জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় ষান্মাসিক সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর
1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন-55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1979

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1979

চিত্র-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জানুয়ারী—জুন
1980

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন-55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক প্রথম ষাণ্মাষিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1980

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণনাক্রমিক লেখকসূচী

জানুয়ারী থেকে জুন—1980

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখক সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1980

GREEN LEAVES PROPERTY
FULLY MAINTAINED
Keshut
HERBAL
HAIR OIL

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 12, ডিসেম্বর, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ   ডিসেম্বর, 1979   দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ধোঁয়াশা : একটি শহুরে সমস্যা

জয়ন্ত বসু

শীতের রাতে শহর কলকাতা একটা নোংরা চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে থাকে। এই চাদরের নাম ধোঁয়াশা। ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলিয়ে এর সৃষ্টি। ইংরেজিতে বলে smog (smoke+fog)। ধোঁয়াশা কেবল কলকাতারই পরিবেশকে দূষিত করে না, পৃথিবীর বহু শহরেরই এটি এক অন্যতম সমস্যা। লণ্ডন, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি শহরে শীতকালে কখনো কখনো এমন ধোঁয়াশা হয় যে, পাশের লোককে পর্যন্ত ভাল ভাবে দেখা যায় না, যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ রাতের দিকেই এর দাপট বেশি। আমেরিকার লস এঞ্জেলস্ শহরে আবার ধোঁয়াশার প্রাবল্য দেখা দেয় দিনদুপুরে অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

ধোঁয়াশা যে শুধুমাত্র মানুষের জীবনযাত্রাকে সাময়িক ভাবে স্তিমিত করে দেয়, তা নয়, মানুষের জীবনের উপরও এর অশুভ দৃষ্টি রয়েছে। ধোঁয়াশার ফলে ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। ধোঁয়াশার পরিবেশে যাঁরা অনেক দিন থাকেন, শ্বাস প্রশ্বাসের রোগে তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর হার সাধারণের চেয়ে বেশি। মানুষের পাকস্থলীও ধোঁয়াশায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা চোখের পক্ষে কষ্টদায়ক। কেবল প্রাণীর পক্ষে নয়, উদ্ভিদের পক্ষেও ধোঁয়াশা ক্ষতিকারক। আবার এর প্রভাবে রবার, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদিও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ধোঁয়াশা মূলতঃ একটি শহুরে সমস্যা। কল-কারখানার চুল্লী থেকে, হাজার হাজার বাড়ির উনান থেকে এবং বাস, লরী, মোটরগাড়ি প্রভৃতির এঞ্জিন থেকে যে রাশি রাশি ধোঁয়া ক্রমাগত শহরের বায়ুমণ্ডলে মিশছে, তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কুয়াশার

জলকণার সঙ্গে মিলে ধোঁয়াশার উৎপত্তি করে। এর মূলে প্রধানতঃ রয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর দহন। কয়লার কার্বনের দহন যদি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতিকর কালোধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ দহনের ক্ষেত্রে ধোঁয়ার দৌরাত্ম্য কমলেও কয়লার ভিতরের অদাহ্য পদার্থ উড়ন্ত ভস্ম (fly ash) রূপে বায়ুতে মেশে। সব রকম কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর মধ্যে যে গন্ধক থাকে, তা দহনের ফলে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে নির্গত হয়। (অনেক ধাতুর নিষ্কাশনেও সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়)। এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প জীবজগতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক, ধাতু ও পাথরেরও এ ক্ষয় সাধন করে।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে ধোঁয়াশা সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে, ধোঁয়াশার উপাদান নানা-রকমের হতে পারে—যেমন, বিভিন্ন জৈব পদার্থ, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ও গন্ধকের বিভিন্ন যৌগ, ধাতব অক্সাইড ও ক্লোরাইড, ওজোন ইত্যাদি। ধোঁয়ার যে সব পদার্থ থাকে, সেগুলির কয়েকটি আবার আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে বা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং সেই নতুন পদার্থগুলিও ধোঁয়াশার উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলিতে ধোঁয়ার বিভিন্ন উৎসকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে ধোঁয়াশার প্রকোপ কমানোর চেষ্টা চলছে।

আমাদের দেশে ধোঁয়াশার বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত কম। কলকাতার মত শহরে ধোঁয়াশা কমা দূরের কথা, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ধোঁয়াশার প্রকৃতি, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন রকম উল্লেখযোগ্য চেষ্টা ভারতের কোন শহরে হয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই, অথচ ধোঁয়াশা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এটাই হল প্রথম নিঃসন্দেহ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সব শহরের ধোঁয়াশা এক ধরনের নয়—এজন্য আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধোঁয়াশা তথা বায়ু দূষণের সমস্যাই কেবল নয়, আমাদের দেশের শহরগুলিতে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে নানান সমস্যা রয়েছে, সেগুলির সমাধানে বিজ্ঞানকে খুব কমই কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা আজকাল প্রায়ই একটা কথা শুনি যে, বিজ্ঞানকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ শহরে যেন বিজ্ঞানের প্রয়োগ যথেষ্ট হচ্ছে, এখন শুধু গ্রামে বিজ্ঞানের দীপ জ্বালাতে পারলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়! আধুনিক বিজ্ঞানের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, তারই বা কতটুকু পান কলকাতার মত শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ? আসলে প্রশ্নটা শহর বনাম গ্রামের নয়, প্রশ্নটা শহর এবং গ্রামে বিজ্ঞানকে সমাজমুখী করে তোলার। অবশ্য সামাজিক ব্যবস্থারও এমন পরিবর্তন দরকার যাতে সমাজও সত্যিকারের বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে।

আধুনিক শিল্প-নির্ভর সভ্যতার যুগে শহরের সংখ্যা বাড়ছে, শহরের গুরুত্বও বাড়ছে। অনেক গ্রাম ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে আধা-শহর, যেগুলির আমরা হয়তো নামকরণ করতে পারি 'গ্রাহর' (গ্রাম+শহর)। এই সব জায়গাতেও ধোঁয়াশার মত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রাহরে অথবা গ্রাহর থেকে শহরে রূপান্তরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিকল্পনার দরকার।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান এখনো অনেকটা সৌখীন বাবুর মত, ধূলা কাদা বাঁচিয়ে কিছু ভাল ভাল বুলি আউড়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরে, গ্রাহরে, গ্রামে—সবত্রই একে একেবারে কঠিন বাস্তবের উপর দাঁড় করানো দরকার, দরকার নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে সরিয়ে এনে নিরলস কর্মযজ্ঞে সামিল করে দেওয়ার।

পরাগ সংযোগে মৌমাছি

স্বপন চক্রবর্তী*

[কৃষিকার্যে মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে মৌমাছির ন্যায় উপকারী কীটপতঙ্গের কথা চিন্তা করে কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে]

গাছে ফুল ফোটে, ফুল ঝরে গেলে দেখা যায় ফল, আর সেই ফল থেকে পাওয়া যায় বীজ। এখন প্রশ্ন, ফলটা ফুল থেকে হয় কি করে?—পুংফুলের রেণুর সঙ্গে স্ত্রীফুলের ডিম্বাণুর মিলনেই ফল জন্মায়। কোন মাধ্যম ছাড়া এই মিলন সম্ভব নয়। মাধ্যমগুলি অনেক রকমের হতে পারে। যেমন—বাতাস, জল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

পরাগ সংযোগ আবার দুইরকমের—(1) আত্ম পরাগ সংযোগ (self pollination) (2) সঙ্কর পরাগ সংযোগ (cross pollination)। যদি একই জাতীয় কোন ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা একই জাতীয় গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে তাহলে সেখানে আত্মপরাগ সংযোগ ঘটে। আর একই পরিবারভুক্ত উদ্ভিদের একশ্রেণীর গাছের ফুলের পরাগরেণু যদি অন্য শ্রেণীর গাছের স্ত্রী অংশে মিলিত হয় তাহলে তাকে সঙ্কর পরাগ সংযোগ বলা হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সঙ্কর পরাগ সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত গাছের সতেজতা, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি আত্ম পরাগ সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত গাছের তুলনায় অনেক বেশী হয় এবং এসব গাছে প্রচুর ফল আসে। তবে এটা প্রমাণিত যে আত্মপরাগ সংযোগের তুলনায় গাছে সঙ্কর পরাগ সংযোগ বেশী হয়ে থাকে। আর সঙ্কর পরাগ সংযোগের বেশীর ভাগটাই সংঘটিত হয় কীট-পতঙ্গদের দ্বারা।

পৃথিবীতে পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের সংখ্যা কম নয়, তবুও তাদের মধ্যে মৌমাছি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কৃষিকার্যে মৌমাছি একটা বিরাট সম্ভাবনাময় দিক খুলে দিয়েছে। এদের দিয়ে পরাগ সংযোগ ঘটালে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়, যেগুলি অন্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

(1) মৌমাছি একটি সামাজিক জীব। তাই অধিক সংখ্যক মৌমাছিকে আমরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে অতি সহজে আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে পারি। এতে প্রধান সুবিধা—এদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। শীতকালে অন্যান্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গরা যখন শীতঘুমে ব্যস্ত থাকে তখন মৌমাছিরা থাকে সবচেয়ে ব্যস্ত। ফলে পরাগ সংযোগে অন্যান্য পতঙ্গ প্রকৃতিতে কম থাকলেও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। মৌমাছির একমাত্র খাবার পরাগ এবং মধু যা একমাত্র ফুলেই পাওয়া যায়। তাই তারা জীবনধারনের তাগিদে ফুলে যেতে বাধ্য হয়—ফলে পরাগ সংযোগ প্রাকৃতিক পরিবেশেই ঘটে।

মৌমাছি একই সময়ে একই জাতীয় ফুলের উপরে

---

*গোবরডাঙ্গা রণেসাঁস ইনষ্টিটিউট পোঃ খাটুরা, জিলা-24 পরগণা

আনাগোনা করে, ফলে পরাগকণা নষ্ট হয় না। যেমন, ধরা যাক—কোন একটা প্রজাপতি দিনের প্রথমে একটি কুমড়ো ফুলে বসল এবং তার থেকে পুষ্পরস নিল। পুষ্পরস নেওয়ার সময় প্রজাপতির পা এবং গায়ের বিভিন্ন জায়গায় পরাগরেণু লেগে গেল। এবার প্রজাপতি পাশেই একটা সীম ফুলে বসল এবং ঐ ফুলে কুমড়ো ফুলের পরাগরেণু লাগিয়ে দিল। এর ফলে ঐ সীম ফুলটার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একটা মৌমাছি দিনের প্রথমে যদি কোন কুমড়ো ফুল থেকে পুষ্পরস এবং পরাগ সংগ্রহ করে তবে সে দিনের শেষ সময়টি পর্যন্ত কুমড়ো ফুল থেকেই পুষ্পরস ও পরাগ সংগ্রহ করবে। কোন রকম প্রলোভনেই সে অন্য ফুলে যাবে না। এর ফলে পরাগ আদান-প্রদান হয় খুব সুন্দরভাবে। অন্যান্য পতঙ্গদের মত মৌমাছির সঞ্চয় প্রবৃত্তি সীমিত নয়। তারা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য মজুত করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পর্যন্ত পুষ্পরস ও পরাগ পাওয়া যায় তা আহরণ করতে থাকে। আর এর ফলে মৌমাছিদের কাছ থেকে উপজাত (bi-product) পদার্থ হিসাবে মধু পাওয়া যায়। আর এই মধুটা এরা তৈরি করে উদ্বৃত্ত পরাগ এবং পুষ্পরস থেকে। এই সংগ্রহের জন্য পরাগ সংযোগের কোন রকম অসুবিধা দেখা দেয় না। মৌমাছির দেহ একপ্রকার সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা থাকে। তাই দেহস্থিত লোমের সাহায্যে পরাগ সংযোগ সুন্দরভাবে সাধিত হয়। তাছাড়া মৌমাছির দেহের গড়নটাও সুন্দর পরাগ সংযোগের অনুকূল। মৌমাছির মুখে কোন ধারালো অংশ নেই। ফলে পাতা কাটা মাছি বা অন্যান্যদের মত এদের থেকে ফুলের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না। মৌমাছিরা ফুলের মধ্যে কোন রোগজীবাণু ছড়াতে পারে না।

মৌমাছির দ্বারা সুষ্ঠু সঙ্কর পরাগ সংযোগের ফলে ফলশস্যের সংখ্যা, আকৃতি, ওজন ও স্বাদ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তৈলবীজ জাতীয় শস্য বা ফলের ক্ষেত্রে সঙ্কর পরাগ সংযোগের ফলে বীজ পুষ্ট হয় ও তেলের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। সাধারণতঃ সূর্যমুখী ফুলে সঙ্কর পরাগ সংযোগ না হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দানা জন্মায় না। যা জন্মায় তাতে তেলের ভাগ খুবই কম থাকে এবং বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। মৌমাছির দ্বারা পরাগ সংযোগের ফলে দেখা গেছে যে শতকরা 85 ভাগ বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে থাকে।

এই আলোচনা থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়েছে যে আধুনিক কৃষিকার্য এবং মৌমাছি পরস্পর পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল।

আমাদের দেশের আধুনিক কৃষিজীবীরা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদে অভ্যস্ত হচ্ছেন। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা জমিতে বিভিন্ন রকমের সার ব্যবহার করছেন আবার উন্নত দেশের মত তারা ফলশস্য রক্ষার জন্য জমিতে কীট নাশক বিষাক্ত ওষুধও ছড়াচ্ছেন। এতে অপকারী পতঙ্গদের সঙ্গে মৌমাছির মত উপকারী পতঙ্গরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একথাটা সম্পূর্ণ সত্য যে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগ বন্ধ করা যাবে না এবং তা উন্নত মানের কৃষিতে যুক্তিযুক্তও নয়। এ ব্যাপারে মৌমাছিকে বাঁচাতে হলে মৌমাছি পালকদের (Bee Keeper) সঙ্গে কৃষকদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের বোঝাতে হবে যে এতে উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষিতের হার বেশী এবং শিক্ষিতরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত হলে এ ব্যাপারে তারা যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, এটা স্বাভাবিক। সেখানে কীটনাশক ওষুধগুলি বাজারে ছাড়ার আগে চিন্তা করা হয় যেন সেটা মৌমাছি এবং উপকারী পতঙ্গদের ক্ষতি করতে না পারে। আর যদিও ওষুধটি মৌমাছির পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে সেই ওষুধ জমিতে এমন সময়ে প্রয়োগ করা হয় যাতে মৌমাছি ও অন্যান্য উপকারী পতঙ্গদের কোন ক্ষতি না হয়। আর একটা কথা, আধুনিক কৃষিকার্যে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য তেমনি মৌমাছি ও অন্যান্য উপকারী পতঙ্গদের জীবনরক্ষাটাও কৃষকদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি উপকারী পতঙ্গদের কথা চিন্তা না করে কীটনাশক দ্রব্যাদির প্রয়োগ বহুল পরিমাণে বাড়ানো হয় তবে শুধু মৌমাছির মত উপকারী পতঙ্গদেরই শেষ করা হবে না—সেই সঙ্গে ক্ষতি করা হবে জাতীয় সম্পদকে।

হিলিয়ামের সন্ধানে

সন্তোষকুমার ঘোড়ই *

[হিলিয়ামের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন উৎস এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। ভারতের কেরালায় যে বিপুল পরিমাণ মোনাজাইট বালি আছে, তা থেকে কিভাবে হিলিয়াম সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

অতি নিম্ন উষ্ণতার জগতে (অন্যভাবে বললে অতিপরিবাহী ও অতিতারল্যের জগতে) হিলিয়াম অতিপরিচিত এবং একান্ত আবশ্যক একটি গ্যাস। হিলিয়াম বাতি তৈরিতে, নিউক্লীয় রিয়্যাক্টরে আচ্ছাদক গ্যাস হিসেবে, সূক্ষ্মছিদ্র নির্ধারণে, মহাকাশ যাত্রায়, বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় বেলুন উড়ানোর ক্ষেত্রে (হিলিয়াম গ্যাস হালকা অথচ অদাহ্য এবং আপাত নিষ্ক্রিয়তাই) হিলিয়াম আধুনিক বিজ্ঞানে একক ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক। মাত্র পনেরো বছর হল প্রকৃত অর্থে নিম্ন উষ্ণতা সংক্রান্ত পদার্থ বিদ্যার কিংবা ক্রায়োজেনিক (Cryo-cold : genies-production) গবেষণা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে এই গবেষণার কাজে ভারতবর্ষে বছরে লাগছে 2,000NM³ গ্যাস। আর নিউক্লীয় গবেষণাগারে বর্তমানে বছরে লাগছে 10,000NM³ গ্যাস। (NM³ এককটি হল সাধারণ উষ্ণতায় (0 C) এবং চাপে (76 সে.মি. পারদ) ঘনমিটারে গ্যাসের আয়তন)। এখনও পর্যন্ত হিলিয়াম গ্যাসের সবটাই বিদেশ থেকে (আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি) আমদানি করতে হচ্ছে। একটি 6NM³ গ্যাস সিলিণ্ডারের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'হাজার টাকা। অতএব, সহজেই বোঝা যায় আমাদের মত অর্থভুখ গরীব দেশ থেকে কেবলমাত্র এজন্য কি পরিমাণ টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে। কোনটা আগে বা কোনটা পরে এ বিতর্কে না গিয়ে, দেখা যাক, বিদেশ থেকে আমদানি না করে আমাদের দেশেই কিভাবে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন উৎস

পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হিলিয়াম সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাসে 0.5% বা তারও বেশী হিলিয়াম গ্যাস থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় দু'ভাবে – (1) শুকনো কূপ থেকে, অর্থাৎ যা থেকে কেবল গ্যাস পাওয়া যায় কিন্তু পেট্রোল বা ঐ জাতীয় কোন তরল পাওয়া যায় না। (2) তরল কূপ থেকে—তরল প্রাকৃতিক পেট্রোলের সঙ্গে মিথেন (দাহ্য), কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর কূপ থেকে যে প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হয়, তাতে মিথেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাসও থাকে। এধরণের প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে জ্বালানী গ্যাস (মিথেন ইত্যাদি) সংগ্রহকালে হিলিয়াম গ্যাসকেও আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে এটাই হল হিলিয়াম সংগ্রহের প্রধান উৎস।

উষ্ণপ্রস্রবণেও হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণে যে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরোয়, তাতে হিলিয়ামের পরিমাণ 3%-এর মত। অন্যান্য যে সব গ্যাস থাকে, সেগুলির মধ্যে

---

* ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেণ্টার, আই, আই, টি, খড়গপুর।

উল্লেখযোগ্য হল কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প। মিথেন প্রভৃতি জ্বালানী গ্যাস না থাকায় কেবলমাত্র হিলিয়াম সংগ্রহের জন্য বক্রেশ্বরে একটি বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ নাকি ব্যয়বহুল - এটাই হল তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যাই হোক অন্য একটি প্রচলিত পদ্ধতি হল—বায়ু-তরলীকরণ যন্ত্র থেকে নির্গত হিলিয়াম, নিয়ন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসমিশ্রণ থেকে হিলিয়াম'কে আলাদা করা। কিন্তু এটিও একটি কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা। তাছাড়া এভাবে পাওয়া হিলিয়ামের পরিমাণও বেশ কম। সুতরাং ভারতবর্ষে এসব পদ্ধতি গ্রহণ করে হিলিয়াম সংগ্রহ সম্ভবতঃ অচল।

মোনাজাইট বালি থেকে হিলিয়াম কেরালায় বিশেষ একটি অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ একধরণের রোগ। অনুসন্ধানে জানাগেছে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বালুরাশি এই রোগের জন্য দায়ী। এইসব বালিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকায়—তেজস্ক্রিয়তার দরুণ এই রোগসৃষ্টি। বিরল মৃত্তিকা গোষ্ঠী (rare earthes), থোরিয়াম, ইউরেনিয়ামের ফসফেট যৌগ সম্বলিত এই ধরণের বালির নাম মোনাজাইট বালি (monazite Sand)। এই মোনাজাইট বালি প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে হিলিয়াম উৎসের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এ থেকে স্বল্পব্যয়ে হিলিয়াম নিষ্কাশন সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, কামেরলিং অনেস্ (Kamerlingh Onnes) প্রথম যে হিলিয়াম গ্যাস তরলীভূত করেন,—তা ভারতবর্ষ থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। সেই গ্যাস এই মোনাজাইট বালি থেকেই নিষ্কাষণ করা হয়েছিল।

মোনাজাইটে হিলিয়ামের উপস্থিতি প্রথম ধরা পড়ে 1897 সালের কাছাকাছি সময়ে। বিদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সহজে হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে বলে আজ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মোনাজাইটের উপর নজর দেন নি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কস্টিক সোডা প্রয়োগে এক গ্রাম মোনাজাইট থেকে 0·8 ঘন সেন্টিমিটার হিলিয়াম পাওয়া সম্ভব। এখন বিরল মৃত্তিকাগোষ্ঠী, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম মৌলগুলি মোনাজাইট থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই দায়ীত্ব গ্রহণ করেছে—'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড কোং'। বর্তমানে এই কোম্পানীর প্রধান প্রকল্পটির সঙ্গে হিলিয়াম সংগ্রহ গৌণ প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে। মোনাজাইট থেকে হিলিয়াম সংগ্রহ পদ্ধতিটি পরপৃষ্ঠায় নক্সা যোগে সংক্ষেপে দেখানো হল।

ভারতবর্ষে মোনাজাইট বালির ভাণ্ডার বিশাল। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করে বাইরের দেশ তাদের মূলধন ও লভ্যাংশ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের কারিগরি জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত, যোগ্য কর্মীরও অভাব নেই। তাই পরমুখাপেক্ষী না হয়ে এখন সময় এসেছে—দেশের প্রয়োজনে নিজেদের উৎসকে সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার করার। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বছরে কমপক্ষে 2500NM[3] হিলিয়াম গ্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব। এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ও উদ্যোগ দেশের হিলিয়াম চাহিদা মেটাতে একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে।

বিক্রিয়া পাত্র

কস্টিক সোডা
+
মোনাজাইট বালি
140°C-এ
9 ঘণ্টা রাখা হয়

ফেনা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা
(foam Separator)

ঘনীভবন ব্যবস্থা
(Condenser)

অপরিশোধিত গ্যাস
He 30%, H_2-2%

গ্যাসধারক
(gas holder)

সংনমন যন্ত্র
200 কে.জি. / বর্গ সে.মি.

De-oxo শোধক
হাইড্রোজেন অপসারণ করে।

তরল নাইট্রোজেন দ্বারা শোধন
(O_2, N_2— ঘনীভূত হয়)

গ্যাস শোষক

বিশুদ্ধ হিলিয়াম গ্যাস (99·9%)

1নং চিত্র—মোনাজাইট বালি থেকে হিলিয়াম সংগ্রহের পদ্ধতি

বিজ্ঞান ও সমাজ

হিজলি টাইডেল ক্যানেল

অমিত বরণ চট্টোপাধ্যায়*

[হিজলি টাইডেল ক্যানেল বর্তমানে একটি স্থানীয় সমস্যা, এককালে এ ক্যানেল নাব্য ছিল এবং জলসেচের ব্যবস্থা করতো। এখন এ নাব্যতা হারিয়েছে, তার সঙ্গে জল সেচ ব্যবস্থাও বন্ধ হয়েছে কেননা রূপনারায়ণের ও হলদি নদীর মুখ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন—এই ক্যানেলের সংস্কার।]

এখনকার কালের না হলেও ইতিহাসের কাল থেকে হিজলি টাইডেল ক্যানেল-কুলে কুলীন। উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেলের সঙ্গে মিশে বাংলা উড়িষ্যার পণ্য বাহিত হত এর বুকের উপর দিয়ে। স্থল পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখন আর এ পথে পণ্য চলাচল করে না। তা ছাড়া হিজলি টাইডেল ক্যানেলের এখন এত জীর্ণদশা, পণ্য বহন দূরের কথা একটা জেলে ডিঙিও চলবে না এর সংকীর্ণ জলনালি দিয়ে। অথচ ইতিহাস বলে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডি. এল. রায়, এঁরা এই ক্যানেলের উপর দিয়েই কলকাতা-কাঁথি যাতায়াত করেছেন। আমরা দেখেছি, মহাত্মা গান্ধীর লঞ্চ এসে ভিড়লো এই ক্যানেলের মাঝ বরাবর একটা জায়গায়—মহিষাদলে। সেখানে নেমে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন।

আজ এই ক্যানেল সংস্কার অভাবে যে কোন ছোট খালের থেকেও স্বল্প-পরিসর। এপার ওপার যাওয়ার জন্য রূপনারায়ণ থেকে হলদি নদী প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ ক্যানেলের বুকে ছয় সাতখানা খেয়া থাকতো, সেখানে যত্র তত্র বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে। গত বছর কর্তাব্যক্তিদের দয়ায় রূপনারায়ণের মুখ ও হলদির মুখ সম্ভবত চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পলি পড়ে পড়ে অগভীর হয়ে যাওয়া ক্যানেলের পণ্যবহন যোগ্যতা ফিরে আসবে কিনা আর তা ফিরিয়ে আনতে হলে যে খরচ হবে তার চেয়ে বর্তমান ব্যবস্থায় পণ্য চলাচল অধিকতর লাভজনক কিনা তা হিসেব বিশারদেরা ভেবে দেখুন কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বার মাইল দীর্ঘ ক্যানেলের দু'পাশে ত্রিশ চল্লিশখানা গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থাটা কি হবে? এই গ্রামগুলির জল নিকাশ এবং চাষের প্রয়োজনে জল নেওয়ার জন্য দুই পাড়ে মিলে কম করে হলেও আট দশটি স্লুইশ গেটের ব্যবস্থা ছিল। এই স্লুইশ থেকে ছোট বড় খাল একেবারে গ্রামের ভিতরের নানা খালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল বের করে দেওয়ার ও নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলি এখন অকেজো। আজ যদি প্রবল বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে ঘটে থাকে তবে জলনিকাশের অভাবে ডুবে বা পচে মরতে হবে। তা ছাড়া নদী থেকে উঠে আসা জোয়ার জলের কল্যাণে স্থানীয় চাষের জমি স্বাভাবিকভাবে উর্বরতা বজায় রাখতে সমস্ত কৃষককে নূতন করে ভাবতে হবে। অনেকে বলেন—এই ক্যানেল থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে গাড়ুঘাটা খাল এবং পূবে মধ্যভুনিয়ার খালদুটিকে ভাল করে সংস্কার করা হয়েছে যার ফলে ক্যানেলের কাজ ওই দুটি খালই করতে পারবে। অর্থাৎ জলের যে গতি পূর্ব দিকে ছিল তা পশ্চিম দিকে বা পশ্চিম

* মহিষাদল, মেদিনীপুর

দিকে ছিল তা পূর্ব দিক দিয়ে হবে। এটা কি সম্ভব? এ বছর বৃষ্টি এতদঞ্চলে কম। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ক্যানেল থেকে জোয়ার তুলে এখানের চাষআবাদের কাজ হয়েছে। কোন বছরই আবাদ-শূন্য জমি পড়ে থাকে নি। এখন তারও সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

অতএব ক্যানেলটার গুরুত্ব ফুরিয়ে গেছে ভেবে যাঁরা এঁকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন তাঁরা আর একবার ভেবে দেখুন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দূরদৃষ্টির সহায়তায় একে বাঁচিয়ে তুলুন। তাতে চল্লিশ পঞ্চাশটি গ্রামের পঞ্চাশ ষাট হাজার অধিবাসীর আতঙ্ক মুক্তির ব্যবস্থা হবে।

ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরূপণ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়*

প্রতিপাদ্য বিষয় :

[ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরূপণ পুরাতত্ত্বে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। এই নিবন্ধে তার মূল সূত্র এবং ভারতবর্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।]

প্রাচীন বস্তুর সময় নিরূপণ পুরাতত্ত্বে এক বড় রকমের সমস্যা। সঠিক সময়কাল নির্ণয় করতে না পারলে উৎখনন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এককালে ঐতিহাসিকেরা তুলনামূলক ভাবে বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে সময়কাল নিরূপণ করতেন। পরবর্তী কালে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সময়কাল ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরমাণু বিজ্ঞানী উইলার্ড এফ. লিবি তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্থায়িত্ব নিয়ে এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন 1952 খৃষ্টাব্দে। এর ফলস্বরূপ 1960-তে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। আবিষ্কারটি 'রেডিও কার্বন ডেটিং' নামে আজকের বিজ্ঞানী ও পুরাতাত্ত্বিকদের কাছে সুপরিচিত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে আগ্রহী ব্যক্তিদের অবশ্যই জানতে হয় এর কার্য পদ্ধতির মূল সূত্র।

মূল সূত্র

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণার সমষ্টি। পরমাণুর মূলধর্ম নির্ভর করে প্রোটন কণার সংখ্যার উপর। পারা আর সোনার মূল পার্থক্য আসলে এর প্রোটন এর সংখ্যা। যেন নিউট্রন এর সংখ্যা কম বেশী হলে পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয়না, একই জাতীয় মৌলিক পদার্থের নিউট্রন সংখ্যার কম বেশী হলে সেগুলিকে ঐ মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপগুলির নাম করলে সব সময়ে পারমাণবিক ভরের উল্লেখ করা হয়। মৌলিক পদার্থ কার্বন এর পরমাণুতে প্রোটন এর সংখ্যা 6, নিউট্রনের সংখ্যা 6 বা 8। এই হিসাবে এর দুটি আইসোটোপ রয়েছে কার্বন 12 এবং কার্বন-14। জীব জগতের মূল উপাদান কার্বন-12 সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদে রয়েছে।

*3A/2. এস. এন. ব্যানার্জি এভিনিউ, দুর্গাপুর-713204

কার্বন-14 আইসোটোপটি সাধারণ কার্বনের (কার্বন-12) সঙ্গে মিশে থাকলেও এটি কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরের নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মি বাহিত নিউট্রনের সংঘাতে সৃষ্ট নূতন পদার্থ। পারমানবিক বিক্রিয়াটি হয় এই ভাবে:- সাধারণ নাইট্রোজেন এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে 7টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন (নাইট্রোজেন-14)। এর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ঐ নিউট্রন সংঘাতের ফলে নবজাত নিউক্লিয়াসে থাকছে 7টি প্রোটন এবং 8টি নিউট্রন (নাইট্রোজেন-15)। সৃষ্ট পদার্থটি অবশ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ (অস্থায়ী)। এই নিউক্লিয়াস থেকে একটি প্রোটন স্বতস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে গেলে এটি কার্বন 14 তে পরিণত হচ্ছে। এটিও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং বিকিরণের ফলে এর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যায়।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের সময়কাল মাপার এক পদ্ধতি রয়েছে। এতে বলা যায় কত সময় পরে ঐ পদার্থের অর্ধেক ওজনের বস্তুর ভাঙন হবে। এটি পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষায় অর্ধ আয়ুষ্কাল বা হাফলাইফ। সাম্প্রতিক গবেষণায় এইচ. গডউইন (1962) এর অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে ঐ কার্বন-14-র অর্ধ আয়ুস্কাল মোটামুটি ভাবে 5730 ± 40 বছর। এ থেকে বলা যায় 1 কিলোগ্রাম কার্বন-14 5730 বছর পরে $\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম কার্বন-14 তে পরিণত হবে। এখন কার্বন-14 এর নিউক্লিয়াস একটি বিটা কণিকা ত্যাগ করে, যা কিনা ওর নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রন কনিকা প্রোটনে পরিণত হবার সময় হয়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে কার্বন-14 আবার নাইট্রোজেন-14 তে ফিরে যাচ্ছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে সব সময়ই কার্বন-14র জন্ম মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে।

কার্বনের ঐ আইসোটোপ দুটির অনুপাত কিন্তু সব সময়েই এক তবে সংখ্যাটি খুবই ছোট, মাত্র $1{\cdot}3 \times 10^{12}$। দুই জাতীয় কার্বন-ই অক্সিজেনের সঙ্গে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। আলোক সংশ্লেষণের ফলে গাছের পাতায় সঞ্চিত হচ্ছে কার্বনের ঐ দুটি আইসোটোপই ঐ অনুপাতে। কাঠের ভেতরে বা প্রাণীদেহে উদ্ভিদ থেকে খাদ্যের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে তার দেহে। গাছপালা বা প্রাণীর মৃত্যুর পর কিন্তু নূতন করে বাতাসে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় কার্বন-14 আর তার দেহে প্রবেশ করতে পারে না এবং দেহের সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় কার্বন অত্যন্ত ধীর গতিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কমতে থাকে।

শত শত বছর পরেও যদি সেই জৈব বস্তুর অস্তিত্ব থাকে তবে দেখা যায় সেই আইসোটোপের অনুপাত আরো কমে গেছে। ভাঙনের হার জানার জন্য অনুপাতের সঠিক মানের সঙ্গে তুলনা করে তার মৃত্যুর সময় জানা যাবে। উৎখননে কোনও স্তরের সময় নিরূপণের জন্য সেই স্তরে পাওয়া কাঠকয়লা, শস্য, অস্থি, বস্ত্র প্রভৃতিকে ঐ পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতি অনুধাবন করা অত্যন্ত জটিল। মোটামুটি ভাবে আবহাওয়ার সংস্পর্শে না এনে সংগৃহীত পুরাবস্তুর অংশ বিশেষকে দহনের ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড বা মিথেন গ্যাসে পরিণত করা হয়। পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে গ্যাস প্রোপোর্শনাল কাউন্টার (gas proportional counter) এ ঐ অনুপাতে মাপা হয়।

ভূতাত্ত্বিক শিলার সময়কাল নির্ণয়ের পদ্ধতি একটু আলাদা। তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম কালে কালে সীসাতে পরিণত হয়। শিলা তরল অবস্থায় থাকলে উদ্ভূত সীসা আলাদা ভাবে জমে; কিন্তু গলিত শিলা যখনই কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ইউরেনিয়াম ও উদ্ভূত সীসা এক সঙ্গে থাকে। অর্ধ আয়ুস্কাল জানার জন্য ধাতু দুটির অনুপাত থেকে কবে শিলা তরল অবস্থা হারিয়েছে তা জানা যাবে।

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ঐ নিরীক্ষণ করা হয় বলে এতে কিছু ত্রুটি আসে। যেমন, চার হাজার বছরের মত প্রাচীন বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ সময় কাল কম বেশী 100 বছরের মধ্যে থাকে। মহাকালের হিসাবে ঐ ত্রুটি নিতান্তই সামান্য।

ভারতে প্রয়োগ

এই পদ্ধতি আবিষ্কার হলে ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরূপনে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ এর তৎকালীন ডাইরেক্টর বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রথম দিকে ভারতের গুটিকয়েক প্রত্ন বস্তুকে বিদেশে পাঠানো হত। কিন্তু তাতে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় হওয়ায় ডঃ ভাবা ভারতের পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করার জন্যে তাঁর গবেষণাগারে 'রেডিয়োকার্বন ল্যাবরেটরী' গড়ে তোলেন। 1962তে সেই কাজ শুরু হয়। ঐ ল্যাবরেটরীতে পরিচালক হিসাবে ডক্টর ধর্মপাল আগরওয়ালকে ডঃ ভাবা নিয়োগ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় হাজার খানেক প্রত্ন নমুনার সময়কাল জানা যায়। ডঃ আগরওয়াল বর্তমানে পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট রেডিয়োকার্বন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। 1973তে ঐ গবেষণাগার স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে সেটি ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর অন্যতম বিভাগ। 'রেডিয়োকার্বন' পত্রিকায় তাদের গবেষণার ফল নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই প্রবন্ধ লেখার জন্য ডঃ ডি. সি. আগরওয়াল এর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী।

বৈদ্যুতিকবাতির শতবর্ষ ও টমাস এডিসন

অরুণকুমার ঘোষ*

[বৈদ্যুতিক বাতির শতবর্ষ উপলক্ষে এই বাতির উদ্ভাবক টমাস এডিসনের বাল্যজীবন ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হয়েছে। এই বাতি তৈরীর ইতিহাসও এখানে বিবৃত।]

বৈদ্যুতিক বাতির এটা শতবার্ষিকী বছর। একশ'বছর আগে 21শে অক্টোবর আমেরিকার টমাস আলভা এডিসন সফল বিদ্যুৎ-বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। শুধু বিদ্যুৎ-বাতি নয়, এডিসন আরও অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছিলেন। কেবলমাত্র মার্কিনদেশে তিনি সারাজীবনে 1,093টি উদ্ভাবনের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনটি—ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন), বৈদ্যুতিক ও ভিটাস্কোপ (চলচ্চিত্র ক্যামেরা)—আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ বলা চলে। বৈদ্যুতিকবাতি তো অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ।

আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশের মিলান শহরে 1847 সালে এডিসনের জন্ম। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। বাবার একটা ছোটখাট করাতকল ছিল। মা স্কুলে পড়াতেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষা টমাসের ভাল লাগল না। বুদ্ধিমতী মা ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। কিন্তু ছেলে ত' তেমন সুশীল সুবোধ বালক নন্! তাঁর মাথায় কখন কী দুষ্টুমি ভর করে, তার নাগাল পাওয়া মুশ্‌কিল। কী খেয়াল হল, একবার এক গোলাবাড়ীতে তিনি আগুন লাগিয়ে দিলেন। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে সর্বসমক্ষে চাবুক মারা হলো। একবার মাছ ধরতে গিয়ে এক খালের জলে ডুবে যাবার মত হয়েছিল। আর একবার এডিসনকে সারাদিন খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সন্ধান মিলল দেখা গেল তিনি মুরগীদের অনুকরণে ডিমে তা দিচ্ছেন। অসীম কৌতুহল ছেলের! খালি প্রশ্ন, এটা কেন, ওটা কেন। বাবা তিতিবিরক্ত। তাঁর ধারণা, ছেলে একটা আস্ত গাধা। মার ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অসীম স্নেহ ও অশেষ ধৈর্য নিয়ে ছেলের পড়াশুনা দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এডিসন পরিবার মিশিগান প্রদেশের পোর্ট হিউরণ শহরে ডেরা বাঁধল। বারো বছর যখন বয়েস হল, টমাস ভাবলেন কিছু রোজগার করা যাক। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু দেশটা ভারতবর্ষ নয়। সুতরাং বাবা-মার সানন্দ অনুমতি মিলল তিনি পোর্ট

*নেহেরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, বোম্বাই-18

হিউরন থেকে ডেট্রয়েট যাবার রেলপথে চকোলেট আর খবরের কাগজ বিক্রি শুরু করলেন। ওইটুকু ছেলে হলে কি হয়, তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি খুব পাকা। তিনি যাবার পথে বিভিন্ন স্টেশনে চাষীদের কাছ থেকে তাজা তরিতরকারি, ফলমূল কিনে ডেট্রয়টে বিক্রিও করতে লাগলেন। এইসব করে তখনকার দিনে মাসে শ'দেড়েক ডলার রোজগার হতে থাকল। টমাস দেখলেন, এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যখন গাড়ি যায়, তখন তাঁর কিছু করার থাকে না। তাই রেলকোম্পানিকে বলে কয়ে ব্রেকভ্যানের এক কোণে একটা ছোট ল্যাবরেটরী তৈরী করলেন। সেখানে তাঁর রসায়ন চর্চা শুরু হল। মা ছেলেকে বইপত্তর যোগাতে লাগলেন।

এইসময় একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি বদলে গেল। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে মাউণ্ট ক্লিমেন্স শহরের স্টেশন মাস্টারের শিশুপুত্রকে নিশ্চিত রেলগাড়ি-চাপা পড়ার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। কৃতজ্ঞ স্টেশনমাস্টার তাঁকে টেলিগ্রাফযন্ত্রে বার্তা আদান-প্রদানের কাজ শেখালেন। 16 বছর বয়স্ক এডিসন টেলিগ্রাফ অপারেটারের কাজ পেলেন। এই কাজে তাঁকে প্রায় সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়াতে হল। মিশিগানের ডেট্রয়েট, লুইসিয়ানার নিউ অর্লিয়েন্স, ওহায়োর সিনসিনাটি, ইণ্ডিয়ানাপোলিস, কেন্টাকির লুইস্‌ভিল, টেনেসির মেম্‌ফিস। অবশেষে 1868 সালে তিনি বস্টন শহরে বদলি হয়ে এলেন। বস্টন শহরের বুদ্ধিদীপ্ত আবহাওয়ায় এডিসন বিকশিত হয়ে উঠলেন। পুরানো বইয়ের দোকান থেকে মাইকেল ফ্যারাডের লেখা কিছু বই কিনে এনে গোগ্রাসে পড়তে শুরু করলেন। শুধু পড়ে ক্ষান্ত হবার পাত্র তিনি নন—অনেক পরীক্ষা নিজে করে দেখতে লাগলেন। বস্টন শহরের কোর্ট স্ট্রীটে তখন চার্লস উইলিয়ামস নামে এক ওস্তাদ কারিগর ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করা। উইলিয়ামস পরবর্তীকালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোনও ড্রয়িং দেখে তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই উইলিয়ামসের সহায়তায় এডিসন নির্বাচনে ভোট গণনার জন্য একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করে পেটেণ্ট নিলেন। দুঃখের ব্যাপার যন্ত্রটা সরকারী কর্তাদের পছন্দ হল না। ভগ্নহৃদয় এডিসন প্রতিজ্ঞা করলেন, ভবিষ্যতে চাহিদা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হয়ে তবেই কোন্‌ও যন্ত্র তৈরি করবেন।

পরের বছর তিনি নিউইয়র্ক শহরে চলে এলেন। সেখানে মাসে 300 ডলার বেতনের একটা চাকরিও জুটে গেল। কাজ টেলিগ্রাফ মেশিন সারানো। এডিসনের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু হল। তিনি টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত একটার পর একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করে চললেন। বছর দুয়েকের মধ্যে নিউজার্সির নিউ আর্ক শহরে একটা ছোটখাট কারখানা খুললেন। ইতিমধ্যে 1876 সালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন উদ্ভাবন করলেন। বেলের টেলিফোনে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রে ম্যাগনেটো সিস্টেম ছিল। এর প্রধান অসুবিধা ছিল যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যেত। এডিসন বছর খানেকের মধ্যে টেলিফোন প্রেরক যন্ত্রের জন্য কার্বন মাইক্রোফোন উদ্ভাবন করে এই সমস্যার সমাধান করলেন।

1877 সালে এডিসন ফনোগ্রাফ উদ্ভাবন করলেন। যন্ত্রটা নিয়ে তিনি 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার বন্ধু সম্পাদকের অফিসে যখন বাজিয়ে শোনাতে গেলেন, যন্ত্র দেখতে এত লোক ছুটে এল যে মেঝে ভেঙে পড়ার ভয়ে সম্পাদক প্রদর্শন বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রাদারফোর্ড হেয়েস ফনোগ্রাফ বাজিয়ে শোনানোর জন্য এডিসনকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানালেন। এডিসনের ল্যাবরেটরী তখন নিউজার্সি প্রদেশের মেনলো পার্ক শহরে। এত লোক মেনলো পার্কে ফনোগ্রাফ দেখতে আসতে লাগলো যে, রেলকোম্পানী নিউইয়র্ক থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন চালাতে বাধ্য হলেন।

রাতারাতি সাধারণ মানুষের মধ্যে এডিসনের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর এডিসন বৈদ্যুতিকবাতি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। জেনারেটারের সাহায্যে তখন অল্পসল্প বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন হচ্ছে। তা দিয়ে মোটরের সাহায্যে পাম্প চলছে। বিদ্যুৎ-শক্তি দিয়ে আলো জ্বালাবার অনেক চেষ্টা চরিত্র চলছে বটে, কিন্তু সহজ কোনও পন্থার হদিশ মিলছে না।

সমসাময়িক শিল্পীর দৃষ্টিতে এডিসনের বিদ্যুৎবাতি উদ্ভাবন। বাতির পিছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিই এডিসন।

হামফ্রি ডেভী আর্ক-ল্যাম্পের উদ্ভাবন করেছেন, এখানে ওখানে কিছু আর্ক-ল্যাম্প লাগানোও হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাটা তেমন কারও মনঃপূত হচ্ছে না। আর্ক-ল্যাম্পের কার্বন বারবার ঠিকঠাক করতে হয়। আলোও বড় তীব্র—চোখে লাগে। আর্ক-ল্যাম্প ছাড়া আরও একটা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা চলছিল। সেটা হল, ফিলামেন্ট ল্যাম্প। ফিলামেন্ট ল্যাম্পে বায়ুশূন্য কাঁচের আধারে একটা সূক্ষ্ম তারের ফিলামেন্ট থাকে। বিদ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে ফিলামেন্ট গরম হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কিন্তু তখন ফিলামেন্ট ল্যাম্পে প্লাটিনাম ধাতুর তার লাগানো হত, তারও খুব সূক্ষ্ম হত না। ফলে তার দাম হত আকাশছোঁয়া। ল্যাম্পের আয়ু ছিল স্বল্প। দেখে শুনে এডিসনের মনে হল, আর্ক-ল্যাম্পের জনপ্রিয় হবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। বরং সস্তায় ফিলামেন্ট ল্যাম্প তৈরি করতে পারলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 1878 সালের অক্টোবর মাসে তিনি 'এডিসন ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি' নামে বিধিবদ্ধ এক সংস্থা গড়ে কাজে নেমে পড়লেন।

শৃঙ্খলার সঙ্গে একের পর এক নানা ধাতুর তার, কার্বন-মাখানো নানা জিনিস—যথা বাঁশের তন্তু, মাথার চুল, কাগজের ফিতে ইত্যাদি—নিয়ে দিনের পর দিন পরীক্ষা চলল। দিন গেল, মাস গেল বছর ঘুরতে চলল। প্রায় দেড় হাজার রকমের বস্তু নিয়ে পরীক্ষা বিফল হল। সাফল্য আর আসে না। অবশেষে 1879 সালের 21 অক্টোবর কার্বন মাখানো একটা সাধারণ সুতোর তৈরি ফিলামেন্ট আকাঙ্খিত ফল দিল।

বৈদ্যুতিকবাতি তৈরি হল। এডিসনের নিশ্চয়ই যথেষ্ট আনন্দ হল। কিন্তু সেই আনন্দে মশগুল হয়ে কয়েক বছর কাটিয়ে দেবার পাত্র তিনি নন। একবছরের মধ্যে বৈদ্যুতিকবাতি তৈরির কারখানা গড়ে তুললেন। সেই কারখানার তৈরি পাঁচশো বিদ্যুতবাতি তাঁর মেনলো পার্ক শহরের গবেষণাগারে লাগালেন। তখনকার দিনে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার ছিল সীমিত। তাই বিদ্যুৎ-বিভাজনের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। এডিসন ভেবেচিন্তে দেখলেন, প্যারালাল সার্কিট হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। সুইচ, ফিউজতারের সাহায্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ল্যাম্প হোল্ডার, মায় ব্ল্যাক টেপ—সব এডিসনের উদ্ভাবন। তাঁর ল্যাবরেটরীর আলো দেখতে রোজ প্রচুর জনসমাগম হতে লাগল। রেলকোম্পানি আবার নিউইয়র্ক থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন চালালেন।

এবারে আবার জাহাজে করে ইয়োরোপ থেকে ইঞ্জিনীয়াররা এসে হাজির হলেন।

নানা লোকে নানা মন্তব্য করল। কেউ বলল, গ্যাসের শেয়ার বাজার মন্দা করার জন্য এটা একটা 'ইয়াঙ্কী ধাপ্পা'। এমন কি বিখ্যাত জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ওয়ার্নার ফন সীমেন্স বিদ্রূপ করে বললেন, বৈদ্যুতিকবাতি গ্যাসের বাতির সঙ্গে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারবে না।

এডিসন বললেন, উদ্ভাবকের জীবন হল শতকরা এক ভাগ প্রেরণা (inspiration) আর শতকরা নিরানব্বই ভাগ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি (perspiration)। তিনি নিজে জীবনের অধিকাংশ সময় দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন। সহকর্মীদেরও তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে উৎসাহ দিতেন। গবেষণাগারের বাছা বাছা কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁর 'ইন্‌সম্‌নিয়া স্কোয়াড' (insomnia squad)। 1931 সালে এডিসনের মৃত্যুমুহূর্তে কিছু অনুরাগী ভেবেছিলেন কয়েক মিনিটের জন্য সারা আমেরিকার বিদ্যুৎ-বাতি নিভিয়ে দিলে বোধহয় তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো হবে। কিন্তু পরে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, যে ব্যক্তি কর্মকে জীবনে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, বিদ্যুৎবাতি বিরহিত কর্মহীনতায় তাঁর স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হবে

এডিসন জীবনে যতকিছু উদ্ভাবন করেছিলেন, তার প্রায় সবেরই পেটেন্ট নিয়েছিলেন। কিন্তু একটা আবিষ্কার সম্ভবতঃ তিনি নিজের অজ্ঞাতে করেছিলেন, কারণ তার পেটেন্ট নেন নি। সেটা হল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পের সেতুবন্ধন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা—এরা যে একে অন্যের সম্পূরক, এই ব্যাপারটা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এ-ব্যাপারে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক জে. ডি. বার্নাল বলেছেন,

'The triumph of Edison marks the end of an era of the inventor and the beginning of a new one—that of directed scientific research in industry —which has gone from strength to strength in our own time. From now on the strands of industrial and scientific advance will be as closely mingled as they were before the dawn of civilization.'

(Science in History, Vol. 4, P. 1230, Pelican Edn, 1965)

লেখকদের প্রতি বিশেষ নিবেদন

প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে তা চাইনীজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাবেন এবং চিত্রে যদি সংখ্যা থাকে তবে আন্তর্জাতিক সংখ্যা (1, 2, 3 ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন। প্রবন্ধের ভিতর চিত্র এঁকে পাঠাবেন না।

(সমালোচনা)

মাননীয়, সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর 1979 সংখ্যায় শ্রীশিবরাম বেরা মহাশয়ের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঐ সব প্রবন্ধে নদী সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বেরা মহাশয়ের চিন্তা ধারা সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে বিশেষ অনুরোধ এসেছে। যেহেতু এই বন্যা সমস্যা নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি করেছে ও দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জন সাধারণের মনে আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে চলেছে, মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মতামত আপনাদের জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে নিবেদন করা আমার কর্তব্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই লেখার অবতারণা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান মার্চ ও এপ্রিল 1979 সংখ্যায় বেরা মহাশয় "দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন" প্রবন্ধে দামোদর নদের বন্যা সমস্যা ও দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত ও অনেক তথ্য বহুল আলোচনা করেছেন।

প্রথম প্রবন্ধে (মার্চ পত্রাঙ্ক 184) ভুরডাইনের যে 10 লক্ষ কিউসেকের কথা বলা হয়েছে সেইটি ড্যাম ডিজাইনের Spillway ক্ষমতার জন্য প্রযোজ্য। জলধারের আয়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হয় প্রবাহিত সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার উচ্চতা কমানোর জন্য। 186 পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে, ঠিকই বলা হয়েছে যে বাঁধের জলধারগুলি সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে।" 2'50 লক্ষ কিউসেক বহন ক্ষমতার ইতিহাস এই যে 40 এর দশকে ভুরডাইনকে বলা হয়েছিল যে দুর্গাপুরের নীচে দামোদরের তখনকার বহন ক্ষমতা 2,50,000 কিউসেক্স্। 2,50,000 কিউসেক জল নীচের দিকে কোন বন্যার সমস্যা দেখা দেবে না নদীপাড়ের বাঁধের ক্ষতি করবে না। অবশ্য বিগত 30/40 বৎসরে দামোদর নদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনার জলাধার ছাড়াও নিম্ন দামোদরের বুকে অনেক অত্যাচার হয়েছে। সদরঘাটের নতুন সড়ক সেতু। নিম্নদামোদরের বুকে বাঁধ, দামোদরের তলভূমিতে (flood plain) চাষ আবাদ, ঘের বাঁধ, ঘর বাড়ী এমন কি ছোট খাট শিল্পও গড়ে উঠেছে। দামোদরের নীচের দিকে জল বহন ক্ষমতা এখন 1,00,000 কিউসেকেরও অনেক কম কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই দামোদর পরিকল্পনা নয়।

187 পৃষ্ঠায় শ্রীবেরা লিখেছেন যে দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য বন্যা উচ্চ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সকলের জানা দরকার যে দুর্গাপুর ব্যারাজ জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বন্যার সময় নদীর জলে পলি মাটী থাকায় ও সেচ এলাকায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় ব্যারাজের দুধারে ক্যানাল বন্ধ করে দেওয়া হয় ও নদীর জল নীচে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন কি সর্বোচ্চ বন্যার সময় (6,00,000 কিউসেক) ব্যারাজের উপরে জলের মাত্রা, ব্যারাজ না থাকলে যে উচ্চতা হোত তার অপেক্ষা তিন ফুটের অধিক

উঁচু কখনও হ'বেনা ও হয় না। নদীর ঢাল দুর্গাপুরের কাছে মাইল প্রতি 2.25 ফুট। সুতরাং ব্যারাজের প্রভাব খুব বেশী হলে ব্যারাজ থেকে 1½ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। বন্যার সময়ের নদীর উচ্চতা ও Pond level দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। এটা মনে না রাখলে নানারকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'বে। প্রসঙ্গতঃ এটাও মনে রাখতে হ'বে দুর্গাপুর ব্যারাজের জল নির্গমন ক্ষমতা 6 লক্ষেরও বেশী সুতরাং "সমগ্র দামোদর উপত্যকা অনিবার্য ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে" কথাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

দামোদরে বন্যা প্রতিরোধের উপায় ও পথের বাঁধা সম্বন্ধে আলোচনায় ও কয়েকটা তথ্যের নির্ভুলতাই সমস্ত বিষয়টিকে আরও বিতর্কিত ও জটিল করে তুলেছে।

এটা ঠিকই নদীর ঢাল যেদিকে বেশী সেই দিকেই নদীর জল স্বাভাবিক ভাবে বয়ে যায়। এটাও ঠিক যে নদীর গতিপথে বৎসরের পর বৎসর পলি জমার দরুণ ও প্রাকৃতিক কারণে geomorphological reasons) নদী গতিপথ বদলায় ও যেদিকে ঢাল বেশী ও বাধা সর্বপেক্ষা কম (line of least resistance) সেইদিকেই গতিপথ তৈয়ারী করে নেয়। এর জন্যেই মোহানার কাছে 'ব' দ্বীপ গড়ে ওঠে ও নতুন নতুন জমির সৃষ্টি হয়। নদীর প্রবাহ একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

আমার মনে হয় 191 পৃষ্ঠায় বেরা মহাশয় যে বলেছেন দুর্গাপুর ব্যারাজই আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল ও বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি করবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বেরা মহাশয় শুধু বর্ধমান জেলা বা পশ্চিমবাংলার ক্ষতির কথা বলেই বিরত হ'ন নি তিনি বলেছেন দুর্গাপুর ব্যারাজ ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দেবে। ব্যারাজ পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মান ও নদীর উপর ব্যারাজের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য, অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা শুধু এই দেশেই নয় অনেক দেশ বিদেশেই এর পূর্বে হয়েছে। *'যা কিছু করা হয়েছে সবই ভুল' এই সিদ্ধান্তে লাফিয়ে না পড়ে আরও গভীর ভাবে চিন্তা, সমীক্ষা ও আলোচনা করা হ'লে জনসাধারণের পক্ষে সমস্যাটি বোঝাবার সুবিধা হবে।

যখনই কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়, এটা স্বাভাবিক যে সেই সব বিষয়ে তখন পর্যন্ত যে সব তথ্যাদি থাকে ও পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যদি ও যখন নতুন নতুন তথ্য ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় পরিকল্পনাগুলিরও কিছু কিছু হের ফেরকরা হয় বা করা উচিত। কিন্তু আমাদের আবহাওয়া বিশারদদের কাছে যদি 60/70 বৎসরের চেয়ে আগেকার তথ্য না থাকে ও পরবর্তীকালে নতুন তথ্যের সৃষ্টি হয় (যেমন 1978 এ হয়েছে) তার জন্য পরিকল্পনাকে কি কারও ভুলের পর্যায়ে ফেলা যুক্তিযুক্ত হবে? শ্রীবেরা যে যুক্তির পথের কথা লিখেছেন যেমন দামোদরকে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি সোজা পথে নতুন নদীর (দামোদর নদের মত) সৃষ্টি করা, সেটা আমার মনে হয় একেবারে অসম্ভব না হলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব। একটি ছোট ম্যাপে নদীর গতিবিধি দেখান যত সহজ কার্যক্ষেত্রে ও বাস্তবে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা শেষ পর্যন্ত হয়তো অসম্ভব ও unpractical এর পর্যায়ে পড়বে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার অধিবাসীরা কি এই রকম একটি পরিকল্পনার কথা শুনতেও রাজী হবেন? বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষ এমন কি সারা বিশ্ব প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিকরা কি মনে করেন ও এই রকম একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বেরা মহাশয়ের প্রস্তাব প্রচারের আগে যথাস্থানে পেশ করতে বাধা বা আপত্তি কোথায়? এই রকম

*"Effects of barrages on the regime of rivers."

একটা পরিকল্পনা কি জনসাধারণের কাছে আদৌ গ্রহণ যোগ্য হবে?

শিবরাম বাবুর আর একটি প্রবন্ধ "ব্যারাজগুলি ভাগীরথীকে পুনরুজ্জীবিত করবে, না ধ্বংস করবে?" খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার ছাপার অক্ষরে এই প্রবন্ধ আমাদের ছেলে মেয়েদের বিশেষ করে আজকের দিনের তরুণ তরুণীদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে যেটা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। বেরা মহাশয় লিখেছেন যে 'পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ হয়তো একদিন জলস্রোতে মুছে যাবে এবং সিন্ধু সভ্যতার ন্যায় বাংলার সভ্যতা চিরতরে লুপ্ত হবে'। এর অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে ফরাক্কা ও ব্রহ্মপুত্র ব্যারাজের অবদান। আমার জানা নেই হরপ্পা, মাহেঞ্জদারো তথা সিন্ধু সভ্যতার বিলুপ্তির সঙ্গে কোন ব্যারাজ পরিকল্পনা যুক্ত ছিল কি না। তবে সিন্ধু নদে সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি ব্যারাজ নির্মান করা হয়েছে ও সিন্ধু প্রদেশ তথা বর্তমান পাকিস্তানের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে উত্তর প্রদেশের বন্যার জন্য ফরাক্কা বাঁধকে দায়ী করা হয়েছে। শুধু ভুল তথ্যই নয় আজকালকার স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকে নানা রকম ভুল ও অবাস্তব সরবরাহ করার মত অনেক কিছু ব্যাপারে বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিকল্পনাগুলির সমীক্ষা ও সমালোচনার দ্বারা যদি পরিকল্পনা রূপায়নে ভুল ক্রটির অনুসন্ধান করা যায় তা'লে হয়তো সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান নির্ণয় করা সহজ হয়ে যায়। পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই ব্যারাজ নির্মাণ করে নদী পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। সব পরিকল্পনার অল্পবিস্তর ক্ষতি কারক দিক থাকতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে পরিকল্পনা 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' কি না? সেই হ'বে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার আসল মাপকাঠি।

প্রস্তাবিত হুগলী ব্যারাজ সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানা দরকার যে, যে বিশাল পরিমাণ পলিমাটি সমুদ্র থেকে জোয়ারের সময় নদীর ভেতর আসে, সেই বিশাল পলিমাটী কোথায় যাবে? যদি মেনে নেওয়া যায় যে অসম্ভবকে সম্ভব করে নদীর মোহানায় সাগর সঙ্গমের মুখে ব্যারাজ তৈরী করা যায় জোয়ারের সময় সমুদ্রের পলি ও বর্ষার সময় নদীর ওপর থেকে নিয়ে আসা পলিমাটীর গতি কি হ'বে? জোয়ারের যে বিশাল শক্তি (Tidal energy) যে শক্তির বিকীরণের (dlissipation of energy) জন্য অন্যান্য মোহানার নিকটবর্তী নদী, খালগুলি নষ্ট হয়ে যাবে না কি? জোয়ার ভাটার গতিবিজ্ঞান খুবই জটিল। সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত গোরাই, মধুমতী, পদ্মার খাত বড় হ'চ্ছে কোথা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে জানি না। এমন কি প্রাক স্বাধীনতার সময় অবিভক্ত বাংলা সরকারকে ঐ নদীগুলি বর্ষাকালের পর নৌবাহী রাখার জন্য তলকর্ষণ যন্ত্র দ্বারা কেটে গভীর করার ব্যবস্থা প্রতি বৎসরই করতে হোত। ভাগীরথীকে পুনরুজ্জীবিত করার বিকল্প পরিকল্পনা প্রকাশের জন্য শুধু আমরা বাঙ্গালীরা কেন সারা পৃথিবীর লোকেরা বিশেষতঃ যারা নদ-নদী নিয়ে চিন্তা করে—অপেক্ষা করে থাকবে। তবে যেহেতু এই বিষয়টি এক আন্তদেশিক ব্যাপারে স্বভাবত আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বেরা মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি পড়লে পাঠকদের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাজগুলি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিহার ও উত্তর প্রদেশে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি করেছে। তাঁর প্রবন্ধে অবশ্য ব্যারাজ নির্মাণের পূর্বেও অনেকবারই যে এই এলাকাগুলি বন্যা কবলিত হয়েছে তার স্বীকারোক্তিও আছে। শুধু বন্যাই নয় লেখকের মতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাজগুলি সারা ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে দেবে। ফরাক্কা ব্যারাজ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি এমন কি

বলেছেন "সমগ্র উত্তর ভারতের ধ্বংস ডেকে আনবে। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান দশম সংখ্যা 1979, 484 পাতা)।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কয়টি ব্যারাজের সঙ্গে আমি নিজে পরিকল্পনা, ডিজাইন ও কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় আমার জবাবদিহি হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মত জনপ্রিয় পত্রিকার পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্যই এই লেখার প্রচেষ্টা। আমার একান্ত অনুরোধ যে এইসব কল্পনাগুলি নিছক ব্যক্তিগত কল্পনা হিসাবে না প্রকাশ করে প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমালোচনা করলে দেশের ও দশের পক্ষে হিতকর ও সুখকর হ'বে। ইতি—

দেবেশ মুখার্জী

ফ্লাট—41

2ডি/1এ, গড়িয়াহাটা রোড

কলিকাতা-700029

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন—আরেকটি দিক

অসীম চট্টোপাধ্যায়*

[বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হওয়া উচিৎ নতুন বৈজ্ঞানিক তৈরী করা—যারা শুধু ছোটখাটো কাজের মধ্যে আটকে না থেকে নতুন কিছু করবে।]

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন সম্পর্কে নানা রকম সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যাচ্ছে—বিভিন্ন জায়গায় বহু বিজ্ঞান ক্লাব তৈরীও হচ্ছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'এর মার্চ, 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত মণি দাশগুপ্তের 'বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন' লেখাটিও যথেষ্ট মূল্যবান। আমি এই প্রসঙ্গেই আরও কয়েকটা কথা বলতে চাই।

বিজ্ঞান ক্লাবের কতকগুলো উদ্দেশ্য থাকে। যেমন, তরুণ তরুণীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলা, হাতে-কলমে পরীক্ষা চালানো, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ইত্যাদি। কিন্তু এর সাথে সাথে আরও একটা বিরাট দায়িত্ব থেকে যায় নতুন বৈজ্ঞানিক তৈরী করা, যারা শুধু ছোটখাট কিছু কাজের মধ্যে আটকে থাকবে না—পৃথিবীকে নতুন কিছু দেবে। আর একাজের সব থেকে ভালো উপাদান হতে পারে খুব অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক যদি এইসব ছেলেমেয়েদের নিয়ে এ ধরণের প্রচেষ্টা চালানো যায়, তাহলে অনেক কিছুই সম্ভব হতে পারে। নিশ্চয়ই সেইসব ছেলেমেয়েদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ গুণ একটা বিশেষ শর্ত, কিন্তু আমাদের সমাজে কত শত এরকম গুণ বিশিষ্ট প্রতিভা তো অহরহ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্লাবগুলো তাদের অনেক সাহায্য করতে পারে—অন্তত বাহ্যিক শর্ত হিসেবেও। আর বিজ্ঞান জগতের দিকপালদের গড়ে ওঠার ইতিহাসটা শুরু হয় প্রায় সময়েই খুব অল্প বয়সে। ছোট্ট ছুটো উদাহরণ দেওয়া যাক। 1905 সালে আইনষ্টাইন যখন তাঁর 'বিশেষ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' নিয়ে সারা দুনিয়ার সামনে দাঁড়ান—তখন তাঁর বয়স মাত্র 26 বছর। তাহলে এর জন্য তাঁর প্রস্তুতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল? সত্যেন্দ্রনাথ

*কোলড়া বিজ্ঞান-চর্চা কেন্দ্র, গ্রাম + ডাকঘর—কোলড়া, জেলা হাওড়া।

বসু যখন 'প্ল্যাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প' বিষয়ক লেখা (যে কাজের জন্য তিনি পৃথিবী বিখ্যাত) আইনস্টাইনের কাছে পাঠান, তখন তাঁর বয়স 30 বছর। প্রস্তুতির উৎসটা কোথায়?

'বৈজ্ঞানিক তৈরী করা'র এ ধরণের প্রচেষ্টার প্রথম শর্ত অবশ্যই শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। এ ভালোবাসা কারও কারও মধ্যে সহজাত ভাবেই থাকে, আবার এটাও সত্য যে আরও বহুজনের মধ্যে নানারকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ ভালোবাসার জন্ম দেওয়া যায়। চার্লস ডারউইন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে তাঁর গবেষণায় সাফল্যের জন্য নিজস্ব যে সমস্ত মানসিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে এই 'Love of Science' (বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা)। এ থেকেই আসে জানার আগ্রহ, নতুন কিছু করার প্রেরণা। শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, ছবি দেখিয়ে বোঝানো, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখানোর ব্যবস্থা করা, মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞানের বই-পত্র পড়ানো ও এই ধরণের আরও অনেক কিছু কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় বিজ্ঞান মানসিকতা। তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই-পত্রের নিদারুণ অভাবের কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে—বিশেষতঃ শিশু-কিশোরদের উপযোগী। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' কিছু কিছু এই ধরণের বই প্রকাশ করেছেন—কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। আরও বই-পত্র প্রকাশ হওয়া দরকার। অল্প কয়েকটি এদেশীয় বই এবং কয়েকটি অনুবাদ—আমাদের বাংলাভাষায় বিদ্যালয়-ছাত্রদের উপযোগী বিজ্ঞানের বইপত্রের এই অবস্থা (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিদ্যালয় ছাত্রদের উপযোগী একটি পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে—যা খুব দরকার)। এ ব্যাপারে যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তা হলো সরকারি উদ্যোগ—কিন্তু এ ধরণের উদ্যোগ এদেশে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, 'কেরালা শাস্ত্র-সাহিত্য পরিষদ' শিশুদের জন্য একটি 'বিজ্ঞান পুস্তক সিরিজ' প্রকাশ করেছে এবং সমস্ত বইয়ের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শাস্ত্রকেরলম্' ও শিশুদের জন্য 'ইউরেকা' নামে দুটি বিজ্ঞান পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। গ্রামের মানুষ ও প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি মাসিক বিজ্ঞান সংবাদ দেওয়াল পত্রিকারও প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

কিভাবে এই প্রকল্পের কাজ চালানো যায়, তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান ক্লাবগুলো তাদের এলাকার বিদ্যালয়গুলো থেকে কিছু ছাত্র ছাত্রীকে বেছে নিতে পারে। এরপর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোর ওপর পাঠক্রম তৈরী করে, বিশেষ ক্লাশ শুরু করা যায়। এই পাঠক্রম অনেকটাই হবে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আর উদ্দেশ্য-মূলক। এই ধরণের পাঠক্রম তৈরী করা বা তার ওপর ক্লাশ করানোর ব্যাপারে, বহু শিক্ষক-অধ্যাপক-গবেষক বিজ্ঞানকর্মীর এগিয়ে আসা দরকার—এঁদের সাহায্য না পেলে সত্যিই অসুবিধে হবে। কোনো বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর কোনো বিশেষ দিকে আগ্রহ থাকলে, তাকে অল্পবয়স থেকেই সেই বিষয়টার ওপর পড়াশুনো করতে ও ভাবনা-চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা দরকার, যাতে করে সে প্রথম থেকেই একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে। এই ধরণের কাজকর্মে আরও অনেককিছু করা দরকার—বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর উচিত তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক পাঠক্রমের ওপর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ক্লাশ করানো হয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফিন্‌ম্যানের (Feinman) বিখ্যাত বক্তৃতা-গুলো আর তাঁর উদাহরণ—একদল ছাত্র-ছাত্রীকে

নির্দিষ্ট সময় ধরে ও নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক তৈরী করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা দেওয়া (অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থায় ও ভিন্ন পদ্ধতিতে)।

আমার মনে হয়, বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর কর্মসূচীর মধ্যে এই ধরণের একটা কর্মসূচী অবশ্যই থাকা উচিত। না হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকম—কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই-পত্র পড়া, হাতে-কলমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কয়েকটা মডেল তৈরী করা, দু একটা পত্র পত্রিকায় লেখা, কয়েক জায়গায় বক্তৃতা করা ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মানুষের সামনে নতুন কিছু নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রকৃতি যে বিশাল রহস্যময়তার চ্যালেঞ্জ নিয়ে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার আরও একটা বাঁধনকে খুলে দেওয়া যায় না।

এই ধরনের কাজ করতে গেলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বাধার মোকাবিলা করতেই হবে। অভিভাবকদের অজ্ঞতা এক বিশাল সামাজিক বাধা। "কি হবে ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান করে", কিংবা আর কোনো কাজ নেই, বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলোর মাথা খেয়ে বেড়াচ্ছে" এ ধরণের মন্তব্য বহু অভিভাবক হামেশাই করে থাকেন। এগুলো বলারও অবশ্য একটা গভীর সামাজিক আর্থনীতিক উৎস আছে—কিন্তু সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের এই ধরণের সমস্যাকে সমাধান করার রাস্তা খুঁজে বার করতে আর বুকভরা ভালবাসা ও উৎসাহ নিয়ে ঐ সমস্ত শিশু-কিশোরকে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে পৃথিবীকে উপহার দেওয়া যায় নতুন নতুন নিউটন, এডিসন, ডারউইন, পাস্তুর, মেণ্ডেল, পাভলভ, সি. ভি. রামন, সত্যেন বোস, আইনস্টাইন অথবা মাদাম কুরী।

বিদেশে ভারতীয় সামুদ্রিক পণ্যের চাহিদা

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে সম্পদশালী দেশ হিসাবে পরিচিত। ভারতের প্রধান সম্পদ হল বনজ ও জলজ সম্পদ যা বহুকাল থেকে এদেশে ও বিদেশে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। আমাদের দেশের নানাবিধ জলজ সম্পদের প্রধান উৎসই হল সমুদ্র। বিদেশের বাজারে এই সকল সামুদ্রিক পণ্যের কদর অত্যধিক। ভারত থেকে বিদেশে নানাবিধ সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র 1978 সনে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 77,946 টন, যার আনুমানিক মূল্য 212·16 কোটি টাকা। গত 1977 সনে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 64,964 টন যার মূল্য হল 179·74 কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরেই রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ হল শতকরা 20 ভাগ। নানা ধরণের সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ গত 1978 সনেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভারত থেকে রপ্তানীযোগ্য এই সকল নানাবিধ পণ্যের মধ্যে অন্যতম হল ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি। যা বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই পরম আকাঙ্খিত বস্তু। জমানো চিংড়ি ছাড়া অপর পণ্যেরা হল নানাবিধ সামুদ্রিক মাছ (তাজা ও ঠাণ্ডায় জমানো), ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস, জমানো স্কুইড ও কাট্‌লফিস, শুকনো মাছ, হাঙরের পুচ্ছ ইত্যাদি।

ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি—1978 সনে ভারত থেকে রেকর্ড পরিমাণ ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়েছে। মোট নানা ধরণের পণ্যের মধ্যে এই জমানো চিংড়ির পরিমাণ হল 51,223 টন যার মূল্য 179·06 কোটি টাকা। ভারতের জমানো চিংড়ির অন্যতম প্রধান ক্রেতা হল জাপান ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র। এই দুই প্রধান দেশ, আমাদের মোট চিংড়ি রপ্তানীর প্রায় শতকরা 94·6 ভাগ ক্রয় করতে সক্ষম। এর পরই উল্লেখযোগ্য ক্রেতারা হল ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, কানাডা, হংকং, ইতালী, পঃ জার্মানী, কুয়ায়েত ও সিঙ্গাপুর। কেবলমাত্র জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য দেশে ভারত থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরে খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপানেই ভারতীয় চিংড়ির কদর ও চাহিদা খুবই বেশী, কারণ এদেশের রপ্তানী চিংড়ির প্রায় শতকরা 64 ভাগই জাপান ক্রয় করে। বিগত কয়েক বছরে জাপানে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার মুখ্য কারণ হল ওদেশে চিংড়ি ক্রেতাদের চাহিদা বৃদ্ধি, একই সাথে জাপানে ও অপর কয়েকটি সরবরাহকারী দেশে চিংড়ি উৎপাদনে ঘাটতি এবং সেখানে চিংড়ির লোভনীয় বাজার দর।

বর্তমানে ভারতই জাপানে জমানো চিংড়ি সর্বশ্রেষ্ঠ সরবরাহকারী দেশ। বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একমাত্র 1978 সনে জানুয়ারী নভেম্বর মাসে জাপান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে

প্রায় 1,28,649 টন ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি আমদানী করে যেখানে কেবল ভারত থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণই ছিল সর্বাধিক অর্থাৎ 28,820 টন যা মোট আমদানী চিংড়ির শতকরা 22·4 ভাগ। এর পরই হল ইন্দোনেশিয়ার স্থান। ইন্দোনেশিয়া থেকে জাপানে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ মোট পেয়েছে, যদিও জাপানের তুলনায় তা নিতান্তই কম। উপরিউক্ত দুটি দেশ ছাড়া তৃতীয় পর্যায়ে ফ্রান্সই সর্বাপেক্ষা বেশী চিংড়ি আমদানী করে। 1978 সনে ভারত থেকে ফ্রান্সে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 1,359 টন যার মূল্য 3·45 কোটী টাকা যা অন্য বছরের তুলনায় বহুলাংশে বেশী

দেশ	1976		1977		1978	
	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
জাপান	26,859	114 58 কোটি	26,176	107 71 কোটি	32,618	138·12 কোটি
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	18,943	40·41 কোটি	18,657	41·67 কোটি	15,839	33·15 কোটি
ফ্রান্স	1,135	258·38 লক্ষ	884	197·19 লক্ষ	1,359	344 94 লক্ষ
বেলজিয়াম	78	30·37 লক্ষ	229	79·04 লক্ষ	224	71·80 „
ডেনমার্ক	15	2·85 „	42	7·62 „	150	35 94 „
পঃ জার্মানী	—	—	48	24·36 „	24	18 67 „
ইতালী	32	9 28 „	54	15·13 „	38	12 02 „
নেদারল্যাণ্ড	42	11·90 „	282	85·75 „	413	116 69 „
U. K.	78	22·60 „	79	21·38 „	88	30·35 „
স্পেন	5	2·06 „	53	5·59 „	18	5 01 „

ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্নদেশে ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ও তার মূল্য।

25,502 টন অর্থাৎ মোট আমদানী চিংড়ির শতকরা 19·8 ভাগ। জাপানের পরই ভারতীয় চিংড়ির অপর বৃহৎ ক্রেতা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। 1978 সনে ভারত থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 15,839 টন যা অপর কয়েক বছরের তুলনায় নিঃসন্দেহে কম, এর অন্যতম কারণ হল জাপানে চিংড়ির বাজার দর আমেরিকা অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়। ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানী চিংড়ির অধিকাংশই হল খোসা ছাড়ানো চিংড়ি। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদানুযায়ী চিংড়ি উৎপাদন কম হওয়ায় ও অপর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ কমে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে চিংড়ির বাজার দর অনেকটা বৃদ্ধি

ফ্রান্স ছাড়া ভারতীয় চিংড়ি আমদানীকারী পশ্চিম ইউরোপের অপর দেশগুলি হল নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালী, পঃ জার্মানী ও সুইডেন।

ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস—চিংড়ির পরই অপর মূল্যবান রপ্তানীযোগ্য পণ্য হল ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস। ভারত থেকে এই ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানীর পরিমাণ ও সেই সাথে বিশ্বের বাজারে এর চাহিদাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ফ্রান্সই সবচেয়ে বেশী পরিমান ব্যাঙের মাংস আমদানী করে। গত 1978 সনে ভারত থেকে ফ্রান্সে এই রপ্তানীর পরিমাণ হল 11,507 টন যার আনুমানিক মূল্য 410·19 লক্ষ টাকা। এছাড়া অন্য প্রধান

রাষ্ট্রগুলি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (1267 টন), নেদারল্যাণ্ড (566 টন), বেলজিয়াম (128 টন), অষ্ট্রেলিয়া (12 টন), সুইজারল্যাণ্ড (3 টন) মালয়েশিয়া (5 টন), পশ্চিম জার্মানী (47 টন) ও জাপান (6 টন)। চলতি বছরে ভারত থেকে আরো দুটি রাষ্ট্রে ব্যাঙের মাংস রপ্তানী করা হচ্ছে, তারা হল সুইডেন (8 টন) ও সৌদি আরব (3 টন)।

ঠাণ্ডায় জমানো লবষ্টার পুচ্ছ—লবষ্টার নামক খোলসযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীর ঠাণ্ডায় জমানো পুচ্ছের বিদেশের বাজারে যথেষ্ট কদর আছে। ভারত থেকে লবষ্টার পুচ্ছের রপ্তানীর পরিমাণ বর্তমান বছরে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নানা ধরণের লবষ্টার পুচ্ছের প্রধান ক্রেতা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরে এই রপ্তানীর পরিমাণ হল 381 টন যার আর্থিক মূল্য 2·30 কোটি টাকা। আমেরিকার পরই জাপানের স্থান। 1978 সনে জাপানে ভারত থেকে লবষ্টার পুচ্ছের রপ্তানীর পরিমাণ অন্য বছরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 229 টনে যার মূল্য প্রায় 184·50 লক্ষ টাকা। জাপানে এই রপ্তানীযোগ্য লবষ্টার গুলির মধ্যে আছে মশলামাখানো অথবা রান্না করা লবষ্টার। উপরিউক্ত দুটি দেশ ছাড়াও গত বছর ভারত থেকে অন্য নানা দেশে লবষ্টার পুচ্ছ রপ্তানী করা হয়েছে তারা হল ফ্রান্স (74 টন) নেদারল্যাণ্ড (5 টন), কুয়েত (200 কিঃগ্রাঃ)।

স্কুইড ও কাটল্ ফীস স্কুইড ও কাটল্ ফিস প্রধানতঃ মোলাস্কাপ পর্বের অন্তভূক্ত (Phylom-Mollusca)। বর্তমানে নানাধরনের সামুদ্রিক পণ্যের সাথে সাথে এদের রপ্তানীও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রধান কারণ হল বিদেশের খাদ্য হিসেবে এর চাহিদার বৃদ্ধি। ভারত থেকে একমাত্র ফ্রান্সে 1978 সনে স্কুইড রপ্তানীর পরিমাণ হল 2,101 টন এ ছাড়া অন্য প্রধান দেশ হল স্পেন (110 টন), নেদারল্যাণ্ড (106 টন), বেলজিয়াম (41 টন), U.K. (25 টন), অষ্ট্রেলিয়া (17 টন), ইতালী (11 টন), জাপান (4 টন), U.S.A (4 টন) ও সিঙ্গাপুর (2 টন)।

গত বছর এদেশ থেকে কাটল্ ফিস রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরের তুলনায় কিছু কম, এর প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে সামুদ্রিক উৎস হতে কাটল্ ফিস সংগ্রহের ব্যর্থতা। জাপানেই ভারত থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাটল্ ফিস রপ্তানী করা হয়। গত বছরেই এর পরিমাণ ছিল 476 টন যার মূল্য 67 লক্ষ টাকা। অপর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি হল জাপান (387 টন), নেদারল্যাণ্ড (27 টন), U.S.A (40টন) অষ্ট্রেলিয়া (14 টন), হংকং (13 টন) নিউজিল্যাণ্ড (9 টন) ইত্যাদি।

টিন বন্দী সামুদ্রিক পণ্য—ঠাণ্ডায় জমানো পণ্য ছাড়াও নানা ধরণের টিন বন্দী সামুদ্রিক-পণ্য ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়। টিনের পাত্রে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় চিংড়ি, কাঁকড়ার মাংসল অংশ, তৎসহ টুনা, সার্ডিন ও নানা প্রকার ঝিনুক জাতীয় খাদ্যসামগ্রী বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছে। 1978 সনে টিন বন্দী চিংড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী করা হয়েছে U.K (109 টন), পঃ জার্মানী (88 টন), যুগোশ্লোভিয়া (38 টন) ও সৌদি আরব (22 টন)। এছাড়া টিন-বন্দী কাঁকড়া রপ্তানী করা হয় ফ্রান্স (15 টন অস্ট্রেলিয়া (9 টন) ও চেকোশ্লোভিয়ায়।

উপরিউক্ত প্রধান সামুদ্রিক পণ্য ছাড়াও নানা ধরণের শুঁটকি মাছ, হাঙর পুচ্ছ ইত্যাদি যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, মরিসাস, হংকং ও মালয়েশিয়াতে রপ্তানী করা হয়। আশা করা যায় আগামী বছরগুলিতে এই সব সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে অধিক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- M. P. D A কর্তৃক Indian Seafood Exports Shoot past Rs. 200 Croremark (1978) নামক প্রচারিত বুলেটিনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।]

প্রতিবেদক—নরেশমোহন চক্রবর্তী

ব্রা-বনাম-ক্যান্সার

মেয়েদের বুকের (Breast) ক্যানসার রোগ এখন বেড়েই চলেছে। আর তাতে প্রাণহানির সংখ্যাও প্রচুর। আমাদের দেশে এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ইংল্যাণ্ডের মত সুউন্নত অথচ ছোট্ট একটা দেশে এক বছরে ব্রেষ্ট-ক্যান্সারে মারা গেছে 11,000 মেয়ে, 1976 সালের রিপোর্ট। ঐ দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগনির্ণয়ের ও চিকিৎসার ব্যাপক সুযোগ এবং উন্নত জনশিক্ষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, রোগসমস্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ঐ বিপুল মৃত্যুহার ঠেকান সম্ভব হচ্ছে না। এর মূলগত হেতু—অন্যান্য রোগের মত ক্যান্সার রোগটির পেছনে একটি বা দুটি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট কারণ থাকে না। একাধিক কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। আর বড় তাড়াতাড়ি এর বিস্তার ঘটে। রোগী ডাক্তারের পরামর্শ নিতে দেরী করলে অথবা প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শে কিছু ত্রুটি বা অবহেলা ঘটলে রোগটি তার প্রাথমিক স্থান থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আর মৌলিক চিকিৎসার উপায় থাকে না। আর এই রোগটি এমন একটি জায়গায় যে সংস্থাত লজ্জাবশে মেয়েরা সহজে তা প্রকাশ করতে চায় না। যাইহোক বহু সূত্র ধরে যে রোগের উৎপত্তি ঘটে তার দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণকে যদি একটু সাবধানতা নিলেই—দূরে রাখা যায় তাহলে সেই কথা সকলেরই জেনে রাখা দরকার।

এই বিষয়ে Science Reporter-এ গত নভেম্বর (1979) সংখ্যায় উত্তর মেডিক্যাল কলেজের শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধ ও রিপোর্টের সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। "শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে মেয়েদের বক্ষ-আবরণীর ব্যবহার প্রায় অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু সর্বাধুনিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে যারা বেশী দামী, পুরু, আরামপ্রদ, সিন্থেটিক 'ব্রা' ব্যবহার করেন তাঁদের ব্রেষ্ট ক্যান্সারের আশঙ্কা অধিক। এই জাতীয় বক্ষ আবরণীগুলি সাধারণতঃ 'প্যাডেড্ ব্রা' নামে পরিচিত। দাম বেশী। তাই সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত পরিবারের মহিলারাই এগুলি বেশী ব্যবহার করেন। এতে নাকি রূপের বিকাশটা ভাল হয়। ফলে উন্নত পরিবারের মেয়েদেরই বেশী ব্রেষ্ট-ক্যান্সার হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন-পরিবারের মেয়েদের এই রোগ কম দেখা যায়।

সুইডেনের দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যাডামী ও রিমোটার্গ 1978 সালে সেপ্টেম্বরে 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রথমে এই কথা লেখেন। তাঁরা আরও লেখেন যে (1) স্থূলাকৃতি স্তনেই ক্যান্সার সম্ভাবনা বেশী। (2) তাইওয়ান মেয়েরা সাধারণতঃ তাঁদের সন্তানদের একদিকের স্তনই দান করেন। যে দিকের স্তনটা খাওনান না, সেই স্তনেই ক্যান্সার বেশী হয়। এবং (3) 'নান্' (nun) অর্থাৎ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের স্তন ক্যান্সার বেশী হয়।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ক্যালিফোর্নিয়ার লস্এঞ্জেলস্ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশিষ্ট ডাক্তার জন ডগলাস্ বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে বলেছেন যে, অত্যাধিক আঁটোসাটো (টাইট) ব্রেসিয়ারই এই জাতীয় ক্যান্সারের বিশেষ কারণ। টাইট্ ব্রা পরলে স্তনের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও স্থানীয় রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। মোটা প্যাডেড ব্রাতে এই উষ্ণতা আরও বাড়ে। এই বেশী তাপই স্তনের ভিতরের গ্রাওটিস্থগুলিকে উত্তেজিত করে তাদের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্যান্সারে পরিণত করে। স্থূলাকৃতি স্তনে টাইট্ ব্রা পরলে এই উষ্ণতা আরো বেশী হয়। সেই জন্যই তাদের ক্যান্সারের প্রবণতা বেশী। স্থূলাকৃতিটা আসল নয়। 'নান্'দের স্তনক্যান্সারের কারণও তাই। তাঁরা কালো কাঁচুলি দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বুক বেঁধে রাখেন। তাতে ঐ স্থানের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। আর উষ্ণতাও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ব্রা না পরলে ঐ স্থান শীতল থাকে ক্যান্সারের আশঙ্কাও কম থাকে। ব্রা আকারে ছোট হোক বা বড়ই হোক। দিনরাত্রি যাঁরা টাইট্ ব্রা পরে থাকেন —রাত্রে শোবার সময়ও খুলে রাখেন না তাঁদের ঐ রোগের আশঙ্কা বেশ বেশী।"

অন্য একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে সব মায়েরা তাঁদের সন্তানদের নিয়মিত স্তনদান করেন না তাঁদের ক্যান্সার বেশী হয়। আবার বেশী বয়সে যাঁদের সন্তান হয় তাঁদেরও এই রোগের আশঙ্কা বেশী।

শ্রীগুণধর বর্মন

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

1979

শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

[1979 সংখ্যাটিকে গণিতে নানা উপায়ে প্রকাশ করা যায়। 1979 সালের বিদায় উপলক্ষ্যে তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।]

$1979 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$ (2 এর বিভিন্ন ঘাতের সমষ্টিতে)

$= 2^{11} - 2^6 - 2^2 - 2^0$ (2 এর বিভিন্ন ঘাতের প্রকাশে)

$= 990^2 - 989^2$ (দুই বর্গের অন্তরে)

$= 9^2 + 23^2 + 37^2$ (সমান্তর তিনসংখ্যার বর্গের সমষ্টিতে, এখানে 9, 23 এবং 23, 37-এর মধ্যে পার্থক্য 14)

$= \frac{1}{5}\{(-23)^2 + 2^2 + 27^2 + 52^2 + 77^2\}$ (সমান্তর পাঁচ সংখ্যার বর্গের গড়ে, এখানে পার্থক্য 25)

$= \frac{1}{3^4}(2^3 + 27^3 + 52^3)$ (সমান্তর তিনসংখ্যার ঘনের সাহায্যে, এখানে পার্থক্য 25)

$= 7 \times 7(7 \times 7 - 7) - 77 - \frac{7+7}{7}$ (দশটি 7-এর সাহায্যে)

$= 9(9 + 9 \times 9 + 9) + 999 + 99 - 9 - \frac{9}{9}$ (তেরটি 9-এর সাহায্যে)

$= 3^7 - 3^5 + 3^3 + 3^2 - 3^0$
$= 5^5 - 5^4 - 5^4 + 5^3 - 5^2 + 5^1 - 5^0$ } (3 ও 5 এর বিভিন্ন ঘাতের প্রকাশে)

$= 1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + 10^3$, (1, 2, 3, 4, 5, 10 এর বিভিন্ন ঘাতে)

---

*গণিত বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়। ইটাচুনা, হুগলী

রসায়নে পথিকৃৎ—গেলুসাক

অশোক সেন*

জোসেফ লুই গেলুসাক সংক্ষেপে জেলুসাক নামটি প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। ফরাসী দেশের এই বিখ্যাত রসায়নবিদ 1778 সালে লিমোজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বাল্যকালে তিনি বিদ্যালয়ে যেতে পারেন নি। 16 বছর বয়সে তিনি প্যারিসে চলে আসেন কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আশ্রয়ে। সেখানে শহরগুলিতে এক ভদ্রমহিলার কাছে তিনি থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন ভোরবেলা বাড়ীতে বাড়ীতে দুধ সরবরাহ করতেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তিন বছর সেখানে তিনি কাটান। এত কষ্টের মধ্যেও বালক লুসাকের পড়াশোনা কিন্তু একদিনের জন্যও বন্ধ যায় নি। অবশেষে 1797 সালে তিনি এক্স্ পলিটেকনিকে ভর্তি হন। তিন বছর পর এখানে পড়াশোনা শেষ হলে বারথোলে তাঁকে সেখানে গবেষণা চালাবার সুযোগ করে দেন। তাঁর অধীনে গ্যাসের চাপ জলীয় বাষ্পের চাপ ইত্যাদি নিয়ে লুসাক প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। 1804 সালে বারুটের সঙ্গে বেলুনে চড়ে ঊর্ধ্ব আকাশে চুম্বকের আকর্ষণ নিয়ে তিনি অনেক পর্যবেক্ষণের কাজ চালান। 1806 সালে তাঁকে ইনস্টিটিউট দ্য ফ্রান্সের সদস্য করা হয় এবং এখানেই তিনি নানা গ্যাস নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন। দু-বছর পরে এখানে গবেষণার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত Law of Gaseous Volume। এই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করার সময় লুসাক তাঁর সহযোগী হিসেবে পান লুই জ্যাক থেনাডকে।

এই সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভি কর্তৃক অ্যালকালি মেটাল আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই সাফল্যের সংবাদ শুনতে পেয়ে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন লুসাক ও থেনাডকে এ বিষয়ে উন্নততর গবেষণা চালাবার জন্যে উৎসাহ দেন এবং সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। তাঁরই আগ্রহ ও সাহায্যে তাঁরা দু-জন এ নিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং অচিরেই উত্তপ্ত লোহার সঙ্গে ফিউজড্ পটাশের সংযোগ ঘটিয়ে সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পটাশ তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁদের এই আবিষ্কার রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের পক্ষে ব্যাপক পরিমাণে অ্যালকালি মেটাল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই লুসাক ও থেনার্ড পরে বোরোন ও তার ফ্লোরাইড এবং শুষ্ক অক্সিজেনে অ্যালকালি মেটালের দহন ঘটিয়ে তাদের পারক্সাইডও প্রস্তুত করেন।

লুসাক ও থেনার্ড 1810-11 সালে জৈব রসায়ন বিশেষত জৈব রাসায়নিক যৌগগুলির বিশ্লেষণে নানা নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের আবিষ্কারের আগে জৈব পদার্থগুলিকে অক্সিজেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তবেই সেগুলির গঠন বিশ্লেষণ করা হত। কিন্তু এর ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল

*ব্যারাকপুর, 24 পরগণা

অনেক। লুসাক ও থেনার্ড দেখান পদার্থ সমেত যে কোন জৈব যৌগকে কাচনলে দহন করে সেটির গঠন বিশ্লেষণ করা যায়। এভাবে তাঁরা চিনি, স্টার্চ, মোম এবং অক্সালিক সাইট্রিক, অ্যাসেটিক ও অন্যান্য কয়েকটি অ্যাসিড সমেত মোট 15টি পরিচিত জৈব পদার্থের গঠন নির্ণয় করেন।

গেলুসাকের একক গবেষণার উল্লেখযোগ্য অবদান 1811 সালে বিশুদ্ধ hydrocyanic acid আবিষ্কার। এর চারবছর পর তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে cyanogen একটি যৌগ র‍্যাডিকাল। তাছাড়া তিনি মুক্ত cyanogen তৈরির পদ্ধতিও বের করেন। লুসাকের এই শেষোক্ত দুটি আবিষ্কার hydrogen acid theory-তে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কারণ জৈব রসায়নে যৌগ র‍্যাডিকালের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

রসায়নশাস্ত্রে গেলুসাকের অবদানের বিবরণ এক কথায় দেওয়া শক্ত। তাঁর আবিষ্কৃত নতুন উপাদানগুলির মধ্যে আছে বোরোনের ফ্লোরাইড এবং iodic hydrosculphocyanic dithionic ও hypasulphurous acid। তাছাড়া রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যও কম মূল্যবান নয়। নানা রাসায়নিক পরীক্ষায় অপরিহার্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, ক্যাথেটোমিটার, অ্যালকহলো মিটার এবং সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতে প্রয়োজন টাওয়ার প্রভৃতির নির্মাণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গেও গেলুসাকের নাম জড়িয়ে আছে। কাঠ থেকে অক্সালিক অ্যাসিড প্রস্তুতপ্রণালীও তাঁর আবিষ্কার। তাছাড়া তিনিই প্রথম দেখান বোরোক্স বা অ্যামোনিয়াম্ফসফেটের দ্রবণে কাঠ ডুবিয়ে নিলে তার দহনশীলতা অনেক কমে যায়।

রসায়নশাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক গেলুসাকের চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল ধৈর্য ও অধ্যবসায়। 1808 সালে এক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন তাঁর চোখে এমন আঘাত লাগে যে তিনি প্রায় দৃষ্টি শক্তি হারাতে বসেছিলেন এই দৃষ্টিস্বল্পতা পরবর্তীকালে তার কাজে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে কিন্তু তাঁকে কখনোই দমিয়ে রাখতে পারে নি, এই স্বল্প দৃষ্টি নিয়েই তিনি রসায়নের নানা জটিল ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। 1850 সালে প্যারিস শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাটকাঠির ব্যবহার

প্রতি কুইন্টাল পাট ও মেসতাপাট থেকে 2·5 কুইন্টাল কাঠি পাওয়া যায়। যা প্রকৃতপক্ষে নষ্ট নানাভাবে। অল্প অংশ কেবলমাত্র চাষীরা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেছে যে এই পাট কাঠি কাগজ, নাইট্রোজেন, সেলুলোজ, বোর্ড, এমনকি ভিসকোজ রেয়ন তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বোর্ড ইত্যাদি তৈরীর কাজ সুরু করা যেতে পারে পাট অঞ্চল গুলিতে সংবায় প্রথায়। ইনট্রোসেলুলোজ, ভিসকোজ রেয়ন ইত্যাদির জন্য আরো বেশী সুযোগ থাকা দরকার। এথেকে বিশেষ পদ্ধতিতে হার্ডবোর্ড পেপার বোর্ড ইত্যাদি তৈরী হতে পারে।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ

মিনি শ্রমিক

সন্তোষ চক্রবর্তী*

[ঘরে-বাইরে রকমারী পিঁপড়ে। এদের উন্নত ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা, কর্তব্যবোধ, নিষ্কাম কর্ম সুসভ্য মানুষকে অবাক করে দেয়।

পিঁপড়ের আত্মকথনের ভঙ্গিতে এদের সমাজ জীবন দেখান হয়েছে।]

আমি একজন সাধারণ শ্রমিক। তোমাদের অনেকের মতই কলোনীতে আমার বাস। তোমাদের কলোনী তৈরী হওয়ার, এমন কি তোমরা পৃথিবীতে জন্মাবার বহু আগে থেকেই আমরা কলোনী গড়ে থাকতে অভ্যস্ত। আমরা খুবই ছোট জীব। দৈহিক শক্তিতে যেমন দুর্বল, বুদ্ধিতেও প্রায় তেমনি। তবে আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী প্রাণীও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু রয়েছি ও থাকবো কারণ আমরা একতাবদ্ধ সামাজিক জীব। পৃথিবীতে তোমাদের থেকে আমরা সংখ্যায় বহু সহস্রগুণ বেশী—আমরা পিঁপড়ে।

তোমাদের আশে পাশে যেমন ছোট কালো সুড়সুড়ে পিঁপড়ে (plagiolepis sp) ছোট লাল বিষপিঁপড়ে (solenopsis sp) কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে (camponotus sp.) বা লাল। কালো লম্বাটে কাঠপিঁপড়ে (sima rufonigra)—এ রকম অনেকেই আমরা গাছের গর্তে, মাটিতে, দেওয়ালে, মেঝের গর্তে কলোনী তৈরি করে বাস করি। এ ছাড়া অনেকে যেমন নালসো পিঁপড়ে পাতা দিয়ে সুন্দর বাসা তৈরী করে গাছে বাস করে। আরেক ধরণের গেছো লাল পিঁপড়ের (cremato-gaster sp.) বাসা দেখলে হঠাৎ পাখীর বাসা বলে ভুল হয়। সারা পৃথিবীতে আমরা প্রায় হাজার চারেক রকমের পিঁপড়ে রয়েছি।

আমাদের কলোনী দেখতে হলে আমার সংগে এস। ঐ দেখ আমাদের কলোনীর একজন শ্রমিক ভাই মুখে খাবার নিয়ে তোমার ঘরের দরজার গোড়ায় ছিদ্রপথে ভেতরে ঢুকলো—এটি আমাদের কলোনীর সদর দরজা। এর ভেতর আমরা থাকছি—একজন দুজন নয়—শত শত। তোমরা অনেকে জানতেই পারছ না। তুমি ভাবছো বেশ তো বিনা ভাড়ায় থাকা হচ্ছে, কেননা কয়েক মাস আগে পাশে একখানা ঘর বাড়ির তোমরা ভাড়া খাটিয়েছ—অবশ্য সেখানেও আমাদের এক আত্মীয় পিঁপড়ে ইতিমধ্যে কলোনী গড়ে থাকছে। তুমি কিন্তু যাই ভাবনা কেন আমরা ভাড়া দিয়েই থাকছি এবং তোমাদের তাগিদের আগেই দিচ্ছি। তবে টাকা দিয়ে নয়, কাজের মাধ্যমে। এই দেখ না তুমি সকালে জলখাবার

---

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009।

খেয়েছ—রুটীর টুকরো, বিস্কুটের গুড়ো আরও কত কি পড়েছিল—তোমাদের ঠিকে-ঝি ঘর ঝাড় দেবে সেই কখন, আমরা কিন্তু সেগুলো মুখে তুলে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছি। ঘরে পোকামাকড় মরে পড়ে থাকছে—অনেক কিছু তোমরা দেখতেই পাও না। আমরা ঠিক গন্ধ পেয়ে তোমাদের অলক্ষ্যে সরিয়ে নিচ্ছি। বিছানায় অনেক সময় আমাদের দেখতে পাও—ছারপোকা হলে ডিমের লোভে আমরা অনেক সময় বিছানায় ঘোরাফেরা করি এছাড়া খাওয়ার কিছু পরে থাকলেও সেগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে বিছানায় যাই—তোমরা কিন্তু না বুঝেই আমাদের উপর অত্যাচার কর। ঘরের বাইরে কাক যেমন ঝাড়ুদার, ভেতর বাড়ীতে তেমনি আমরা ঝাড়ুদারী করে তোমাদের তাগিদের আগেই ভাড়া দিচ্ছি। তোমাদের অবশ্য সোজাসুজি মেনে নেওয়া অসুবিধা—কেননা টাকাই বেশী চেন। এভাবে ভাড়া দেওয়া ছাড়া অনেক গাছের ক্ষতিকারক পোকার ডিম বা লার্ভা খেয়ে আমরা Biological Control-এ সহায়তা করছি। এছাড়া ফুলের পরাগ সংযোগেও কিছুটা সুবিধে করি।

কলোনীর গড়ন: এবার এস, কলোনীর ভেতর ঢোকা যাক। দেখ, দরজার মুখে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার দ্বাররক্ষী পিঁপড়ে এ কলোনী কর্মী ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। সুড়ঙ্গ পথ দেখছো—কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তোমাদের রাজপথে কলার খোসা, ডাবের খোলা বা কোন কোন জায়গায় নাকে রুমাল চেপে চলতে হয়, আমাদের পথে কিন্তু সে-সব পাবে না, অসুবিধে হবে না তো? ঐ দেখ একটি শ্রমিক মশার ডানা মুখে করে বাইরে ফেলতে চলেছে, কেননা ডানায় খাবার কিছু নেই। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমরা শুঁড় নেড়ে একটু কথা বলে নিচ্ছি। আসলে আমাদের শুঁড়, নাক, কানও কথা বলার যন্ত্র। এই শুঁড় জোড়ার প্রয়োজন খুব-ই। আমাদের চোখ আছে বটে—তবে অন্যান্য পোকামাকড়ের চোখের মতোই এক একটি চোখ অসংখ্য ছোট ছোট চোখের সমষ্টি, থাকে পুঞ্জাক্ষী বলে। ফলে আমরা একই দৃশ্য অসংখ্য দেখতে পাই, কিন্তু সবই অস্পষ্ট।

শুঁড়ে শুঁড় লাগিয়ে কথা

সুড়ঙ্গ পথ এদিক ওদিক অনেক কুঠুরীকে যোগ করেছে। একটি কুঠুরীতে অসংখ্য ডিম। বহু শ্রমিক ডিমগুলোকে দেখাশুনায় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ডিমগুলোকে নেড়ে দিচ্ছে। এমনকি তোমরা যেমন শিশুকে রোদে রাখ, ঐ দেখ ডিম মুখে করে রোদ থেকে ঘুরিয়ে আনছে। সুড়ঙ্গ পথের মোড় ঘুরে অন্য কুঠুরীতে লার্ভা। আলতো করে মুখে করে লালন পালনে ব্যস্ত বহু পিঁপড়ে। লার্ভা থেকে আবরণীর ভেতর ঢুকে পিউপা অবস্থায় কিছুদিন কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে।

ও পাশের কুঠুরী আমাদের রাণী-কক্ষ। সন্তর্পণে চল দেখবে। অনেক শ্রমিক পিঁপড়ে রাণীকে ঘিরে আছে। আমাদের কলোনীর ইনিই সকলের মা এবং সর্বময় কর্ত্রী। আমরা সবাই রাণীর সন্তান এবং রাণী মায়ের সেবা যত্ন করে থাকি। রাণীকে খাওয়ান থেকে শুরু করে বিপদ থেকে রক্ষা করা সবই আমাদের কাজ। তোমাদের অনেকের মত বড় হয়ে মাকে ভুলে যাওয়া আমাদের সমাজে ঘটে না। যদিও নামে রাণী, বস্তুতঃ পক্ষে ডিম দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই তাকে করতে হয় না। রাণীর এক জাতীয় ডিম থেকেই খাওয়াবার তারতম্যে স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক পিঁপড়ে তৈরী হচ্ছে এবং এদের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করছি আমরাই। স্ত্রী ও পুরুষ আকৃতিতে আমাদের থেকে বড় ও ডানাওয়ালা, যদিও ডানার ব্যবহার বছরের বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময় করতে পারে না। আমাদের সমাজে মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গের মত পুরুষের প্রয়োজন শুধু ডিম তৈরিতে। কলোনীর রাণীকে সরিয়ে নিলে সাময়িকভাবে কলোনী ভেঙ্গে যায়।

ভাঁড়ার ঘর: রাণী কক্ষ দেখলে। এবার সুড়ঙ্গ পথের এ-পাশে আর একটি কুঠুরী এটি হচ্ছে কলোনীর ভাঁড়ার ঘর বা ষ্টোর রুম। প্রচুর মজুত খাদ্য রয়েছে—ভাত, গম থেকে শুরু করে নখের টুকরো, ছোট্ট শামুক, এমনকি সেদিন দরজায় চেপ্টে যাওয়া টিকটিকির ল্যাজের টুকরো—যাদের বহু খোঁজ করেও তোমরা হদিস পেলে না—এই দেখ তোমাদের অলক্ষ্যে আমরা ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে এনে রেখেছি। আমরা আমাদের ওজনের বেশী জিনিষকেও টেনে আনতে পারি। আমাদের ঘ্রাণ শক্তি তোমাদের চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশী; ফলে খাদ্য-বস্তু সংগ্রহ সুবিধা। খাদ্যবস্তু পেলে কলোনীর ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে আসাই সাধারণ নিয়ম। তবে ঝোলা গুড়, রসগোল্লার রস বা তোমাদের বাচ্চাদের খাওয়াবার গ্রাইপ ওয়াটার এ-ধরণের খাদ্যের ব্যাপারে আমরা খবর পাঠিয়ে অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে প্রচুর খাই, তারপর কলোনীতে ফিরে অন্যান্য অভুক্তদের বিশেষ কায়দায় মুখে মুখ লাগিয়ে বমি করে কিছুটা খাইয়ে দি। আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে

অপরকে ভোজন করান

তোমাদের মত তেমন কোন বাছবিচার নেই। আমরা প্রায় সর্বভুক। দেশী, বিলেতী, মোগলাই—শর্করা, আমিষ, চর্বি সব কিছুই চলে। ভাঁড়ার ঘরের খাদ্য কলোনীর সবার। কারণ আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। আমরা খুব পরিশ্রমী বলে—আমাদের খাওয়ার প্রয়োজনও

অপেক্ষাকৃত বেশী, এছাড়া উপোষ করে আমরা একদম থাকতে পারি না—সম্ভবতঃ আমাদের দেহে জমা খাদ্য খুব কম। সব দিনে খাদ্য সংগ্রহ সমান হয় না। শুকো গরম বাতাস, বেশী ঠাণ্ডা এসব দিনে বাইরে বেড়িয়ে কাজ করা আমাদের অসুবিধা, তখন কলোনীর ভেতর রাস্তা তৈরী মেরামতির কাজ ইত্যাদি করে থাকি। অলস বসে থাকা, আড্ডা দেওয়া বা কাজে ফাঁকি—আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ।

কলোনীর গোশালা : এবার চল আমাদের কলোনীর গোশালা দেখতে। তোমরা দুধের জন্য যেমন গরু, মোষ পোষ আমরাও গাছের এ্যাপিড্ বলে (Aphid) ছোট পোকা নিয়ে এসে আমাদের কলোনীতে সযত্নে রাখি। বিনিময়ে ওদের দেহ নিঃসৃত মিষ্টি রস খেয়ে থাকি। আমাদের প্রয়োজনে ওদের রস বার করার পদ্ধতিও মজার। তোমরা যেমন বাছুর মরে গেলে অনেক সময় খড়ের তৈরী নকল বাছুর দেখিয়ে গরু বা মোষের দুধ বার কর—আমরাও অনেকটা একই কৌশলে শুঁড় দিয়ে এ্যাপিড্দের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে রস বার করি।

পিঁপড়ের লাইন : এবার এস কলোনীর বাইরে বেড়িয়ে যাই। ঐ দেখ শ্রমিক পিঁপড়ে লাইন করে চলেছে শিকারের সন্ধানে, এরা কিন্তু পথ চিনে ফিরে আসবে কলোনীতে। কেমন করে আমরা পথ চিনে চলি—এ ব্যাপারে 1959 সাল থেকে তোমরা ফেরোমন নাম দিয়েছ আমাদের দেহ নিঃসৃত এক রকম রাসায়নিক পদার্থকে। এর গন্ধে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি, সেই সঙ্গে রাস্তাকে বুঝতে পারি।

আত্মরক্ষা : এমনিতে আমরা শান্ত প্রাণী। তবে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও পিছপা নই। যদিও যুদ্ধাস্ত্র বলতে—শক্ত চোয়ালের জোরালো চিমটি সঙ্গে একটু ফরমিক এ্যাসিড, কারও বা বিষাক্ত গ্যাস, অনেকের মৌমাছির মত হুল—সেই সঙ্গে ভোজনান্তে দক্ষিণার মত কিঞ্চিৎ বিষ—যা তোমাদের মত জীবকেও সাময়িক হঠাতে সক্ষম। আফ্রিকার জঙ্গলের চালক পিঁপড়ে (Driver ant) বলে এক ধরণের জঙ্গী পিঁপড়ের লাইনের উপর হাতী, বা সিংহের মত শক্তিশালী জীবও আসতে সাহসী হয় না। যুদ্ধের সময় আমাদের আক্রমণ এমন তীব্র যে অনেককে দেহে আটকে থাকা শত্রু পিঁপড়ের শুধু মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও দেখবে যেন যুদ্ধে পাওয়া বীর পদক।

আমাদের অনেক আত্মীয়রা মাটিতে না থেকে গাছে থাকে। নালসো পিঁপড়ে, আম, লিচু জাতীয় গাছের পাতা নিজেদের লার্ভার রস দিয়ে জুড়ে সুন্দর বাসা তৈরী করে থাকে। ওদের ডিমই তোমরা চুরি করে মাছ ধরো। আরেক ধরণের গেছো লাল পিঁপড়ের বাসা দেখলে তোমাদের পাখীর বাসা বলে ভুল হবে।

এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের একজন শ্রমিক আহত হয়েছে—তাকে দেখতে যেতে হচ্ছে। আমি আসি।

এত ছোট প্রাণী পিঁপড়ে—আরও ছোট্ট এদের মস্তিষ্ক, কিন্তু কেমন সুশৃঙ্খল, কর্তব্যপরায়ণ, নিস্বার্থ ভাবে শুধু গোষ্ঠির প্রয়োজনে কাজ করে চলেছে—ভাবলে অবাক হতে হয়। আমাদের মত অনেক দর্শনশাস্ত্র না পড়েও যেন "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অর্থাৎ ফলের দিকে না তাকিয়ে শুধু কাজেই অধিকার এই শ্লোকবাক্য ওদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ফুল কেন দেখতে সুন্দর ?

রাধারাণী মাইতি*

মানুষ যতদিন থেকে সভ্য হতে আরম্ভ করেছে ততদিন থেকেই ফুলকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে জানে।

অনেক অনেক কবি তাঁদের এই অনুভূতি কাব্যে লিখেছেন ; অনেক চিত্রকর এঁকেছেন তাঁদের চিত্রের মাধ্যমে। এ ধরণের বহু উদাহরণ রয়েছে। এমন কি কোন রূঢ় মেজাজী ব্যক্তিরও মন জয় করা যায় একগুচ্ছ ফুলের তোড়া দিয়ে। ফুল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি সুমধুর পরিচায়ক।

কিন্তু প্রশ্ন হোল ফুল কেন দেখতে সুন্দর ? কেনই বা সবাইকে মুগ্ধ করতে পারে ?—এর উত্তর জানার জন্যে আমাদের দরকার ফুলকে একজন উদ্ভিদবিদের চোখে দেখা। ফুলের সুন্দর রঙের পেছনে যারা রয়েছে তাদের নাম ফ্লেভোনয়েড (Flavonoid) এবং টারপিনয়েড (terpinoid) ফ্লেভোনয়েডগুলি সমস্ত পাতা ও পুষ্পদলের একটি সাধারণ উপকরণ। নিঃসন্দেহে তাদের কাজ হোল ফুল ও ফলকে রঙীন করে পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীদের (যারা পরাগমিলনে সাহায্য করে) আকর্ষণ করা ফ্লেভোনয়েড অনেকগুলি বিভাগ রয়েছে। তাদের মধ্যে অ্যানথোসায়ানিন, ফ্লেভোন এবং ফ্লেভোনলগুলি সম্বন্ধে ভালভাবে জানা হয়েছে। অ্যানথোসায়ানিন লাল ও নীল রঞ্জক আর ফ্লেভোনগুলি হাল্কা পীতবর্ণের (cream) রঞ্জক। এ রঞ্জকগুলি জলে দ্রবণীয়। ক্যারোটিনয়েড রঞ্জকগুলি টারপিনয়েড দলের (category) মধ্যে পড়ে। ক্যারোটিনয়েড গুলি স্নেহপদার্থ দ্রবণীয় ও হলুদবর্ণের রঞ্জক আর জ্যানথোফিলরা হলুদ থেকে বাদামী রঙের ক্যারোটিনয়েডগুলি থাকে পাতা ও পুষ্পদলের ক্লোরোপ্লাস্টের সঙ্গে।

ফুল উদ্ভিদ প্রজননের নির্দিষ্ট অঙ্গ। তার গর্ভাধান এবং আনুষঙ্গিকভাবে ফলধরার সুযোগ হয় তখনই যখন পরাগের দানা ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর জমা হয়।

কিছু কিছু ফুল আছে যাদের স্বয়ং পরাগমিলন (Self pollination) ঘটে। এদের ফুলের পাঁপড়ি আদৌ খোলে না। বরং শক্ত ভাবে বদ্ধ থাকে, ফলে যখন পরাগধানী খুলে যায় পরাগ এমনিতেই গর্ভমুণ্ডে এসে যায়। এই ফুলগুলি খুব ছোট ছোট হয়। কিন্তু ফুলেরা কি চায় নিজেরই পরাগে পরাগমিলন ঘটাতে ? Darwin বলেছেন, "প্রকৃতি আমাদেরকে জোরগলায় বলছে যে সে স্বয়ং পরাগমিলন ঘৃণা (abhor) করে" অন্য কথায় একই গাছের ফুলেরা অন্য ফুলের পরাগ নিতে (cross-pollination)।

পরাগমিলনের জড় প্রতিনিধি বায়ু কিংবা জল। যাদের পরাগমিলন বাতাস ও জল দ্বারা ঘটিয়া থাকে। তাদের ফুলের রঙীন হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় পরাগ বহনকারী একটি জীব সে সমস্ত জায়গায় ফুলকে ঐ সমস্ত

---

*ভেমুয়া গার্লস স্কুল, গ্রাম-পাকুই, পোঃ-বালিচক, মেদিনীপুর।

বাহক জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। কিভাবে ফুল তা করে ? ফুলের সৌন্দর্যের উপরই তা নির্ভর করে এবং এই ঘটনা ঘটাবার জন্যে উল্টোভাবে বহনকারীদের কিছু দিতেও হয়। বহনকারীরা প্রধানতঃ তিন ধরণের হয় i) পোকামাকড় ii) পাখী এবং iii) বাদুড় জাতীয় প্রাণী। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পোকামাকড়।

ফুলে ফুলে বিচরণ করে যে পোকামাকড়, তারা আবার চার ভাগে বিভক্ত ক) গুবরে-পোকা খ) মাছি ; গ) প্রজাপতি ও মথ ; এবং ঘ) মৌমাছি ও বোলতা। তাদের বেশীর ভাগই ফুলে খাদ্যের সন্ধানে যায়। ফুল তাদের দু-ধরনের খাদ্য দেয় ক) পরাগ ; এবং খ) মধু। যেসব ফুল মধু ও পরাগ দুইই দেয় তাদের মধু পুষ্প বলা হয়। আর যারা কেবল পরাগ দেয় তাদের বলা হয় পরাগ-পুষ্প।

তবে কেবল পরাগও মধু বিতরণের দ্বারা ফুল পরাগমিলনকারীদের আকৃষ্ট করে যে তা নয়—তাদের রঙ, আকার, আকৃতি ও গন্ধের দ্বারাও আকৃষ্ট করে।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসাবে পোকামাকড়দের দৃষ্টি খুব কম সীমার মধ্যে থাকে। তাদের যুগ্মচক্ষু (compound eye) নড়ন্ত বস্তু ভালভাবে দেখতে পায়। মানুষের দৃষ্টিগোচর বর্ণালীর সীমা হোল 400 nm (nanometer)* থেকে 750 nm (বেগুনী থেকে লাল) মৌমাছির এই সীমা হোল 300 nm থেকে 650 nm। অতএব মৌমাছি লাল রঙে অন্ধ (red blind) ; এমনকি এই সীমার (range) মধ্যে তারা চারটি গুচ্ছের (band) রঙ দেখতে পায় i) হলুদ থেকে হলুদাভ সবুজ (650—500 nm) ; ii) নীলাভ সবুজ (500—480 nm) ; iii) নীল (480—400 nm) iv) অতিবেগুনী রঙ (400—300 nm) লাল রঙ তারা তখনই দেখতে পায় যখন অতিবেগুনী রশ্মি লাল রঙের উপর প্রতিফলিত হয়।

প্রথমতঃ যাদের পাপড়ি নেই তাদের ফুলের অন্যান্য অংশ রঙীন হয়, যাদের ফুলের রঙ নেই, তাদের গন্ধ দ্বারা পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়।

ফুলের আকর্ষণ করার আরও একটি মস্তবড়ো উপাদান হলো 'nectar guides' এদের বিভিন্ন রঙ ও গন্ধ হয় ফুলের বয়স বাড়লে এদের রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং পোকামাকড় তা বুঝতে পারে।

ফুল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন ; i) থালার মত ; ii) গামলার মত iii) নলের মত iv) পতাকা সদৃশ প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের ফুল দ্বারা যে যে নির্দিষ্ট ধরনের পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়, তারা ফুলের গন্ধ, পাপড়ির আকৃতি প্রভৃতি দেখে ঠিক নির্দিষ্ট ফুলকেই চিনতে পারে।

পোকামাকড় বিভিন্ন ফুলের গন্ধ মানুষের চেয়েও খুব ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে। এই সমস্ত গন্ধ নানান রাসায়নিক দ্রব্যের জন্যে। মথ দ্বারা যে সমস্ত ফুলের পরাগমিলন সংঘটিত হয় রাত্রে তাদের সুন্দর গন্ধ উঠে। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলগুলি গুবরে পোকা দ্বারা পরাগমিলন ঘটায়। অতএব পরাগমিলনকারীদের আসার সময়ের উপর ফুলের গন্ধের তীব্রতার একটি গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক Darwin-এর একটি মন্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়।

* 1nm = 10^{9} cm

Charles Darwin বলেছিলেন, ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের উন্নতি ঐ রাজ্যের প্রবীণ স্ত্রী-ভৃত্যের সংখ্যার উপর বাড়ে। স্ত্রী-ভৃত্যেরা বিড়াল পোষতে ভালবাসে। অতএব ভৃত্যের সংখ্যা যত বেশী হবে বিড়ালের সংখ্যা তত বেশী হবে, বিড়াল যত বেশী হবে, ইঁদুরের সংখ্যা ততই কমবে। ইঁদুরেরা বড় বোলতার (bumble bee) বাসা নষ্ট করে। বড় বোলতা লাল ছোট ছোট তৃণের জনন কার্য বর্ধন করে। ছোট ছোট তৃণ আবার গো-মহিষাদির খাদ্য। গো-মহিষাদি আবার রাজ্যের নাবিক ও যোদ্ধাদের খাদ্য (beef)। অতএব স্ত্রী-ভৃত্য বেশী হলে, বিড়াল সংখ্যা বেশী, ইঁদুর কম, বড় বোলতা বেশী, তৃণ সংখ্যা বেশী, গো-মহিষাদি বেশী ও রাজ্যের উন্নতি বেশী।

সৌরশক্তি ব্যবহারে ভারত

দীপঙ্কর খাঁ*

[সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে নেই সে কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমরা আজ চলতে পারি না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে আমোদ আহ্লাদ, চলাফেরা, সাজপোষাক সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারেও সংযোজিত হচ্ছে নিত্যনূতন তথ্য। কিন্তু স্বতঃপ্রবহমানা বিজ্ঞানের এই রূপের উৎস মূল হল শক্তি। প্রথম খৃষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যেখানে মাত্র 7Q শক্তি ব্যয় হয়েছে সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত শক্তিব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 4Q এবং পরবর্তী শতাব্দীতে এই শক্তিব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে 100Qতে। বলে রাখা ভাল যে $1Q = 10^{21}$ জুল শক্তি। এতদিন পর্যন্ত কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতিই ছিল শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু বর্তমানের বিপুল চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে সেগুলি ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা মেটানোর একটি প্রধান উপায় সৌরশক্তি।

প্রতি বছর পৃথিবী সূর্য থেকে যে শক্তি পায় তার পরিমাণ প্রায় 400 বিলিয়ন টন অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার সমান। এ ছাড়াও জানা গেছে যে, বিষুব অঞ্চলের প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে প্রতি বছর প্রায় $1 \cdot 5 \times 10^{6}$ কিলোওয়াট সৌরশক্তি আপতিত হয়। এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির কিয়দংশও যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে শক্তি সমস্যার একটি চমৎকার সমাধান হয়ে যায়।

*দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান) হায়ার সেকেণ্ডারী ইন্‌স্টিটিউশন (টাকী-হাউস), কলিকাতা-700009

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য সহজ ও ব্যবসাভিত্তিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। কয়েক বছর আগে বরোদাতে একটি ছোট আকারের সৌরশক্তিচালিত ইঞ্জিন প্রদর্শিত হয়। ইঞ্জিনটির প্রদর্শনীটি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। যদিও ইঞ্জিনটিতে কোনো নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দেখানো হয়নি কিন্তু ঐ প্রোটোটাইপ ইঞ্জিনটি ভারতীয় যন্ত্রবিদ্যার একটি সাফল্যকে সূচিত করেছে। ভবিষ্যতে হয়ত এই সৌরশক্তিচালিত ইঞ্জিন সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় সবুজ বিপ্লবকে আরও প্রসারিত করবে। উক্ত ইঞ্জিনটি বোম্বের সর্দার প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এস, এস, ডিঘের চিন্তাপ্রসূত। তিনি ফ্রেয়ন নামক একটি কম স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট তরল নির্বাচন করেন। কারণ কম সৌরতাপ প্রয়োগেই ফ্রেয়ন 'পাওয়ার স্ট্রোকে'র উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় ফ্রেয়ন-12-এর চাপ থাকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় 100 পাউন্ড। কিন্তু 60°C-এ ঐ তরলটি 220 পাউন্ডেরও বেশী চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অধ্যাপক ডিঘের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তপ্ত ফ্রেয়ন পাত্রের সীল করা অংশগুলিতে গর্ত করে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। তাই ইতিপূর্বে ফ্রেয়ন ব্যবহার করে সৌরযন্ত্রে সাফল্য লাভ করা যায় নি। অধ্যাপক ডিঘে তাঁর আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতিতে এই অসুবিধা দূর করেন। ঐ পদ্ধতির সাথে ব্যাটারির 'লীকপ্রুফ' পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। একই পদ্ধতিতে বিউটেন ব্যবহার করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Jean Pierre-Giradier আফ্রিকাতে বহু কাজ করেন। এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই আশাবাদী।

অধ্যাপক ডিঘের যন্ত্রটি ছাড়াও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সৌরশক্তিচালিত কুকার, জলগরম করার যন্ত্র প্রভৃতি বের করেছেন, যদিও সৌরকুকার ছাড়া বাকীগুলি ভারতের দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের বাইরে। ভারতীয়দের পুরাতন খাদ্যাভ্যাসের জন্য কুকারটিও পল্লী অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু প্রচার বাড়ালে শহর ও শহরতলীতে সৌরকুকার নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

1977 সালের মার্চমাসে সি, আই, এলের কর্মীরা পরীক্ষামূলক ভাবে দিল্লীর অনতিদূরে ঐ প্রতিষ্ঠানেরই প্রাঙ্গনে একটি সৌর-পাম্প বসান। ঐ পাম্পের ফটো ভোল্টাইক মডিউল ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি হল একগুচ্ছ সিলিকন সৌর কোষের সমাহার। এই মডিউলগুলি সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে। এই বিদ্যুৎ শক্তিকে লেড—স্টোরেজ কোষের ভিতর সঞ্চিত রাখা হয়। প্রয়োজনমত তার থেকে পাম্পের মোটর চালানো হয়। '77 থেকে '79 এই দুবছরে সি, আই, এলের কর্মীরা এই পাম্পের কর্মক্ষমতা 12% থেকে 20%-এ তুলতে সমর্থ হয়েছেন। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এটি বর্তমানে দৈনিক 12000 লিটারের মত জল তুলতে পারে।

জাহাজ পরিচালনার সংকেতের জন্য দ্বারোকা বন্দরে সি, আই, এল, নির্মিত দুটি সৌরশক্তি গ্রাহকও বসান হয়েছে।

জনশিক্ষা ও বিনোদনের জন্য ইউনিসেফ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রামে গ্রামে কিছু রেডিও সেট বিতরণ করে থাকেন। ঐসব সেট চালানোর জন্য ফটো-ভোল্টাইক মডিউলও তৈরী করেছেন সি, আই, এল। শ্রীনগরের লেহ-র মত দুর্গম অঞ্চলে এই রকম রেডিও ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেছে।

কিন্তু সিলিকন সৌরকোষের দাম বেশী হওয়ায় এসব সাফল্যকে এখনও ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। 1974 সালে মার্কিন মুলুকেই এই ধরণের কোষে উৎপন্ন প্রতি ওয়াট শক্তির খরচ পড়ত প্রায় 70 ডলার। আমাদের দেশে '78-এ সেই খরচ নেমে দাঁড়িয়েছে ওয়াট প্রতি 7 ডলারে। দেশে বিশুদ্ধ সিলিকন উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে '81তে এই খরচ ওয়াট প্রতি 3 ডলারে নামানো যাবে বলে সি, আই, এলের কর্মীরা আশা রাখেন।

অধ্যাপক ডিঘের ইঞ্জিনটির ব্যবসায়িক দিক বিচার করে বলা যায় পরিকল্পনামাফিক 12টি 3 অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন একসাথে নির্মাণ করতে প্রতিটিতে খরচ পড়বে প্রায় 6000 টাকা। টাকার অংকটা নিশ্চয়ই বেশী। কিন্তু একথাও ভাবতে হবে যে, অন্যান্য দৈত্যাকৃতি গ্যাস-টার্বাইনের তুলনায় এটির ব্যবহার অনেক সহজ। এছাড়াও অন্যান্য সৌরযন্ত্রগুলির মত এটিরও মেরামতী খরচ খুবই কম।

ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় 5,76,000। ঐসব গ্রামের মধ্যে ছোটো-খাটো জমিতেও চাষের জন্য দরকার জল। ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে পাম্পের খরচ আরো কমানো সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থায় পরিচালনার খরচ কম কিন্তু ব্যবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী। এই সব দেখে মনে আশা জাগে ভারতের মাটিতেই, ভারতের শক্তিতেই অদূর ভবিষ্যতে মানবকল্যাণে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হয়ত সাধ্যাতীত হবে না।

সংখ্যা নিয়ে খেলা

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ*

[4টি চার এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করে কেমন করে '0' থেকে '50' পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় তা এখানে দেখানো হল।]

$0 = 4 \times 4 (4 - 4)$

$1 = (4 + 4) / (4 + 4)$

$2 = 4/4 + 4/4$

$3 = (4 + 4 + 4) / 4$

$4 = 4 + 4 (4 - 4)$

$5 = (4 \times 4 + 4) / 4$

$6 = 4 + (4 + 4) / 4$

$7 = 4 + 4 - 4/4$

$8 = 4 + 4 + (4 - 4)$

$9 = 4 + 4 + 4/4$

$10 = 4 + 4 + 4 / \sqrt{4}$

$11 = \frac{4 + 4!}{4} + 4, \; 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

$12 = 4! + 4 - 4 \times 4$

$13 = \sqrt{4} \; (4! + \sqrt{4}) / 4$

$14 = \frac{4!}{\sqrt{4}} + \frac{4}{\sqrt{4}}$

$15 = (4 \times 4) - 4/4$

$16 = 4 \times 4 + (4 - 4)$

$17 = 4 \times 4 + 4/4$

$18 = 4 \times 4 + 4 / \sqrt{4}$

$19 = 4! - 4 - 4/4$

$20 = 4 \times (4 + 4/4)$

$21 = 4! - \sqrt{4} - \frac{4}{4}$

10/1, গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা-13

$22 = 4! - (4+4)/4$

$23 = 4! - (\sqrt{4} + \sqrt{4})/4$

$24 = 4! + 4(4-4)$

$25 = (\sqrt{4} + \sqrt{4})/4 + 4!$

$26 = 4! + (4+4)/4$

$27 = 4! + 4 - 4/4$

$28 = 4! + 4 + (4-4)$

$29 = 4! + 4 + 4/4$

$30 = 4! + 4 + 4/\sqrt{4}$

$31 = 4! + (4! + 4)/4$

$32 = 4 \times 4 \times 4/\sqrt{4}$

$33 = 4 \times 4 \times \sqrt{4^{\circ}}$ [যেহেতু, $4^{\circ} = 1$]

$34 = \sqrt{4} + 4 + 4 + 4!$

$35 = 4! + (4! - \sqrt{4})/\sqrt{4}$

$36 = 4! + 4 + 4 + 4$

$37 = 4! + (4! + \sqrt{4})/\sqrt{4}$

$38 = 4! + 4 \times 4 - \sqrt{4}$

$39 = 4 \times 4 + 4! - 4^{\circ}$

$40 = 4 \times 4 \times 4 - 4!$

$41 = 4 \times 4 + 4! + 4^{\circ}$

$42 = 4! + 4 \times 4 + \sqrt{4}$

$43 = 44 - 4/4$

$44 = 4! + 4 \times 4 + 4$

$45 = (4 \times 4 + \sqrt{4})/4$ [$4 = \frac{4}{10}$]

$46 = 4! \times \sqrt{4} - 4/\sqrt{4}$

$47 = 4! \times \sqrt{4} - 4/4$

$48 = 4! \times (4+4)/4$

$49 = 4! \times \sqrt{4} + 4/4$

$50 = 4! \times \sqrt{4} + 4/\sqrt{4}$

সংখ্যাকূট

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে 'সংখ্যাকূট'টি সমাধান কর :—

a	b	c	d
e			*
f	*	g	h
	i	*	j

a 1	b 9	c 1	d 8
e 6	4	0	*
f 2	*	g 8	h 2
0	i 3	*	j 4

পাশাপাশি

a—ম্যাক্স প্লাংক যে খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান :

e—এক বর্গমাইলে যত 'একর' হয় ;

f—মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা ;

g—লেড-এর পারমাণবিক সংখ্যা ;

i—জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উচ্চতায়

উপর থেকে নিচে

a—লেড-এর স্ফুটনাংক যত ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ;

b—প্লুটোনিয়াম-এর পারমাণবিক সংখ্যা ;

c—এযাবৎ আবিষ্কৃত মোট মৌলের সংখ্যা :

d—অসমিয়াম-এর যোজ্যতা ;

h—এক 'দিনরাত্রি'তে যত ঘন্টা হয় ;

i—শনিগ্রহের বলয় সংখ্যা ।

247, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-700033

মডেল তৈরি

রেন অ্যালার্ম

সুব্রত মণ্ডল*

মায়েরা হয়ত সারাদিনের কাজ সেরে দুপুরে বিশ্রামের জন্য শুলেন ; কিন্তু ছাদে রয়েছে কয়েকটা ভিজা জামা-কাপড়, আর আকাশে কিছু মেঘ জমেছে অর্থাৎ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অথচ ভিজে জামা-কাপড়গুলো তুলেও রাখা যায় না। ফলে মায়েরা সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর দুপুরেও নিশ্চিন্তে সামান্য বিশ্রাম নিতে পারেন না। কিন্তু সহজ-সরল এই যন্ত্রটি (রেন অ্যালার্ম) গৃহে থাকলে তাঁরা মোটামুটি নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারবেন।

রেন অ্যালার্ম

যন্ত্রটি সহজ-সরল। এটি তৈরির জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি প্রয়োজন :—

(1) চিত্রের ন্যায় স্ট্যান্ডযুক্ত কাচের একটি 'U' টিউব, যার এক বাহুর অগ্রভাগ ফানেলাকৃতি এবং অপর বাহুর অগ্রভাগ 'U' এর ন্যায়ই বাঁকানো, এই বাঁকানো অগ্রভাগ বিশিষ্ট বাহুর ভেতরে (অগ্রভাগের কাছেই) দুটি তামার পাত লাগানো [তামার পাতদুটি যেন পরস্পর ঠেকে না থাকে] ও তামার পাত দুটি থেকে কিছুটা নীচে ঐ বাহুরই সঙ্গে একটি কল (Tape) [কলটির সম্পূর্ণাংশ যেন তড়িতের অপরিবাহী অর্থাৎ অধাতব পদার্থে গঠিত হয়] লাগানো ;

(2) একটি ইলেকট্রিক কলিং বেল (Calling Bell 250 Volt) ;

(3) একটি সুইচ্ (Switch) একটি প্লাগ্ (Plug), কিছু তার ইত্যাদি।

---

*একাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর।

যন্ত্রটিকে কর্মক্ষম করতে হলে প্লাগপয়েন্টের সঙ্গে সংযুক্ত প্লাগের ধনাত্মক (Positive) তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত তার নিয়ে চিত্রানুরূপ সুইচের সঙ্গে যুক্ত করে, সুইচের অপর তড়িৎদ্বারের সঙ্গে অপর একটা তার সংযুক্ত করে তারের অপর প্রান্ত 'U' টিউবের মধ্যস্থ একটি তামার পাতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ও অপর তামার পাতটির সঙ্গে অন্য একটা তার যুক্ত করে সেই তারটির অপর প্রান্ত কলিং বেলটির আউটপুট্ (output)-এ সংযুক্ত করে অপর আউটপুটের সঙ্গে অপর একটা তার যুক্ত করে সেটিকে প্লাগের ঋণাত্মক (Negative) তড়িৎদ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এবার সুইচটি অফ্ (off) রেখে 'U' টিউবের ফানেলাকৃতি মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে জল ঢালতে হবে। জল ঢাললেই দেখা যাবে যে জলের 'সমচ্চোশীলতা' ধর্মানুসারে 'U' টিউবের দুই বাহুরই জল সমানভাবে বাড়ছে এবং যখনই ঐ জল তামার পাতদ্বয়কে স্পর্শ করবে ঠিক সেই মুহূর্তেই জল ঢালা বন্ধ করতে হবে। এবার সুইচ্ অন্ (on) করলেই কলিং বেলটি বাজতে শুরু করবে [কারণ, জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ায় বন্ধনী (circuit)-টি সম্পূর্ণ হবে]। এখন 'U' টিউবের কলটি সামান্য খুলে কোন পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলতে হবে। যে মুহূর্তে কলিং বেল বাজা বন্ধ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে কলটিও বন্ধ করতে হবে [জল কমে বর্তনী ছিন্ন হওয়াই কলিং বেল বাজা বন্ধ হওয়ার কারণ]। এখন যন্ত্রটি কাজের জন্য সম্পূর্ণাংশে তৈরী।

ঠিক এই অবস্থায় যন্ত্রটিকে ছাদে রাখলে বৃষ্টি পড়লেই, বৃষ্টির জল 'U' টিউবের ফানেলাকৃতি মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে [ফলে অপর বাহুরও জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ও বর্তনী সম্পূর্ণ হবে] এবং কলিং বেলটি বাজতে শুরু করবে। সুতরাং কলিং বেলটি বাজলেই বোঝা যাবে—বৃষ্টি

[বৃষ্টি পড়লেই সুইচ্ অফ্ করে যন্ত্রটি ছাদ থেকে সরিয়ে নিতে হবে, নাহলে অতিরিক্ত জল ঢুকলে তামার পাতের সঙ্গে জল লেগে থাকলে ক্ষতি হতে পারে।]

পুস্তক পরিচয়

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়

লেখক : ডক্টর জয়ন্ত বসু, প্রকাশক : আশা প্রকাশনী, 74 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9, মূল্য : পনেরো টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বর্তমান শতকে বহু বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে। পদার্থ ও জীব বিজ্ঞানের এই সব আবিষ্কার এতই চমকপ্রদ ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ এমনই সুদূরপ্রসারী যে, তা বর্তমান সভ্যতার ও সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে। 'পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়' পুস্তকটিতে লেখক তারই কিছু আভাস দিয়েছেন। সাধারণত বিজ্ঞানের বিষয়গুলি এতই জটিল যে, সাধারণ পাঠকের সেখানে প্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য। পদার্থবিজ্ঞান বলতে তো অঙ্ক আর যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি, সাধারণ মগজে তাদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। তবু বিজ্ঞানীরা সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের ফাঁকটুকু যতদূর সম্ভব কমাতে চান। তার উপায় হল বিজ্ঞানের জনপ্রিয় পুস্তক অথবা বক্তৃতার প্রচার। আমাদের দেশে এ দুয়েরই অভাব। তবু কিছু কিছু জনপ্রিয় পুস্তক দেখে আমরা আশান্বিত হই। আলোচ্য পুস্তক নিঃসন্দেহে তাদের একটি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান লেখক এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী। তাঁর কলমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে লেখক সাধারণ পাঠকদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সহজ, সাবলীল ও স্থানে স্থানে সরলও বটে। পুস্তকটিতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আরো ভাল হত, তবে অধ্যায়গুলি প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় পড়তে গিয়ে কোথাও আটকায় না এবং বইটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য।

আরম্ভে পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ নিয়ে প্রথম অধ্যায়। বিপরীত পদার্থের বিভিন্ন মৌল কণার পরিচয়, পরীক্ষাগারে তাদের অস্তিত্ব, সেগুলি দিয়ে গঠিত বিপরীত পরমাণু ও অণু এবং বিপরীত জগতের গঠন, এই সব বিষয় লেখক সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিপরীত জগতের অস্তিত্ব কীভাবে ধরা পড়তে পারে, সে বিষয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিপরীত জগতের অস্তিত্ব কি সম্ভব—এ প্রশ্নের দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কী বলেন, তার কিছু বিবরণ থাকলে ভাল হত। যেমন আল্‌ফ্‌বেন বলছেন লীডেন ফ্রষ্ট লেয়ারের কথা। যদিও এসব ধ্যান ধারণা কিছুটা কল্পনার মিশ্রণ—তবু তাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ়, তাই আলোচনার সুযোগ আছে।

পরবর্তী অধ্যায় : অতিতারল্য ও অতি-পরিবাহিতা– পদার্থের এ দুটি ধর্ম এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যথেষ্ট জটিল কিন্তু প্রয়োগ এতই বহুল যে, বিষয়গুলি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। এই অধ্যায় থেকে এই দুটি বিষয়ের একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। জটিল হওয়া সত্ত্বেও লেখক সাধারণ ভাষায় অর্থাৎ অঙ্কের সাহায্য না নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তবে দুই তরলের মডেল ও দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনার সুযোগ ছিল।

পরবর্তী তিনটি অধ্যায়—প্লাজমা, সংযোজনচুল্লী, ও এম এইচ্ ডি জেনারেটর একসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের দিনে শক্তি উৎপাদন প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। শক্তি উৎপাদনের অন্যতম পন্থা হল নিউক্লীয় সংযোজন, যা

নিউক্লীয় বিভাজনের ঠিক উল্টো ব্যাপার। নিউক্লীয় বিভাজন ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ভারী নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন করে, যে পদ্ধতিতে তারাপুর রিঅ্যাক্টর বা পৃথিবীর বহু রিঅ্যাক্টর বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। সম্প্রতি এই সব রিঅ্যাক্টর নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী সাধারণের কান ভারী করছেন এই বলে যে, এই সব রিঅ্যাক্টর যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য, পরিবেশ দূষিত করে, দুর্ঘটনা জনিত কারণে বহু প্রাণহানি ঘটাতে পারে; অকেজো রিঅ্যাক্টরের দূষিত মল ফেলাও দারুণ সমস্যা। এই সব কারণে কয়লার কিছুটা বিকল্প হয়েও এই সব রিঅ্যাক্টর আগামী শতকেও পৃথিবীর শক্তির প্রয়োজন যতটা মেটাবে, তার বেশী ক্ষতি সাধন করবে। তাহলে বিকল্প কি? সৌরশক্তিও ঠিক বিকল্প নয়। একমাত্র পর্যাপ্ত বিকল্প হতে পারে হাল্কা নিউক্লিয়াসের সংযোজন। ব্যাপারটা জানা গেছে অনেক আগেই—সূর্যের অমিত শক্তির উৎস যে এই প্রক্রিয়া, তাও প্রায় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। আসলে এর প্রয়োগ কৌশলেই যত সমস্যা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গবেষণার অধিকাংশ বাজেট ব্যয়িত হচ্ছে এই প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষায়। প্লাজমা ও সংযোজন চুল্লী অধ্যায়ে এই সমস্যার মনোজ্ঞ আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমার স্বরূপ, ধর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কেও একটি সম্যক্‌ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। MHD প্লাজমা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি প্রায়োগিক কৌশল। এই কৌশল যথেষ্ট যত্ন সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংযোজন চুল্লী থেকে শক্তির উৎপাদন সম্ভব হলে পৃথিবীর একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত।

নবম অধ্যায়ে আলোচিত লেসার বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যেতে পারে। সুসমঞ্জস বিকিরণ প্রক্রিয়াটি তাত্ত্বিকভাবে জানা থাকলেও এমোনিয়া মেসার থেকে এর প্রয়োগ কৌশল আরম্ভ হয় 1958 খৃষ্টাব্দে। তারপরই চলেছে মেসার ও লেসারের জয়যাত্রা। লেখক এসব আবিষ্কারের কথা সহজভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে রামন যে আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান, লেসারের আবিষ্কারে সেই রামন এফেক্ট-এর প্রয়োগ যে ব্যাপক হয়ে পড়েছে, তার আলোচনা আর একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত।

অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার কীভাবে TV, ছাপা সার্কিট, Radar, Computer, Microelectronics, Medical Electronics ইত্যাদিতে কাজে লাগান হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের জানা থাকলেও তাদের কার্যপ্রণালী অনেকের জানা নাই। ফলে সাধারণের কাছে এই অধ্যায়গুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। অনেকে বলেন, TV ও Computer মানুষের সভ্যতায় দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটাচ্ছে। এ দুটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তাই বেশ সময়োপযোগী হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে ইলেকট্রনমাইক্রোস্কোপ আলোচিত হয়েছে। এর বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে জীববিজ্ঞানে ভাইরাস প্রভৃতি আবিষ্কারে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে। লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সাহায্যে এই সব বিষয় আলোচনা করেছেন। আধুনিকতম এরকম মাইক্রোস্কোপে 1 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বা তার বেশী শক্তির ইলেকট্রন ব্যবহার করে এমন কি বড় বড় অণুর ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়—এ দিকটা আরো একটু বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, লেখক বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি সহজ বাংলা ভাষায় ও বহু আকর্ষণীয় চিত্রের সাহায্যে সাধারণের কাছে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করতে পেরেছেন। এজন্য লেখক প্রশংসার্হ।

পুস্তকে ছাপার ভুল খুবই কম। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বিজ্ঞানের বই বলতে যাঁরা ভয় পান, এই বইটি নির্ভয়ে পড়ে তাঁরা কিছুটা গল্পের আস্বাদ পাবেন নিঃসন্দেহে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

কল্যাণী
24.11.79

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

মহাশয়,

আমি আপনাদের পত্রিকা প্রত্যেক মাসেই পড়ি। এই পত্রিকাটা আমাকে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করে। আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনারা আশা করি আমার এই প্রশ্নের সমাধান করে দেবেন।

প্রশ্ন—একটা জীবন্ত কোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কতগুলি সূক্ষ্ম সূতার ন্যায় ঘন বস্তু দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় ক্রোমোজম, এই ক্রোমজমগুলি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই জীনগুলি ডি. এন এ. এবং আর. এন. এ. নিয়ে গঠিত।

আবার একটি জড় পদার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটা কতগুলো অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই অণুগুলি কতগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত, আবার পরমাণুগুলো ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত।

আমি বলছি একটা জীবন্ত বস্তু মারা গেলে জড় বস্তুতে পরিণত হয়। তবে জীবন্ত বস্তুতে আমরা যে সকল বস্তু দেখি এবং জড় বস্তুতেও যে সব বস্তু দেখি তাদের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? যদি থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে নিশ্চই জানাবেন।

দেবাশীষ শীল
কল্যাণী

উত্তর :- জীবকোষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. অণুদের জড় পদার্থের সাধারণ অণু-পরমাণুর সঙ্গে তুলনা করে এই পত্রে জীবন ও জড়ের মধ্যে মিল বা সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

ডি. এন. এ ও আর. এন. এ হচ্ছে নিউক্লিয়িক এসিডের দুটি রূপ—একটি ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিয়িক এসিড (সংক্ষেপে D.N.A) অন্যটি রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড (R.N.A)। সাধারণ

অ্যাসিড বা অ্যালকালীর অণু বলতে যেমন বোঝায় এখানেও তাই হওয়ার কথা। তবে ডি. এন. এ ও আর. এন. এ. হচ্ছে বিশিষ্ট জৈবঅণু। সাধারণ অণু নয়। ভৌতরসায়নের ভাষায় এদের বলা হয় "ম্যাক্রোমলিক্যুলস" (Macro-molecules)—অতিকায় অণু। অতি-অতিবৃহৎ অণু। অজৈব জড় পদার্থে এই ধরণের অণু হয় না। আদি জীবনরসায়ন প্রোটোপ্লাজমের মৌল উপাদানই হচ্ছে ঐ নিউক্লিয়িক এসিড। তার এক একটি অণুতে অর্থাৎ একটি ডি. এন. এ. বা আর. এন. এ. অণুতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জড় অণু-পরমাণু। দু-দশটি বিশটি বা দু একশত নয়। আর সেই অণু-সমন্বয়ে এমন একটি বিচিত্র জটিল গঠন—কাঠামো রয়েছে যা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই গঠনবৈচিত্র্য গুণেই তারা ঐ রকম বৃহৎ আকারধারণে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটি বিশেষগুণ যাকে বলে স্বয়ংক্রিয়তা। এই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাবলেই তারা উপযুক্ত পরিবেশে নিজেরাই নিজেদের গঠন ও রক্ষণা-বেক্ষণে সক্ষম এবং প্রয়োজনমত নিজেদের দেহের দ্বিত্বকরণ (Duplication) দ্বারা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমর্থ। প্রথমটিকে জীবনবিজ্ঞান বলে পুষ্টি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জননশক্তি বা বংশবিস্তার। এই দুটিই হচ্ছে আদি জীবনধর্ম। কোন জড় অণুর এই ক্ষমতা নাই। আবার প্রয়োজনীয় পরিবেশ বা ঐ গঠন কাঠামোটি নষ্ট হয়ে গেলে ডি. এন. এ, আর. এন. এ অণুতেও আর ঐ জীবনধর্ম থাকে না অর্থাৎ তাদের সেই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা সাধারণ জড় অণু-পরমাণুতেই পরিণত হয়।

এখানে অবশ্য আর একটি কথার বিশেষ উল্লেখ একান্তই প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে ঐ বিশিষ্ট জৈবঅণুগুলির আবির্ভাব ঘটেছে মাত্র একবার,—অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। সাধারণ জড় অণু পরমাণু যেকোন সময়ই তৈরী হয় বা করা যায়। একইভাবে এক অণু থেকে আর এক অণুর সৃষ্টি বা রূপান্তর ঘটান যায়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পৃথিবীতে বারে বারে জড় অণুসমূহের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। আর সেইভাবে বিভিন্ন জড়পদার্থের উৎপত্তি এবং বহুভাবে তাদের রূপান্তর ও নতুন সৃষ্টি ঘটে চলেছে। কিন্তু নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বা তাই দিয়ে তৈরী জিন, ক্রোমোজোম প্রভৃতিকে ঐভাবে নতুন করে তৈরী করা যায় না বা অন্য কোন অণু থেকে হঠাৎ তাদের নতুন ভাবে সৃষ্টিও হয় না। প্রকৃতির নিজস্ব রসায়নাগারে পৃথিবীর মৌল-উপাদানসমূহের পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক ভৌতরাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অণু, পরমাণু ও যৌগকণাদের মিলন মিশ্রণ সংযোজন বিভাজন প্রক্রিয়াদি চলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে জীবনশূন্য আদিম পৃথিবীর বুকে। তাতে নানারকমের ছোটবড় সহজজটিল বিবিধ অণু ও তাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকারের অ্যাসিড, অ্যালকালী, লবণ, দ্রবণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উৎপত্তি যেমন হয়েছে তেমনি অণুদের আকার ও গঠন কাঠামোর মধ্যে চলেছে ক্রমিক বিবর্তনের ধারা। ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় আকারের এবং সহজ থেকে জটিল কাঠামোর অণু সৃষ্টি হয়েছে। জড় অণুদের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বলা হয় আণবিক বিবর্তন—মলিক্যুলার ইভলিউশন (Molecular evolution)। এই সুদীর্ঘ বিবর্তন ধারার বিশেষ এক পর্যায়ে ঐ জড় অণু থেকেই তৈরী হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি

ক্রমিক বৃহৎ জটিল জৈব অণুগুলি। আর পরিবেশের বিশেষ প্রভাবে শুধু ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড গোষ্ঠীর মধ্যেই জাগে সেই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা। পরবর্তী দুশত কোটি বছরের বেশী কাল তারা সেই ক্ষমতাটি ধরে রেখেছে ঐ গঠন বৈচিত্র্য গুনেই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কেবল নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থেকেই অনুরূপ আর একটি নিউক্লিয়িক অ্যাসিড অণুর জন্ম হয়েছে বা তাদের তৈরী একটি জিন থেকে অনুরূপ আর একটি জিন এবং একইভাবে একটি জীবন থেকে আর একটি জীবনের উৎপত্তি হয়ে চলেছে। অন্য কোন উপায়ে সাধারণভাবে অর্থাৎ অন্য কোন জড় উপাদান থেকে হঠাৎ করে আর জীবনের সৃষ্টি হয় না বা জীবনের মৌল উপাদান ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (ডি. এন. এ., আর এন. এ) ও জিন প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না। সেইজন্যই পৃথিবীতে এদের আবির্ভাব বা প্রথম সৃষ্টিকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে বলা হয়। আর সেই আকস্মিক ঘটনায় অর্থাৎ জীবনের আদি উৎপত্তির মূলে কোন এক অলৌকিক শক্তির কথা কল্পনা করা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরেই। কিন্তু আসলে এতে অলৌকিকত্ব বলতে কিছুই নেই। প্রত্যেক পদার্থের যেমন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড গোষ্ঠীর মধ্যেও তেমনি বিশেষ গুণই হচ্ছে ঐ স্বয়ংক্রিয়তা। বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাদের সেই ধর্ম প্রকাশ পায়। আর সেই পরিবেশকে তারা নিজেরাই তৈরী করতে ও রক্ষা করতে পারে। না পারলে আবার জড়েই পরিণত হয়।

গুণধর বর্মণ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সভ্য / সভ্যাগণের নিকট বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আপনার সভ্য / সভ্যা হিসাবে 1979 সালের চাঁদার মেয়াদ ডিসেম্বর '79 শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী বছরের (1980) চাঁদা আগামী 20শে ফেব্রুয়ারী '80 মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এখানে উল্লেখ্য বিধি অনুযায়ী 20শে ফেব্রুয়ারী '80 মধ্যে কেহ চাঁদা জমা না দিলে তিনি পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞানীর সম্মান

(ক) নোবেল পুরস্কার :—

পদার্থবিদ্যা :

মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চৌম্বক বল, শক্তিশালী নিউক্লীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল—প্রকৃতিতে আমরা এই চাররকম বলের কথা জানি। আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ধরে প্রথম দুটি বলকে একটি ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা পারেন নি। পাকিস্তানের আবদুল সালাম, আমেরিকার দু'জন বিজ্ঞানী অধ্যাপক শেলডন গ্ল্যাসো এবং অধ্যাপক স্টিভেন্ ভিনবার্গ-এর গবেষণায় তড়িৎ-চৌম্বক বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বলকে একটি ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে; অর্থাৎ, তারা দেখিয়েছেন, ঐ দুটি বল একটি বলেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। এজন্য উপরিউক্ত তিনজন বিজ্ঞানীকে 1979 সালের পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক সালাম, পাকিস্তানের প্রথম পদার্থ বিজ্ঞানী যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। তিনি এখন লণ্ডনের ইমপিরিয়্যাল কলেজ অফ্ সায়েন্স্ এণ্ড টেকনোলজীর অধ্যক্ষ এবং ইটালীতে তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ।

রসায়ন :—

ইণ্ডিয়ানার অধ্যাপক হার্বার্ট ব্রাউন এবং পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক জর্জ উইটিগকে জৈবরসায়নে বোরণ এবং ফসফরাস যৌগের প্রয়োগের জন্য রসায়নে 1979 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক উইটিগ একজন বধির; তাঁর বয়স এখন 83।

ঔষধ এবং শারীর বিদ্যা :—

চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'টমোগ্রাফি'-র অবদানের জন্য ইংলণ্ডের ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার জি. হাউন্সফিল্ড এবং আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালান করম্যাককে ঔষধ এবং শারীরবিদ্যা বিভাগে 1979 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

দেহের অভ্যন্তরে কোন অংশের বহু এক্স্-রে ছবি তুলে সেগুলিকে গাণিতিক উপায়ে সংযুক্ত করে অংশটির একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তোলার পদ্ধতিই হল টমোগ্রাফি। এর তাত্ত্বিক উদ্ভাবক হলেন অধ্যাপক করম্যাক্ এবং সেই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেন হাউন্সফিল্ড। এই যন্ত্র এখন পৃথিবীর বহু উন্নতদেশের হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের 45তম বার্ষিক সম্মেলনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের জন্য নিম্নলিখিত ভারতীয় বিজ্ঞানীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে :—

জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি পুরস্কার—

(বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়নের অধ্যক্ষ ডঃ ডি. পি. বড়ুয়া)। বিষয়—আণবিক জীববিদ্যা।

চন্দ্রকোলা হোরা স্মৃতি পুরস্কার—

ডঃ ভি. জি. ঝিনগ্রাম (ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধিকর্তা) বিষয়—ভারতে মৎস্য চাষের উন্নয়ণ।

ডি. এন ওয়াদিয়া স্মৃতি পুরস্কার—

ডঃ জে. বি আউডেন। বিষয়—ভূ-বিজ্ঞান।

সি. ভি রামন স্মৃতি পুরস্কার—

ডঃ সেলিম মৈজুদ্দিন আব্দুল আলি। বিষয়—পক্ষীতত্ত্ব।

বাসাম্বর নাথ চোপরা স্মৃতি বক্তৃতা পুরস্কার—

ডঃ এ. জি. দত্ত (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন) বিষয়-জৈব জারণ প্রক্রিয়া।

[প্রতিবেদক—যুগলকান্তি রায়]

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ

জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

দ্বিতীয় ষান্মাসিক সূচীপত্র

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ ঃ জুলাই—ডিসেম্বর
1979

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006
ফোন-55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1979

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক লেখকসূচী

জুলাই থেকে ডিসেম্বর—1979

চিত্র-সূচী

আমাদের সংস্কৃতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ ংগ্রামে সামিল হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে াইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, ানন্দে-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই কান ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান, নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।
সব রকমের প্ররোচনা ও চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জনসাধারণের শত্রু

ই. সি. এ. ২৬০৪৪।৭৯

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ দান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত এ গ্রন্থাগারে আসেন। এ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। গত বছরের বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 12, ডিসেম্বর, 1979

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

দ্বাত্রিংশত্তম বর্ষ ডিসেম্বর, 1979 দ্বাদশ সংখ্যা

ধোঁয়াশা : একটি শহুরে সমস্যা

জয়ন্ত বসু

শীতের রাতে শহর কলকাতা একটা নোংরা চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে থাকে। এই চাদরের নাম ধোঁয়াশা। ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলিয়ে এর সৃষ্টি। ইংরেজিতে বলে smog (smoke+fog)। ধোঁয়াশা কেবল কলকাতারই পরিবেশকে দূষিত করে না, পৃথিবীর বহু শহরেরই এটি এক অন্যতম সমস্যা। লণ্ডন, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি শহরে শীতকালে কখনো কখনো এমন ধোঁয়াশা হয় যে, পাশের লোককে পর্যন্ত ভাল ভাবে দেখা যায় না, যানবাহন চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণতঃ রাতের দিকেই এর দাপট বেশি। আমেরিকার লস এঞ্জেলস্ শহরে আবার ধোঁয়াশার প্রাবল্য দেখা দেয় দিনদুপুরে অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে।

ধোঁয়াশা যে শুধুমাত্র মানুষের জীবনযাত্রাকে সাময়িক ভাবে স্তিমিত করে দেয়, তা নয়, মানুষের জীবনের উপরও এর অশুভ দৃষ্টি রয়েছে। ধোঁয়াশার ফলে ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। ধোঁয়াশার পরিবেশে যাঁরা অনেক দিন থাকেন, শ্বাস প্রশ্বাসের রোগে তাঁদের মধ্যে মৃত্যুর হার সাধারণের চেয়ে বেশি। মানুষের পাকস্থলীও ধোঁয়াশায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধোঁয়াশা চোখের পক্ষে কষ্টদায়ক। কেবল প্রাণীর পক্ষে নয়, উদ্ভিদের পক্ষেও ধোঁয়াশা ক্ষতিকারক। আবার এর প্রভাবে রবার, ধাতব দ্রব্য ইত্যাদিও ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ধোঁয়াশা মূলতঃ একটি শহুরে সমস্যা। কল-কারখানার চুল্লী থেকে, হাজার হাজার বাড়ির উনান থেকে এবং বাস, লরী, মোটরগাড়ি প্রভৃতির এঞ্জিন থেকে যে রাশি রাশি ধোঁয়া ক্রমাগত শহরের বায়ু-মণ্ডলে মিশছে, তারই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা কুয়াশার

জলকণার সঙ্গে মিলে ধোঁয়াশার উৎপত্তি করে। এর মূলে প্রধানতঃ রয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর দহন। কয়লার কার্বনের দহন যদি সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতিকর কালোধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ দহনের ক্ষেত্রে ধোঁয়ার দৌরাত্ম্য কমলেও কয়লার ভিতরের অদাহ্য পদার্থ উড়ন্ত ভস্ম (fly ash) রূপে বায়ুতে মেশে। সব রকম কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানীর মধ্যে যে গন্ধক থাকে, তা দহনের ফলে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে বায়ুতে নির্গত হয়। (অনেক ধাতুর নিষ্কাশনেও সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়)। এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে সালফিউরিক অ্যাসিড বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প জীবজগতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক, ধাতু ও পাথরেরও এ ক্ষয় সাধন করে।

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে ধোঁয়াশা সম্পর্কে বিশদ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে, ধোঁয়াশার উপাদান নানা-রকমের হতে পারে—যেমন, বিভিন্ন জৈব পদার্থ, কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ও গন্ধকের বিভিন্ন যৌগ, ধাতব অক্সাইড ও ক্লোরাইড, ওজোন ইত্যাদি। ধোঁয়ার যে সব পদার্থ থাকে, সেগুলির কয়েকটি আবার আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শে বা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে নতুন পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং সেই নতুন পদার্থগুলিও ধোঁয়াশার উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে উন্নত দেশগুলিতে ধোঁয়ার বিভিন্ন উৎসকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে ধোঁয়াশার প্রকোপ কমানোর চেষ্টা চলছে।

আমাদের দেশে ধোঁয়াশার বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত কম। কলকাতার মত শহরে ধোঁয়াশা কমা দূরের কথা, ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ধোঁয়াশার প্রকৃতি, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন রকম উল্লেখযোগ্য চেষ্টা ভারতের কোন শহরে হয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই, অথচ ধোঁয়াশা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে এটাই হল প্রথম বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, সব শহরের ধোঁয়াশা এক ধরনের নয়—এজন্য আলাদা আলাদা ভাবে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বস্তুতঃ ধোঁয়াশা তথা বায়ু দূষণের সমস্যাই কেবল নয়, আমাদের দেশের শহরগুলিতে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত যে নানান সমস্যা রয়েছে, সেগুলির সমাধানে বিজ্ঞানকে খুব কমই কাজে লাগানো হচ্ছে। আমরা আজকাল প্রায়ই একটা কথা শুনি যে, বিজ্ঞানকে গ্রামে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ শহরে যেন বিজ্ঞানের প্রয়োগ যথেষ্ট হচ্ছে, এখন শুধু গ্রামে বিজ্ঞানের দীপ জ্বালাতে পারলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়! আধুনিক বিজ্ঞানের যতটুকু সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে পাওয়া যায়, তারই বা কতটুকু পান কলকাতার মত শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ? আসলে প্রশ্নটা শহর বনাম গ্রামের নয়, প্রশ্নটা শহর এবং গ্রামে বিজ্ঞানকে সমাজমুখী করে তোলার। অবশ্য সামাজিক ব্যবস্থারও এমন পরিবর্তন দরকার যাতে সমাজও সত্যিকারের বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে।

আধুনিক শিল্প-নির্ভর সভ্যতার যুগে শহরের সংখ্যা বাড়ছে, শহরের গুরুত্বও বাড়ছে। অনেক গ্রাম ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠছে আধা-শহর, যেগুলির আমরা হয়তো নামকরণ করতে পারি 'গ্রাহর' (গ্রাম+শহর)। এই সব জায়গাতেও ধোঁয়াশার মত নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। গ্রাম থেকে গ্রাহরে অথবা গ্রাহর থেকে শহরে রূপান্তরে বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিকল্পনার দরকার।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান এখনো অনেকটা সৌখীন বাবুর মত, ধূলা কাদা বাঁচিয়ে কিছু ভাল ভাল বুলি আউড়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরে, গ্রাহরে, গ্রামে—সর্বত্রই একে একেবারে কঠিন বাস্তবের উপর দাঁড় করানো দরকার, দরকার নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে সরিয়ে এনে নিরলস কর্মযজ্ঞে শামিল করে দেওয়ার।

পরাগ সংযোগে মৌমাছি

স্বপন চক্রবর্তী*

[কৃষিকার্যে মৌমাছির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে মৌমাছির ন্যায় উপকারী কীটপতঙ্গের কথা চিন্তা করে কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে শতর্ক করা হয়েছে।]

গাছে ফুল ফোটে, ফুল ঝরে গেলে দেখা যায় ফল ; আর সেই ফল থেকে পাওয়া যায় বীজ। এখন প্রশ্ন, ফলটা ফুল থেকে হয় কি করে?—পুংফুলের রেণুর সঙ্গে স্ত্রীফুলের ডিম্বাণুর মিলনেই ফল জন্মায়। কোন মাধ্যম ছাড়া এই মিলন সম্ভব নয়। মাধ্যমগুলি অনেক রকমের হতে পারে। যেমন—বাতাস, জল, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।

পরাগ সংযোগ আবার দুইরকমের—(1) আত্ম পরাগ সংযোগ (self pollination) (2) সঙ্কর পরাগ সংযোগ (cross pollination)। যদি একই জাতীয় কোন ফুলের পুংকেশর থেকে পরাগরেণু ঐ ফুলের গর্ভমুণ্ডে বা একই জাতীয় গাছের অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে তাহলে সেখানে আত্মপরাগ সংযোগ ঘটে। আর একই পরিবারভুক্ত উদ্ভিদের একশ্রেণীর গাছের ফুলের পরাগরেণু যদি অন্য শ্রেণীর গাছের স্ত্রী অংশে মিলিত হয় তাহলে তাকে সঙ্কর পরাগ সংযোগ বলা হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সঙ্কর পরাগ সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত গাছের সতেজতা, উচ্চতা, ওজন ইত্যাদি আত্ম পরাগ সংযোগের দ্বারা উদ্ভূত গাছের তুলনায় অনেক বেশী হয় এবং ঐসব গাছে প্রচুর ফল আসে। তবে এটা প্রমাণিত যে আত্মপরাগ সংযোগের তুলনায় গাছে সঙ্কর পরাগ সংযোগ বেশী হয়ে থাকে। আর সঙ্কর পরাগ সংযোগের বেশীর ভাগটাই সংঘটিত হয় কীট-পতঙ্গদের দ্বারা।

পৃথিবীতে পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের সংখ্যা কম নয়, তবুও তাদের মধ্যে মৌমাছি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কৃষিকাযে মৌমাছি একটা বিরাট সম্ভাবনাময় দিক খুলে দিয়েছে। এদের দিয়ে পরাগ সংযোগ ঘটালে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়, যেগুলি অন্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

(1) মৌমাছি একটি সামাজিক জীব। তাই অধিক সংখ্যক মৌমাছিকে আমরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে অতি সহজে আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারি। এতে প্রধান সুবিধা—এদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। শীতকালে অন্যান্য পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গরা যখন শীতঘুমে ব্যস্ত থাকে তখন মৌমাছিরা থাকে সবচেয়ে ব্যস্ত। ফলে পরাগ সংযোগে অন্যান্য পতঙ্গ প্রকৃতিতে কম থাকলেও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। মৌমাছির একমাত্র খাবার পরাগ এবং মধু যা একমাত্র ফুলেই পাওয়া যায়। তাই তারা জীবনধারনের তাগিদে ফুলে যেতে বাধ্য হয়। ফলে পরাগ সংযোগ প্রাকৃতিক পরিবেশেই ঘটে।

মৌমাছি একই সময়ে একই জাতীয় ফুলের উপরে

*গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট পোঃ খাঁটুরা, জিলা-24 পরগণা

আনাগোনা করে, ফলে পরাগকণা নষ্ট হয় না। যেমন, ধরা যাক—কোন একটা প্রজাপতি দিনের প্রথমে একটি কুমড়ো ফুলে বসল এবং তার থেকে পুষ্পরস নিল। পুষ্পরস নেওয়ার সময় প্রজাপতির পা এবং গায়ের বিভিন্ন জায়গায় পরাগরেণু লেগে গেল। এবার প্রজাপতি পাশেই একটা সীম ফুলে বসল এবং ঐ ফুলে কুমড়ো ফুলের পরাগরেণু লাগিয়ে দিল। এর ফলে ঐ সীম ফুলটার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু একটা মৌমাছি দিনের প্রথমে যদি কোন কুমড়ো ফুল থেকে পুষ্পরস এবং পরাগ সংগ্রহ করে তবে সে দিনের শেষ সময়টি পর্যন্ত কুমড়ো ফুল থেকেই পুষ্পরস ও পরাগ সংগ্রহ করবে। কোন রমক প্রলোভনেই সে অন্য ফুলে যাবে না। এর ফলে পরাগ আদান-প্রদান হয় খুব সুন্দরভাবে। অন্যান্য পতঙ্গদের মত মৌমাছির সঞ্চয় প্রবৃত্তি সীমিত নয়। তারা ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য মজুত করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে যে পর্যন্ত পুষ্পরস ও পরাগ পাওয়া যায় তা আহরণ করতে থাকে। আর এর ফলে মৌমাছিদের কাছ থেকে উপজাত (bi-product) পদার্থ হিসাবে মধু পাওয়া যায়। আর এই মধুটা এরা তৈরি করে উদ্বৃত্ত পরাগ এবং পুষ্পরস থেকে। এই সংগ্রহের জন্য পরাগ সংযোগের কোন রকম অসুবিধা দেখা দেয় না। মৌমাছির দেহ একপ্রকার সূক্ষ্ম লোমে ঢাকা থাকে। তাই দেহস্থিত লোমের সাহায্যে পরাগ সংযোগ সুন্দরভাবে সাধিত হয়। তাছাড়া মৌমাছির দেহের গড়নটাও সুন্দর পরাগ সংযোগের অনুকূল। মৌমাছির মুখে কোন ধারালো অংশ নেই। ফলে পাতা কাটা মাছি বা অন্যান্যদের মত এদের থেকে ফুলের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে না। মৌমাছিরা ফুলের মধ্যে কোন রোগজীবাণু ছড়াতে পারে না।

মৌমাছির দ্বারা সুষ্ঠু সঙ্কর পরাগ সংযোগের ফলে ফলশস্যের সংখ্যা, আকৃতি, ওজন ও স্বাদ বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তৈলবীজ জাতীয় শস্য বা ফলের ক্ষেত্রে সঙ্কর পরাগ সংযোগের ফলে বীজ পুষ্ট হয় ও তেলের পরিমাণ অনেক বেশী হয়। সাধারণতঃ সূর্যমুখী ফুলে সঙ্কর পরাগ সংযোগ না হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দানা জন্মায় না। যা জন্মায় তাতে তেলের ভাগ খুবই কম থাকে এবং বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় না। মৌমাছির দ্বারা পরাগ সংযোগের ফলে দেখা গেছে যে শতকরা 85 ভাগ বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে থাকে।

এই আলোচনা থেকে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়েছে যে আধুনিক কৃষিকার্য এবং মৌমাছি পরস্পর পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল।

আমাদের দেশের আধুনিক কৃষিজীবীরা বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদে অভ্যস্ত হচ্ছেন। মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা জমিতে বিভিন্ন রকমের সার ব্যবহার করছেন আবার উন্নত দেশের মত তারা ফলশস্য রক্ষার জন্য জমিতে কীট নাশক বিষাক্ত ওষুধও ছড়াচ্ছেন। এতে অপকারী পতঙ্গদের সঙ্গে মৌমাছির মত উপকারী পতঙ্গরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একথাটা সম্পূর্ণ সত্য যে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগ বন্ধ করা যাবে না এবং তা উন্নত মানের কৃষিতে যুক্তিযুক্তও নয়। এ ব্যাপারে মৌমাছিকে বাঁচাতে হলে মৌমাছি পালকদের (Bee Keeper) সঙ্গে কৃষকদের একটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের বোঝাতে হবে যে এতে উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষিতের হার বেশী এবং শিক্ষিতরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত বলে এ ব্যাপারে তারা যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন, এটা স্বাভাবিক। সেখানে কীটনাশক ওষুধগুলি বাজারে ছাড়ার আগে চিন্তা করা হয় যেন সেটা মৌমাছি এবং উপকারী পতঙ্গদের ক্ষতি করতে না পারে। আর যদিও ওষুধটি মৌমাছির পক্ষে ক্ষতিকর হয় তবে সেই ওষুধ জমিতে এমন সময়ে প্রয়োগ করা হয় যাতে মৌমাছি ও অন্যান্য উপকারী পতঙ্গদের কোন ক্ষতি না হয়। আর একটা কথা, আধুনিক কৃষিকার্যে কীটনাশক ওষুধের প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য তেমনি মৌমাছি ও অন্যান্য উপকারী পতঙ্গদের জীবনরক্ষাটাও কৃষকদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি উপকারী পতঙ্গদের কথা চিন্তা না করে কীটনাশক দ্রব্যাদির প্রয়োগ বহুল পরিমাণে বাড়ানো হয় তবে শুধু মৌমাছির মত উপকারী পতঙ্গদেরই শেষ করা হবে না—সেই সঙ্গে ক্ষতি করা হবে জাতীয় সম্পদকে।

হিলিয়ামের সন্ধানে

সন্তোষকুমার ঘোড়ই *

[হিলিয়ামের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন উৎস এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে। ভারতের কেরালায় যে বিপুল পরিমাণ মোনাজাইট বালি আছে, তা থেকে কিভাবে হিলিয়াম সংগ্রহ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

অতি নিম্ন উষ্ণতার জগতে (অন্যভাবে বললে অতিপরিবাহী ও অতিতারল্যের জগতে) হিলিয়াম অতিপরিচিত এবং একান্ত আবশ্যক একটি গ্যাস। হিলিয়াম বাতি তৈরিতে, নিউক্লীয় রিয়াক্টরে আচ্ছাদক গ্যাস হিসেবে, সূক্ষ্মছিদ্র নির্ণয়ে, মহাকাশ যাত্রায়, বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় বেলুন উড়ানোর ক্ষেত্রে (হিলিয়াম গ্যাস হাল্কা অথচ অদাহ্য এবং আপাত নিষ্ক্রিয়তাই) হিলিয়াম আধুনিক বিজ্ঞানে একক ভূমিকা পালন করে। ভারতবর্ষের কথা ধরা যাক। মাত্র পনেরো বছর হল প্রকৃত অর্থে নিম্ন উষ্ণতা সংক্রান্ত পদার্থ বিদ্যার কিংবা ক্রায়োজেনিক (Cryo-cold ; genies-production) গবেষণা শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে এই গবেষণার কাজে ভারতবর্ষে বছরে লাগছে 2,000NM³ গ্যাস। আর নিউক্লীয় গবেষণাগারে বর্তমানে বছরে লাগছে 10,000NM³ গ্যাস। (NM³ এককটি হল সাধারণ উষ্ণতায় (0°C) এবং চাপে (76 সে.মি. পারদ) ঘনমিটারে গ্যাসের আয়তন)। এখনও পর্যন্ত হিলিয়াম গ্যাসের সবটাই বিদেশ থেকে (আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ইত্যাদি) আমদানি করতে হচ্ছে। একটি 6NM³ গ্যাস সিলিণ্ডারের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু'হাজার টাকা। অতএব, সহজেই বোঝা যায় আমাদের মত অর্ধভুখ গরীব দেশে থেকে কেবলমাত্র এজন্য কি পরিমাণ টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে। কোন্‌টা আগে বা কোন্‌টা পরে এ বিতর্কে না গিয়ে, দেখা যাক, বিদেশ থেকে আমদানি না করে আমাদের দেশেই কিভাবে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন উৎস

পৃথিবীতে এখন সবচেয়ে বেশী পরিমাণ হিলিয়াম সংগ্রহ করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাসে 0.5% বা তারও বেশী হিলিয়াম গ্যাস থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় দুভাবে--(1) শুকনো কূপ থেকে, অর্থাৎ যা থেকে কেবল গ্যাস পাওয়া যায় কিন্তু পেট্রোল বা ঐ জাতীয় কোন তরল পাওয়া যায় না। (2) তরল কূপ থেকে—তরল প্রাকৃতিক পেট্রোলের সঙ্গে মিথেন (দাহ্য), কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি গ্যাস পাওয়া যায়। প্রথমশ্রেণীর কূপ থেকে যে প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গত হয়, তাতে মিথেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে হিলিয়াম গ্যাসও থাকে। এধরণের প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে জ্বালানী গ্যাস (মিথেন ইত্যাদি) সংগ্রহকালে হিলিয়াম গ্যাসকেও আলাদা ভাবে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে এটাই হল হিলিয়াম সংগ্রহের প্রধান উৎস।

উষ্ণপ্রস্রবণেও হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে বক্রেশ্বরের উষ্ণপ্রস্রবণে যে প্রাকৃতিক গ্যাস বেরোয়, তাতে হিলিয়ামের পরিমাণ 3%-এর মত। অন্যান্য যে সব গ্যাস থাকে, সেগুলির মধ্যে

* ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার, আই, আই, টি, খড়গপুর।

উল্লেখযোগ্য হল কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, জলীয় বাষ্প। মিথেন প্রভৃতি জ্বালানী গ্যাস না থাকায় কেবলমাত্র হিলিয়াম সংগ্রহের জন্য বক্রেশ্বরে একটি বড় আকারের প্রকল্প গ্রহণ নাকি ব্যয়বহুল এটাই হল তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যাই হোক অন্য একটি প্রচলিত পদ্ধতি হল—বায়ু তরলীকরণ যন্ত্র থেকে নির্গত হিলিয়াম, নিয়ন এবং নাইট্রোজেন গ্যাসমিশ্রণ থেকে হিলিয়াম'কে আলাদা করা। কিন্তু এটিও একটি কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা। তাছাড়া এভাবে পাওয়া হিলিয়ামের পরিমাণও বেশ কম। সুতরাং ভারতবর্ষে এসব পদ্ধতি গ্রহণ করে হিলিয়াম সংগ্রহ সম্ভবতঃ অচল।

মোনাজাইট বালি থেকে হিলিয়াম কেরালায় বিশেষ একটি অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ একধরণের রোগ। অনুসন্ধানে জানাগেছে, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বালুরাশি এই রোগের জন্য দায়ী। এইসব বালিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকায়--তেজস্ক্রিয়তার দরুণ এই রোগসৃষ্টি। বিরল মৃত্তিকা গোষ্ঠী (rare earthes), থোরিয়াম, ইউরেনিয়ামের ফসফেট যৌগ সম্বলিত এই ধরণের বালির নাম মোনাজাইট বালি (monazite Sand)। এই মোনাজাইট বালি প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে হিলিয়াম উৎসের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। এ থেকে স্বল্পব্যয়ে হিলিয়াম নিষ্কাশন সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, কামেরলিং অনেস্ (Kamerlingh Onnes) প্রথম যে হিলিয়াম গ্যাস তরলীভূত করেন,—তা ভারতবর্ষ থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। সেই গ্যাস এই মোনাজাইট বালি থেকেই নিষ্কাষণ করা হয়েছিল।

মোনাজাইটে হিলিয়ামের উপস্থিতি প্রথম ধরা পড়ে 1897 সালের কাছাকাছি সময়ে। বিদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে সহজে হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে বলে আজ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মোনাজাইটের উপর নজর দেন নি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে কস্টিক সোডা প্রয়োগে এক গ্রাম মোনাজাইট থেকে 0·8 ঘন সেন্টিমিটার হিলিয়াম পাওয়া সম্ভব। এখন বিরল মৃত্তিকাগোষ্ঠী, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম মৌলগুলি মোনাজাইট থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই দায়ীত্ব গ্রহণ করেছে—'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ লিমিটেড কোং'। বর্তমানে এই কোম্পানীর প্রধান প্রকল্পটির সঙ্গে হিলিয়াম সংগ্রহ গৌণ প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে। মোনাজাইট থেকে হিলিয়াম সংগ্রহ পদ্ধতিটি পরপৃষ্ঠায় নক্সা যোগে সংক্ষেপে দেখানো হল।

ভারতবর্ষে মোনাজাইট বালির ভাণ্ডার বিশাল। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করে বাইরের দেশ তাদের মূলধন ও লভ্যাংশ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের কারিগরি জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত, যোগ্য কর্মীরও অভাব নেই। তাই পরমুখাপেক্ষী না হয়ে এখন সময় এসেছে—দেশের প্রয়োজনে নিজেদের উৎসকে সঠিকভাবে সদ্ব্যবহার করার। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বছরে কমপক্ষে 2500NM³ হিলিয়াম গ্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব। এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ ও উদ্যোগ দেশের হিলিয়াম চাহিদা মেটাতে একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে।

বিক্রিয়া পাত্র			
কস্টিক সোডা + মোনাজাইট বালি 140°C-এ 9 ঘণ্টা রাখা হয়	ফেনা পৃথকীকরণ ব্যবস্থা (foam Separator)	ঘনীভবন ব্যবস্থা (Condenser)	অপরিশোধিত গ্যাস He 30%, H_2-2%
গ্যাসধারক (gas holder)	সংনমন যন্ত্র 200 কে.জি. / বর্গ সে.মি.	De-oxo শোধক হাইড্রোজেন অপসারণ করে।	
তরল নাইট্রোজেন দ্বারা শোধন (O_2, N_2—ঘনীভূত হয়)			
গ্যাস শোষক	বিশুদ্ধ হিলিয়াম গ্যাস (99·9%)		

1নং চিত্র—মোনাজাইট বালি থেকে হিলিয়াম সংগ্রহের পদ্ধতি

বিজ্ঞান ও সমাজ

হিজলি টাইডেল ক্যানেল

অসিত বরণ চট্টোপাধ্যায়*

[হিজলি টাইডেল ক্যানেল বর্তমানে একটি স্থানীয় সমস্যা, এককালে এ ক্যানেল নাব্য ছিল এবং জলসেচের ব্যবস্থা করতো। এখন এ নাব্যতা হারিয়েছে, তার সঙ্গে জল সেচ ব্যবস্থাও বন্ধ হয়েছে কেননা রূপনারায়ণের ও হলদি নদীর মুখ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন—এই ক্যানেলের সংস্কার।]

এখনকার কালের না হলেও ইতিহাসের কাল থেকে হিজলি টাইডেল ক্যানেল-কুলে কুলীন। উড়িষ্যা কোষ্ট ক্যানেলের সঙ্গে মিশে বাঙলা উড়িষ্যার পণ্য বাহিত হত এর বুকের উপর দিয়ে। স্থল পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখন আর এ পথে পণ্য চলাচল করে না। তা ছাড়া হিজলি টাইডেল ক্যানেলের এখন এত জীর্ণদশা, পণ্য বহন দূরের কথা একটা জেলে ডিঙিও চলবে না এর সংকীর্ণ জলনালি দিয়ে। অথচ ইতিহাস বলে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডি. এল. রায়, এঁরা এই ক্যানেলের উপর দিয়েই কলকাতা-কাঁথি যাতায়াত করেছেন। আমরা দেখেছি, মহাত্মা গান্ধীর লঞ্চ এসে ভিড়লো এই ক্যানেলের মাঝ বরাবর একটা জায়গায়—মহিষাদলে। সেখানে নেমে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করেছিলেন।

আজ এই ক্যানেল সংস্কার অভাবে যে কোন ছোট খালের থেকেও স্বল্প-পরিসর। এপার ওপার যাওয়ার জন্য রূপনারায়ণ থেকে হলদি নদী প্রায় বারো মাইল দীর্ঘ ক্যানেলের বুকে ছয় সাতখানা খেয়া থাকতো, সেখানে যত্র তত্র বাঁশের সাঁকো তৈরি হয়ে গেছে। গত বছর কর্তাব্যক্তিদের দয়ায় রূপনারায়ণের মুখ ও হলদির মুখ সম্ভবত চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পলি পড়ে পড়ে অগভীর হয়ে যাওয়া ক্যানেলের পণ্যবহন যোগ্যতা ফিরে আসবে কিনা আর তা ফিরিয়ে আনতে হলে যে খরচ হবে তার চেয়ে বর্তমান ব্যবস্থায় পণ্য চলাচল অধিকতর লাভজনক কিনা তা হিসেব বিশারদেরা ভেবে দেখুন কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বার মাইল দীর্ঘ ক্যানেলের দু-পাশে ত্রিশ চল্লিশখানা গ্রামের জল নিকাশের ব্যবস্থাটা কি হবে? এই গ্রামগুলির জল নিকাশ এবং চাষের প্রয়োজনে জল নেওয়ার জন্য দুই পাড়ে মিলে কম করে হলেও আট দশটি স্লুইশ গেটের ব্যবস্থা ছিল। এই স্লুইশ থেকে ছোট বড় খাল একেবারে গ্রামের ভিতরের নানা খালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল বের করে দেওয়ার ও নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলি এখন অকেজো। আজ যদি প্রবল বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলে ঘটে থাকে তবে জলনিকাশের অভাবে ডুবে বা পচে মরতে হবে। তা ছাড়া নদী থেকে উঠে আসা জোয়ার জলের কল্যাণে স্থানীয় চাষের জমি স্বাভাবিকভাবে উর্বরতা বজায় রাখতো সমস্ত কৃষককে নতুন করে ভাবতে হবে। অনেকে বলেন—এই ক্যানেল থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে গাড়ুঘাটা খাল এবং পূবে মধ্যহুগলিয়ার খালদুটিকে ভাল করে সংস্কার করা হয়েছে যার ফলে ক্যানেলের কাজ এই দুটি খালই করতে পারবে। অর্থাৎ জলের যে গতি পূর্ব দিকে ছিল তা পশ্চিম দিকে বা পশ্চিম

* মহিষাদল, মেদিনীপুর

দিকে ছিল তা পূর্ব দিক দিয়ে হবে। এটা কি সম্ভব ? এ বছর বৃষ্টি এতদঞ্চলে কম। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ক্যানেল থেকে জোয়ার তুলে এখানের চাষআবাদের কাজ হয়েছে। কোন বছরই আবাদ-শূন্য জমি পড়ে থাকে নি। এখন তারও সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

অতএব ক্যানেলটার গুরুত্ব ফুরিয়ে গেছে ভেবে যাঁরা এঁকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন তাঁরা আর একবার ভেবে দেখুন। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দূরদৃষ্টির সহায়তায় একে বাঁচিয়ে তুলুন। তাতে চল্লিশ পঞ্চাশটি গ্রামের পঞ্চাশ ষাট হাজার অধিবাসীর আতঙ্ক মুক্তির ব্যবস্থা হবে।

ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরুপণ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়*

প্রতিপাদ্য বিষয় :

[ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরূপণ পুরাতত্ত্বে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়। এই নিবন্ধে তার মূল সূত্র এবং ভারতবর্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।]

প্রাচীন বস্তুর সময় নিরুপণ পুরাতত্ত্বে এক বড় রকমের সমস্যা। সঠিক সময়কাল নির্ণয় করতে না পারলে উৎখনন মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এককালে ঐতিহাসিকেরা তুলনামূলক ভাবে বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে সময়কাল নিরুপণ করতেন। পরবর্তী কালে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সময়কাল ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরমাণু বিজ্ঞানী উইলার্ড এফ. লিবি তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্থায়িত্ব নিয়ে এক নুতন পদ্ধতি আবিস্কার করেন 1952 খৃষ্টাব্দে। এর ফলস্বরুপ 1960-তে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। আবিস্কারটি 'রেডিও কার্বন ডেকটিং নামে আজকের বিজ্ঞানী ও পুরাতাত্বিকদের কাছে সুপরিচিত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে আগ্রহী ব্যক্তিদের অবশ্যই জানতে হয় এর কার্য পদ্ধতির মূল সূত্র।

মূল সূত্র

মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণার সমষ্টি। পরমাণুর মূলধর্ম নির্ভর করে প্রোটন কণার সংখ্যার উপর। পারা আর সোনার মূল পার্থক্য আসলে এর প্রোটন এর সংখ্যা। যেন নিউট্রন এর সংখ্যা কম বেশী হলে পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হয়না, একই জাতীয় মৌলিক পদার্থের নিউট্রন সংখ্যার কম বেশী হলে সেগুলিকে ঐ মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপ বলা হয়। আইসোটোপগুলির নাম করনে সব সময়ে পারমাণবিক ভরের উল্লেখ করা হয়। মৌলিক পদার্থ কার্বন এর পরমাণুতে প্রোটন এর সংখ্যা 6, নিউট্রনের সংখ্যা 6 বা 8। এই হিসাবে এর দুটি আইসোটোপ রয়েছে কার্বন 12 এবং কার্বন-14। জীব জগতের মূল উপাদান কার্বন-12 সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদে রয়েছে।

*3A/2 এস. এন. ব্যানার্জি এভিনিউ, দুর্গাপুর-713204

কার্বন-14 আইসোটোপটি সাধারণ কার্বনের (কার্বন-12) সঙ্গে মিশে থাকলেও এটি কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরের নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মি বাহিত নিউট্রনের সংঘাতে সৃষ্ট নূতন পদার্থ। পারমানবিক বিক্রিয়াটি হয় এই ভাবে:- সাধারণ নাইট্রোজেন এর নিউক্লিয়াসে রয়েছে 7টি প্রোটন ও 7টি নিউট্রন (নাইট্রোজেন-14)। এর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ঐ নিউট্রন সংঘাতের ফলে নবজাত নিউক্লিয়াসে থাকছে 7টি প্রোটন এবং 8টি নিউট্রন (নাইট্রোজেন-15)। সৃষ্ট পদার্থটি অবশ্য তেজষ্ক্রিয় পদার্থ (অস্থায়ী)। এই নিউক্লিয়াস থেকে একটি প্রোটন স্বতস্ফুর্ত ভাবে বেরিয়ে গেলে এটি কার্বন 14 তে পরিণত হচ্ছে। এটিও তেজষ্ক্রিয় পদার্থ এবং বিকিরণের ফলে এর নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যায়।

তেজষ্ক্রিয় পদার্থের সময়কাল মাপার এক পদ্ধতি রয়েছে। এতে বলা যায় কত সময় পরে ঐ পদার্থের অর্ধেক ওজনের বস্তুর ভাঙ্গন হবে এটি পদার্থ বিজ্ঞানীদের ভাষায় অর্ধ আয়ুকাল বা হাফলাইফ। সাম্প্রতিক গবেষণায় এইচ. গডউইন (1962) এর অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে ঐ কার্বন-14-র অর্ধ আয়ুষ্কাল মোটামুটি ভাবে 5730 ± 40 বছর। এ থেকে বলা যায় 1 কিলোগ্রাম কার্বন-14 5730 বছর পরে $\frac{1}{2}$ কিলোগ্রাম কার্বন-14 তে পরিণত হবে। এখন কার্বন-14 এর নিউক্লিয়াস একটি বিটা কণিকা ত্যাগ করে, যা কিনা ওর নিউক্লিয়াসের একটি নিউট্রন কনিকা প্রোটনে পরিণত হবার সময় হয়। এর ফলে দেখা যাচ্ছে কার্বন-14 আবার নাইট্রোজেন-14 তে ফিরে যাচ্ছে। এর ফলে দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে সব সময়ই কার্বন-14র জন্ম মৃত্যু অব্যাহত রয়েছে।

কার্বনের ঐ আইসোটোপ দুটির অনুপাত কিন্তু সব সময়েই এক তবে সংখ্যাটি খুবই ছোট, মাত্র $1 \cdot 3 \times 10^{12}$। দুই জাতীয় কার্বন-ই অক্সিজেনের সঙ্গে জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। আলোক সংশ্লেষণের ফলে গাছের পাতায় সঞ্চিত হচ্ছে কার্বনের ঐ দুটি আইসোটোপই ঐ অনুপাতে। কাঠের ভেতরে বা প্রাণীদেহে উদ্ভিদ থেকে খাদ্যের মধ্য দিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে তার দেহে। গাছপালা বা প্রাণীর মৃত্যুর পর কিন্তু নূতন করে বাতাসে অবস্থিত তেজষ্ক্রিয় কার্বন-14 আর তার দেহে প্রবেশ করতে পারে না এবং দেহের সঞ্চিত তেজষ্ক্রিয় কার্বন অত্যন্ত ধীর গতিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে করতে থাকে

শত শত বছর পরেও যদি সেই জৈব বস্তুর অস্তিত্ব থাকে তবে দেখা যায় সেই আইসোটোপের অনুপাত আরো কমে গেছে। ভাঙ্গনের হার জানার জন্য অনুপাতের সঠিক মানের সঙ্গে তুলনা করে তার মৃত্যুর সময় জানা যাবে। উৎখননে কোনও স্তরের সময় নিরুপণের জন্য সেই স্তরে পাওয়া কাঠকয়লা, শস্য, অস্থি, বস্ত্র প্রভৃতিকে ঐ পদ্ধতির জন্য ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতি অনুধাবন করা অত্যন্ত জটিল। মোটামুটি ভাবে আবহাওয়ার সংস্পর্শে না এনে সংগৃহীত পুরাবস্তুর অংশ বিশেষকে দহনের ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড বা মিথেন গ্যাসে পরিণত করা হয়। পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে গ্যাস প্রোপোর্শনাল কাউন্টার (gas proportional counter) এ ঐ অনুপাতে মাপা হয়।

ভূতাত্ত্বিক শিলার সময়কাল নির্ণয়ের পদ্ধতি একটু আলাদা। তেজষ্ক্রিয় ইউরেনিয়াম কালে কালে সীসাতে পরিণত হয়। শিলা তরল অবস্থায় থাকলে উদ্ভূত সীসা আলাদা ভাবে জমে; কিন্তু গলিত শিলা যখনই কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন ইউরেনিয়াম ও উদ্ভূত সীসা এক সঙ্গে থাকে। অর্ধ আয়ুষ্কাল জানার জন্য ধাতু দুটির অনুপাত থেকে কবে শিলা তরল অবস্থা হারিয়েছে তা জানা যাবে।

পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ঐ নিরীক্ষণ করা হয় বলে এতে কিছু ত্রুটি আসে। যেমন, চার হাজার বছরের মত প্রাচীন বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ সময় কাল কম বেশী 100 বছরের মধ্যে থাকে। মহাকালের হিসাবে ঐ ত্রুটি নিতান্তই সামান্য।

ভারতে প্রয়োগ

এই পদ্ধতি আবিষ্কার হলে ঐতিহাসিক বস্তুর সময় নিরূপনে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ এর তৎকালীন ডাইরেক্টর বিশ্ববরণ্যে বিজ্ঞানী হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রথম দিকে ভারতের গুটিকয়েক প্রত্ন বস্তুকে বিদেশ পাঠানো হত। কিন্তু তাতে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় হওয়ায় ডঃ ভাবা ভারতের পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দূর করার জন্যে তাঁর গবেষণাগারে 'রেডিয়ো কার্বন ল্যাবরেটরী' গড়ে তোলেন। 1962তে সেই কাজ শুরু হয়। ঐ ল্যাবরেটরীতে পরিচালক হিসাবে ডক্টর ধর্মপাল আগরওয়ালকে ডঃ ভাবা নিয়োগ করেন। তিনি ও তাঁর সহযোগীদের প্রচেষ্টায় হাজার খানেক প্রত্ন নমুনার সময়কাল জানা যায়। ডঃ আগরওয়াল বর্তমানে পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট রেডিয়োকার্বন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। 1973তে ঐ গবেষণাগার স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে সেটি ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর অন্যতম বিভাগ। 'রেডিয়োকার্বন' পত্রিকায় তাঁদের গবেষণার ফল নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধ লেখার জন্য ডঃ ডি. সি. আগরওয়াল এর কাছে ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী।

বৈদ্যুতিকবাতির শতবর্ষ ও টমাস এডিসন

অরুণকুমার ঘোষ*

[বৈদ্যুতিক বাতির শতবর্ষ উপলক্ষে এই বাতির উদ্ভাবক টমাস এডিসনের বাল্যজীবন ও কর্মজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত হয়েছে। এই বাতি তৈরীর ইতিহাসও এখানে বিবৃত।]

বৈদ্যুতিক বাতির এটা শতবার্ষিকী বছর। একশ'বছর আগে 21শে অক্টোবর আমেরিকার টমাস আলভা এডিসন সফল বিদ্যুৎ-বাতি উদ্ভাবন করেছিলেন। শুধু বিদ্যুৎ-বাতি নয়, এডিসন আরও অনেক কিছু উদ্ভাবন করেছিলেন। কেবলমাত্র মার্কিনদেশে তিনি সারাজীবনে 1,093টি উদ্ভাবনের পেটেন্ট নিয়েছিলেন। তার মধ্যে তিনটি—ফনোগ্রাফ (গ্রামোফোন), বৈদ্যুতিক ও ভিটাস্কোপ (চলচ্চিত্র ক্যামেরা)—আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ বলা চলে। বৈদ্যুতিকবাতি তো অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য অঙ্গ।

আমেরিকার ওহায়ো প্রদেশের মিলান শহরে 1847 সালে এডিসনের জন্ম। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। বাবার একটা ছোটখাট করাতকল ছিল। মা স্কুলে পড়াতেন। কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষা টমাসের ভাল লাগল না। বুদ্ধিমতী মা ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। কিন্তু ছেলে ত' তেমন সুশীল সুবোধ বালক নন্! তাঁর মাথায় কখন কী দুষ্টুমি ভর করে, তার নাগাল পাওয়া মুশ্‌কিল। কী খেয়াল হল, একবার এক গোলাবাড়ীতে তিনি আগুন লাগিয়ে দিলেন। শাস্তিস্বরূপ তাঁকে সর্বসমক্ষে চাবুক মারা হলো। একবার মাছ ধরতে গিয়ে এক খালের জলে ডুবে যাবার মত হয়েছিল। আর একবার এডিসনকে সারাদিন খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন সন্ধান মিলল দেখা গেল তিনি মুরগীদের অনুকরণে ডিমে তা দিচ্ছেন। অসীম কৌতূহল ছেলের! খালি প্রশ্ন, এটা কেন, ওটা কেন। বাবা তিতিবিরক্ত। তাঁর ধারণা, ছেলে একটা আস্ত গাধা। মার ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অসীম স্নেহ ও অশেষ ধৈর্য নিয়ে ছেলের পড়াশুনা দেখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে এডিসন পরিবার মিশিগান প্রদেশের পোর্ট হিউরণ শহরে ডেরা বাঁধল। বারো বছর যখন বয়েস হল, টমাস ভাবলেন কিছু রোজগার করা যাক। পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু দেশটা ভারতবর্ষ নয়। সুতরাং বাবা-মার সানন্দ অনুমতি মিলল তিনি পোর্ট

* নেহেরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, বোম্বাই-18

হিউরন থেকে ডেট্রয়েট যাবার রেলপথে চকোলেট আর খবরের কাগজ বিক্রি শুরু করলেন ওইটুকু ছেলে হলে কি হয়, তাঁর ব্যবসাবুদ্ধি খুব পাকা। তিনি যাবার পথে বিভিন্ন স্টেশনে চাষীদের কাছ থেকে তাজা তরিতরকারি, ফলমূল কিনে ডেট্রয়টে বিক্রিও করতে লাগলেন। এইসব করে তখনকার দিনে মাসে শ'দেড়েক ডলার রোজগার হতে থাকল। টমাস দেখলেন, এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যখন গাড়ি যায়, তখন তাঁর কিছু করার থাকে না। তাই রেলকোম্পানিকে বলে কয়ে ব্রেকভ্যানের এক কোণে একটা ছোট ল্যাবরেটরী তৈরী করলেন। সেখানে তাঁর রসায়ন চর্চা শুরু হল। মা ছেলেকে বইপত্তর যোগাতে লাগলেন।

এইসময় একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনায় তাঁর জীবনের গতি বদলে গেল। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে মাউন্ট ক্লিমেন্স শহরের স্টেশন মাস্টারের শিশুপুত্রকে নিশ্চিত রেলগাড়ি-চাপা পড়ার হাত থেকে উদ্ধার করলেন। কৃতজ্ঞ স্টেশনমাস্টার তাঁকে টেলিগ্রাফযন্ত্রে বার্তা আদান-প্রদানের কাজ শেখালেন। 16 বছর বয়স্ক এডিসন টেলিগ্রাফ অপারেটারের কাজ পেলেন। এই কাজে তাঁকে প্রায় সারা আমেরিকা ঘুরে বেড়াতে হল। মিশিগানের ডেট্রয়েট, লুইসিয়ানার নিউ অর্লিয়েন্স, ওহায়োর সিনসিনাটি, ইণ্ডিয়ানাপোলিস, কেন্টাকির লুইস্‌ভিল, টেনেসির মেম্‌ফিস। অবশেষে 1868 সালে তিনি বস্টন শহরে বদলি হয়ে এলেন। বস্টন শহরের বুদ্ধিদীপ্ত আবহাওয়ায় এডিসন বিকশিত হয়ে উঠলেন। পুরানো বইয়ের দোকান থেকে মাইকেল ফ্যারাডের লেখা কিছু বই কিনে এনে গোগ্রাসে পড়তে শুরু করলেন। শুধু পড়ে ক্ষান্ত হবার পাত্র তিনি নন—অনেক পরীক্ষা নিজে করে দেখতে লাগলেন। বস্টন শহরের কোর্ট স্ট্রীটে তখন চার্লস উইলিয়ামস নামে এক ওস্তাদ কারিগর ছিলেন। তাঁর কাজ ছিল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করা। উইলিয়ামস পরবর্তীকালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের টেলিফোনও ড্রয়িং দেখে তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই উইলিয়ামসের সহায়তায় এডিসন নির্বাচনে ভোট গণনার জন্য একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করে পেটেন্ট নিলেন। দুঃখের ব্যাপার যন্ত্রটা সরকারী কর্তাদের পছন্দ হল না। ভগ্নহৃদয় এডিসন প্রতিজ্ঞা করলেন, ভবিষ্যতে চাহিদা সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হয়ে তবেই কোনও যন্ত্র তৈরি করবেন।

পরের বছর তিনি নিউইয়র্ক শহরে চলে এলেন। সেখানে মাসে 300 ডলার বেতনের একটা চাকরিও জুটে গেল। কাজ-টেলিগ্রাফ মেশিন সারানো। এডিসনের জীবনের তৃতীয় অধ্যায় শুরু হল। তিনি টেলিগ্রাফ সংক্রান্ত একটার পর একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করে চললেন। বছর দুয়েকের মধ্যে নিউজার্সির নিউ আর্ক শহরে একটা ছোটখাট কারখানা খুললেন। ইতিমধ্যে 1876 সালে আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন উদ্ভাবন করলেন। বেলের টেলিফোনে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রে ম্যাগনেটো সিস্টেম ছিল। এর প্রধান অসুবিধা ছিল যে দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে যেত। এডিসন বছর খানেকের মধ্যে টেলিফোন প্রেরক যন্ত্রের জন্য কার্বন মাইক্রোফোন উদ্ভাবন করে এই সমস্যার সমাধান করলেন।

1877 সালে এডিসন ফনোগ্রাফ উদ্ভাবন করলেন। যন্ত্রটা নিয়ে তিনি 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকার বন্ধু সম্পাদকের অফিসে যখন বাজিয়ে শোনাতে গেলেন, যন্ত্র দেখতে এত লোক ছুটে এল যে মেঝে ভেঙে পড়ার ভয়ে সম্পাদক প্রদর্শন বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাদারফোর্ড হেয়েস ফনোগ্রাফ বাজিয়ে শোনানোর জন্য এডিসনকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানালেন। এডিসনের ল্যাবরেটরী তখন নিউজার্সি প্রদেশের মেনলো পার্ক শহরে। এত লোক মেনলো পার্কে ফনোগ্রাফ দেখতে আসতে লাগলো যে, রেলকোম্পানী নিউইয়র্ক থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন চালাতে বাধ্য হলেন।

রাতারাতি সাধারণ মানুষের মধ্যে এডিসনের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

এরপর এডিসন বৈদ্যুতিকবাতি তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করতে মনস্থ করলেন। জেনারেটারের সাহায্যে তখন অল্পসল্প বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন হচ্ছে। তা দিয়ে মোটরের সাহায্যে পাম্প চলছে। বিদ্যুৎ-শক্তি দিয়ে আলো জ্বালাবার অনেক চেষ্টা চরিত্র চলছে বটে, কিন্তু সহজ কোনও পন্থার হদিশ মিলছে না।

সমসাময়িক শিল্পীর দৃষ্টিতে এডিসনের বিদ্যুৎবাতি উদ্ভাবন। বাতির পিছনে দণ্ডায়মান ব্যক্তিই এডিসন।

হামফ্রি ডেভী আর্ক-ল্যাম্পের উদ্ভাবন করেছেন, এখানে ওখানে কিছু আর্ক-ল্যাম্প লাগানোও হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাটা তেমন কারও মনঃপূত হচ্ছে না। আর্ক-ল্যাম্পের কার্বন বারবার ঠিকঠাক করতে হয়। আলোও বড় তীব্র—চোখে লাগে। আর্ক-ল্যাম্প ছাড়া আরও একটা জিনিস নিয়ে পরীক্ষা চলছিল। সেটা হল, ফিলামেন্ট ল্যাম্প। ফিলামেন্ট ল্যাম্পে বায়ুশূন্য কাঁচের আধারে একটা সূক্ষ্ম তারের ফিলামেন্ট থাকে। বিদ্যুৎ-শক্তির প্রভাবে ফিলামেন্ট গরম হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে। কিন্তু তখন ফিলামেন্ট ল্যাম্পে প্লাটিনাম ধাতুর তার লাগানো হত, তারও খুব সূক্ষ্ম হত না। ফলে তার দাম হত আকাশছোঁয়া। ল্যাম্পের আয়ু ছিল স্বল্প। দেখে শুনে এডিসনের মনে হল, আর্ক-ল্যাম্পের জনপ্রিয় হবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। বরং সস্তায় ফিলামেন্ট ল্যাম্প তৈরি করতে পারলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। 1878 সালের অক্টোবর মাসে তিনি 'এডিসন ইলেকট্রিক লাইট কোম্পানি' নামে বিধিবদ্ধ এক সংস্থা গড়ে কাজে নেমে পড়লেন।

শৃঙ্খলার সঙ্গে একের পর এক নানা ধাতুর তার, কার্বন-মাখানো নানা জিনিস—যথা বাঁশের তন্তু, মাথার চুল, কাগজের ফিতে ইত্যাদি—নিয়ে দিনের পর দিন পরীক্ষা চলল। দিন গেল, মাস গেল বছর ঘুরতে চলল। প্রায় দেড় হাজার রকমের বস্তু নিয়ে পরীক্ষা বিফল হল। সাফল্য আর আসে না। অবশেষে 1879 সালের 21 অক্টোবর কার্বন মাখানো একটা সাধারণ সুতোর তৈরি ফিলামেন্ট আকাঙ্খিত ফল দিল।

বৈদ্যুতিকবাতি তৈরি হল। এডিসনের নিশ্চয়ই যথেষ্ট আনন্দ হল। কিন্তু সেই আনন্দে মশগুল হয়ে কয়েক বছর কাটিয়ে দেবার পাত্র তিনি নন। একবছরের মধ্যে বৈদ্যুতিকবাতি তৈরির কারখানা গড়ে তুললেন। সেই কারখানার তৈরি পাঁচশো বিদ্যুত্‍বাতি তাঁর মেনলো পার্ক শহরের গবেষণাগারে লাগালেন। তখনকার দিনে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার ছিল সীমিত। তাই বিদ্যুৎ-বিভাজনের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ কেউ মাথা ঘামান নি। এডিসন ভেবেচিন্তে দেখলেন, প্যারালাল সার্কিট হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। সুইচ, ফিউজতারের সাহায্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ল্যাম্প হোল্ডার, মায় ব্ল্যাক টেপ—সব এডিসনের উদ্ভাবন। তাঁর ল্যাবরেটরীর আলো দেখতে রোজ প্রচুর জনসমাগম হতে লাগল। রেলকোম্পানি আবার নিউইয়র্ক থেকে স্পেশ্যাল ট্রেন চালালেন।

এবারে আবার জাহাজে করে ইয়োরোপ থেকে ইঞ্জিনীয়াররা এসে হাজির হলেন।

নানা লোকে নানা মন্তব্য করল। কেউ বলল, গ্যাসের শেয়ার বাজার মন্দা করার জন্য এটা একটা 'ইয়াঙ্কী ধাপ্পা'। এমন কি বিখ্যাত জার্মান ইঞ্জিনীয়ার ওয়ার্নার ফন সীমেন্স বিদ্রূপ করে বললেন, বৈদ্যুতিকবাতি গ্যাসের বাতির সঙ্গে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারবে না।

এডিসন বললেন, উদ্ভাবকের জীবন হল শতকরা এক ভাগ প্রেরণা (inspiration) আর শতকরা নিরানব্বই ভাগ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি (perspiration)। তিনি নিজে জীবনের অধিকাংশ সময় দিনে আঠারো ঘণ্টা পরিশ্রম করেছেন। সহকর্মীদেরও তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে উৎসাহ দিতেন। গবেষণাগারের বাছা বাছা কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁর 'ইন্‌সম্‌নিয়া স্কোয়াড' (insomnia squad)। 1931 সালে এডিসনের মৃত্যুমুহূর্তে কিছু অনুরাগী ভেবেছিলেন কয়েক মিনিটের জন্য সারা আমেরিকার বিদ্যুৎ-বাতি নিভিয়ে দিলে বোধহয় তাঁর স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো হবে। কিন্তু পরে তাঁরা উপলব্ধি করলেন, যে ব্যক্তি কর্মকে জীবনে সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, বিদ্যুৎবাতি বিরহিত কর্মহীনতায় তাঁর স্মৃতির প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শিত হবে

এডিসন জীবনে যতকিছু উদ্ভাবন করেছিলেন, তার প্রায় সবেরই পেটেন্ট নিয়েছিলেন। একটা আবিষ্কার সম্ভবতঃ তিনি নিজের অজ্ঞাতে করেছিলেন, কারণ তার পেটেন্ট নেন নি। সেটা হল, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পের সেতুবন্ধন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা—এরা যে একে অন্যের সম্পূরক, এই ব্যাপারটা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এ-ব্যাপারে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক জে. ডি. বার্নাল বলেছেন,

'The triumph of Edison marks the end of an era of the inventor and the beginning of a new one – that of directed scientific research in industry —which has gone from strength to strength in our own time. From now on the strands of industrial and scientific advance will be as closely mingled as they were before the dawn of civilization.'

(Science in History, Vol. 4, P. 1230, Pelican Edn, 1965)

লেখকদের প্রতি বিশেষ নিবেদন

প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে তা চাইনীজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাবেন এবং চিত্রে যদি সংখ্যা থাকে তবে আন্তর্জাতিক সংখ্যা (1, 2, 3 ইত্যাদি) ব্যবহার করবেন। প্রবন্ধের ভিতর চিত্র এঁকে পাঠাবেন না।

(সমালোচনা)

মাননীয়, সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান"

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞানে"র ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর 1979 সংখ্যায় শ্রীশিবরাম বেরা মহাশয়ের লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। ঐ সব প্রবন্ধে নদী সংস্কার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বেরা মহাশয়ের চিন্তা ধারা সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে বিশেষ অনুরোধ এসেছে। যেহেতু এই বন্যা সমস্যা নানারকম বিতর্কের সৃষ্টি করেছে ও দেশের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের জন সাধারণের মনে আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে চলেছে, মনে হয়, আমার ব্যক্তিগত মতামত আপনাদের জনপ্রিয় পত্রিকার মাধ্যমে সকলের কাছে নিবেদন করা আমার কর্তব্য। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই লেখার অবতারণা। জ্ঞান ও বিজ্ঞান মার্চ ও এপ্রিল 1979 সংখ্যায় বেরা মহাশয় "দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন" প্রবন্ধে দামোদর নদের বন্যা সমস্যা ও দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত ও অনেক তথ্য বহুল আলোচনা করেছেন।

প্রথম প্রবন্ধে (মার্চ পত্রাঙ্ক 184) ভুরডাইনের যে 10 লক্ষ কিউসেকের কথা বলা হয়েছে সেইটি ড্যাম ডিজাইনের Spillway ক্ষমতার জন্য প্রযোজ্য। জলধারের আয়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হয় প্রবাহিত সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার উচ্চতা কমানোর জন্য। 186 পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে, ঠিকই বলা হয়েছে যে বাঁধের জলধারগুলি সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে।" 2'50 লক্ষ কিউসেক বহন ক্ষমতার ইতিহাস এই যে 40এর দশকে ভুরডাইনকে বলা হয়েছিল যে দুর্গাপুরের নীচে দামোদরের তখনকার বহন ক্ষমতা 2,50,000 কিউসেক্স্। 2,50,000 কিউসেক জল নীচের দিকে কোন বন্যার সমস্যা দেখা দেবে না নদীপাড়ের বাঁধের ক্ষতি করবে না। অবশ্য বিগত 30/40 বৎসরে দামোদর নদের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দামোদর পরিকল্পনার জলাধার ছাড়াও নিম্ন দামোদরের বুকে অনেক অত্যাচার হয়েছে। সদরঘাটের নতুন সড়ক সেতু। নিম্নদামোদরের বুকে বাঁধ, দামোদরের তলভূমিতে (flood plain) চাষ আবাদ, ঘের বাঁধ, ঘর বাড়ী এমন কি ছোট খাট শিল্পও গড়ে উঠেছে। দামোদরের নীচের দিকে জল বহন ক্ষমতা এখন 1,00,000 কিউসেকেরও অনেক কম কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই দামোদর পরিকল্পনা নয়।

187 পৃষ্ঠায় শ্রীবেরা লিখেছেন যে দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য বন্যা উচ্চ উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সকলের জানা দরকার যে দুর্গাপুর ব্যারাজ জলাধার হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বন্যার সময় নদীর জলে পলি মাটী থাকায় ও সেচ এলাকায় বৃষ্টিপাত হওয়ায় ব্যারাজের দুধারে ক্যানাল বন্ধ করে দেওয়া হয় ও নদীর জল নীচে ছেড়ে দেওয়া হয়। এমন কি সর্বোচ্চ বন্যার সময় (6,00,000 কিউসেক) ব্যারাজের উপরে জলের মাত্রা, ব্যারাজ না থাকলে যে উচ্চতা হোত তার অপেক্ষা তিন ফুটের অধিক

উঁচু কখনও হ'বেনা ও হয় না। নদীর ঢাল দুর্গাপুরের কাছে মাইল প্রতি 2/2·5 ফুট। সুতরাং ব্যারাজের প্রভাব খুব বেশী হ'লে ব্যারাজ থেকে $1\frac{1}{2}$ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। বন্যার সময়ের নদীর উচ্চতা ও Pond level দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। এটা মনে না রাখলে নানারকম ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'বে। প্রসঙ্গতঃ এটাও মনে রাখতে হ'বে দুর্গাপুর ব্যারাজের জল নির্গমন ক্ষমতা 6 লক্ষেরও বেশী সুতরাং "সমগ্র দামোদর উপত্যকা অনিবার্য ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে" কথাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

দামোদরে বন্যা প্রতিরোধের উপায় ও পথের বাঁধা সম্বন্ধে আলোচনায় ও কয়েকটী তথ্যের নিভু'লতাই সমস্ত বিষয়টিকে আরও বিতর্কিত ও জটিল করে তুলেছে।

এটা ঠিকই নদীর ঢাল যেদিকে বেশী সেই দিকেই নদীর জল স্বাভাবিক ভাবে বয়ে যায়। এটাও ঠিক যে নদীর গতিপথে বৎসরের পর বৎসর পলি জমার দরুণ ও প্রাকৃতিক কারণে (geomorphological reasons) নদী গতিপথ বদলায় ও যেদিকে ঢাল বেশী ও বাধা সর্বপেক্ষা কম (line of least resistance) সেইদিকেই গতিপথ তৈয়ারী করে নেয়। এর জন্যেই মোহানার কাছে 'ব' দ্বীপ গড়ে ওঠে ও নতুন নতুন জমির সৃষ্টি হয়। নদীর প্রবাহ একদিক থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

আমার মনে হয় 191 পৃষ্ঠায় বেরা মহাশয় যে বলেছেন দুর্গাপুর ব্যারাজই আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল ও বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের শিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চলের প্রভূত ক্ষতি করবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বেরা মহাশয় শুধু বর্ধমান জেলা বা পশ্চিমবাংলার ক্ষতির কথা বলেই বিরত হ'ন নি, তিনি বলেছেন দুর্গাপুর ব্যারাজ ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দেবে। ব্যারাজ পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মান ও নদীর উপর ব্যারাজের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক তথ্য, অনেক গবেষণা, অনেক আলোচনা শুধু এই দেশেই নয় অনেক দেশ বিদেশেই এর পূর্বে হয়েছে। *'যা কিছু করা হয়েছে সবই ভুল' এই সিদ্ধান্তে লাফিয়ে না পড়ে আরও গভীর ভাবে চিন্তা, সমীক্ষা ও আলোচনা করা হ'লে জনসাধারণের পক্ষে সমস্যাটি বোঝাবার সুবিধা হবে।

যখনই কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়, এটা স্বাভাবিক যে সেই সব বিষয়ে তখন পর্যন্ত যে সব তথ্যাদি থাকে ও পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে যদি ও যখন নতুন নতুন তথ্য ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় পরিকল্পনাগুলিরও কিছু কিছু হের ফেরকরা হয় বা করা উচিত। কিন্তু আমাদের আবহাওয়া বিশারদদের কাছে যদি 60/70 বৎসরের চেয়ে আগেকার তথ্য না থাকে ও পরবর্তীকালে নতুন তথ্যের সৃষ্টি হয় (যেমন 1978 এ হয়েছে) তার জন্য পরিকল্পনাকে কি কারও ভুলের পর্যায়ে ফেলা যুক্তিযুক্ত হবে? শ্রীবেরা যে যুক্তির পথের কথা লিখেছেন যেমন দামোদরকে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত একটি সোজা পথে নতুন নদীর (দামোদর নদের মত) সৃষ্টি করা, সেটা আমার মনে হয় একেবারে অসম্ভব না হলেও সম্পূর্ণ অবাস্তব। একটি ছোট ম্যাপে নদীর গতিবিধি দেখান যত সহজ কার্যক্ষেত্রে ও বাস্তবে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা শেষ পর্যন্ত হয়তো অসম্ভব ও unpractical এর পর্যায়ে পড়বে। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার অধিবাসীরা কি এই রকম একটি পরিকল্পনার কথা শুনতেও রাজী হবেন? বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষ এমন কি সারা বিশ্ব প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিকরা কি মনে করেন ও এই রকম একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে বেরা মহাশয়ের প্রস্তাব প্রচারের আগে যথাস্থানে পেশ করতে বাধা বা আপত্তি কোথায়? এই রকম

*"Effects of barrages on the regime of rivers."

বসু যখন 'প্ল্যাঙ্ক সূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প' বিষয়ক লেখা (যে কাজের জন্য তিনি পৃথিবী বিখ্যাত) আইনষ্টাইনের কাছে পাঠান, তখন তাঁর বয়স 30 বছর। প্রস্তুতির উৎসটা কোথায়?

'বৈজ্ঞানিক তৈরী করা'র এ ধরণের প্রচেষ্টার প্রথম শর্ত অবশ্যই শিশু-কিশোরদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। এ ভালোবাসা কারও কারও মধ্যে সহজাত ভাবেই থাকে, আবার এটাও সত্য যে আরও বহুজনের মধ্যে নানারকম প্রক্রিয়ার সাহায্যে এ ভালোবাসার জন্ম দেওয়া যায়। চার্লস ডারউইন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে তাঁর গবেষণায় সাফল্যের জন্য নিজস্ব যে সমস্ত মানসিক গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে এই 'Love of Science' (বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা)। এ থেকেই আসে জানার আগ্রহ, নতুন কিছু করার প্রেরণা। শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, ছবি দেখিয়ে বোঝানো, মিউজিয়াম ইত্যাদি দেখানোর ব্যবস্থা করা, মাতৃ ভাষায় বিজ্ঞানের বই-পত্র পড়ানো ও এই ধরণের আরও অনেক কিছু কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায় বিজ্ঞান মানসিকতা। তবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বই-পত্রের নিদারুণ অভাবের কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে—বিশেষতঃ শিশু-কিশোরদের উপযোগী। 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' কিছু কিছু এই ধরণের বই প্রকাশ করেছেন—কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। আরও বই-পত্র প্রকাশ হওয়া দরকার। অল্প কয়েকটি এদেশীয় বই এবং কয়েকটি অনুবাদ—আমাদের বাংলাভাষায় বিদ্যালয়-ছাত্রদের উপযোগী বিজ্ঞানের বইপত্রের এই অবস্থা। (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিদ্যালয় ছাত্রদের উপযোগী একটি পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা আছে—যা খুব দরকার)। এ ব্যাপারে যা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, তা হলো সরকারী উদ্যোগ—কিন্তু এ ধরণের উদ্যোগ এদেশে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, 'কেরালা শাস্ত্র-সাহিত্য পরিষদ' শিশুদের জন্য একটি 'বিজ্ঞান পুস্তক সিরিজ' প্রকাশ করেছে এবং সমস্ত বইয়ের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ। এছাড়া মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শাস্ত্রকেরলম্' ও শিশুদের জন্য 'ইউরেকা' নামে দুটি বিজ্ঞান পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করে থাকেন। গ্রামের মানুষ ও প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি মাসিক বিজ্ঞান সংবাদ দেওয়াল পত্রিকারও প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

কিভাবে এই প্রকল্পের কাজ চালানো যায়, তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞান ক্লাবগুলো তাদের এলাকার বিদ্যালয়গুলো থেকে কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে বেছে নিতে পারে। এরপর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোর ওপর পাঠক্রম তৈরী করে, বিশেষ ক্লাশ শুরু করা যায়। ঐ পাঠক্রম অনেকটাই হবে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে আর উদ্দেশ্য-মূলক। এই ধরণের পাঠক্রম তৈরী করা বা তার ওপর ক্লাশ করানোর ব্যাপারে, বহু শিক্ষক-অধ্যাপক-গবেষক-বিজ্ঞানকর্মীর এগিয়ে আসা দরকার—এঁদের সাহায্য না পেলে সত্যিই অসুবিধে হবে। কোনো বিশেষ ছাত্র বা ছাত্রীর কোনো বিশেষ দিকে আগ্রহ থাকলে, তাকে অল্পবয়স থেকেই সেই বিষয়টার ওপর পড়াশুনো করতে ও ভাবনা-চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা দরকার, যাতে করে সে প্রথম থেকেই একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে। এই ধরণের কাজকর্মে আরও অনেককিছু করা দরকার—বিজ্ঞান ক্লাবগুলোর উচিত তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক পাঠক্রমের ওপর পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ক্লাশ করানো হয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফিন্‌ম্যানের (Feinman) বিখ্যাত বক্তৃতা-গুলো আর তাঁর উদাহরণ—একদল ছাত্র-ছাত্রীকে

নির্দিষ্ট সময় ধরে ও নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক তৈরী করার লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা দেওয়া (অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থায় ও ভিন্ন পদ্ধতিতে)।

আমার মনে হয়, বিজ্ঞান-ক্লাবগুলোর কর্মসূচীর মধ্যে এই ধরণের একটা কর্মসূচী অবশ্যই থাকা উচিত। না হলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকম—কিছু জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই-পত্র পড়া, হাতে-কলমে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, কয়েকটা মডেল তৈরী করা, দু'একটা পত্র-পত্রিকায় লেখা, কয়েক জায়গায় বক্তৃতা করা ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর মানুষের সামনে নতুন কিছু নিয়ে যাওয়া যায় না। প্রকৃতি যে বিশাল রহস্যময়তার চ্যালেঞ্জ নিয়ে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তার আরও একটা বাঁধনকে খুলে দেওয়া যায় না।

এই ধরনের কাজ করতে গেলে বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বাধার মোকাবিলা করতেই হবে। অভিভাবকদের অজ্ঞতা এক বিশাল সামাজিক বাধা। "কি হবে ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান করে", কিংবা আর কোনো কাজ নেই, বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলোর মাথা খেয়ে বেড়াচ্ছে" এ ধরণের মন্তব্য বহু অভিভাবক হামেশাই করে থাকেন। এগুলো বলারও অবশ্য একটা গভীর সামাজিক আর্থনীতিক উৎস আছে—কিন্তু সেটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের এই ধরণের সমস্যাকে সমাধান করার রাস্তা খুঁজে বার করতে আর বুকভরা ভালবাসা ও উৎসাহ নিয়ে ঐ সমস্ত শিশু-কিশোরকে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে পৃথিবীকে উপহার দেওয়া যায় নতুন নতুন নিউটন, এডিসন, ডারউইন, পাস্তুর, মেণ্ডেল, পাভ্‌লভ্‌, সি. ভি. রামন, সত্যেন বোস, আইনস্টাইন অথবা মাদাম কুরী।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বিদেশে ভারতীয় সামুদ্রিক পণ্যের চাহিদা

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে সম্পদশালী দেশ হিসাবে পরিচিত। ভারতের প্রধান সম্পদ হল বনজ ও জলজ সম্পদ যা বহুকাল থেকে এদেশে ও বিদেশে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। আমাদের দেশের নানাবিধ জলজ সম্পদের প্রধান উৎসই হল সমুদ্র। বিদেশের বাজারে এই সকল সামুদ্রিক পণ্যের কদর অত্যধিক। ভারত থেকে বিদেশে নানাবিধ সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরেই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র 1978 সনে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 77,946 টন, যার আনুমানিক মূল্য 212·16 কোটি টাকা। গত 1977 সনে এই রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 64,964 টন যার মূল্য হল 179·74 কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরেই রপ্তানী বৃদ্ধির পরিমাণ হল শতকরা 20 ভাগ। নানা ধরণের সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানীর পরিমাণ গত 1978 সনেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভারত থেকে রপ্তানীযোগ্য এই সকল নানাবিধ পণ্যের মধ্যে অন্যতম হল ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি। যা বিশ্বের প্রায় সকল দেশেরই পরম আকাঙ্খিত বস্তু। জমানো চিংড়ি ছাড়া অপর পণ্যেরা হল নানাবিধ সামুদ্রিক মাছ (তাজা ও ঠাণ্ডায় জমানো), ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস, জমানো স্কুইড ও কাট্‌লফিস, শুকনো মাছ, হাঙরের পুচ্ছ ইত্যাদি।

ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি—1978 সনে ভারত থেকে রেকর্ড পরিমাণ ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছে। মোট নানা ধরণের পণ্যের মধ্যে এই জমানো চিংড়ির পরিমাণ হল 51,223 টন যার মূল্য 179·06 কোটি টাকা। ভারতের জমানো চিংড়ির অন্যতম প্রধান ক্রেতা হল জাপান ও আমেরিকাযুক্তরাষ্ট্র। এই দুই প্রধান দেশ, আমাদের মোট চিংড়ি রপ্তানীর প্রায় শতকরা 94·6 ভাগ ক্রয় করতে সক্ষম। এর পরই উল্লেখযোগ্য ক্রেতারা হল ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, কানাডা, হংকং, ইতালী, পঃ জার্মানী, কুয়ায়েত ও সিঙ্গাপুর। কেবলমাত্র জাপান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য দেশে ভারত থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরে খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। জাপানেই ভারতীয় চিংড়ির কদর ও চাহিদা খুবই বেশী, কারণ এদেশের রপ্তানী চিংড়ির প্রায় শতকরা 64 ভাগই জাপান ক্রয় করে। বিগত কয়েক বছরে জাপানে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ার মুখ্য কারণ হল ওদেশে চিংড়ি ক্রেতাদের চাহিদা বৃদ্ধি, একই সাথে জাপানে ও অপর কয়েকটি সরবরাহকারী দেশে চিংড়ি উৎপাদনে ঘাটতি এবং সেখানে চিংড়ির লোভনীয় বাজার দর।

বর্তমানে ভারতই জাপানে জমানো চিংড়ি সর্বশ্রেষ্ঠ সরবরাহকারী দেশ। বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একমাত্র 1978 সনে জানুয়ারী নভেম্বর মাসে জাপান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে

প্রায় 1,28,649 টন ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি আমদানী করে যেখানে কেবল ভারত থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণই ছিল সর্বাধিক অর্থাৎ 28,820 টন যা মোট আমদানী চিংড়ির শতকরা 22·4 ভাগ। এর পরই হল ইন্দোনেশিয়ার স্থান। ইন্দোনেশিয়া থেকে জাপানে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ মোট পেয়েছে, যদিও জাপানের তুলনায় তা নিতান্তই কম। উপরিউক্ত দুটি দেশ ছাড়া তৃতীয় পর্যায়ে ফ্রান্সই সর্বাপেক্ষা বেশী চিংড়ি আমদানী করে। 1978 সনে ভারত থেকে ফ্রান্সে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 1,359 টন যার মূল্য 3·45 কোটি টাকা যা অন্য বছরের তুলনায় বহুলাংশে বেশী।

দেশ	1976		1977		1978	
	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)	রপ্তানীর পরিমাণ (টন)	আনুমানিক মূল্য (টাকা)
জাপান	26,859	114·58 কোটি	26,176	107·71 কোটি	32,618	138·12 কোটি
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	18,943	40·41 কোটি	18,657	41·67 কোটি	15,839	33·15 কোটি
ফ্রান্স	1,135	258·38 লক্ষ	884	197·19 লক্ষ	1,359	344·94 লক্ষ
বেলজিয়াম	78	30·37 লক্ষ	229	79·04 লক্ষ	224	71·80 „
ডেনমার্ক	15	2·85 „	42	7·62 „	150	35·94 „
পঃ জার্মানী	—	—	48	24·36 „	24	18·67 „
ইতালী	32	9·28 „	54	15·13 „	38	12·02 „
নেদারল্যাণ্ড	42	11·90 „	282	85·75 „	413	116·69 „
U. K.	78	22·60 „	79	21·38 „	88	30·35 „
স্পেন	5	2·06 „	53	5·59 „	18	5·01 „

ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্নদেশে ঠাণ্ডায় জমানো চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ও তার মূল্য

25,502 টন অর্থাৎ মোট আমদানী চিংড়ির শতকরা 19·8 ভাগ। জাপানের পরই ভারতীয় চিংড়ির অপর বৃহৎ ক্রেতা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। 1978 সনে ভারত থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ছিল 15,839 টন যা অপর কয়েক বছরের তুলনায় নিঃসন্দেহে কম, এর অন্যতম কারণ হল জাপানে চিংড়ির বাজার দর আমেরিকা অপেক্ষা অনেক আকর্ষণীয়। ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানী চিংড়ির অধিকাংশই হল খোসা ছাড়ানো চিংড়ি। তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চাহিদানুযায়ী চিংড়ি উৎপাদন কম হওয়ায় ও অপর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলি থেকে চিংড়ি রপ্তানীর পরিমাণ কমে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে চিংড়ির বাজার দর অনেকটা বৃদ্ধি

ফ্রান্স ছাড়া ভারতীয় চিংড়ি আমদানীকারী পশ্চিম ইউরোপের অপর দেশগুলি হল নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ইতালী, পঃ জার্মানী ও সুইডেন।

ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস—চিংড়ির পরই অপর মূল্যবান রপ্তানীযোগ্য পণ্য হল ঠাণ্ডায় জমানো ব্যাঙের মাংস। ভারত থেকে এই ব্যাঙের ঠ্যাং রপ্তানীর পরিমাণ ও সেই সাথে বিশ্বের বাজারে এর চাহিদাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ফ্রান্সই সবচেয়ে বেশী পরিমান ব্যাঙের মাংস আমদানী করে। গত 1978 সনে ভারত থেকে ফ্রান্সে এই রপ্তানীর পরিমাণ হল 11,507 টন যার আনুমানিক মূল্য 410·19 লক্ষ টাকা। এছাড়া অন্য প্রধান

রাষ্ট্রগুলি হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (1267 টন), নেদারল্যাণ্ড (566 টন), বেলজিয়াম (128 টন), অষ্ট্রেলিয়া (12 টন), সুইজারল্যাণ্ড (3 টন) মালয়েশিয়া (5 টন), পশ্চিম জার্মানী (47 টন) ও জাপান (6 টন)। চলতি বছরে ভারত থেকে আরো দুটি রাষ্ট্রে ব্যাঙের মাংস রপ্তানী করা হচ্ছে, তারা হল সুইডেন (8 টন) ও সৌদি আরব (3 টন)।

ঠাণ্ডায় জমানো লবষ্টার পুচ্ছ—লবষ্টার নামক খোলসযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীর ঠাণ্ডায় জমানো পুচ্ছের বিদেশের বাজারে যথেষ্ট কদর আছে। ভারত থেকে লবষ্টার পুচ্ছের রপ্তানীর পরিমাণ বর্তমান বছরে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নানা ধরণের লবষ্টার পুচ্ছের প্রধান ক্রেতা হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরে এই রপ্তানীর পরিমাণ হল 381 টন যার আর্থিক মূল্য 2·30 কোটি টাকা। আমেরিকার পরই জাপানের স্থান। 1978 সনে জাপানে ভারত থেকে লবষ্টার পুচ্ছের রপ্তানীর পরিমাণ অন্য বছরের তুলনায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে 229 টনে যার মূল্য প্রায় 184·50 লক্ষ টাকা। জাপানে এই রপ্তানীযোগ্য লবষ্টারগুলির মধ্যে আছে মশলামাখানো অথবা রান্না করা লবষ্টার। উপরিউক্ত দুটি দেশ ছাড়াও গত বছর ভারত থেকে অন্য নানা দেশে লবষ্টার পুচ্ছ রপ্তানী করা হয়েছে তারা হল ফ্রান্স (74 টন) নেদারল্যাণ্ড (5 টন), কুয়েত (200 কিঃগ্রাঃ)।

স্কুইড ও কাটল্ ফীস—স্কুইড ও কাটল্ ফিস প্রধানতঃ মোলাস্কাপ পর্বের অন্তর্ভুক্ত (Phylom-Mollusca)। বর্তমানে নানাধরনের সামুদ্রিক পণ্যের সাথে সাথে এদের রপ্তানীও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রধান কারণ হল বিদেশের খাদ্য হিসেবে এর চাহিদার বৃদ্ধি। ভারত থেকে একমাত্র ফ্রান্সে 1978 সনে স্কুইড রপ্তানীর পরিমাণ হল 2,101 টন এ ছাড়া অন্য প্রধান দেশ হল স্পেন (110 টন), নেদারল্যাণ্ড (106 টন), বেলজিয়াম (41 টন), U. K. (25 টন), অষ্ট্রেলিয়া (17 টন), ইতালী (11 টন), জাপান (4 টন), U.S.A (4 টন) ও সিঙ্গাপুর (2 টন)।

গত বছর এদেশ থেকে কাট্ল্ ফিস রপ্তানীর পরিমাণ বিগত কয়েক বছরের তুলনায় কিছু কম, এর প্রধান কারণ হল আমাদের দেশে সামুদ্রিক উৎস হতে কাট্ল্ ফিস সংগ্রহের ব্যর্থতা। জাপানেই ভারত থেকে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাট্ল্ ফিস রপ্তানী করা হয়। গত বছরেই এর পরিমাণ ছিল 476 টন যার মূল্য 67 লক্ষ টাকা। অপর বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি হল জাপান (387 টন), নেদারল্যাণ্ড (27 টন), U.S A (40টন) অষ্ট্রেলিয়া (14 টন), হংকং (13 টন) নিউজিল্যাণ্ড (9 টন) ইত্যাদি।

টিন বন্দী সামুদ্রিক পণ্য—ঠাণ্ডায় জমানো পণ্য ছাড়াও নানা ধরণের টিন বন্দী সামুদ্রিক-পণ্য ভারত থেকে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে রপ্তানী করা হয়। টিনের পাত্রে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় চিংড়ি, কাঁকড়ার মাংসল অংশ, তৎসহ টুনা, সার্ডিন ও নানা প্রকার ঝিনুক জাতীয় খাদ্যসামগ্রী বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা সম্ভব হয়েছে। 1978 সনে টিন-বন্দী চিংড়ি সর্বাপেক্ষা অধিক রপ্তানী করা হয়েছে U.K (109 টন), পঃ জার্মানী (88 টন), যুগোশ্লোভিয়া (38 টন) ও সৌদি আরব (22 টন)। এছাড়া টিন-বন্দী কাঁকড়া রপ্তানী করা হয় ফ্রান্স (15 টন), অস্ট্রেলিয়া (9 টন) ও চেকোশ্লোভিয়ায়।

উপরিউক্ত প্রধান সামুদ্রিক পণ্য ছাড়াও নানা ধরণের শুঁটকি মাছ, হাঙর পুচ্ছ ইত্যাদি যথাক্রমে শ্রীলঙ্কা, মরিসাস, হংকং ও মালয়েশিয়াতে রপ্তানী করা হয়। আশা করা যায় আগামী বছরগুলিতে এই সব সামুদ্রিক পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে অধিক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকার :- M. P. D A কর্তৃক Indian Seafood Exports Shoot past Rs. 200 Croremark (1978) নামক প্রচারিত বুলেটিনের তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।]

প্রতিবেদক—নরেশমোহন চক্রবর্তী

ব্রা-বনাম-ক্যান্‌সার

মেয়েদের বুকের (Breast) ক্যানসার রোগ এখন বেড়েই চলেছে। আর তাতে প্রাণহানির সংখ্যাও প্রচুর। আমাদের দেশে এর সঠিক পরিসংখ্যান নেই। ইংল্যাণ্ডের মত সুউন্নত অথচ ছোট্ট একটা দেশে এক বছরে ব্রেষ্ট-ক্যান্সারে মারা গেছে 11,000 মেয়ে, 1976 সালের রিপোর্ট। ঐ দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাব্যবস্থা, রোগনির্ণয়ের ও চিকিৎসার ব্যাপক সুযোগ এবং উন্নত জনশিক্ষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, রোগসমস্যা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ঐ বিপুল মৃত্যুহার ঠেকান সম্ভব হচ্ছে না। এর মূলগত হেতু—অন্যান্য রোগের মত ক্যান্সার রোগটির পেছনে একটি বা দুটি নির্দিষ্ট বা বিশিষ্ট কারণ থাকে না। একাধিক কারণে এই রোগের উৎপত্তি হয়। আর বড় তাড়াতাড়ি এর বিস্তার ঘটে। রোগী ডাক্তারের পরামর্শ নিতে দেরী করলে অথবা প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরামর্শে কিছু ত্রুটি বা অবহেলা ঘটলে রোগটি তার প্রাথমিক স্থান থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আর মৌলিক চিকিৎসার উপায় থাকে না। আর এই রোগটি এমন একটি জায়গায় যে সহজাত লজ্জাবশে মেয়েরা সহজে তা প্রকাশ করতে চায় না। যাইহোক বহু সূত্র ধরে যে রোগের উৎপত্তি ঘটে তার দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণকে যদি একটু সাবধানতা নিলেই—দূরে রাখা যায় তাহলে সেই কথা সকলেরই জেনে রাখা দরকার।

এই বিষয়ে Science Reporter-এ গত নভেম্বর (1979) সংখ্যায় উত্তর মেডিক্যাল কলেজের শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র মহাশয়ের লেখা প্রবন্ধ ও রিপোর্টের সারাংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। "শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে মেয়েদের বক্ষ-আবরণীর ব্যবহার প্রায় অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু সর্বাধুনিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে যারা বেশী দামী, পুরু, আরামপ্রদ, সিন্থেটিক 'ব্রা' ব্যবহার করেন তাঁদের ব্রেষ্ট-ক্যান্সারের আশঙ্কা অধিক। এই জাতীয় বক্ষ-আবরণীগুলি সাধারণত: 'প্যাডেড্ ব্রা' নামে পরিচিত। দাম বেশী। তাই সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত পরিবারের মহিলারাই এগুলি বেশী ব্যবহার করেন। এতে নাকি রূপের বিকাশটা ভাল হয়। ফলে উন্নত পরিবারের মেয়েদেরই বেশী ব্রেষ্ট-ক্যান্সার হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিম্ন-পরিবারের মেয়েদের এই রোগ কম দেখা যায়।

সুইডেনের দুজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অ্যাভামী ও রিমোটার্ণ 1978 সালে সেপ্টেম্বরে 'ল্যানসেট' পত্রিকায় প্রথমে এই কথা লেখেন। তাঁরা আরও লেখেন যে (1) স্থূলাকৃতি স্তনেই ক্যান্সার সম্ভাবনা বেশী। (2) তাইওয়ান মেয়েরা সাধারণত: তাঁদের সন্তানদের একদিকের স্তনই দান করেন। যে দিকের স্তনটা খাওনান না, সেই স্তনেই ক্যান্সার বেশী হয়। এবং (3) 'নান্' (nun) অর্থাৎ খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীদের স্তন ক্যান্সার বেশী হয়।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কালিফোর্নিয়ার লস্‌এঞ্জেলস্ স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশিষ্ট ডাক্তার জন ডগলাস্ বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে বলেছেন যে, অত্যাধিক আঁটোসাটো (টাইট) ব্রেসিয়ারই এই জাতীয় ক্যান্সারের বিশেষ কারণ। টাইট্‌ব্রা পরলে স্তনের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় ও স্থানীয় রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। মোটা প্যাডেড ব্রাতে এই উষ্ণতা আরও বাড়ে। এই বেশী তাপই স্তনের ভিতরের গ্রাণ্ডটিস্যুগুলিকে উত্তেজিত করে তাদের অতিবৃদ্ধি ঘটিয়ে ক্যান্সারে পরিণত করে। স্থূলাকৃতি স্তনে টাইট্ ব্রা পরলে এই উষ্ণতা আরো বেশী হয়। সেই জন্যই তাদের ক্যান্সারের প্রবণতা বেশী। স্থূলাকৃতিটা আসল নয়। 'নান্'দের স্তনক্যান্সারের কারণও তাই। তাঁরা কালো কাঁচুলি দিয়ে জড়িয়ে শক্ত করে বুক বেঁধে রাখেন। তাতে ঐ স্থানের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। আর উষ্ণতাও অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ব্রা না পরলে ঐ স্থান শীতল থাকে ক্যান্সারের আশঙ্কাও কম থাকে। ব্রা আকারে ছোট হোক বা বড়ই হোক। দিনরাত্রি যাঁরা টাইট্ ব্রা পরে থাকেন—রাত্রে শোবার সময়ও খুলে রাখেন না তাঁদের ঐ রোগের আশঙ্কা বেশ বেশী।"

অন্য একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে সব মায়েরা তাঁদের সন্তানদের নিয়মিত স্তনদান করেন না তাঁদের ক্যান্সার বেশী হয়। আবার বেশী বয়সে যাঁদের সন্তান হয় তাঁদেরও এই রোগের আশঙ্কা বেশী।

শ্রীগুণধর বর্মন

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

1979

শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়*

[1979 সংখ্যাটিকে গণিতে নানা উপায়ে প্রকাশ করা যায় 1979 সালের বিদায় উপলক্ষ্যে তারই কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।]

$1979 = 2^{10} + 2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 + 2^0$ (2 এর বিভিন্ন ঘাতের সমষ্টিতে)

$= 2^{11} - 2^6 - 2^2 - 2^0$ (2 এর বিভিন্ন ঘাতের প্রকাশে)

$= 990^2 - 989^2$ (দুই বর্গের অন্তরে)

$= 9^2 + 23^2 + 37^2$ (সমান্তর তিনসংখ্যার বর্গের সমষ্টিতে, এখানে 9, 23 এবং 23, 37-এর মধ্যে পার্থক্য 14)

$= \frac{1}{5}\{(-23)^2 + 2^2 + 27^2 + 52^2 + 77^2\}$ (সমান্তর পাঁচ সংখ্যার বর্গের গড়ে, এখানে পার্থক্য 25)

$= \frac{1}{3^4}(2^3 + 27^3 + 52^3)$ (সমান্তর তিনসংখ্যার ঘনের সাহায্যে, এখানে পার্থক্য 25)

$= 7 \times 7(7 \times 7 - 7) - 77 - {}^{7+7}$ (দশটি 7-এর সাহায্যে)

$= 9(9 + 9 \times 9 + 9) + 999 + 99 - 9 - \frac{9}{9}$ (তেরটি 9-এর সাহায্যে)

$= 3^7 - 3^5 + 3^3 + 3^2 - 3^0$

$= 5^5 - 5^4 - 5^4 + 5^3 - 5^2 + 5^1 - 5^0$ } (3 ও 5 এর বিভিন্ন ঘাতের প্রকাশে)

$= 1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 + 5^4 + 10^3$, (1, 2, 3, 4, 5, 10 এর বিভিন্ন ঘাতে)

*গণিত বিভাগ, বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়। ইটাচুনা, হুগলী।

রসায়নে পথিকৃৎ—গেলুসাক

অশোক হেম*

জোসেফ লুই গেলুসাক সংক্ষেপে জেলুসাক নামটি প্রত্যেক বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীর কাছে একটি অতি পরিচিত নাম। ফরাসী দেশের এই বিখ্যাত রসায়নবিদ 1778 সালে লিমোজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে দেশের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার জন্য বাল্যকালে তিনি বিদ্যালয়ে যেতে পারেন নি। 16 বছর বয়সে তিনি প্যারিসে চলে আসেন কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আশ্রয়ে। সেখানে শহরগুলিতে এক ভদ্রমহিলার কাছে তিনি থাকতেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রতিদিন ভোরবেলা বাড়ীতে বাড়ীতে দুধ সরবরাহ করতেন। এভাবে কঠোর পরিশ্রম করে তিন বছর সেখানে তিনি কাটান। এত কষ্টের মধ্যেও বালক লুসাকের পড়াশোনা কিন্তু একদিনের জন্যও বন্ধ যায় নি। অবশেষে 1797 সালে তিনি একল পলিটেকনিকে ভর্তি হন। তিন বছর পর এখানে পড়াশোনা শেষ হলে বারথোলে তাঁকে সেখানে গবেষণা চালাবার সুযোগ করে দেন। তাঁর অধীনে গ্যাসের চাপ জলীয় বাষ্পের চাপ ইত্যাদি নিয়ে লুসাক প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। 1804 সালে বারুটের সঙ্গে বেলুনে চড়ে ঊর্ধ্ব আকাশে চুম্বকের আকর্ষণ নিয়ে তিনি অনেক পর্যবেক্ষণের কাজ চালান। 1806 সালে তাঁকে ইনস্টিটিউট দ্য ফ্রান্সের সদস্য করা হয় এবং এখানেই তিনি নানা গ্যাস নিয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা সুরু করেন। দু-বছর পরে এখানে গবেষণার ফল হিসেবে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত Law of Gaseous Volume। এই প্রতিষ্ঠানেই কাজ করার সময় লুসাক তাঁর সহযোগী হিসেবে পান লুই জ্যাক থেনাডকে।

এই সময় বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডেভি কর্তৃক অ্যালকালি মেটাল আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই সাফল্যের সংবাদ শুনতে পেয়ে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন লুসাক ও থেনাডকে এ বিষয়ে উন্নততর গবেষণা চালাবার জন্যে উৎসাহ দেন এবং সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন। তাঁরই আগ্রহ ও সাহায্যে তাঁরা দু-জন এ নিয়ে গবেষণা সুরু করেন এবং অচিরেই উত্তপ্ত লোহার সঙ্গে ফিউজড্ পটাশের সংযোগ ঘটিয়ে সরাসরি রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পটাশ তৈরি করতে সমর্থ হন। তাঁদের এই আবিষ্কার রসায়নশাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই আবিষ্কারকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের পক্ষে ব্যাপক পরিমাণে অ্যালকালি মেটাল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই লুসাক ও থেনার্ড পরে বোরোন ও তার ফ্লোরাইড এবং শুষ্ক অক্সিজেনে অ্যালকালি মেটালের দহন ঘটিয়ে তাদের পারক্সাইডও প্রস্তুত করেন।

লুসাক ও থেনার্ড 1810-11 সালে জৈব রসায়ন বিশেষত জৈব রাসায়নিক যৌগগুলির বিশ্লেষণে নানা নতুন তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের আবিষ্কারের আগে জৈব পদার্থগুলিকে অক্সিজেনে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তবেই সেগুলির গঠন বিশ্লেষণ করা হত। কিন্তু এর ব্যবহারিক অসুবিধা ছিল

---

*ব্যারাকপুর, 24 পরগণা

অনেক। লুসাক ও থেনার্ড দেখান পদার্থ সমেত যে কোন জৈব যৌগকে কাচনলে দহন করে সেটির গঠন বিশ্লেষণ করা যায়। এভাবে তাঁরা চিনি, স্টার্চ, মোম্‌ এবং অক্সালিক সাইট্রিক, অ্যাসেটিক ও অন্যান্য কয়েকটি অ্যাসিড সমেত মোট 15টি পরিচিত জৈব পদার্থের গঠন নির্ণয় করেন।

গেলুসাকের একক গবেষণার উল্লেখযোগ্য অবদান 1811 সালে বিশুদ্ধ hydrocyanic acid আবিষ্কার। এর চারবছর পর তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখান যে cyanogen একটি যৌগ র‍্যাডিকাল। তাছাড়া তিনি মুক্ত cyanogen তৈরির পদ্ধতিও বের করেন। লুসারের এই শেষোক্ত দুটি আবিষ্কার hydrogen acid theory-তে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, কারণ জৈব রসায়নে যৌগ র‍্যাডিকালের ক্ষেত্রে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

রসায়নশাস্ত্রে গেলুসাকের অবদানের বিবরণ এক কথায় দেওয়া শক্ত। তাঁর আবিষ্কৃত নতুন উপাদানগুলির মধ্যে আছে বোরোনের ক্লোরাইড এবং iodic hydrosculphocyanic dithionic ও hypasulphurous acid। তাছাড়া রাসায়নিক সংযোগ ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যও কম মূল্যবান নয়। নানা রাসায়নিক পরীক্ষায় অপরিহার্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার, ক্যাথেটোমিটার, অ্যালকহলো মিটার এবং সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতে প্রয়োজন টাওয়ার প্রভৃতির নির্মাণ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গেও গেলুসাকের নাম জড়িয়ে আছে। কাঠ থেকে অক্সালিক অ্যাসিড প্রস্তুতপ্রণালীও তাঁর আবিষ্কার। তাছাড়া তিনিই প্রথম দেখান বোরোক্স বা অ্যামোনিয়ামফসফেটের দ্রবণে কাঠ ডুবিয়ে নিলে তার দহনশীলতা অনেক কমে যায়।

রসায়নশাস্ত্রের একনিষ্ঠ সাধক গেলুসাকের চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল ধৈর্য ও অধ্যবসায়। 1808 সালে এক দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন তাঁর চোখে এমন আঘাত লাগে যে তিনি প্রায় দৃষ্টি শক্তি হারাতে বসেছিলেন এই দৃষ্টিস্বল্পতা পরবর্তীকালে তার কাজে নানাভাবে বাধা সৃষ্টি করেছে কিন্তু তাঁকে কখনোই দমিয়ে রাখতে পারে নি, এই স্বল্প দৃষ্টি নিয়েই তিনি রসায়নের নানা জটিল ও সূক্ষ্ম পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। 1850 সালে প্যারিস শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাটকাঠির ব্যবহার

প্রাপ্ত কুইন্টাল পাট ও মেসতাপাট থেকে 2·5 কুইন্টাল কাঠি পাওয়া যায়। যা প্রকৃতপক্ষে নষ্ট নানাভাবে। অল্প অংশ কেবলমাত্র চাষীরা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেছে যে এই পাট কাঠি কাগজ, নাইট্রোজেন, সেলুলোজ, বোর্ড, এমনকি ভিসকোজ রেয়ন তৈরীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বোর্ড ইত্যাদি তৈরীর কাজ সুরু করা যেতে পারে পাট অঞ্চল গুলিতে সমবায় প্রথায়। ইনট্রোসেলুলোজ, ভিসকোজ রেয়ন ইত্যাদির জন্য আরো বেশী সুযোগ থাকা দরকার। এথেকে বিশেষ পদ্ধতিতে হার্ডবোর্ড পেপার বোর্ড ইত্যাদি তৈরী হতে পারে।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ

মিনি শ্রমিক

রণতোষ চক্রবর্তী*

[ঘরে-বাইরে রকমারী পিঁপড়ে। এদের উন্নত ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা, কর্তব্যবোধ, নিষ্কাম কর্ম সুসভ্য মানুষকে অবাক করে দেয়।

পিঁপড়ের আত্মকথনের ভঙ্গিতে এদের সমাজ জীবন দেখান হয়েছে।]

আমি একজন সাধারণ শ্রমিক। তোমাদের অনেকের মতই কলোনীতে আমার বাস। তোমাদের কলোনী তৈরী হওয়ার, এমন কি তোমরা পৃথিবীতে জন্মাবার বহু আগে থেকেই আমরা কলোনী গড়ে থাকতে অভ্যস্ত। আমরা খুবই ছোট জীব। দৈহিক শক্তিতে যেমন দুর্বল, বুদ্ধিতেও প্রায় তেমনি। তবে আমাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী প্রাণীও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু রয়েছি ও থাকবো কারণ আমরা একতাবদ্ধ সামাজিক জীব। পৃথিবীতে তোমাদের থেকে আমরা সংখ্যায় বহু সহস্রগুণ বেশী—আমরা পিঁপড়ে।

তোমাদের আশে পাশে যেমন ছোট কালো সুড়সুড়ে পিঁপড়ে (plagiolepis sp) ছোট লাল বিষপিঁপড়ে (solenopsis sp) কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে (camponotus sp.) বা লাল কালো লম্বাটে কাঠপিঁপড়ে (sima rufonigra)—এ রকম অনেকেই আমরা গাছের গর্তে, মাটিতে, দেওয়ালে, মেঝের গর্তে কলোনী তৈরি করে বাস করি। এ ছাড়া অনেকে যেমন নালসো পিঁপড়ে পাতা দিয়ে সুন্দর বাসা তৈরী করে গাছে বাস করে। আরেক ধরণের গেছো লাল পিঁপড়ের (cremato-gaster sp.) বাসা দেখলে হঠাৎ পাখীর বাসা বলে ভুল হয়। সারা পৃথিবীতে আমরা প্রায় হাজার চারেক রকমের পিঁপড়ে রয়েছি।

আমাদের কলোনী দেখতে হলে আমার সংগে এস। ঐ দেখ আমাদের কলোনীর একজন শ্রমিক ভাই মুখে খাবার নিয়ে তোমার ঘরের দরজার গোড়ায় ছিদ্রপথে ভেতরে ঢুকলো—এটি আমাদের কলোনীর সদর দরজা। এর ভেতর আমরা থাকছি—একজন দুজন নয়—শত শত। তোমরা অনেকে জানতেই পারছ না। তুমি ভাবছো বেশ তো বিনা ভাড়ায় থাকা হচ্ছে, কেননা কয়েক মাস আগে পাশে একখানা ঘর বাড়িয়ে তোমরা ভাড়া খাটিয়েছ—অবশ্য সেখানেও আমাদের এক আত্মীয় পিঁপড়ে ইতিমধ্যে কলোনী গড়ে থাকছে। তুমি কিন্তু যাই ভাবনা কেন আমরা ভাড়া দিয়েই থাকছি এবং তোমাদের তাগিদের আগেই দিচ্ছি। তবে টাকা দিয়ে নয়, কাজের মাধ্যমে। এই দেখ না তুমি সকালে জলখাবার

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

খেয়েছ—রুটীর টুকরো, বিস্কুটের গুড়ো আরও কত কি পড়েছিল—তোমাদের ঠিকে-ঝি ঘর ঝাড় দেবে সেই কখন, আমরা কিন্তু সেগুলো মুখে তুলে নিয়ে ঘর পরিষ্কার করে দিয়েছি। ঘরে পোকামাকড় মরে পড়ে থাকছে—অনেক কিছু তোমরা দেখতেই পাও না। আমরা ঠিক গন্ধ পেয়ে তোমাদের অলক্ষ্যে সরিয়ে নিচ্ছি। বিছানায় অনেক সময় আমাদের দেখতে পাও—ছারপোকা হলে ডিমের লোভে আমরা অনেক সময় বিছানায় ঘোরাফেরা করি এছাড়া খাওয়ার কিছু পরে থাকলেও সেগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে বিছানায় যাই—তোমরা কিন্তু না বুঝেই আমাদের উপর অত্যাচার কর। ঘরের বাইরে কাক যেমন ঝাড়ুদার, ভেতর বাড়ীতে তেমনি আমরা ঝাড়ুদারী করে তোমাদের তাগিদের আগেই ভাড়া দিচ্ছি। তোমাদের অবশ্য সোজাসুজি মেনে নেওয়া অসুবিধা—কেননা টাকাই বেশী চেন। এভাবে ভাড়া দেওয়া ছাড়া অনেক গাছের ক্ষতিকারক পোকার ডিম বা লার্ভা খেয়ে আমরা Biological Control-এ সহায়তা করছি। এছাড়া ফুলের পরাগ সংযোগেও কিছুটা সুবিধে করি।

কলোনীর গড়ন: এবার এস, কলোনীর ভেতর ঢোকা যাক। দেখ, দরজার মুখে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার দ্বাররক্ষী পিঁপড়ে এ কলোনী কর্মী ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। সুড়ঙ্গ পথ দেখছো—কেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তোমাদের রাজপথে কলার খোসা, ডাবের খোলা বা কোন কোন জায়গায় নাকে রুমাল চেপে চলতে হয়, আমাদের পথে কিন্তু সে-সব পাবে না, অসুবিধে হবে না তো? ঐ দেখ একটি শ্রমিক মশার ডানা মুখে করে বাইরে ফেলতে চলেছে, কেননা ডানায় খাবার কিছু নেই। যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে আমরা শুঁড় নেড়ে একটু কথা বলে নিচ্ছি। আসলে আমাদের শুঁড়, নাক, কানও কথা বলার যন্ত্র। এই শুঁড় জোড়ার প্রয়োজন খুব-ই। আমাদের চোখ আছে বটে—তবে অন্যান্য পোকামাকড়ের চোখের মতোই এক একটি চোখ অসংখ্য ছোট ছোট চোখের সমষ্টি, থাকে পুঞ্জাক্ষী বলে। ফলে আমরা একই দৃশ্য অসংখ্য দেখতে পাই, কিন্তু সবই অস্পষ্ট।

শুঁড়ে শুঁড় পিঁপড়ে কথা

সুড়ঙ্গ পথ এদিক ওদিক অনেক কুঠুরীকে যোগ করেছে। একটি কুঠুরীতে অসংখ্য ডিম। বহু শ্রমিক ডিমগুলোকে দেখাশুনোয় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে ডিমগুলোকে নেড়ে দিচ্ছে। এমনকি তোমরা যেমন শিশুকে রোদে রাখ, ঐ দেখ ডিম মুখে করে রোদ থেকে ঘুরিয়ে আনছে। সুড়ঙ্গ পথের মোড় ঘুরে অন্য কুঠুরীতে লার্ভা। আলতো করে মুখে করে লালন পালনে ব্যস্ত বহু পিঁপড়ে। লার্ভা থেকে আবরণীর ভেতর ঢুকে পিউপা অবস্থায় কিছুদিন কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ পিঁপড়ে বেরিয়ে আসে।

ও পাশের কুঠুরী আমাদের রাণী-কক্ষ। সন্তর্পণে চল দেখবে। অনেক শ্রমিক পিঁপড়ে রাণীকে ঘিরে আছে। আমাদের কলোনীর ইনিই সকলের মা এবং সর্বময় কর্ত্রী। আমরা সবাই রাণীর সন্তান এবং রাণী মায়ের সেবা যত্ন করে থাকি। রাণীকে খাওয়ান থেকে শুরু করে বিপদ থেকে রক্ষা করা সবই আমাদের কাজ। তোমাদের অনেকের মত বড় হয়ে মাকে ভুলে যাওয়া আমাদের সমাজে ঘটে না। যদিও নামে রাণী, বস্তুতঃ পক্ষে ডিম দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই তাকে করতে হয় না। রাণীর এক জাতীয় ডিম থেকেই খাওয়াবার তারতম্যে স্ত্রী, পুরুষ ও শ্রমিক পিঁপড়ে তৈরী হচ্ছে এবং এদের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করছি আমরাই। স্ত্রী ও পুরুষ আকৃতিতে আমাদের থেকে বড় ও ডানাওয়ালা, যদিও ডানার ব্যবহার বছরের বিশেষ সময় ছাড়া অন্য সময় করতে পারে না। আমাদের সমাজে মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গের মত পুরুষের প্রয়োজন শুধু ডিম তৈরিতে। কলোনীর রাণীকে সরিয়ে নিলে সাময়িকভাবে কলোনী ভেঙ্গে যায়।

ভাঁড়ার ঘর: রাণী কক্ষ দেখলে। এবার সুড়ঙ্গ পথের এ-পাশে আর একটি কুঠুরী এটি হচ্ছে কলোনীর ভাঁড়ার ঘর বা ষ্টোর রুম। প্রচুর মজুত খাদ্য রয়েছে—ভাত, গম থেকে শুরু করে নখের টুকরো, ছোট্ট শামুক, এমনকি সেদিন দরজায় চেপ্টে যাওয়া টিকটিকির ল্যাজের টুকরো—যাদের বহু খোঁজ করেও তোমরা হদিস পেলে না—এই দেখ তোমাদের অলক্ষ্যে আমরা ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে এনে রেখেছি। আমরা আমাদের ওজনের বেশী জিনিষকেও টেনে আনতে পারি। আমাদের ঘ্রাণ শক্তি তোমাদের চেয়ে কয়েকশ' গুণ বেশী; ফলে খাদ্য-বস্তু সংগ্রহ সুবিধা। খাদ্যবস্তু পেলে কলোনীর ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে আসাই সাধারণ নিয়ম। তবে ঝোলা গুড়, রসগোল্লার রস বা তোমাদের বাচ্চাদের খাওয়াবার গ্রাইপ ওয়াটার এ-ধরণের খাদ্যের ব্যাপারে আমরা খবর পাঠিয়ে অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে প্রচুর খাই, তারপর কলোনীতে ফিরে অন্যান্য অভুক্তদের বিশেষ কায়দায় মুখে মুখ লাগিয়ে বমি করে কিছুটা খাইয়ে দি। আমাদের খাওয়ার ব্যাপারে

অভুক্তকে ভোজন করান

তোমাদের মত তেমন কোন বাছবিচার নেই। আমরা প্রায় সর্বভুক। দেশী, বিলেতী, মোগলাই—শর্করা, আমিষ, চর্বি সব কিছুই চলে। ভাঁড়ার ঘরের খাদ্য কলোনীর সবার। কারণ আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। আমরা খুব পরিশ্রমী বলে—আমাদের খাওয়ার প্রয়োজনও

অপেক্ষাকৃত বেশী, এছাড়া উপোষ করে আমরা একদম থাকতে পারি না—সম্ভবতঃ আমাদের দেহে জমা খাদ্য খুব কম। সব দিনে খাদ্য সংগ্রহ সমান হয় না। শুকো গরম বাতাস, বেশী ঠাণ্ডা এসব দিনে বাইরে বেড়িয়ে কাজ করা আমাদের অসুবিধা, তখন কলোনীর ভেতর রাস্তা তৈরী মেরামতির কাজ ইত্যাদি করে থাকি। অলস বসে থাকা, আড্ডা দেওয়া বা কাজে ফাঁকি—আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ।

কলোনীর গোশালা : এবার চল আমাদের কলোনীর গোশালা দেখতে। তোমরা দুধের জন্য যেমন গরু, মোষ পোষ আমরাও গাছের এ্যাপিড্ বলে (Aphid) ছোট পোকা নিয়ে এসে আমাদের কলোনীতে সযত্নে রাখি। বিনিময়ে ওদের দেহ নিঃসৃত মিষ্টি রস খেয়ে থাকি। আমাদের প্রয়োজনে ওদের রস বার করার পদ্ধতিও মজার। তোমরা যেমন বাছুর মরে গেলে অনেক সময় খড়ের তৈরী নকল বাছুর দেখিয়ে গরু বা মোষের দুধ বার কর—আমরাও অনেকটা একই কৌশলে শুঁড় দিয়ে এ্যাপিড্দের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে রস বার করি।

পিঁপড়ের লাইন : এবার এস কলোনীর বাইরে বেড়িয়ে যাই। ঐ দেখ শ্রমিক পিঁপড়ে লাইন করে চলেছে শিকারের সন্ধানে, এরা কিন্তু পথ চিনে ফিরে আসবে কলোনীতে। কেমন করে আমরা পথ চিনে চলি—এ ব্যাপারে 1959 সাল থেকে তোমরা ফেরোমন নাম দিয়েছ আমাদের দেহ নিঃসৃত এক রকম রাসায়নিক পদার্থকে। এর গন্ধে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারি. সেই সঙ্গে রাস্তাকে বুঝতে পারি।

আত্মরক্ষা : এমনিতে আমরা শান্ত প্রাণী। তবে প্রয়োজনে যুদ্ধ করতেও পিছপা নই। যদিও যুদ্ধাস্ত্র বলতে—শক্ত চোয়ালের জোরালো চিমটি সঙ্গে একটু ফরমিক এ্যাসিড, কারও বা বিষাক্ত গ্যাস, অনেকের মৌমাছির মত হুল—সেই সঙ্গে ভোজনান্তে দক্ষিণার মত কিঞ্চিৎ বিষ—যা তোমাদের মত জীবকেও সাময়িক হঠাতে সক্ষম। আফ্রিকার জঙ্গলের চালক পিঁপড়ে (Driver ant) বলে এক ধরণের জঙ্গী পিঁপড়ের লাইনের উপর হাতী, বা সিংহের মত শক্তিশালী জীবও আসতে সাহসী হয় না। যুদ্ধের সময় আমাদের আক্রমণ এমন তীব্র যে অনেককে দেহে আটকে থাকা শত্রু পিঁপড়ের শুধু মাথা নিয়ে ঘুরে বেড়াতেও দেখবে যেন যুদ্ধে পাওয়া বীর পদক।

আমাদের অনেক আত্মীয়রা মাটিতে না থেকে গাছে থাকে। নালসো পিঁপড়ে, আম, লিচু জাতীয় গাছের পাতা নিজেদের লার্ভার রস দিয়ে জুড়ে সুন্দর বাসা তৈরী করে থাকে। ওদের ডিমই তোমরা চুরি করে মাছ ধরো। আরেক ধরণের গেছো লাল পিঁপড়ের বাসা দেখলে তোমাদের পাখীর বাসা বলে ভুল হবে।

এই মাত্র খবর পেলাম আমাদের একজন শ্রমিক আহত হয়েছে—তাকে দেখতে যেতে হচ্ছে। আমি আসি।

এত ছোট প্রাণী পিঁপড়ে—আরও ছোট্ট এদের মস্তিষ্ক, কিন্তু কেমন সুশৃঙ্খল, কর্তব্যপরায়ণ, নিস্বার্থ ভাবে শুধু গোষ্ঠির প্রয়োজনে কাজ করে চলেছে—ভাবলে অবাক হতে হয়। আমাদের মত অনেক দর্শনশাস্ত্র না পড়েও যেন "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" অর্থাৎ ফলের দিকে না তাকিয়ে শুধু কাজেই অধিকার এই শ্লোকবাক্য ওদের জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

ফুল কেন দেখতে সুন্দর ?

রাধারাণী মাইতি*

মানুষ যতদিন থেকে সভ্য হতে আরম্ভ করেছে ততদিন থেকেই ফুলকে সৌন্দর্যের প্রতীক বলে জানে।

অনেক অনেক কবি তাঁদের এই অনুভূতি কাব্যে লিখেছেন ; অনেক চিত্রকর এঁকেছেন তাঁদের চিত্রের মাধ্যমে। এ ধরণের বহু উদাহরণ রয়েছে। এমন কি কোন রূঢ় মেজাজী ব্যক্তিরও মন জয় করা যায় একগুচ্ছ ফুলের তোড়া দিয়ে। ফুল আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি সুমধুর পরিচায়ক।

কিন্তু প্রশ্ন হোল ফুল কেন দেখতে সুন্দর ? কেনই বা সবাইকে মুগ্ধ করতে পারে ?—এর উত্তর জানার জন্যে আমাদের দরকার ফুলকে একজন উদ্ভিদবিদের চোখে দেখা। ফুলের সুন্দর রঙের পেছনে যারা রয়েছে তাদের নাম ফ্লেভোনয়েড (Flavonoid) এবং টারপিনয়েড (terpinoid) ফ্লেভোনয়েডগুলি সমস্ত পাতা ও পুষ্পদলের একটি সাধারণ উপকরণ। নিঃসন্দেহে তাদের কাজ হোল ফুল ও ফলকে রঙীন করে পোকামাকড় ও অন্যান্য প্রাণীদের (যারা পরাগমিলনে সাহায্য করে) আকর্ষণ করা ফ্লেভোনয়েড অনেকগুলি বিভাগ রয়েছে। তাদের মধ্যে অ্যানথোসায়ানিন, ফ্লেভোন এবং ফ্লেভোনলগুলি সম্বন্ধে ভালভাবে জানা হয়েছে। অ্যানথোসায়ানিন লাল ও নীল রঞ্জক আর ফ্লেভোনগুলি হালকা পীতবর্ণের (cream) রঞ্জক। এ রঞ্জকগুলি জলে দ্রবণীয়। ক্যারোটিনয়েড রঞ্জকগুলি টারপিনয়েড দলের (category) মধ্যে পড়ে। ক্যারোটিনয়েড গুলি স্নেহপদার্থ দ্রবণীয় ও হলুদবর্ণের রঞ্জক আর জ্যানথোফিলরা হলুদ থেকে বাদামী রঙের ক্যারোটিনয়েডগুলি থাকে পাতা ও পুষ্পদলের ক্লোরোপ্লাস্টের সঙ্গে।

ফুল উদ্ভিদ প্রজননের নির্দিষ্ট অঙ্গ। তার গর্ভাধান এবং আনুষঙ্গিকভাবে ফলধরার সুযোগ হয় তখনই যখন পরাগের দানা ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর জমা হয়।

কিছু কিছু ফুল আছে যাদের স্বয়ং পরাগমিলন (Self pollination) ঘটে। এদের ফুলের পাঁপড়ি আদৌ খোলে না। বরং শক্ত ভাবে বন্ধ থাকে, ফলে যখন পরাগধানী খুলে যায় পরাগ এমনিতেই গর্ভমুণ্ডে এসে যায়। এই ফুলগুলি খুব ছোট ছোট হয়। কিন্তু ফুলেরা কি চায় নিজেরই পরাগে পরাগমিলন ঘটাতে ? Darwin বলেছেন, "প্রকৃতি আমাদেরকে জোরগলায় বলছে যে সে স্বয়ং পরাগমিলন ঘৃণা (abhor) করে" অন্য কথায় একই গাছের ফুলেরা অন্য ফুলের পরাগ নিতে (cross-pollination)।

পরাগমিলনের জড় প্রতিনিধি বায়ু কিংবা জল। যাদের পরাগমিলন বাতাস ও জল দ্বারা ঘটিয়া থাকে। তাদের ফুলের রঙীন হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় পরাগ বহনকারী একটি জীব সে সমস্ত জায়গায় ফুলকে ঐ সমস্ত

---

*জেমুয়া গার্লস স্কুল, গ্রাম-পাকুই, পোঃ-বালিচক, মেদিনীপুর।

বাহক জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। কিভাবে ফুল তা করে? ফুলের সৌন্দর্যের উপরই তা নির্ভর করে এবং এই ঘটনা ঘটাবার জন্যে উল্টোভাবে বহনকারীদের কিছু দিতেও হয়। বহনকারীরা প্রধানতঃ তিন ধরণের হয় i) পোকামাকড় ii) পাখী এবং iii) বাদুড় জাতীয় প্রাণী। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পোকামাকড়।

ফুলে ফুলে বিচরণ করে যে পোকামাকড়, তারা আবার চার ভাগে বিভক্ত ক) গুবরে-পোকা খ) মাছি; গ) প্রজাপতি ও মথ; এবং ঘ) মৌমাছি ও বোলতা। তাদের বেশীর ভাগই ফুলে খাদ্যের সন্ধানে যায়। ফুল তাদের দু-ধরনের খাদ্য দেয় ক) পরাগ; এবং খ) মধু। যেসব ফুল মধু ও পরাগ দুইই দেয় তাদের মধু পুষ্প বলা হয়। আর যারা কেবল পরাগ দেয় তাদের বলা হয় পরাগ-পুষ্প।

তবে কেবল পরাগও মধু বিতরণের দ্বারা ফুল পরাগমিলনকারীদের আকৃষ্ট করে যে তা নয়—তাদের রঙ, আকার, আকৃতি ও গন্ধের দ্বারাও আকৃষ্ট করে।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসাবে পোকামাকড়দের দৃষ্টি খুব কম সীমার মধ্যে থাকে। তাদের যুগ্মচক্ষু (compound eye) নড়ন্ত বস্তু ভালভাবে দেখতে পায়। মানুষের দৃষ্টিগোচর বর্ণালীর সীমা হোল 400 nm (nanometer)* থেকে 750 nm (বেগুনী থেকে লাল) মৌমাছির এই সীমা হোল 300 nm থেকে 650 nm। অতএব মৌমাছি লাল রঙে অন্ধ (red blind); এমনকি এই সীমার (range) মধ্যে তারা চারটি গুচ্ছের (band) রঙ দেখতে পায় i) হলুদ থেকে হলুদাভ সবুজ (650—500 nm); ii) নীলাভ সবুজ (500—480 nm); iii) নীল (480—400 nm) iv) অতিবেগুনী রঙ (400—300 nm) লাল রঙ তারা তখনই দেখতে পায় যখন অতিবেগুনী রশ্মি লাল রঙের উপর প্রতিফলিত হয়।

প্রথমতঃ যাদের পাপড়ি নেই তাদের ফুলের অন্যান্য অংশ রঙীন হয়, যাদের ফুলের রঙ নেই, তাদের গন্ধ দ্বারা পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়।

ফুলের আকর্ষণ করার আরও একটি মস্তবড়ো উপাদান হলো 'nectar guides' এদের বিভিন্ন রঙ ও গন্ধ হয় ফুলের বয়স বাড়লে এদের রঙের পরিবর্তন ঘটে এবং পোকামাকড় তা বুঝতে পারে।

ফুল বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন; i) থালার মত; ii) গামলার মত iii) নলের মত iv) পতাকা সদৃশ প্রভৃতি। বিভিন্ন ধরনের ফুল দ্বারা যে যে নির্দিষ্ট ধরনের পোকামাকড় আকৃষ্ট হয়, তারা ফুলের গন্ধ, পাপড়ির আকৃতি প্রভৃতি দেখে ঠিক নির্দিষ্ট ফুলকেই চিনতে পারে।

পোকামাকড় বিভিন্ন ফুলের গন্ধ মানুষের চেয়েও খুব ভালভাবে সনাক্ত করতে পারে। এই সমস্ত গন্ধ নানান রাসায়নিক দ্রব্যের জন্যে। মথ দ্বারা যে সমস্ত ফুলের পরাগমিলন সংঘটিত হয় রাত্রে তাদের সুন্দর গন্ধ উঠে। তীব্র গন্ধযুক্ত ফুলগুলি গুবরে পোকা দ্বারা পরাগমিলন ঘটায়। অতএব পরাগমিলনকারীদের আসার সময়ের উপর ফুলের গন্ধের তীব্রতার একটি গূঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক Darwin-এর একটি মন্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়।

* $1nm = 10^{-7} cm$

Charles Darwin বলেছিলেন, ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের উন্নতি ঐ রাজ্যের প্রবীণ স্ত্রী-ভৃত্যের সংখ্যার উপর বাড়ে। স্ত্রী-ভৃত্যেরা বিড়াল পোষতে ভালবাসে। অতএব ভৃত্যের সংখ্যা যত বেশী হবে বিড়ালের সংখ্যা তত বেশী হবে, বিড়াল যত বেশী হবে, ইঁদুরের সংখ্যা ততই কমবে। ইঁদুরেরা বড় বোলতার (bumble bee) বাসা নষ্ট করে। বড় বোলতা লাল ছোট ছোট তৃণের জনন কার্য বর্ধন করে। ছোট ছোট তৃণ আবার গো-মহিষাদির খাদ্য। গো-মহিষাদি আবার রাজ্যের নাবিক ও যোদ্ধাদের খাদ্য (beef)। অতএব স্ত্রী-ভৃত্য বেশী হলে, বিড়াল সংখ্যা বেশী, ইঁদুর কম, বড় বোলতা বেশী, তৃণ সংখ্যা বেশী, গো-মহিষাদি বেশী ও রাজ্যের উন্নতি বেশী।

সৌরশক্তি ব্যবহারে ভারত

দীপঙ্কর খাঁ*

[সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে পিছিয়ে নেই সে কথাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আমরা আজ চলতে পারি না। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে আমোদ আহ্লাদ, চলাফেরা, সাজপোষাক সবকিছুর সাথেই জড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের ভান্ডারেও সংযোজিত হচ্ছে নিত্যনূতন তথ্য। কিন্তু স্বতঃপ্রবহমানা বিজ্ঞানের এই রূপের উৎস মূলে হল শক্তি। প্রথম খৃষ্টাব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যেখানে মাত্র 7Q শক্তি ব্যয় হয়েছে সেখানে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত শক্তিব্যয়ের পরিমাণ প্রায় 4Q এবং পরবর্তী শতাব্দীতে এই শক্তিব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে 100Qতে। বলে রাখা ভাল যে, $1Q=10^{21}$ জুল শক্তি। এতদিন পর্যন্ত কয়লা, খনিজ তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতিই ছিল শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু বর্তমানের বিপুল চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে সেগুলি ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা মেটানোর একটি প্রধান উপায় সৌরশক্তি।

প্রতি বছর পৃথিবী সূর্য থেকে যে শক্তি পায় তার পরিমাণ প্রায় 400 বিলিয়ন টন অ্যান্থ্রাসাইট কয়লার সমান। এ ছাড়াও জানা গেছে যে, বিষুব অঞ্চলের প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে প্রতি বছর প্রায় $1 \cdot 5 \times 10^{6}$ কিলোওয়াট সৌরশক্তি আপতিত হয়। এই বিপুল পরিমাণ সৌরশক্তির কিয়দংশও যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি তাহলে শক্তি সমস্যার একটি চমৎকার সমাধান হয়ে যায়।

* দ্বাদশ শ্রেণী (বিজ্ঞান) হাওয়ার সেকেণ্ডারী ইন্‌স্টিটিউশন (টাকী-হাউস , কলিকাতা-700009

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য সহজ ও ব্যবসাভিত্তিক উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে। কয়েক বছর আগে বরোদাতে একটি ছোট আকারের সৌরশক্তিচালিত ইঞ্জিন প্রদর্শিত হয়। ইঞ্জিনটির প্রদর্শনীটি বেশ আলোড়ন তুলেছিল। যদিও ইঞ্জিনটিতে কোনো নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দেখানো হয়নি কিন্তু ঐ প্রোটোটাইপ ইঞ্জিনটি ভারতীয় যন্ত্রবিদ্যার একটি সাফল্যকে সূচিত করেছে। ভবিষ্যতে হয়ত এই সৌরশক্তিচালিত ইঞ্জিন সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় সবুজ বিপ্লবকে আরও প্রসারিত করবে। উক্ত ইঞ্জিনটি বোম্বের সর্দার প্যাটেল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এস, এস, ডিঘের চিন্তাপ্রসূত। তিনি ফ্রেয়ন নামক একটি কম স্ফুটনাঙ্ক বিশিষ্ট তরল নির্বাচন করেন। কারণ কম সৌরতাপ প্রয়োগেই ফ্রেয়ন 'পাওয়ার স্ট্রোকে'র উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় ফ্রেয়ন-12-এর চাপ থাকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় 100 পাউন্ড। কিন্তু 60°C-এ ঐ তরলটি 220 পাউন্ডেরও বেশী চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অধ্যাপক ডিঘের আবিষ্কৃত যন্ত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তপ্ত ফ্রেয়ন পাত্রের সীল করা অংশগুলিতে গর্ত করে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। তাই ইতিপূর্বে ফ্রেয়ন ব্যবহার করে সৌরযন্ত্রে সাফল্য লাভ করা যায় নি। অধ্যাপক ডিঘে তাঁর আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতিতে এই অসুবিধা দূর করেন। ঐ পদ্ধতির সাথে ব্যাটারির 'লীকপ্রুফ' পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। একই পদ্ধতিতে বিউটেন ব্যবহার করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক Jean Pierre-Giradier আফ্রিকাতে বহু কাজ করেন। এই যন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি খুবই আশাবাদী।

অধ্যাপক ডিঘের যন্ত্রটি ছাড়াও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সৌরশক্তিচালিত কুকার, জলগরম করার যন্ত্র প্রভৃতি বের করেছেন, যদিও সৌরকুকার ছাড়া বাকীগুলি ভারতের দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের বাইরে। ভারতীয়দের পুরাতন খাদ্যাভ্যাসের জন্য কুকারটিও পল্লী অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু প্রচার বাড়ালে শহর ও শহরতলীতে সৌরকুকার নিশ্চয়ই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

1977 সালের মার্চমাসে সি, আই, এলের কর্মীরা পরীক্ষামূলক ভাবে দিল্লীর অনতিদূরে ঐ প্রতিষ্ঠানেরই প্রাঙ্গনে একটি সৌর-পাম্প বসান। ঐ পাম্পের ফটো ভোল্টাইক মডিউল ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি হল একগুচ্ছ সিলিকন সৌর কোষের সমাহার। এই মডিউলগুলি সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে। এই বিদ্যুৎ শক্তিকে লেড—স্টোরেজ কোষের ভিতর সঞ্চিত রাখা হয়। প্রয়োজনমত তার থেকে পাম্পের মোটর চালানো হয়। '77 থেকে '79 এই দুবছরে সি, আই, এলের কর্মীরা এই পাম্পের কর্মক্ষমতা 12% থেকে 20%-এ তুলতে সমর্থ হয়েছেন। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এটি বর্তমানে দৈনিক 12000 লিটারের মত জল তুলতে পারে।

জাহাজ পরিচালনার সংকেতের জন্য দ্বারোকা বন্দরে সি, আই, এল, নির্মিত দুটি সৌরশক্তি গ্রাহকও বসান হয়েছে।

জনশিক্ষা ও বিনোদনের জন্য ইউনিসেফ ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশের গ্রামে গ্রামে কিছু রেডিও সেট বিতরণ করে থাকেন। ঐসব সেট চালানোর জন্য ফটো-ভোল্টাইক মডিউলও তৈরী করেছেন সি, আই, এল। শ্রীনগরের লে-র মত দুর্গম অঞ্চলে এই রকম রেডিও ব্যবহার করে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেছে।

কিন্তু সিলিকন সৌরকোষের দাম বেশী হওয়ায় এসব সাফল্যকে এখনও ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। 1974 সালে মার্কিন মুলুকেই এই ধরণের কোষে উৎপন্ন প্রতি ওয়াট শক্তির খরচ পড়ত প্রায় 70 ডলার। আমাদের দেশে '78-এ সেই খরচ নেমে দাঁড়িয়েছে ওয়াট প্রতি 7 ডলারে। দেশে বিশুদ্ধ সিলিকন উৎপাদনের ব্যবস্থা হলে '81তে এই খরচ ওয়াট প্রতি 3 ডলারে নামানো যাবে বলে সি, আই, এদের কর্মীরা আশা রাখেন।

অধ্যাপক ভিষের ইঞ্জিনটির ব্যবসায়িক দিক বিচার করে বলা যায় পরিকল্পনামাফিক 12টি 3 অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন একসাথে নির্মাণ করতে প্রতিটিতে খরচ পড়বে প্রায় 6000 টাকা। টাকার অংকটা নিশ্চয়ই বেশী। কিন্তু একথাও ভাবতে হবে যে, অন্যান্য দৈত্যাকৃতি গ্যাস-টার্বাইনের তুলনায় এটির ব্যবহার অনেক সহজ। এছাড়াও অন্যান্য সৌরযন্ত্রগুলির মত এটিরও মেরামতী খরচ খুবই কম।

ভারতে মোট গ্রামের সংখ্যা প্রায় 5,76,000। ঐসব গ্রামের মধ্যে ছোটো-খাটো জমিতেও চাষের জন্য দরকার জল। ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে পাম্পের খরচ আরো কমানো সম্ভব হবে। এই ব্যবস্থায় পরিচালনার খরচ কম কিন্তু ব্যবস্থাটি দীর্ঘস্থায়ী। এই সব দেখে মনে আশা জাগে ভারতের মাটিতেই, ভারতের শক্তিতেই অদূর ভবিষ্যতে মানবকল্যাণে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হয়ত সাধ্যাতীত হবে না।

সংখ্যা নিয়ে খেলা

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ*

[4টি চার এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন ব্যবহার করে কেমন করে '0' থেকে '50' পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পাওয়া যায় তা এখানে দেখানো হল।]

$0 = 4 \times 4\,(4-4)$

$1 = (4+4)\,/\,(4+4)$

$2 = 4/4 + 4/4$

$3 = (4+4+4)\,/\,4$

$4 = 4 + 4\,(4-4)$

$5 = (4 \times 4 + 4)\,/\,4$

$6 = 4 + (4+4)\,/\,4$

$7 = 4 + 4 - 4/4$

$8 = 4 + 4 + (4-4)$

$9 = 4 + 4 + 4/4$

$10 = 4 + 4 + 4\,/\,\sqrt{4}$

$11 = \frac{4 + 4!}{4} + 4, \quad 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

$12 = 4! + 4 - 4 \times 4$

$13 = \sqrt{4}\ \ (4! + \sqrt{4}\,)\,/\,4$

$14 = \frac{4!}{\sqrt{4}} + \frac{4}{\sqrt{4}}$

$15 = (4 \times 4) - 4/4$

$16 = 4 \times 4 + (4-4)$

$17 = 4 \times 4 + 4/4$

$18 = 4 \times 4 + 4\,/\,\sqrt{4}$

$19 = 4! - 4 - 4/4$

$20 = 4 \times (4 + 4/4)$

$21 = 4! - \sqrt{4}\ \ \frac{4}{4}$

*10/1, গোয়ালটুলি লেন, কলিকাতা-13

$22 = 4! - (4+4)/4$

$23 = 4! - (\sqrt{4} + \sqrt{4})/4$

$24 = 4! + 4(4-4)$

$25 = (\sqrt{4} + \sqrt{4})/4 + 4!$

$26 = 4! + (4+4)/4$

$27 = 4! + 4 - 4/4$

$28 = 4! + 4 + (4-4)$

$29 = 4! + 4 + 4/4$

$30 = 4! + 4 + 4/\sqrt{4}$

$31 = 4! + (4! + 4)/4$

$32 = 4 \times 4 \times 4/\sqrt{4}$

$33 = 4 \times 4 \times \sqrt{4}^{\circ}$ [যেহেতু, $4^{\circ} = 1$]

$34 = \sqrt{4} + 4 + 4 + 4!$

$35 = 4! + (4! - \sqrt{4})/\sqrt{4}$

$36 = 4! + 4 + 4 + 4$

$37 = 4! + (4! + \sqrt{4})/\sqrt{4}$

$38 = 4! + 4 \times 4 - \sqrt{4}$

$39 = 4 \times 4 + 4! - 4^{\circ}$

$40 = 4 \times 4 \times 4 - 4!$

$41 = 4 \times 4 + 4! + 4^{\circ}$

$42 = 4! + 4 \times 4 + \sqrt{4}$

$43 = 44 - 4/4$

$44 = 4! + 4 \times 4 + 4$

$45 = (4 \times 4 + \sqrt{4})/.4$ [$.4 = \frac{4}{10}$]

$46 = 4! \times \sqrt{4} - 4/\sqrt{4}$

$47 = 4! \times \sqrt{4} - 4/4$

$48 = 4! \times (4+4)/4$

$49 = 4! \times \sqrt{4} + 4/4$

$50 = 4! \times \sqrt{4} + 4/\sqrt{4}$

সংখ্যাকূট

শ্রীঅসিতকুমার চক্রবর্তী

নিচের ইঙ্গিত অনুযায়ী উপযুক্ত সংখ্যা বসিয়ে 'সংখ্যাকূট'টি সমাধান কর ঃ—

a	b	c	d
e			*
f	*	g	h
	i	*	j

a 1	b 9	c 1	d 8
e 6	4	0	*
f 2	*	g 8	h 2
0	i 3	*	j 4

পাশাপাশি

a—ম্যাক্স প্লাংক যে খৃীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান ;

e—এক বর্গমাইলে যত 'একর' হয় ;

f—মঙ্গলগ্রহের উপগ্রহ সংখ্যা ;

g—লেড-এর পারমাণবিক সংখ্যা ;

i—জলের ঘনত্ব সর্বোচ্চ হয় যত ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায়।

উপর থেকে নিচে

a—লেড-এর স্ফুটনাঙ্ক যত ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড ;

b—প্লুটোনিয়াম-এর পারমাণবিক সংখ্যা ;

c—এযাবৎ আবিষ্কৃত মোট মৌলের সংখ্যা ;

d—অসমিয়াম-এর যোজ্যতা ;

h—এক 'দিনরাত্রি'তে যত ঘন্টা হয় ;

j—শনিগ্রহের বলয় সংখ্যা।

247, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলিকাতা-700033

মডেল তৈরি

রেন অ্যালার্ম

সুব্রত মণ্ডল*

মায়েরা হয়ত সারাদিনের কাজ সেরে দুপুরে বিশ্রামের জন্য শুলেন ; কিন্তু ছাদে রয়েছে কয়েকটা ভিজা জামা-কাপড়, আর আকাশে কিছু মেঘ জমেছে অর্থাৎ বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। অথচ ভিজে জামা-কাপড়গুলো তুলেও রাখা যায় না। ফলে মায়েরা সারাদিনের খাটা-খাটুনির পর দুপুরেও নিশ্চিন্তে সামান্য বিশ্রাম নিতে পারেন না। কিন্তু সহজ-সরল এই যন্ত্রটি (রেন অ্যালার্ম) গৃহে থাকলে তাঁরা মোটামুটি নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে পারবেন।

রেন অ্যালার্ম

যন্ত্রটি সহজ-সরল। এটি তৈরির জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি প্রয়োজন :—

(1) চিত্রের ন্যায় স্ট্যান্ডযুক্ত কাঁচের একটি 'U' টিউব, যার এক বাহুর অগ্রভাগ ফানেলাকৃতি এবং অপর বাহুর অগ্রভাগ 'U' এর ন্যায়ই বাঁকানো, এই বাঁকানো অগ্রভাগ বিশিষ্ট বাহুর ভেতরে (অগ্রভাগের কাছেই) দুটি তামার পাত লাগানো [তামার পাতদুটি যেন পরস্পর ঠেকে না থাকে] ও তামার পাত দুটি থেকে কিছুটা নীচে ঐ বাহুরই সঙ্গে একটি কল (Tape) [কলটির সম্পূর্ণাংশ যেন তড়িতের অপরিবাহী অর্থাৎ অধাতব পদার্থে গঠিত হয়] লাগানো ;

(2) একটি ইলেকট্রিক কলিং বেল (Calling Bell 250 Volt) ;

(3) একটি সুইচ্ (Switch) একটি প্লাগ্ (Plug), কিছু তার ইত্যাদি।

---

*একাদশ শ্রেণী বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, কানাইলাল বিদ্যামন্দির, চন্দননগর।

যন্ত্রটিকে কর্মক্ষম করতে হলে প্লাগপয়েন্টের সঙ্গে সংযুক্ত প্লাগের ধনাত্মক (Positive) তড়িৎ-দ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত তার নিম্নে চিত্রানুরূপ সুইচের সঙ্গে যুক্ত করে, সুইচের অপর তড়িৎদ্বারের সঙ্গে অপর একটা তার সংযুক্ত করে তারের অপর প্রান্ত 'U' টিউবের মধ্যস্থ একটি তামার পাতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে ও অপর তামার পাতটির সঙ্গে অন্য একটা তার যুক্ত করে সেই তারটির অপর প্রান্ত কলিং বেলটির আউটপুট্ (output)-এ সংযুক্ত করে অপর আউটপুটের সঙ্গে অপর একটা তার যুক্ত করে সেটিকে প্লাগের ঋণাত্মক (Negative) তড়িৎদ্বারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এবার সুইচটি অফ্ (off) রেখে 'U' টিউবের ফানেলাকৃতি মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে জল ঢালতে হবে। জল ঢাললেই দেখা যাবে যে জলের 'সমচ্চোশীলতা' ধর্মানুসারে 'U' টিউবের দুই বাহুরই জল সমানভাবে বাড়ছে এবং যখনই ঐ জল তামার পাতদ্বয়কে স্পর্শ করবে ঠিক সেই মুহূর্তেই জল ঢালা বন্ধ করতে হবে। এবার সুইচ্ অন্ (on) করলেই কলিং বেলটি বাজতে শুরু করবে [কারণ, জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ায় বর্তনী (circuit)-টি সম্পূর্ণ হবে]। এখন 'U' টিউবের কলটি সামান্য খুলে কোন পাত্রে ফোঁটা ফোঁটা জল ফেলতে হবে। যে মুহূর্তে কলিং বেল বাজা বন্ধ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে কলটিও বন্ধ করতে হবে [জল কমে বর্তনী ছিন্ন হওয়াই কলিং বেল বাজা বন্ধ হওয়ার কারণ]। এখন যন্ত্রটি কাজের জন্য সম্পূর্ণাংশে তৈরী।

ঠিক এই অবস্থায় যন্ত্রটিকে ছাদে রাখলে বৃষ্টি পড়লেই, বৃষ্টির জল 'U' টিউবের ফানেলাকৃতি মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবে [ফলে অপর বাহুরও জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে ও বর্তনী সম্পূর্ণ হবে] এবং কলিং বেলটি বাজতে শুরু করবে। সুতরাং কলিং বেলটি বাজলেই বোঝা যাবে—বৃষ্টি পড়ছে।

[বৃষ্টি পড়লেই সুইচ্ অফ্ করে যন্ত্রটি ছাদ থেকে সরিয়ে নিতে হবে, নাহলে অতিরিক্ত জল ঢুকলে তামার পাতের সঙ্গে জল লেগে থাকলে ক্ষতি হতে পারে।]

পুস্তক পরিচয়

পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়

লেখক : ডক্টর জয়ন্ত বসু, প্রকাশক : আশা প্রকাশনী, 74 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9, মূল্য : পনেরো টাকা।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বর্তমান শতকে বহু বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটেছে। পদার্থ ও জীব বিজ্ঞানের এই সব আবিষ্কার এতই চমকপ্রদ ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ এমনই সুদূরপ্রসারী যে, তা বর্তমান সভ্যতার ও সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে। 'পদার্থবিজ্ঞানের বিস্ময়' পুস্তকটিতে লেখক তারই কিছু আভাস দিয়েছেন। সাধারণত বিজ্ঞানের বিষয়গুলি এতই জটিল যে, সাধারণ পাঠকের সেখানে প্রবেশ প্রায় দুঃসাধ্য। পদার্থবিজ্ঞান বলতে তো অঙ্ক আর যন্ত্রপাতির ছড়াছড়ি, সাধারণ মগজে তাদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ। তবু বিজ্ঞানীরা সাধারণ পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগের ফাঁকটুকু যতদূর সম্ভব কমাতে চান। তার উপায় হল বিজ্ঞানের জনপ্রিয় পুস্তক অথবা বক্তৃতার প্রচার। আমাদের দেশে এ দুয়েরই অভাব। তবু কিছু কিছু জনপ্রিয় পুস্তক দেখে আমরা আশান্বিত হই। আলোচ্য পুস্তক নিঃসন্দেহে তাদের একটি।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান লেখক এই পরিষদের সঙ্গে যুক্ত থেকে জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রচারে ব্রতী। তাঁর কলমে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে লেখক সাধারণ পাঠকদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। লেখকের প্রকাশভঙ্গী সহজ, সাবলীল ও স্থানে স্থানে সরসও বটে। পুস্তকটিতে ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে আরো ভাল হত, তবে অধ্যায়গুলি প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় পড়তে গিয়ে কোথাও আটকায় না এবং বইটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য।

আরম্ভে পদার্থ ও বিপরীত পদার্থ নিয়ে প্রথম অধ্যায়। বিপরীত পদার্থের বিভিন্ন মৌল কণার পরিচয়, পরীক্ষাগারে তাদের অস্তিত্ব, সেগুলি দিয়ে গঠিত বিপরীত পরমাণু ও অণু এবং বিপরীত জগতের গঠন, এই সব বিষয় লেখক সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। বিপরীত জগতের অস্তিত্ব কীভাবে ধরা পড়তে পারে, সে বিষয়েও লেখক আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিপরীত জগতের অস্তিত্ব কি সম্ভব—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কী বলেন, তার কিছু বিবরণ থাকলে ভাল হত। যেমন আল্‌ফ্‌বেন বলছেন লীডেন ফ্রষ্ট লেয়ারের কথা। যদিও এসব ধ্যান ধারণা কিছুটা কল্পনার মিশ্রণ—তবু তাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ়, তাই আলোচনার সুযোগ আছে।

পরবর্তী অধ্যায় : অতিতারল্য ও অতি-পরিবাহিতা—পদার্থের এ দুটি ধর্ম এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যথেষ্ট জটিল কিন্তু প্রয়োগ এতই বহুল যে, বিষয়গুলি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। এই অধ্যায় থেকে এই দুটি বিষয়ের একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। জটিল হওয়া সত্ত্বেও লেখক সাধারণ ভাষায় অর্থাৎ অঙ্কের সাহায্য না নিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরও কিছু বিশ্লেষণ করেছেন। তবে দুই তরলের মডেল ও দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনার সুযোগ ছিল।

পরবর্তী তিনটি অধ্যায়—প্লাজমা, সংযোজনচুল্লী, ও এম এইচ্ ডি জেনারেটর একসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্তমান বিদ্যুৎ সংকটের দিনে শক্তি উৎপাদন প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। শক্তি উৎপাদনের অন্যতম পন্থা হল নিউক্লীয় সংযোজন, যা

নিউক্লীয় বিভাজনের ঠিক উল্টো ব্যাপার। নিউক্লীয় বিভাজন ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ভারী নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে শক্তি উৎপাদন করে, যে পদ্ধতিতে তারাপুর রিএ্যাক্টর বা পৃথিবীর বহু রিএ্যাক্টর বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। সম্প্রতি এই সব রিএ্যাক্টর নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী সাধারণের কান ভারী করছেন এই বলে যে, এই সব রিএ্যাক্টর যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য, পরিবেশ দূষিত করে, দুর্ঘটনা জনিত কারণে বহু প্রাণহানি ঘটাতে পারে; অকেজো রিএ্যাক্টরের দূষিত মল ফেলাও দারুণ সমস্যা। এই সব কারণে কয়লার কিছুটা বিকল্প হয়েও এই সব রিএ্যাক্টর আগামী শতকেও পৃথিবীর শক্তির প্রয়োজন যতটা মেটাবে, তার বেশী ক্ষতি সাধন করবে। তাহলে বিকল্প কি? সৌরশক্তিও ঠিক বিকল্প নয়। একমাত্র পর্যাপ্ত বিকল্প হতে পারে হাল্কা নিউক্লিয়াসের সংযোজন। ব্যাপারটা জানা গেছে অনেক আগেই—সূর্যের অমিত শক্তির উৎস যে এই প্রক্রিয়া, তাও প্রায় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব। আসলে এর প্রয়োগ কৌশলেই যত সমস্যা। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গবেষণার অধিকাংশ বাজেট ব্যয়িত হচ্ছে এই প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষায়। প্লাজমা ও সংযোজন চুল্লী অধ্যায়ে এই সমস্যার মনোজ্ঞ আলোচনা পরিবেশিত হয়েছে। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজমার স্বরূপ, ধর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কেও একটি সম্যক্ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। MHD প্লাজমা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি প্রায়োগিক কৌশল। এই কৌশল যথেষ্ট যত্ন সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংযোজন চুল্লী থেকে শক্তির উৎপাদন সম্ভব হলে পৃথিবীর একটি গুরুতর সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত।

নবম অধ্যায়ে আলোচিত লেসার বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যেতে পারে। সুসমঞ্জস বিকিরণ প্রক্রিয়াটি তাত্ত্বিকভাবে জানা থাকলেও এমোনিয়া মেসার থেকে এর প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত হয় 1958 খৃষ্টাব্দে। তারপরই চলেছে মেসার ও লেসারের জয়যাত্রা। লেখক এসব আবিষ্কারের কথা সহজভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে রামন যে আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান, লেসারের আবিষ্কারে সেই রামন এফেক্ট-এর প্রয়োগ যে ব্যাপক হয়ে পড়েছে, তার আলোচনা আর একটু বিস্তৃত হলে ভাল হত।

অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার কীভাবে TV, ছাপা সার্কিট, Radar, Computer, Microelectronics, Medical Electronics ইত্যাদিতে কাজে লাগান হয়েছে, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের জানা থাকলেও তাদের কার্যপ্রণালী অনেকের জানা নাই। ফলে সাধারণের কাছে এই অধ্যায়গুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। অনেকে বলেন, TV ও Computer মানুষের সভ্যতায় দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লব ঘটাচ্ছে। এ দুটি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা তাই বেশ সময়োপযোগী হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে ইলেকট্রনমাইক্রোস্কোপ আলোচিত হয়েছে। এর বিভিন্ন প্রয়োগের মধ্যে জীববিজ্ঞানে ভাইরাস প্রভৃতি আবিষ্কারে যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে। লেখক যথেষ্ট মুন্সীয়ানার সাহায্যে এই সব বিষয় আলোচনা করেছেন। আধুনিকতম এরকম মাইক্রোস্কোপে 1 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বা তার বেশী শক্তির ইলেক্ট্রন ব্যবহার করে এমন কি বড় বড় অণুর ফটোগ্রাফ পাওয়া যায়—এ দিকটা আরো একটু বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ ছিল।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, লেখক বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলি সহজ বাংলা ভাষায় ও বহু আকর্ষণীয় চিত্রের সাহায্যে সাধারণের কাছে বোধগম্য ও চিত্তাকর্ষক করতে পেরেছেন। এজন্য লেখক প্রশংসার্হ।

পুস্তকে ছাপার ভুল খুবই কম। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বিজ্ঞানের বই বলতে যাঁরা ভয় পান, এই বইটি নির্ভয়ে পড়ে তাঁরা কিছুটা গল্পের আস্বাদ পাবেন নিঃসন্দেহে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

কল্যাণী
24.11.79

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মহাশয়,

আমি আপনাদের পত্রিকা প্রত্যেক মাসেই পড়ি। এই পত্রিকাটা আমাকে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করে। আমি একটা প্রশ্ন নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছি। আপনারা আশা করি আমার এই প্রশ্নের সমাধান করে দেবেন।

প্রশ্ন---একটা জীবন্ত কোষের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে কতগুলি সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় ঘন বস্তু দেখা যায়। এগুলিকে বলা হয় ক্রোমোজম. এই ক্রোমজমগুলি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীন কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। এই জীনগুলি ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. নিয়ে গঠিত।

আবার একটি জড় পদার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটা কতগুলো অণুর সমন্বয়ে গঠিত। এই অণুগুলি কতগুলি পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত. আবার পরমাণুগলো ইলেকট্রন. প্রোটন এবং নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত।

আমি বলছি একটা জীবন্ত বস্তু মারা গেলে জড় বস্তুতে পরিণত হয়। তবে জীবন্ত বস্তুতে আমরা যে সকল বস্তু দেখি এবং জড় বস্তুতেও যে সব বস্তু দেখি তাদের মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? যদি থাকে তাহলে দয়া করে আমাকে নিশ্চই জানাবেন।

দেবাশীষ শীল
কল্যাণী

উত্তর :-- জীবকোষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. অণুদের জড় পদার্থের সাধারণ অণু-পরমাণুর সঙ্গে তুলনা করে এই পত্রে জীবন ও জড়ের মধ্যে মিল বা সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

ডি. এন. এ ও আর. এন. এ হচ্ছে নিউক্লিয়িক এসিডের দুটি রূপ—একটি ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিয়িক এসিড (সংক্ষেপে D.N.A) অন্যটি রাইবোনিউক্লিয়িক এসিড (R.N.A)। সাধারণ

অ্যাসিড বা অ্যালকালীর অণু বলতে যেমন বোঝায় এখানেও তাই হওয়ার কথা। তবে ডি. এন. এ ও আর. এন. এ. হচ্ছে বিশিষ্ট জৈবঅণু। সাধারণ অণু নয়। ভৌতরসায়নের ভাষায় এদের বলা হয় "ম্যাক্রোমলিক্যুলস" (Macro-molecules)—অতিকায় অণু। অতি-অতিবৃহৎ অণু। অজৈব জড় পদার্থে এই ধরণের অণু হয় না। আদি জীবনরসায়ন প্রোটোপ্লাজমের মৌল উপাদানই হচ্ছে ঐ নিউক্লিয়িক এসিড। তার এক একটি অণুতে অর্থাৎ একটি ডি. এন. এ. বা আর. এন. এ. অণুতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সাধারণ জড় অণু-পরমাণু। দু-দশটি বিশটি বা দু একশত নয়। আর সেই অণু-সমন্বয়ে এমন একটি বিচিত্র জটিল গঠন—কাঠামো রয়েছে যা বাস্তবিকই অসাধারণ। এই গঠনবৈচিত্র্য গুণেই তারা ঐ রকম বৃহৎ আকারধারণে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটি বিশেষগুণ যাকে বলে স্বয়ংক্রিয়তা। এই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাবলেই তারা উপযুক্ত পরিবেশে নিজেরাই নিজেদের গঠন ও রক্ষণা-বেক্ষণে সক্ষম এবং প্রয়োজনমত নিজেদের দেহের দ্বিত্বকরণ (Duplication) দ্বারা তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমর্থ। প্রথমটিকে জীবনবিজ্ঞান বলে পুষ্টি আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে জননশক্তি বা বংশবিস্তার। এই দুটিই হচ্ছে আদি জীবনধর্ম। কোন জড় অণুর এই ক্ষমতা নাই। আবার প্রয়োজনীয় পরিবেশ বা ঐ গঠন কাঠামোটি নষ্ট হয়ে গেলে ডি. এন. এ, আর. এন. এ অণুতেও আর ঐ জীবনধর্ম থাকে না অর্থাৎ তাদের সেই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন তারা সাধারণ জড় অণু-পরমাণুতেই পরিণত হয়।

এখানে অবশ্য আর একটি কথার বিশেষ উল্লেখ একান্তই প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে ঐ বিশিষ্ট জৈবঅণুগুলির আবির্ভাব ঘটেছে মাত্র একবার,—অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। সাধারণ জড় অণু পরমাণু যেকোন সময়ই তৈরী হয় বা করা যায়। একইভাবে এক অণু থেকে আর এক অণুর সৃষ্টি বা রূপান্তর ঘটান যায়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পৃথিবীতে বারে বারে জড় অণুসমূহের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। আর সেইভাবে বিভিন্ন জড়পদার্থের উৎপত্তি এবং বহুভাবে তাদের রূপান্তর ও নতুন সৃষ্টি ঘটে চলেছে। কিন্তু নিউক্লিয়িক অ্যাসিড বা তাই দিয়ে তৈরী জিন, ক্রোমোজোম প্রভৃতিকে ঐভাবে নতুন করে তৈরী করা যায় না বা অন্য কোন অণু থেকে হঠাৎ তাদের নতুন ভাবে সৃষ্টিও হয় না। প্রকৃতির নিজস্ব রসায়নাগারে পৃথিবীর মৌল-উপাদানসমূহের পরস্পরের মধ্যে ধারাবাহিক ভৌতরাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় বিভিন্ন অণু, পরমাণু ও যৌগকণাদের মিলন মিশ্রণ সংযোজন বিভাজন প্রক্রিয়াদি চলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর ধরে জীবনশূন্য আদিম পৃথিবীর বুকে। তাতে নানারকমের ছোটবড় সহজজটিল বিবিধ অণু ও তাদের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকারের অ্যাসিড, অ্যালকালী, লবণ, দ্রবণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের উৎপত্তি যেমন হয়েছে তেমনি অণুদের আকার ও গঠন কাঠামোর মধ্যে চলেছে ক্রমিক বিবর্তনের ধারা। ক্রমশঃ ছোট থেকে বড় আকারের এবং সহজ থেকে জটিল কাঠামোর অণু সৃষ্টি হয়েছে। জড় অণুদের এই ধারাবাহিক পরিবর্তনকে বলা হয় আণবিক বিবর্তন—মলিক্যুলার ইভলিউশন (Molecular evolution)। এই সুদীর্ঘ বিবর্তন ধারার বিশেষ এক পর্যায়ে ঐ জড় অণু থেকেই তৈরী হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লিয়িক অ্যাসিড প্রভৃতি

ক্রমিক বৃহৎ জটিল জৈব অণুগুলি। আর পরিবেশের বিশেষ প্রভাবে শুধু ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড গোষ্ঠীর মধ্যেই জাগে সেই স্বয়ংক্রিয় ক্ষমতা। পরবর্তী দু'শত কোটি বছরের বেশী কাল তারা সেই ক্ষমতাটি ধরে রেখেছে ঐ গঠন বৈচিত্র্য গুনেই। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কেবল নিউক্লিয়িক অ্যাসিড থেকেই অনুরূপ আর একটি নিউক্লিয়িক অ্যাসিড অণুর জন্ম হয়েছে বা তাদের তৈরী একটি জিন থেকে অনুরূপ আর একটি জিন এবং একইভাবে একটি জীবন থেকে আর একটি জীবনের উৎপত্তি হয়ে চলেছে। অন্য কোন উপায়ে সাধারণভাবে অর্থাৎ অন্য কোন জড় উপাদান থেকে হঠাৎ করে আর জীবনের সৃষ্টি হয় না বা জীবনের মৌল উপাদান ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড (ডি. এন. এ., আর এন. এ) ও জিন প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না। সেইজন্যই পৃথিবীতে এদের আবির্ভাব বা প্রথম সৃষ্টিকে একটি আকস্মিক ঘটনা বলে বলা হয়। আর সেই আকস্মিক ঘটনায় অর্থাৎ জীবনের আদি উৎপত্তির মূলে কোন এক অলৌকিক শক্তির কথা কল্পনা করা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরেই। কিন্তু আসলে এতে অলৌকিকত্ব বলতে কিছুই নেই। প্রত্যেক পদার্থের যেমন পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে ঐ নিউক্লিয়িক অ্যাসিড গোষ্ঠীর মধ্যেও তেমনি বিশেষ গুণই হচ্ছে ঐ স্বয়ংক্রিয়তা। বিশেষ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে তাদের সেই ধর্ম প্রকাশ পায়। আর সেই পরিবেশকে তারা নিজেরাই তৈরী করতে ও রক্ষা করতে পারে। না পারলে আবার জড়েই পরিণত হয়।

গুণধর বর্মণ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সভ্য / সভ্যাগণের নিকট বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আপনার সভ্য / সভ্যা হিসাবে 1979 সালের চাঁদার মেয়াদ ডিসেম্বর '79 শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী বছরের (1980) চাঁদা আগামী 20শে ফেব্রুয়ারী '80 মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এখানে উল্লেখ্য বিধি অনুযায়ী 20শে ফেব্রুয়ারী '80 মধ্যে কেহ চাঁদা জমা না দিলে তিনি পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞানীর সম্মান

(ক) নোবেল পুরস্কার :—

পদার্থবিদ্যা :

মহাকর্ষ বল, তড়িৎ-চৌম্বক বল, শক্তিশালী নিউক্লীয় বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বল—প্রকৃতিতে আমরা এই চাররকম বলের কথা জানি। আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ধরে প্রথম দুটি বলকে একটি ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা পারেন নি। পাকিস্তানের আবদুল সালাম, আমেরিকার দু'জন বিজ্ঞানী অধ্যাপক শেলডন গ্ল্যাসো এবং অধ্যাপক স্টিভেন্ ভিনবার্গ-এর গবেষণায় তড়িৎ-চৌম্বক বল এবং দুর্বল নিউক্লীয় বলকে একটি ক্ষেত্রতত্ত্বের মধ্যে আনা সম্ভব হয়েছে; অর্থাৎ, তাঁরা দেখিয়েছেন, ঐ দুটি বল একটি বলেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। এজন্য উপরিউক্ত তিনজন বিজ্ঞানীকে 1979 সালের পদার্থ বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অধ্যাপক সালাম, পাকিস্তানের প্রথম পদার্থ বিজ্ঞানী যিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। তিনি এখন লণ্ডনের ইমপিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েনস্ এণ্ড টেকনোলজীর অধ্যক্ষ এবং ইটালীতে তত্ত্বীয় পদার্থ বিদ্যার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ।

রসায়ন :—

ইণ্ডিয়ানার অধ্যাপক হার্বার্ট ব্রাউন এবং পশ্চিম জার্মানীর অধ্যাপক জর্জ উইটিগকে জৈবরসায়নে বোরণ এবং ফসফরাস যৌগের প্রয়োগের জন্য রসায়নে 1979 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক উইটিগ একজন বধির; তাঁর বয়স এখন 83।

ঔষধ এবং শারীর বিদ্যা :—

চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'টমোগ্রাফি'-র অবদানের জন্য ইংলণ্ডের ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার জি. হাউন্সফিল্ড এবং আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অ্যালান করম্যাককে ঔষধ এবং শারীরবিদ্যা বিভাগে 1979 সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

দেহের অভ্যন্তরে কোন অংশের বহু এক্স্-রে ছবি তুলে সেগুলিকে গাণিতিক উপায়ে সংযুক্ত করে, অংশটির একটি ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তোলার পদ্ধতিই হল টমোগ্রাফি। এর তাত্ত্বিক উদ্ভাবক হলেন অধ্যাপক করম্যাক্ এবং সেই তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দেন হাউন্সফিল্ড। এই যন্ত্র এখন পৃথিবীর বহু উন্নতদেশের হাসপাতালে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(খ) ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের 45তম বার্ষিক সম্মেলনে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের জন্য নিম্নলিখিত ভারতীয় বিজ্ঞানীকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে :—

জগদীশচন্দ্র বসু স্মৃতি পুরস্কার—

(বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবরসায়নের অধ্যক্ষ ড: ডি. পি. বড়ুয়া)। বিষয়—আণবিক জীববিদ্যা।

চন্দ্রকোলা হোরা স্মৃতি পুরস্কার—

ড: ভি. জি. ঝিনগ্রাম (ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন অধিকর্তা) বিষয়—ভারতে মৎস্য চাষের উন্নয়ন।

ডি. এন ওয়াদিয়া স্মৃতি পুরস্কার—

ড: জে. বি আউডেন। বিষয়—ভূ-বিজ্ঞান।

সি. ভি রামন স্মৃতি পুরস্কার—

ড: সেলিম মৈজুদ্দিন আব্দুল আলি। বিষয়—পক্ষীতত্ত্ব।

বাসান্তর নাথ চোপরা স্মৃতি বক্তৃতা পুরস্কার—

ড: এ. জি. দত্ত (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন) বিষয়-জৈব জারণ প্রক্রিয়া।

[প্রতিবেদক—যুগলকান্তি রায়]

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

আমাদের সংস্কৃতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ গ্রামে সামিল হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে ইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙ্গন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, নন্দে-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই ান ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান, নেই মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।
সব রকমের প্ররোচনা ও চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জনসাধারণের শত্রু

.সি. এ. ২৬০৪৪।৭৯

বিষয়-সূচী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়ত্রিংশত্তম বর্ষ জানুয়ারী, 1980 প্রথম সংখ্যা

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও সাধারণ মানুষ

যুগলকান্তি রায়

দু-মাস আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের পারমাণবিক ও আণবিক পদার্থবিদদের যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের কারও কারও কণ্ঠে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ের অভাবের কথা শোনা গেছে। তাঁরা আক্ষেপ করে বলেছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা পরস্পরের কাজ পর্যালোচনার জন্যে নিয়মিত এক-সঙ্গে বসলে বিজ্ঞানীদের পরিশ্রম আরও সার্থক-ভাবে দেশের কাজে লাগত। এবছর 1লা ফেব্রুয়ারীর শেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 67তম অধিবেশনের প্রাক্কালে ভারতের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর এই আক্ষেপ ভারতের জনগণের কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকবে। কেননা, যে কয়েকটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 67 বছর আগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার একটি ছিল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনায় ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি নতুন অধ্যায় এই শতাব্দীর প্রথমেই শুরু হলেও তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেরকম কোন সংযোগ ছিল না। ফলে, দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তাঁরা কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে একযোগে এগোতে পারেন নি। সেদিন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি মিলন ক্ষেত্র রচনা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন দু-জন বৃটিশ বিজ্ঞানী—লক্ষ্ণৌর ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক ম্যাকমোহন এবং মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সাইমনসেন। বৃটিশ অ্যাসো-সিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অভ সায়েন্স (British Association for the advancement

of science)-এর অনুরূপ ভারতের বৈজ্ঞানিকদের একটি সংস্থা গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা 1911 সালে দেশের সত্তর জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের (ইউরোপীয় ও ভারতীয়) কাছে পত্র লেখেন। তাঁদের প্রস্তাবে যাঁরা সম্মত হলেন তাঁরা 1912 সালের 2রা নভেম্বর মিলিত হয়ে 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি' (Indian Science Congress Association) নামে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা গড়ার মনস্থ করলেন এবং প্রতি বছর এর অধিবেশনের ব্যবস্থা করার জন্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অভ বেঙ্গল' (Asiatic Society of Bengal)-কে অনুরোধ করলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি বিজ্ঞানীদের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে 1914 সালের 15ই থেকে 17ই জানুয়ারী কলকাতায় 1নং পার্ক ষ্ট্রীটের সোসাইটি ভবনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। ঐ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ঐ অধিবেশনে আশুতোষ সভাপতিরূপে বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন তা হল, বিজ্ঞানীরা নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করবেন, দেশের প্রয়োজনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রকল্প গ্রহণ করে তা রূপায়ণের জন্যে সরকারের কাছে সুপারিশ করবেন এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়-করণের মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করবেন।

প্রথম অধিবেশনে বিজ্ঞানের ছয়টি শাখার উপর আলোচনা হয়েছিল, এক'শ-পাঁচ জন বিজ্ঞানী যোগ দিয়েছিলেন এবং মোট পঁয়ত্রিশটি গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিল। এখন কম করে তেরটি শাখার উপর আলোচনা হয়, দেশ-বিদেশের সহস্রাধিক বিজ্ঞানী যোগ দেন এবং শতাধিক গবেষণাপত্র পাঠ করা হয়। তবুও তরুণ বিজ্ঞানীদের উৎসাহ সঞ্চারের যে উদ্দেশ্য নিয়ে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষকদের মিলিত করার যে পরিকল্পনা নিয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সাতষট্টি বছর পরেও তার অনেকটাই এখনো অপূর্ণ আছে। বরং বলা যেতে পারে, বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই নৈরাশ্য ক্রমশ বাড়ছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিচালকমণ্ডলীকে দায়ী করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। বিজ্ঞান কংগ্রেসকে সার্থক করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টা, ঐকান্তিক আগ্রহ একান্ত প্রয়োজন। আজ তারই অভাব বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে।

কলকাতার সাহা ইনষ্টিটিউট অভ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যক্ষ ডঃ অজিতকুমার সাহার সভাপতিত্বে এবারকার অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'দেশের শক্তি সমস্যা'। দেশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই কয়েক বছর ধরে এক একটি বিষয় মূল আলোচনার বিষয় রূপেই স্থির করা হচ্ছে। আগের চারটি বছরের আলোচ্য বিষয় ছিল, (1) বিজ্ঞান এবং পল্লী উন্নয়ন, (2) প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং ব্যবহার, (3) বিজ্ঞান শিক্ষা ও পল্লী উন্নয়ন এবং (4) আগামী দশকে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা। ঐ সমস্ত বিষয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সুপারিশ সরকার কতখানি কার্যকর করছেন, বা আদৌ করছেন কিনা এবং এ ব্যাপারে বিজ্ঞান কংগ্রেস কি ভূমিকা নিয়েছেন তার সঠিক খবর আজও অনেকের জানা নেই। গত বছর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ডঃ আর. সি. মেহরোত্রা আগামী দশকে 'ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা' শীর্ষক ভাষণে স্বীকার করেন, বিজ্ঞানের উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে ভারতের প্রভূত উন্নতি হলেও তা গ্রামের গরীব মানুষের কাছে এখনো বিশেষ লাভজনক হয় নি। তিনি এজন্য গ্রামীণ পরিবেশের অনুকূল স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মেয়াদী টেকনোলজীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। এই শতাব্দীর মধ্যেই এ ব্যাপারে কয়েকটি

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও তিনি ভেবেছেন বলে জানান। কিন্তু, আগামী দশকে কোন্ পথে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করবে তার কোন রূপরেখা তিনি দেন নি; এ ব্যাপারে কয়েকটি সমস্যার কথা বলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে এই এক বছরে কি স্থির করলেন জানি না। আমরা আশা করব, সরকারের কাছে নিয়মমাফিক সুপারিশ পাঠিয়েই বিজ্ঞান কংগ্রেস ক্ষান্ত থাকবে না, গ্রামীণ ভারতের গরীব মানুষের দিকে চেয়ে বিজ্ঞানীরা আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের তৃতীয় উদ্দেশ্যটি একরকম অবহেলিত বলা চলে। লোকরঞ্জক বক্তৃতার আয়োজন করা ছাড়া (যা আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য হয়) বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে আর কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস চোখে পড়ে না। স্কুল-কলেজের বাইরে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞান কংগ্রেস ছাত্রদেরও তেমন আকর্ষণ করতে পারেনি। এখনও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জনসাধারণের বিস্তর ব্যবধান। এই ব্যবধান কমানোর ভাল সুযোগ এখন বিজ্ঞান কংগ্রেসের সামনে আছে। সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান প্রচারের লক্ষ্য নিয়ে দেশে এখন বহু বিজ্ঞান ক্লাব, নানা ধরণের বিজ্ঞান সংস্থা গড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত অর্থ ও লোকবল না থাকায় এই সংস্থাগুলি (ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও) সেরকম কাজ করতে পারছে না। বিজ্ঞান কংগ্রেস এই সংস্থাগুলিকে সাহায্য করে এবং মহকুমা-মহকুমায় আরও এধরণের সংস্থা গড়ে এগুলির মাধ্যমেই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের একটি দীর্ঘ মেয়াদী সাধারণ কর্মসূচী নিলে অনেক ভাল ফল পেতে পারে।

বিংশ শতকের শেষেও যখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্ন বোধ করছেন, তরুণ বিজ্ঞানীদের মধ্যে যখন নৈরাশ্য প্রবল, গ্রাম ভারতের অবস্থা যখন করুণ এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান যখন একটা প্রহেলিকা তখন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উপযোগিতাও ফুরিয়েছে বলে যারা এর বিরূপ সমালোচনা করে দূরে সরে যান তাঁরা জাতির প্রতি অকর্তব্যই করেন বলে মনে করি।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। *** মনে করিওনা বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থ লাভই হয়। সংসারে মানুষের বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানবমন বিজ্ঞানবলে মার্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বিমান ও ঘুড়ি

অরুণকুমার ঘোষ*

[ঘুড়ির লড়াই করার মধ্যে অবিমিশ্র আনন্দ আছে কি? আর, সে লড়াই-এ জানার সুযোগই বা কতটুকু—মাঞ্জা দেওয়ার কলাকৌশল ছাড়া? আসুন না, আমরা ঘুড়ি ওড়ার মূল তত্ত্বগুলি জেনে ঘুড়ির ডিজাইন নিয়ে কিছু ভাবি।]

শহরের কথা স্বতন্ত্র, পশ্চিমবাংলার পাড়াগাঁয়ে এমন ছেলে পাওয়া যাবে কিনা জানি না যে কখনও ঘুড়ি ওড়ায় নি। ঘুড়ি-জগতের কত আশ্চর্য সুন্দর পরিভাষা—ভো-কাট্টা, লাট খাওয়া, গোঁৎ খাওয়া, লক দেওয়া, কান্নিক, ডবকা, মাঞ্জা! পশ্চিমবাংলায় বিশ্বকর্মা পুজোয় এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে মকর-সংক্রান্তিতে ঘুড়ির প্যাঁচে শুধু ছেলেপিলেরাই নয় তাদের বাবা-কাকারাও হামেশা জড়িয়ে পড়েন, কেউ কেউ হাবু-ডুবুও খান। কিন্তু দুঃখের কথা, মাঞ্জা ছাড়া আর কোনও অংশে কোনও বৈচিত্র্য নেই। সেই এক ঘুড়ি। এক তার আকার, প্রকরণও অভিন্ন। অথচ আমরা অনেকেই খবর রাখি না যে ঘুড়ির আকার ও প্রকার নিয়ে কত বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

আবার বিজ্ঞান কি—প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তরে বলা যায়, ঘুড়ির জন্য ঠিক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান গড়ে না উঠলেও, এরোপ্লেন ওড়ার যা বিজ্ঞান, এরোডাইনামিক্স (aerodynamics, বায়ুগতিবিদ্যা), ঘুড়ির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই বিজ্ঞান প্রয়োগ করে নানা ডিজাইনের ঘুড়ি বানানো, তার ভারবহন ক্ষমতা বাড়ানো, বা অল্প আয়াসে ওড়ানো ইত্যাকার নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অন্যের ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ লাগানোর মত, হয়ত বা তার থেকেও বেশি আকর্ষণীয়। প্রথমে আমরা বোঝবার চেষ্টা করি, এরোপ্লেন ওড়ে কেন?

ধরা যাক, কোনও নলের ভিতর দিয়ে জল যাচ্ছে। নলটার একাংশ অন্যান্য অংশের তুলনায় একটু সরু। নলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সরু জায়গাটায় জলের গতি একটু বেড়ে যাবে এবং জল ঐ জায়গায় নলে কম চাপ দেবে। এটাকে বলা হয় বার্নোলির তত্ত্ব। এবার 1নং চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে সেরকমভাবে এরোপ্লেনের দুটি ডানাকে উল্টে বসিয়ে ওপরের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করলে সহজেই বলা যায়, ডানা দুটোর মধ্যবর্তী অংশে হাওয়ার গতি বেড়ে যাবে ও ডানার পৃষ্ঠে বায়ুর চাপ কমে যাবে।

এবার যদি একটিমাত্র ডানাকে হাওয়ার গতিপথে রেখে দিই—একই কারণে তার ওপরের বক্রতলে

*বেহেক্ক কারেজ সেন্টার, ডঃ ই. মসেস রোড, ওর্লি, বোম্বে 400018

হাওয়ার চাপ কম হবে। ফলে সেটা ওপর দিকে উঠতে চাইবে। এরোপ্লেনের ডানার এই বিশেষ চেহারার কারণটা তাহলে বোঝা গেল। এই আকৃতির বস্তুকে ইংরেজিতে বলে এরোফয়েল (aerofoil)

এরোফয়েল ওড়ার সময় তার ওপর কী কী বল কাজ করবে? আগেই দেখেছি, এরোফয়েলের আকৃতির জন্য প্রবহমান হাওয়ায় সেটা ওপরে উড়তে চাইবে—অর্থাৎ একটা ঊর্ধ্বগ বল তার ওপর কাজ করবে। এই বলকে ইংরেজিতে বলে লিফ্‌ট (lift)।

দ্বিতীয়তঃ, অবশ্যই ভার কেন্দ্র থেকে তার ভার বা ওজন তাকে নিচের দিকে টানবে।

এছাড়া, বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণ থেকে উদ্ভূত আরও একটা বল এরোফয়েলটাকে পিছন দিকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করবে। এই বলের নাম ড্র্যাগ (drag)। প্রধানতঃ এই তিনটি বল এরোফয়েলের ওপর কাজ করবে। লব্ধি বল কতটা হবে সেটা নির্ভর করবে লিফ্‌ট, ড্র্যাগ ও ভারের পরিমাণের ওপর। খুব সহজেই বোঝা যায় ভার ও ড্র্যাগ কম হলে এবং লিফ্‌ট বেশী হলে এরোফয়েল সহজে ওপরে উঠবে। ড্র্যাগ কমাবার একটা উপায় হল এরোফয়েলটার উপরিতল ঘষে মেজে যথা সম্ভব মসৃণ করা (2নং চিত্র)।

বাতাসের গতি একই থাকলে আক্রমণ কোণের ওপর লিফটের কম-বেশী কেমন নির্ভর করে 3নং চিত্র দেখলে বোঝা যাবে।

আক্রমণ কোণ অতিরিক্ত বেশি হলে এরোফয়েলের পিছন দিকে হাওয়ায় আলোড়ন (turbulence) বা ঘূর্ণির (vortex) সৃষ্টি হতে পারে। ফলে লিফ্‌টের পরিমাণ কমে যায়।

এরোপ্লেন যাঁরা ডিজাইন করেন তাঁদের কাছে লিফ্‌ট ও ড্র্যাগের অনুপাত বা L/D অনুপাত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক কোনও প্লেনের L/D অনুপাত 30—তার অর্থ হল, লিফ্‌ট বল ড্র্যাগের
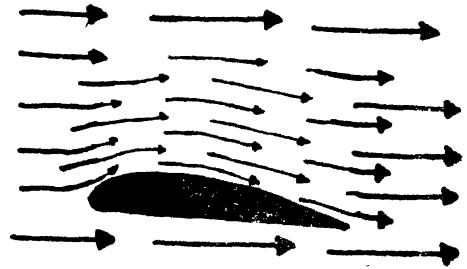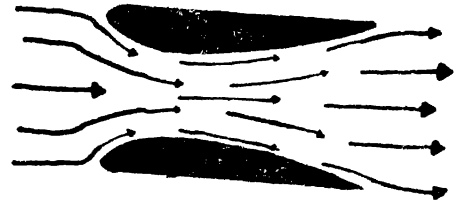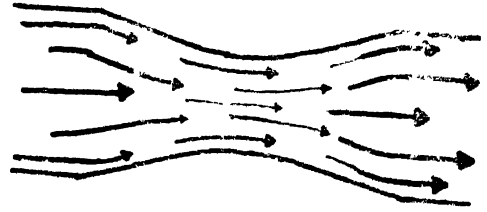
1নং চিত্র
যে অংশে জল বা বায়ুর গতিবৃদ্ধি হবে, সেই অংশে হাল্‌কা তীরচিহ্ন দেওয়া হয়েছে

তুলনায় 30 গুণ বেশী। এর ফলে চলন্ত অবস্থায় যদি এরোপ্লেনের ইঞ্জিন সহসা বন্ধ করে দেওয়া হয় তখন সেটা যে সময়ে 30 মিটার সামনে যাবে সেই সময়ে 1 মিটার নিচে নেমে আসবে। সাধারণতঃ মালবাহী প্লেনের L/D অনুপাত 15-এর কাছাকাছি হয়। অবশ্য, স্পষ্টতঃই কোনও প্লেনের L/D অনুপাত তার গতিবেগের ওপর

নির্ভরশীল। আমরা এতক্ষণ যে সংখ্যার কথা বলছিলাম সেটা প্রমাণ গতিবেগের সঙ্গে সম্পর্কিত।

L/D অনুপাত কমাবার বা বাড়াবার একটা উপায় হল ডানার অ্যাসপেক্ট (aspect) অনুপাত
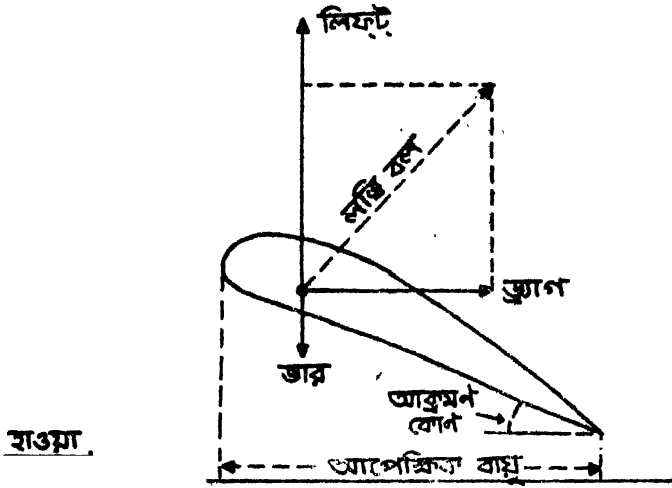
2নং চিত্র

কমানো বা বাড়ানো। সহজ কথায়, অ্যাসপেক্ট অনুপাত হল ডানার দৈর্ঘ্য ও গড়-প্রস্থের ভাগফল। অর্থাৎ অ্যাসপেক্ট অনুপাতের পরিমাণ বেশী হলে ডানার দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে বেশী হবে। সেই ক্ষেত্রে L/D অনুপাতও বেশী হয়—অর্থাৎ প্লেনের ভেসে থাকার ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তার অসুবিধাও আছে। এই ধরণের প্লেনকে যদৃচ্ছ আঁকাবাঁকা পথে চালানো প্রায় অসম্ভব। তাই যুদ্ধোপযোগী প্লেনের অ্যাসপেক্ট অনুপাত বেশি হলে চলে না।

এতক্ষণ আমরা এয়োরোফয়েলের ওপর নানারকম বলের আলোচনা করলাম। এবার তার ঊর্ধ্বাকাশে স্থিতির প্রসঙ্গে আলোচনা করব। অর্থাৎ প্লেন আকাশে উড়ছে, এখন তাকে সাম্যাবস্থায় রাখা কী প্রকারে সম্ভব? অথবা আমরা ভাবি, ঊর্ধ্বাকাশে তার কী ধরণের অসাম্য হওয়া সম্ভব।

এরোপ্লেনের ভিন্ন ধরণের অসাম্য হওয়া

রোল (roll)। 4নং চিত্র দেখলে বোঝা যাবে কোন্‌টা কী। এরোপ্লেনের তিনটি অক্ষ কল্পনা
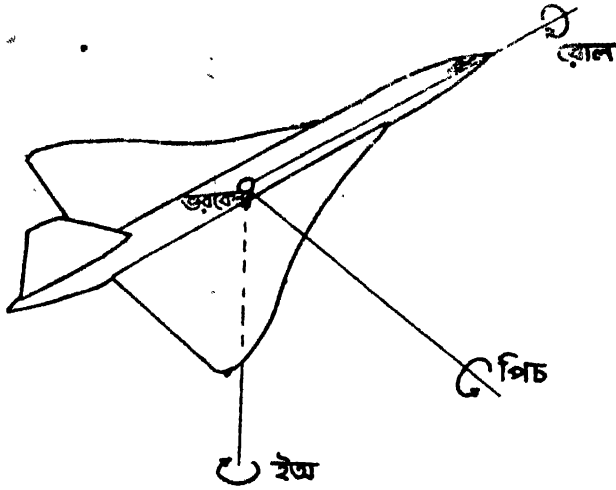
4নং চিত্র

করা যেতে পারে। আড়াআড়ি অক্ষের ওপর ঘূর্ণনের নাম পিচ্‌। লম্ব-অক্ষের ওপর ঘুরলে

5নং চিত্র

বলা হয় ইঅ। আর সামনে-পেছনে লম্বা যে অক্ষ তাকে অবলম্বন করে ঘুরলে বলি রোল।

5নং চিত্রে দেখানো হয়েছে এরোপ্লেনের কোন্‌ অংশ কী ধরণের অসাম্য নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। চিত্র দেখলে বোঝা যায় এরোপ্লেনের শারীরিক গঠনটা ওইরকম কেন। ইঅ নিয়ন্ত্রণ করতে পেছনের
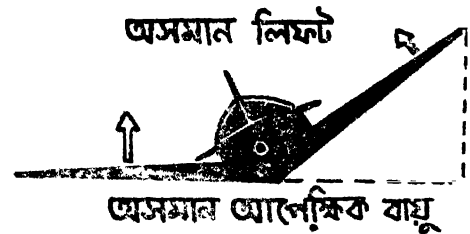
6নং চিত্র

অংশটা ওপরে ওঠানো। তার পিছনে থাকে রাডার (rudder, হাল)। পিচ নিয়ন্ত্রণ করতে লেজটাকে

দু-পাশে ছড়াতে হয়। রোল নিয়ন্ত্রণ করতে কিন্তু একটু অন্য ধরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। প্লেনের ডানাগুলি একই তলে না লাগিয়ে একটু কোণ করে লাগানো হয়। একে বলে ডাইহেড্রাল (dihedral)। ডাইহেড্রাল থাকার জন্যে প্লেন একদিকে একটু হেলে গেলে কী করে নিজে নিজেই সোজা হবার চেষ্টা করে 6নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।
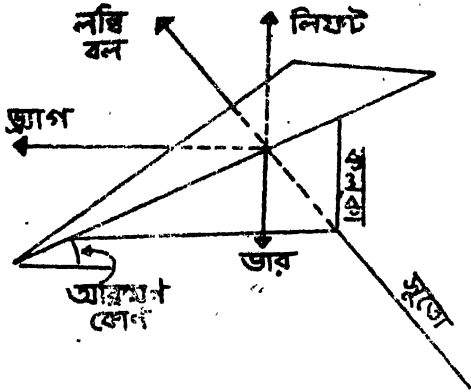
7নং চিত্র

এবার আমরা ঘুড়ির প্রসঙ্গে আসি। 7নং চিত্রে ঘুড়ির লিফ্‌ট, ড্র্যাগ ও ভারের অভিমুখ ও আক্রমণ কোণ দেখানো হয়েছে। ঘুড়ির কল্‌কা এমনভাবে বাঁধা দরকার যাতে লব্ধি বলের সঙ্গে সুতো এক লাইনে থাকে এবং এই লাইন ভারকেন্দ্র দিয়ে যায়। এই ব্যাপারটা বুঝতে হলে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা ভাবা যাক। ধরা যাক, একটিমাত্র বিন্দুতে দড়ি দিয়ে বেঁধে আড়াআড়ি ভাবে একটা রড ঝোলানো হয়েছে। সন্দেহ নেই এই বিন্দুটা রডের ভারকেন্দ্র। এবার যদি ভারকেন্দ্র ছাড়া রডের আর যে-কোনও বিন্দু থেকে একটা ছোট ওজন ঝোলানো হয়, রডটা আর অনুভূমিক থাকে না। কিন্তু যদি দড়িটা রডের দুটি প্রান্তে বাঁধা হয়, তখন অবস্থান বিশেষে ওজন ঝোলালে রড্‌টা সামান্য হেলে যেতে পারে। ঘুড়ির ক্ষেত্রে হাওয়ার প্রতিরোধকে ওজন ঝোলানোর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তাহলেই বোঝা যাবে দুটি বিন্দুতে কলকা বাঁধার কী সুবিধা। এবং এটা বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, এই বিন্দু দুটি যত দূরে হয় ততই ভাল।
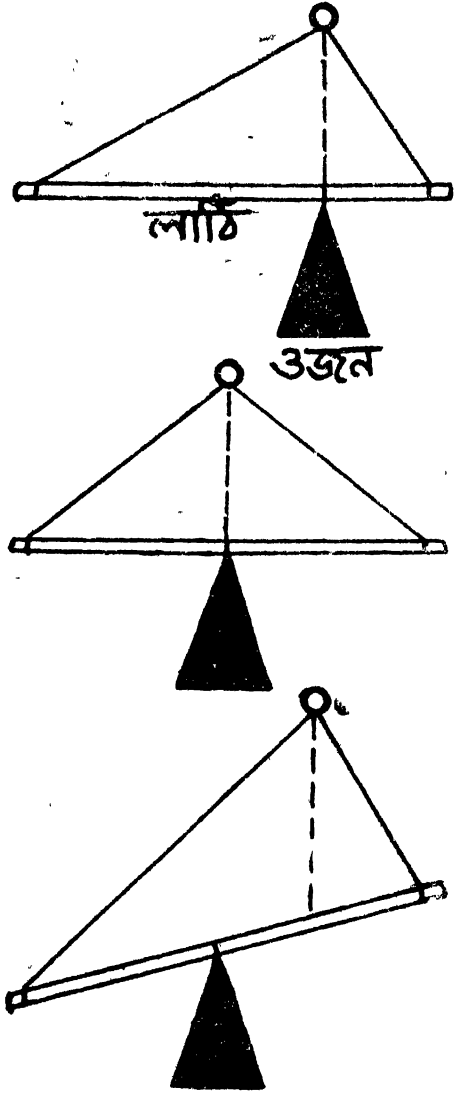
8নং চিত্র

দ্বিতীয়তঃ, ঘুড়ির কলকা বাঁধার ওপর তার আক্রমণ কোণ নির্ভর করে। 8, ৯ ও 10নং চিত্র থেকে বোঝা যায় হাওয়ার গতি কম হলে আক্রমণ কোণ বেশী ও গতি বেশী হলে কোণ কম হওয়া দরকার। চলতি-কথায় বলা হয়, হাওয়ার জোর কম হলে বেশী হাওয়া ধরানো দরকার। বেশি অথবা কম

হাওয়া ধরাতে কেবলমাত্র কল্‌কার সংযোজন—বিন্দু অ্যাডজাস্ট করলেই চলে।

এরোপ্লেনের মত ঘুড়িরও তিন ধরণের অসাম্য হতে পারে। আমরা যে ঘুড়ি বাজার থেকে কিনে

9নং চিত্র

10নং চিত্র
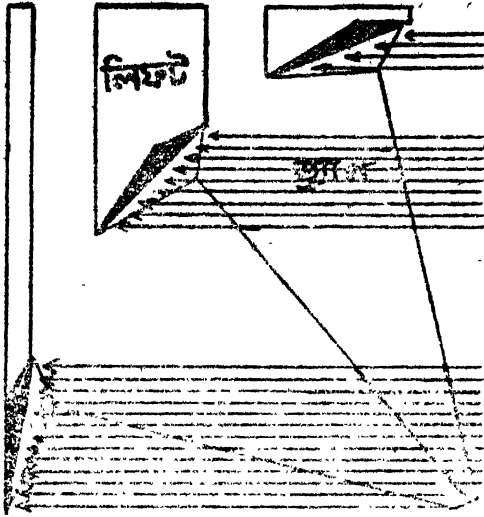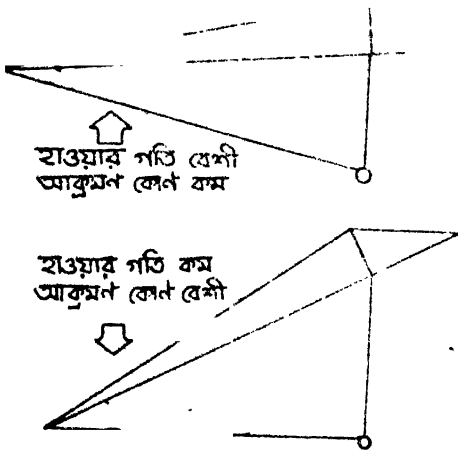
ওড়াই তাতে ডাইহেড্রাল থাকে না। ঘুড়িতে ধনুকের মত যে কাঠিটা থাকে সেটা সংনমনশীল। তাই ঘুড়ি ওপরে উঠলে হাওয়ার চাপে নিজে নিজেই তাতে ডাইহেড্রাল তৈরি হয়ে যায়। ঘুড়ির লেজের পাখ্‌না দুটি পিচ্ নিয়ন্ত্রণ করে। হাওয়ার চাপে এগুলি লাবাগ্র ওপরে উঁচু হয়ে কিয়দংশে ইয়-ও নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ ডিজাইনের দিক থেকে বিচার করলে ভারতীয় ঘুড়ি বেশ উচ্চস্তরের।

ঘুড়ির প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে তার অ্যাসপেক্ট অনুপাত বলা যেতে পারে। বাজারের ঘুড়ি তো আসলে যুদ্ধের প্রয়োজনে তৈরী, তাই লক্ষ্য করুন এর অ্যাসপেক্ট অনুপাত 1-এর কাছাকাছি। এর ফলে একে এদিক-ওদিক সহজেই চালনা করা যায়।

এবার আমরা একটা ঘুড়ি তৈরির কথা ভাবি যার অ্যাসপেক্ট অনুপাত 1-এর থেকেও কম। এই ধরণের ঘুড়ি দ্রুত এধার-ওধার চালনার পক্ষে উপযুক্ত হলেও এর সাম্য বজায় রাখা বেশ শক্ত। তাই এই ঘুড়িতে আমরা ডাইহেড্রাল তৈরি করে দেব। পেছনে কীল (keel) লাগানো থাকবে। কীলটা লাগানো হবে লম্বকাঠির সোজাসুজি অপর পিঠে।
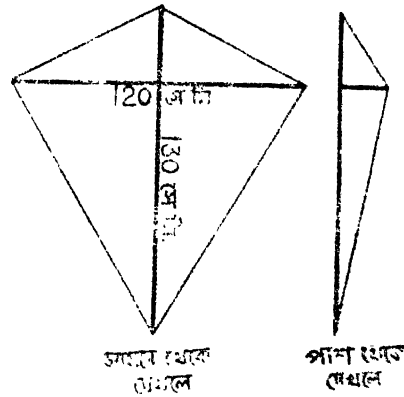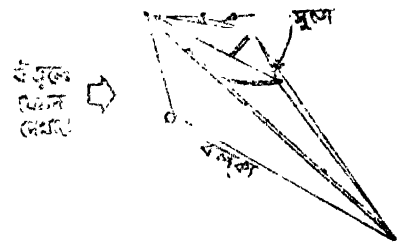
11নং চিত্র

কীলের সঙ্গে একটা কাঠি লাগাতে হবে—সেটা দেখাবে মাস্তুলের মত। ঘুড়ির আড়াআড়ি যে কাঠি তার প্রান্তদেশ দুটি মাস্তুলের সঙ্গে সুতো দিয়ে টানটান করে এমনভাবে বাঁধা হবে যেন ডাইহেড্রাল তৈরি হয়। কল্‌কা বাঁধা হবে লম্ব-কাঠির দুই প্রান্তে। 11নং চিত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ দেওয়া আছে। অন্যান্য মাপ আনুপাতিক। কাগজ, পলিথিন অথবা কাপড় দিয়ে এই ঘুড়ি তৈরি করা যায়। মনে রাখতে হবে ঘুড়ির ওজন বেশী হলে তাকে মাপে বড় হতে হবে।

জলের কথা

অভিজিৎ লাহিড়ী*

[কোন বিষয় যদি আমাদের কাছে খুব সহজ মনে হয় তবে আমরা বলি 'জলের মতো সোজা'। একটু ভেবে দেখলেই কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে জল বস্তুটা খুব একটা সহজ জিনিস নয়। জল আমাদের কাছে অতি পরিচিত একটা পদার্থ। কিন্তু অতি-পরিচয় চিরকালই ঔৎসুক্য আর অনুসন্ধিৎসার মহাশত্রু। তাই বিজ্ঞানের চোখে জল যে একটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস সেটা সাধারণত আমরা অনুভব করি না।]

জলের অদ্ভুত অদ্ভুত আচরণ বোঝানোর জন্য কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। আমরা সবাই জানি, বরফ জলে ভাসে। ঘটনাটা অতি-পরিচিত হলেও অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে এটা একটা বিরল ব্যাপার। এমন খুব কম জিনিসই আছে তরল দশায় যার ঘনত্ব কঠিন দশার চেয়ে বেশী। এ ব্যাপারে জল একটা ব্যতিক্রম কেন? ভূতাত্ত্বিক আর আবহাওয়াবিদদের জিজ্ঞাসা করলে জানা যাবে জলের এই সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারের প্রাকৃতিক তাৎপর্য কি প্রচণ্ড। বরফ জলে ভাসে বলে শীতের দেশে তাপমাত্রা খুব নেমে গেলে হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদির জল তলা থেকে জমে বরফ হতে পারে না; ওপরে বরফের একটা স্তর সৃষ্টি হয়ে ভাসতে থাকে। আর বরফ তাপের কুপরিবাহী বলে নীচের জলের তাপ সহজে বরফের স্তরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে না। ফলে বেশীর ভাগ জলই তরল অবস্থায় থেকে যায়, ওপরের বরফের চাদরটা কেবল অত্যন্ত ধীরে ধীরে পুরু হতে থাকে। খুব বেশী জল জমে বরফ হওয়ার আগেই আবার শীত শেষ হয়ে তাপ-মাত্রা বাড়তে থাকে। আর তার ফলে বরফের স্তরটা গলে জল হতে বেশী সময় লাগে না। বরফ যদি জলের চেয়ে ভারী হতো তবে শীতকালে ঐসব অঞ্চলে জলাশয়গুলির জল তলা থেকে জমে বরফ হতো আর অনেকটা পরিমাণ জল জমে যেত। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণীরা তো মারা যেতই, উপরন্তু গরমকালে সবটা বরফ গলতে পারত না। পৃথিবী-পৃষ্ঠে তরল জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসত, ফলে সূর্যের উত্তাপে জলীয় বাষ্প এখনকার মতো বেশী পরিমাণে তৈরি হতো না, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যেত, জল এবং জলীয় বাষ্পের তাপধারণ ক্ষমতার (এ নিয়ে একটু পরেই আলোচনা করছি) জন্য বায়ু-মণ্ডলে যতখানি তাপ আটকে থাকে তা মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীকে আরো ঠাণ্ডা করে দিত, ফলে আরো বেশী জল বরফে রূপান্তরিত হতো, আর এই-ভাবে পৃথিবী অচিরেই একটা চিরতুষারের রাজ্যে পরিণত হতো—পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই বিপন্ন হতো, কঠিন অবস্থায় জলের ঘনত্ব তরল অবস্থার চেয়ে কম—একথা বলার অর্থ হলো, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জল জমে বরফ হলে তার আয়তন বেড়ে যায়। জলের এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য আরো নানা রকম প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে থাকে। যেমন খুব ঠাণ্ডা পাহাড়ী জায়গায় পাহাড়ের খাঁজে জল ঢুকে থাকলে শীতকালে যখন সেই জল জমে বরফ হয় তখন তা আয়তনে বাড়তে চেষ্টা করে বলে প্রচণ্ড চাপ দেয়,

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ, কলিকাতা-700 006

আর সেই চাপে পাহাড়ের মধ্যে বিরাট বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়। পাহাড় ধ্বসে পড়ে। শীতের দেশে গরম জলের পাইপেও অনেক সময় জল জমে পাইপ ফেটে যায় এই কারণে।

জলের এই অদ্ভুত ধর্মের সঙ্গে তার আর একটা আশ্চর্য ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। আমরা জানি যে কোন তরল পদার্থকে গরম করলে তা আয়তনে বেড়ে যায় (জর দেখার থার্মমিটারে পারার এই ধর্মকে ব্যবহার করা হয়)। জলের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে 0° সে. থেকে জলকে গরম করলে 4° সে. পর্যন্ত তার আয়তন না বেড়ে বরং কমে যায়। তারপর অবশ্য আরো গরম করলে আয়তন বাড়তে থাকে। তাপমাত্রার সঙ্গে জলের আয়তনের এই অদ্ভুত সম্পর্ককে বলা হয় জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ। এই ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের জন্য শীতের দেশে তাপমাত্রা খুব কমে গেলে যখন হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদির জলের ওপরে বরফের স্তর ভাসতে থাকে, একেবারে নীচে তখন 4° সে. তাপমাত্রার একটা জলের স্তরে জলচর প্রাণীরা জীবনধারণ করে। প্রশ্ন—জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ হয় কেন?

জলের আরেকটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর তাপধারণ ক্ষমতা আর গলন বা বাষ্পীভবনের সময় তাপশোষণ ক্ষমতা খুব বেশী। কোন বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা সাধারণত প্রকাশ করা হয় তার আপেক্ষিক তাপের সাহায্যে; অর্থাৎ ঐ বস্তুর এক গ্রামের তাপমাত্রা 1° সে বাড়াতে হলে যে পরিমাণ তাপ দরকার হয় সেই পরিমাণের সাহায্যে। দেখা গেছে যে প্রায় সব জিনিসেরই আপেক্ষিক তাপ জলের চেয়ে কম; অর্থাৎ জলের আপেক্ষিক তাপকে যদি 1 ধরে নিই তবে অন্যান্য বস্তুর আপেক্ষিক তাপ হবে 1-এর চেয়ে কম। একটা খালি কেট্‌লিকে উনুনের ওপর ধরলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি সাংঘাতিক রকম গরম হয়ে যায় কিন্তু জল ভরা অবস্থায় ধরলে তা গরম হতে অনেক সময় লাগে। এর কারণ, কেট্‌লির ধাতুর আপেক্ষিক তাপ কম হওয়ায় উনুনের থেকে সামান্য তাপ পেলেই সেটার তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যায় কিন্তু জলের আপেক্ষিক তাপ বেশী হওয়ায় অনেকক্ষণ ধরে উনুন থেকে তাপ নেওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রা বেশী বাড়তে পারে না। রুক্ষ জায়গায় বা মরুভূমিতে যেখানে মাটিতে ও বায়ুমণ্ডলে জলীয় ভাগ খুব কম সেখানে দিনের বেলায় সূর্য ওঠার পর চট করে তাপমাত্রা খুব বেড়ে যায় কিন্তু বড় জলাশয়ের কাছাকাছি জায়গায় অথবা যে জায়গায় মাটির ভিতর বা বাতাসে জলীয় ভাগ বেশী সেখানে দিনের বেলায় তাপমাত্রা বাড়ে খুব ধীরে। এর ফলে শুকনো জায়গায় দিনের বেলা তাপমাত্রা অনেকটা বাড়লেও জলীয় আবহাওয়ার জায়গায় সারা দিনে তাপমাত্রা বাড়ে তার চেয়ে অনেক কম। আবার প্রথম ক্ষেত্রে তাপমাত্রা অনেকটা বাড়লেও মাটি বা বায়ুমণ্ডল যতখানি তাপ ধরে রাখে তার পরিমাণটা কিন্তু অনেক কম হয়, যার ফলে সূর্যাস্তের পর এসব জায়গা চট করে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অথচ জলীয় জায়গায় সারা দিনে তাপমাত্রা বেশী না বাড়লেও সে জায়গার জল অনেকখানি তাপ ধরে রাখে, যার ফলে সারা রাত্রি ধরে তাপ ছেড়ে দিলেও ঐ জায়গার তাপমাত্রা বিশেষ কমে না; অর্থাৎ রুক্ষ জায়গায় 24 ঘণ্টার মধ্যে তাপমাত্রার যতখানি বাড়া-কমা হয়, জলীয় জায়গায় তার তুলনায় তাপমাত্রা প্রায় স্থিরই থাকে। মরুভূমির যাত্রীরা দিনের বেলায় যেমন অসহ্য গরমে কষ্ট পান রাত্রে তেমন আবার তাঁদের সইতে হয় হাড়-কাঁপানো শীত। একইভাবে, সারা বছরের মধ্যেও রুক্ষ জায়গাগুলিতে তাপমাত্রার ওঠা-পড়া জলীয় জায়গার থেকে অনেক বেশী হয়। সমুদ্রের ধারে অবস্থিত জায়গাগুলিতে শীতকাল আর গরম-কালের পার্থক্য অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক কম থাকে। আবার জলাশয়ের ধারে অবস্থিত জায়গায় 'সমুদ্রবায়ু' আর 'স্থলবায়ু'র উৎপত্তিও হয় এই কারণে। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডল তাতে বছরের বিভিন্ন সময়ে যে নানারকম বায়ুপ্রবাহ হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার আবহাওয়া যার ওপর

অনেকাংশে নির্ভর করে, তার পিছনেও জলের এই তাপধারণ ক্ষমতার ভূমিকা অনেকখানি।

কিছু পরিমাণ জলকে যখন গরম করা হয় তখন বাইরে থেকে সরবরাহ করা তাপশক্তি পেয়ে জলের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে কিন্তু প্রমাণ চাপে জল যখন 100° সে.-তে ফুটতে থাকে তখন বাইরে থেকে তাপশক্তি সরবরাহ করলেও তাপমাত্রা বাড়ে না, সমস্ত জল ফুটে বাষ্প না হওয়া পর্যন্ত 100° সে.-তে স্থির থাকে। 1 গ্রাম জলকে বাষ্প করতে গেলে দেখা যাবে যে প্রায় 537 ক্যালরী তাপ প্রয়োজন হচ্ছে; অর্থাৎ জল এই পরিমাণ তাপ শোষণ করলেও সে তাপ তার তাপমাত্রা বাড়ানোর কাজে ব্যয় হয় না, ব্যয় হয় জলের অণুগুলির পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করার কাজে। আবার বাষ্প জমে জল হওয়ার সময় ঐ একই পরিমাণ তাপ বেরিয়ে আসে, কিন্তু তার দরুণ ঐ জলের তাপমাত্রা কমে না। বাষ্পীভূত হওয়ার সময় জল এই যে তাপ শোষণ করে (বাষ্প জমে জল হওয়ার সময় যা ছেড়ে দেয়) তাকে লীন তাপ বলা হয়। 100° সে.-এ ষ্টীমের সংস্পর্শে আনলে চামড়া পোড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে চামড়ার সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হওয়ার সময় জল যে তাপটুকু ছাড়ে সেটুকুই চামড়ায় ঢুকে চামড়াকে পোড়ায়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এছাড়াও ষ্টীম জমে জল হওয়ার সময় যে লীন তাপ ছাড়ে সেটা চামড়কে আরো বেশী পুড়িয়ে দেয়। জল বাষ্প হতে যে পরিমাণ লীন তাপ শোষণ করে তার পরিমাণটা অন্যান্য প্রায় সব তরল পদার্থের তুলনায়ই অনেক বেশী। ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রণে জলের এই বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা নিজেরা অনেক সময় জলের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাই গরমের দিনে ঘরের দেয়ালে, মেঝেতে বা খসখসের পর্দায় জল ছিটিয়ে। ঐ জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাতাস থেকে অনেকটা তাপ টেনে নিয়ে ঘর ঠাণ্ডা করে। গরমকালের শেষ দিকে অনেক সময় দেখা যায় আকাশে হঠাৎ বিরাট আকৃতির কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছে আর সেগুলি দেখতে হয়েছে অনেকটা ফুলকপির মতো, যেন তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অনেকগুলি বড় বড় আবর্ত। বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প জমে এই মেঘ সৃষ্টি হয়। কিন্তু জলীয় বাষ্প জমার সময় যে বিশাল পরিমাণ তাপ ছেড়ে দেয় সেই তাপ আশেপাশের বাতাসকে হঠাৎ সাংঘাতিক রকম গরম করে দেয়, যার ফলে সেই বাতাসের মধ্যে তীব্র আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই আবর্ত বা পরিচলন স্রোতের জন্যই মেঘগুলির আকৃতি হয় ফুলকপির মতো, তুবড়ীর আগুন যে ভাবে ছড়িয়ে পড়ে অনেকটা সেই ধরণের।

জল বাষ্প হওয়ার সময় যেমন লীন তাপ শোষণ করে, বরফ গলার সময়ও তেমনই পারিপার্শ্বিক থেকে লীন তাপ টেনে নেয়। জল জমে বরফ হওয়ার সময় এর উল্টোটা ঘটে; অর্থাৎ জল পারিপার্শ্বিকে লীন তাপ ছেড়ে দেয়। শীতের জায়গায় তাপমাত্রা যখন 0° সে-এর নীচে নেমে যায় তখন ছোট ছোট গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে কাচের ঘর বা 'গ্রীন হাউস'-এর ভিতর রেখে অনেক সময় সেই ঘরে বড় এক পাত্র জল রেখে দেওয়া হয়। কারণ ঐ জল যখন জমে বরফ হয় তখন যে লীন তাপ বেরোয় তা ঘরের বাতাসকে অনেকটা গরম রাখে। প্রতি গ্রাম বরফ গলার জন্য 80 ক্যালরী লীন তাপ প্রয়োজন হয়। জলের বাষ্পীভবনের লীন তাপের মতোই গলনের এই লীন তাপও অন্যান্য অনেক পদার্থের তুলনায় যথেষ্ট বেশী। জলের বাষ্পীভবন আর গলনের লীন তাপ এত বেশী কেন? জলের তাপীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্যের তালিকা এখানেই শেষ নয়। এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় জলের গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্কের বেলায়ও। প্রমাণ চাপে জলের গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক দুই-ই অস্বাভাবিক রকম বেশী। সাধারণত দেখা যায় যে একই ধরণের আণবিক গঠনবিশিষ্ট একাধিক পদার্থের মধ্যে যেটার আণবিক ভর সবচেয়ে বেশী তার গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্কও বেশী, আর যার আণবিক ভর যত কম তার গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তত কম। জলের ফর্মুলা H_2O (অর্থাৎ এক অণুতে দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন)। একই রকম গঠনবিশিষ্ট আরো কয়েকটা পদার্থ হলো

H_2Te, H_2Se আর H_2S, যেগুলিতে দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যথাক্রমে এক পরমাণু টেলুরিয়াম, সেলেনিয়াম ও সালফার। এদের মধ্যে আণবিক ভর সবচেয়ে বেশী H_2Te-র আর তার পর আসছে যথাক্রমে H_2Se, H_2S ও H_2O, এখন H_2Te, H_2Se আর H_2S-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক ক্রমশ বেশী থেকে কমের দিকে গেছে, অর্থাৎ ওপরে যে নিয়মের উল্লেখ করেছি তা এখানে খাটছে। কিন্তু জলের বেলায় এই নিয়ম একেবারে উল্টে গেছে। এই নিয়ম অনুসারে জলের গলনাঙ্ক আর স্ফুটনাঙ্ক হওয়া উচিৎ ছিল H_2S-এর চেয়ে কম, কিন্তু আসলে তা H_2Te-এর চেয়েও অনেক বেশী।

প্রশ্ন : এর কারণ কি? জলের গলনাঙ্কের সঙ্গে চাপের সম্পর্কটাও খুবই সৃষ্টিছাড়া। যে কোন জিনিসেরই গলনাঙ্ক চাপের ওপর নির্ভর করে। যেমন, বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপে জল 100° সে.-এ ফুটলেও তার চেয়ে বেশী চাপে স্ফুটনাঙ্ক 100° সে.-এর চেয়ে বেড়ে যায় আর কম চাপে স্ফুটনাঙ্ক হয় 100 সে.-এর চেয়ে কম। শুধু জল নয়, সব তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই স্ফুটনাঙ্ক চাপের সঙ্গে এভাবে বাড়ে-কমে। গলনাঙ্কের বেলায় কিন্তু জলের ব্যবহারটা অন্যান্য পদার্থের থেকে আলাদা। অধিকাংশ বেশীর ভাগ পদার্থের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বাড়ে আর চাপ কমালে গলনাঙ্ক কমে, কিন্তু জলের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। সাধারণ চাপে বরফ গলে 0°সে.-এ কিন্তু তার চেয়ে বেশী চাপে বরফ গলে আরো কম তাপমাত্রায়। জলের অন্যান্য সব অদ্ভুত ধর্মের মতো এই বৈশিষ্ট্যের প্রাকৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। পাহাড়ের ওপর বরফ জমতে জমতে যখন বরফের পরিমাণটা খুব বেড়ে যায় তখন ওপরের বরফের প্রচণ্ড চাপে নীচের স্তরের বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। ফলে নীচেকার বরফ গলে গিয়ে জলের পাতলা স্তর সৃষ্টি হয় আর সেই স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে ওপরের বরফ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। একেই বলা হয় হিমবাহ বা 'গ্লেসিয়ার'। চাপ বাড়লে বরফের গলনাঙ্ক যদি না কমতো তবে এইভাবে হিমবাহ পাহাড় থেকে নীচে নামতে পারতো না, উঁচু পাহাড়গুলির উপরে জমে থাকা বরফের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যেত, নদীনালার স্রোত ক্রমশ কমে আসত আর এসবের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়াটা সম্পূর্ণ পালটে যেত। বরফের ওপর পায়ে চাকা বেঁধে বা মোচার খোলার আকৃতির জুতো পরে যাঁরা স্কেটিং করেন তাঁদের স্বচ্ছন্দ গতিও নির্ভর করে জলের এই ধর্মের ওপর। আমাদের প্রশ্নের তালিকা আরো দীর্ঘ হলো— চাপ বাড়লে বরফের গলনাঙ্ক কমে কেন? এর পর আরো আছে। জলের পৃষ্ঠটান অন্যান্য অনেক তরল পদার্থের চেয়ে বেশী। পৃষ্ঠটান বলতে কি বোঝায় তার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি। একটা পাতলা রবারের টুকরো টান টান করে ধরলে সেটা বেশ কিছুটা ওজন সইতে পারে। খুব বেশী টান করে ধরে-থাকা রবারের পর্দার ওপর একটা লোহার
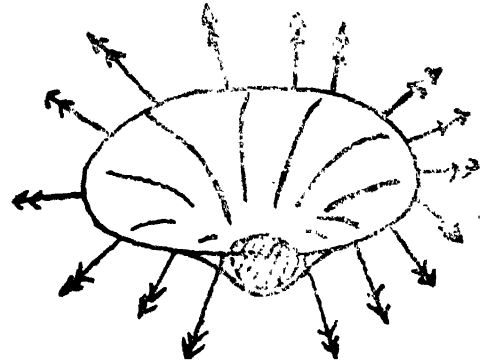
1নং চিত্র

বল রাখলে বলের ওজনে রবারের পর্দার মাঝখানটা যতটা নেমে যায় (1নং চিত্র) আলগা করে ধরে থাকা পর্দার ওপর ঐ বলটা রাখলে পর্দার মাঝখানটা তার চেয়ে বেশী নামে (2নং চিত্র)। রবারের পর্দার মাঝখানটা নেমে যেতে হলে তার তলের পরিমাণ বা ক্ষেত্রফল বাড়তে হয়। এখন পর্দাটাকে টান টান করে ধরে রাখার জন্য যে বলপ্রয়োগ করা হয়েছে সেটা তার ক্ষেত্রফল বাড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। পর্দাটাকে যত

বেশী টান টান করা হবে এই বাধার পরিমাণও হবে তত বেশী ফলে লোহার বলের ওজনের দরুন বাধাখানটা নামার পরিমাণ হবে কম। যে কোন তরল পদার্থের ক্ষেত্রে তরল পদার্থের ওপরের তলটা অনেকটা এরকম টান করে ধরে থাকা পর্দার মতো; কোন তরল পদার্থের ক্ষেত্রে টানের পরিমাণটা বেশী কোন ক্ষেত্রে আবার কম।
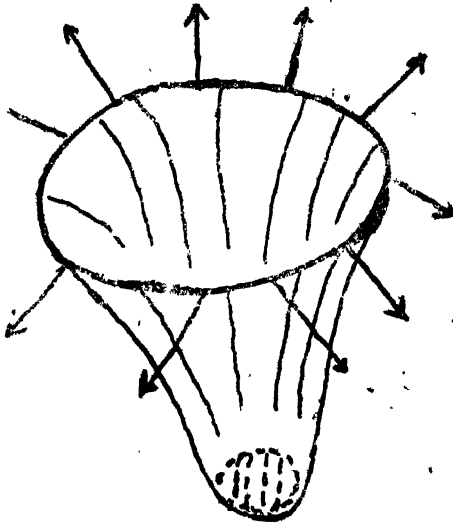
2নং চিত্র

এই টানটাকেই বলা হয় তরলের পৃষ্ঠটান। জলের ক্ষেত্রে এই পৃষ্ঠটানের পরিমাণটা অন্যান্য বেশার ভাগ তরল পদার্থের তুলনায় অনেক বেশী। একটা গেলাসে জল নিয়ে তার ওপর খুব সন্তর্পণে একটা সরু লোহার সূচ ছেড়ে দিলে দেখা যাবে যে সূচটা জলের ওপর ভাসছে। রবারের পর্দাটা যেমন লোহার বলের ওজন রেখেছিল, জলের ওপরের তলটাও তেমনি সূচের ওজনটা ধরে রাখে। লোহার বলটা খুব ভারী হলে যেমন পর্দাটা ছিঁড়ে বলটা পড়ে যেত তেমনই ঐ সূচের চেয়ে আরেকটু ভারী কিছু দিলে তা জলের ওপরের তলটা ভেদ করে ডুবে যেতো। রবারের পর্দা যতখানি ওজন সইতে পারবে তা যেমন নির্ভর করে পর্দাটা কতখানি টান করে ধরে রাখা হয়েছে তার ওপর, তেমনি তরল পদার্থের ওপরের তলও বিচ্ছিন্ন না হয়ে কতখানি ওজন সইতে পারবে তা নির্ভর করে তরল পদার্থের পৃষ্ঠটানের ওপর। জলের পৃষ্ঠটান বেশী বলে যে সূচ জলের ওপর ভাসে সেই সূচ আবার তেলের ওপর ছাড়লে ডুবে যাবে। অনেক সময় ছোট ছোট পিঁপড়ে বা পোকামাকড়কে জলের ওপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়। এরা এতই হালকা যে এদের ওজন জলের ওপরের তলকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জলের পৃষ্ঠটান বেশী হওয়ার আরেকটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কলের মুখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ার সময় তার বাইরের তলটা একটা থলির মতো ভিতরের তরল পদার্থের ওজনকে ধরে রাখে, যেমন হয় একটা রবারের বেলুনকে তরল পদার্থে পূর্ণ করে ছেড়ে দিলে। তরল পদার্থের ফোঁটাটা খুব বড় হলে কিন্তু বাইরের তলটা আর ভিতরের তরল পদার্থের ওজন ধরে রাখতে পারে না। তখন বড় ফোঁটাটা ছোট ছোট ফোঁটায় ভেঙে যায়। যে তরল পদার্থের পৃষ্ঠটান যত বেশী তার বাইরের তলটা তত বেশী ওজন ধরে রাখতে পারবে, অর্থাৎ তার ফোঁটাগুলিও তত বড় হবে। জলের পৃষ্ঠটান বেশী বলে কলের মুখ থেকে জল পড়ার সময় বা বৃষ্টিপাতের সময় জলের ফোঁটাগুলি হয় বড় বড়। জলের ফোঁটা মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যায় না। কারণ ছড়িয়ে পড়তে হলে ওপরের তলের ক্ষেত্রফল এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়তে হয়, পৃষ্ঠটান বেশী হওয়ার দরুণ যা সম্ভব হয় না। তাই মাটিতে ধাক্কা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটাটা প্রথমে কয়েকটা ছোট ফোঁটায় ভেঙে যায় আর এই ছোট ফোঁটাগুলি মাটি থেকে ছিটকে ওঠে। জলের পৃষ্ঠটান যদি আরো অনেক বেশী হতো তাহলে পুরো ফোঁটাটাই জলভর্তি বেলুনের মতো মাটি থেকে ঠিকরে উঠতো; অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে সেটা একটা বুলেটের মতো মাটিতে এসে ধাক্কা খেত। জলের পৃষ্ঠটান ততটা বেশী না হওয়ার অতদূর হয় না বটে কিন্তু সেটা কয়েকটা ফোঁটায় ভেঙে গিয়ে লাফিয়ে ওঠে। এর ফলে এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়লে মাটির ওপর তা যতটা ধাক্কা দেয় সেটা অন্য যে কোন তরল পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী। ফল দিয়ে জল

পড়ে পড়ে জলের আকার পাথর যত তাড়াতাড়ি ক্ষইয়ে দেয়, জল ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ তা পারত না। বৃষ্টির জলের ফোঁটা মাটিতে পড়েও জমিকে একইভাবে ক্ষইয়ে দেয়। জলের মাত্রাতিরিক্ত পৃষ্ঠটানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে আর একটা বৈশিষ্ট্য—কাচ, মাটি ইত্যাদি বস্তুর প্রতি জলের আসক্তি। জলের এই ধর্মকে বলা হয় আসঞ্জন (অ্যাডেসন) একপাত্র জলের মধ্যে একটা খুব সরু কাচের নল ঢুকিয়ে দিলে আসঞ্জনের দরুণ জল ঐ নলের ভিতরকার গা বেয়ে ওপরে ওঠে। গাছপালার শিকড়ের মধ্যে দিয়ে মাটির ভিতর থেকে জলীয় দ্রবণ ওপরে ওঠার পিছনেও এই ধর্মের ভূমিকা রয়েছে। আর এই আসঞ্জনের জন্যই মাটির ওপর দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার সময় অনেকটা পরিমাণ মাটি সঙ্গে করে টেনে নিয়ে যায়। বৃষ্টির জলের ধাক্কায় ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় আর জলের স্রোতের সঙ্গে মাটি পরিবাহিত হওয়া, এই ঘটনা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে যেমন জমির শস্যফলনক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তেমনই আবার মাটির বাঁধ আলগা হয়ে বন্যা ডেকে আনে। সমুদ্রগর্ভে প্রচুর পলিমাটি জমা হয়ে মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে, আর এরকম অন্যান্য নানা ঘটনা ঘটে।

এর পর বলতে হয় জলের আশ্চর্য দ্রবণ ক্ষমতার কথা। জলে বহু জিনিসই দ্রবীভূত হয়। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় নানারকম লবণের কথা। যে কোন জিনিস ধোওয়া বা পরিষ্কার করার জন্য যে আমরা সর্বদা জল ব্যবহার করি তার কারণ শুধু এই নয় যে জল সবচেয়ে সহজলভ্য তরল পদার্থ। জলের দ্রবণ ও (আসঞ্জন) যদি এত বেশী না হতো তবে ধোওয়া বা পরিষ্কার করার জন্য জল কোন কাজেই লাগতো না। সুতরাং জল সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের তালিকায় আরো একটা প্রশ্ন যোগ হলো—জলের দ্রবণ ক্ষমতা এত বেশী কেন? এ প্রসঙ্গে আরেকটা বিষয় একটু উল্লেখ করা দরকার। যে সমস্ত বস্তুর অণুতে আধান বন্ধনী বা 'আয়নিক বণ্ড'-এর প্রাধান্য রয়েছে (অর্থাৎ অণুর অংশগুলি যেখানে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বিপরীত-ধর্মী আধানের মধ্যেকার আকর্ষণজনিত বল দিয়ে) জল সে সব বস্তুর অণুগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে সহজেই তাদেরকে দ্রবীভূত করে। কিন্তু যে সব বস্তুর অণুতে আধানের প্রকাশ্য উপস্থিতি নেই—(এগুলিকে বলা হয় মেরুবিহীন অণু বা 'অ্যাপোলার মলিকিউল') তাদের ওপর জলের প্রভাব একেবারে অন্য রকম। অনেক সময় জলের মধ্যে এ ধরণের অণুগুলি ছড়িয়ে পড়ার বদলে পরস্পরের কাছাকাছি এসে দানা বেঁধে যায়। জলীয় মাধ্যমে মেরুবিহীন অণুগুলির মধ্যে এই পারস্পরিক আকর্ষণকে বলা হয় জলাতঙ্কজনিত আকর্ষণ বা 'হাইড্রোফোবিক অ্যাট্রাকশন'। এরকম অদ্ভুত নামের অর্থ কি—সেটা ব্যাখ্যা করার অবকাশ অবশ্য এখানে নেই। কোটি কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলে প্রথম জীবকোষের আবির্ভাবের পিছনে এই আকর্ষণের বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। জীবকোষের স্বাভাবিক গঠন ও কাজের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন : জলাতঙ্ক-জনিত আকর্ষণের কারণ কি?

এতগুলি প্রশ্নের ধাক্কায় প্রপীড়িত হয়ে কেউ যেন আবার জলাতঙ্ক রোগের কবলে না পড়েন। কারণ বিজ্ঞান জলের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনেকটাই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে। তবে সে স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

[সূত্র : কেনেথ ডেভিস ও জন ডে—'ওয়াটার, দি মিরর অফ সায়েন্স' (হাইনম্যান, লণ্ডন)।]

ব্লাড-প্রেসার

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই রক্তচাপ (Blood Pressure) রোগের আধিক্য দেখা দিয়েছে। বর্তমানে রোগটির ব্যাপকতার এবং ক্ষতিকর সম্ভাবনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বিশ্বব্যাপী তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। সেই জন্য সাধারণ লোকেও রক্তচাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং আতঙ্কগ্রস্ত। আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই রক্তচাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণার অভাব।

রক্তচাপটা কি ব্যাপার? যে কোনও নলের ভেতর দিয়ে যদি কোনও তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়, তাহলে নলের গাত্রে ঐ তরল পদার্থ একটা চাপ সৃষ্টি করে। আমাদের দেহের অভ্যন্তরে অসংখ্য ধমনী, শিরা ও তাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত শোণিত সঞ্চারিত হচ্ছে। সুতরাং ঐসব রক্তবাহীনলের মধ্যে সর্বদাই একটা চাপ থাকে। এই চাপকেই বলা হয় ব্লাড প্রেসার অর্থাৎ রক্তচাপ। এইখানে একটা কথা বলে নিই। হৃদপিণ্ড থেকে যে নলের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে সেই রক্তবাহী নলের নাম ধমনী আর যে নলের ভিতর দিয়ে ঐ রক্ত বিভিন্ন অংশ থেকে হৃদপিণ্ডে ফিরে আসে তাকে বলে শিরা। রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ঐ ধমনীর রক্তচাপকেই বোঝায়।

এই চাপ সব বয়সের সব মানুষের রক্তেই আছে। সেই চাপের জোরেই শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত চলাচল করে। তবে সেই চাপের একটা স্বাভাবিক মাত্রা আছে। দেহের উষ্ণতার যেমন একটা স্বাভাবিক মাত্রা থাকে যার বেশী হলে আমরা বলি জ্বর, তেমনি ধমনীর রক্তচাপেরও যে স্বাভাবিক মাত্রা আছে তার বেশী হলে আমরা বলি হাই ব্লাডপ্রেসার (High blood pressure)—চলতি কথায় শুধু ব্লাড প্রেসার বা প্রেসার।

এইখানে আর একটি প্রসঙ্গের আলোচনা দরকার। ধমনীর মধ্যস্থিত রক্ত সর্বদা সমবেগে সঞ্চালিত হয় না। ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের মূল উৎস হল হৃদযন্ত্র। যেটা আসলে একটি পাম্প মেশিন। হৃদযন্ত্র মুহুর্মুহু সংকুচিত হয়ে ধমনীর ভিতরে রক্ত সঞ্চালন করে। সুস্থ শরীরে হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে নিয়মিত ভাবে 70/72 বার পর্যায়ক্রমে সংকুচিত হয় ও আবার প্রসারিত হয়। সংকুচিত হলেই হৃদপিণ্ডের ভিতরের রক্ত সজোরে ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত হয়। তখনই ধমনীতে রক্তের পরিমাণ তথা চাপ বৃদ্ধি পায়। পরক্ষণেই হৃদযন্ত্র প্রসারিত হয়ে সংকোচনের আগের অবস্থায় ফিরে আসে তখন ধমনীতে রক্তের চাপ আগের থেকে কমে যায়। আর এই হৃদযন্ত্র প্রসারিত হওয়ার সময়ই শিরার ভিতর দিয়ে ফিরে-আসা রক্ত হৃদপিণ্ডের মধ্যে জমা হয়। পরবর্তী সংকোচনে সেই রক্ত আবার বেরিয়ে যায়। তাই হৃদযন্ত্রের সংকোচন-প্রসারণের সঙ্গে ধমনীতে রক্তচাপ পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। হৃদযন্ত্রের সংকোচন ক্রিয়ার নাম সিস্টোলী বা সিস্টোল (Systole) এবং প্রসারণের পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার কার্যক্রমকে বলে ডায়াস্টোলী বা ডায়াস্টোল (Diastole)। সিস্টোলীর সময়ই ধমনীতে সর্বোচ্চ চাপ হয়। তাকে বলে সিস্টোলিক প্রেসার (Systolic Pressure) আর ডায়াস্টোলীর সময়ই সর্বনিম্ন চাপ হয় তাকে বলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার (Diastolic Pressure)। রক্তচাপ পরিমাপ

*25-এ নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6

করার সময় এই দুই রকম চাপই নির্ণয় করতে হয়। দুই রকম চাপেরই বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এখন জ্বর বললে যেমন কোন বিশেষ রোগ বোঝায় না তেমনি রক্তচাপবৃদ্ধি বললেও ঠিক একটা কোন নির্দিষ্ট রোগ বলা যায় না। বিভিন্ন কারণেই এই রক্তচাপে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সাধারণ শরীরে যে পরিমাণে রক্ত আছে এবং নিয়তই সঞ্চালিত হচ্ছে যদি কোন কারণে সেই রক্তের সামগ্রিক পরিমাণ (Total volume) বৃদ্ধি পায় তবে স্বাভাবিক ভাবেই ধমনী মধ্যস্থ রক্তের চাপও বৃদ্ধি পাবে। রক্তের সামগ্রিক পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটে মূলতঃ তার জলীয় অংশের বৃদ্ধির ফলেই। আর রক্তের জলীয় অংশে বিভিন্ন রকমের লবণ, বিশেষ করে আমাদের সাধারণ খাদ্যলবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যাংশ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যে কোন দ্রবণে এই দুই রকমের পদার্থ বেশী থাকলে সেই দ্রবণের জলধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। সুতরাং রক্তে যদি কোন কারণে আমাদের খাদ্যলবণ ও আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যাংশ বৃদ্ধি পায় তবে আমাদের শরীরের সামগ্রিক রক্তের পরিমাণ (volume) বেড়ে যায়। তাতে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে ত্রুটি বা রোগটি হচ্ছে মূলতঃ ঐ লবণ ও প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের বিপাকীয় পদ্ধতির কোথাও গোলমাল। সেই জন্য তখন লবণ ও প্রোটিনজাতীয় খাদ্যগ্রহণ সীমিত করেই ঐ রক্তচাপ বৃদ্ধি সংযত করতে চেষ্টা করা হয়। তারপর হৃদপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। যদি কখনও তার কর্মক্ষমতা বেড়ে যায় তাহলে সাধারণ অবস্থায় যে পরিমাণ রক্ত হৃদযন্ত্র থেকে ধমনীতে প্রবাহিত হয় ঐ অবস্থায় ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণও বেড়ে যাবে। তাতে ধমনীর রক্তচাপ বৃদ্ধি পাবে। আবার যে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় সেই ধমনীতো পাতলা রবারের নলের মত জিনিস। রবারের মতই সেই সব ধমনীগাত্রের একটা স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) আছে। হৃদযন্ত্রের সংকোচনকালে অর্থাৎ ঐ সিস্টোল-এর সময় যখন বেশ কিছুটা রক্ত সজোরে ধমনীর মধ্যে পাম্প করে দেওয়া হয় তখন সেই বেশী রক্তের চাপে ধমনীগাত্র স্বাভাবিকভাবে কিছুটা প্রসারিত হয়ে যায় ও ডায়াস্টোলের সময় তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। যদি কোন কারণে ধমনীগাত্রের এই সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা বা স্থিতিস্থাপকতা শক্তি হ্রাস পায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন হৃদযন্ত্র থেকে যতটুকু রক্তই ধমনীর মধ্যে পাম্প করে দেওয়া হোক না কেন ধমনীগাত্রে তার চাপের মাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশীই অনুভূত হবে। এতেও রক্তচাপ বাড়বে। রোগটি তখন ধমনীর গাত্রেই। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা শক্তি কমে গেলে তার ভিতরের ফাঁপা অংশে আভ্যন্তরীণ পরিধি বা ঘেরটা ক্রমে ছোট হয়ে যায়। আর জলের পাইপের মধ্যে যেমন ময়লা জমে গিয়ে তার ভিতরে ছিদ্রপথ ক্রমে সরু হতে থাকে, ধমনীর মধ্যেও এমন দু-একটি রোগ হয় যাতে তার ছিদ্রপথ ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে যায়। এই সরুপথে স্বাভাবিক মাত্রায় রক্ত গেলেও ধমনীর গায়ে তার চাপ যথেষ্ট বেশী হয়ে পড়বে। প্রথম অবস্থাকে অর্থাৎ ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস হওয়াকে বলে আর্টারিওস্ক্লেরোসিস (Arteriosclerosis) আর পরের অবস্থাকে বা ধমনীর অভ্যন্তরে কিছু জমে গিয়ে তার ছিদ্রপথ সংকুচিত হয়ে যাওয়াকে বলে অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস (Athirosclerosis)। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, সাধারণতঃ পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে ধমনীর গায়ে গায়ে এই জাতীয় পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে থাকে। এই দুই অবস্থাতেই ধমনীগাত্রে চাপ সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।

এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আমাদের শরীরে যে অসংখ্য—মানে শত শত কোটি (প্রায় 75 ট্রিলিয়ন) কোষ রয়েছে যা দিয়ে বিভিন্ন কলা ও সমগ্র অঙ্গসংস্থান তৈরী, তাদের প্রত্যেকের অবস্থান ও দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কেউই কখনও সচেতন নই অথচ তারা অতি সুনিপুণভাবে অবিরাম কাজ করে চলেছে। এদের প্রায় সব কাজই স্বনিয়ন্ত্রিত ও

পারস্পরিক নিখুঁত যোগসূত্রে গ্রথিত। আমাদের সাধারণ ইচ্ছাশক্তির ওপর তারা নির্ভরশীল নয়। সেই জন্য তাদের বলা হয় স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা (Automatic System)। তাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়। শরীরাভ্যন্তরে সেই সব স্বয়ংক্রিয় তন্ত্র ও পদ্ধতির মধ্যে যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদানের বহুবিধ সূক্ষ্ম সংবেদনশীল গ্রাহক-প্রেরক ব্যবস্থা রয়েছে যার বেশীর ভাগই রক্ত মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। আবার রক্তমাধ্যমেই ঐ কোটি কোটি কোষ, কলা, বিভিন্ন অঙ্গসংস্থান ও যন্ত্রাংশের রক্ষণ পোষণ ও কর্মক্ষমতার উপযোগী উপাদান প্রত্যেকের কাছে যথাযথভাবে উপস্থিত হয়। সুতরাং একদিকে স্বয়ংক্রিয় প্রথায় রক্তের উৎপাদন, তার স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ষণ, তার মধ্যে দ্রবীভূত লবণ ও অন্যান্য বস্তুর পরিমাণ স্থিরীকরণ, রক্ত সঞ্চালনের উপযোগী রক্তবাহী নলসমূহের গঠন এবং তাদের প্রকৃতি নিরূপণ ও সেই সঙ্গে হৃদযন্ত্রের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় তেমনি এইসবের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজেও আরও কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির যোগাযোগ রয়েছে এবং সর্বোপরি পরিবেশেরও প্রভাব রয়েছে। এই জটিল এবং বহুবিস্তৃত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসমূহের যে কোন এক বা একাধিক ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে রক্তচাপের হ্রাস-বৃদ্ধিও ঘটবে। সেটা কখনো দীর্ঘস্থায়ী, আবার কখনও স্বল্পস্থায়ী হতে পারে। আর তার উপরেই রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগের গুরুত্ব নির্ভর করে। এই জন্যেই রক্তচাপ নিজে কোন একটা রোগই নয়।

এখন রক্তচাপের স্বাভাবিকতা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সিস্টোলিক চাপ 140 থেকে 150 মি. মি ও ডায়াস্টোলিক চাপ 90 থেকে 100 মিলিমিটারের মধ্যে থাকলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। এর ঊর্ধ্বে গেলেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। আর উচ্চ চাপ *105*-এর নীচে নামলে অসুস্থ বোধ করার কথা। আবার বর্ধিত রক্তচাপে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কোন উপসর্গই দেখা দেয় না। উপসর্গ বা কষ্ট যা থাকে তারও বেশীর ভাগ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়; অর্থাৎ ঐ কষ্টগুলি অন্যান্য রোগেও থাকতে পারে, যেমন মাথার যন্ত্রণা, মাথাঘোরা, অথবা সিঁড়িতে উঠলে হাঁফ লাগা ইত্যাদি। সাধারণ লোকে মাথাঘোরা বা মাথার যন্ত্রণাকেই বেশী গুরুত্ব দেয়। তাই মাথার যন্ত্রণা বা মাথা ঘুরলেই ব্লাডপ্রেসারের ভয়ে আতঙ্কিত হন, তা সে জ্বরের জন্যই মাথা ঘোরা হোক বা সর্দির জন্য মাথার যন্ত্রণা হোক। আবার বেশী রেগে যাওয়াকে অনেকে রক্তচাপ বৃদ্ধির লক্ষণ মনে করেন। এই সব ক্ষেত্রে রোগের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান না করে রক্তচাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একটা বিশেষ মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে তার ফলে সে নিয়মিত কাজকর্ম করতে পারে না। এই জাতীয় দীর্ঘস্থায়ী মানসিক অশান্তি শেষ পর্যন্ত তার রক্তচাপ রোগের অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ স্নায়ুর উত্তেজনা মস্তিষ্কে, হৃদযন্ত্রে ও সমগ্র রক্তসঞ্চালন পদ্ধতির স্বয়ংক্রিয় কার্যকারিতায় বিপর্যয় এনে দেয়। তাই রক্তচাপের ভয়ে অহেতুক শঙ্কিত না হয়ে যথাসময়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে রোগনির্ণয় একান্ত প্রয়োজন।

কোন কোন ব্যক্তি ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে শক্তি সামর্থ্যের একটা সম্বন্ধ আছে বলেও মনে করেন। কোন কারণে শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করলে তাঁদের রক্তচাপ বুঝি নিম্নমুখী হয়েছে অনুমান করে থাকেন। কিন্তু রক্তচাপের সঙ্গে শক্তিসামর্থ্যের যথার্থ সম্বন্ধ নেই। অনেক বলিষ্ঠ ব্যায়ামবিদেরও বেশ কম রক্তচাপ দেখা যায়।

রক্তচাপবৃদ্ধির মূলগত কারণের উপরেই রক্ত চাপের হানিকর প্রভাব নির্ভর করে। যদি ধমনীগাত্রে সংকীর্ণতা বা কাঠিন্য (sclerosis) হেতু রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তাহলে মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অংশের সরু ধমনীগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে বা রক্তচাপের বেগ সামলাতে না

পেরে ছিঁড়ে গিয়ে আকস্মিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তেমনি রক্তের অতিরিক্ত লবণ ও জল নির্গমনের প্রধান পথ হচ্ছে বৃক্ক (Kidney) বা মূত্রযন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কালে সাধারণ পরিস্রাবণ (Filtration) প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্তের অতিরিক্ত লবণ ও জলীয় অংশ বাইরে মূত্র আকারে নির্গত হয়। এই বৃক্ক বা কিড্‌নির কোন রোগে যদি মূত্রের পরিমাণ কমে যায় তাহলে রক্তে লবণ ও জলের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করবে। আর শরীর মধ্যস্থ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহ সেই অতিরিক্ত লবণ ও জল নিষ্কাশনের চেষ্টায় ভুলক্রমে আরও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে কিড্‌নির পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া বাড়াবার চেষ্টা করবে। স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রগুলি এইখানেই অন্ধের মত কাজ করে। তারা রক্ত থেকে লবণ ও জল নিষ্কাশনের স্বাভাবিক পথ সেই কিড্‌নীর উপরই চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তাতে চক্রাকারে রক্তচাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েই চলে কিন্তু অসুস্থ কিড্‌নী রক্ত পরিশোধনে সক্ষম হয় না। একই ভাবে স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয় তন্ত্রগুলি অনেক সময় একটি অংশের অসুস্থতার সময় অন্য অংশগুলি ভুলক্রমে মাত্রাতিরিক্ত কাজ করে উত্তরোত্তর রক্ত চাপ বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলে। তাতে সুস্থ যন্ত্রগুলিও পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ত-চাপ বৃদ্ধির মূল কারণ নির্ণয়ই আসল কথা, রক্ত-চাপ বৃদ্ধিই আসল রোগ নয়।

তাই রক্তচাপ বৃদ্ধি ধরা পড়লেই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া একান্ত কর্তব্য এবং রক্তচাপের জন্য আতঙ্কিত না হয়ে আসল রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার। তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবেশে কোন সময় সাময়িকভাবে হঠাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। আভ্যন্তরীণ রোগ ছাড়া অত্যধিক পরিশ্রম, নানাবিধ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ, ভয় পাওয়া, অত্যধিক যন্ত্রণা প্রভৃতি কারণে সাময়িকভাবে হঠাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। সেই বৃদ্ধিটা প্রকৃত রোগের পর্যায়ে পড়ে কিনা সেটা পরবর্তীকালে নিশ্চিত করে নিতে হয়। নতুবা একবার রক্তচাপ হঠাৎ কোন কারণে বেশী দেখলেই মনের মধ্যে তার ভীতি পরবর্তীকালে ক্ষতিকর হতে পারে।

রক্তচাপ বৃদ্ধির একটা স্থায়ী নির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকায় অর্থাৎ বহু কারণে এই চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় এই রোগের পূর্ণ নিরাময় বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা সব সময় সম্ভব নয়। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, এই চাপ যত বেশীই হোক তাকে উপযুক্ত চিকিৎসায় সীমিত সীমার মধ্যে রাখা বা আনা যায়। কিন্তু একবার সেই চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলেই চিকিৎসা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ নিয়মিত চিকিৎসা ছাড়া এই চাপ যে কোন সময় বেড়ে যেতে পারে। আর এই রোগ প্রতিরোধেরও নির্দিষ্ট বা সঠিক কোন উপায় নাই। তবে সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষাই সর্বোত্তম পথ। অহেতুক শরীরের ওজন বৃদ্ধি যাতে না ঘটে সে কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। তার জন্য কতকগুলি খাদ্যাভ্যাস পালন করা উচিৎ। বেশী লবণ খাওয়া, ঘি, মাখন, ডালডা জাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে খাওয়া বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সে যথাসম্ভব বারণ। বেশী মিষ্টি জাতীয় আহারের দ্বারাও শরীরের মেদ বৃদ্ধি ও

ওজন বৃদ্ধি ঘটে। কায়িক শ্রমের তুলনায় বেশী আহার করলে শরীরে চর্বি জমা হওয়ার সম্ভাবনা। তাই আহারের সঙ্গে কায়িক শ্রমের সমতা রেখে কর্মঠ জীবনযাপন এবং প্রয়োজনমত যথেষ্ট অঙ্গ সঞ্চালনের খেলাধূলার অভ্যাস শরীরের অহেতুক মেদ জমা হতে দেয় না, শরীরের ওজন স্বাস্থ্য-সম্মত সীমার মধ্যে রাখে। সুতরাং মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের সীমিত আহার ও উপযুক্ত শ্রমের মাধ্যমে মেদবৃদ্ধি রোধ করে রক্তচাপ বৃদ্ধি আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায়। তবে কোন কোন পরিবারের এই মেদবৃদ্ধি ও রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রবণতা বংশানুক্রমিকভাবে দেখা যায়। সেই সব পরিবারে অপেক্ষাকৃত কম বয়স থেকেই এই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং প্রকৃত চিকিৎসকের নির্দেশ যথাযথভাবে মেনে চললে রক্তচাপ সম্পর্কে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই।

বাগদাজাতীয় চিংড়ির জননক্রিয়া ও জীবনচক্র

নরেশমোহন চক্রবর্তী*

[প্রাণী-জগতে আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত খোলসওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে চিংড়ি, লবষ্টার প্রভৃতি মানুষের সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে বিশেষ পরিচিত। বাগদাজাতীয় নোনাজলের চিংড়িরা সমুদ্রে তাদের ডিম নিষ্কাশন করে। ডিম থেকে কয়েকটি লার্ভা দশার মাধ্যমে ছোট চিংড়ি চারার (post larvae) আকার প্রাপ্ত হয়, তখন এরা জোয়ারের জলের সাথে নদীর মোহনাগুলের খাল-খাড়িতে প্রবেশ করে ও সেখানে উপযুক্ত খাদ্য খেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।]

প্রাণীজগতে আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) পর্বের অন্তর্ভুক্ত ক্র্যাসটেসিয়ান (Crustacean) বা খোলসওয়ালা প্রাণীদের সংখ্যা অসংখ্য। এদের দেহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দেহের উপরিভাগের খোলসটি। এরা দেহবৃদ্ধির সাথে সাথে পুরনো খোলস ত্যাগ করে যা একডাইসিস্ বা 'খোলসত্যাগ' নামে পরিচিত। খোলস ত্যাগের অনতিকাল পরেই দেহের উপরিভাগের এপিডারমিস স্তর থেকে নিঃসৃত পদার্থ দ্বারা একটি পাতলা আবরণীর সৃষ্টি হয় যা পরে বাতাসের সংস্পর্শে শক্ত খোলসে পরিণত হয়। চিংড়ি, লবষ্টার, স্কাইলেরাস প্রভৃতি বেশ কিছু নানা ধরণের খোলসওয়ালা সামুদ্রিক পণ্যের মধ্যে চিংড়ির চাহিদাই সর্বাধিক। তার অন্যতম কারণ হল বিদেশে এর অত্যধিক চাহিদা ও কদর। নানাধরণের চিংড়ির মধ্যে Penaeus monodon (বাগদা চিংড়ি), Penaeus indieus (চাপড়া চিংড়ি), Penaeus semisulcatus, (হেঁড়ে বাগদা) Metapenaeus dobsoni, Metapenaeus monoceros (হন্নে চিংড়ি), Metapenaeus brevicornis (চামনে চিংড়ি), Parapenaeopsis stylifera (লাল চিংড়ি) প্রভৃতিকে রপ্তানীযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। যদিও এই সকল নানাধরনের চিংড়ি সমুদ্রেই অবস্থান করে ও সেখান থেকে প্রধানতঃ এদের সংগ্রহ করা হয় তথাপি প্রয়োজনের তাগিদে জীবনচক্রের বিশেষ অবস্থায় এরা নদীর মোহনাঞ্চলে প্রবেশ করে।

বাগদাজাতীয় নোনাজলের চিংড়িরা তাদের ডিম নিষ্কাশনের পর জীবনচক্রের লার্ভা দশাগুলিও সেখানেই কাটায় ও কেবলমাত্র ছোট চারাবস্থায় (post larvae) জোয়ারের জলের সাথে নদীর মোহনাঞ্চলে প্রবেশ করে, কারণ সেখানে তারা তাদের উপযুক্ত খাদ্য পেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

জনন অঙ্গ—চিংড়ি একলিঙ্গ (unisexual) প্রাণী, অর্থাৎ এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। মোটামুটি 8 গ্রাম ওজনের বাগদাজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ চিংড়ির মধ্যে কিছু বহিরাকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আকৃতিতে সমবয়স্ক স্ত্রীচিংড়িরা পুরুষ অপেক্ষা কিছু বড় হয়। স্ত্রীচিংড়ির দেহে "থেলিকম" (thelycum) নামক একটি চ্যাপ্টা গোলাকার জননঅঙ্গ শেষ পদউপাঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। পুরুষ চিংড়ির ক্ষেত্রে "পেটাজমা" (petasma) নামে ছোট চামচের ন্যায় একজোড়া জননঅঙ্গ প্রথম উদর উপাঙ্গের উপর অবস্থান করে, যৌন মিলনের সময় এরই সাহায্যে শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণীর

* সেন্ট্রাল ইনল্যাণ্ড ফিসারীস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কাকদ্বীপ, পশ্চিমবঙ্গ

দেহে স্থানান্তরিত হয়। পুরুষ প্রাণীর শুক্রথলি পঞ্চম পদের গোড়ায় অবস্থান করে। শুক্রাণুগুলি দলবদ্ধভাবে কয়েকটি সাদা পিণ্ডের আকারে শুক্রথলিতে জমা থাকে, উক্ত পিণ্ডগুলিকে "স্পার্মাটোফোর" বা "স্পারম স্যাক" (sperm sac) বলে। পুংজনন ছিদ্রও ঐ পঞ্চমপদের গোড়ায় অবস্থিত। স্ত্রী জনন-অঙ্গ বা ডিম্বাশয় স্ত্রীচিংড়ির পৃষ্ঠভাগে অবস্থান করে। পরিপক্ক ডিম্বাশয়টি আকারে পরিণত ও গাঢ় বর্ণের হয় যা স্বচ্ছ বহিঃখোলসের উপর থেকে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রী জনন ছিদ্র তৃতীয় পদ উপাঙ্গের গোড়ায় অবস্থিত।

যৌন মিলন—বাগদাজাতীয় চিংড়িরা তাদের যৌন মিলন রাত্রিকালেই সম্পন্ন করে। মিলনকাল খুবই ক্ষণস্থায়ী মাত্র 3-4 মিনিট। যৌন মিলনের পূর্বে একটি সদ্য খোলসত্যাগী স্ত্রীচিংড়ি সহজাত অপর একটি পুরুষ চিংড়িকে আকর্ষণ করে। মিলনাকাঙ্খী পুরুষ চিংড়িটি তখন স্ত্রী-চিংড়ির দেহের ঠিক নীচে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে ও জলে ভেসে বেড়ায়। ধীরে ধীরে পুরুষ প্রাণীটি স্ত্রী-প্রাণীর দেহের মধ্যভাগে নিজের শরীরকে বাঁকিয়ে একটি বেষ্টনী রচনা করে। যৌন মিলনের সময় পুরুষ প্রাণী থেকে "স্পার্মাটোফোর" স্ত্রী-প্রাণীর থেলিকামের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এই ভাবে স্ত্রী-চিংড়ি পুরুষ থেকে শুক্রাণু সঞ্চয় করে। একটি পরিণত স্ত্রী-প্রাণী এক সাথে 3-10 লক্ষ ডিম নিষ্কাশন করে। ডিম্ব নিষ্কাশনের সাথে স্পারমাটোফোর থেকে শুক্রাণুও নিষ্কাশিত হয় ও দেহের বাইরে ডিম্বাণুগুলি শুক্রাণুদ্বারা নিষিক্ত হয়, এই ধরণের নিষেক প্রক্রিয়াকে বাহ্য নিষেক বা external fertilization বলে। স্ত্রী-চিংড়ি এক নাগাড়ে 2-7 মিনিটকাল ডিম নিষ্কাশন করে এবং ঐ সময় স্ত্রী-চিংড়ি জলের নীচে কোন এক জায়গায় স্থির ভাবে ভেসে থাকে।

যৌন অঙ্গ পরিপক্কতায় হরমোনের প্রভাব—চিংড়ির যৌন অঙ্গের পরিপক্কতা ও খোলসত্যাগ প্রভৃতি দেহ-নিঃসৃত কয়েক প্রকার হরমোনের প্রভাবেই সম্ভব হয়। সাধারণতঃ চিংড়ির মস্তিষ্ক ও বক্ষ নার্ভ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত দু-প্রকার হরমোন যথাক্রমে Moulting Hormone (MH) ও Gonad Stimulating Hormone (GSH) চিংড়ির খোলসত্যাগ ও জননঅঙ্গ বিকাশের সহায়ক হরমোন নামে পরিচিত। অপর পক্ষে দেহের পুঞ্জাক্ষি বৃন্ত থেকে নিঃসৃত অপর দুটি ভিন্ন হরমোন Moult inhibiting hormone (MIH) ও Gonad inhibiting hormone (GIH পূর্বে বর্ণিত দু-প্রকার হরমোনের স্বাভাবিক কার্যের প্রতিবন্ধকস্বরূপ। জননকালে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ি মোহনাঞ্চল ত্যাগ করে সমুদ্রে প্রত্যাগমন করে, ঐ সময় উক্ত পরিবেশজনিত কিছু প্রভাবে চিংড়ির পুঞ্জাক্ষিবৃন্ত থেকে নিঃসৃত প্রতিবন্ধককারী হরমোনগুলির (MIH এবং GIH) কার্য ক্ষমতা লোপ পায় অথচ স্বাভাবিকভাবে MS ও GSH হরমোনগুলির কার্যক্ষমতা অব্যাহত থাকে, ফলস্বরূপ চিংড়ির দেহে দ্রুত যৌনাঙ্গের পরিপক্কতা লক্ষ্য করা যায়। কৃত্রিম উপায়ে পুঞ্জাক্ষি বৃন্তের অপসারণের দ্বারা পরীক্ষালব্ধ ভাবে জনন অঙ্গ বিকাশ ও ডিম নিষ্কাশন করানো সম্ভব।

জীবনচক্র—বাগদাজাতীয় নোনা জলের চিংড়ির নিষিক্ত ডিমগুলি কয়েকটি লার্ভা দশার মাধ্যমে ছোট চিংড়ির আকৃতি লাভ করে। জীবনচক্রের এই প্রধান দশাগুলি হল "নপ্লিয়াস লার্ভা" nauplius larva), জোয়াইয়া (Zoea stage), মাইসিস দশা (mysis stage) ও ছোট চিংড়ি চারা (post larvae)। ডিম নিষ্কাশনের প্রায় 10-15 ঘণ্টার মধ্যে নিষিক্ত ডিমগুলি থেকে "নপ্লিয়াস" নামক লার্ভার আবির্ভাব ঘটে। ডিম থেকে সদ্য ফোটা এই লার্ভাগুলি অতি চঞ্চল প্রকৃতির। জলে প্রায় সবদিকেই এরা অবাধে সন্তরণ করে বেড়ায়। এরা কোন বাইরের খাদ্য গ্রহণ করে না, দেহে সঞ্চিত খাদ্যই (yolk) এদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়। "নপ্লিয়াস লার্ভা" মুহুর্মুহু খোলস ত্যাগ করে

ও পরবর্তী জোয়াইয়া (zoea) দশায় রূপান্তরিত হয়। জোয়াইয়া দশা প্রধানতঃ তিনপ্রকার। প্রথম জোয়াইয়া দশায় আকার 1·2 মি. মি. এবং এদের দেহের খাদ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই এরা বাইরের খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করে। দ্বিতীয় জোয়াইয়া দশা অপেক্ষাকৃত বড় 1·74 মি. মি. এই সময় এদের দেহে পুঞ্জাক্ষি বৃন্ত, প্রধান খাদ্য হল নানাধরণের ছোট জলজ শৈবাল ও কীটসমূহ। মাইসিস দশায় কয়েকবার খোলস ত্যাগ করে ও পরে ছোট চিংড়ি চারায় বা post-larvae-এ উপনীত হয়। post larvae দশায় চিংড়ির উদর উপাঙ্গগুলি খুবই স্পষ্ট দেখা যায় ও এর সাহায্যে এরা জলে যে কোন দিকে সাঁতার কাটতে সক্ষম হয়।
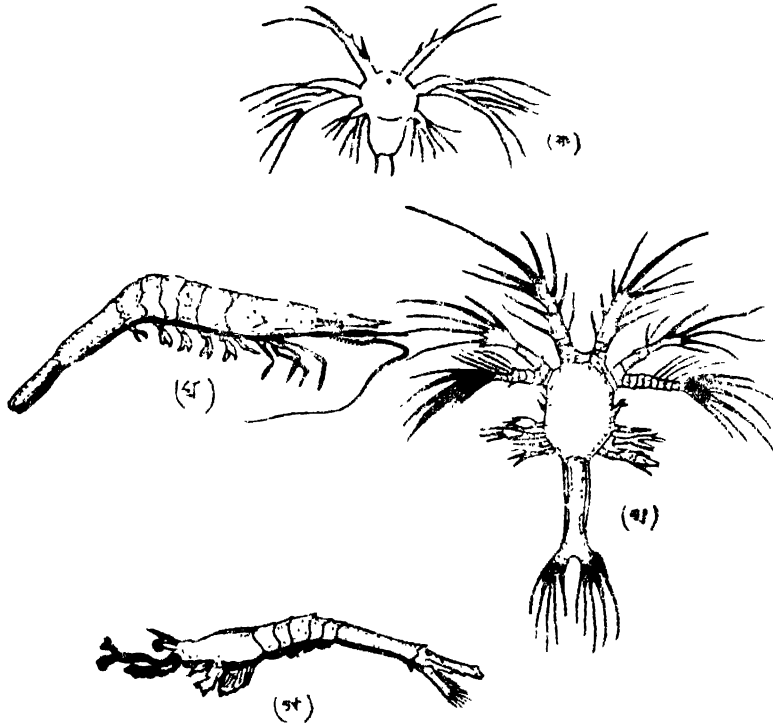
বাগদা চিংড়ির জীবনচক্র—(ক) নপ্লিয়াস লার্ভা, (খ) জোয়াইয়া (Zoea), (গ) মাইসিস এবং (ঘ) পোষ্ট লার্ভা (Post larvae)

রষ্ট্রামের কাঁটা ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় দশা 2·55 মি. মি. ও এই সময়ে দেহে আরো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। জোয়াইয়া লার্ভা জলে কেবলমাত্র সম্মুখ দিকেই সন্তরণ করে অগ্রসর হয়। এদের প্রধান খাদ্য হল ডায়াটম নামক অতি ক্ষুদ্র শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ। এদের স্থিতিকাল মোটামুটি 6 দিন। খোলস ত্যাগের মাধ্যমে এরা পরবর্তী মাইসিস দশায় রূপান্তরিত হয়। মাইসিস দশার অবস্থানকাল 4·5 দিন। দেহ 3·5-4·5 মি. মি. অবধি হয় ও চিংড়ির আকৃতির সাথে বহুলাংশে মিল দেখা যায়। দেহে ক্রমশঃ শিরোবক্ষ ও উদর উপাঙ্গগুলির আবির্ভাব ঘটে। মাইসিস (mysis) দশার শিরোবক্ষের উপাঙ্গগুলির সাহায্যে ছোট চিংড়ির চারারা জলের তলদেশে বালির উপর হেঁটে বেড়ায় ও প্রয়োজনে কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরতে পারে। এই দশা বারংবার খোলস ত্যাগ করে ও ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ির আকার পেতে থাকে।

সাধারণতঃ এই post larvae কিংবা তার পরবর্তী ছোট চিংড়ির চারারা জোয়ারের জলের সাথে নদীর মোহনাঞ্চলের সংলগ্ন খাল-খাড়ি প্রভৃতিতে উঠে আসে ও সেই সময় চিংড়ি চাষীরা এদের সরাসরি অথবা নানা ধরণের জালের সাহায্যে সংগ্রহ করে নোনাজলের পুকুর বা ভেড়ীতে ঢুকিয়ে নিয়ে চাষ করেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

বিমলেন্দু মিত্র*

গত পয়লা জানুয়ারী (1980) আমাদের আচার্যদেব, বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সত্যেন্দ্রনাথের 86তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ বসু দীর্ঘজীবী ছিলেন, 96 বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ পিতার অনুরূপ দীর্ঘজীবন ভোগ করেন নি। সত্যেন্দ্রনাথের সুহৃৎ নীরেন্দ্রনাথ রায় সত্যেন্দ্রের পিতামাতার মুখে শোনা একটি মন্তব্য আমাদের উপহার দিয়েছেন। মন্তব্যটি সত্যেন্দ্রের মায়ের সম্বন্ধে। সত্যেন্দ্রের পরে সুরেন্দ্রনাথের পর পর ছয়টি কন্যাসন্তান জন্মায়। এ বিষয়ে কেউ দুঃখ প্রকাশ করলে সত্যেন্দ্রনাথের মা সগর্বে জবাব দিতেন,—মেয়ে হয়েছে বলে কোন দুঃখ নেই, কিন্তু সত্যেনের যদি এমন একটি ভাই হত,যে 'সত্যেনের-ভাই' হবার উপযুক্ত নয়, তবে সেটাই হত দুঃখের।

যে সময়ে সত্যেন বড় হয়ে উঠছিলেন, দেশের ইতিহাসের সেই যুগটাকে বলা হয় বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনের যুগ বা স্বদেশী যুগ। সেই যুগের মেধাবী ছাত্র সত্যেন্দ্র ছিলেন স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ। কিন্তু স্বদেশ সেবার এটাও একটা ধরন ছিল তখন, যা হল—দেশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা। তাই সেই যুগে 'নিজেকে-গড়ে-তোলা' যতগুলি সুসন্তানকে দেশ পেয়েছে, পরে হয়ত তা পার নি। জীবনের লক্ষ্য বদলে গেছে।

সত্যেন্দ্র শুধু যে অঙ্কে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, তা নয়। আমরা জানি, পার্সিভ্যাল সাহেব সত্যেন্দ্রের উত্তরপত্র পরীক্ষা করে খাতায় সর্বোচ্চ নম্বর দিয়ে উপরন্তু মন্তব্য লিখেছিলেন—This boy is a genius! সেটি হল ইংরেজীর খাতা। প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ অসাধারণ মেধার ছাত্রগুলিকে। শিক্ষক পেয়েছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে।

1915 সালে সদ্য M.Sc. পাশ সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ সাহা ও জ্ঞান ঘোষ, এই তিনজনকে লেকচারার নিয়োগ করে স্যার আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশ্রগণিত ও পদার্থবিদ্যায় নতুন বিভাগ খুললেন। কারণ ঐ মেধাবী ছাত্রগুলিই স্যার আশুতোষের সঙ্গে দেখা করে ঐ ডিপার্টমেন্ট দুটি খোলার পক্ষে অনেক যুক্তি দেখায়। আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজ শুরু হয় শুধু রসায়ন বিভাগ নিয়ে।

ঐ সময়টা ছিল পদার্থবিদ্যার উজ্জ্বলতম পর্যায়কালগুলির অন্যতম। পদার্থবিদ্যায় নতুন যুগ শুরু হয়েছিল,—বলা চলে শতকের ঠিক শুরুতেই, প্ল্যাংকের আবিষ্কারের সঙ্গেই। 1905 সালে বিজ্ঞান গগনে শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটল, তিনি আইনষ্টাইন। তাঁর ফটোইলেকট্রিসিটির তত্ত্বই কোয়ান্টম তত্ত্বকে দৃঢ়ভিত্তি দিল। 1913 সালে এলেন নীলস্‌ বোর পরমাণুর কোয়ান্টম-তত্ত্ব নিয়ে। 1914 সালে ফ্র্যাংক হার্ৎজ্‌-এর পরীক্ষা হল।

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা

1919 সাল পর্যন্ত সত্যেন্দ্র ও মেঘনাদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জ্যোতিষ্ক, একসঙ্গে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করেছেন। তত্ত্বীয় গবেষণা ছাড়া উপায় ছিল না। সে যুগের উপযুক্ত যন্ত্রপাতিও তাঁরা জোগাড় করতে পারেন নি, ফলিত কোন গবেষণায় ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। ফলিত পদার্থবিদ্যার সে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ হল X-ray ও তার সাহায্যে কেলাস-পরীক্ষা বা ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী। 1912 সালে Laue-এর কাজ প্রকাশিত হয়। ব্র্যাগ্ পিতাপুত্র কাজ করেন 1913 সালে। সুতরাং সবচেয়ে আকর্ষণীয় পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্র ছিল এক্স-রে ক্রষ্ট্যালোগ্রাফী। অন্যদিকে, পরমাণুর বর্ণালী পরীক্ষা, বিশেষত বর্ণালী পরীক্ষায় পরমাণু গবেষণায় তত্ত্বীয় কাঠামোর সাহায্য, আকর্ষণীয় কাজ ছিল না। অধ্যাপক সাহা এই দিকটা ভেবেছিলেন। পরমাণু কেন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণার কথা কেউ চিন্তাও করেন নি কারণ 1919 সাল তখনও আসে নি এবং রাদারফোর্ডের সেই বিখ্যাত পরীক্ষা, আল্‌ফা কণা দিয়ে নাইট্রোজেন নিউক্লিয়সকে ভেঙে ফেলা, তখনও ভবিষ্যতে; সত্য কথা বলতে কি যতদিন না 1932 সালের নিউট্রন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, বা ঐ সালেই কক্রফ্‌ট্ ওয়ালটনের ত্বরকযন্ত্র দিয়ে প্রথম কৃত্রিম ভাবে প্রোটনকে ত্বরণযুক্ত করে লিথিয়াম নিউক্লিয়সকে ভেঙে ফেলা গেছে, ততদিন পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়-গবেষণা শুরু হয় নিই বলতে হয়।

আশ্চর্য ব্যাপার হল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থতত্ত্বের পঠন-পাঠন শুরু হবার পর বেশি দিন সত্যেন্দ্র কলকাতায় রইলেন না। 1921 সালে তিনি অন্য একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় চলে গেলেন। কেন গেলেন, তা একটি বিস্ময়। তিনি কি ভেবেছিলেন যে ঢাকাকে তিনি নিজের মনের মত করে গড়ে তুলবেন? কলকাতা কি তাঁর পরিকল্পনা মত চেহারা নিচ্ছিল না? এ বিষয়ে মতভেদ আছে। জানি না তিনি নিজে কোথাও এবিষয়ে কিছু লিখে গেছেন কিনা। কলকাতায় কিন্তু মেঘনাদও থাকেন নি, তিনি চলে গিয়েছিলেন এলাহাবাদে।

সত্যেন্দ্র তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টি করলেন 1924 সালে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে প্ল্যাঙ্কের কাজের পর 24 বছর কেটে গেল, আইনষ্টাইনের ফটোইলেকট্রন ব্যাখ্যার পর 19 বছর কাটল, ফোটনের যথার্থ কোয়াণ্টম ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স গড়ে তোলবার জন্য। সত্যেন্দ্র বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ ও তার কোয়াণ্টা ইত্যাদি গোলমেলে কথা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলেন, তিনি ফোটনকে তার যথার্থ রূপে বিচার করলেন,—বললেন, ফোটন কণাগুলিকে গ্যাসের অণুর মত বস্তুকণা হিসাবে বিচার করা হোক আর ধরে নেওয়া হোক কণাগুলিকে আলাদা করে চেনবার উপায় নেই। ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের নিয়মে বিচার করা হোক একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার কণা নির্দিষ্ট অবস্থায় কতগুলি শক্তি ও ভরবেগের আলাদা আলাদা স্তরে জোটবদ্ধ করা যায়। এইভাবে ফোটনের তরঙ্গ প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্ল্যাঙ্কের ফর্মূলায় পৌছান যায়, তা তিনি দেখালেন। তার পরের ঘটনা ইতিহাস। নিজের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না, তাই আইনষ্টাইনকে সরাসরি পাঠিয়ে দিলেন গবেষণা-পত্রটি। গড়ে উঠল বোস-আইনষ্টাইন ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স যা শুধু ফোটন নয়, বিবিধ শক্তি ও ভরবেগগুচ্ছে ভাগ হয়ে-যাওয়া গ্যাস কণিকার বেলায় প্রযোজ্য হল।

একটা জিনিস বোঝা যায় যে এদেশে এরকম প্রাগ্রসর চিন্তাধারায় সত্যেন্দ্রের সঙ্গী কেউ ছিল না। তিনি ছিলেন বড় বেশি একা। একমাত্র সমকক্ষ মেঘনাদ সাহা তখন বর্ণালীবিদ্যায় ব্যস্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এসময় ধন্যবাদার্হ হলেন সত্যেন্দ্রকে ইউরোপে পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা ও সমস্ত ব্যয় বহন করতে রাজি হওয়ায়। সত্যেন্দ্র ইউরোপে প্রথমে এলেন মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরীতে কাজ করবার জন্য। আবার লক্ষণীয় যে তিনি বেছে নিলেন প্রধানত এমন একটি ল্যাবরেটরী যেটি ফলিত গবেষণার

পীঠস্থান। সেখানে রয়েছেন জোলিও (Jo'iot), রয়েছেন ল্যাজভাঁ (Langevin)। এখানে এক বছর কাটাবার পর তিনি গেলেন বার্লিনে। বার্লিনেই তখন আইনষ্টাইন রয়েছেন। ঢাকায় ফিরে এলেন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হয়ে। ফিরে এসেও কিন্তু রয়ে গেলেন মানসিকভাবে একা, আমি গবেষণার মানসিকতার কথাই বলছি। অবশ্য তিনি এখন সুযোগ পেলেন, নিজের অন্য আকর্ষণ, ফলিত পদার্থবিদ্যার ল্যাবরেটরি গড়ে তোলার। তিনি গড়লেন এক্স-রে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফীর চমৎকার গবেষণাগার আর মেধাবী কিছু ছাত্র ও অধ্যাপক। তিনি পাশাপাশি গড়ে তুললেন রেডিও ফিজিক্স্ ও আয়নোস্ফিয়ারের গবেষণা, অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীরকে কেন্দ্র করে। বোঝা যায় না, কোন্ বিষয়ে তাঁর অনুরাগ আর পারদর্শিতা বেশি,—তত্ত্বীয় না ফলিত পদার্থবিদ্যায়। তিনি যেমন D² ষ্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গবেষণা করছেন, লরেন্ৎস্ গ্রুপ (Lorentz group) নিয়ে পেপার করছেন, ডিরাক সমীকরণ ও জীম্যান প্রক্রিয়া (Zeeman effect) নিয়ে আলোচনা করছেন, তেমনই আয়নোস্ফিয়ারের ওপরেও গবেষণা করছেন, নতুন ধরণের ডিবাই (Debye)-ক্যামেরা গড়েছেন এক্স রে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফির কাজের জন্য। শুধু তাই নয়, তিনি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু কাজ করছেন।

আমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, 1950 সালে। আমি দেখেছি পরীক্ষামূলক গবেষণাতে কি উৎসাহ ছিল তাঁর। তিনি নিজে ওয়ার্কশপে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্দেশ দিচ্ছেন, কিভাবে সহজে অভ্রান্ত বক্রতল গ্রেটিং কাটা যেতে পারে, এক্স রে বর্ণালীবীক্ষণের কাজের জন্যে। 1954 সালে তিনি প্যারিসে ক্রিষ্ট্যালোগ্রাফী কনফারেন্সে যখন গেলেন, তখন ফিরে এলেন সেখান থেকে তাঁদের তৈয়ারী 8" ব্যাসের অতিক্রান্ত ডিফিউশন-পাম্পের নক্সার কাগজপত্র নিয়ে। এখানে তিনি "ডিফারেন্সিয়াল থার্মাল অ্যানালিসিস" (DTA) করে মাটিতে অতি সামান্য সামান্য যে সব পদার্থ রয়েছে, তার পরিমাণ নির্দেশের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাপদীপ্তি (Thermoluminescence) গবেষণার কাজে নির্দেশ দিয়েছেন। Soft x-ray বর্ণালীবীক্ষণ কাজে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। উৎসাহ দিয়েছেন fine focus x-ray tube তৈরির কাজে। প্রতিটি কাজই পরীক্ষামূলক গবেষণার অঙ্গ। সেই 1955 সালেই; খুব উঁচুতে এরোপ্লেন পাঠিয়ে তার ডানাতে সংগৃহীত ধূলোর কতটা তেজস্ক্রিয়তা থাকে, তা মাপবার কাজ চালিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহায়তায়। তেজস্ক্রিয় ধূলিপাত বা fall out-এর সেই আদিযুগের মাপজোখের আগেকার কোন data ছিল না। তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্, না পরীক্ষামূলক গবেষক এ প্রশ্ন নিয়ে আর নাড়াচাড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। সেই যে ছাত্রাবস্থায়, স্বদেশী যুগে, তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন নিজেদের পূর্ণমানুষ করে গড়ে তুলে দেশমাতৃকার সেবা করবার জন্য, সেই সংকল্পে তিনি স্থির ছিলেন। তিনি অতি উচ্চশ্রেণীর পূর্ণ মানব ছিলেন। কি চিন্তায়, কি কাজে, তিনি যেখানে পৌঁছেছিলেন, সেখানে আমরা আমাদের অনুভবের মাপকাঠিকেও তুলতে পারি নি। সমালোচনাও করেছি, কেন তিনি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট গড়েন নি, কেন তিনি ছাত্র নিয়ে একটা বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক School গড়েন নি। এর সোজা উত্তর হচ্ছে, তিনি উপযুক্ত ছাত্র পান নি। তাঁর উত্তরসূরী হবার যোগ্য হিসেবে আমরা নিজেদের তৈরি করি নি। এমনকি তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা,—সেখানেও আমরা তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক হতে পারি নি।

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

দাঁত দেখে মানুষ চেনা

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সম্প্রতি জানা গেছে মৃতদেহের দাঁত পরীক্ষা করে তার বয়স, নারী অথবা পুরুষ, রক্তের শ্রেণী বিভাগ (blood group) প্রভৃতি নিশ্চয় করে বলা যায়। পৃথিবীর নানা দেশে মৃতদেহ সনাক্ত এবং অপরাধ তদন্তের কাজে দাঁতের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

লেবু থেকে বিদ্যুৎ

কিডারমিণ্টারের (Kidderminter) এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, একটি লেবু (lemon)-র দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি একটি ছোট বৈদ্যুতিক মোটর 5 মাস চালাচ্ছেন। ব্যাটারি প্রস্তুতকারকেরা এটা মানতে পারছেন না। তাঁরা এটা অবশ্য জানেন যে, একটা লেবু থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা বড় জোর একটি ছোট হাত ঘড়ি চালানো যেতে পারে। এটাও অনেকে জানেন যে, এক ফালি লেবুর উপর 1টি তামার তার ও 1টি দস্তার তার রেখে ঐ তার জিভে ঠেকালে বিদ্যুৎ স্পর্শ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীর পুরস্কার

(ক) ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান পর্ষদের (The Indian National Science Academy) 45 তম বার্ষিক সম্মেলনে 'এস. এন. বোস পদক' পেয়েছেন অধ্যাপক সি. এন. আর. রাও—সলিড স্টেট সায়েন্স ও স্পেক্ট্রস্কপির উপর গবেষণার জন্য এবং 'এস্. এইচ. জাহির পদক' পেয়েছেন ডাঃ ডি. পি. অ্যামটিয়া—ধাতুবিদ্যায় গবেষণার জন্য।

(খ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পুরস্কার' পেয়েছেন অধ্যাপক বি. সি. হালদার (বোম্বাই-এর ইনষ্টিটিউট অভ্ সায়েন্সের অধ্যক্ষ)—জৈব জারণ প্রক্রিয়ার (Biological Oxidation Mechanism). উপর গবেষণার জন্য।

প্রতিবেদক—হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

গাউস—অনন্য গণিত প্রতিভা

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়*

বিজ্ঞানের ইতিহাসে কয়েকটি অতিবিরল গণিত প্রতিভার মধ্যে কার্ল ফিড্রিখ গাউস-এর নাম নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। গত 1977-এর 30শে এপ্রিল গাউসের দ্বিজন্মশতবার্ষিকী আমরা পেরিয়ে এসেছি। অর্থাৎ ফিড্রিখের জন্ম 30শে এপ্রিল 1777। জন্মস্থান—জার্মানীর ব্রান্সউইক শহর। পিতা—গেরহের্ড ডিড্রিক, একজন সাধারণ শ্রমিক। মাতা—ডরোথিয়া বেন্‌ৎস। গাউসের প্রতিভা স্ফুরণে তাঁর মায়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একথা গাউস তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন।

জন্মলগ্ন থেকেই দরিদ্রতা গাউসের সঙ্গী ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছিল তার গণিতের প্রতি প্রবণতা। অতি শিশু বয়সে কার্ল স্বাভাবিকভাবে যেসব যোগ বিয়োগ করতে পারতেন তা ঐ বয়সের অপর কোনও শিশুর পক্ষে ছিল অসম্ভব। শোনা যায়, গাউসের বয়স যখন সাত, তখন তাঁর স্কুলের এক শিক্ষক 1 থেকে 100 পর্যন্ত প্রতিটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করতে দেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মানসিক গণনায় কার্ল শিক্ষককে চমকিত করে উত্তর বলে দেন। সমান্তর শ্রেণী সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকা সত্ত্বেও, গাউস তাঁর মৌলিক চিন্তায় এটা বুঝেছিলেন যে, 1 থেকে 100 অবধি সংখ্যানুক্রম যোগের মধ্যে 50টি 101 আছে। অর্থাৎ উক্ত যোগফল সমান $50 \times 101 = 5050$।

*সি 6/1, কালিন্দী হাউসিং এস্টেট, কলিকাতা-700055

এর পর তাঁর ঐ শিক্ষকের প্রেরণায় বালক গাউস আরও নানান সমান্তর শ্রেণীর সমাধান করেন। নানান বাধাবিপত্তি দরিদ্রতার মধ্যে কার্লের পড়াশুনা চলতে থাকে। জ্যামিতি এবং সংখ্যাতত্ত্বের কয়েকটি মৌলিক সমস্যারও সমাধান করেন তিনি স্কুল জীবনেই। স্কুল থেকে পনের বছর বয়সে কলেজ জীবন। তারপর গ্যোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়। 1795 থেকে 1798 খৃঃ। কার্ল ফিডরিখ গাউসের জীবনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 1795 খৃঃ, 18 বছরের যুবক গাউস আবিষ্কার করলেন 'প্রিন্সিপল্ অফ লিস্ট স্কোয়াস' (Principle of least squares), যার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তীকালের 'গাউসিয়ান ল অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশানস' (Gaussean Law of normal distribution)। 1796 খৃঃ শুধুমাত্র একটি কম্পাস (compass) ও একটি স্কেলের (scale) সাহায্যে সতেরো বাহুর বহুভুজ অংকন পদ্ধতি আবিষ্কার করে জ্যামিতির ইতিহাসে এক যুগান্তর আনেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পালা শেষ হলে, গাউস গণিতের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। 1799 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণালব্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন প্রত্যেক বীজগণিতীয় সমীকরণেরই অন্ততঃ একটা করে মূল বর্তমান এবং সমীকরণের অজ্ঞাত রাশির সর্বোচ্চ ঘাত যত হবে, মূলের সংখ্যা হবে ততগুলি। যেমন $a^4+2a^3+9=0$ এই সমীকরণে মূলের সংখ্যা অজ্ঞাত রাশি a-এর সর্বোচ্চ ঘাতের সমান অর্থাৎ 4। এই প্রবন্ধে গাউস বাস্তব সংখ্যা দ্বারা সমাধানের অযোগ্য কিছু সমীকরণের বিষয়েও আলোচনা করেন। যেমন $x^2+9=0$ এই সমীকরণটি বাস্তব সংখ্যা দ্বারা সমাধানের অযোগ্য। যেহেতু x-এর মান এখানে $\pm\sqrt{-9}$ $=\pm 3\sqrt{-1}$। এগুলি কাল্পনিক সংখ্যা। বাস্তব সংখ্যার মতনই কাল্পনিক সংখ্যারও লেখচিত্র অংকনের প্রস্তাব তিনি করেন। এরই সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন কাল্পনিক এবং বাস্তব সংখ্যা লেখচিত্রে একটি বিন্দু, যাকে গাউস জটিল সংখ্যা নাম দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য গাউস $\sqrt{-1}$-কে " i " বলে চিহ্নিত করেন। যে কোনও সংখ্যাকেই $a+bi$ এইরূপ জটিল সংখ্যারূপে প্রকাশ করা যেতে পারে। বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে a বাস্তব এবং $i=0$ এবং কাল্পনিক সংখ্যার ক্ষেত্রে $a=0$ এবং b বাস্তব। গাউসের এই তত্ত্ব বীজগণিত এবং জ্যামিতির অগ্রগতিকে যথেষ্ট ত্বরান্বিত করেছিল।

এর পরেই প্রকাশিত হয় গাউসের বিখ্যাত গবেষণাবহুল প্রবন্ধ Disquistiones Arithmeticae" (1801 খৃঃ) যা তাঁকে খ্যাতির শিখরে নিয়ে যায়। খ্যাতির প্রতি ছিল তাঁর বীতরাগ। তিনি গবেষণা করতেন মূলতঃ মানসিক পরিতৃপ্তির জন্যেই। তাঁর জীবিতকালে তাঁর গবেষণার অনেক ফলই তিনি অপ্রকাশিত রাখেন। তাঁর গবেষণা বিষয় শুধুমাত্র গণিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির নানান শাখা ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। একথা নিশ্চিত তাঁর গণিতের গবেষণার তুলনায় সেইসব গবেষণা ছিল অকিঞ্চিৎকর।

অনইউক্লিডীয় জ্যামিতির মত বর্তমান অংকশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় শাখারও অন্যতম আবিষ্কারক ফিডরিখ গাউস। ইউক্লিডের "স্বতঃপ্রতীয়মান" স্বতঃসিদ্ধগুলির ত্রুটি সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা আজও সমান ভাবে স্মরণীয়। 1820 খৃঃ থেকে প্রায় দশ বছর 'জিওডসী'র উপর তিনি যে কাজ করেন পরবর্তী কালে ব্যবহারিক অংকের ক্ষেত্রে তা প্রভূত সাহায্য করেছে।

1799 খ্রীঃ গাউস হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। 1805 খ্রীঃ 9 অক্টোবর তিনি বিয়ে করেন য়োহানে ওসলহাফকে। কিন্তু 4 বছরের মধ্যেই মারা যান য়োহানে। গাউস এক বছর পর পুনঃবিবাহ করেন মিনা ভাবডেককে। 1807 খ্রীঃ গ্যোটিঞ্জেন মানমন্দিরের অধিকর্তা হন তিনি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থাকেন।

বন্ধুবান্ধব পুত্র-কন্যাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কার্ল ফিডরিখ গাউস গণিতকেই করে তুলেছিলেন জীবনের একমাত্র ধ্যান। গণিতের মধ্যেই তিনি পেতেন অসীম শান্তি। বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ লাপ্লাস গাউসকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলে অভিহিত করেছিলেন। গাউসের জীবনে একদিকে যেমন এসেছে পেশাগত সাফল্য অপরদিকে তেমনি পেয়েছেন ব্যক্তিগত দুঃখ ও অশান্তি। স্ত্রী এবং প্রিয় ছাত্র আইজেনস্টাইনের অকাল মৃত্যু, তাঁকে বাস্তব জীবনের প্রতি করেছিল অনুরাগহীন। গণিতের মধ্যেই তিনি খুঁজেছিলেন শান্তিলাভের সঞ্জীবনী। 1855 খ্রীঃ 23শে ফেব্রুয়ারী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কার্ল ফিডরিখ গাউসের নাম আর্কিমিডিস, নিউটনের সঙ্গে আজও এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হয়।

রেশম চাষ

লতিকা বসু*

"কিনে দে রেশমী শাড়ী নইলে যাব বাপের বাড়ী"—ঠাকুমা দিদিমাদের আমলে একটি অতি প্রিয় আবদার। কাজী নজরুলেরও দু-একটি কবিতায় এই রেশমী শাড়ির উল্লেখ পাই। প্রাচীনকাল থেকেই রেশমী শাড়ির চাহিদা ছিল, এখন তো দেশে-বিদেশে সর্বত্র আরও এই রেশমের চাহিদা বেড়েছে। রেশম সুতো দিয়ে বুনে হয় রেশমী শাড়ি বা সিল্কের শাড়ি। কিন্তু এই রেশম সুতোর উৎস কি বা কি ভাবে সুতো প্রস্তুত হয়—সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা নেই। ইদানীং রেশম সুতোর বাণিজ্যিক চাহিদাও প্রচুর, আর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও এই রেশম চাষের সঙ্গে যথেষ্ট জড়িত।

রেশম চাষকে আরও সহজ ভাবে বলা যায় গুটি পোকার চাষ। প্রজাপতির মত অনেকটা দেখতে এক রকম পোকা আছে যাদের বলা হয় 'মথ' বা রেশম কীট। এই মথের গুটি থেকে রেশম সুতো সৃষ্টি করার কৌশল কিন্তু সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনদেশে। ভারতেও বহু প্রাচীনকাল থেকে রেশম চাষ চলছে। এখন তো রেশম চাষ আমাদের দেশে একটি অন্যতম কুটীরশিল্প। পৃথিবীতে রেশম উৎপাদনে ভারতের স্থান এখন পঞ্চম। কাশ্মীর, মধ্য ও উত্তর প্রদেশে বহু লোকের জীবিকা নির্ভর করছে এই রেশম চাষের উপর। পূর্ব ভারতে আসামেও রেশম চাষ চলছে বহু প্রাচীন কাল থেকে। পশ্চিমবাংলার মালদহ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য। রেশম চাষের উন্নতির জন্য ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। পশ্চিম বাংলার বহরমপুরে সেণ্ট্রাল সেরিকালচারাল রিসার্চ স্টেশন, মহীশূরে সেণ্ট্রাল সেরিকালচারাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং ইন্‌স্টিট্যুট, রাচীতে সেণ্ট্রাল তসর রিসার্চ স্টেশন আর আসামে এণ্ডি রিসার্চ স্টেশন - এ চারিটি গবেষণা কেন্দ্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে রেশম চাষের উন্নতির জন্য।

ভারতে প্রধানত চার রকমের রেশম উৎপাদন করা হয়—মালবেরী বা তুঁত রেশম, এণ্ডি, মুগা আর তসর। এদের মধ্যে তুঁত রেশম হল উৎকৃষ্ট। আর এই তুঁত রেশমের চাহিদাও বেশী। তুঁত রেশমের চাষ পদ্ধতি খুব সংক্ষেপে চারটি পর্যায়ে নীচে বর্ণনা করা হল।

(1) প্রজনন—বোমবিক্স মোরি (Bombyx mory) নামক কোন মথ থেকে উৎকৃষ্ট রেশম পাওয়া যায়। এরা একচক্রী—অর্থাৎ বছরে মাত্র একবার ডিম পাড়ে। তবে এদের গুটি থেকে উৎকৃষ্ট রেশম পাওয়া যায় বলে এদের চাষ খুব বেশী হয়। বোমবিক্স-এর আরেকটি প্রজাতি হল বোমবিক্স নিস্ট্রি (Bombyx nistry)—এরা বহুচক্রী অর্থাৎ বছরে বহুবার ডিম পাড়ে।

*রামমোহন কলেজ, কলিকাতা-700009

কিন্তু এদের গুটি থেকে নিকৃষ্ট ধরণের রেশম পাওয়া যায় বলে এদের চাহিদা কম আর চাষের পরিমাণও অল্প।

এই কীটগুলি পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় যৌন-মিলনে লিপ্ত হয়। মিলন শেষে স্ত্রী-মথগুলিকে অতি সাবধানে গোলাকার কার্ডবোর্ডের ওপর রেখে টিনের ফানেল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। এরকম অন্তরীণ অবস্থায় প্রতিটি স্ত্রী-মথ কার্ডবোর্ডের ওপর 24 ঘণ্টায় অন্তত 400-500টা ডিম পাড়ে।

(2) গুটি পালন—কার্ডবোর্ড থেকে ডিমগুলিকে খুব সাবধানে লালন ডালা বা রেয়ারিং ট্রে-তে সংগ্রহ করে পালন ঘরে নিয়ে আসা হয়। গোল গোল লালন ডালাগুলি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি হয়। পালন ঘরের দেয়াল মাটির আর চালও খড়ের—ফলে ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ঘরে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া চলাচল করতে পারে তারও ব্যবস্থা রাখা আছে। পালন ঘরে আছে জালের ঢাকনা দেওয়া অনেক তাক। ডিমশুদ্ধ লালন ডালাগুলি সাজিয়ে রাখা হয় ঐ তাকে। মাঝে মাঝে বীজাণুমুক্ত করার জন্য পালন ঘরটি বেশ করে ফরমালিন দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়।

এরকম অবস্থায় বহুচক্রী মথের নিষিক্ত ডিম ফুটতে সময় লাগে 10-12 দিন আর একচক্রী মথের ডিম ফুটতে প্রায় এক বছর লাগে। ডিম ফুটে যে ধূসর রঙের লার্ভা বেরোয়—তাকে চলতি ভাষায় বলে 'পলু'। এই পলুদের খিদেও সাংঘাতিক। এদের প্রিয় খাদ্য হল তুঁতগাছের পাতা। পাতাগুলি টুকরো টুকরো করে ডালাতে পরিবেশন করা হয়। আর পলুগুলিও সমানে রাক্ষসের মত পাতা খেয়ে চলে। তবে চার-পাঁচদিন পর এরা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তখন এদের নির্মোচন ঘটে—সাদা কথায় যাকে বলে দেহের খোলস পাল্টান। কিন্তু নির্মোচনের পরে আবার আগের মত পাতা খেতে সুরু করে। এভাবে মোট চারবার নির্মোচনের পরে প্রায় 45 দিন বাদে পূর্ণ লার্ভায় পরিণত হয়। পরিণত অবস্থায় পৌঁছলে এরা সম্পূর্ণভাবে খাওয়া বন্ধ করে দেয়।

এরপর গুটি তৈরির পালা। প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক পলু বা লার্ভা লালন ডালার উঁচু কিনারায় সরে আসে। এসময় এদের দেহের ভেতর থেকে একরকম আঠাল রস বা লালা বেরোয়। এই রস আসলে ফাইব্রোইন (সাদা) সেরিসিন (রঙীন) জাতীয় প্রোটিনের সংমিশ্রণ। এদের মাথার দিকে আছে স্পিনারেট নামে একটি আঁকড়াকৃতি অঙ্গ আর পেটের মধ্যে আছে একজোড়া সিল্কগ্রন্থি। সিল্কগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস স্পিনারেট পথে দেহের বাইরে এসে বায়ুর সংস্পর্শে শক্ত সুতো বা রেশমে পরিণত হয়। লার্ভাটি প্রতি মিনিটে প্রায় 15 সেন্টিমিটার সুতো তৈরি করতে পারে। দেহ থেকে রস বেরোবার সময় নিজের দেহটিও সমানে ঘোরাতে থাকে—ফলে লার্ভাটি নিজেও সুতোর আবরণে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়। এভাবে লার্ভাটি তিন-চার দিনে প্রায় 400-1500 মিটার লম্বা রেশম সুতোয় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে ফেলে রেশম গুটির ভেতরে। সম্প্রতি তাসখন্ড কৃষি ইনস্টিটুট-এর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জানিয়েছেন যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ায় গুটিপোকার জৈব তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। উজবেকিস্তানের রাষ্ট্রীয় খামারে রেশমগুটিগুলি নিম্নকম্পাংকের বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে দেওয়ার পর দেখা গেছে—বিকিরণপ্রাপ্ত গুটি থেকে রেশম উৎপাদনের

(3) রেশম সংগ্রহ—গুটির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় লার্ভাগুলিকে বলে 'পিউপা' বা 'মুককীট'। গুটির মধ্যে পিউপার দেহের রূপান্তর ঘটে যখন পূর্ণাঙ্গ মথে পরিণত হয়। তখন গুটি কেটে বাইরে আসে, এর ফলে গুটির সুতো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেজন্যে পিউপা অবস্থায় গুটিগুলি সংগ্রহ করতে হয়। বংশরক্ষার জন্য কিছু গুটি সংরক্ষণ করে বাকী গুটিগুলি গরম জলে ডুবিয়ে এবং বিষাক্ত ধোঁয়া দিয়ে পিউপাগুলিকে মেরে ফেলা হয়। এদিকে গুটির সুতোর সঙ্গে লেগে থাকা আঠালো পদার্থ নরম হয়ে যাওয়ায় রেশম সুতো খুব সহজে পৃথক হয়ে যায়, তখন কাঠের তৈরী একরকম যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত গুটি থেকে রেশম সুতো সংগ্রহণ চলে।

প্রাণীদের সন্তান স্নেহ

দিলীপকুমার দাস*

আমাদের এই বিরাট জীবজগতে এমন অনেক জীব আছে যাদের সন্তানদের প্রতি কোন স্নেহ-মমতা নেই, আবার, এমন অনেক প্রাণী আছে যারা বেশ যত্নের সঙ্গেই সন্তানের লালন-পালন করে।

আরশোলা, প্রজাপতি, মথ, ফড়িং, গঙ্গাফড়িং প্রভৃতি গাছের পাতায় বা বোঁটায় ডিম পেড়ে চলে যায়। তাদের সন্তান-সন্ততি জীবিত রইল কি মারা গেল সে খবর তারা রাখে না। মশা-মাছিদের ক্ষেত্রে ওই একই অবস্থা। পঙ্গপালরাও ঝাঁকে ঝাঁকে এক জায়গায় উড়ে এসে সেখানকার শস্য খেয়ে সর্বনাশ করে। মাটির নীচে ডিম পেড়ে অন্য জায়গায় উড়ে যায়। সাপেরাও বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডিম পাড়ে। ডিম পেড়েই ওরা ওদের পিতা-মাতার দায়িত্ব শেষ করে। শুধু মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল প্রভৃতি খুব যত্নের সঙ্গে শিশু লালন করে। বাচ্চাদের বড় করার জন্য তারা সারাদিন ফুল থেকে ফুলে ছুটোছুটি করে। একটু একটু করে চাকে মধু সঞ্চয় করে। খাইয়ে সেবাযত্ন করে বাচ্চাগুলিকে তারা তাড়াতাড়ি কর্মক্ষম হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

কোন কোন মাকড়সার মধ্যেও অপত্য স্নেহ দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের বড় বড় মাকড়সা ঘরের দেয়ালে বা পাঁচিলের গায়ে প্রায়ই দেখা যায়। স্ত্রী মাকড়সা ডিমের থলি বুকে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কোন কোন মাকড়সা ছোট বড় জাল বুনে ডিমের থলি নিয়ে জালের উপর বসে থাকে। কখনও কখনও জালের উপরও ডিম পাড়ে। আবার কোন কোন মাকড়সা এক জাতের বুনো গাছের প্রায় প্রতিটি পাতায় একটি করে ছোট ডিম পেড়ে পাতাটি ডগার দিক থেকে অর্ধেক চিরে ঠোঙার মত মুড়ে রেখে চলে যায়।

শামুক, গেঁড়ি, ঝিনুক প্রভৃতিদের মধ্যে অপত্য স্নেহ দেখা যায় না। তারা পুকুর বা

* রিসার্চ সেন্টার অন্ ন্যাচারাল সায়েন্স, ডুইল্যা, হাওড়া

খানা-ডোবার পাড়ে ডিম পেড়ে চলে যায়। ডিম পাড়ার পর সেই ডিম বা বাচ্চাদের আর কোন খোঁজই রাখে না। মাছও প্রায় সেরকমই করে কিন্তু শোল, শাল, ল্যাটা, চ্যাং প্রভৃতি মাছের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা স্ত্রী-পুরুষে নিজেদের বাচ্চার ঝাঁকের সঙ্গে সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, শত্রুর হাত থেকে তাদের রক্ষা করে। যতদিন পর্যন্ত না বাচ্চাগুলি বেশ বড় হয়ে ওঠে ততদিন পর্যন্ত তারা ওইভাবে ঘুরে বেড়ায়।

ব্যাঙও খানা, ডোবা, পুকুরে বা গাছে ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম পাড়ার পর পর যে যার জায়গায় চলে যায়। কোন কোন ব্যাঙ ডিম পাড়ার পর সেই ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ না হওয়া পর্যন্ত ডিম পিঠে করে বা মুখে করে বহন করে। এ ধরনের ব্যাঙ আমাদের দেশে এখনও বিরল। ইকথাইওপিস ডিম পাড়ার পর শরীরটিকে গোলাকার করে তার মধ্যে ডিমগুলি নিয়ে বাচ্চা না-ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকে।

পাখীদের মধ্যেও পুরোপুরিভাবে অপত্য স্নেহের প্রভাব দেখা যায়। ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী-পুরুষ দু-জনে মিলেই ছোট ছোট শুকনো গাছের ডাল, পাতা প্রভৃতি নিজেদের পছন্দ মত কোন গাছের ডালে বা কোটরে এনে ছোট ছোট ঝুড়ির মত তৈরি করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী পাখীরাই বাসা তৈরি করে, আর পুরুষেরা গাছের ডালে বসে বাসার তদারক করে। বাসা তৈরি শেষ হলে স্ত্রী পাখীরা তার মধ্যে দুটি কিংবা চারটি, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ছয়টি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর তারা বেশীর ভাগই দু-জনে পালা করে সেই ডিমের উপর বসে পেটের পালকের সাহায্যে নিজের শরীরের উত্তাপ দ্বারা ডিমগুলিকে তা' দিতে থাকে। কুড়ি-একুশ দিন পরে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটা এবং উড়তে না শেখা পর্যন্ত তাদের খাটুনির অন্ত থাকে না। সারাদিন দু-জনে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে নিজেদের খাবার চিন্তা ভুলে গিয়ে বাচ্চাদের খাবার যোগাড় করে। উড়তে সক্ষম হবার পর তারা কিছুদিন বাচ্চাগুলিকে নিজেদের সঙ্গে ঠোঁটের সাহায্যে খাওয়াতে থাকে এবং মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের গা পরিষ্কার করে দেয়। এইভাবে এরা বাচ্চা লালন-পালনে মেতে থাকে। পাখীদের মধ্যে কোকিল আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু এরা নিজেদের বাসা তৈরি বা সন্তান লালন-পালন করতে জানে না। তাই তারা প্রজনন ঋতুতে কাকের বাসায় সুযোগ পেলেই ঢুকে ডিম পেড়ে পালিয়ে যায়। কাক সেই ডিমে তা' দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

মুরগী বা হাঁস জাতীয় পাখীদের আমরা অনেকেই যত্ন করে ঘরে পুষে থাকি ডিমের আশায়। এরা বাসা তৈরি করতে জানে না, কিন্তু বাচ্চা লালন-পালন করতে জানে। কিন্তু অন্যান্য পাখীর মত এরা বাচ্চাদের মুখে করে খাওয়াতে পারে না। তাই ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই তারা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে আহারের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে ও নিজেরা পা দিয়ে মাটি আঁচড়ে ছোট ছোট পোকামাকড় দেখিয়ে দেয় খাবার জন্য। প্রচণ্ড রোদ, চিল, বাজপাখীর হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য নিজেদের ডানা ও শরীরের পালক ফুলিয়ে বাচ্চাগুলিকে ঢাকা দিয়ে দেয়। এদের প্রজনন ঋতু বলে কিছু নেই। সব ঋতুতেই এরা ডিম পাড়ে। জলমুরগীরা (ডাহুক) কিন্তু নিজেরা বাসা তৈরি করতে পারে। এরাও বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে খাবারের সন্ধানে বেরোয়।

স্তন্যপায়ীদের বাচ্চা লালন-পালন করার পদ্ধতি আরও উন্নত। এরা ডিম পাড়ে না, একেবারে বাচ্চা প্রসব করে ও স্তনপান করিয়ে বাচ্চাদের লালন-পালন করে। কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, ছুঁচো

প্রভৃতি বাচ্চাদের জন্মের পর চোখ বন্ধ হয়ে থাকে। প্রায় পনের থেকে একুশ দিনের মধ্যে এদের চোখ ফোটে। চোখ না ফোটা পর্যন্ত তারা বাচ্চাদের খুব চোখে চোখে রাখে। ইঁদুর, বিড়াল ও কুকুরদের মধ্যে দেখা যায় যে; শত্রু আসছে বুঝতে পারলে এরা বাচ্চাদের মুখে নিয়ে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায়। ছুঁচোদের বাচ্চা স্থানান্তরিত করার পদ্ধতি এতই মজার যে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। প্রথমে মা ও পিছনে বাচ্চাগুলি একজন আর একজনের ল্যাজ মুখে করে ধরে ঠিক রেলগাড়ীর ন্যায় চলতে থাকে। গরু, ছাগল, মহিষ, শূকর প্রভৃতি জন্তু কথা বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু বাচ্চারা তাদের নজরের বাইরে চলে গেলে তাদের কাছে ডেকে স্তন পান করায়। গরু তার বাচ্চার শরীর নিজের জিব দিয়ে চেটে সব সময় পরিষ্কার রাখে। কাঙ্গারু পেটের নীচে একটি থলির মধ্যে বাচ্চা রেখে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। বানর এবং হনুমানের বাচ্চারা ভয় পেলে ছুটে গিয়ে মায়েদের পেট জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে বা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময় মায়েরা বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে নিয়ে গাছের পর গাছ লাফ দিয়ে চলে।

টারজানের মা

দেবব্রত জানা*

রুদ্ধশ্বাসে সবাই দেখছে কেমন করে গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে, এক গাছ থেকে আর এক গাছে ঝুলন্ত লতা বেয়ে চলে যাচ্ছে ঐ বাঘছাল পরা খালি গা বলিষ্ঠ সুপুরুষটি। তারপর ঝোলা বন্ধ করে মুখের দুদিকে হাত দুটি এনে নিজস্ব ভাষায় সুতীব্র চিৎকার করে উঠল; অমনি দলে দলে লোকটির বন্ধু 'সিম্বা' মানে 'সিংহ'-রা এসে উপস্থিত হল তার সামনে।...অমনি আরও কত দৃশ্য আফ্রিকার আরণ্যক পরিবেশে ইংরেজী চলচ্চিত্রে তোমরা দেখেছ। ঐ দুঃসাহসী লোকটির বর্ণনা শুনে এতক্ষণ নিশ্চয় ধরে ফেলেছ তার পরিচয়। হ্যাঁ, চলচ্চিত্র, কমিক্স্ প্রভৃতিতে আলোড়নকারী 'এডগার রাইস বারোজ'-এর অমর নায়ক 'টারজান'। টারজান আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণাদাতা। সেই অরণ্যরাজ টারজান ছোটবেলা পালিত হয়েছিল আফ্রিকার গভীর গহন অরণ্যের বনমানুষ 'গরিলা' মাতার কোলে। 'গরিলা' কথাটা শুনে অবাক হলে নাকি। ভাবলে নাকি গরিলা তো একটি যুদ্ধ পদ্ধতি—তার আবার 'কোল' আসে কোত্থেকে। আসলে গুলিয়ে ফেলেছ; অনেকেই গণ্ডগোল করে ফেলে। যে যুদ্ধ হঠাৎ আক্রমণ করে সংঘটিত হয় সেই যুদ্ধ রীতিকে 'গেরিলা' (Guerilla) যুদ্ধ বলে—'গরিলা' (Gorilla) নয়। গরিলা আফ্রিকায় বসবাসকারী এক রকম বিশাল প্রাণী। এবারে নিশ্চয় পার্থক্যটা খেয়াল হয়েছে?

কল্পিত টারজান সম্বন্ধে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি। কিন্তু তাঁর পালক

*গ্রাম—দেবান (কোলাঘাট), পোঃ—আমলহাণ্ডা, জেলা—মেদিনীপুর-৭২১১৩৪

গরিলাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা খোঁজ খবর রাখি? যা রাখি তাও আবার শতকরা নিরানব্বই ভাগই ভেজাল।

আমরা তবুও জানি যে গরিলা নামে এক রকম বিশাল 'বন মানুষ বা এপ্-ম্যান (ape-man)' কেবল আফ্রিকায় বাস করে। কিন্তু বিশ্বাস কর বা না কর খ্রীষ্টপূর্ব 480 বছরেরও আগে, এক আফ্রিকার গরিলা-অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি আদিম বাসিন্দারা ছাড়া বাইরের লোকেরা জানতই না যে পৃথিবীতে গরিলা নামে একরকম প্রাণী আছে। খ্রীষ্টপূর্ব 480 অব্দে,
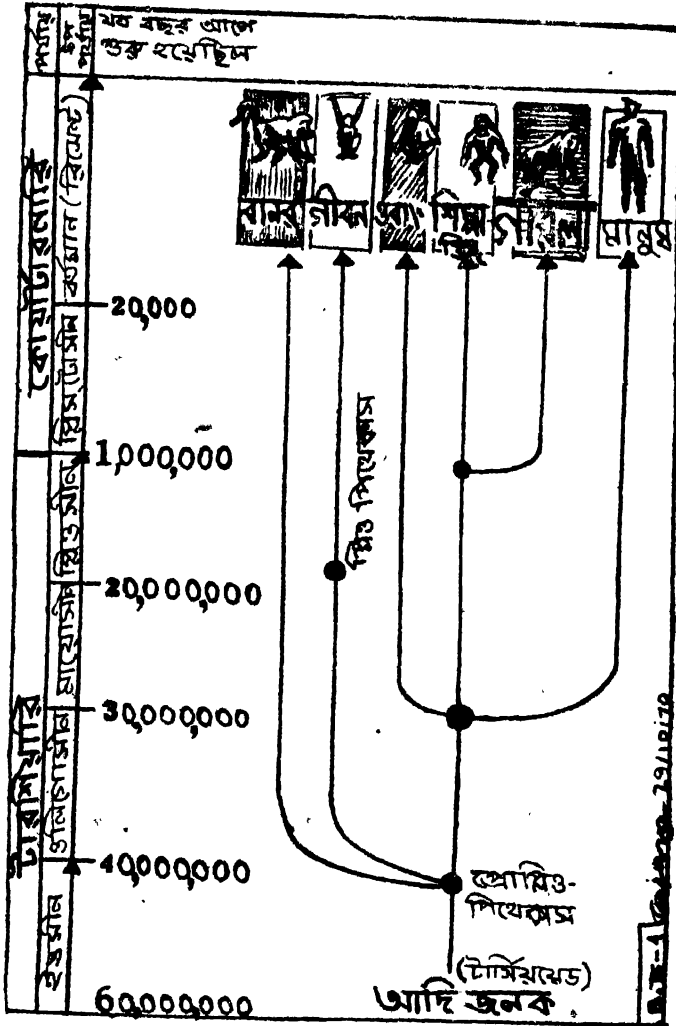
1নং চিত্র

অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে 'হান্নো (Hanno)' নামে এক কার্থেজবাসী উপনিবেশ গড়ার জন্য সমুদ্রপথে পশ্চিম আফ্রিকার তীর ধরে এসে একটি অঞ্চলে নোঙর ফেলেন। এই সময় তীরে এসে দেখেন কতকগুলি লোমশ বন্য মানুষ! তিনি তাদের ধরতে চেষ্টা করেন।

অনেক যুদ্ধে মেহনতের পরে কয়েকটি মৃত স্ত্রীলোক ছাড়া কোন জীবিত লোমশ বন্য-মানুষকে ধরে আনতে পারেন নি। জুনা দেবীর মন্দিরে সেই মৃত স্ত্রী বনমানুষদের লোমশ চামড়া ছাড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। বহু শতাব্দী পরে বর্তমান যুগে যখন 'রোম' আবিষ্কৃত হয় তখন যে 'পেরিপেটাস হান্নোস (Peripatus Hannois)' নামে এক ব্রোঞ্জ-ফলক পাওয়া যায়, তাতে এই ঘটনা বর্ণনা করা আছে। হান্নো দো-ভাষীর কাছে এদের নাম শুনেছিলেন 'গরিল্লা (Gorillae)'।

জীবন বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় বিবর্তনের ধারায় আজ থেকে প্রায় 60,000,000 বছর আগে টারশিয়ারি ভূতত্ত্বীয় পর্যায়ে এসেছে উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণী। প্রায় 40,000,000 বছর আগে ওলিগোসীন ভূতত্ত্বীয় উপ-পর্যায়ে এদেরই থেকে একটি ধারায় এলো বানর প্রভৃতি গোষ্ঠী; তারই অপর একটি ধারায় উদ্ভব হল মানুষ ও বনমানুষ (ape এপ্)-এর পূর্বপুরুষ। সেই বনমানুষ ও মানুষের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ধারায় একদিকে এসেছে মানুষের পূর্বপুরুষ এবং অপর ধারায় বনমানুষের পূর্বপুরুষ 'পঙ্গিড (Pongidae)', এরা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াত, গাছেই ছিল এদের বাস। কালক্রমে ঐ পঙ্গিড থেকেই এসেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 'গিবন (Gibbon)', 'ওরাং-উটাং (Orangutan)' এবং আফ্রিকার 'শিম্পাঞ্জি (Chimpanzee),' গরিলার পূর্বপুরুষ। অবশেষে প্রায় 1,000,000 বছর আগে প্লিসটোসীন ভূতত্ত্বীয় উপ-পর্যায়ে শিম্পাঞ্জি ও গরিলার পূর্বপুরুষ থেকে দুটি আলাদা ধারায় উদ্ভব হল শিম্পাঞ্জি আর গরিলা (1নং চিত্র)।

আফ্রিকান আদিবাসীদের ভাষায় 'গরিলা' কথার অর্থ 'লোমশ বর্বর'। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে—যেখানে সূর্যের আলো প্রায় পৌঁছয় না, গাছে গাছে শ্যাওলার বিরাট মোটা পুরু আস্তরণ পড়ে রয়েছে, সেই সব অরণ্যে গরিলার বাস, তাও আফ্রিকার সব অরণ্যে নয়। কেবল মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাংশে ক্যামেরুন্স ও গেবুনের গভীর জঙ্গলে, টাঙ্গানীয়ার হ্রদের উত্তরে কিভ্রু হ্রদের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ইটুরি জঙ্গলে এদের বাস। তবে ঐ তিন অঞ্চলের সমস্ত গরিলা একই রকম নয়। ক্যামেরুন্স ও গেবুনের গভীর অরণ্যে 'গরিলা গরিলা (Gorila Gorila)', কিভ্রু হ্রদের পার্বত্য অঞ্চলে 'গরিলা বেরিঙ্গি (Gorila Beringei)' এবং ইটুরি জঙ্গলে 'গরিলা, গরিলা রেক্স—পিগমিরাম (Gorila Gorila rex—pygmaerum)'– এই তিন জাতের গরিলা ঐ সব অঞ্চলে দেখা যায়। এদের মধ্যে ক্যামেরুন্স ও গেবুনের 'গরিলা গরিলা' আয়তনে সবচেয়ে বড়। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের কিভ্রুর 'গরিলা বেরিঙ্গি'-রা সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী গরিলা। প্রত্যেক অঞ্চলের গরিলার দেহের ওজনের কিছুটা তারতম্য আছেই; তবে সাধারণ ভাবে 400-500 পাউণ্ডের মত হয়।

যদিও হান্নো প্রথম ইউরোপীয়, যিনি গরিলার দেখা পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব যুগের লোক। তাঁর সেই আবিষ্কার বহুদিন ধরে বিস্মৃতির অন্তরালে ছিল। আধুনিক যুগে প্রথম গরিলার কথা শোনালেন দুই মিশনারী—উইলসন এবং স্যাভেজ। এঁরা 1846-'47 সালে আফ্রিকায় গিয়ে গরিলার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁদের গরিলা সম্বন্ধীয় কথা শুনে, সাধারণ লোক অতিশয়োক্তি করে গরিলা সম্বন্ধে অদ্ভুত

সব ধারণা গড়ে তুলতে থাকে। তখন থেকেই বেচারা গরিলাদের সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে থাকে।

কিন্তু কোন ভ্রান্ত ধারণা তো চিরদিন থাকতে পারে না—সত্য যেমন করে হোক উদ্ভাসিত হবেই। হ্যাঁ, এর পরেও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া গিয়েছিল, আমেরিকান পর্যটক 'পি. দ্যু চৈল্লা (P. Du. Chailla)'-র লেখা 1861 সালে প্রকাশিত 'এক্সপ্লোরেশন অ্যাণ্ড অ্যাডভেঞ্চারাস ইন ইকোয়েটোরিয়ান আফ্রিকা' বইতে। তিনি বলেন যে হাজার হাজার গরিলা অকারণে দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে কথাটা একেবারে ভুল। গদা দিয়ে হাতীকে পেটাতে কখনও তিনি দেখেন নি। আর গাছের ডালে-ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে বসে থেকে, সাঁড়াশীর মত হাত দিয়ে মানুষ ধরে, ইত্যাদি ধারণাগুলি যে কি করে আসতে পারে—বহু মাথা ঘামিয়েও তিনি তা ধরতে পারেন নি। গাছে বলতে গেলে চড়েই না। এক রকম শক্ত বাদামজাতীয় ফল খাওয়ার জন্য, অন্যান্য জন্তুদের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য বা কখনো কখনো ঘুমাবার জন্য গাছে চড়ে থাকে। আনারস জাতীয় গাছের পাতার মত একরকম পাতার সাদা অংশ, গাছের শেকড়-বাকড় খেতে খুব ভালবাসে। তিনি যে এক বিরাট গরিলার সম্মুখীন হয়েছিলেন—সেই অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ নির্ভেজাল বর্ণনা তাঁর ঐ বইতে দিয়েছেন।

এরপর 1876 সালে জার্মান পর্যটক ডঃ ফকেনস্টাইন সর্বপ্রথম জ্যান্ত গরিলার বাচ্চা ধরে ইউরোপে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। ঐ বছরই 21 জুন তারিখে লিভারপুলের জাহাজঘাটায় পেঁছিলে সম্বর্ধিত হন এবং ডারউইনের অভ্যর্থনাসহ আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে 30 তারিখে বার্লিনে পেঁছে বার্লিন অ্যাকোরিয়ামে বাচ্চাটিকে রাখেন। সেখানে তার উপর গবেষণা চলতে থাকাকালে অ্যাকোরিয়ামের নয় মাসের জীবনের অবসান ঘটে।

এর পরেও বার্লিন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর লুজ্ হক্ তিনটি গরিলা শিশু ধরে এনে শিক্ষিত করে তুলতে লাগলেন। এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যার হিসাব নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, ছয় সংখ্যার পর থেকে হিসাবের গোলমাল করে ফেলত। সবথেকে আশ্চর্যের কথা—স্পর্শকাতরতা, অভিমান, বন্ধুর মত দয়া আদর প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীও আয়ত্ত করতে পেরেছিল। এরাও বেশী দিন বেঁচে থাকে নি।

বার্লিন চিড়িয়াখানার পুরুষ গরিলা 'ববী' বন্দী অবস্থায় আর সমস্ত গরিলার মধ্যে সবচেয়ে বড় আকার ধারণ করেছিল। 1935 সালে 1লা অগাষ্টে 14 বছর বয়সে মারা যায়।

গরিলারা সাধারণতঃ ছোট ছোট দলে বিচরণ করে। এক একটা দলে পাঁচ থেকে পঞ্চাশটা গরিলা দেখা যায়। এক একটা দলে গড়ে তেরজন থাকে। ওয়েস্টারমার্ক তাঁর 1921 সালে প্রকাশিত 'হিস্ট্রি অব্ হিউম্যান ম্যারেজ' বইয়ের প্রথম খণ্ডে বলেছেন, দলের পুরুষ—রক্ষা করা, বাসা তৈরি করা, সাবধান সংকেত দেওয়া প্রভৃতি দায়িত্ব বহন করে।

কখনো কখনো পুরুষকে বনের মধ্যে একাকী ঘুরতে দেখা যায়। এর কারণ বিভিন্ন। যেমন দলের কোন পুরুষ যদি হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে—যে সেই হচ্ছে দলপতি; তবে আসল দলপতির

সঙ্গে ঐ পুরুষের যুদ্ধ হয় এবং যে পরাজিত হয় সে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়। দলে ভেড়ার আর উপায় থাকে না বলেই তখন পরাজিত নায়ক একাকী বনে ঘুরে বেড়ায়। একটি দলে সাধারণতঃ একজন পুরুষই থাকে। বাকীরা স্ত্রীলোক ও শিশু। কখনো কখনো দলপতির অনুগ্রাহী একাধিক পুরুষ অথবা বৃদ্ধরাও দলে আশ্রয় নেয়।

1927 সালে প্রকাশিত 'দি মাদার্স' বইতে লেখক 'বিফল্ট' এক নতুন কথা শুনিয়েছেন। পুরুষরা নাকি নিজেরা দল গঠন করে না। স্ত্রী-গরিলারাই স্থায়ীভাবে দল গঠন করে এবং বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষ গরিলাকে দলভুক্ত করে এবং তার প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়।

1929 সালে প্রকাশিত ইয়র্ক'স দম্পতি রবার্ট ও আডা লিখিত 'দ্য গ্রেট এপস্'-এ গরিলাদের খাদ্য ও খাদ্যান্বেষণ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেছেন। এরা সাধারণতঃ টেঁপারি জাতীয় এবং অন্যান্য ফলমূল খেয়ে থাকে। যারা পার্বত্য অঞ্চলে থাকে তারা আগাছা ও শেকড় খেয়ে থাকে। এছাড়াও কাঁচ বাঁশের কোরকও খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। 1977 সালে 'বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়াম' আয়োজিত পূর্বভারত বিজ্ঞান মেলায় রতনলাল ব্রহ্মচারীর 'দি ওয়াইল্ড লাইফ (The wild life)' বক্তৃতায় জেনেছিলাম ওরা 'রুমেক্স্ আবিসিনিকাস্' নামে একরকম টকজাতীয় পাতা খায়। স্থানীয় বাসিন্দারা গাছটিকে 'মুফুন্দা' বলে। এই সুযোগে আরো কয়েকটা কথা বলে নিই ; বলেছিলেন রতনলাল ব্রহ্মচারীই। ঐ টক পাতা একটা গরিলা খাচ্ছে এমন সময় তিনি সেখানে উপস্থিত। অন্যান্য জন্তুরা খাওয়ার সময় বিঘ্ন ঘটালে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উনি করলেন কি, কয়েকটা পাতা মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে গরিলার দিকে এগোতে থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় গরিলাটি একবারও তো ক্ষেপে যায় নি ; উপরন্তু তার আনন্দ হয়েছিল বলে মনে হয়। ওদের ধারণা খাওয়ার সময় কেউ কারও শত্রুতা করতেই পারে না। এত সরল বিশ্বাস।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ডিসেম্বরে গরিলাদের বাচ্চা হয়। কিন্তু ডাইস শার্প লক্ষ্য করেছেন বছরের প্রথম বৃষ্টির ঠিক পরেই ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে গরিলা-শিশুদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

গরিলাদের কথা শেষ করতে গেলে বিখ্যাত মহিলা প্রাণীবিদ্ ডিয়েন ফসি-র গবেষণার কথা না বললেই চলে না। তিনি তাঁর মূল্যবান গবেষণার জন্য আফ্রিকার মধ্য-পূর্বাঞ্চলের 'পার্ক দ্য ভলকান'-এ থেকে গরিলাদের প্রচুর মূল্যবান আলোক-চিত্র ও বিভিন্ন মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। ওদের বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন সময়ে শব্দের টেপ করেছেন টেপরেকর্ডারে। উত্তেজিত হলে বা রেগে গেলে 'গর্‌গর্' করে। খুব খুশি হলে ঢেকুর তোলার মত শব্দ করে। 'নুম্ নুম্ নুম্' শব্দের সাহায্যে বোঝায় 'সমস্ত ব্যাপারটা বেশ তোফা জমেছে'। পুরুষ-গরিলারা সাধারণতঃ 'ঘোঁত ঘোঁত' শব্দে ঝগড়াঝাটি থামার বা আস্তানা গুটিয়ে এগুবার আদেশ দেয়। স্ত্রী-গরিলারা মোলায়েম 'ঘোঁত ঘোঁত' শব্দে বাচ্চাদের শাসন করে। সামনে বিপদ দেখলে প্যাচার মত 'হুম্ হুম্' শব্দ করে থাকে। এমনি আরো কত শব্দের সম্ভার ফসির টেপ-ভাণ্ডারে জমা পড়েছে।

পুরুষ-গরিলাদের বয়স হলে পিছনের পিঠের লোমগুলি পেকে সাদা হয়ে যায়। বছর দশ বয়স হলে এই পাক ধরতে শুরু করে। এমন গরিলাদের বলা হয় 'সিলভার-ব্যাক্‌ড্' বা 'রুপোলী-পিঠ'। রাত্রে গাছের ডাল ভেঙ্গে, তার উপর শ্যাওলা-মাটি লেপে বিছানা করে। তার উপর কখনো বা পাতাও বিছিয়ে নেয়। অনেক সময় মাটিতেও শুয়ে পড়ে।

ফসি দেখেছেন, একটা দল অপর দলের কাছে এসে পড়লে সাধারণতঃ বন্ধুত্ব করে না ; তা বলে মারপিটও বাধিয়ে দেয় না। একটু বুক চাপড়ে চিৎকার টিৎকার করে, কয়েকটা ডাল-ফাল ভেঙ্গে একদল অপর দলের থেকে দূরে চলে যায়। এসম্বন্ধে সাধারণ মানুষের যে বাজে ধারণা ছিল ফসির প্রত্যক্ষ মতে, তা আদৌ সত্য নয়।

এক দিনের কথা—একটা কালো পিঠওয়ালা পুরুষ-গরিলা হঠাৎ ফসির কাছে এসে দুষ্টুমি করে ভয় দেখানোর জন্য জোরে জোরে দুম্ দুম্ করে বুক চাপড়াতে লাগল। তারপর সটান ফসির দিকে এগিয়ে এলো ; কিন্তু কোন অভদ্র আচরণ করল না। গা খস্ খস্ করে চুলকোলে গরিলারা আশ্বস্ত হয়। ফসিও তাই করলেন, বোঝাতে চাইলেন বন্ধু বলে। তারপর ফসি তার দিকে নিজের হাতখানা ছুঁড়ে দিলেন। গরিলাটিও কিছুটা ইতঃস্তত করে লাজুক লাজুক ভাব এনে তারও হাতখানা ছুড়ে দিল—বন্ধুত্বের জন্য। এই চরম দৃশ্যের আলোকচিত্র ফসির এক বন্ধু তুলে নিলেন অমর করার জন্য। এমনই আরো বহু বহু অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ নিরীক্ষণে ফসি উদাত্ত কণ্ঠে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'গরিলারা খুব ভদ্র—খুব লাজুক ; সেই সঙ্গে ভীষণ দুষ্টুও বটে।'

আবহমণ্ডলে হাইড্রোজেন কম কেন?

চন্দন দাশগুপ্ত*

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বুধ গ্রহের এবং পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের আবার কোন আবহমণ্ডলই নেই। এই ঘটনারই কারণ প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়।

স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলস্থ বিভিন্ন গ্যাসের আয়তন সম্পর্কে আমরা সকলেই মোটামুটি ওয়াকিবহাল। এই সব গ্যাসের শতকরা পরিমাণ হল :

নাইট্রোজেন	→	77·17%
অক্সিজেন	→	20 60%
কার্বন ডাই-অক্সাইড	→	0·03%
জলীয় বাষ্প	→	1·40% এবং
অন্যান্য গ্যাস (যথা : হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি)	→	0·80%

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে যে, আবহমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণের এই তারতম্যের কারণ কি? বিশেষতঃ হাল্কা গ্যাস, যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতির পরিমাণ অন্য গ্যাসগুলির চেয়ে এত কম কেন? এসব নিয়ে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে অনেক গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে সহজবোধ্য ব্যাখ্যাটি এখানে দেওয়া হল।

কোন বস্তুকে আকাশের দিকে ছুঁড়লে, সেটা আবার মাটিতেই ফিরে আসে—এটি আমরা সকলেই জানি। পৃথিবীর 'অভিকর্ষ' (gravity) এই ঘটনার জন্য দায়ী। কিন্তু পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলকে অতিক্রম করার উপযোগী বেগে ঐ বস্তুটিকে ছোঁড়া হলে সেটি আর কখনই পৃথিবীতে ফিরে আসবে না। সবচেয়ে কম যে বেগে কোন বস্তুকে ছুঁড়লে সেটি আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না, তাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'মুক্তি বেগ' (escape velocity)। $V_e = \sqrt{2gR}$—এই সূত্রের সাহায্যে এর মান নির্ণয় করা সম্ভব : যেখানে,

V_e = সূত্র প্রয়োগকারী গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের মুক্তি বেগ,

g = ,, ,, ,, ,, ,, অভিকর্ষজ ত্বরণ, এবং

R = ,, ,, ,, ,, ,, ব্যাসার্ধ।

পৃথিবীর গড় অভিকর্ষজ ত্বরণ 980 সে.মি./বর্গ সেকেন্ড এবং গড় ব্যাসার্ধ 6400 কি.মি. ধরলে, পৃথিবীর মুক্তি বেগের মান হয় $11{\cdot}2 \times 10^5$ সে.মি./সেকেন্ড।

সব গ্যাসই অসংখ্য 'অণু' (molecule)-র সমবায়ে গঠিত এবং এই অণুগুলি সর্বদা একটি 'অক্রম' (random) গতিতে ধাবমান।

* 20/1-বি, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা-700 054

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, চাপ 76 সে.মি. দীর্ঘ পারদস্তম্ভের সমান এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘনত্ব 0·00009 গ্রাম/ঘন সে.মি. ধরলে, হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণুর মূল গড় বর্গবেগ* হয় $1 \cdot 84 \times 10^5$ সে.মি./সেকেণ্ড।

আমরা জানি, কোন আবদ্ধ গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে তার চাপও সমহারে বেড়ে যায়। এই চাপ বাড়বার প্রকৃত কারণ হল তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে গ্যাসের প্রত্যেকটি অণুর মূল গড় বর্গবেগের মান বেড়ে যায়।

সৃষ্টির উষাকালে পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা অত্যন্ত বেশী ছিল। ফলে আবহমণ্ডলস্থ হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুগুলির মূল গড় বর্গবেগের মানও ছিল অনেক বেশী। সুতরাং মনে করা যেতে পারে, এই মূল গড় বর্গবেগের মান, পৃথিবীর মুক্তি বেগের সমান বা, তার চেয়েও বেশী ছিল। এর ফলে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের হাইড্রোজেন গ্যাসের অধিকাংশই ধীরে ধীরে পৃথিবীপৃষ্ঠ ছেড়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

এই তত্ত্বের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে বলা যায়, বর্তমান পৃথিবীর স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণুর মূল গড় বর্গবেগের মান $1 \cdot 84 \times 10^5$ সে.মি./সেকেণ্ড (পূর্বে নির্ণীত)। যেহেতু পৃথিবীর মুক্তিবেগের মান $11 \cdot 2 \times 10^5$ সে.মি./সেকেণ্ড, সুতরাং বর্তমান মূল গড় বর্গবেগের প্রায় 6·09 গুণ বেগ বৃদ্ধি হলেই হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রত্যেকটি অণুর বেগ পৃথিবীর মুক্তিবেগের সমান হয়ে যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রচণ্ড উষ্ণতার সাপেক্ষে চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি হাইড্রোজেন অণুর পক্ষে বর্তমান বেগের 6·09 গুণ বেগ অর্জন করা খুব দুঃসাধ্য ছিল না। শুধু হাইড্রোজেন নয়, আবহমণ্ডলের হিলিয়াম এবং আরও কয়েকটি গ্যাসের উপাদানের বৈষম্যের মূলেও এটি একটি কারণ।

বুধ-চাঁদ প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের কোন রকম আবহমণ্ডলই নেই। ম্যাক্সওয়েলের 'বেগ বণ্টন' (velocity distribution) অনুসারে এর ব্যাখ্যা করা যায়। তাঁর মতে কোন গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলির বেগ অসীম পর্যন্ত হতে পারে। এর ফলে, বুধ-চাঁদ প্রভৃতির মুক্তি-বেগের চেয়ে বেশী বেগে ধাবমান গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি সহজেই সেই সব গ্রহ-উপগ্রহের সান্নিধ্য পরিত্যাগ করেছে। আবার চাঁদ ও বুধের মুক্তি বেগের মান অত্যন্ত কম—কারণ তাদের g ও R উভয়েই পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। সুতরাং সৃষ্টির প্রারম্ভে চাঁদ ও বুধের পৃষ্ঠের অত্যধিক উষ্ণতার সুযোগে, অবশিষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলিও সেই সব গ্রহ-উপগ্রহের আবহমণ্ডলে থাকার বন্দীত্ব থেকে চিরমুক্তি লাভ করেছে।

*যদি N-সংখ্যক অণুর প্রত্যেকটির গতিবেগ যথাক্রমে $C_1, C_2, C_3, \cdots, C_N$ হয়,

তবে $$\frac{C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + \cdots\cdots + C_N^2}{N} = C^2 \text{ (ধরি)}$$

এই C^2 রাশিটিকে বলে 'গড় বর্গ বেগ' (mean square velocity)

$$\therefore \; C = \sqrt{\frac{C_1^2 + C_2^2 + C_3^2 + \cdots\cdots + C_N^2}{N}}$$

এই C রাশিটিকে বলে 'মূল গড় বর্গ বেগ' (root mean square velocity)।

অ্যালার্জি কি?

বিমলকৃষ্ণ ঘোষ*

বিংশ শতাব্দীতেও মানুষের দেহ সংস্থানে অ্যালার্জি একটা মহাসমস্যা সংকুল ব্যাধিরূপে উপস্থিত হয়েছে। আশ্চর্য এই যে রোগ যখন ধরা পড়ে না, তার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তখন চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া হয় ওটা একটা অ্যালার্জি। কারও শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে সেটা অ্যালার্জি, কারও ভয়ানক হাঁচি হচ্ছে সেটাও অ্যালার্জি ; আবার কারও গায়ে চুলকানি সেটাও অ্যালার্জি। এই অ্যালার্জি নিয়ে আলোচনাও অনেক হচ্ছে। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চললেও স্থির সিদ্ধান্তে এখনও উপনীত হতে পারা যায় নি। তবে অ্যালার্জির স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য এখন জানা গেছে।

এখন প্রশ্ন হল—অ্যালার্জি বলতে আমরা কি বুঝি? 'অ্যালার্জি' হল অনেকের ক্ষেত্রে যে বিষয় কোনও অনুভূতি বা প্রবণতা জাগাতে পারে না এবং ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয় না, তা অন্য কোন ক্ষেত্রে বিকৃত বা বর্ধিত অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই অস্বাভাবিকভাবে বিকৃত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অনুভূতিপ্রবণতাই হল অনেকের মতে 'অ্যালার্জি'।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে অ্যালার্জি সম্পর্কে গবেষণা শুরু হলেও প্রায় দেড়-শ' বছর পূর্বে ডাঃ হ্যানেমেন অ্যালার্জি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (idiosyn-cracies) সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—'দেহস্থিত কতকগুলি বিশেষ ধাতু যা অন্যভাবে সুস্থ থাকলেও কতকগুলি দ্রব্যদ্বারা তাদের অল্পাধিক পীড়িত হবার প্রবণতা দেখা যায়। অথচ সেই সকল দ্রব্য অপর অনেক লোকেরই কোনও প্রভাব বিস্তার করে না বা কোনও পরিবর্তন আনে না'। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেছেন—একভদ্র মহিলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পায়ে আলতা পরার পরে সেখানে একপ্রকার চুলকানির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সেই একই আলতা অন্য অনেক মহিলার কোন ক্ষতি করে না।

অনেক কারণে অ্যালার্জি হতে পারে। এর প্রকৃত কারণ এখনও অজ্ঞাত। তবে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে এককথায় যা বলেছেন তা হল বিরুদ্ধ বা বিষাক্ত পদার্থের (antigen) সঙ্গে দেহস্থিত প্রতিরক্ষামূলক পদার্থের (antibody) সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন একটা প্রতিক্রিয়াই এর কারণ। অর্থাৎ প্রোটিনজাত কোন বিজাতীয় (foreign) পদার্থের দেহপেশীর উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলেই অ্যালার্জির উৎপত্তি হয়। ব্যাখ্যা করলে ব্যাপারটাকে এভাবে বলা যায়—প্রতিদিনই আমরা প্রোটিনজাতীয় খাদ্যগ্রহণ করি। এই প্রোটিন আবার 20 প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) দিয়ে গঠিত। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির মধ্যে হিস্টিডিন (histidine) সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বিজাতীয় পদার্থ দ্বারা দেহের পেশী আক্রান্ত হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তার মাঝ থেকে বিতাড়িত হয় ; হিস্টিডিন তখন হিস্টামিনে পরিণত হয়। রক্তপ্রবাহে এই প্রোটিনজাত হিস্টামিন যখন

*ডি এম. এস. (2য় বর্ষ), 3.63, মহাজাতি নগর, পোঃ-বিরাটী, কলিকাতা-700051

প্রবাহিত হয় তখন দেহযন্ত্র ও মাংশপেশীতে কতকগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যথা—হাঁচি, মাথাঘোরা, ত্বকের উত্তেজনা, আমবাত, শ্বাসকষ্ট, অ্যানাফিলেকসিস প্রবণতা, শক্ প্রভৃতি। দেহের সর্বত্রই অ্যালার্জির এই প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। বিজাতীয় পদার্থের অনুপ্রবেশে দেহের ভিতরে প্রতিরোধ উপাদান স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে।

আজকাল অবশ্য ব্যাপকভাবে 'অ্যান্টিবায়োটিক' ঔষধ ব্যবহার করা হয়, যার ফলে অ্যালার্জির লক্ষণ খুব বেড়ে গেছে বলে অনেকের ধারণা। রোগের কতকগুলি নির্ধারিত জীবাণুকে ধ্বংস করা অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ হলেও অন্ত্রস্থিত ফ্লোরার (intestinal flora) উপরও তা ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ধরনের ঔষধ দেহে প্রবেশের সাথে সাথে অ্যালার্জি প্রকাশ না পেলেও তা গাত্রত্বকের উদ্ভেদ ও অন্যান্য লক্ষণরূপে দেখা দিতে পারে। অনেক সময় 'পেনিসিলিন'-এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে যে অ্যানাফিলেকসিস প্রবণতার সৃষ্টি হয়, তা রোগীর পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ফলে অ্যালার্জি হতে পারে। এই প্রতিক্রিয়াটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ—অ্যাটোপি। এই প্রতিক্রিয়াটির জন্য দায়ী পদার্থগুলিকে বলা হয় অ্যাটোপেন্স। আর দেহের ভিতরে তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরক্ষা উপাদান গড়ে উঠে তাকে বলা হয় রিআগিন্স (reagins)। এই প্রতিরক্ষামূলক উপাদানের স্বভাব হল অধঃক্ষিপ্ত না হওয়া এবং ত্বকের সঙ্গে তার সংযুক্ত হবার প্রবণতা থাকা, যা গর্ভস্থ ফুলের (placenta) আবরণ ভেদ করে এবং জরায়ুস্থিত ভ্রূণের মধ্যে তার স্বভাব ও স্বধর্ম আরোপ করে। দেহের ভিতর অ্যাটোপেন্স-এর অনুপ্রবেশ ঘটে সাধারণতঃ শ্বাসনালী, অন্ত্রনালী এবং গাত্রত্বকের ভিতর দিয়ে ; আর তার ফলে দেখা দেয়—সর্দি, হাঁচি ও নানা স্রাব। এই অ্যাটোপেন্স ক্লোম শাখার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির (bronchial mucosa) ভিতর দিয়ে গেলে হয় হাঁপানী। পাকাশয় ও অন্ত্রের ভিতর দিয়ে এটোপেন্স প্রবেশ করলে প্রকাশ পায় পাকাশয় উদ্ভূত হাঁপানি (gastric asthma), বমি, উদরাময়, আমবাত, ত্বকের প্রদাহ, একজিমা, চর্মরোগ, অর্শ, মলদ্বারে ব্যথাবেদনা, মুখের ভিতর ঘা, ত্বকের খোলস উঠা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ।

খাদ্য-দ্রব্যের অসঙ্গতি থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে। কেউ চিংড়ি মাছ খেলে অ্যালার্জি হয়, কারো ইলিশমাছ খেলে অ্যালার্জি হয়, কারো বা ডিম খেলে হয়। কেউ মাংস খেলে হয়, কেউ পেঁয়াজ খেলে, কেউবা লঙ্কা খেলেও অ্যালার্জি হয়। তা ছাড়া আরও অনেক খাদ্য আছে যা খেলে অনেকেরই অ্যালার্জিরূপে উদ্ভেদ দেখা যায়। তবে লক্ষণীয় যে—এক এক খাবারে এক এক জনের এই অ্যালার্জি হয়ে থাকে।

এমন অনেক খাদ্য আছে যেগুলি গাত্রত্বকের সংস্পর্শে এসে অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—অ্যান্টিবায়োটিকযুক্ত ক্রিম, মলম। কতকগুলি বিষাক্ত গাছ যেমন—আর্টিকা ইউরেন্স, আইভি। রসায়নজাত পদার্থ যেমন—ফর্মালিন, আয়োডিন, নিকেল, পারদ, নাইলন-বস্ত্র, রবার, প্রসাধনদ্রব্য। ব্যক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই সকল পদার্থ অ্যালার্জি সৃষ্টি করতে পারে।

মনে রাখতে হবে ক্রিমি, অ্যামিবাহিস্টোলিটিকা নানান ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের থেকেও অ্যালার্জি হতে পারে কিংবা সেগুলি অ্যালার্জির ধারক হতে পারে।

শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাবের বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 29-12-79 থেকে 1-1-80 পর্যন্ত শ্রীরামপুর সায়েন্স ক্লাব আয়োজিত 12 বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চাতরা শ্রীরামপুরে। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিকস্ অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস্-এর বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মৃণাল কুমার দাশগুপ্ত। অধ্যাপক দাশগুপ্ত বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর নিজের সাক্ষাতের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে এক শিক্ষণীয় ভাষণ দেন।

30-12-79 থেকে 1-1-80 তিন দিনের প্রভাতী অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, 'স্কুলের কর্মশিক্ষা পদ্ধতি কর্মজীবনের সহায়ক নয়' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ ও শিশুদের প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। এছাড়া 'মগজের রহস্য সন্ধানে ঔষধের অবদান' শীর্ষক আমন্ত্রিত বক্তৃতা প্রদান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক জগৎজীবন ঘোষ। প্রতিযোগিতাগুলির বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞান কলেজের 'রাসবিহারী ঘোষ' অধ্যাপক পবিত্রকান্তি ঘোষ।

প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল বৈদ্যুতিক আলোর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আবিষ্কারক টমাস আলভা এডিসনের জীবনালেখ্য প্রদর্শন। প্রদর্শিত মডেলগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছিল উদ্ভাবনের ট্রাক্টর, প্রাণী-বিজ্ঞানে নমুনা সংগ্রহ, Appropriate Technology র উপর কয়েকটি প্রকল্প এবং ডাকটিকিটের মাধ্যমে টেলিফোনের আবিষ্কর্তা আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের জীবনী এবং তৎসঙ্গে টেলিফোন যন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক উন্নতির রূপরেখার প্রদর্শন।

প্রদর্শনীর প্রথম দিন (29-12-79) বিশ্ব-বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্ম-শতবর্ষ (1879-1955) উপলক্ষে আইনস্টাইন দিবস রূপে, দ্বিতীয় দিন (30-12-79) আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ উপলক্ষে শিশু দিবস রূপে, তৃতীয় দিন (31-12-79) এডিসনের মেনলো পার্কের বৈদ্যুতিক আলোর প্রদর্শনীর (31-12 1879) শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এডিসন দিবস রূপে এবং চতুর্থ দিন (1-1-1980) আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 85 তম জন্মদিবস উপলক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ বসু দিবস রূপে পালন করা হয়। এছাড়া প্রদর্শনীতে প্রখ্যাত কৃষি-বিজ্ঞানী রাজেশ্বর দাশগুপ্তের (জন্ম 25-9-1 78 মৃত্যু-22-11-1926) জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান হয়।

প্রদর্শনীর বিভিন্ন প্রতিযোগিতাতে অংশ গ্রহণকারী বহিরাগতদের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়েছে চন্দন নগরের সংস্কৃতি সংঘ, ভদ্রেশ্বরের উন্মেষ, শ্রীরামপুরের বোর সায়েন্স অরগানাইজেসন, নন্দলাল ইনষ্টিটিউশন হবি সেণ্টার ও অরুণোদয় (বিজ্ঞান বিভাগ)।

প্রদর্শনীর সমাপ্তি দিনে পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতার সিটি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং ইনষ্টিটিউট অফ থিয়রেটিক্যাল ফিজিকস্-এর অধিকর্তা অধ্যাপক মোহিনীমোহন ঘোষ এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ইনষ্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিকস অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকস্-এর প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড়।

প্রদর্শনীর প্রথম দিন বিজ্ঞান বিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাসম্বলিত স্মারক পত্রিকাটি বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। প্রদর্শনীতে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণের সমাগম হয়েছিল।

মাননীয় সম্পাদক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান,

জ্ঞান ও বিজ্ঞান, নভেম্বর '79 সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরাধানাথ ঘোষ মহাশয়ের পত্রের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নদী বিষয়ে আমার আলোচনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে জেনে খুশী হলাম। তাঁর পত্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ—

সাগর থেকে উঠে আসা জোয়ারের জল বন্যার জলকে নেমে যেতে বাধা দেয় সত্য, কিন্তু 1978 সালের প্রবল বন্যার সময় কলিকাতা, উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় যে, জোয়ারের সময় বন্যার জলের গতি কমে যাওয়ায় জলস্ফীতি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ঐ সময়েও নদীতে জলের গতি সাগর অভিমুখে ছিল; অর্থাৎ কোন স্থানে ব্যারাজ দ্বারা জোয়ারের জল আটকানোর চেষ্টা হলে ব্যারাজের নিম্নাংশে জোয়ারের জন্য জলতল যত উঁচু হত, প্লাবিত অঞ্চল থেকে নেমে আসা জলে ব্যারাজের উপরাংশের জলতল আরও বেশী উঁচু হত। এছাড়া ব্যারাজটি ভাঁটায় সময় জল প্রবাহের বাধা দিত। ফলে প্রবলতর প্লাবন হত। প্লাবন কমাতে জোয়ার আটকাতে হলে তা করতে হবে প্রায় সাগরে—যা অবাস্তব বলে আলোচিত হয় নি।

নদীকে গভীর করার জন্য যে ঘাত-প্রতিঘাতের কথা শ্রীঘোষ বলেছেন, তা যদি বাঁকের জন্য সৃষ্ট হয়, তবে নদীর পাড়ের ক্ষয় হয় ও সেই ক্ষয়িত মাটি নদীবক্ষে জমা হয়, আসলে নদীতে বন্যার জলের তীব্র গতি অজস্র ঘূর্ণি সৃষ্টি করে, যা খাতকে গভীর করে। সেই জন্য বিপুল পরিমাণ জলরাশি স্বল্পগতিতে অবিরাম নেমে এলে নদীখাতের উন্নতি হয় না, বরং তার চেয়ে কম জল হঠাৎ তীব্র গতিতে ছুটে গেলে নদীখাতের উন্নতি হয়। জনশক্তির দ্বারা বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নদীখাত রক্ষা করা সম্ভব নয় বলেই তো বন্যার প্রবল শক্তিকে নদীখাতমুখী করে তাকে কাটানোর কাজে নিয়োজিত করতে বলেছি। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল, পৃষ্ঠা 194)

শ্রীঘোষ জলধারগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলেছেন কেন? জলাধারগুলি না থাকলে আজকের এই সবুজ বিপ্লব হত কি? আসলে জলাধারগুলি থেকে বছরে কয়েকবার নদীখাতের উপযোগী স্বাভাবিক বন্যা ছেড়ে অথবা কৃত্রিম বন্যা সৃষ্টি করে সেচখালগুলির সাহায্যে সীমিত প্লাবনের মাধ্যমে নদীখাত থেকে জমিতে উর্বর পলি আহরণ করা একান্ত দরকার ছিল, যা করা হয় নি বলেই নদীখাত ধ্বংস হয়েছে। (পৃষ্ঠা 195) তাই আজকের এই সর্বনাশা প্লাবন।

শ্রীঘোষ দামোদর ও দ্বারকেশ্বরের সংযুক্তি ভয়াবহ বলেছেন কেন? যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও হুগলী মোহানার উন্নতি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই সংযুক্তি একান্ত প্রয়োজন। তবে যদি কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলসহ হুগলীখাতের উন্নতি একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হয়, তবে বলব দামোদরকে শক্তিগড় থেকে দক্ষিণ পূর্বমুখী পথে চন্দননগরের কাছে হুগলী আনা যেতে পারে (যার মধ্যাঞ্চলটি কানা নদীপথে গড়ে উঠতে পারে)। যদিও এতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল মাঝে মাঝে প্লাবনের কবলে পড়বে, তবুও চন্দননগর পর্যন্ত হুগলী খাতের যথেষ্ট উন্নতি হবে। তথাপি হুগলী ও হাওড়া জেলায় দামোদরের বর্তমান খাত জলের গতি বজায় রাখার সহায়ক নয় বলে শ্রীঘোষের

মতানুযায়ী বারবার সংস্কার করলেও বারবার মজে যাবে। প্রসঙ্গত বলি, উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বন্যার সময় 4 বা 5 লক্ষ কিউসেক জল আনাই ভাগীরথী-হুগলী পুনরুজ্জীবনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

শ্রীঘোষের উল্লেখিত শ্রীকপিল ভট্টাচার্যের স্কীমটি কোন সংস্থার মুখপত্রে আছে তা জানানো হয় নি। তাছাড়া আমার বক্তব্যের একটি অতি সীমিত অংশই ছিল হুগলী মোহনার কাজের রূপরেখা। বক্তব্যের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল কয়েকটি সূত্র নির্ণয় করে বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগ সাধন করে জলের দ্রুতগতির সাহায্যে নদীখাতের উন্নতি বিধান ও প্লাবন নিয়ন্ত্রণ —যা মৌলিক বলে মনে হয়।

খাল-বিলের সাহায্যে বর্ষার প্রারম্ভে কিছুটা প্লাবন নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও শেষ বর্ষণে এগুলি পূর্ণ থাকায় প্লাবন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে না। এছাড়া বন্যার সময় যে বিপুল পরিমাণ জল নেমে আসে, [1978 সালে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দামোদর-কংসাবতী উপত্যকায় প্রায় 55 লক্ষ একর ফুট—পৃষ্ঠা 136] তা বিশালায়তন জলাধারগুলি ধরে রাখতে পারে না, খালবিলে কতটুকু রাখা সম্ভব? কাজেই নদীখাতের উন্নতিই প্লাবন মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শিবরাম বেরা

পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

পুস্তক-পরিচয়

পুস্তকের নাম — রোমাঞ্চকর রসায়ন; লেখক - সাধন দাশগুপ্ত; পরিবেশক—বিশ্বভারতী 8সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-9; পৃষ্ঠা সংখ্যা-118; মূল্য-12 টাকা।

রোমাঞ্চকর রসায়ন পাঠে শরীরে শিহরণ ও মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি হবে কিনা বলা যায় না, তবে পাঠক যে রসায়নে রসোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দু-দশক আগেও বিজ্ঞানের রহস্য বাংলাভাষায় পরিবেশন করা ছিল দুরূহ, কিন্তু বহুজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঐ আপাতদুর্লঙ্ঘ্য বাধা প্রায় অপসারিত। শ্রীদাশগুপ্তের রোমাঞ্চকর রসায়ন কথকথায় উন্নীত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশের অবকাশ থাকলেও, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশের চড়াই উতরাই পথে সহজে পদচারণার সম্ভাবনার সঙ্কেত বয়ে এনেছে।

গ্রন্থটির প্রতি অধ্যায়ের কাব্যিক নামকরণের সাথে কবিতাগুচ্ছের সংযোজনে রস-অয়ন হয়ে উঠেছে রস-চয়ন। ছন্দময় ভাষায় বিষয়ের সুষম প্রকাশে লেখকের মুন্সিয়ানার তারিফ করতে হয়। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিস্তারিত ক্ষেত্রে যে কোন শাখাকে সহজবোধ্য করা বেশ কঠিন। তাই রোমাঞ্চকর রসায়নের বৃঠিবাড়ীর সদর দরজায় সাধারণ পাঠক সহজেই পৌঁছাতে পারে, কিন্তু জটিল তত্ত্বের জটিলতা ভেদ করতে সব বাধা নিষেধ কাটিয়ে অন্দরে প্রবেশ করতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য লেখক ভূমিকায় একথা স্বীকার করেছেন।

ইতিহাসের পটভূমি থেকে নবপর্যায়ে রসায়নের যে উত্তরণ, তার একটি ছবি এই লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে। পর্যায়-সারণী পরিক্রমাকালে মনে হয় জানার মধ্যেও রয়েছে কত অজানা। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম শতাধিক মৌল ও তাদের নানা যৌগের মহাযজ্ঞের এই লিপিকা জ্ঞানের ক্ষেত্র করে বিস্তৃত আর মনে জাগায় অনুসন্ধিৎসা। এ কারণেই লোকরঞ্জক বিজ্ঞানের গ্রন্থমেলায় এ গ্রন্থ একটি বিশিষ্ট স্থান পাবে এবং রসিক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হবে বলেই আমাদের ধারণা।

রতনমোহন খাঁ

পরিষদ-সংবাদ

বিশেষ সাধারণ সভা

গত বার্ষিক সাধারণ সভায় সময়াভাবে বিধিনিয়মাবলীর সংস্কারের আলোচনা করা সম্ভব না হওয়ায়, উক্ত সভায় স্থির হয় যে 1979 সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভায় এই সংস্কার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ঐ সিদ্ধান্তানুযায়ী 30শে ডিসেম্বর বিশেষ সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়, কিন্তু 'কোরাম' না হওয়ায় সভাপতি মহাশয় সভা বাতিল করতে বাধ্য হন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিবস উদযাপন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে 1 জানুয়ারী (1980) পরিষদের "সত্যেন্দ্র ভবনে" সকাল 9 ঘটিকায় অধ্যাপক বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এবং উপস্থিত সভ্যগণ অধ্যাপক বসুর প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঐ দিনটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করবার জন্য এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি-বক্তৃতা'র আয়োজন করার জন্য উপস্থিত সভ্যগণ কার্যকরী-সমিতিকে অনুরোধ জানান। এর পর ঈশ্বর মিল লেনে অধ্যাপক বসুর বাড়ীতে বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনকে স্মরণ করা হয়।

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 21শে নভেম্বর '79 'সত্যেন্দ্র ভবনে' অধ্যাপক আশিস সিংহ "যোগশাস্ত্রের বিজ্ঞানভিত্তি" বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। সভা পরিচালনা করেন ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীজীবনতারা হালদার, ডঃ গুণধর বর্মন ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের অনেকে। সভাশেষে শ্রীযুগল কান্তি রায় পরিষদের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভ্রম সংশোধন—ইন্দ্রজিৎ ঘোষের 'সংখ্যা নিয়ে খেলা' (ডিসেম্বর, 1979) প্রবন্ধে '$33=4\times4\times\sqrt{4}^{\circ}$ এবং '$45=(4\times4+\sqrt{4})/4$'-এর স্থলে যথাক্রমে $33=4\times4\times\sqrt{4}+4^{\circ}$ এবং $45=(4\times4+\sqrt{4})/{}^{\circ}4$ হবে। ডিসেম্বর '79 সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর 616 পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে ডি. পি. "বড়ুয়া"-এর স্থলে ডি. পি. "বর্মা" হবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1980 সালের জন্য সভ্য/সভ্যা পদ গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থিগণ বিধি অনুযায়ী আগামী 20শে ফেব্রুয়ারী, 1980 তারিখের মধ্যে সভ্য/সভ্যা চাঁদা বার্ষিক 19.00 (উনিশ টাকা) জমা দিন। উক্ত তারিখের মধ্যে চাঁদা জমা না দিলে, তিনি 1980 সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোষ্ট অপিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে। টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন।** কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে **চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে।** প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। **কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন।** কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। **প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।**

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের গ্রাহক হইবার জন্য আবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সুবৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে ।

মূল্য : 30 টাকা

[15ই এপ্রিল, 1980 সালের মধ্যে 20 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 25 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন । পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে ।]

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

লেখক—দ্বিজেশচন্দ্র রায়

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । এই পুস্তকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পূর্ণ-জীবনী এবং মৌলিক গবেষণাগুলির বিবরণ আছে ।

মূল্য : 25 টাকা

[15ই এপ্রিল, 1980 সালের মধ্যে 15 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 20 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন । পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে ।]

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

প্রকাশক :

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—700006,

ফোন 55-0660

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা । সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না ।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয় । বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা । আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা । যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন । প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে । এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে । টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য । টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না । ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় ।

5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন ।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না ।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 3 মার্চ, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

বৈজ্ঞানিক মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। হাতের কাছে অতি সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলির উপর তৈরী মডেল আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত সব মডেল ফেরৎ দেওয়া হবে। যোগদানের শেষ তারিখ 30 মে, 1980। কোন প্রবেশ মূল্য নাই।

প্রথম পুরস্কার 100.00 টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার 75.00 টাকা
তৃতীয় পুরস্কার 50.00 টাকা

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ | মার্চ, 1980 | তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে

সুব্রত পাল

আন্দোলন কথাটার সাথে পরিচিত নন বর্তমানে এমন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। গণ আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন—এসব কথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। এর সাথে নবতম সংযোজন—বিজ্ঞান আন্দোলন।

আন্দোলন শব্দটা শুনলে একসময় অনেকে আঁতকে উঠতেন, অনেকে বিরক্ত বোধ করতেন। এর কারণ বোধ করি যত না শব্দটার প্রকৃত অর্থ তার চেয়ে বেশী একটা ভ্রান্ত ধারণা। যাই হোক আজকাল অবশ্য আমাদের সেই অনীহা অনেকটা কেটে গেছে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দটার ব্যবহার একটা হাল ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'মুভমেণ্ট' সেই আন্দোলন শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোড়ন। দ্বিতীয় শব্দটা প্রয়োগে অবশ্য অর্থের অস্পষ্টতা আরো বেড়ে যায়। আসলে আন্দোলন শব্দটার প্রচলন ও পরিচিতি এতই ব্যাপক যে এর আভিধানিক অর্থ সন্ধান অথবা ব্যুৎপত্তি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

ফিরে আসা যাক মূল জায়গায় বিজ্ঞান আন্দোলন ব্যাপারটা কি? নাট্য আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলনের তুলনায় বিজ্ঞান আন্দোলন কথাটার ব্যাপ্তি অবশ্য যথেষ্ট সীমিত। আর সীমিত বলেই বোধ হয় এ সম্বন্ধে নানারকম ধারণা জনমানসে চালু আছে। তার মানে আদৌ এই নয় যে নাট্য আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলন সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পুরোপুরি স্বচ্ছ।

কেউ কেউ বিজ্ঞান আন্দোলন বলতে বোঝেন নিছক বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'পপুলারাইজেশন অফ সায়েন্স'। কারো কারো মতে বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত

ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার প্রসার ঘটানো। আবার একদল পছন্দ করেন প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে—স্থানীয় প্রাকৃতিক ও জনসম্পদকে কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে যুক্ত করা যায় সেটাই তাদের চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু। এ সকল কাজকর্মের সাথে অনেকে যুক্ত আন্তরিকতার সাথে, কেউ কেউ আবার নিছক ফ্যাশানে। এরই মধ্যে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ছোট বড় সংস্থা বা গ্রুপ যাদের কর্মসূচী রচিত হয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলনের এক বা একাধিক দিকের ওপর ভিত্তি করে। এ সংস্থাগুলোর সদস্যদের অনেকেরই কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যথেষ্ট সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা—যদিও অধিকাংশই গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে কিছু আবেগ পরিচালিত কর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

সচেতন হোক বা স্বতঃস্ফূর্ত হোক, কার্যপদ্ধতির যতই ভিন্নতা হোক একটা জিনিস বোধ হয় এরা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন বা অন্ততঃ পেরেছেন বলে দাবী করেন যে বিজ্ঞান পরিচালিত হওয়া উচিত প্রকৃতভাবে 'জনসাধারণের জন্য; জনসাধারণের দ্বারা ও জনসাধারণের প্রতি'। এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই তো জন্ম হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে পৌঁছে আমরা আবিষ্কার করছি যে বিজ্ঞান পরিচালিত হচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির জন্য, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং প্রায়শঃই জনসাধারণের বিপক্ষে। মনে পড়ে যায় বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে গ্যালিলিওর সতর্কবাণী—'যদি ক্ষমতায় আসীন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ভয়ে বিজ্ঞানীরা নিছক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান সঞ্চয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে বিজ্ঞান পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এবং তোমাদের নতুন যন্ত্র আর কিছুই নয় শোষণের নতুন হাতিয়ারে পরিণত হবে। সময়ের সাথে সাথে যা আবিষ্কার করার কথা তা অবশ্য তোমরা আবিষ্কার করবে কিন্তু তোমাদের প্রগতি মানব জাতি থেকে দূরে সরে যাবে। তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একদিন এত বেশী ব্যবধান হয়ে যাবে যে কোন নতুন কীর্তির ওপর তোমাদের উল্লাস এক সার্বজনীন আতঙ্কের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হবে'।

এই সার্বজনীন আর্তনাদে সাড়া দিয়েছিলেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বেশ কিছু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। দলে দলে তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন তাদের 'গজদন্ত মিনার' ছেড়ে, গড়ে তুলেছিলেন এক আন্দোলন যা Social Relations of Science movement বা 'বিজ্ঞানের সামাজিক সম্পর্ক আন্দোলন' নামে বিখ্যাত। এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন জে, ডি, বার্নাল, পি, এম, এস, ব্ল্যাকেট, জে, বি, এস, হ্যালডেন, জুলিয়ান হাক্সলে, প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী।

দেরীতে হলেও আনন্দের কথা যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের একাংশের মধ্যেও উপলব্ধি ও আত্মউপলব্ধির এক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। জনজীবন থেকে দূরে নিভৃত বিজ্ঞান মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে বসে বিজ্ঞান আরাধনা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। গোটা সমাজটার সাথে সাথে গবেষণা মন্দিরও উঠছে কেঁপে কেঁপে—পূজারীর ধ্যান ভঙ্গ হচ্ছে বারবার। সে বেরিয়ে এসে দেখছে যে মহাকালের রথের দড়ি যাদের টানবার কথা তার কেউই আর তার কাছাকাছি নেই। থাকবেই বা কেন? কি দিয়েছে তাদের বিজ্ঞান? মিটিয়েছে কি তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা? তাই বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আশংকাজনকভাবে সীমিত। বরং যুগ যুগ ধরে বয়ে আনা কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-বিরোধী অবক্ষয়ী আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণা জাতির প্রগতির পথে পদে-পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কথায় আছে একেবারে না হওয়ার চাইতে দেরীতে হওয়াও ভাল। তাই এগিয়ে এসেছেন বেশ কিছু সুখ্যাত, অখ্যাত এবং খ্যাতিবঞ্চিত বিজ্ঞানী। তাঁদের পাশাপাশি

এসে দাঁড়িয়েছেন বহু স্বেচ্ছাকর্মী। মানুষ ও বিজ্ঞান— এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য শুরু হয়েছে এক কর্মযজ্ঞ যার নাম বিজ্ঞান আন্দোলন। যদিও এখন তার শৈশবাবস্থা তবে প্রতিশ্রুতি বিরাট।

বিজ্ঞান আন্দোলন সম্বন্ধে এখনও কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি। অবশ্য নিছক একটা ছকবাঁধা সংজ্ঞার কতটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। বরং এর বিভিন্ন দিক ও সম্ভাবনার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত বোধ হয় অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে মূলতঃ তিনটে দিকে ভাগ করা যায়—বিজ্ঞানের 'জনপ্রিয়করণ', জাতীয় বিজ্ঞান নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও প্রসার।

প্রথমে ধরা যাক বিজ্ঞানের 'জনপ্রিয়করণ'। কথাটা এখানে অবশ্য ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বগুলোকে সহজ ভাষায় প্রচার করার মধ্যেই এর অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যায় না। মূল কথা হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মকাণ্ডে দেশের ব্যাপক জনসমষ্টিকে জড়িত করা। বিজ্ঞান আন্দোলনের নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিয়ে যেতে হবে আপামর জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের আলোক-বর্তিকা, দূর করতে হবে তাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার। বিজ্ঞানকে যুক্ত করতে হবে তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে। কেবল বিজ্ঞানের তথ্য বিতরণ নয়, বিজ্ঞানকে করে তুলতে হবে তাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ—জীবনধারণের পদ্ধতি। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ব্যাপক জনসাধারণের সচেতন ও সক্রিয় সহযোগিতা এবং উদ্যোগ ছাড়া বিজ্ঞানের পক্ষে এক পা'ও এগোনো সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের সন্দেহের পরিবর্তে আগ্রহ সঞ্চার করা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত বিজ্ঞানকর্মীদের এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণাকে করে তুলতে হবে জনমুখী। স্থানীয় চাহিদার সাথে সংহতি রেখে, স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এবং গ্রাম শহরের অসংখ্য চাষী-মজুর কারিগরদের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এবং তাদের সমৃদ্ধ করে বিকশিত হতে পারে গবেষণাগারের বিজ্ঞান। এর অর্থ আদৌ প্রতিষ্ঠানগত গবেষণার মান নামিয়ে আনা নয় বরং তার ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত করা। ভিত্তি মজবুত না হলে ইমারতের উচ্চতাও কি বাড়ানো সম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান নীতির প্রশ্ন। বিজ্ঞানী বা স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক বা প্রচেষ্টা যতই আন্তরিক হোক না কেন বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করা যাবে না যদি না জাতীয় স্তরে বিজ্ঞান নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশে এখনও একটা সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত বিজ্ঞান নীতির প্রণয়ন হয় নি। ক্ষেত্রভিত্তিক যে সকল আংশিক নীতি ও কর্মসূচীগুলো গৃহীত হয় সেগুলোও নির্ধারিত হয় উচ্চতম স্তরের মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্তাব্যক্তির দ্বারা। বিজ্ঞানের জাতীয় ও আঞ্চলিক নীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি ব্যাপক বিজ্ঞানী সমাজেরও কোন ভূমিকা থাকে না।

বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরেও একই অবস্থা। সেখানে কি প্রশাসনিক, কি অ্যাকাডেমিক—সমস্ত ব্যাপারেই অধিকাংশ বিজ্ঞান কর্মীদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। জনাকয়েক ব্যক্তিই এসকল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর (সর্বোচ্চ স্তরের কর্মী বা বিজ্ঞানী পর্যন্ত) মধ্যে কার্যতঃ এক 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বিরাজমান। স্বভাবতঃই 'ভৃত্যের' পক্ষে গবেষণার নীতি নির্ধারণে নাক গলানো প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কর্তাব্যক্তিদের রোষানলে পড়লে চাকরীটাও

যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার আইনের আশ্রয় নেবারও অধিকার নেই।

পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন যে বিজ্ঞান আন্দোলনের এ-তিনটে দিকই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যাপক বিজ্ঞানকর্মীদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার যদি সুরক্ষিত না হয় তবে তাঁরা কোন্ সাহসে এক জনস্বার্থবাদী বিজ্ঞাননীতির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলবেন বা বিজ্ঞান গবেষণাকে জনমুখী রূপ দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন? আবার বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার বা জনমুখী বিজ্ঞান নীতির আন্দোলন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সাফল্য লাভ করতে পারে না। এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে যদি তাদের জীবনে বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা যায়।

অন্যদিকে বিজ্ঞান আন্দোলনকে এক অখণ্ড সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে না দেখাটা হবে এক মারাত্মক ত্রুটি। সামাজিক আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সাথে যুক্ত না করতে পারলে বিজ্ঞান আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা অনিবার্যভাবেই যাবে কমে—এ-শিক্ষাতো আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকেই পেয়েছি। আবার বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার সার্বিক সামাজিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করবে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রদূত কেরলার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের একটি স্লোগান—'সামাজিক বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞান'। আমরা আপাততঃ বিপ্লবের পরিবর্তে আন্দোলন শব্দটা ব্যবহার করে বলতে পারি—'সামাজিক আন্দোলনের জন্য বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের জন্য সামাজিক আন্দোলন।'

বিশেষ নিবন্ধ

মেঘনাদ সাহা ও সোভিয়েত বিজ্ঞান*

আলেকজান্দর খারকভ্স্কি

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত 'জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নভশ্চারণবিদ্যা' আকর গ্রন্থে মেঘনাদ সাহা (1893-1956) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ভারতীয় জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী যিনি উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাস আয়নীভবনের এক নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং এই তত্ত্বটিকে নক্ষত্রের আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োগ করেন। সাহা তত্ত্ব···হয়ে উঠেছে জ্যোতি-র্পদার্থবিদ্যার আধুনিক পদ্ধতির প্রধান নির্ভর।"

মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন, প্রায়ই আসতেন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং সোভিয়েত সহযোগীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ পত্র-বিনিময় করতেন। সম্প্রতি তাঁর অনুগামী সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এদুয়ার্দ কোনোনোভিচের রচনায় তাঁর রচনার প্রতিফলন ঘটেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির ক্রিমিয়ার মানমন্দিরে তাঁর সৌর পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে আকাদেমিসিয়ান আন্দ্রেই সেভেরনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কারের কথা বলেন: আমাদের এই নক্ষত্রের (অর্থাৎ, সূর্যের) উপরিতল সামান্য স্ফীত হয়, তারপরে অবনমিত হয়, এবং প্রতি 160 মিনিটে এমনি স্পন্দিত হয়ে চলে। নিরীক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, স্পন্দনমানতা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর বৈশিষ্ট্য, যে-সব বস্তুর গভীর দেশে চাপ অতি-প্রচণ্ড নয় যেমনটি আগে আশা করা গিয়েছিল।

এই আবিষ্কারের অর্থ দাঁড়ায় এই যে হাইড্রোজেন বোমার শিখার মতো কোনো তাপ-নিউক্লিয়ার শিখা সূর্যের গভীর অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে নেই। বিজ্ঞানীরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই অর্থ যদি ধরতে হয় তাহলে একথা ঠিক যে বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়ে। এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ আকাদেমিসিয়ান ভিক্তর আম্বার্তসুমিয়ান বলেন, "এখন তাহলে বলতে পারি, সূর্য কেন আলো দেয় তা আমরা জানি না।"

এই আবিষ্কারের ফলে যে প্রচণ্ড আঘাত তৈরি হল তা কয়েক বছরেও কাটানো গেল না। ব্যাপারটা বোঝা যায়। কেননা, সূর্য কেন কিরণ দেয় তাই যদি অজানা থাকে তাহলে তো বিশ্বের গড়ন সম্পর্কে কোন ধারণাই করা চলে না। সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় নিয়ন্ত্রিত তাপ-নিউক্লিয়ার ক্রিয়ার রহস্য। আর এই রহস্য জানা হয়ে গেলে সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণু একীভূত করে শক্তি লাভ করার ব্যাপারে সহায়তা হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মেঘনাদ সাহার ছাত্ররা এই সমস্যা নিয়ে কাজে লাগলেন। নক্ষত্রের আবহমণ্ডল সম্পর্কিত মেঘনাদ সাহার তত্ত্ব প্রয়োগ করে মস্কোর জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী এদুয়ার্দ কোনোনোভিচ প্রমাণ করেছেন, স্ফীত হচ্ছে সূর্য নয়, তার আবহমণ্ডল। তার মানে, সূর্যের গভীরে তাপ-নিউক্লিয়ার ক্রিয়া অবশ্যই ঘটতে পারে। দহনের

*কলকাতার রুশ দূতাবাসের তথ্যবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'Science & Engineering'-এর খণ্ড 14, সংখ্যা 91 (10 ডিসেম্বর, 1979) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সমস্যা নিয়ে নতুন এই বিচার বহু বিজ্ঞানীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে।

রুশদেশের বিজয়মণ্ডিত মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সে-দেশের মানুষ স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে সকল শোষকের হাত থেকে এবং কুসংস্কারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল— এই দেশ সম্পর্কে তরুণ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আগ্রহী হয়েছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী এ ইওফ-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং পরে এ ইওফ্-এর কাছে তিনি চিঠি লিখতেন। পরবর্তী কালে এ ইওফ্ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সহ-সভাপতি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির বিদেশী সদস্য।

ইওফ্ তাঁর 'আমার দেখা পদার্থবিজ্ঞানীরা' বইয়ে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে সাহার প্রথম দেখা হয় বার্লিনে (1922 সালে)। তিনি তখন অতি তরুণ ও প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানী। সেটা এমন এক সময় যখন ভারতের ওপরে পূর্ণ আধিপত্য ছিল ব্রিটিশদের। সাহা ছিলেন একাগ্র দেশভক্ত। সাহা আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়তেন সেই সময়েই তিনি ও তাঁর দশ বারোজন সহপাঠী অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে স্বদেশের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য করবেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তাঁরা লেখাপড়া করবেন এবং উচ্চশিক্ষার এমন এক মান অর্জন করবেন যে পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ও বিজ্ঞানে ব্রিটিশদের স্থান তাঁরা নিতে পারবেন। সেই বয়সে নির্ধারিত এই লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। এই লক্ষ্য অর্জনে মেঘনাদ সাহা সবচেয়ে চমৎকারভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন নক্ষত্রের বিকিরণ নিয়ে অনুসন্ধানে এবং নক্ষত্রের তাপগতিবিদ্যা নিয়ে বিশদীকরণের কৃতিত্বে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির 200তম জুবিলী উৎসবে যোগ দেবার জন্য 1925 সালে মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলেন। ভারত থেকে আরও যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক মোদি ও ভাবী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সি. ভি. রামন। তরুণ বিজ্ঞানী অবাক হয়ে দেখেছিলেন, যে-দেশ তখনো দু-দুটি যুদ্ধের আঘাত (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ) কাটিয়ে উঠতে পারে নি সেই দেশে বিজ্ঞানের প্রতি কী প্রচুর আগ্রহ। লেনিনগ্রাদের কাছে পুলকোভো মানমন্দির তিনি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে অধ্যাপক এ. মিখাইলভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

লেনিনগ্রাদে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আরও একজন বিজ্ঞানীর আলাপ হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন মহান রুশ বিজ্ঞানী পি. লেবেদেভের ছাত্র, যিনি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বস্তুর ওপরে আলো চাপ সৃষ্টি করে। রুশ পদার্থবিজ্ঞানীর এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে 1918 সালে মেঘনাদ সাহা আলোর চাপ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ দিয়েছেন যে যুক্তিসঙ্গতভাবেই তিনি লেবেদেভের অনুগামী হিসেবে গণ্য হতে পারেন।

কিন্তু মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নতুন সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানের স্থপতি এবং লেনিনগ্রাদের পদার্থবিদ্যা-কারিগরী ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা "পিতা ইওফ্"-এর সঙ্গে। ভারতীয় বিজ্ঞানী এই ঘটনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একই গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে তত্ত্বমূলক সমস্যা নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং লব্ধ ফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ ইওফ্ ছিলেন তৎকালের একজন সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেই সোভিয়েত পরমাণু-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ। এ ইওফ্ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মেঘনাদ সাহা দীর্ঘকাল ধরে

যুক্ত ছিলেন এবং তার ফলেই উপলব্ধি করেন যে নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব কতখানি এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। 1951 সালে কলকাতায় ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ স্থাপন করার সময়ে মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, ভারতের মাটিতে তিনি সোভিয়েত সহযোগীদের ধ্যানধারণা স্থাপন করছেন।

1945 সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুকাল পরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির 220তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য একটি ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা হয়ে মেঘনাদ সাহা মস্কোতে এসেছিলেন। মধ্যবর্তী সময়কালে বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

মেঘনাদ সাহা হয়ে উঠলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, লাভ করলেন ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ, গ্রহণ করলেন কলকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, 1951 সালে নির্বাচিত হলেন ভারতীয় সংসদে।

মস্কোতে পুনরায় তাঁর সঙ্গে এ ইওফ্-এর দেখা হল। তিনি তাঁকে বললেন পরমাণু-শক্তি বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও অনুরাগের কথা। তখনো তাঁদের স্মৃতিতে অম্লান হয়েছিল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপরে মার্কিন বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। অধ্যাপক আই. কুরচাতভ এই সময়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন পরমাণুকে পূষণ করতে হবে শান্তির স্বার্থে এবং তিনি শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বৈদ্যুতিক পাওয়ার ষ্টেশনের স্বপ্ন দেখেন। মেঘনাদ সাহা বললেন, স্বাধীন ভারতের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির মূল্য হবে বিরাট এবং এই শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলবে।

কয়েক বছর পরে কলকাতায় ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ স্থাপিত হল। মেঘনাদ সাহা হলেন তার অবৈতনিক অধ্যক্ষ। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটের নামের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার নাম যুক্ত আর মস্কোতে রয়েছে আই ডি কুরচাতভ প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর নামাংকিত ইনষ্টিটিউট অব অ্যাটমিক এনার্জি। বর্তমানে ভারতীয় ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁদের জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে চলেছেন

দধীচির হাড়

অরুণকুমার ঘোষ*

[বজ্রপাত 'দেবতার রোষ' নয়, বিরাট আকারের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ মাত্র। মেঘে বিদ্যুতের উদ্ভব কীভাবে হয়, বজ্রপাতের বিভিন্ন পর্যায় কী, বজ্রপাতের হাত থেকে আত্মরক্ষার সাধারণ সতর্কতাগুলি কী ও বজ্রপাতেরও কেন প্রয়োজন আছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

পৌরাণিক গল্পে আছে, বৃত্রাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবকুল দধীচি মুনির কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যদি দেহটা দান করেন, তবে তাঁর তপস্যাক্লিষ্ট দেহের হাড় থেকে বজ্র নামে এক মারণাস্ত্র তৈরি করে বৃত্রের বিনাশ করা যায়। দধীচি মানব তথা দেবকুলের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন। তাঁর হাড় থেকে বিশ্বকর্মা বজ্র নামক অস্ত্র তৈরি করলেন এবং তারপর যা হবার তা হল।

গ্রীসদেশের পুরাণেও এইরকম একটা গল্প আছে। হেফায়েস্টাস নামে তাদের এক ক্ষমতাশালী দেবতা নিজের কামারশালায় বজ্রাস্ত্র তৈরি করেন। পরে দেবরাজ জিউস এই অস্ত্রে তাঁর শত্রুদের বিনাশ করেন।

শুধু ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণে নয়, রোমান, মিশরীয় জাপানী, চীনা, তিব্বতীয় প্রভৃতি নানা পুরাণে এই ধরণের গল্প আছে। বজ্রপাত ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে অনেক দেশেই 'দেবতার রোষ' বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। অবশ্য বজ্রপাতের সময় যেরকম চোখধাঁধানো আলো ও কানফাটানো শব্দের উৎপত্তি হয়, তাতে প্রাচীন মানুষের এরকম একটা ধারণা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর প্রাচীন মানুষের কথাই বা বলি কেন, এখনও শিক্ষার আলোক যেখানে পড়ে নি সেইসব মানুষের জগতে এই ধরণের বিশ্বাসের সাক্ষাৎ মেলে। অথচ, প্রায় দু-হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ 'দেবতার রোষ' নামক ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। লুক্রেটিয়াস কাব্য করে যে-সব মজার মজার কথা বলেছিলেন, তাতে এই মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, দেবতারা যদি শত্রুই বধ করতে চাইবেন, তবে অধিকাংশ সময়েই এই মারণাস্ত্র জনমানবশূন্য মরুভূমিতে, সাগরের জলে বা উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় ছুঁড়ে মারবেন কেন? আকাশে মেঘ করলেই কি দেবতাদের বজ্র রোষের প্রকোপ হয়? আর তাঁরা কি এতই বোকা যে রাগের মাথায় নিজেদের মন্দিরে বজ্র ছুঁড়ে মারবেন?

মানুষ যেদিন থেকে বিদ্যুতের ব্যবহার জেনেছে

* নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, ই. মোজেস্ রোড, ওরলি, বম্বে 400 018

প্রায় সেদিন থেকেই জানে বজ্রপতন বিরাট আকারের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অনেকদিন আগে, পলাশীর যুদ্ধেরও পাঁচ বছর আগে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী এক বিপজ্জনক পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন যে পরীক্ষাগারে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, বজ্র সেই জিনিসই। এক প্রচণ্ড বজ্রপাতের দিনে তিনি রেশমি কাপড়ের তৈরী একটা ঘুড়ি ওড়ালেন। ঘুড়িতে বাঁধা একটা তার— তারের প্রান্তে বাঁধা সাধারণ সুতো। এই সুতো যেখানে মাটির কাছে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা লোহার চাবি বাঁধা। চাবির ফুটোর অন্যপ্রান্তে রেশমি ফিতে বাঁধা। উদ্দেশ্য, বিদ্যুৎ তার থেকে জলে-ভেজা সাধারণ সুতো বেয়ে চাবি পর্যন্ত নেমে আসবে এবং চাবিটা লীডেন জারের চাকৃতিতে ঠেকিয়ে ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ জমা করে রাখবেন। তিনি রেশমি ফিতে ধরে থাকবেন। রেশম বিদ্যুতের কুপরিবাহী, সুতরাং তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবেন না। সৌভাগ্যক্রমে, ফ্রাঙ্কলিন চালার নিচে ছিলেন, তাই রেশমি ফিতেটা ভিজে যায় নি এবং তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন নি। পরবর্তীকালে ইয়োরোপে রিচম্যান এই পরীক্ষা করতে গিয়ে পরীক্ষার ফলাফল বলার জন্য আর বেঁচে থাকেন নি।

ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল বজ্রপাত বিরাট আকারের বিদ্যুৎমোক্ষণ। কিন্তু প্রশ্ন, মেঘে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানী-কুল বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন ও ঘামাচ্ছেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। কিন্তু সদুত্তর এখনও মেলে নি।

চিত্র-1: হাওয়ার ঊর্ধ্বগমন ও নিম্নাবতরণ—বজ্রমেঘের সৃষ্টি

একদল বিজ্ঞানী—অবশ্য তাঁরাই দলে ভারি—মনে করেন, মেঘে যে বিদ্যুতের উদ্ভব হয় তার মূল কারণ হল মেঘের মধ্যে শিলাখণ্ড ও শিলাকণার সংঘর্ষ। শিলা বলতে আমরা বরফ বোঝাচ্ছি।

সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনও অংশ অতিরিক্ত গরম হলে সেখানকার গরম হাওয়া ওপরে উঠতে থাকে। গরম হাওয়ার সঙ্গে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠে। অনেক উঁচুতে উঠলে—সেখানে তাপমাত্রা কম বলেও বটে, আবার হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ার জন্যও বটে—গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে।

হাওয়া যত ঠাণ্ডা হয়, তত তার জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার উৎপত্তি হয়। এইসব জলকণা দল বেঁধে মেঘের চেহারা নেয়।

সাধারণ অবস্থায় 0° সে. তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়। কিন্তু কোনও কোনও অবস্থায় – 40° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত জল জলই থাকে। এটাকে বলে জলের "অতি শীতল" (supercooled) অবস্থা।

হাওয়ার সঙ্গে জলকণা অনেক ওপরে উঠতে উঠতে এমন উচ্চতায় পৌঁছয় যেখানে তাপমাত্রা −40° সে. বা তার নিচে। তখন জলকণা শিলাকণায় রূপান্তরিত হতে থাকে (চিত্র-1)। ক্রমে কয়েকটা শিলাকণা জুড়ে এক একটা শিলাখণ্ড হয়। শিলাখণ্ড ওজনে ভারি। তাই সেগুলি নিচের দিকে নামতে থাকে।

চিত্র-2 : মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের তাপবিদ্যুতীয় তত্ত্ব।

এরপর কীভাবে বিদ্যুৎ-উৎপাদন হয়, সে ব্যাপারে দুটি মত আছে। প্রথম মতানুসারে, নিম্নগামী শিলাখণ্ডগুলি অতি-শীতল জলকণা সংস্পর্শে আসে (চিত্র-2)। অতিশীতল জলকণা শিলাখণ্ডের ওপর জমা হয় এবং ক্রমে বরফে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই সময় তারা যে লীনতাপ ত্যাগ করে তার ফলে শিলাখণ্ডের উপরিতলের তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে যায়। এই নিম্নগামী কবোষ্ণ শিলাখণ্ডের সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী শীতল শিলাকণার সংস্পর্শেই সম্ভবতঃ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কোনও কোনও ধাতুর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন তাপমাত্রায় রেখে দিলে ঐ ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটাকে বলে তাপবিদ্যুৎ বা থার্মো-ইলেকট্রিসিটি (thermo = তাপমাত্রা, electricity = বিদ্যুৎ বা তড়িৎ), বস্তুটাকে বলে থার্মোইলেকট্রিক বস্তু। বরফও থার্মোইলেকট্রিক বস্তু। তাই কবোষ্ণ শিলাখণ্ড ও শীতল শিলাকণার সংস্পর্শে তড়িতের উদ্ভব সম্ভব।

চিত্র-3 : খোলা জায়গায় দাঁড়ানো মানুষের চারপাশে বৈদ্যুতিক সমবিভব তলের আকৃতি।

দ্বিতীয় মতানুসারে, তাপবিদ্যুৎ নয়, আবিষ্ট বিদ্যুৎই মূল কারণ। পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রতি মিটার উচ্চতায় গড়ে প্রায় 100 ভোল্ট বিভবভেদ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিভবভেদ হেতু আমরা অহরহ শক্ খাই না কেন? তার কারণ চিত্র-3-এ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বিভবভেদের কারণ কী? এত বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসছে? উত্তর হল, এই বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের উৎপত্তির কারণ, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ঝঞ্ঝা। দিনে সারা পৃথিবীতে

প্রায় 40,000 বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হয়, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 100 বিদ্যুৎ চমকায়। আমাদের দেশে যখন রাত এগারোটা তখন এই বিদ্যুতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়।

চিত্র-4 : মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের আবিষ্ট-বিদ্যুতীয় তত্ত্ব।

এই বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের প্রভাবে শিলাকণায় ধনতড়িৎ ও শিলাখণ্ডে ঋণতড়িতের সঞ্চার কীভাবে হতে পারে চিত্র-4-এ তা দেখানো হয়েছে। সংস্পর্শের আগে শিলাখণ্ড ও শিলাকণায় আবিষ্ট তড়িতের উদ্ভব হয়। সংস্পর্শের সময় শিলাখণ্ডের ধনতড়িৎ ও শিলাকণার ঋণতড়িতে কাটাকুটি হয়ে পড়ে থাকে শিলাখণ্ডে ঋণতড়িৎ ও শিলাকণায় ধনতড়িৎ।

ঋণতড়িৎ-যুক্ত শিলাখণ্ডগুলি আরও নিচে নেমে এলে গলে আবার জলকণায় রূপান্তরিত হয়, আর ধনতড়িৎ-যুক্ত শিলাকণাগুলি ওপর দিকে জমা হতে থাকে। এই ধরণের একটা ব্যাপার প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে চললেই মেঘে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সঞ্চার হওয়া সম্ভব।

দেখা গেছে, এই সময় মেঘের একেবারে নিচের স্তরে কিছু ধনতড়িতের উৎপত্তি হয় (চিত্র-5ক)। এই ধনতড়িতের উৎপত্তি যে ঠিক কীভাবে হয় তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা এখনও মেলে নি। সে যাই হোক, এই ধনতড়িৎ অঞ্চল থেকে ওপরের ঋণতড়িৎ
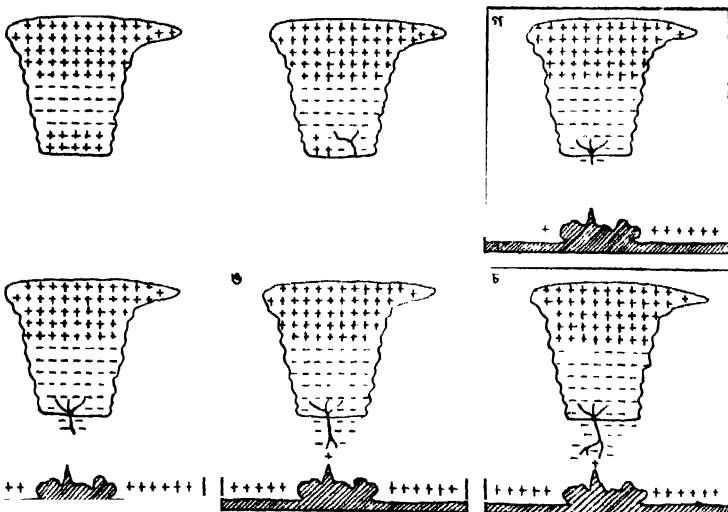
চিত্র 5 : ক—মেঘে তড়িতের সজ্জা, খ—দিশারী মোক্ষণ, গ—চ—চালকের ধাপে ধাপে অবতরণ।

অকলে একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-মোক্ষণ—দিশারী-মোক্ষণ (pilot discharge)—হলেই বজ্রপাত ব্যাপারটা শুরু হয়ে যায় (চিত্র 5খ)। ওপরের ঋণতড়িৎ এই বিদ্যুৎ-মোক্ষণের পথে নিচে নামতে থাকে (চিত্র 5গ) এবং নিচের সমস্ত ধনতড়িৎকে নিস্তেজ করেই ক্ষান্ত হয় না, আহিত বিপরীত তড়িতে আকৃষ্ট হয়ে ধাপে ধাপে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে (চিত্র 5ঘ—চ)। হয়। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে আহিত-বিদ্যুতের উদ্ভব হয়। তড়িৎ-সম্পন্ন বস্তুর সূচালো অংশে তড়িতের ঘনত্ব বেশি। চালকের কাছে গাছপালা, লম্বা উঁচু বাড়ি, কারখানার চিমনি অথবা খোলামাঠে দাঁড়ানো লোক সূচালো বস্তুর মত। এইসব সূচালো বস্ত থেকে আবিষ্ট ধনতড়িতের প্রবাহ ওপরদিকে উঠে চালককে পথ দেখিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে ডেকে আনে (চিত্র 6খ)।

চিত্র-6 : ক—চালকের শেষ পাদ, খ—আবিষ্ট ধনতড়িতের উর্ধ্বপ্রবাহের শুরু। গ—ঙ—বিপরীত প্রবাহ ও শব্দ-সৃষ্টি।

বজ্র একেবারে সোজা নেমে আসে না। পৃথিবীর বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেন পথ খুঁজে খুঁজে নামে। তাই তার রাস্তা আঁকাবাঁকা, কুটিল, সর্পিল।

দিশারী মোক্ষণ বেশ ক্ষীণ। সাধারণত এর ব্যাস প্রায় 5 মিটার। গতি সেকেণ্ডে প্রায় 150 কিলোমিটার। প্রায় 30 মিটার নিচে নেমে এলে হঠাৎ এর উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। এই সময়ে ঋণ-তড়িৎকণার যে নিম্নমুখী প্রবাহ হয় তাকে বলে চালক (leader)। চালক প্রায় 1/100 সেকেণ্ডের মধ্যে ধাপে ধাপে মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছয় (চিত্র-6ক)। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটতম তল ও চালকের মধ্যে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ-প্রভবভেদের সৃষ্টি

ঠিক তারপরই এই বিদ্যুৎ-মোক্ষণের পথ ধরে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎকণার প্রবাহ আলোর প্রায় $\frac{1}{8}$ গতিতে মেঘের দিকে উঠে যায় (চিত্র-6 গ—ঙ)। এর নাম বিপরীত প্রবাহ বা প্রত্যাবৃত্ত-ঘা (return stroke)। এই সময় প্রায় একলক্ষ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়। বিপরীত-প্রবাহ ভীষণ উজ্জ্বল। এটাই আমরা বজ্রপাত হিসাবে দেখে থাকি। মেঘের যে-অংশ থেকে প্রথম ঋণতড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়েছিল, সেই অংশের সমস্ত বিদ্যুৎ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বিপরীত-প্রবাহ চলতে থাকে।

প্রায় $\frac{1}{20}$ সেকেণ্ড পরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। হয়ত এবার ঘটনার শুরু হয় মেঘের

আরও ওপরের স্তর থেকে। আবার প্রথমে ক্ষীণ দিশারী-মোক্ষণ। তারপর চালক, তারপর বিপরীত-প্রবাহ। মেঘের বিভিন্ন স্তর থেকে খুব অল্প সময়ের বিরতিতে এই রকম কয়েকবার বজ্রপাত হতে পারে। বিভিন্ন মোক্ষণ এত কম সময়ের মধ্যে হয় যে খালি-চোখে সেগুলো পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। মেঘ ইত্যাদিতে শব্দ প্রতিফলিত হয় এইসব বিভিন্ন কারণে একটা গড়ানো শব্দের সৃষ্টি হয়।

আগেই বলেছি, প্রতি সেকেণ্ডে সারা পৃথিবীতে প্রায় শ'-খানেক বিদ্যুৎচমক হয়। পৃথিবীর সব জায়গায় তা বলে সমানভাবে বজ্রপাত বা বিদ্যুৎচমক হয় না (চিত্র-7)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুতের

চিত্র-7 : পৃথিবীর কোথায় বছরে কতবার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হয়

দ্রুতগতি ফটোগ্রাফির সাহায্যে এগুলো পৃথক করা যায়। একটা বজ্রপাতে 3 থেকে 30টা বা বেশি বিদ্যুৎ-মোক্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে।

সব সময়েই যে মেঘ থেকে পৃথিবীতে বজ্রপাত হয়, তা নয়। এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বা একই মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও হতে পারে।

বজ্রপাতে আওয়াজ হয় কেন?—এই সময় বায়ুমণ্ডলের যে পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ হয় সে-পথের হাওয়া নিমেষের মধ্যে দারুণ গরম হয়ে সহসা প্রসারিত হয়। তার ফলে যে ধাক্কা বা শক-ওয়েভের (shock-wave) উৎপত্তি হয় তাতেই শব্দের উদ্ভব হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের রাস্তাটা আঁকাবাঁকা। তাই শব্দতরঙ্গের উৎপত্তিও নানা জায়গা ও নানাদিক থেকে হয়। তাছাড়া বাড়িঘর, গাছপালা, পাহাড়,

প্রকোপ একটু বেশি। কারণ সহজেই অনুমেয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল স্বভাবতঃই গরম—আর গরম হাওয়ার ঊর্ধ্বগমনই বজ্রভরা মেঘের জনক। পাহাড়-পর্বত এলাকাতেও অনেক সময় বজ্রপাত বেশি হয়—পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা লেগে হাওয়া ওপরে উঠে যায় কিংবা পাহাড়-পর্বত বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরকে গরম করে দেয়। মাটির রং বা তাপশোষণের ক্ষমতাও হাওয়াকে উত্তপ্ত করার আর একটা কারণ। প্রায় এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সৌরকলঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বজ্রপাতের সংখ্যাবৃদ্ধির যোগাযোগও পরিলক্ষিত হয়েছে (চিত্র-8)।

প্রতিবছর বজ্রপাতে প্রচুর প্রাণহানি হয়। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ বিধিনিষেধ মেনে চললে এই সংখ্যা অনেক কমে যেতে পারে।

ফাঁকা মাঠে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হলে মাটিতে শুয়ে পড়াই ভাল। কাছেপিঠে বনজঙ্গল থাকলে সেখানে আশ্রয় নেওয়া আরও ভাল। কিন্তু, নিঃসঙ্গ একটা দুটি গাছের তলায়

চিত্র-8: মোটা দাগ আপেক্ষিক সৌরকলঙ্ক সংখ্যার সূচক। এই লেখচিত্র ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত।

কখনও দাঁড়ানো উচিত নয়। জলে থাকা একদম সমীচীন নয়। নদী বা খালবিলের কোনও অংশে বজ্রপাত হলে জল সেই বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে আনতে পারে। ফলে স্নানরত ব্যক্তির ওপর বজ্রপাত না হলেও এই বিদ্যুৎ প্রবাহে সংজ্ঞালোপ হয়ে তার সলিল সমাধি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। উঁচু বাড়ি খুব নিরাপদ। এসব বাড়িতে সাধারণত লোহার কাঠামো থাকে। এই কাঠামো বজ্রের বিদ্যুৎকে মাটিতে যাবার সহজ রাস্তা করে দেয়। বাড়ির মাথায় লাগানো বজ্রনিরোধক দণ্ডও আনুষঙ্গিক মোটা তারের রাস্তা বজ্রবিদ্যুৎকে মাটিতে যাবার সহজ পথ বাৎলে দেয়।

বজ্রপাত অবশ্যই ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। কিন্তু তার একটা প্রয়োজনও আছে। বজ্রভরা মেঘ প্রকৃতির সার-কারখানা। বজ্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে নাইট্রেট-সার তৈরি করে। প্রকৃতির কারখানায় তৈরী এই সারের পরিমাণ সারা পৃথিবীর মানুষের তৈরী নাইট্রেট উৎপাদনের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি। নাইট্রেট-সারে গাছপালার বাড়বাড়ন্ত হয়। আর গাছপালার বাড়বাড়ন্ত মানেই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিকুলের মহোৎসব।

তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

আমাদের দেশে কত জিনিসই যে কত ভাবে অপচয় হচ্ছে তার হিসেব নেই। যেমন গুড় একটি। নারকেলের ছোবড়া আরেকটি। আবার ধান, গম ইত্যাদি শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। গুড়কে কেবল অ্যালকোহল তৈরির কাজেই লাগানো হয় কিন্তু এর থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থও যে তৈরি সম্ভব তার বিষয়ে তত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। নারকেলের ছোবড়াও এদিক-সেদিকে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এদেরকে পুড়িয়েই নষ্ট করা হয়। এগুলি আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু এও যে একটি অর্থকরী উপাদান তা সবিশেষ লক্ষ্য করা হচ্ছে না। আমাদের এখানে দেখা যায় এরা শহরকে বা শহরাঞ্চলকে অথবা গ্রামের রাস্তাঘাটকে অপরিষ্কার করে রাখে। ধুপধুনার কাজে অথবা রান্নার কাজেই এদেরকে লাগিয়েই আমাদের সব কাজ শেষ হয়। ঠিক তেমনি ধানের তুষ। এটিও যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান তা সকলে লক্ষ্যও করতে পারছেন না। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় তুষকেও বেশী সময় জ্বালানি হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। আজকাল এই তিনটি কৃষিজাত অবশিষ্টাংশ নানা রাসায়নিক পদার্থের উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের সদ্ব্যবহার করলে দেশও অনায়াসে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

গুড় থেকে অক্সালিক অ্যাসিড

গুড় সুগার ইণ্ডাষ্ট্রীর একটি উপজাত পদার্থ। গুড় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উপাদান। ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স যেমন একটি, অক্সালিক অ্যাসিডও আরেকটি। সাধারণতঃ চিনিকে জারিত করেই (নাইট্রিক অ্যাসিডের সাহায্যে) অক্সালিক অ্যাসিড বাণিজ্যিক আকারে তৈরি করা হয়। এখন দেখা যায় গুড় ইত্যাদি উপজাত পদার্থগুলিও অক্সালিক অ্যাসিডের একটি মূল্যবান উপাদান। এখন চিনির বদলে গুড়কে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাও চলছে। গুড়ের মধ্যে চিনি বা অন্যান্য শর্করা যা আছে এদেরকেই অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টের উপস্থিতিতে জারিত করে নেওয়া হয়। চিনিকে সরাসরি জারিত করলে যত পরিমাণ অক্সালিক অ্যাসিড হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে গুড়ের মধ্যেও চিনিজাতীয় শর্করাও সেই অনুপাতেই অক্সালিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং গুড়ের অপচয় অক্সালিক অ্যাসিড করেও বন্ধ করা যেতে পারে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি করে গুড়ের দামও অনেক নামিয়ে আনা সম্ভব।

অক্সালিক অ্যাসিডের ব্যবহার নানা বিষয়েতেই আছে। যেমন একে একটি মরডেণ্ট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অক্সালিক অ্যাসিডের লবণও নানা কাজে লাগে। পটাশিয়াম ফেরাস অক্সালেট একটি ফটোগ্রাফিক ডেভেলপার। পটাশিয়াম কুয়াড্রক্সালেট কাপড়ের, কাগজের কালির দাগ তুলতে সাহায্য করে। অক্সালিক অ্যাসিড নিজেও লোহার উপর মরীচা দূর করতে সাহায্য করে। অটোমোবাইল রেডিয়েটরের লোহার পাইপের মরীচা অক্সালিক অ্যাসিড দিয়ে দ্রবীভূত করা হয়।

সাধারণতঃ বিক্রিয়ারত পাত্রে গুড় নিয়ে তাতে সালফিউরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিডের (উভয় ক্ষেত্রেই ঘন) মিশ্রণ ঢালা হয়। কোনটা কত তা নির্ভর করে গুড়ের উপাদানের উপর। সত্তর ডিগ্রী (70°) তাপাঙ্কে ঘণ্টা চারেকের মত উত্তপ্ত

* পোঃ আগরপাড়া, নর্থ স্টেশন রোড, 24 পরগণা

করে নিলেই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টের সঙ্গে মেটাল ক্যাটালিষ্টের ব্যবহারও চলছে। এই মেটাল ক্যাটালিষ্টের সাহায্যে জারণ ক্রিয়াকেও দ্রুতগামী করে তোলা হয়। ফলে এই পদ্ধতিতে অক্সালিক অ্যাসিডের উৎপাদন সন্তোষজনক হচ্ছে। প্রতিটি কারখানায় এখন অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টকে পুনরায় কাজে লাগাবার জন্যে একটি ইউনিটও আছে। সেই জন্যে নির্গত অ্যাসিডের বাষ্প থেকেও বায়ু দূষিতও হতে পারছে না।

গুড় থেকে অক্সালিক অ্যাসিড বাদেও টারটারিক অ্যাসিডও মিলছে। আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থও সম্ভবতঃ গুড় থেকেই মিলবে। অন্ততঃ বিজ্ঞানীরা তাই মনে করছেন।

নারকেলের ছোবড়া থেকে রাসায়নিক পদার্থ

নারকেলের ছোবড়া থেকে সাম্প্রতিককালে শেল চারকোলের উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এই শেল চারকোল (shell charcool) অ্যাকটিভ কার্বনের প্রধান উপাদান। শেল চারকোল সহজ প্রণালীতেই পাওয়া যায়। নারকেলের ছোবড়াকে নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেনে পুড়িয়েই তা তৈরি করা হয়। এতে ইল্ড (yield) প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগের মত। শেল চারকোলে থাকছে দুই শতাংশ ছাই, পনেরো শতাংশ উদ্বায়ী পদার্থ, দশ শতাংশ জলীয় পদার্থ আর এক শতাংশেরও দশ ভাগের মত ক্লোরাইড। লণ্ড্রীতে, সোনার দোকানে এর ব্যবহার চলছে। আর এই শেল চারকোল থেকে যে অ্যাকটিভ কার্বন মিলছে তার ব্যবহারও প্রচুর। দুর্গন্ধনাশক পদার্থ হিসেবে অ্যাকটিভ চারকোলকে ব্যবহার করা হয়। এটির শোষণ ক্ষমতাও অত্যধিক।

অ্যাকটিভ চারকোলের ব্যবহার আরও অনেক। বিভেরেজ ইণ্ডাষ্ট্রীতে (Beverage industry), ফারমাসিউটিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীতে (Pharmaceutical industry), পেইন্ট (paint), ল্যাকার (lacquer) ইণ্ডাষ্ট্রীতে, এবং স্মাচারেল গ্যাস ইণ্ডাষ্ট্রীতে এর ব্যবহার প্রচুর। গুড়, ভেজিটেবল অয়েল, ফলের রস, গ্লিসারিন ইত্যাদি বিশুদ্ধিকরণে হামেশাই অ্যাকটিভ চারকোলকে ব্যবহার করা হয়। গ্যাসোলিন সংরক্ষণের জন্যেও ন্যাচারেল গ্যাস ইণ্ডাষ্ট্রীতে অ্যাকটিভ চারকোল ব্যবহার হচ্ছে। গ্যাসোলিনকে শোষণ করিয়ে নিয়ে এইভাবে ফিরিয়ে পাওয়া যায়। গ্যাসোলিনের অপচয় যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

নারকোলের ছোবড়া থেকে ফুরফুরাল (furfural) নামক একটি বিশেষ জৈব পদার্থ মিলছে। এটি নাইলন উৎপাদনেরও একটি উপাদান। নারকেলের ছোলাকে অন্তর্ধূম পাতনের সাহায্যে পায়রোলিগনিয়াস অ্যাসিড, টার আর চারকোলে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতিটিই প্রয়োজনীয়। পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড (pyroligneous acid) থেকে অ্যাসিটোন, মিথাইল অ্যালকোহল আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। আর টারকে পাতিত করে ফিনল (phenol) এবং ফিনলজাতীয় যাবতীয় পদার্থ মিলছে। অবশিষ্টাংশ পিচও (pitch) উড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজে লাগছে।

কৃষিজাত দ্রব্য ও বেগেজ থেকে চিনি

আখ থেকে চিনি শোষণ করার পর অবশিষ্টাংশ যা পড়ে থাকে তার বৈজ্ঞানিক নাম বেগেজ (bagasse)। বেগেজ একটি অর্থকরী উপজাত উপাদান। বেগেজ থেকে মিলছে আরও চিনি। আর যেহেতু চিনি থেকে অ্যালকোহল আর অ্যালকোহল থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ, বেগেজও নানা রাসায়নিক পদার্থের উপাদান। অন্য কৃষিজাত অবশিষ্টাংশও; যেমন কর্ণ-কবস (corn cobas), আলফালফা (alfalfa)। আগেও এদেরকে চিনিতে রূপান্তরিত করা হতো। তবে বিক্রিয়াটিকে ভালভাবে ঘটানো সম্ভব হতো না; পরিমাণের দিক দিয়েও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ আশানুরূপ

ভাবে সম্পাদিত হয় নি। চিনি ছাড়া অন্য উপজাত পদার্থই বেশী জুটতো। (যেখানে অ্যাসিড দিয়ে এই বিক্রিয়া চালানো হয়েছিল)।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এতে সহজে বেগেজ এবং অন্যান্য কৃষিজাত পদার্থ চিনিতে রূপান্তরিত হতে পারছে আর পরিমাণও অত্যধিক। বিক্রিয়াটি আর অন্য কিছুই নয়। অ্যাসিডের বদলে এনজাইমের ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এন-জাইম দিয়ে উপজাত পদার্থ বেশী হয় না। চিনিই প্রধান বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ।

সেলিউলোজ (cellulose) দু-রকমের। একটির নাম আলফা সেলিউলোজ, অপরটির নাম বিটা-সেলিউলোজ। যে রেয়ন (rayon) বাজারে মিলে সেটি আলফা-সেলিউলোজ থেকেই (alpha-cellulose)। এই আলফা-সেলিউলোজকেই এন-জাইম দিয়ে ভাঙ্গা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যদি পূর্বে কোন দ্রাবকের সাহায্য নেওয়া হয় তবে গ্লুকোজের পরিমাণ অত্যধিক বাড়ে। তাই এখন এনজাইম দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটাবার পূর্বে সেলিউলোজ জাতীয় পদার্থসমূহকে দ্রাবক দিয়ে মেশানো হয়। এই দ্রাবকটির নাম কেডক্সেন (cadoxen)। এটি পাঁচ শতাংশ (5%) ক্যাডমিয়াম অক্সাইডকে (cadmium oxide) আঠাশ শতাংশ (28%) ইথিলিনডাইঅ্যামিন (ethylene-diamine) জলীয় দ্রবণে গুলে দিয়ে তৈরি করা হয়। এই দ্রাবকের বিশেষত্ব হলো—একে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। প্রথমতঃ দ্রাবক দিয়ে ধুয়ে নিয়ে মিথাইল অ্যালকোহল আর পরে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ক্যাডমিয়াম, ক্যাডমিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর পরে তার থেকে, ক্যাডমিয়াম অক্সাইড (উত্তাপ দিয়ে) মিলছে। আর বাড়তি জলীয় দ্রবণকে (ধৌত করার পর) বাষ্পীভূত করে আঠাশ শতাংশ (28%) ইথিলিনডাইঅ্যামিনও মিলছে। এই নতুন পদ্ধতিতে শুধু যে চিনি মিলছে (এখানে গ্লুকোজ) তাই নয়, গ্লুকোজকেও পরে অ্যালকোহল আর নানা রাসায়নিক পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়। এখন পেট্রোলের বদলে অ্যালকোহলের ব্যবহার নিয়েই চর্চা চলছে।

মন্তব্য

দেশের দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার এখনই বন্ধ করার প্রয়োজন। উপজাত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার থেকে বহু মূল্যবান জিনিস মিলেছে। জ্বালানির অভাব মিটছে, রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদাও মিটছে। অথচ এই উপজাত পদার্থের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় নি বলে বিদেশ থেকে বহু জিনিস আমদানী করে নিতে হচ্ছে। এই বাবদ খরচাটাও মন্দ নয়। বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারও প্রায় নিঃশেষ হতে চলছে। আর দিনে দিনে আমদানী খরচও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে হলে আমাদের উপজাত সকল পদার্থের সদ্ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত টেক্‌নোলজি দরকার। বৈদেশিক সাহায্যেই হউক বা অন্য যে কোনভাবেই হউক সর্বাগ্রে প্রযুক্তি-বিদ্যায় জ্ঞান আহরণ একান্ত প্রয়োজন।

বেগেজ এখন যুক্তরাষ্ট্রে সবরকম কাগজের উৎপাদনের যোগান দিচ্ছে। আমাদের দেশে জ্বালানি হিসেবেই তার অধিকাংশটা খরচা হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজের দাম রুখতে বেগেজকে কাজে লাগাতে পারলে একটা সুরাহা হতো। তাই সেই সব টেকনোলজির প্রয়োগের দরকারও আমাদের দেশে আছে।

কারারুদ্ধ আলোক

চন্দন দাশগুপ্ত*

[সূর্যালোকের শক্তিকে কিভাবে আবদ্ধ করে রেখে কাজে লাগানো যায়, এই প্রবন্ধে তাই আলোচনা করা হয়েছে।]

বর্তমান পৃথিবীর যে সমস্যাটি বিজ্ঞানীদের খুব বেশী ভাবিয়ে তুলেছে, তা হল ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত শক্তি-সম্পদগুলির (কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি) ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি। এমতাবস্থায় বহিঃপৃথিবী থেকে আগত শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বহির্বিশ্ব থেকে যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে আসে, সৌরশক্তিই হল তার সিংহভাগ। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে আগত সৌরশক্তির 1%-এরও কম সবুজ উদ্ভিদ ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং সেই সঞ্চিত শক্তির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আহরণ করেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বেঁচে রয়েছে। আবার একথাও সত্য যে, অন্ততঃ আরও 1% সূর্যরশ্মিকেও যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, তা হলে প্রত্যেক পৃথিবীবাসী জীবনকালে 1 কোটি টাকার মালিক হতে পারে।

সৌরশক্তি সঞ্চয়ের পদ্ধতি বুঝতে হলে আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিউটনের 'কণিকা তত্ত্ব' (Corpuscular Theory) এবং হাইজেনের 'তরঙ্গবাদ' (Wave Theory)—উভয়েরই কয়েকটি ত্রুটি আবিষ্কৃত হবার বেশ কিছু দিন পর 1873 খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন যে, আলোক হল 'তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ' (electromagnetic wave)। পরবর্তীকালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ 'কোয়ান্টাম' তত্ত্বানুসারে আলোক শক্তিকে ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বানুসারে আলো হল কতকগুলি শক্তি কণিকার প্রবাহ—যাদের বলে 'ফোটন'। প্রমাণিত হয়েছে আলোর সাথে আলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তরঙ্গবাদ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যেখানে পদার্থ এবং বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া জড়িত, সেখানে যথার্থ ব্যাখ্যাদানে সক্ষম কোয়ান্টাম তত্ত্ব। অর্থাৎ, আলোকের প্রকৃতি কখনও তির্যক তরঙ্গের মত, আবার কখনও বা কোয়ান্টার মত। অবশ্য 1926 খৃষ্টাব্দে ডি ব্রগলী (De Broglie) দেখিয়েছেন যে, একটি ফোটনকে এক মুহূর্তের জন্যে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ এবং ঠিক পরমুহূর্তেই তাকে দ্রুতগামী ফোটন কণিকা বলে ধরা যেতে পারে।

আমরা জানি, তাপ ও আলোকরশ্মির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, বিকীর্ণ তাপ এবং আলোকরশ্মি—উভয়ের প্রকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এদের মূল পার্থক্য দুটি। আলো চোখে সাড়া জাগায়, তাপ সাড়া দেয় ত্বকে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 8×10^{-5} সে. মি. থেকে 4×10^{-2} সে. মি. হলে সেটি বিকীর্ণ তাপরশ্মি। কিন্তু আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র, 8×10^{-5} সে. মি. থেকে 4×10^{-5} সে মি.।

এখন বিকীর্ণ তাপের পরিবাহিতা (K : একক দৈর্ঘ্য বাহুবিশিষ্ট ঘনকের দুই বিপরীত তল একক উষ্ণতায় পার্থক্যে থাকাকালীন একক সময়ে লম্বভাবে ঐ পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে বাহিত তাপ) পদার্থের

*20/1B, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা—700 054

উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেসব পদার্থ কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত বিকীর্ণ তাপকে নিজের ভিতর দিয়ে যেতে দেয়, তাদেরকে সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলির সাপেক্ষে তাপ-স্বচ্ছ (diathermanous) বলে। আবার যেসব পদার্থ কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত বিকীর্ণ তাপকে নিজের ভিতর দিয়ে যেতে দেয় না, তাদেরকে সেই সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপরোধী (athermanous) বলে।

অধিকাংশ পদার্থই কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপস্বচ্ছ হতে পারে, আবার অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপরোধী হতে পারে। সূর্যালোক ধরবার জন্য বিজ্ঞানীরা নির্বাচন করেছেন কাচকে। কাচের একটি বিশেষ গুণ হল, এর মধ্যে দিয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন রশ্মি সহজেই যেতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি যেতে পারে না। কাচের এই বিশেষ ধর্মটিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটানো হয়ে 'সবুজ বাড়ীতে' (green house)। এই ব্যবস্থায়, কাচনির্মিত ঘরের ভিতরে মাটি, ও গাছপালা রাখা হয়। সূর্যালোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে সহজেই ঘরের ভিতর ঢোকে এবং এতে ভিতরের জিনিসগুলি গরম হয়ে ওঠে। পরে রাত্রিবেলা সূর্যের অনুপস্থিতে পরিবেশের উষ্ণতা যখন কমে আসতে থাকে, তখন কাচের ঘরের ভিতরের জিনিসগুলিও নিজস্ব স্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরে পেতে চায়। ফলে প্রেভস্টের 'তাপ বিনিময়' সূত্রানুসারে (Prevost's theory of heat exchange) তারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন তাপরশ্মির বিকিরণ সুরু করে। সবুজ বাড়ীর কাচের দেয়াল ঐ রশ্মিকে নির্গত হতে বাধা দেয়। ফলে ঘরের ভিতরটা সব সময়েই ঈষদুষ্ণ হয়ে থাকে।

শীতপ্রধান দেশগুলিতে সবুজ বাড়ীর প্রচলন আছে। গাছপালা সংরক্ষণে এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। পারমাণবিক শক্তি আজকাল অনেক দেশই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে—সৌরশক্তি সংগ্রহেরও নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট জটিল যান্ত্রিক প্রস্তুতির দরকার। তাই অতি সাধারণ ব্যবস্থায় সূর্যালোককে কারারুদ্ধ করতে হলে সবুজ বাড়ীর সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান

মৎস্য-চাষে বীজ সমস্যা

প্রেমতোষ ঘোষ*

জলের ফসল মাছ, মনুষ্য সমাজকে দেহপুষ্টির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জান্তব প্রোটিন জোগান দেয়। তার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরের ঘেরা জলাশয়গুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যেই অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা চাষীদের পক্ষে সহজ নিয়ন্ত্রণসাধ্য। সে কারণে সব দেশেই বদ্ধ জলাশয়ে মাছের চাষে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর পড়েছে বহুদিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা দ্রুতবর্ধনশীল বা উচ্চফলনশীল জাতের চাষযোগ্য মাছের বীজের জন্য চাষীদের পরনির্ভরতা। মিষ্টি জলের আবাদী জলকরের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত চাষযোগ্য মাছ রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, প্রভৃতি এদেশী ও বিদেশী পোনা মাছ। মৎস্য জগতে ওরা সবাই 'সাইপ্রিনিডি' বা 'কার্প' পরিবারভুক্ত। পুকুরের জলে ওরা কেউই প্রজনন করে না, প্রজনন করে মিষ্টি জলের নদীতে। মাছচাষীদের ফার্ম বা আবাদী জলাশয় থেকে বহু দূরে নদী থেকে এসব মাছের ডিমপোনা সংগৃহীত হয় এক শ্রেণীর জেলেদের জালে। তারপর তা বিক্রী হয় ডিমপোনার পাইকারী বাজারে। সেখান থেকে তা চালান যায় নার্শারী পালকদের নার্শারী পুকুরে বড় আকারের 'চারা পোনা' (ফ্রাই, ফিংগারলিং) রূপে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। আর চারা পোনাদের বীজ হিসাবে কেনে মাছচাষীরা তাদের জলাশয়ে চাষের জন্য মৎস্যভোজীদের ভোগ্য ফসল হিসাবে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কাজেই নদী থেকে সংগৃহীত মাছের ডিমপোনা শেষ পর্যন্ত আবাদী জলাশয়ে এসে পৌঁছায় 3-4 শ্রেণীর হাত ঘুরে। প্রকৃত মাছচাষী চায় তাদের জলাশয়ে মাছের ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং চাষের খরচ কমিয়ে লাভের পরিমাণ বাড়াতে। এক্ষেত্রে মৎস্যবীজের উৎকর্ষের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কোন কোন পোনা মাছের চারা পোনায় তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধি দ্রুত তালে বাড়ে, আবার কোন কোন পোনা মাছের চারাপোনায় 'গ্রোথ রেট' যথেষ্ট কম, এই সব ব্যাপার চারা পোনা কেনার সময় বোঝা যায় না—চাষ করতে করতে পরে বোঝা যায় কেননা ওসব ব্যাপার 'ফলেন পরিচয়তে'।

অন্য দিকে হয়তে কোন মাছচাষীর জলাশয়ে কাত্‌লা মাছের ফসল সর্বাধিক হারে মেলে, কারো জলাশয়ে সর্বাধিক 'গ্রোথ' রুই মাছে, কারো বা মৃগেল মাছের ক্ষেত্রে। ঐ সব ক্ষেত্রে মাছচাষীরা চাইবে যে 'চারা পোনা' অথবা 'ধানী পোনা' কিনবো তাদের 100 শতাংশই শুধু মাত্র কাত্‌লা, 100 শতাংশই শুধু মাত্র রুই বা 100 শতাংশই মৃগেল। কিন্তু সেভাবে 'পিওর' মৎস্য বীজ (ধানী পোনা, চারা পোনা) পাওয়া শক্ত। কেননা নদীতে সংগৃহীত ডিমপোনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে রুই, কাত্‌লা ও মৃগেল-এর সংমিশ্রণ থাকে। আর সেই সঙ্গে থাকে ভুরসি, বাটা, পুঁটি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতের মাছের ডিমপোনা। মোট কথা উৎকৃষ্ট মৎস্যবীজের ক্ষেত্রে দেশের মাছচাষিগণ অসহায়ভাবে পরমুখাপেক্ষী।

মাছচাষীদের এই পরনির্ভরতা দূর করার জন্য

*68/B/2, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-700 010

মৎস্যবিজ্ঞানী সমাজ বহুদিন ধরেই সচেতন। কেননা এ ব্যাপারে মাছচাষীদের সাহায্য করলে মৎস্যবীজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে দেশের আবাদী জলাশয়ে মাছের ফসল উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বাড়বে। তাতে শেষ পর্যন্ত দেশের মৎস্যভোজীদেরই উপকার হবে। সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মৎস্য বিজ্ঞানিগণ নদীতে প্রজননকারী ঐ সকল চাষযোগ্য উৎকৃষ্ট জাতের মাছ যাতে পুকুরের বদ্ধ জলেই প্রজনন করে সে বিষয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন।

এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম সফল মৎস্য-বিজ্ঞানী আর্জেন্টিনার ডঃ বি. এ হাউসে। 1930 সালে এই সাফল্যলাভ ঘটে। প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছকে পিটুটারী হর্মোন ইনজেকশান দিয়ে পুকুরের জলে তাদের প্রজনন করানোর পদ্ধতিই মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বা প্ররোচিত প্রজনন বা প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি নামে পরিচিত। পরে 1934 সালে ব্রেজিল, 1937 সালে রাশিয়া, 1940 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 1955 সালে লাল চীন, 1957 সালে ভারত, 1958 সালে জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রসমূহে ঐ গবেষণা সফল হয়। ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার মৎস্যবিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরী রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি এদেশী পোনা মাছের প্রণোদিত প্রজননে সফল হন 1957 সালে।

ডঃ চৌধুরী উদ্ভাবিত পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির কলাকৌশলের মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য লুকানো নেই। পুকুরের বদ্ধ জলে পূর্ণ বয়স্ক পোনা মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই পুকুরে পুষে রাখা 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বড় স্ত্রী ও পুরুষ পোনা মাছগুলির জীবনে প্রতি বছর মে, জুন, জুলাই মাসে প্রজননের মরশুম এলেও তারা প্রজননের আকর্ষণ অনুভব করে না বা প্রকৃতির সেই আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক মাছগুলি পুকুরে প্রজনন করে না। ঐ সকল মাছের দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে পিটুটারী হর্মোন প্রয়োগ করা হলে মাছগুলির দেহাভ্যন্তরের অপুষ্ট জননেন্দ্রিয়গুলি প্ররোচিত হওয়ায় তাদের সঠিক পুষ্টিবিধান ঘটতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশলাভ ঘটে। ফলে পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণবয়স্ক পোনা মাছগুলি প্রজননের ক্ষমতা অর্জন করে। পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন বা প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির মূল কথা এটাই।

প্রজনন করানোর জন্য 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বড় মাছগুলির মধ্যে সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট মাছদের বেছে নিতে হয় প্রজনন মরশুম শুরু হওয়ার 2-3 মাস আগে। স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের পৃথক করে পৃথক পৃথক পুকুরে রেখে যত্ন-পরিচর্যা করে লালন-পালন করতে হয়। পর্যাপ্ত খাদ্য জোগান দিতে হবে, নিয়মিত পরিশ্রম করাতে হবে যাতে তাদের দেহে চর্বি জমতে না পারে। এই সময়ের মধ্যে 4-5 সপ্তাহ অন্তর ওদের প্রত্যেকের দেহে প্রাথমিক মাত্রায় হর্মোন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রজননের মরশুমে প্রজনন পুকুরের জলের পি-এইচ-ভ্যালু 6·5 থেকে 7·0-এর মাত্রায় থাকা, জলের উষ্ণতা 25-31 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এর সীমার মধ্যে থাকা ও তিথি-নক্ষত্র ত্রয়োদশী থেকে দ্বিতীয়া পর্যন্ত (কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ)-এর মধ্যে থাকা। এই তিন নির্ধারক (ফ্যাকটর)-এর সামঞ্জস্য ঘটলে প্রজনন পুকুরে পোনা মাছের প্রজননের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে সময় পৃথক পৃথক পুকুরে বিশেষ যত্ন পরিচর্যার মধ্যে পুষে রাখা স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলিকে ধরে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত মাছদের বেছে নিয়ে পুনরায় তাদের দেহে পিটুটারী হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করে সেই ইনজেকশন-দেওয়া স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের একসঙ্গে প্রজনন পুকুরে সঠিক অনুপাতে (স্ত্রী ও পুরুষ মাছের সংখ্যার অনুপাত) ছেড়ে দিতে হবে। সব কিছু ঠিক হলে উপযুক্ত সময়ে প্রজননের উদ্দেশ্যে প্ররোচিত মাছগুলি সেই প্রজনন পুকুরেই প্রজনন করে।

হর্মোন প্রয়োগের মাত্রা হল যে মাছের উপরে তা প্রয়োগ হবে তার দৈহিক ওজন যত কিলোগ্রাম, তত গ্রাম ওজনের (মাছটির দৈহিক ওজনের 1 হাজার ভাগের 1 ভাগ মাত্র) পিটুটারী গ্ল্যাণ্ড-এর নির্যাস। আর প্রজননের উদ্দেশ্যে প্রজনন পুকুরে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ একসঙ্গে ছাড়ার উপযুক্ত আনুপাতিক হার হবে স্ত্রী মাছগুলির মোট ওজন যত হবে, পুরুষ মাছগুলির মোট ওজনও তার সমান রাখতে হবে। এতে যদি 5টি স্ত্রী মাছের মোট ওজন 10 কিলোগ্রাম হয় তবে পুরুষ মাছগুলির মোট ওজন 10 কিলোগ্রাম করতে 7টি পুরুষ মাছের সংখ্যা দাঁড়ায় সে ক্ষেত্রে ঐ সেট-এর আনুপাতিক হার হবে স্ত্রী : পুরুষ=5 : 7।

প্রজনন পুকুরে মাছের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে পুকুরের জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন ও 'টারাবিডিটি'র মাত্রারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। যে বছরে পোনা মাছের প্রজনন মরশুমে ভাল বৃষ্টিপাত হয় সে বছরে মাছের প্রণোদিত প্রজনন বেশী সফল হয়। যে বছরে ঐ সময়ে খরা চলে সে বছর একাজে ব্যর্থতা জোটে বেশী। আর প্রজননের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত মাছদের প্রজনন পুকুরে ছাড়ার সময়ে তাদের দেহে সর্বশেষ বার ইনজেকশন করা হর্মোনের মাত্রা নির্ধারণ নির্ভর করে সেই মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির বিকাশ-এর সঠিক অবস্থার ওপর। একেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই দক্ষতা এনে দেয়।

মোট কথা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির সাহায্যে সকল মাছচাষীই যদি তাদের আবাদী জলাশয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট চারা পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জলাশয়ের উৎকৃষ্ট বড় মাছদের হর্মোন ইনজেকসান প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ফার্মে প্রজনন করিয়ে উৎকৃষ্ট জাতের ডিমপোনা উৎপাদন করিয়ে নেয় তবে রাজ্যে মৎস্যবীজের কণামাত্র ঘাটতি থাকে না। তাছাড়া মৎস্যবীজের উৎকর্ষের অবনতি ঘটতে পারে না। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশ এই ভাবেই তাদের সমস্যা মিটিয়েছে।

1957 সালে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানী বদ্ধ জলাশয়ে পোনা মাছের প্রজনন করানোর উপায় আবিষ্কার করলে 60-এর দশকে সরকার প্রচার করতে থাকেন অদূর ভবিষ্যতে সারা দেশ জুড়ে মৎস্যবীজের প্লাবন আসন্ন। রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকী, ভাঙন, পারশে, ইলিশ, বাগদা, গলদা, কৈ, শিঙি, মাগুর প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট জাতের কোটি কোটি সংখ্যক মাছকে তাদের প্রজননের মরশুমে মাছেরই পিটুটারী গ্রন্থির নির্যাস ইনজেকশন দিয়ে প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রজনন করানো হবে। তার ফলে প্রতি বছর ঐ সকল মাছের এত সীমাহীন সংখ্যক ডিম পোনা উৎপাদিত হবে যাতে সারা রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনকে (2·19 কোটি একর) 10 ফুট পুরু আস্তরণে (মাছের ডিম পোনার আস্তরণ) ঢেকে ফেলা যায়। মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির যুগান্তকারী আবিষ্কারের 22 বছর পরেও সেই 'অ্যাকোয়াপ্রোশান' দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যবীজের ঘাটতি বেড়েই চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পোনা মাছের ডিমপোনা সংগ্রহের পরিমাণ 1958 সালে ছিল বার্ষিক 18 হাজার 'কুনকা' (450 কোটি সংখ্যক ডিমপোনা)। আর 1978 সালে তা হয়েছে বার্ষিক 12 হাজার 'কুনকা' (300 কোটি সংখ্যক ডিমপোনা)। অথচ উপরিউক্ত 24 বছরের ব্যবধানের মধ্যে (1958-1978) 21 বছর আগে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানে সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ হয়েছে যা 'অ্যাকোয়াপ্রোশান'-এর স্বপ্ন দেখিয়েছে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানীদের, আর সেই আবিষ্কারের পরবর্তী 20 বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মৎস্য-বিজ্ঞানিগণ শুধু পশ্চিমবঙ্গের অন্তত 500 জন মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য দপ্তর ও বেসরকারী মহলের কর্মীদের ঐ বিশেষ পদ্ধতির কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ঐ অদ্ভুতকর্মা হাতিয়ারটির সাহায্যে সারা দেশ জুড়ে 'অ্যাকোয়াপ্রোশান' বা 'জলের প্রাণী

কুলের সংখ্যা বিস্ফোরণ' বা সংক্ষেপে 'মৎস্যবীজ প্লাবন'কে কার্যকরী করার উপযোগী সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন-এর অভাবে পশ্চিমবঙ্গে সেই স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। মৎস্যবীজের প্লাবন-এর বদলে মৎস্যবীজের উৎপাদন 24 বছর আগেকার তুলনায় 33 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের মৎস্যবীজ-এর সংকট আরও বেড়েছে।

তবে ঐ আবিষ্কারের সুফল পোনা মাছ প্রজননের কয়েকটি ছোট উৎস মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় 'বাঁধ' নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের ছোট ছোট জলাধার-এর ডিমপোনা উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ভাল ভাবেই ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। ডিমপোনা উৎপাদনের ঐ মরা গাঙে এখন বান ডেকেছে। আর সংশ্লিষ্ট ডিমপোনা ও ব্যবসায়ীদের উপার্জন বেড়েছে 26·6 গুণ, ঐ উৎস-গুলিতে ডিম পোনার উৎপাদন 4 গুণ হয়েছে।

ঐ বাঁধগুলিতে পোনা মাছের ডিমপোনার উৎপাদন ছিল 1954 সালে বার্ষিক 500 কুনকা (12·5 কোটি সংখ্যক) যা রাজ্যের মোট জোগানের (18 হাজার কুনকা) নাম মাত্র (2·7 শতাংশ),। উৎপাদিত ডিমপোনার মোট দাম 1·50 লক্ষ টাকা (কুনকা প্রতি দর গড়ে 300 টাকা)। বর্তমানে (1978) সেখানে উৎপাদিত হয় বার্ষিক 2 হাজার কুনকা (50 কোটি সংখ্যক) ডিমপোনা যা রাজ্যের এখনকার মোট জোগানের (12 হাজার কুনকা) 16·6 শতাংশের সমান। আর ঐ 2 হাজার কুনকা ডিমপোনা বিক্রী করে ডিমপোনা ব্যবসায়ী ও ডিমপোনা উৎপাদকগণের উপার্জন বার্ষিক 40 লক্ষ টাকা। (কুনকা প্রতি দর গড়ে 2000 টাকা)।

'বাঁধ'গুলির এই শ্রীবৃদ্ধি এসেছে পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির কল্যাণে। এখন মে, জুন, জুলাই মাসে একদল শিক্ষিত কর্মী বাঁধগুলিতে ভীড় করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং পোনা মাছের মাথা কেটে সংগ্রহ করা পিটুটারী গ্রন্থি ইত্যাদি নিয়ে। ওখানকার পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণবয়স্ক পোনা মাছ 10-15 টাকা কিলো দরে প্রজনন মরশুমের জন্য ভাড়া নেয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে তাদের দেহে হর্মোন ইনজেকশন প্রয়োগ করে এক সঙ্গে বহু সংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের 'বাঁধ' নামে পরিচিত জলাধারে ছেড়ে দেয়। সব মাছের দেহে ইন্জেকশন দিতে হয় না মাত্র গুটি কয়েক-এর দেহে তা প্রয়োগ করে। কিন্তু প্রজনন করে সব কটি মাছই—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'সিমপ্যাথেটিক ব্রীডিং' আর গ্রাম্য পরিভাষায় বলে 'হুপে পাল খাওয়া'। 3-4 জনের কর্মী গোষ্ঠী এই স্বল্প মেয়াদী মরশুমে 3 4 হাজার টাকা লগ্নী করে 10,15 এমন কি 20 হাজার টাকাও উপার্জন করছে, উৎপাদিত ডিমপোনা সেই উৎপাদন কেন্দ্রেই ডিমপোনা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে। ইন্জেকশনের কাজে নেমেছে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তহশীলদার, গ্রামসেবক প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী, স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকার যুবক।

'বাঁধ'গুলির ক্ষেত্রে শুধু মাত্র হর্মোন ইনজেকশন ও 'সিমপ্যাথেটিক ব্রীডিং'-এরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা নয়—ঐ সাহায্য ছাড়া অন্য ভাবেও বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঐ এলাকার মাটি 'ল্যাটেরাইট-সয়েল' শ্রেণীভুক্ত, যার রং লাল। ভূপৃষ্ঠে 'ঢাল' বা 'স্লোপ' রয়েছে সর্বত্র। ঢালের নীচের অংশকে অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁধ দিয়ে ঘেরা হয়, উঁচুর দিকের তিনদিক বাঁধ দেওয়া হয় না। তাই বর্ষাকালে ঐ বাঁধ শূন্য উঁচু দিক দিয়ে ভূপৃষ্ঠ ধোয়া বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে জমে বাঁধবন্দী অংশে। আর এই ভাবে বাঁধবন্দী জমিতে জল জমলে ঐ অগভীর জলাধারে মাটি ও জলের গুণে এবং মাছের প্রজননের উপযুক্ত তাপমাত্রায় সেখানে পোনা মাছের স্বাভাবিক প্রজননের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ওখানকার পুকুরের জল ও মাটির গুণে পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ-লাভ ঘটে বলেই বর্ষাকালে পোনা মাছের

প্রজননের মরশুমে মাছ প্রজননের জলাধারগুলিতে (বাঁধ) উপযুক্ত সময়ে পুকুর থেকে মাছ ধরে স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলিকে বাঁধগুলিতে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে তারা যথাসময়ে স্বাভাবিক প্রজনন করে। তবে অতীতে বাঁধে পোনা মাছের প্রজননের জন্য বর্ষাকালীন বৃষ্টির জলধারার ওপর নির্ভর করতে হত। বর্তমানে সে নির্ভরতা আর নেই। এখন ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জলাধারে সঞ্চিত জলরাশি থেকে সেচ-খাল-বাহিত জল মাছের প্রজননের মরশুমের গোড়ার দিকেই 'বাঁধ'গুলিতে ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মাফিক তুলে বাঁধগুলিতে পোনা মাছের প্রজননের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। এটাও বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া। এই সাহায্য ওখানে পাওয়া গেছে বলে ওখানে পোনা মাছের প্রজনন ব্যাপক রূপ নিতে পেরেছে। ফলে উৎপাদিত ডিমপোনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-ধন্য মাছের ডিমপোনা উৎপাদন কেন্দ্রটি রাজ্যের মাছচাষ ব্যবস্থাকে সুফল দিতে পারে নি। কেননা বাঁধগুলিতে ডিমপোনার দ্রুত বর্ধনশীলতা বীজ হিসাবে উৎকর্ষের মান যথেষ্ট অবনমিত হয়েছে। ঐ সকল ডিমপোনা থেকে তৈরী চারা পোনা ও চালা মাছের 'গ্রোথ-রেট' বা 'বাড়' খুবই কম। কারণ ওরা তো সব অপুষ্ট ও অপরিণত পিতামাতার সন্তান (ডিম)। তাই মাছচাষের আবাদী জলাশয়ে 15 বছর আগে পোনা মাছের দেহের ওজন বৃদ্ধি যে হারে হত এখন সে হার তুলনামূলক ভাবে যথেষ্ট কম।

বর্তমানে ঐ বাঁধগুলিতে যে রকম অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন পোনা মাছের লালন-পালন চলে তাতে প্রজননকারী পিতামাতা মাছগুলির 'জেনেটিকাল ডিজেনারেশন' অনিবার্য।

অতীতে প্রজননের কাজে ব্যবহারের জন্য এখানকার পুকুরে পুষে রাখা হত বড় আকারের পোনা মাছ (5 থেকে 10 কেজি ওজন)। 5 কিলোগ্রামের কম ওজনের মাছকে একাজে ব্যবহার করা হত না। বর্তমানে পুকুরগুলিতে ঠাসাঠাসি করে পুষে রাখা হয় বহু সংখ্যক পোনা মাছ। স্থান ও খাদ্যের অভাবে ওরা 'ষ্টান্টেড গ্রোথ' বিশিষ্ট বেঁটে আকারের হয়ে ওঠে। বয়সে 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের হলেও ঐসব মাছ 250 গ্রাম থেকে 1.5 কিলোগ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই ভাবে গত 10—15 বছর ধরে ছোট, খর্বাকৃতি, বামনত্বসম্পন্ন পিতামাতা মাছদেরই প্রজনন করানো হচ্ছে।

পরিবেশজনিত কারণে সাময়িকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য (এক্ষেত্রে 'বামনত্ব') সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় না—একথা ঠিক। কিন্তু ঐ পরিবেশ বছরের পর বছর ধরে (10—15 বছরব্যাপী) চললে এবং সেই পরিবেশের মধ্যে প্রজননকারী পিতা-মাতাদের 3—4 প্রজন্ম অতিবাহিত হলে সেই পরিবেশজনিত সাময়িক বৈশিষ্ট্যটি (ঐ বামনত্ব) পরবর্তী প্রজন্মের দেহকোষের 'ক্রোমোসোম'-এর 'জিন'-এ সঞ্চারিত হয় (ল্যামার্ক-এর 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যে'র উত্তরাধিকার সূত্র)। এরূপ পরিস্থিতিতে বেঁটে পিতামাতা মাছেদের উৎপাদিত মৎস্যবীজের দ্রুতবর্ধনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাওয়ায় ঐসব মৎস্যবীজ থেকে তৈরী চারা পোনাদের প্রচুর খাদ্য জোগান দিলেও তারা বেঁটেই হয়। তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধির হার কিছুতেই পুরাতন স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছায় না।

এই দুর্দৈবের কারণে পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জলাশয়ে মাছের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে, আর চাষের জন্য বেশী সংখ্যক হারে চারা পোনা ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে বীজের ঘাটতি বেড়েছে। মৎস্য বীজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির হাতিয়ার পেয়েও আমরা তার অবনতি ঘটিয়েছি, বিজ্ঞানের আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ ভোগ করছি আমাদেরই দোষে।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাবের সাম্প্রতিক কাজকর্ম

গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের শাখা, গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব সাম্প্রতিককালে অনেকগুলি কর্মদ্যোগে নিযুক্ত রয়েছে। এই ক্লাবের পৃষ্টপোষকতায় বিগত 15-2-80 তারিখ বসিরহাট মহকুমার কাটিয়াহাট সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে 'কাটিয়াহাট বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়,—এই অঞ্চলে এই প্রথম একটি বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব টেলিস্কোপ ও স্লাইড প্রোজেকটার নিয়ে যায়। টেলিস্কোপে সূর্য পর্যবেক্ষণ করে প্রায় 300 ছাত্র-ছাত্রী। সন্ধ্যায় স্লাইড প্রোজেকটর-এর মাধ্যমে 'গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিতে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস'-শীর্ষক ছবি বক্তৃতা সহকারে দেখানো হয়। এরপরে আলিপুর চিড়িয়াখানার জীব-জন্তুদের সম্পর্কে মনোজ্ঞ স্লাইডও দেখানো হয়। বিকাল 4-টায় কাটিয়াহাট বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ক্লাব কি ও কেন'? এই বিষয়ে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে দীপক দা বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব 'জহর শিশুভবন' আয়োজিত ষষ্ঠ রাজ্য বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ মডেল প্রস্তুতকারক' হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় স্বপন চক্রবর্তীর 'মৌমাছি পালন ও সমীক্ষা', কল্যাণ মল্লিকের 'আধুনিক উনুন' এবং কৃষ্ণেন্দু পালের Double Instensity lamp মডেল ও প্রজেক্ট কাজ পাঠিয়েছিল।

সংস্থার নিজস্ব ঘরে গত 17.2.80, রবিবার, 4-টায় এক বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে দেবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার 'মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি ও আবশ্যকতা' সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংস্থা 'মাটি পরীক্ষা' করার একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব সম্প্রতি 15পঃ মূল্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু-স্মারক টিকিট প্রকাশ করে। 'গ্রামীণ বিজ্ঞান প্রজেক্ট' কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। এবছর সংস্থা দু-মাসের 'মৌমাছি পালনের' প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করেছে। 15 জন এই ট্রেনিং নিয়ে মৌমাছি পালন করছে। সংস্থার প্রায় 100 সদস্য বর্তমানে মৌমাছি প্রকল্পের কাজে যুক্ত আছে। 1979 সালে এদের মধু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 4 কুইণ্টাল হয়েছিল। এবছর উৎপাদন পরিমাণ দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংস্থার আরো কতকগুলি শাখা কেন্দ্র আছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 'এলেন রায় আদিবাসী বিদ্যালয়ে' 40টি ছাত্র-ছাত্রী বিনা বেতনে পড়ে। এদের জন্য সামান্য টিফিন ও ঔষধ দেওয়া হয়। সংস্থার নিজস্ব 15 কাঠা জমিতে এই কর্মোদ্যোগ গত আড়াই বছর ধরে চলেছে। এছাড়া শিশুদের উপর 'শারীর-মানসিক'-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংস্থা

একটি নার্শারী বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা 55 জন।

অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা

উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে গত 20শে জানুয়ারী, 1980 বাণীপীঠ বিদ্যালয়ে 'ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে শিক্ষাব্যবস্থা' সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়। লণ্ডনের কুইন্‌স্ মেরী কলেজের অধ্যাপক দীপঙ্কর রায় ভারত, আমেরিকা ও বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ঐ আলোচনাচক্রের সভাপতি রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা চীন, রাশিয়া ও বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেন। 'গ্রামীণ উন্নয়নে প্রযুক্তিবিদ্যা' সম্পর্কে স্লাইড সহযোগে ভাষণ দান করেন শ্রীদীপক দা।

জানবার কথা

ডিমে রক্তবিন্দু দেখা যায় কেন ?

পাখীর জরায়ু থেকে যখন ডিমের ইয়োক' বেরিয়ে আসে তখন কোন রক্তবাহী শিরা ফেটে যেয়ে রক্ত-বিন্দু দেখা দেয় ভিটামিন-'এ'র অভাবও এর কারণ হতে পারে

ডিমের আকার কিসের ওপর নির্ভর করে ?

নিম্নলিখিত কারণগুলির ওপর ডিমের আকার বড় হবে কি ছোট হবে নির্ভর করে খাদ্যে প্রোটিন বা আমিষের পরিমাণ, অ্যামিনো অ্যাসিড এর পরিমাণ, লিনোনিক অ্যাসিডের পরিমাণের ওপর। এছাড়া বংশগত গুণ, জননের জন্য পরিণতির অবস্থান, বয়স এবং কিছু পরিমাণে কোন্ কোন্ ওষুধের প্রভাবের ওপর ডিমের আকার নির্ভর করে।

বাদামী এবং সাদা ডিমের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বাদামী বর্ণের ডিমের থেকে সাদা ডিমের গুণগত উৎকর্ষ একটু বেশী। সাদা ডিমে খাদ্যপ্রাণ B_1 ও B_2 (থিয়ামিন ও রাইভোফেলামিন)-এর পরিমাণ বেশী থাকে, প্রায় 0·01% বেশী। সাদা ডিমে কোলেষ্টেরল এবং রক্তবিন্দুও কম থাকে। বাদামী ডিমের সঙ্গে এগুলিই এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। বাদামী ডিমের খোসা আপাতঃদৃষ্টিতে শক্ত মনে হলেও খাচায় ভাঙে বেশী এই ডিম।

ডিমের সঙ্গে ভিটামিন-'সি' থাকা চাই

হরিয়ানা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের গৃহ বিজ্ঞান কলেজের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের অধ্যক্ষা ডাঃ মিসেস ভাট বলেন যে ডিমের সঙ্গে খাদ্যে অবশ্যই ভিটামিন-'সি' থাকা চাই কারণ ডিমে ভিটামিন-'সি' থাকে না। তিনি বলেন ডিমের সঙ্গে লেবু, টম্যাটো, আমলা বা কমলালেবু খাওয়া উচিত। ভিটামিন-'সি' ডিমের মধ্যে যে লোহা থাকে তা হজম করার জন্যে প্রয়োজন। হরিয়ানা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত করা হয়।

খাদ্য হিসেবে শৈবাল

মিষ্টি জলে যে সব শৈবাল জন্মায় তারা ক্ষুদ্র সবুজ রঙের এবং খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। অধুনা এই শৈবালের ওপর লোকের দৃষ্টি পড়েছে কারণ খাদ্য, পশু-পাখীর খাদ্য, জৈব সার এবং জৈব শক্তির উৎস হিসেবে শৈবাল নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।

এই শৈবাল নিয়ে 6 বছর যাবত অনুসন্ধান চলেছে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান সংস্থায়। এই অনুসন্ধানের ফলে বেশী পরিমাণে শৈবাল উৎপাদন ও তা থেকে অন্যান্য জিনিস তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ইট, পিভি, সি, প্লাসটিক সিট, রবটার বা এ ধরণের জিনিস দিয়ে তৈরী চৌবাচ্চার মধ্যে শৈবাল হতে পারে। এদের জন্য বাণিজ্যিক স্তরে তৈরী সারের প্রয়োজন হয়। কার্বনের ভাল হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে) প্রয়োজন হয় এই শৈবাল তৈরি করতে। এছাড়াও অল্প পরিমাণে আখের গুড়, রক্ত এবং মূত্র সংযোজনে চৌবাচ্চায় শৈবাল হতে সাহায্য করে।

'সিনেডেসমাস' নামে শৈবাল তৈরি করতে গুড় থেকে কার্বন সংগ্রহ করা হয়। গ্রামে এই শৈবাল তৈরির জন্য 'স্পাইরুলিনা' নামক শৈবাল বেশী উপযোগী বলে জানা গেছে। এই শৈবাল খড়ের ঢাকনাওয়ালা চৌবাচ্চায় তৈরি করা যায়। কাপড়ে

ছেঁকে রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে এই শৈবাল পশুখাদ্যে ব্যবহার করা যায়।

এভাবে হেক্টরে 60-70 টন শৈবাল পাওয়া যায় যাতে 45-55% আমিষ পদার্থ আছে যা অন্য যে কোন সজীব আমিষ পরিমাণের চেয়ে বেশী। এই পাউডারে ভিটামিন-'বি' কমপ্লেক্স ও অন্যান্য খনিজ লবণ থাকে। এতে প্রচুর কোয়াটিন থাকে থাকে যা পাখীকে খাওয়ালে পাখীর ডিমে হলুদ অংশ হতে সাহায্য করে।

মিষ্টিজলের শৈবাল খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের খবর পাওয়া যায় মেক্সিকো এবং আফ্রিকা থেকে কেলাবেলা নামে শৈবাল থেকে তৈরী বড়ি জাপানে পুষ্টির জন্য ব্যবহার হয়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী (No. 45 (5) 80 A.I.S, ফেব্রুয়ারী, '80)-র সৌজন্যে।]

চৌম্বক বালার রোগ নিরাময় ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই

বাংলাদেশ উচ্চতর চিকিৎসা বিজ্ঞান সমিতি উচ্চ রক্তচাপ ও বাত নিরাময়ের আশায় জনগণকে আর্মব্যান্ড (বালা) ব্যবহারে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। গত 26শে নভেম্বর সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পত্রিকায় বালা ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এদ্বারা নিরীহ রুগীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। কারণ, উচ্চ রক্তচাপ ও বাতের চৌম্বক নিরাময়ের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এতে বলা হয় যে, বিজ্ঞাপনের ভুয়া আশ্বাসে যেন তারা প্রতারিত হয়ে কষ্টার্জিত টাকা এই বালার জন্য ব্যয় না করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি বালার পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় তবে সমিতি তা মেনে নেবে।

[বিজ্ঞান পরিক্রমা, বেতাগা, খুলনা, বাংলাদেশ]

একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তাবনা

সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান

[অভিযান করব, কিন্তু কেন এবং কোথায়? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। অজানাকে জানার চেষ্টা, বাঁধা ধরা জীবনের বাইরে যে বিরাট জগৎ রয়েছে তাকে জানা ও চেনার নেশায় মানুষ অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যরা এই প্রস্তুতি নিয়েছে—কেন নিয়েছে তার বর্ণনা নীচে উপস্থাপন করা হল]

প্রাকৃতিক সম্পদ ও রহস্যে ঘেরা সুন্দরবন। সেখানে পথে পথে রোমাঞ্চ। পদে পদে অজানার হাতছানি। তার বর্ণময় বৈচিত্র্য, আরণ্য বৈভব, দুরন্ত নদী, ভয়ঙ্কর ও নিরীহ পশু, উচ্ছ্বলিত পক্ষীকুল, উদার ভূপ্রকৃতি, অফুরন্ত কৃষিজ সম্পদ এবং প্রাণচঞ্চল অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সংবাদ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সংকল্প হাতে নিয়েছেন গোবরডাঙা রেনেসাঁ ইনস্টিটিউট। ভাবতে অবাক লাগে অর্থ নৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি সুন্দরবন অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে নমুনা সংগ্রহের জন্য এযাবৎ কোন সংগঠিত বেসরকারী উদ্যোগ দেখা যায় নি।

সুন্দরবনে শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীই নয়, সেখানে প্রকৃতির মত মানুষও বিচিত্র। বিচিত্র তাদের জীবন ও জীবিকা। কেউ বঞ্চিত কৃষক, কেউ মৎস্য শিকারী, কেউ মধু সংগ্রাহক, কেউ মাঝি, কেউ ওঝা, কেউ দালাল, কেউবা জোতদার। সেখানকার মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসও সাধারণ অঞ্চলের মত নয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে বনবিবিকে, মুসলমানেরা পূজো দেয় দক্ষিণ রায়ের মন্দিরে। খৃষ্টান্—গীর্জায় কীর্তনের সুরে যীশুর ভজনা করে। এমন করে একাকার হয়ে যায় বিভিন্ন ধর্মমত—সুন্দরবনের উদার পটভূমিতে। সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য এধরণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বোধ করি আর দুটি নাই।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা পরিচিত ও বিলীয়মান জীবজন্তুর বাসভূমি সুন্দরবনে তথ্যানুসন্ধানীর জন্য অজস্র উপাদান ছড়ানো রয়েছে। এ যেন চ্যালেঞ্জ। কীভাবে অনেক প্রজাতি বংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তার চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

পক্ষীআলয়ের নিরাপদ আশ্রয়ে পাখীর ডানায় কখন কত রং ফোটে, গলায় কত সুর ঝরে তার হিসাব রাখা যেতে পারে তন্নিষ্ট পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। আবার জানা-অজানা অজস্র কীটপতঙ্গের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হয়ত অবাক হতে হবে। ভারসাম্য বজায় রাখতে এ সব তুচ্ছ পতঙ্গরাও কীভাবে সাহায্য করে তা সন্ধানের বিষয় জীববিজ্ঞানীর। সুন্দরবনের বৃক্ষের কোন সম্পূর্ণ নির্দেশিকা আজও প্রস্তুত হয় নি। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সংগ্রহশালায় সমৃদ্ধ হতে পারে সুন্দরবনের পুষ্পরাজির সমাবেশ।

ভূবিজ্ঞানী ও কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণীয় এখানকার জমি যার অধিকাংশই এক ফসলী এবং একমাত্র ধানই সেই ফসল। অথচ কার্পাস, গম, সূর্যমুখী ফুল ইত্যাদি নানা রকমের অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলতে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ও সুপারিশসমূহ সহায়ক হবে। এছাড়া পর্যটনের স্থান নির্বাচন নিয়ে তথ্য পাওয়া দরকার।

এমনকি ভিক্টোরিয়্যাণ্ডের মত কল্পনাশ্রয়ী যাত্রীদের দর্শনীয় প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী মূলধন করে গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তরুণদের নিয়ে একটি অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবের কষ্টসহিষ্ণু, উৎসাহী, সাহসী, অনুসন্ধিৎসু অভিযাত্রীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় মাসাধিক-কালের জন্য জলে, স্থলে এই অভিযান পরিচালিত হবে। গৃহীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে পরবর্তী কার্যক্রম।

সকল শ্রেণীর দরদী মানুষের আর্থিক সাহায্যের উপর এই অভিযানের সার্থক রূপায়ন নির্ভর করছে।

অভিযান সম্পর্কে কিছু বই-এর তালিকা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার জন্যে দেওয়া হল। এসব বই পড়লে অভিযানের একটা মানসিক প্রস্তুতি হবে।

1. Travels of Mungo Park
2. (a) The R. A. Expedition
   (b) Sea routes of Polynesia — Thor Heyer dahal
   (c) American Indian in the Pacific
3. Mankind and mother earth —Toynbee
4. Man of Everest - Autobiography of Tenzing
5. Travelling with the innocents abraod — Mark Twain
6. Heroes of exploration—Ker & Cleaver
7. সমুদ্র থেকে আকাশ অভিযান—হিলারী
8. (a) নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টী
   (b) স্বর্গ যদি কোথাও থাকে — গৌরকিশোর ঘোষ
9. ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বিভিন্ন বই

মণি দাশগুপ্ত
গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট
পোঃ—খাটুরা, জেলা—24পরগণা
PIN—743273

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

লোবাচেভস্কি—এক অভিনব জ্যামিতির স্রষ্টা

নন্দলাল মাইতি*

ভাব ও চিন্তাজগতে বিপ্লব সূচনা করে যাঁরা মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করেছেন, জীবদ্দশায় তাঁদের বেশীর ভাগের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট জুটেছে। এমন কি চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও যে কেউ কেউ পেয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সক্রেটিসকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, আর গ্যালিলিও অন্ধকার কারাগৃহে লাঞ্ছনাময় জীবন কাটিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি আধুনিক যুগে আইনস্টাইনকে তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ঠিক এমনিভাবে লোবাচেভস্কিও এক অভিনব জ্যামিতি আবিষ্কারের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর জীবদ্দশায় পান নি। শেষ জীবনে এই তত্ত্ব সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটি যখন তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন, তখন তিনি ছিলেন অন্ধ। অথচ ওই কাজান বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিকল্পে তিনি কী-ই না করেছেন!

নিকোলাই আইভ্যানোভিচ লোবাচেভস্কি 1793 খৃীস্টাব্দের 2রা নভেম্বর রাশিয়ার ম্যাকারিয়েফ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ গণিতবিদের মত ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতা ছিলেন সামান্য মাইনের সরকারী কর্মচারী। নিকোলাই মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর পিতাকে হারান। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় সন্তান। কিন্তু তাঁর মা প্রাস্কভিয়া আইভ্যানোভনা ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা। ছোট ছোট তিনটি সন্তান

*পোঃ—ঠাকুরাণিচক, জেলা—হুগলী

নিয়ে তিনি দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন। তাঁর তিনটি সন্তানই ছিল বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান।

সন্তানদের ঠিকমত মানুষ করার জন্য বিধবা প্রাস্কভিয়া আইভ্যানোভনা কাজান শহরে চলে এলেন। তিনি তাদের জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করে দিলেন এবং তারা সবাই একের পর এক বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠতে লাগল। নিকোলাই মাত্র আট বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়। গণিত ও প্রাচীন সাহিত্য—দুয়েতেই ছিল তার অসাধারণ অনুরাগ।

লোবাচেভস্কি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং 1807 খৃীস্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে 1811 খৃীস্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছর বয়সে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। সহকারী অধ্যাপক, অধ্যাপক ও রেক্টর হিসাবে এখানেই তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর কেটেছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে অধ্যাপকপদে উন্নীত হবার পর তাঁকে অনেক কাজের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। গণিতের পঠন-পাঠন তো ছিলই, তার উপর আবার কখনো কোন সহকর্মী ছুটিতে থাকলে তাঁকে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়াতে হত। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ও কিউরেটারের দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে। 1827 খৃীস্টাব্দে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটারের পদলাভ করেন। আমাদের আশুতোষের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেও তিনি শারীরিক শ্রমকে অমর্যাদাকর বলে মনে করতেন না। লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের উন্নতির প্রয়োজনে কোর্ট-সার্ট খুলে পরিশ্রম করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। একবার এক বিদেশী পর্যটক কোর্টবিহীন রেকটরকে দারোয়ান বা সাধারণ একজন কর্মী ভেবে লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম দেখানোর সাহায্য করার জন্য বলেছিলেন। এই জ্ঞানতপস্বী গণিতবিদ অবশ্য পর্যটকের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়ে বিদেশী ভদ্রলোকের পছন্দ মত সংগ্রহ ও লাইব্রেরী দেখিয়ে তিনি এমন চমৎকৃত করেছিলেন যে, ভদ্রলোক যাবার সময় তাঁকে লোভনীয় বখশিস দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য, লোবাচেভস্কি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় গভর্ণরের ডিনার-টেবিলে মহান এই গণিতবিদের পরিচয় পেয়ে ঐ বিদেশী পর্যটকের যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গণিতে যে বিষয়টির তিনি স্রষ্টা তার নাম অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। এই অভিনব বিষয়টির উপর কাজানের ফিজিক্যাল ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে (Physical Mathematical Society) 1826 খৃীস্টাব্দে প্রথম বক্তৃতা করেন, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা কেউ বুঝতে পারল না। বলা হয় তিনটি প্রকল্পের উপর তিন ধরনের জ্যামিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটি, সমকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, দ্বিতীয়টি, সূক্ষ্মকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর লোবাচেভস্কির জ্যামিতি ও

তৃতীয়টি স্থূলকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর রীম্যানীয় জ্যামিতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের জ্যামিতিকে একত্রে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বলা হয়।

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। তাই, লোবাচেভস্কীর জ্যামিতির অবাক হওয়ার মত দু-একটি উপপাদ্যর উল্লেখ করা হল :

(1) ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

(2) চতুর্ভুজের কোণসমষ্টি চার সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

(3) দুটি অপসারী সরলরেখার একটিমাত্র সাধারণ লম্ব আছে।

যুগান্তকারী এ-সব কাজ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বনিবনা না হওয়ায় তাঁকে অধ্যাপক ও রেক্টারের পদ থেকে 1846 খ্রীস্টাব্দে অপসারিত করা হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা ছাড়া তাঁর আর কোন সুযোগই রইল না।

এরপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। 1855 খ্রীস্টাব্দে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উৎসবে তিনি তাঁর সমগ্র জ্যামিতিক গবেষণা সম্বন্ধে পুস্তকটি উপহার দেন। অবশেষে 1856 খৃঃ 24শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

জোনাকী

অশোক বিজলী*

বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে প্রায় দেড় হাজার রকমের জোনাকী আছে। এদের আলোর রং আলাদা আলাদা, আলো বিকিরণের সময়ও আলাদা। কারও গা থেকে দু-সেকেন্ড অন্তর আলো বের হয়। আবার এমন জোনাকী আছে যারা আট থেকে দশ মিনিট অন্তর আলো দেয়।

জোনাকীর সময়জ্ঞানও খুব বেশী, এদের আলো দেবার নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ঠিক পরে। সময়ের ব্যাপারে জোনাকীরা ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল। গবেষণাগারে নকল অন্ধকার সৃষ্টি করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, জোনাকীদের কখনও ভুল হয় নি। দিন ও রাত্রির পার্থক্য বুঝতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, জোনাকীর দেহে লুসিফেরিন নামে রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সংমিশ্রণের ফলেই সৃষ্টি হয় এই আলো। জোনাকীর আলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে আলো আছে কিন্তু তাপ নেই, তাই বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছে ঠান্ডা আলো। দেখা গেছে একটি মোমবাতি থেকে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ আলো সৃষ্টি করতে চল্লিশটি জোনাকীর দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী সৈনিকরা এই ধরণের ঠান্ডা আলো প্রচুর পরিমাণে

*গ্রাম—বনগোপালপুর, পোঃ—মুক্তাহাটা, জেলা—মেদিনীপুর

কাজে লাগিয়েছিল, তারা মৃত জোনাকীর দেহ গ্‌'ড়ো করে সঙ্গে রাখত। দরকারমত সেই গ্‌'ড়ো কিছুটা হাতের চেটোয় নিয়ে তাতে জল মিশিয়ে আলো জবালাত। এই আলোর তাতও পড়ত না, অথচ বনের মধ্যে অন্ধকারে ম্যাপ দেখা ইত্যাদির মত ছোট-খাট কাজ সহজেই করতে পারত।

পৃথিবীর নানা দেশে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য প্রসাধন হিসাবে ব্যাপকভাবে জোনাকীর ব্যবহার দেখা যায়, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা শরীরের শোভা বাড়াবার জন্য মাথার চুল ও দেহের নানা অংশে জোনাকী গেঁথে রাখে। জাপানে ছোট ছোট নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাড়ির দরজা জানালা ও লতাপাতার মধ্যে রাত্রিবেলা জোনাকী আটকে রেখে দেয়, মধ্য আফ্রিকায় গভীর অরণ্যে যেসব মানুষ বাস করে তারা রাত্রে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার সময় জুতোতে কিংবা পায়ের পাতায় কয়েকটি জোনাকী বসিয়ে নেয়, ফলে তাদের পথচলার সুবিধে হয়।

জোনাকীর খাদ্য হল পুকুরের ছোট খাট শামুক, গুগলি ও অন্যান্য পোকামাকড়, রাত্রে এদের শাঁসটুকু খেয়ে জোনাকিরা খোলাগুলি ফেলে দেয়।

ওজোনকে বাঁচানো দরকার

শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়*

[শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী, বিমানের বর্জিত গ্যাস স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। তার ফলে আরও বেশী পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে যাতে মানুষের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।]

পৃথিবীর উপরে আছে বায়ু। আমরা বায়ু-সমুদ্রে ডুবে আছি। এই বায়ু কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। মাটির উপরে বায়ুর প্রথম অংশটাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। বিষুবরেখা থেকে প্রায় $23\frac{1}{2}^{\circ}$ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে বায়ুর এই অংশের গড়-উচ্চতা প্রায় 16 কিলোমিটার হয়'। মেরু ও মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই উচ্চতা প্রায় 8 থেকে 10 কিলোমিটার হয়। ট্রোপোস্ফিয়ারে উচ্চতা যতই বাড়তে থাকে, বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ এবং ঘনত্ব ততই কমতে থাকে। একদম উপরের তলের তাপমাত্রা 210°k হয়। ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরেই মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি সীমাবদ্ধ থাকে এবং এসবের ফলে ঐ অংশের দূষিত পদার্থগুলি অনেকাংশে দূর হয়। ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের প্রান্ততলকে বলা হয় ট্রোপোপজ। এই ট্রোপোপজের উপরে বায়ুর আর একটা বিরাট অংশ রয়েছে। এর নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এর উচ্চতা প্রায় 50 কিলোমিটার হয়। এখানকার কাজ হয় ট্রোপোস্ফিয়ারের

*পোঃ+গ্রাম—মল্লিকপুর, জেলা—24 পরগণা

ঠিক বিপরীত। এখানে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ে। মেরু অঞ্চলে প্রথমে কিছুদূর তাপমাত্রা স্থির থাকে এবং পরে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ঠাণ্ডা বা ভারী বাতাস নীচে থাকে এবং গরম হাল্কা বাতাস উপরে থাকে। ফলে এই অংশে বাতাসের চলাচল খুব কম হয় এবং মিশ্রিত অপদ্রব্যের দূরীকরণ প্রায় হয় না বললেই চলে। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় দূষিত গ্যাসীয় পদার্থগুলি বছরের পর বছর থেকেই যায়। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানগুলি (supersonic transport aircrafts) এই দূষিত গ্যাসীয় পদার্থের জন্য দায়ী। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় ঐ বিমানগুলি যেসব গ্যাস ছাড়ে তার মধ্যে নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পই প্রধান। এখানে এই সব গ্যাস তিন চার বছর থাকে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমণ্ডলের এই অংশে অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন (O_3) গ্যাস থাকে। ওজোন গ্যাসের কাজ হলো সূর্য থেকে নিঃসৃত যেসব অদৃশ্য রশ্মি জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর, সেই সব রশ্মিগুলিকে শোষণ করা। ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মি থেকে আরম্ভ করে খুব বড় তরঙ্গের নিঃসরণ সূর্য থেকে হয়। 3200Å (10^{-8} cm = 1Å)-এর চেয়ে ছোট তরঙ্গের রশ্মিগুলিই ক্ষতিকর। এইসব রশ্মি খুব কমই পৃথিবীতে আসে। ওজোন 3200Å থেকে শোষণ করতে আরম্ভ করে। 2950Å-এর চেয়ে ছোট তরঙ্গের কোন রশ্মিকে এই গ্যাস পৃথিবীতে আসতে দেয় না। বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে অতিবেগুনী রশ্মি (ultra-violet) পৃথিবীতে চলে আসে এবং জীব ও উদ্ভিদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এই রশ্মি খালি চোখে দেখা যায় না। যেসব রশ্মি দেখা যায় তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 4000A°-এর উপরে। দীর্ঘ দিন ধরে এই অতিবেগুনী রশ্মি (uv – B) শরীরের উপর এসে পড়লে কর্কট রোগ (cancer) হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। অনুমান করা হচ্ছে যে ওজোন 1% কমলে অতিবেগুনী রশ্মি 2% বাড়ে এবং এর ফলে প্রতি বছরে প্রায় 10,000 লোক কর্কট রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিও রোধ হতে পারে এবং উদ্ভিদ অকালে মারা যেতে পারে। এসব ছাড়া অতিবেগুনী রশ্মিস্রোত বাড়লে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাপমাত্রার পরিবর্তন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। তার ফলে কেবলমাত্র আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে তাই নয়, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা।

যতদূর জানা যায়, সূর্য থেকে নির্গত ফোটন কণা কোন অনুঘটকের উপস্থিতিতে যখন অক্সিজেনের উপর পড়ে তখন ওজোন (O_3) উৎপন্ন হয়।

$$O_2 + \text{ফোটন কণা} \rightarrow O + O$$

$$O_2 + O \rightarrow O_3$$

আগেই বলা হয়েছে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানগুলি উড়ে যাবার সময় নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO) ছাড়ে। এই NO গ্যাস O_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে NO_2 তৈরি করে।

$$O_3 + NO \rightarrow O_2 + NO_2$$

এই NO_2 আবার ফোটন কণা ও O-এর দ্বারা NO গ্যাস পরিণত হয়।

(i) $NO_2 +$ ফোটন কণা $\rightarrow NO + O$

(ii) $NO_2 + O \rightarrow NO + O_2$

এই ভাবে NO গ্যাস ওজোনকে ধ্বংস করে।

বর্তমান বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে যদি এই ওজোন গ্যাসকে ধরে না রাখা যায় তাহলে ক্ষতির মাত্রা দিনের পর দিন বাড়বে এবং শেষে এর প্রভাব মানুষকে একটা বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেবে।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির মাংসভোজী প্রাণী হলো এক জাতের বাদামী রঙের ভালুক। এই ভালুক অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় না, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যেই এদের বাস। এরা কাটমাই ভালুক নামে পরিচিত। সাধারণতঃ একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কাটমাই ভালুকের ওজন 1500 পাউণ্ডের মত এবং সাধারণতঃ এরা নয় ফুট লম্বা হয়। একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ বা সিংহের তুলনায় এরা তিনগুণ বড় হয়ে থাকে। বিশাল দেহ এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হলেও এদের স্বভাব মোটেই উগ্র নয়। খুব কাছাকাছি না গেলে বিপদের বড় একটা আশঙ্কা থাকে না। গ্রীষ্মকালে এদের প্রিয় খাদ্য হলো স্যামন মাছ। খরস্রোতা নদী থেকে এরা স্যামন মাছ শিকার করে উদরসাৎ করে। বিশাল শরীরের ভারে এদের গতি মন্থর হলেও কাজের সময় কিন্তু খুব ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেয়। সব সময় এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। গা চুলকালে বা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য এরা প্রথমে নরম মাটি বা বালির উপর একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ে এবং সেই অবস্থায় চারদিকে ঘুরতে থাকে। এর ফলে দু-এক মিনিটের মধ্যে এক ফুট বা তারও বেশী গভীর একটা বৃত্তাকার গর্ত তৈরি হয়ে যায়।

সুগন্ধের উৎস

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

আমরা অনেকেই, বিশেষ করে মহিলারা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে যাবার সময় সাজপোষাকের পর একটু সেন্ট (scent) ব্যবহার করি। কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বেশীর ভাগ সুগন্ধি দ্রব্য তৈরী হলেও উদ্ভিদ-জগৎ এবং প্রাণী-জগৎ থেকেও মূল্যবান মনমাতানো সুগন্ধি প্রস্তুত করা হয়। আশ্চর্যের কথা, উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ মূল পদার্থগুলি প্রথমাবস্থায় সুগন্ধ-যুক্ততো নয়ই বরং গন্ধহীন বা দুর্গন্ধযুক্তই বটে। নিম্নে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

গন্ধগোকুল (Civet)—গ্রামের লোক গন্ধগোকুলকে ভালোভাবেই জানেন। ধারেকাছে গন্ধগোকুল এলেই নাকে চাপা দিতে ইচ্ছে করে। ঐ গন্ধগোকুলের লাঙ্গুলের মূলের নীচের দিকে দুটি গ্রন্থির নিঃসৃত রস থেকে অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈরি হয়। 1 কিঃ গ্রাঃ পরিস্রুত ঐ রস থেকে 36·000—40·000 টাকার সুগন্ধি তৈরি হয়।

অ্যামবারগ্রিস (Ambergris)—এই বস্তুটি গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় এগুলি পুরুষ তিমির বমি। সুরাসারে বিগলিত ঐ বস্তু পরিস্রুত হয়ে কিঃ গ্রাম প্রতি 2,00,000 টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রীত হয়।

কস্তুরি—কস্তুরিমৃগের কথা অনেকেরই শোনা আছে। এই জাতীয় মৃগ এশিয়ার বিশেষ করে হিমালয়ের উপরভাগে বাস করে। এর নাভির কাছে একটি পিণ্ডাকার অংশ গন্ধযুক্ত। এই অংশগুলি সংগ্রহ করার জন্য প্রাণীটিকে হত্যা করা হয়। পিণ্ডটি বের করে নিয়ে প্রাণীটিকে ফেলে দেওয়া হয়। এক কিঃ গ্রাঃ কস্তুরির মূল্য এক লাখ পঁচাশী হাজার থেকে আড়াইলাখ টাকা।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)—বীবর নামক প্রাণীর গ্রন্থির রস। বীবর (Beaver) একটি খরগোশের মত চতুষ্পদ প্রাণী। ক্যানাডা এবং রাশিয়ায় পাওয়া যায়।

লাবডেনাম (Labdanum)—এক প্রকার উদ্ভিদের আঠালো রস। মিষ্টি গন্ধযুক্ত সুগন্ধি তৈরি হয়।

নাখলা (Nakhla)—এটিও সামুদ্রিক প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। শুকনো অবস্থায় মাছের আঁশের মত দেখায় এবং ঐ অবস্থায় কোন গন্ধ থাকে না।

সবুজ বানর থেকে সাবধান

কমল চক্রবর্তী*

বানর দেখতে কেমন সকলেই জানি। কিন্তু সবুজ বানর কি তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। আসলে সবুজ বানর কিন্তু বানরই নয়, এটা একটা অসুখের নাম। 1975-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা হঠাৎ এক রোগের সম্বন্ধে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। সেই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম 'মারবার্গ-ভাইরাস' (Marburg Virus)। এরই চলতি নাম 'সবুজ বানর'।

জার্মানীতে 1967 সালের এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 31 জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। আফ্রিকার এক ধরনের বানরের থেকে এই রোগের বিস্তারলাভ হয়েছে। এই রোগের বীজাণু রক্তে প্রবেশ করলে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগ বেশ ছোঁয়াচে। যার জন্য এই রোগের সংস্পর্শে অন্যকে অসুস্থ করে তোলে। হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তাররাও এই রোগের চিকিৎসায় নিজেরাই রুগী বনে যান। একজন অস্ট্রেলিয়াবাসী, যখন রোডেশিয়া হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তিনি এই রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে জোহানসবার্গ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু তাঁকে বাঁচান সম্ভব হয় নি। এই অস্ট্রেলিয়াবাসীর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল, সেও কিছুদিন পর এই রোগে আক্রান্ত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় মেয়েটি রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

1967 সাল থেকে এই রোগ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার জন্য পৃথিবীর বহু মানুষই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। 1975 সালে জার্মান এবং যুগোস্লাভ সরকারকে বেশ ভাবিয়ে তুলল এই রোগ। এরপর 1976 সালের শেষদিকে এই রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিল সুদান ও জাইরেতে।

যে ভাইরাস এই রোগের কারণ তার নাম 'মারবার্গ ভাইরাস'। এই রোগের প্রথমে বেশ জ্বর হয় এবং পরে রক্ত বমি শুরু হয়। বেশী রক্ত-বমি হলে জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ডাক্তারদের কাছে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল, কারণ এই ধরণের রোগের মোকাবিলা তাঁদের আগে করতে হয় নি। এই রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বহুলোক প্রাণ হারাতে লাগল। তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থাও চলতে লাগল ব্যাপকভাবে। এখন পর্যন্ত ডাক্তাররা এর ভাল ওষুধের সন্ধান পান নি। প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এই বীজাণু আট থেকে নয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে এই রোগের ভাইরাস বের করে ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তাররা এই অসুখের নিরাময় করতে পেরেছেন কিন্তু এখনও তারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। আমাদের দেশে এই রোগ এখনও আসে নি, তাই আমরা এবিষয়ে খুব বেশী ভীত নই। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষই আমাদের আপন আমরা চাই এই রোগ থেকে সকলেই যেন মুক্তি পান।

---

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা

মৌমাছির বিষ

আমিনুল ইসলাম*

[মৌমাছির বিষ-এর গঠন, প্রয়োগ, রাসায়নিক ও ভেষজ গুণাবলী আলোচিত হয়েছে ।]

মৌমাছির গুন গুন শব্দ কবিদের উন্মেষ যতই ঘটাক না কেন, খুব কম লোকই আছেন যিনি এই গুন গুন শব্দে ভয় পান না । সত্যি হয়তো এতে ভয়ের কিছু থাকে না কারণ মৌমাছি সাধারণতঃ হুল ফোটায় না যদি না ওদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটান হয় । যাই হোক এই বিষ, বিগত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এই বিষ একটি গ্রন্থির নিঃসৃত পদার্থ । রূপান্তরিত সহকারী জনন অঙ্গসমূহ, সাধারণতঃ একজোড়া অম্লগ্রন্থি (acid gland), একটি বিষথলি, (poison reservoir) একটি ক্ষার গ্রন্থি (alkaline gland) এবং একটি সম্মিলিত নালী নিয়ে বিষগ্রন্থি গঠিত এবং এই সাধারণ নালীটি হুল-এর সঙ্গে যুক্ত । হুল ফোটানোর সময় শিকারের দেহে হুলটি ফুটে গেলে ইনজেকশনের ন্যায় ঐ স্থানে বিষ নিক্ষিপ্ত হয় । কিন্তু সুখের বা দুঃখের কথা এই যে, মৌমাছি ঐ ব্যবহৃত হুলটি আর শিকারের দেহ থেকে বের করে আনতে পারে না ফলে ঐ হুল নামক ব্রহ্মাস্ত্রটি মৌমাছি সারা জীবনে একবারই ব্যবহার করতে পারে, তারপর ঐ বিষের আর কোন মূল্যই থাকে না । কারণ একবার খসে গেলে হুল আর নূতন করে তৈরি হয় না ।

মৌমাছির বিষ স্বচ্ছ, উগ্র গন্ধযুক্ত ও তিক্ত স্বাদযুক্ত, এটি অম্লজাতীয় তরল, এতে ফর্মিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অর্থোফসফোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে । এ-ছাড়া পাওয়া গেছে হিস্টামিন, ট্রিপটোফ্যান, সালফার, তামা এবং ক্যালসিয়াম । মেলিটিন নামক এক প্রকার পদার্থ এর জ্বালা এবং ক্ষতের জন্য দায়ী । মৌমাছির বিষে দুটি উৎসেচকও পাওয়া গেছে— হায়ালিউরোনিডেজ এবং ফসফোলাইপেজ ।

হুল ফোটানোর সময় একটা মৌমাছি প্রথমবারে যে বিষটুকু ঢালে সেটা বিষাক্ত নয় । সেই মাত্রার দশ গুণ হলে সেটি হয় বিষাক্ত এবং মারাত্মকভাবে বিষাক্ত হতে গেলে দরকার এক-শ' গুণ । সাধারণতঃ 200-300 হুল ফোটানো একজন মানুষের সংজ্ঞা লোপের পক্ষে যথেষ্ট এবং 500 বা ততোধিক হুল মানুষের মৃত্যু ঘটায় । মৌমাছির বিষ নার্ভতন্ত্রের উপর কাজ করে, এবং প্রাথমিকভাবে শ্বাসঅঙ্গ ও হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হয় ।

এই বিষকে কোন চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা এনিয়ে বিজ্ঞানীমহল বহুকাল ধরে ভেবে আসছেন । প্রাচীনকাল থেকেই মৌমাছির বিষ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।

* 'সেবায়ন', নিউ হসপিটাল রোড, চুঁচুড়া, হুগলী (712 101)

মৌমাছির বিষের দ্বারা যে রোগটির চিকিৎসা সর্বজনবিদিত সেটি হল 'বাত'। সর্বপ্রথম ভিয়েনার একজন চিকিৎসক এফ্ ট্রেটস্ (F. Tretsch) এই বিষ দ্বারা বাতের চিকিৎসার সুফল লাভ করেন। তিনি দেখান যে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের কোন একটি বিশেষ অংশ এই রোগে আক্রান্ত হয়, এই বিষের প্রভাবে সেটি তার স্বাভাবিক গুণাগুণ ফিরে পায়।

বাতের পরেই উল্লেখযোগ্য রোগ হল নিউরাইটিস (neuritis) এবং নিউরালজিয়া (neuralgia)। বিষদ্বারা এই রোগের চিকিৎসা সর্বপ্রথম করেন একজন রাশিয়ান চিকিৎসক—ইরুসালিমচিক (Erusalimchik), 1938 সালে।

এই বিষ দ্বারা কিছু চোখের রোগেরও চিকিৎসা হয়ে থাকে যেমন—কেরাটো-কনজাংটিভাইটিস (kerato-conjunctivitis) ; আইরিটিস (iritis) এবং আইরিডোসাইক্লিটিস (iridocyclitis)। এছাড়াও মৌমাছির বিষ রক্তচাপ কমানোর উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন চামড়ার রোগের বিরুদ্ধে, এমনকি বিভিন্ন স্ত্রীরোগ এবং শিশুদের রোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মৌমাছির বিষদ্বারা চিকিৎসা সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে রাশিয়ায়, আমেরিকায়, চীনে এবং রুমানিয়ায়। এখন মৌমাছির বিষ থেকে ভাইরাপিন (virapin) এবং এপিসারথ্রন (apisarthron) নামে দুটি ওষুধও প্রস্তুত করা হয়েছে। মৌমাছির বিষ দিয়ে চিকিৎসা করতে গেলে সবসময়ই কোনো না কোনো বিশেষজ্ঞ দিয়ে করানো উচিত ; বিশেষত যখন শিশু এবং বৃদ্ধদের চিকিৎসা করা হবে।

যাঁরা মৌমাছির চাষ করেন তাঁরা খালি মধু এবং মৌমাছির মোমের কথাই ভাবেন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিষও দরকারী এবং দামী, এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সাপের বিষের মতো মৌমাছির বিষও অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিষ খালি বিষই নয় ওষুধও, অবশ্য দুটোই মাত্রাভেদে।

মধু উৎপাদনের কথা

তরুণকুমার দেবনাথ*

[লেখক নিজে একজন মৌমাছি পালক।
কিভাবে মধু উৎপাদন করা যায় তা লেখকের অভিজ্ঞতা
থেকে এই নিবন্ধে বিবৃত করা হয়েছে।]

মধু সর্বকালে সর্বদেশে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে গণ্য। মধুর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট। এক পাউন্ড মধুতে প্রায় 1600 কিলো ক্যালরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, (1 গ্রাম জলের 1° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে 1 ক্যালোরি বলে) যা কিনা দুধের তাপশক্তি উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে প্রায় 6 গুণ বেশী। মধুতে আছে গ্লুকোজ, লেভুলোজ, অর্গানিক অ্যাসিড, ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য যা শরীর গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মধু সহজপাচ্য কারণ মৌমাছির শরীরেই এর পাচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। মাতৃদুগ্ধে যে সমস্ত উপাদান থাকে না তাও মধুতে বর্তমান। মাছ, মাংস ও শাকসব্জী অপেক্ষা মধুর ক্যালোরি উৎপাদন ক্ষমতা অধিক। কলোরাডো কৃষি মহাবিদ্যালয়ের জীবাণুবিদ ডাঃ ডব্লিউ বি. স্যাকেট (Dr. W. B. Sacket) বিভিন্ন পরীক্ষার পর মধুর জীবাণুনাশক বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। মধু নিম্নলিখিত জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করে, (1) টাইফাস্, (2) প্যারাটাইফাস্, (3) এনটিরিডিস্, (4) ডিসেন্ট্রি, (5) সুইফেসটিফার ইত্যাদি। এ ছাড়াও রুশ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে মৌমাছি মধু, পরাগ ও জল মিশিয়ে যে 'বী ব্রেড' শূককীটকে খাওয়ায় তার ব্যবহারে ক্যান্সারের জীবাণুও নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া মধু ফুসফুসের রোগ, হৃদরোগ, লিভার বা যকৃতের রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। মধু প্রসাধনসামগ্রী হিসেবে খুব ভাল। মধুর ব্যবহারে যৌবন ও লাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক 100 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম এবং প্রত্যেক শিশু দৈনিক 30-60 গ্রাম মধু নির্বিঘ্নে খেতে পারে। কোন রোগের উপশমের জন্য মধু অন্তত দেড় থেকে দু-মাস খাওয়া উচিত।

এত সময় ধরে যে মধুর ব্যবহার ও খাওয়ার নিয়ম বলা হল এতেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যায় না। এই মধু কিভাবে উৎপাদন করা যায় তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত চার ধরণের মৌমাছি দেখা যায়, যেমন—(1) পাহাড়ীয়া মৌমাছি (Apis Dorsata), (2) ভারতীয় মৌমাছি (Apis Indica), (3) ক্ষুদে মৌমাছি (Apis Floriea), (4) ডামার মৌমাছি (Damar Bee)। ভারতীয় মৌমাছি বাক্সে রেখে নিজেদের তত্ত্বাবধানে পালন করা যায় কারণ এই জাতীয় মৌমাছি অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে এবং এদের চাক থেকে ভাল মধু

* গ্রাম—বেতপুল, ডাকঘর—মছলন্দপুর, জেলা – 24 পরগণা

পাওয়া যায়। ভারতীয় মৌমাছি পালন করার জন্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যেমন (1) এ টাইপ মৌমাছি বাক্স (A type bee hive), (2) ধোয়াদানী (smoker), (3) মধু নিষ্কাশন যন্ত্র (honey extractor) ইত্যাদি।

A type মৌমাছি বাক্সের 5টি ভাগ আছে (1) বটম বোর্ড (bottom board), (2) ব্রুড চেম্বার (brood chamber), (3) সুপার চেম্বার (super chamber), (4) ক্রাউন বোর্ড (crown board), (5) টপ (top)।

এখন প্রশ্ন, ভারতীয় মৌমাছির চাক দেখতে পেলে সেই স্থানে বাক্স রেখে দিলেই কি মৌমাছি বাক্সে ঢুকবে? যা, তা নয়। প্রকৃতির থেকে চাক ধরে কিভাবে বাক্সে আনা যায় তা এখানে বলা হল। প্রশিক্ষণ না নেওয়া থাকলে মৌমাছিরা চাক ধরার কালে হুল ফোটাতে পারে। কয়েকটি হুল খাওয়ার পর যদি কেউ এই মৌমাছি পালন করা ছেড়ে দেন তাহলে তিনি মস্ত বড় ভুল করবেন। কারণ মৌমাছির হুলে যে বিষ থাকে সেই বিষে ফরমিক অ্যাসিড, অর্থ-ফসফোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে থাকে হিসটামিন (histamin), সালফার ইত্যাদি। চাক ধরতে হলে যে সমস্ত জিনিষ সঙ্গে নিতে হয় তা হল হাইভ (কুইনগেট সহ) ধোয়াদানী, নারিকেলের ছোবড়া, হাতুড়ি, বাটালি, ছুরি, কলার সুতা ইত্যাদি। চাক ধরা কাজ গরমের দিনে সকাল 9টার পূর্বে এবং শীতের দিনে সকাল 9টা থেকে বিকেল 4 টার মধ্যে সেরে নিতে হয়। মনে করা যাক একটি গাছের কোটরে একটি চাক আছে। ঐ চাকটিকে বাক্সে আনতে হলে কোটরের মুখ ছোট থাকলে বড় করে কেটে নিতে হবে। এখন ধোয়াদানীর সাহায্যে ধোয়া দিলে মাছি কিছু বেরিয়ে আসবে এবং কিছু কোটরের মধ্যে জমা হবে। এখন চাকটির যে অংশ কোটরে জোড়া ছিল ঐ অংশে কেটে দিতে হবে। চাক বের করবার পর যদি দেখা যায় চাকে মধু জমা আছে তাহলে ঐ মধু জমা অংশটিকে কেটে বাদ দিতে হবে। বাকী যে অংশে ডিম, শূককীট, মূককীট রয়েছে ঐ অংশকে ব্রুড ফ্রেমে (brood frame) কলার সুতার সাহায্যে বেঁধে দিতে হবে। মধু অংশকে সুপার ফ্রেমে (super frame) বাঁধা যেতে পারে। ফ্রেমে চাক বাঁধা শেষ হলে কুইন গেট (queen gate) তালপাতা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে সমস্ত মাছি কোটরে বসে ছিল ওদের হাত দিয়ে নিয়ে এসে রুমাল তুলে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বাক্সে দিতে হবে। এসময় রাণী যদি বাক্সে প্রবেশ করে তাহলে অন্যান্য মৌমাছিরা বাক্সে ঢোকার জন্য ভীড় করতে থাকবে। তখন তালপাতা সরিয়ে নিলে সমস্ত মাছি ভিতরে প্রবেশ করবে। এই অবস্থায় বাক্সকে ঐ স্থানে একদিন রেখে দেওয়া উচিত। কুইন গেট লাগানোর ফলে রাণী বাইরে বেরোতে পারবে না। কিন্তু শ্রমিকরা তখন তাদের কাজ শুরু করে দেবে। যে সমস্ত জায়গায় ফুল বেশী তার কাছে বাক্স রেখে দিলে মধু বেশী পাওয়া যাবে। চাক পর্যবেক্ষণ কালে যদি দেখা যায় সুপার চেম্বারের ফ্রেমের চাকগুলির মুখ মোম দিয়ে এঁটে দেওয়া এবং সোনালী রঙ হয়েছে তা হলে বুঝতে হবে চাকে মধু রয়েছে। এই

অবস্থায় মধু নিষ্কাশন না করলে তারা আর মধু জমানোর জায়গা পাবে না। মধু জমা হলে সামান্য ধোয়া দিয়ে সুপার ফ্রেমটি তুলে আনতে হবে। তখন যদি তাতে কিছু মৌমাছি থাকে তাদের ব্রাশের সাহায্যে বা সামান্য ঝাঁকুনি দিলে তারা উড়ে যাবে। এখন ছুরি সামান্য গরম করে মোমের উপর ধরলে মোম গলে যাবে। তারপর ঐ চাকটিকে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রে বসিয়ে দিতে হবে। আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করি তার নাম 'টেনজেনশিয়াল এক্সট্রাকটর'। এই যন্ত্রে একবারে চারটি ফ্রেমের মধু বের করা যায়। চাকগুলিকে যন্ত্রের মধ্যে লম্বভাবে বসিয়ে যদি যন্ত্রের হাতল ঘোরানো হয় তাহলে মধু বেরিয়ে আসবে কিন্তু চাকের কোন ক্ষতি হবে না, এই চাক আবার মৌমাছিরা ব্যবহার করতে পারবে। এই যে মধু পাওয়া গেল এই মধুকে তখন না খেয়ে বিশুদ্ধ করে খাওয়া ভাল। মধুকে বিশুদ্ধ করতে হলে মধু ছেঁকে নিয়ে মধু পাত্রটিকে একটি জলপাত্রের মধ্যে রেখে 140°—150° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ দিলে মধু বিশুদ্ধ হবে এবং এই মধু অনেকদিন ভাল থাকে এবং এই মধু স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. প্রশ্ন : (ক) সম্প্রতি আমাদের অঞ্চলে কয়েকটি আলু গাছে ফুল ধরতে দেখা যায়। ক্রমশ সেগুলি গোলাকৃতি সবুজ বর্ণের ফলে রূপান্তরিত হয়। এর কারণটা কি? এই ফল থেকে কি বীজ হয়, যা দিয়ে আবার আলুর চাষ হতে পারে?

(খ) টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি দেখি সেগুলি কি ক্যামেরায় তোলা যাবে?

দেবাশীষ সাহা (বয়স 16)
কামদেবপুর, হুগলী

উত্তর : (ক) সব আলু গাছেই স্বাভাবিকভাবে ফুল ও তাথেকে ফল হওয়ার কথা। কারণ আলু হচ্ছে স-পুষ্পক গোষ্ঠীর দ্বি-বীজপত্রীয় গোত্রের সোলেনেসী পরিবারের উদ্ভিদ যার বোটানি-নাম হচ্ছে সোলেনাম টিউবারোসাম (*Solanum tuberosum*)। বেগুন, লঙ্কা, টমাটোও এই সোলেনেসী পরিবারভুক্ত। কিন্তু আলু গাছের মাটির তলায় অবস্থিত কাণ্ডের কিছু শাখা তাদের প্রান্তভাগে প্রচুর খাদ্যসম্ভার সঞ্চয় করে স্ফীত (tuber) হয়ে ওঠে। ঐ স্ফীত অংশের উপরিভাগে অনেকগুলি গর্ত সৃষ্টি হয় যাকে বলে 'চোখ', সেই চোখ থেকে আবার সহজেই নতুন কাণ্ড বা গাছ গজিয়ে আলুর বংশবিস্তার ঘটায়। তাই এদের ফল থেকে বীজ সংগ্রহ না করে ঐ স্ফীত কাণ্ডকেই বীজ হিসাবে ব্যবহার করে সহজেই আলুর চাষ করা হয়। আর ফলের বীজ থেকে গাছ তৈরি করা বেশ কষ্টকর। সব পরিবেশে তা হয়ও না। সেই বীজ

থেকে ভাল আলু হয় না, গাছও ভাল হয় না, আর ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে গেলে ততদিনে নীচের আলুগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) নিশ্চয়ই, তবে ভাল ক্যামেরা ও অভিজ্ঞতা চাই।

2. প্রশ্ন : (ক) এক হাঁড়ি ফুটন্ত জলের মধ্যে কিছু চাল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ির মুখ ভাল করে বন্ধ করে চুল্লি থেকে নামিয়ে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে এমনভাবে বন্ধ করা হল যাতে হাঁড়ির তাপ কোন মতে বাইরে বেরোতে না পারে। তাতে চাল ফুটে ভাত হবে কি?

(খ) আমাদের দেহে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে যেসব হর্মোন নিঃসৃত হয় সেই সব হর্মোন কি কি মৌল (যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, লোহা, সালফার ইত্যাদি) দিয়ে তৈরী?

(গ) হরমোন কি রক্ত থেকে পৃথক করা যায়?

(ঘ) টেস্টোস্টেরন হরমোন ও শুক্রাণু কি একই জিনিষ?

(ঙ) আমাদের দেহে হরমোন ও উৎসেচকের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব বেশী?

গোবিন্দ পাল
শ্রীপল্লী, বর্ধমান

উত্তর : (ক) সবটা নির্ভর করছে কতখানি চাল, কতটা জল এবং কতক্ষণ কাঠের বাক্সে রাখা হবে তার উপর। চালগুলি সিদ্ধ হওয়ার জন্য যে পরিমাণ তাপ দরকার, ঐ ফুটন্ত জলের সামগ্রিক তাপ সেই অনুপাতে থাকলে চালগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে হাঁড়িকে যেভাবেই বন্ধ করা হোক না কেন তা থেকে কিছু তাপ স্বাভাবিকভাবে বিকিরিত হয়ে যাবেই। সেইজন্য সময়ের গুরুত্ব অর্থাৎ বিকিরিত হয়ে যেতে যেতে যে পরিমাণ তাপ জলে থাকবে তা কতখানি চালকে সিদ্ধ করতে পারবে সেটাই বিবেচ্য। অবশ্য চাল ফুটে কথাটা ঠিক নয়, ফুটন্ত বা গরম জলে চাল সিদ্ধ হয় মাত্র, ফুটে না।

(খ) হরমোনের রাসায়নিক গঠনে সবক্ষেত্রেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এই তিন মৌল বিভিন্ন ধরণের রিং যাকে বলে হাইড্রোকার্বন রিং বা চেন ফর্মে আছে। সমস্ত স্টেরয়েড হরমোনই এই তিন মৌল দিয়ে তৈরী। নন্‌-স্টেরয়েড বৃহত্তর হরমোনগুলি মূলত প্রোটিন বা তার অংশ বিশেষ—পলিপেপটাইড্‌স্‌ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড—দিয়ে গঠিত। আর নাইট্রোজেন না হলে কোন প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিড হয় না। আবার কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডে সালফার মৌল থাকে। তাই ঐসব হরমোনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন অবশ্যই আছে, তার সঙ্গে সালফার মৌলও থাকতে পারে। এছাড়া থাইরয়েড হরমোনে আছে আইওডিন—

যেটা দিয়েই এই হরমোনের গুরুত্ব। তবে বিভিন্ন মৌলের সংযোজনই বড় কথা নয়, গঠন কাঠামোয় ঐসব মৌলের পারস্পরিক অবস্থিতি ও তাদের সামগ্রিক বিন্যাস-বৈচিত্র্যই (structural arrangement) তাদের ভিন্নতর শক্তিশালী জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়।

(গ) অবশ্যই। অধিকাংশ হরমোনই সঞ্চালিত রক্তে কমবেশী বিদ্যমান। তা থেকে তাদের পৃথক করে সংগ্রহ করা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে রক্তে এদের পরিমাণ এত কম যে প্রমাণযোগ্য হরমোন সংগ্রহ করতে হলে শরীরের বেশীর ভাগ রক্তই বের করে নিতে হবে।

(ঘ) মোটেই না। হরমোন হচ্ছে রাসায়নিক দ্রবণ, আর শুক্রাণু হচ্ছে শরীরের বিশিষ্ট কোষ (cell)—যাকে বলে জননকোষ, প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি তৈরি হয়।

(ঙ) যে যার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক উৎসেচকের উৎপত্তি ও তাদের কর্মধারা বিভিন্ন বা নির্দিষ্ট হরমোন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ঃ যে সব পদার্থে তড়িৎ-আধান সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে তাকেই পরিবাহী বলে। ধাতু এবং অ্যাসিড উভয়েই সেইমতো পরিবাহী। তবে, ধাতুর পরিবাহিতা ইলেকট্রনের জন্য, কিন্তু অ্যাসিডের পরিবাহিতা আয়নের জন্য কেন? আয়ন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্যটা কি?

স্বপন দাস
শান্তিপুর, নদীয়া।

উত্তর ঃ 'যে পদার্থে তড়িৎ-আধান সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে তাকেই পরিবাহী পদার্থ বলে'—ঠিকই, তবে ঐ-তড়িৎ আধানটি হচ্ছে ইলেকট্রন, অন্য কিছু নয়। প্রচণ্ড গতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধাবমান ইলেকট্রনই হচ্ছে বিদ্যুৎপ্রবাহ। অবশ্য এই ধাবমান কথাটিও প্রকৃত অর্থে যুক্তিযুক্ত নয়। ইলেকট্রনগুলি তখন অতিদ্রুততালে—প্রায় আলোর গতিতে—স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। একই ইলেকট্রন পরিবাহীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যায় না। পরিবাহী পদার্থের পরমাণুদের বহিঃকক্ষে অসম্পৃক্ত ইলেকট্রন থাকে—তাদের অল্পায়াসে উত্তেজিত করে স্থানচ্যুত করা যায়। সেই বিচ্যুত ইলেকট্রনগুলি সন্নিহিত পরমাণুর অনুরূপ ইলেকট্রনে আঘাত করে তাদের গতিশীল করে দেয়, তারা আবার পর্যায়ক্রমে একই কাজ করে চলে। এক পরমাণুর ইলেকট্রন পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গাটা দখল করে নেয়। অতিদ্রুত ধারাবাহিকভাবে এই কাজ চলে। ফলে সেই পদার্থের সমস্ত পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনগুলি ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড গতিপ্রাপ্ত হয়, তার পরিমাণ নির্ভর করে বৈদ্যুতিক বিভব-প্রভেদের মাত্রার উপর। ধাতুর পরমাণুতে এই অবস্থা সহজে হয় বলেই

তারা সুপরিবাহী, আর যেসব পদার্থের পরমাণুতে সহজে বিচ্ছিন্ন করার মত ইলেকট্রন থাকে না তারা সেই অনুপাতে অপরিবাহী।

এখন অ্যাসিডে পরিবাহিতা ঘটে কিছুটা অন্যভাবে। দ্রবীভূত অবস্থায় অম্ল (অ্যাসিড), ক্ষার (অ্যালক্যালী), ও লবণ (সল্ট) জাতীয় পদার্থের অণুগুলি বা মূলকগুলি (radicals) সেই দ্রবণের মধ্যে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ওদের একভাগে ধনতড়িত ও অন্যভাগে ঋণতড়িতের সমাবেশ ঘটে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে। দ্রবণের মধ্যে এইভাবে ঐ অণু বা মূলকগুলির দু-ভাগে দুই বিপরীত তড়িৎ-অধানে বিভাজিত হয়ে যাওয়াকে বলে আয়নাইজেশন। আর ওদের প্রত্যেক অংশকেই বলে আয়ন—একটি ধনায়ন, অপরটি ঋণায়ন। সমগ্র দ্রবণে ঐ ধনায়ন ও ঋণায়ন সমমাত্রায় থাকায় দ্রবণটিকে তড়িৎ-যুক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করলে ঐ দ্রবণে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসমান আয়নগুলি তাদের বিদ্যুৎধর্ম অনুসারে পরিপূর্ণরূপে দু-ভাগে পৃথক হয়ে যায়, একদিকে পজিটিভ চার্জ বা ধনায়ন, অন্যদিকে নেগেটিভ চার্জ বা ঋণায়ন। বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিশীল ইলেকট্রনগুলি এদের কাছে পৌঁছলে ধনায়নগুলি ঐ ইলেকট্রনদের ধরে নিয়ে অপরপ্রান্তে ঋণায়ণে পৌঁছে দেয়। আসলে ধনায়ন যার অপর নাম ক্যাটায়ন—তার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনের অভাব। সেইজন্যই তাদের পজিটিভ-চার্জ, তাই নেগেটিভ ইলেকট্রনদের তারা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়। আর ঋণায়ন বা অ্যানায়ন-এ ইলেকট্রনের আধিক্যই রয়েছে। এই ইলেকট্রনের কমবেশীর জন্যই তাদের বৈদ্যুতিক চার্জের তফাৎ। আর সেইজন্যই আয়নিত মাধ্যমে ইলেকট্রনের গতি ধাতুর থেকে ভিন্ন ধরণের। একইভাবে যে পরিস্থিতিতে পদার্থের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটন বিশেষ শক্তির প্রভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন প্লাজ্মা অবস্থায় বা আয়নমণ্ডলে) সেই অবস্থাকেও আয়নিত অবস্থা বলে। সেখানে ইলেকট্রনও প্রোটন প্রত্যেকেই তখন এক একটি আয়ন এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপরিবাহিতা শক্তি। এবারে নিশ্চয়ই আয়ন ও ইলেকট্রনের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্যটা বোঝা গেছে ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণুর মৌল কণা-সবসময়ই নেগেটিভ চার্জ, আর আয়ন হচ্ছে তড়িতযুক্ত পরমাণু বা পরমাণুর অংশ অথবা তড়িৎযুক্ত মূলক। এরা অবস্থা অনুসারে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জ-যুক্ত হয়।

[এই সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন পরিষদের 'হাতে-কলমে কেন্দ্রের' সত্যসুন্দর বর্মন]

নদী সংস্কার ও বন্যানিয়ন্ত্রণ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর, 1979 সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত আমার কয়েকটি নিবন্ধের উপর শ্রীদেবেশ মুখার্জি মহাশয়ের যে সমালোচনাটি ডিসেম্বর, 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :—

তিনি লিখেছেন, "বন্যায় প্লাবিত অঞ্চল সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে" কথাটি ঠিক। তাহলে 1978 সালে D. V C.-র জলাধারগুলিতে আসা সর্বোচ্চ 8.5 লক্ষ কিউসেক প্রবাহকে 1.6 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে ও দুর্গাপুরে দামোদরের অনুমিত সর্বোচ্চ 11 লক্ষ কিউসেক প্রবাহকে 3.8 লক্ষ কিউসেকে নামিয়ে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের যে দাবী করা হয় তা কি ঠিক? কিংবা যদি বলা হত যে, 1978 সালে যখন প্রায় 55 লক্ষ একরফুট জল নিম্ন-দামোদর উপত্যকাকে ধ্বংস করেছে, তখন মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলিতে রাখা সম্ভব হয়েছে, (পৃ: 136 ও পৃ: 520) তাহলে D.V.C-র বক্তব্য ও প্লাবিত অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হত কি? এছাড়া প্লাবন রোধে জলাধারগুলির সীমিত ক্ষমতার কথা মনে রেখে নদী সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন নয় কি?

দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য কিভাবে 1978 সালে বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল ও কয়লাখনি অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো হতে পারে তা 4-6 পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

শ্রীমুখার্জি দামোদরকে বাঁকুড়া জেলার সোমসার থেকে সোজাপথে বইয়ে দেওয়ার বক্তব্য মেনে নিয়ে বলেছেন যে, পরিকল্পনাটির রূপায়ণ অবাস্তব। আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীতে হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরী নামে কোন নদী ছিল না, শুধু ছিল কয়েকটি খাল— মুণ্ডেশ্বরী খাল, বেশোর খাল ও চড়চাড় খাল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বেগোর হানাপথ দিয়ে খালগুলির সঙ্গে সংযোগ ঘটে দামোদরের। ঐ খালগুলির পথ শক্তিগড় থেকে বেগোর হানা পর্যন্ত দামোদরের পথের সঙ্গে সরল হওয়ায় দামোদরের জলের পূর্বলব্ধ তীব্র গতি খালগুলির পথে সঞ্চারিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে দামোদর তার পূর্ব পথকে পরিহার করে চলেছে এবং আমাদের শত বাধা সত্ত্বেও এই বিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠছে একটি নদী - নাম তার মুণ্ডেশ্বরী। নিম্ন দামোদর মজে গেছে, কিন্তু মুণ্ডেশ্বরী সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি,—এ কারণেই দামোদর আজও দুঃখের নদ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে "কেলেঘাই-এর বাঁককে কেটে অনেক জায়গায় সোজা করা হয়েছে, খাতকে গভীরতর করা হয়েছে। ফলে কেলেঘাই-এর বন্যার প্রকোপ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।" [দ্রষ্টব্য বারোমাস, নভেম্বর, 1978 সংখ্যার 106 পৃষ্ঠায় লিখিত প্রাক্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির বক্তব্য]। এছাড়া ইউরোপে রাইন নদী ও আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর পথকে সরলায়িত ও খাতকে গভীর করায় শুধু বন্যার প্রকোপ কমেনি, শত শত মাইল নাব্য জলপথও গড়ে উঠেছে। অতএব নদীখাত সরল

কথা কোন অসম্ভব কাজ নয়। শ্রীমুখার্জি মহাশয়ের মতে কখনও নতুন তথ্য উপস্থিত হলে পরিকল্পনাগুলির হেরফের করা উচিত। তাহলে 1978 সালের লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনাগুলি অনুচিত কেন?

ফরাক্কা ব্যারাজ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ছিল যে, ব্যারাজটি হুগলী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে না, পরন্তু গঙ্গার খাত পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে একটা মহাপ্লাবন ঘটে যেতে পারে। ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি কোন যুক্তিসম্মত আলোচনা রাখেন নি, পরিবর্তে কয়েকটি অবান্তর মন্তব্য করেছেন।

পৃথিবীর সবদেশে ব্যারাজ হয়েছে জলাধারের জল বিতরণের জন্য। ব্যারাজের সাহায্যে নদীর পুনরুজ্জীবনের নজীর আছে কি? ফরাক্কা ব্যারাজের চেয়ে গঙ্গার তথা নিজেদের অস্তিত্ব আমাদের অধিকতর কাম্য। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা নিবন্ধটি নেতিবাচক কেন?

সবশেষে নদনদী-পরিকল্পনা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনাগুলি প্রকাশ করার জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিবরাম বেরা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

সুরমা সাধারণত প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ আবার চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে, জ্বালাযন্ত্রণা কমাতেও চোখে সুরমা লাগান। সুরমার প্রধান উপকরণ অ্যান্টিমনি সালফাইড। এর অভাবে এখন লেড সালফাইড সুরমা প্রস্তুতে ব্যবহার হচ্ছে। লেড বা সীসার বিষক্রিয়ার জন্য সুরমা ব্যবহারে এখন সতর্ক হতে বলা হচ্ছে। লেড ছাড়াও কোন কোন সুরমায় মেনথল বা ঐ জাতীয় কিছু থাকলেও চোখের ক্ষতি হয়।

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের গ্রাহক হইবার জন্য আবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সুবৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য : 30 টাকা

[15ই এপ্রিল, 1980 সালের মধ্যে 20 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 25 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন। পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে।]

• • •

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

লেখক – দ্বিজেশচন্দ্র রায়

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পূর্ণ-জীবনী এবং মৌলিক গবেষণাগুলির বিবরণ আছে।

মূল্য : 25 টাকা

[15ই এপ্রিল, 1980 সালের মধ্যে 15 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 20 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন। পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে।]

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

প্রকাশক :

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—700006,

ফোন 55-0660

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে। টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 10-30টা থেকে 5 টার (শনিবার 2টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করিবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 3, মার্চ, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

বৈজ্ঞানিক মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। হাতের কাছে অতি সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলির উপর তৈরী মডেল আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত সব মডেল ফেরৎ দেওয়া হবে। যোগদানের শেষ তারিখ 30 মে, 1980। কোন প্রবেশ মূল্য নাই।

প্রথম পুরস্কার 100.00 টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার 75.00 টাকা
তৃতীয় পুরস্কার 50.00 টাকা

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ মার্চ, 1980 তৃতীয় সংখ্যা

বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে

সুব্রত পাল

আন্দোলন কথাটার সাথে পরিচিত নন বর্তমানে এমন কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। গণ আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন—এসব কথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। এর সাথে নবতম সংযোজন—বিজ্ঞান আন্দোলন।

আন্দোলন শব্দটা শুনলে একসময় অনেকে আঁতকে উঠতেন, অনেকে বিরক্ত বোধ করতেন। এর কারণ বোধ করি যত না শব্দটার প্রকৃত অর্থ তার চেয়ে বেশী একটা ভ্রান্ত ধারণা। যাই হোক আজকাল অবশ্য আমাদের সেই অনীহা অনেকটা কেটে গেছে। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দটার ব্যবহার একটা হাল ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেছে।

ইংরেজীতে যাকে বলে 'মুভমেণ্ট' সেই আন্দোলন শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোড়ন। দ্বিতীয় শব্দটা প্রয়োগে অবশ্য অর্থের অস্পষ্টতা আরো বেড়ে যায়। আসলে আন্দোলন শব্দটার প্রচলন ও পরিচিতি এতই ব্যাপক যে এর আভিধানিক অর্থ সন্ধান অথবা ব্যুৎপত্তি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।

ফিরে আসা যাক মূল জায়গায় বিজ্ঞান আন্দোলন ব্যাপারটা কি? নাট্য আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলনের তুলনায় বিজ্ঞান আন্দোলন কথাটার ব্যাপ্তি অবশ্য যথেষ্ট সীমিত। আর সীমিত বলেই বোধ হয় এ সম্বন্ধে নানারকম ধারণা জনমানসে চালু আছে। তার মানে আদৌ এই নয় যে নাট্য আন্দোলন বা শিক্ষা আন্দোলন সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পুরোপুরি স্বচ্ছ।

কেউ কেউ বিজ্ঞান আন্দোলন বলতে বোঝেন নিছক বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'পপুলারাইজেশন অফ সায়েন্স'। কারো কারো মতে বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত

ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার প্রসার ঘটানো। আবার একদল পছন্দ করেন প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে—স্থানীয় প্রাকৃতিক ও জনসম্পদকে কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে যুক্ত করা যায় সেটাই তাদের চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তু। এ সকল কাজকর্মের সাথে অনেকে যুক্ত আন্তরিকতার সাথে, কেউ কেউ আবার নিছক ফ্যাশানে। এরই মধ্যে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ছোট বড় সংস্থা বা গ্রুপ যাদের কর্মসূচী রচিত হয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলনের এক বা একাধিক দিকের ওপর ভিত্তি করে। এ সংস্থাগুলোর সদস্যদের অনেকেরই কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যথেষ্ট সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা—যদিও অধিকাংশই গড়ে উঠেছে এবং টিকে আছে কিছু আবেগ পরিচালিত কর্মীর স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে।

সচেতন হোক বা স্বতঃস্ফূর্ত হোক, কার্যপদ্ধতির যতই ভিন্নতা হোক একটা জিনিস বোধ হয় এরা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন বা অন্ততঃ পেরেছেন বলে দাবী করেন যে বিজ্ঞান পরিচালিত হওয়া উচিত প্রকৃতভাবে 'জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা ও জনসাধারণের প্রতি'। এই প্রতিশ্রুতি নিয়েই তো জন্ম হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞানের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে পৌঁছে আমরা আবিষ্কার করছি যে বিজ্ঞান পরিচালিত হচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির জন্য, জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং প্রায়শঃই জনসাধারণের বিপক্ষে। মনে পড়ে যায় বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের 'গ্যালিলিওর জীবন' নাটকে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে গ্যালিলিওর সতর্কবাণী—'যদি ক্ষমতায় আসীন স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ভয়ে বিজ্ঞানীরা নিছক জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান সঞ্চয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, তবে বিজ্ঞান পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এবং তোমাদের নতুন যন্ত্র আর কিছুই নয় শোষণের নতুন হাতিয়ারে পরিণত হবে। সময়ের সাথে সাথে যা আবিষ্কার করার কথা তা অবশ্য তোমরা আবিষ্কার করবে কিন্তু তোমাদের প্রগতি মানব জাতি থেকে দূরে সরে যাবে। তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একদিন এত বেশী ব্যবধান হয়ে যাবে যে কোন নতুন কীর্তির ওপর তোমাদের উল্লাস এক সার্বজনীন আতঙ্কের চীৎকারে প্রতিধ্বনিত হবে'।

এই সার্বজনীন আর্তনাদে সাড়া দিয়েছিলেন তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বেশ কিছু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। দলে দলে তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন তাদের 'গজদন্ত মিনার' ছেড়ে, গড়ে তুলেছিলেন এক আন্দোলন যা Social Relations of Science movement বা 'বিজ্ঞানের সামাজিক সম্পর্ক আন্দোলন' নামে বিখ্যাত। এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন জে, ডি, বার্নাল, পি, এম, এস, ব্ল্যাকেট, জে, বি, এস, হ্যালডেন, জুলিয়ান হাক্সলে, প্রমুখ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী।

দেরীতে হলেও আনন্দের কথা যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের একাংশের মধ্যেও উপলব্ধি ও আত্মউপলব্ধির এক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। জনজীবন থেকে দূরে নিভৃত বিজ্ঞান মন্দিরের চার দেয়ালের মধ্যে বসে বিজ্ঞান আরাধনা আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। গোটা সমাজটার সাথে সাথে গবেষণা মন্দিরও উঠছে কেঁপে কেঁপে—পূজারীর ধ্যান ভঙ্গ হচ্ছে বারবার। সে বেরিয়ে এসে দেখছে যে মহাকালের রথের দড়ি যাদের টানবার কথা তার কেউই আর তার কাছাকাছি নেই। থাকবেই বা কেন? কি দিয়েছে তাদের বিজ্ঞান? মিটিয়েছে কি তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সমস্যা? তাই বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আশংকাজনকভাবে সীমিত। বরং যুগ যুগ ধরে বয়ে আনা কুসংস্কার ও বিজ্ঞান-বিরোধী অবক্ষয়ী আচার-আচরণ ও ধ্যানধারণা জাতির প্রগতির পথে পদে-পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কথায় আছে একেবারে না হওয়ার চাইতে দেরীতে হওয়াও ভাল। তাই এগিয়ে এসেছেন বেশ কিছু সুখ্যাত, অল্পখ্যাত এবং খ্যাতিবঞ্চিত বিজ্ঞানী। তাঁদের পাশাপাশি

এসে দাঁড়িয়েছেন বহু স্বেচ্ছাকর্মী। মানুষ ও বিজ্ঞান—এ দুয়ের মধ্যে সেতুবন্ধনের জন্য শুরু হয়েছে এক কর্মযজ্ঞ যার নাম বিজ্ঞান আন্দোলন। যদিও এখন তার শৈশবাবস্থা তবে প্রতিশ্রুতি বিরাট।

বিজ্ঞান আন্দোলন সম্বন্ধে এখনও কোন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপিত হয় নি। অবশ্য নিছক একটা ছকবাঁধা সংজ্ঞার কতটা প্রয়োজন সেটা নিয়ে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। বরং এর বিভিন্ন দিক ও সম্ভাবনার ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত বোধ হয় অনেক বেশী ফলপ্রসূ হবে। বিজ্ঞান আন্দোলনকে মূলতঃ তিনটে দিকে ভাগ করা যায়—বিজ্ঞানের 'জনপ্রিয়করণ', জাতীয় বিজ্ঞান নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি এবং বিজ্ঞান কর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোর সংরক্ষণ ও প্রসার।

প্রথমে ধরা যাক বিজ্ঞানের 'জনপ্রিয়করণ'। কথাটা এখানে অবশ্য ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বগুলোকে সহজ ভাষায় প্রচার করার মধ্যেই এর অর্থ নিঃশেষিত হয়ে যায় না। মূল কথা হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মকাণ্ডে দেশের ব্যাপক জনসমষ্টিকে জড়িত করা। বিজ্ঞান আন্দোলনের নিঃসন্দেহে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিয়ে যেতে হবে আপামর জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের আলোক-বর্তিকা, দূর করতে হবে তাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার। বিজ্ঞানকে যুক্ত করতে হবে তাদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মের সাথে। কেবল বিজ্ঞানের তথ্য বিতরণ নয়, বিজ্ঞানকে করে তুলতে হবে তাদের জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ—জীবনধারণের পদ্ধতি। একথা আজ অনস্বীকার্য যে ব্যাপক জনসাধারণের সচেতন ও সক্রিয় সহযোগিতা এবং উদ্যোগ ছাড়া বিজ্ঞানের পক্ষে এক পা'ও এগোন সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের সন্দেহের পরিবর্তে আগ্রহ সঞ্চার করা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত বিজ্ঞানকর্মীদের এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। বিজ্ঞান গবেষণাকে করে তুলতে হবে জনমুখী। স্থানীয় চাহিদার সাথে সংহতি রেখে, স্থানীয় সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এবং গ্রাম শহরের অসংখ্য চাষী-মজুর কারিগরদের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এবং তাদের সমৃদ্ধ করে বিকশিত হতে পারে গবেষণাগারের বিজ্ঞান। এর অর্থ আদৌ প্রতিষ্ঠানগত গবেষণার মান নামিয়ে আনা নয় বরং তার ভিত্তি দৃঢ় ও প্রশস্ত করা। ভিত্তি মজবুত না হলে ইমারতের উচ্চতাও কি বাড়ানো সম্ভব?

দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞান নীতির প্রশ্ন। বিজ্ঞানী বা স্বেচ্ছাকর্মীদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক বা প্রচেষ্টা যতই আন্তরিক হোক না কেন বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করা যাবে না যদি না জাতীয় স্তরে বিজ্ঞান নীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। দুর্ভাগ্য যে আমাদের দেশে এখনও একটা সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত বিজ্ঞান নীতির প্রণয়ন হয় নি। ক্ষেত্রভিত্তিক যে সকল আংশিক নীতি ও কর্মসূচীগুলো গৃহীত হয় সেগুলোও নির্ধারিত হয় উচ্চতম স্তরের মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্তাব্যক্তির দ্বারা। বিজ্ঞানের জাতীয় ও আঞ্চলিক নীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এমনকি ব্যাপক বিজ্ঞানী সমাজেরও কোন ভূমিকা থাকে না।

বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরেও একই অবস্থা। সেখানে কি প্রশাসনিক, কি অ্যাকাডেমিক—সমস্ত ব্যাপারেই অধিকাংশ বিজ্ঞান কর্মীদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। জনাকয়েক ব্যক্তিই এসকল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অনেক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে নিয়োগকর্তা ও কর্মীর (সর্বোচ্চ স্তরের কর্মী বা বিজ্ঞানী পর্যন্ত) মধ্যে কার্যতঃ এক 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক বিরাজমান। স্বভাবতঃই 'ভৃত্যের' পক্ষে গবেষণার নীতি নির্ধারণে নাক গলানো প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কর্তাব্যক্তিদের রোষানলে পড়লে চাকরীটাও

যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার আইনের আশ্রয় নেবারও অধিকার নেই।

পাঠক নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছেন যে বিজ্ঞান আন্দোলনের এ-তিনটে দিকই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যাপক বিজ্ঞানকর্মীদের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার যদি সুরক্ষিত না হয় তবে তাঁরা কোন্ সাহসে এক জনস্বার্থবাদী বিজ্ঞাননীতির দাবীতে আন্দোলন গড়ে তুলবেন বা বিজ্ঞান গবেষণাকে জনমুখী রূপ দেবার জন্য এগিয়ে আসবেন? আবার বিজ্ঞানকর্মীদের গণতান্ত্রিক অধিকার বা জনমুখী বিজ্ঞান নীতির আন্দোলন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া সাফল্য লাভ করতে পারে না। এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে যদি তাদের জীবনে বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা যায়।

অন্যদিকে বিজ্ঞান আন্দোলনকে এক অখণ্ড সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে না দেখাটা হবে এক মারাত্মক ত্রুটি। সামাজিক আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সাথে যুক্ত না করতে পারলে বিজ্ঞান আন্দোলনের সাফল্যের সম্ভাবনা অনিবার্যভাবেই যাবে কমে—এ-শিক্ষাতো আমরা বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকেই পেয়েছি। আবার বিজ্ঞান আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসার সার্বিক সামাজিক আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করবে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান আন্দোলনের অগ্রদূত কেরলার শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের একটি শ্লোগান—'সামাজিক বিপ্লবের জন্য বিজ্ঞান'। আমরা আপাততঃ বিপ্লবের পরিবর্তে আন্দোলন শব্দটা ব্যবহার করে বলতে পারি—'সামাজিক আন্দোলনের জন্য বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের জন্য সামাজিক আন্দোলন।'

বিশেষ নিবন্ধ

মেঘনাদ সাহা ও সোভিয়েত বিজ্ঞান*

আলেকজান্দর খারকভ্‌স্কি

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিখ্যাত 'জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নভশ্চারণবিদ্যা', আকর গ্রন্থে মেঘনাদ সাহা (1893-1956) সম্পর্কে বলা হয়েছে, "ভারতীয় জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী যিনি উচ্চ তাপমাত্রায় গ্যাস আয়নীভবনের এক নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন এবং এই তত্ত্বটিকে নক্ষত্রের আবহমণ্ডল পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োগ করেন। সাহা তত্ত্ব···হয়ে উঠেছে জ্যোতি-র্পদার্থবিদ্যার আধুনিক পদ্ধতির প্রধান নির্ভর।"

মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন, প্রায়ই আসতেন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং সোভিয়েত সহযোগীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ পত্র-বিনিময় করতেন। সম্প্রতি তাঁর অনুগামী সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী এদ্‌ভার্দ কোনোনোভিচের রচনায় তাঁর রচনার প্রতিফলন ঘটেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির ক্রিমিয়ার মানমন্দিরে তাঁর সৌর পর্যবেক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে গিয়ে আকাদেমিসিয়ান আন্দ্রেই সেভেরনি একটি কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কারের কথা বলেন: আমাদের এই নক্ষত্রের (অর্থাৎ, সূর্যের) উপরিতল সামান্য স্ফীত হয়, তারপরে অবনমিত হয়, এবং প্রতি 160 মিনিটে এমনি স্পন্দিত হয়ে চলে। নিরীক্ষণ করে দেখা গিয়েছে, স্পন্দনমানতা হচ্ছে অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর বৈশিষ্ট্য, যে-সব বস্তুর গভীর দেশে চাপ অতি-প্রচণ্ড নয় যেমনটি আগে আশা করা গিয়েছিল

এই আবিষ্কারের অর্থ দাঁড়ায় এই যে হাইড্রোজেন বোমার শিখার মতো কোনো তাপ-নিউক্লিয়ার শিখা সূর্যের গভীর অভ্যন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে নেই। বিজ্ঞানীরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই অর্থ যদি ধরতে হয় তাহলে একথা ঠিক যে বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়ে। এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞ আকাদেমিসিয়ান ভিক্তর আমবার্তসুমিয়ান বলেন, "এখন তাহলে বলতে পারি, সূর্য কেন আলো দেয় তা আমরা জানি না।"

এই আবিষ্কারের ফলে যে প্রচণ্ড আঘাত তৈরি হল তা কয়েক বছরেও কাটানো গেল না। ব্যাপারটা বোঝা যায়। কেননা, সূর্য কেন কিরণ দেয় তাই যদি অজানা থাকে তাহলে তো বিশ্বের গড়ন সম্পর্কে কোন ধারণাই করা চলে না। সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করলে জানা যায় নিয়ন্ত্রিত তাপ-নিউক্লিয়র ক্রিয়ার রহস্য। আর এই রহস্য জানা হয়ে গেলে সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণু একীভূত করে শক্তি লাভ করার ব্যাপারে সহায়তা হতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মেঘনাদ সাহার ছাত্ররা এই সমস্যা নিয়ে কাজে লাগলেন। নক্ষত্রের আবহমণ্ডল সম্পর্কিত মেঘনাদ সাহার তত্ত্ব প্রয়োগ করে মস্কোর জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী এদ্‌ভার্দ কোনোনোভিচ প্রমাণ করেছেন, স্ফীত হচ্ছে সূর্য নয়, তার আবহমণ্ডল। তার মানে, সূর্যের গভীরে তাপ-নিউক্লিয়ার ক্রিয়া অবশ্যই ঘটতে পারে। দহনের

*কলকাতার রুশ দূতাবাসের তথ্যবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'Science & Engineering'-এর খণ্ড 14, সংখ্যা 91 (10 ডিসেম্বর, 1979) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

সমস্যা নিয়ে নতুন এই বিচার বহু বিজ্ঞানীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার নাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক পত্রপত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে।

রুশদেশের বিজয়মণ্ডিত মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সে-দেশের মানুষ স্বদেশী বিদেশী নির্বিশেষে সকল শোষকের হাত থেকে এবং কুসংস্কারের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছিল—এই দেশ সম্পর্কে তরুণ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আগ্রহী হয়েছিলেন। সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী এ ইওফ-এর সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং পরে এ ইওফ্-এর কাছে তিনি চিঠি লিখতেন। পরবর্তী কালে এ ইওফ্ ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সহ-সভাপতি এবং ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমির বিদেশী সদস্য।

ইওফ্ তাঁর 'আমার দেখা পদার্থবিজ্ঞানীরা' বইয়ে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে সাহার প্রথম দেখা হয় বার্লিনে (1922 সালে)। তিনি তখন অতি তরুণ ও প্রতিভাবান পদার্থবিজ্ঞানী। সেটা এমন এক সময় যখন ভারতের ওপরে পূর্ণ আধিপত্য ছিল ব্রিটিশদের। সাহা ছিলেন একাগ্র দেশভক্ত। সাহা আমাকে বলেছিলেন, যখন তিনি মাধ্যমিক ইস্কুলে পড়তেন সেই সময়েই তিনি ও তাঁর দশ বারোজন সহপাঠী অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে স্বদেশের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য করবেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তাঁরা লেখাপড়া করবেন এবং উচ্চশিক্ষার এমন এক মান অর্জন করবেন যে পরবর্তীকালে উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে ও বিজ্ঞানে ব্রিটিশদের স্থান তাঁরা নিতে পারবেন। সেই বয়সে নির্ধারিত এই লক্ষ্যে নিবদ্ধ থাকা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোনো পথ ছিল না। ই লক্ষ্য অর্জনে মেঘনাদ সাহা সবচেয়ে চমৎকারভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন নক্ষত্রের বিকিরণ নিয়ে অনুসন্ধানে এবং নক্ষত্রের তাপগতিবিদ্যা নিয়ে বিশদীকরণের কৃতিত্বে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির 200তম জুবিলী উৎসবে যোগ দেবার জন্য 1925 সালে মেঘনাদ সাহা সোভিয়েত ইউনিয়নে এসেছিলেন। ভারত থেকে আরও যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক মোদি ও ভাবী নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সি. ভি. রামন। তরুণ বিজ্ঞানী অবাক হয়ে দেখেছিলেন, যে-দেশ তখনো দু-দুটি যুদ্ধের আঘাত (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধ) কাটিয়ে উঠতে পারে নি সেই দেশে বিজ্ঞানের প্রতি কী প্রচুর আগ্রহ। লেনিনগ্রাদের কাছে পুলকোভো মানমন্দির তিনি পরিদর্শন করেন এবং সেখানে অধ্যাপক এ. মিখাইলভের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়।

লেনিনগ্রাদে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আরও একজন বিজ্ঞানীর আলাপ হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন মহান রুশ বিজ্ঞানী পি. লেবেদেভের ছাত্র, যিনি পরীক্ষাকার্য চালিয়ে প্রমাণ করেছিলেন বস্তুর ওপরে আলো চাপ সৃষ্টি করে। রুশ পদার্থবিজ্ঞানীর এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে 1918 সালে মেঘনাদ সাহা আলোর চাপ বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ দিয়েছেন যে যুক্তিসঙ্গতভাবেই তিনি লেবেদেভের অনুগামী হিসেবে গণ্য হতে পারেন।

কিন্তু মেঘনাদ সাহার সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নতুন সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানের স্থপতি এবং লেনিনগ্রাদের পদার্থবিদ্যা-কারিগরী ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা "পিতা ইওফ্"-এর সঙ্গে। ভারতীয় বিজ্ঞানী এই ঘটনা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একই গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে তত্ত্বমূলক সমস্যা নিয়ে কাজ হচ্ছে এবং লব্ধ ফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ ইওফ্ ছিলেন তৎকালের একজন সর্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানী। তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেই সোভিয়েত পরমাণু-বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ। এ ইওফ্ ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মেঘনাদ সাহা দীর্ঘকাল ধরে

যুক্ত ছিলেন এবং তার ফলেই উপলব্ধি করেন যে নিউক্লিয়াস নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব কতখানি এবং শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতখানি। 1951 সালে কলকাতায় ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ স্থাপন করার সময়ে মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন, ভারতের মাটিতে তিনি সোভিয়েত সহযোগীদের ধ্যানধারণা স্থাপন করছেন।

1945 সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার অল্প কিছুকাল পরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির 220তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য একটি ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা হয়ে মেঘনাদ সাহা মস্কোতে এসেছিলেন। মধ্যবর্তী সময়কালে বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।

মেঘনাদ সাহা হয়ে উঠলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী, লাভ করলেন ব্রিটিশ রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ, গ্রহণ করলেন কলকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা, 1951 সালে নির্বাচিত হলেন ভারতীয় সংসদে।

মস্কোতে পুনরায় তাঁর সঙ্গে এ-ইওফ্-এর দেখা হল। তিনি তাঁকে বললেন পরমাণু-শক্তি বিষয়ে তাঁর গবেষণা ও অনুরাগের কথা। তখনো তাঁদের স্মৃতিতে অম্লান হয়েছিল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ওপরে আমেরিকান বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। অধ্যাপক আই. কুরচাতভ এই সময়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন পরমাণুকে পূরণ করতে হবে শান্তির স্বার্থ এবং তিনি শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বৈদ্যুতিক পাওয়ার ষ্টেশনের স্বপ্ন দেখেন। মেঘনাদ সাহা বললেন, স্বাধীন ভারতের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির মূল্য হবে বিরাট এবং এই শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারত বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলবে।

কয়েক বছর পরে কলকাতায় ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স্ স্থাপিত হল। মেঘনাদ সাহা হলেন তার অবৈতনিক অধ্যক্ষ। বর্তমানে এই ইনস্টিটিউটের নামের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার নাম যুক্ত। আর মস্কোতে রয়েছে আই ভি কুরচাতভ প্রতিষ্ঠিত ও তাঁর নামাংকিত ইনষ্টিটিউট অব অ্যাটমিক এনার্জি। বর্তমানে ভারতীয় ও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাঁদের জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করে চলেছেন।

দধীচির হাড়

অরুণকুমার ঘোষ*

[বজ্রপাত 'দেবতার রোষ' নয়, বিরাট আকারের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ মাত্র। মেঘে বিদ্যুতের উদ্ভব কীভাবে হয়, বজ্রপাতের বিভিন্ন পর্যায় কী, বজ্রপাতের হাত থেকে আত্মরক্ষার সাধারণ সতর্কতাগুলি কী ও বজ্রপাতেরও কেন প্রয়োজন আছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

পৌরাণিক গল্পে আছে, বৃত্রাসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ দেবকুল দধীচি মুনির কাছে প্রার্থনা করলেন, তিনি যদি দেহটা দান করেন, তবে তাঁর তপস্যাক্লিষ্ট দেহের হাড় থেকে বজ্র নামে এক মারণাস্ত্র তৈরি করে বৃত্রের বিনাশ করা যায়। দধীচি মানব তথা দেবকুলের কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করলেন। তাঁর হাড় থেকে বিশ্বকর্মা বজ্র নামক অস্ত্র তৈরি করলেন এবং তারপর যা হবার তা হল।

গ্রীসদেশের পুরাণেও এইরকম একটা গল্প আছে। হেফায়েস্টাস নামে তাদের এক ক্ষমতাশালী দেবতা নিজের কামারশালায় বজ্রাস্ত্র তৈরি করেন। পরে দেবরাজ জিউস এই অস্ত্রে তাঁর শত্রুদের বিনাশ করেন।

শুধু ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণে নয়, রোমান, মিশরীয় জাপানী, চীনা, তিব্বতীয় প্রভৃতি নানা পুরাণে এই ধরণের গল্প আছে। বজ্রপাত ব্যাপারটা অনেকদিন ধরে অনেক দেশেই 'দেবতার রোষ' বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। অবশ্য বজ্রপাতের সময় যেরকম চোখধাঁধানো আলো ও কানফাটানো শব্দের উৎপত্তি হয়, তাতে প্রাচীন মানুষের এরকম একটা ধারণা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর প্রাচীন মানুষের কথাই বা বলি কেন, এখনও শিক্ষার আলোক যেখানে পড়ে নি সেইসব মানুষের জগতে এই ধরণের বিশ্বাসের সাক্ষাৎ মেলে। অথচ, প্রায় দু-হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ 'দেবতার রোষ' নামক ব্যাপারটা সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। লুক্রেটিয়াস কাব্য করে যে-সব মজার মজার কথা বলেছিলেন, তাতে এই মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, দেবতারা যদি শত্রুই বধ করতে চাইবেন, তবে অধিকাংশ সময়েই এই মারণাস্ত্র জনমানবশূন্য মরুভূমিতে, সাগরের জলে বা উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় ছুঁড়ে মারবেন কেন? আকাশে মেঘ করলেই কি দেবতাদের যত রোষের প্রকোপ হয়? আর তাঁরা কি এতই বোকা যে রাগের মাথায় নিজেদের মন্দিরে বজ্র ছুঁড়ে মারবেন?

মানুষ যেদিন থেকে বিদ্যুতের ব্যবহার জেনেছে

* নেহরু বিজ্ঞান কেন্দ্র, ই. মোজেস রোড, ওরলি, বম্বে 400 018

প্রায় সেদিন থেকেই জানে বজ্রপতন বিরাট আকারের বিদ্যুৎ-মোক্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। অনেকদিন আগে, পলাশীর যুদ্ধেরও পাঁচ বছর আগে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী এক বিপজ্জনক পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন যে পরীক্ষাগারে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, বজ্র সেই জিনিসই। হন নি। পরবর্তীকালে ইয়োরোপে রিচম্যান এই পরীক্ষা করতে গিয়ে পরীক্ষার ফলাফল বলার জন্য আর বেঁচে থাকেন নি।

ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল বজ্রপাত বিরাট আকারের বিদ্যুৎমোক্ষণ। কিন্তু প্রশ্ন, মেঘে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানী

চিত্র-1: হাওয়ার ঊর্ধ্বগমন ও নিম্নাবতরণ—বজ্রমেঘের সৃষ্টি

এক প্রচণ্ড বজ্রপাতের দিনে তিনি রেশমি কাপড়ের তৈরী একটা ঘুড়ি ওড়ালেন। ঘুড়িতে বাঁধা একটা তার—তারের প্রান্তে বাঁধা সাধারণ সুতো। এই সুতো যেখানে মাটির কাছে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা লোহার চাবি বাঁধা। চাবির ফুটোর অন্যপ্রান্তে রেশমি ফিতে বাঁধা। উদ্দেশ্য, বিদ্যুৎ তার থেকে জলে-ভেজা সাধারণ সুতো বেয়ে চাবি পর্যন্ত নেমে আসবে এবং চাবিটা লীডেন জারের চাকৃতিতে ঠেকিয়ে ফ্রাঙ্কলিন বিদ্যুৎ জমা করে রাখবেন। তিনি রেশমি ফিতে ধরে থাকবেন। রেশম বিদ্যুতের কুপরিবাহী, সুতরাং তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবেন না। সৌভাগ্যক্রমে, ফ্রাঙ্কলিন চালার নিচে ছিলেন, তাই রেশমি ফিতেটা ভিজে যায় নি এবং তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কুল বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন ও ঘামাচ্ছেন। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। কিন্তু সদুত্তর এখনও মেলে নি।

একদল বিজ্ঞানী—অবশ্য তাঁরাই দলে ভারি—মনে করেন, মেঘে যে বিদ্যুতের উদ্ভব হয় তার মূল কারণ হল মেঘের মধ্যে শিলাখণ্ড ও শিলাকণার সংঘর্ষ। শিলা বলতে আমরা বরফ বোঝাচ্ছি।

সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনও অংশ অতিরিক্ত গরম হলে সেখানকার গরম হাওয়া ওপরে উঠতে থাকে। গরম হাওয়ার সঙ্গে যথেষ্ট জলীয় বাষ্প ওপরে ওঠে। অনেক উঁচুতে উঠলে—সেখানে তাপমাত্রা কম বলেও বটে, আবার হঠাৎ ছড়িয়ে পড়ার জন্যও বটে—গরম হাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে।

হাওয়া যত ঠাণ্ডা হয়, তত তার জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা কমে যায়। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার উৎপত্তি হয়। এইসব জলকণা দল বেঁধে মেঘের চেহারা নেয়।

সাধারণ অবস্থায় 0° সে. তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়। কিন্তু কোনও কোনও অবস্থায় – 40° সে. তাপমাত্রা পর্যন্ত জল জলই থাকে। এটাকে বলে জলের "অতি শীতল" (supercooled) অবস্থা।

হাওয়ার সঙ্গে জলকণা অনেক ওপরে উঠতে উঠতে এমন উচ্চতায় পৌঁছয় যেখানে তাপমাত্রা –40° সে. বা তার নিচে। তখন জলকণা শিলাকণায় রূপান্তরিত হতে থাকে (চিত্র-1)। ক্রমে কয়েকটা শিলাকণা জুড়ে এক একটা শিলাখণ্ড হয়। শিলাখণ্ড ওজনে ভারি। তাই সেগুলি নিচের দিকে নামতে থাকে।

চিত্র-2 : মেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের তাপবিদ্যুতীয় তত্ত্ব।

এরপর কীভাবে বিদ্যুৎ-উৎপাদন হয়, সে ব্যাপারে দুটি মত আছে। প্রথম মতানুসারে, নিম্নগামী শিলাখণ্ডগুলি অতি-শীতল জলকণা সংস্পর্শে আসে (চিত্র-2)। অতিশীতল জলকণা শিলাখণ্ডের ওপর জমা হয় এবং ক্রমে বরফে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই সময় তারা যে লীনতাপ ত্যাগ করে তার ফলে শিলাখণ্ডের উপরিতলের তাপমাত্রা সামান্য বেড়ে যায়। এই নিম্নগামী কবোষ্ণ শিলাখণ্ডের সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী শীতল শিলাকণার সংস্পর্শেই সম্ভবতঃ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

কোনও কোনও ধাতুর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন তাপমাত্রায় রাখে দিলে ঐ ধাতুর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটাকে বলে তাপবিদ্যুৎ বা থার্মো-ইলেকট্রিসিটি (thermo = তাপমাত্রা, electricity = বিদ্যুৎ বা তড়িৎ), বস্তুটাকে বলে থার্মোইলেকট্রিক বস্তু। বরফও থার্মোইলেকট্রিক বস্তু। তাই কবোষ্ণ শিলাখণ্ড ও শীতল শিলাকণার সংস্পর্শে তড়িতের উদ্ভব সম্ভব।

চিত্র-3 : খোলা জায়গায় দাঁড়ানো মানুষের চারপাশে বৈদ্যুতিক সমবিভব তলের আকৃতি।

দ্বিতীয় মতানুসারে, তাপবিদ্যুৎ নয়, আবিষ্ট বিদ্যুৎই মূল কারণ। পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রতি মিটার উচ্চতায় গড়ে প্রায় 100 ভোল্ট বিভবভেদ আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিভবভেদ হেতু আমরা অহরহ শক্ খাই না কেন? তার কারণ চিত্র-3-এ দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বিভবভেদের কারণ কী? এত বিদ্যুৎ কোথা থেকে আসছে? উত্তর হল, এই বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের উৎপত্তির কারণ, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ঝঞ্ঝা। দিনে সারা পৃথিবীতে

প্রায় 40,000 বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হয়, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 100 বিদ্যুৎ চমকায়। আমাদের দেশে যখন রাত এগারোটা তখন এই বিদ্যুতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হয়।

চিত্র-4 : মেঘে বিদ্যুৎ-সঞ্চারের আবিষ্ট-বিদ্যুতীয় তত্ত্ব।

এই বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের প্রভাবে শিলাকণায় ধনতড়িৎ ও শিলাখণ্ডে ঋণতড়িতের সঞ্চার কীভাবে হতে পারে চিত্র-4-এ তা দেখানো হয়েছে। সংস্পর্শের আগে শিলাখণ্ড ও শিলাকণায় আবিষ্ট তড়িতের উদ্ভব হয়। সংস্পর্শের সময় শিলাখণ্ডের ধনতড়িৎ ও শিলাকণার ঋণতড়িতে কাটাকুটি হয়ে পড়ে থাকে শিলাখণ্ডে ঋণতড়িৎ ও শিলাকণায় ধনতড়িৎ।

ঋণতড়িৎ-যুক্ত শিলাখণ্ডগুলি আরও নিচে নেমে এসে গলে আবার জলকণায় রূপান্তরিত হয়, আর ধনতড়িৎ-যুক্ত শিলাকণাগুলি ওপর দিকে জমা হতে থাকে। এই ধরণের একটা ব্যাপার প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চললেই মেঘে প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের সঞ্চার হওয়া

দেখা গেছে, এই সময় মেঘের একেবারে নিচের স্তরে কিছু ধনতড়িতের উৎপত্তি হয় (চিত্র-5ক)। এই ধনতড়িতের উৎপত্তি যে ঠিক কীভাবে হয় তার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা এখনও মেলে নি। সে যাই হোক, এই ধনতড়িৎ অঞ্চল থেকে ওপরের ঋণতড়িৎ

চিত্র 5 : ক—মেঘে তড়িতের সজ্জা, খ—দিশারী মোক্ষণ, গ—চ—চালকের ধাপে ধাপে অবতরণ।

অঞ্চলে একটা ক্ষীণ বিদ্যুৎ-মোক্ষণ—দিশারী-মোক্ষণ (pilot discharge)—হলেই বজ্রপাত ব্যাপারটা শুরু হয়ে যায় (চিত্র 5খ)। ওপরের ঋণতড়িৎ এই বিদ্যুৎ-মোক্ষণের পথে নিচে নামতে থাকে (চিত্র 5গ) এবং নিচের সমস্ত ধনতড়িৎকে নিস্তেজ করেই ক্ষান্ত হয় না, আহিত বিপরীত তড়িতে আকৃষ্ট হয়ে ধাপে ধাপে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে (চিত্র 5ঘ—চ)। হয়। ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে আহিত-বিদ্যুতের উদ্ভব হয়। তড়িৎ-সম্পন্ন বস্তুর সূচালো অংশে তড়িতের ঘনত্ব বেশি। চালকের কাছে গাছপালা, লম্বা উঁচু বাড়ি, কারখানার চিম্‌নি অথবা খোলামাঠে দাঁড়ানো লোক সূচালো বস্তুর মত। এইসব সূচালো বস্তু থেকে আবিষ্ট ধনতড়িতের প্রবাহ ওপরদিকে উঠে চালককে পথ দেখিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে ডেকে আনে (চিত্র 6খ)।

চিত্র-6 : ক—চালকের শেষ পাদ, খ—আবিষ্ট ধনতড়িতের ঊর্ধ্বপ্রবাহের শুরু। গ—ঙ—বিপরীত প্রবাহ ও শব্দ-সৃষ্টি।

বজ্র একেবারে সোজা নেমে আসে না। পৃথিবীপৃষ্ঠের বিদ্যুৎ-বলক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেন পথ খুঁজে খুঁজে নামে। তাই তার রাস্তা আঁকাবাঁকা, কুটিল, সর্পিল।

দিশারী মোক্ষণ বেশ ক্ষীণ। সাধারণত এর ব্যাস প্রায় 5 মিটার। গতি সেকেণ্ডে প্রায় 150 কিলোমিটার। প্রায় 30 মিটার নিচে নেমে এলে হঠাৎ এর উজ্জ্বলতা বেড়ে যায়। এই সময়ে ঋণতড়িৎকণার যে নিম্নমুখী প্রবাহ হয় তাকে বলে চালক (leader)। চালক প্রায় 1/100 সেকেণ্ডের মধ্যে ধাপে ধাপে মাটির কাছাকাছি এসে পৌঁছয় (চিত্র-6ক)। তখন পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটতম তল ও চালকের মধ্যে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ-প্রভবভেদের সৃষ্টি

ঠিক তারপরই এই বিদ্যুৎ-মোক্ষণের পথ ধরে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎকণার প্রবাহ আলোর প্রায় $\frac{1}{8}$ গতিতে মেঘের দিকে উঠে যায় (চিত্র-6 গ—ঙ)। এর নাম বিপরীতপ্রবাহ বা প্রত্যাবৃত্ত-ঘা (return stroke)। এই সময় প্রায় একলক্ষ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয়। বিপরীত-প্রবাহ ভীষণ উজ্জ্বল। এটাই আমরা বজ্রপাত হিসাবে দেখে থাকি। মেঘের যে-অংশ থেকে প্রথম ঋণতড়িৎ-প্রবাহ শুরু হয়েছিল, সেই অংশের সমস্ত বিদ্যুৎ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত বিপরীত-প্রবাহ চলতে থাকে।

প্রায় $\frac{1}{20}$ সেকেণ্ড পরে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। হয়ত এবার ঘটনার শুরু হয় মেঘের

আরও ওপরের স্তর থেকে। আবার প্রথমে ক্ষীণ দিশারী-মোক্ষণ। তারপর চালক, তারপর বিপরীত-প্রবাহ। মেঘের বিভিন্ন স্তর থেকে খুব অল্প সময়ের বিরতিতে এই রকম কয়েকবার বজ্রপাত হতে পারে। বিভিন্ন মোক্ষণ এত কম সময়ের মধ্যে হয় যে খালি-চোখে সেগুলো পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়। দ্রুতগতি ফটোগ্রাফির সাহায্যে এগুলো পৃথক করা যায়। একটা বজ্রপাতে 3 থেকে 30টা বা বেশি বিদ্যুৎ-মোক্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে।

সব সময়েই যে মেঘ থেকে পৃথিবীতে বজ্রপাত হয়, তা নয়। এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বা একই মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও হতে পারে।

বজ্রপাতে আওয়াজ হয় কেন?—এই সময় বায়ুমণ্ডলের যে পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ হয় সে-পথের হাওয়া নিমেষের মধ্যে দারুণ গরম হয়ে সহসা প্রসারিত হয়। তার ফলে যে ধাক্কা বা শক-ওয়েভের (shock-wave) উৎপত্তি হয় তাতেই শব্দের উদ্ভব হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের রাস্তাটা আঁকাবাঁকা। তাই শব্দতরঙ্গের উৎপত্তিও নানা জায়গা ও নানাদিক থেকে হয়। তাছাড়া বাড়িঘর, গাছপালা, পাহাড়, মেঘ ইত্যাদিতে শব্দ প্রতিফলিত হয় এইসব বিভিন্ন কারণে একটা গড়ানো শব্দের সৃষ্টি হয়

আগেই বলেছি, প্রতি সেকেণ্ডে সারা পৃথিবীতে প্রায় শ'-খানেক বিদ্যুৎচমক হয়। পৃথিবীর সব জায়গায় তা বলে সমানভাবে বজ্রপাত বা বিদ্যুৎচমক হয় না (চিত্র-7)। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুতের প্রকোপ একটু বেশি। কারণ সহজেই অনুমেয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল স্বভাবতঃই গরম—আর গরম হাওয়ার ঊর্ধ্বগমনই বজ্রভরা মেঘের জনক। পাহাড়-পর্বত এলাকাতেও অনেক সময় বজ্রপাত বেশি হয়—পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা লেগে হাওয়া ওপরে উঠে যায় কিংবা পাহাড়-পর্বত বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরকে গরম করে দেয়। মাটির রং বা তাপশোষণের ক্ষমতাও হাওয়াকে উত্তপ্ত করার আর একটা কারণ। প্রায় এগারো বছর অন্তর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সৌরকলঙ্কের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে বজ্রপাতের সংখ্যাবৃদ্ধির যোগাযোগও পরিলক্ষিত হয়েছে (চিত্র-8)।

প্রতিবছর বজ্রপাতে প্রচুর প্রাণহানি হয়। কিন্তু কতকগুলি সাধারণ বিধিনিষেধ মেনে চললে এই সংখ্যা অনেক কমে যেতে পারে।

চিত্র-7 : পৃথিবীর কোথায় বছরে কতবার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় হয়

ফাঁকা মাঠে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হলে মাটিতে শুয়ে পড়াই ভাল। কাছেপিঠে বনজঙ্গল থাকলে সেখানে আশ্রয় নেওয়া আরও ভাল। কিন্তু, নিঃসঙ্গ একটা দুটি গাছের তলায়

চিত্র-৪: মোটা দাগ আপেক্ষিক সৌরকলঙ্ক সংখ্যার সূচক। এই লেখচিত্র ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত।

কখনও দাঁড়ানো উচিত নয়। জলে থাকা একদম সমীচীন নয়। নদী বা খালবিলের কোনও অংশে বজ্রপাত হলে জল সেই বিদ্যুতের প্রবাহ বয়ে আনতে পারে। ফলে স্নানরত ব্যক্তির ওপর বজ্রপাত না হলেও এই বিদ্যুৎ প্রবাহে সংজ্ঞালোপ হয়ে তার সলিল সমাধি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। উঁচু বাড়ি খুব নিরাপদ। এসব বাড়িতে সাধারণত লোহার কাঠামো থাকে। এই কাঠামো বজ্রের বিদ্যুৎকে মাটিতে যাবার সহজ রাস্তা করে দেয়। বাড়ির মাথায় লাগানো বজ্রনিরোধক দণ্ডও আনুষঙ্গিক মোটা তারের রাস্তা বজ্রবিদ্যুৎকে মাটিতে যাবার সহজ পথ বাৎলে দেয়।

বজ্রপাত অবশ্যই ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। কিন্তু তার একটা প্রয়োজনও আছে। বজ্রভরা মেঘ প্রকৃতির সার-কারখানা। বজ্রের বিদ্যুৎপ্রবাহ বাতাসের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে নাইট্রেট-সার তৈরি করে। প্রকৃতির কারখানায় তৈরী এই সারের পরিমাণ সারা পৃথিবীর মানুষের তৈরী নাইট্রেট উৎপাদনের পরিমাণ থেকে অনেক বেশি। নাইট্রেট-সারে গাছপালার বাড়বাড়ন্ত হয়। আর গাছপালার বাড়বাড়ন্ত মানেই পৃথিবীর তাবৎ প্রাণিকুলের মহোৎসব।

তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

আমাদের দেশে কত জিনিসই যে কত ভাবে অপচয় হচ্ছে তার হিসেব নেই। যেমন গুড় একটি। নারকেলের ছোবড়া আরেকটি। আবার ধান, গম ইত্যাদি শস্যের অবশিষ্টাংশ ইত্যাদি। গুড়কে কেবল অ্যালকোহল তৈরির কাজেই লাগানো হয় কিন্তু এর থেকে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থও যে তৈরি সম্ভব তার বিষয়ে তত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। নারকেলের ছোবড়াও এদিক-সেদিকে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এদেরকে পুড়িয়েই নষ্ট করা হয়। এগুলি আবর্জনা বিশেষ। কিন্তু এও যে একটি অর্থকরী উপাদান তা সবিশেষ লক্ষ্য করা হচ্ছে না। আমাদের এখানে দেখা যায় এরা শহরকে বা শহরাঞ্চলকে অথবা গ্রামের রাস্তাঘাটকে অপরিষ্কার করে রাখে। ধূপধুনার কাজে অথবা রান্নার কাজেই এদেরকে লাগিয়েই আমাদের সব কাজ শেষ হয়। ঠিক তেমনি ধানের তুষ। এটিও যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান তা সকলে লক্ষ্যও করতে পারছেন না। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় তুষকেও বেশী সময় জ্বালানি হিসেবেই ব্যবহার করা হয়। আজকাল এই তিনটি কৃষিজাত অবশিষ্টাংশ নানা রাসায়নিক পদার্থের উপাদান হয়ে দাড়িয়েছে। এদের সদ্ব্যবহার করলে দেশও অনায়াসে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

গুড় থেকে অক্সালিক অ্যাসিড

গুড় সুগার ইণ্ডাষ্ট্রীর একটি উপজাত পদার্থ। গুড় বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের উপাদান। ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স যেমন একটি, অক্সালিক অ্যাসিডও আরেকটি। সাধারণতঃ চিনিকে জারিত করেই (নাইট্রিক অ্যাসিডের সাহায্যে) অক্সালিক অ্যাসিড বাণিজ্যিক আকারে তৈরি করা হয়। এখন দেখা যায় গুড় ইত্যাদি উপজাত পদার্থগুলিও অক্সালিক অ্যাসিডের একটি মূল্যবান উপাদান। এখন চিনির বদলে গুড়কে ব্যবহার করার প্রচেষ্টাও চলছে। গুড়ের মধ্যে চিনি বা অন্যান্য শর্করা যা আছে এদেরকেই অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টের উপস্থিতিতে জারিত করে নেওয়া হয়। চিনিকে সরাসরি জারিত করলে যত পরিমাণ অক্সালিক অ্যাসিড হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে গুড়ের মধ্যেও চিনিজাতীয় শর্করাও সেই অনুপাতেই অক্সালিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং গুড়ের অপচয় অক্সালিক অ্যাসিড করেও বন্ধ করা যেতে পারে। আর উৎপাদন বৃদ্ধি করে গুড়ের দামও অনেক নামিয়ে আনা সম্ভব।

অক্সালিক অ্যাসিডের ব্যবহার নানা বিষয়েতেই আছে। যেমন একে একটি মরডেণ্ট হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। অক্সালিক অ্যাসিডের লবণও নানা কাজে লাগে। পটাশিয়াম ফেরাস অক্সালেট একটি ফটোগ্রাফিক ডেভেলপার। পটাশিয়াম কুয়াড্রক্সালেট কাপড়ের, কাগজের কালির দাগ তুলতে সাহায্য করে। অক্সালিক অ্যাসিড নিজেও লোহার উপর মরীচা দূর করতে সাহায্য করে। অটোমোবাইল রেডিয়েটরের লোহার পাইপের মরীচা অক্সালিক অ্যাসিড দিয়ে দ্রবীভূত করা হয়।

সাধারণতঃ বিক্রিয়ারত পাত্রে গুড় নিয়ে তাতে সালফিউরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিডের (উভয় ক্ষেত্রেই ঘন) মিশ্রণ ঢালা হয়। কোন্টা কত তা নির্ভর করে গুড়ের উপাদানের উপর। সত্তর ডিগ্রী (70°) তাপাঙ্কে ঘণ্টা চারেকের মত উত্তপ্ত

* পোঃ আগরপাড়া, নর্থ স্টেশন রোড, 24 পরগণা

করে নিলেই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টের সঙ্গে মেটাল ক্যাটালিষ্টের ব্যবহারও চলছে। এই মেটাল ক্যাটালিষ্টের সাহায্যে জারণ ক্রিয়াকেও দ্রুতগামী করে তোলা হয়। ফলে এই পদ্ধতিতে অক্সালিক অ্যাসিডের উৎপাদন সন্তোষজনক হচ্ছে। প্রতিটি কারখানায় এখন অ্যাসিড ক্যাটালিষ্টকে পুনরায় কাজে লাগাবার জন্যে একটি ইউনিটও আছে। সেই জন্যে নির্গত অ্যাসিডের বাষ্প থেকেও বায়ু দূষিতও হতে পারছে না।

গুড় থেকে অক্সালিক অ্যাসিড বাদেও টারটারিক অ্যাসিডও মিলছে। আরও অনেক রাসায়নিক পদার্থও সম্ভবতঃ গুড় থেকেই মিলবে। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করছেন।

নারকেলের ছোবড়া থেকে রাসায়নিক পদার্থ

নারকেলের ছোবড়া থেকে সাম্প্রতিককালে শেল চারকোলের উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। এই শেল চারকোল (shell charcool) অ্যাকটিভ কার্বনের প্রধান উপাদান। শেল চারকোল সহজ প্রণালীতেই পাওয়া যায়। নারকেলের ছোবড়াকে নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেনে পুড়িয়েই তা তৈরি করা হয়। এতে ইল্ড (yield) প্রায় শতকরা ত্রিশ ভাগের মত। শেল চারকোলে থাকছে দুই শতাংশ ছাই, পনেরো শতাংশ উদ্বায়ী পদার্থ, দশ শতাংশ জলীয় পদার্থ আর এক শতাংশেরও দশ ভাগের মত ক্লোরাইড। লণ্ড্রীতে, সোনার দোকানে এর ব্যবহার চলছে। আর এই শেল চারকোল থেকে যে অ্যাকটিভ কার্বন মিলছে তার ব্যবহারও প্রচুর। দুর্গন্ধনাশক পদার্থ হিসেবে অ্যাকটিভ চারকোলকে ব্যবহার করা হয়। এটির শোষণ ক্ষমতাও অত্যধিক।

অ্যাকটিভ চারকোলের ব্যবহার আরও অনেক। বিভেরেজ ইণ্ডাষ্ট্রীতে (Beverage industry), ফারমাসিউটিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীতে (Pharmaceutical industry), পেইণ্ট (paint), ল্যাকার (lacquer) ইণ্ডাষ্ট্রীতে, এবং ন্যাচারেল গ্যাস ইণ্ডাষ্ট্রীতে এর ব্যবহার প্রচুর। গুড়, ভেজিটেবল অয়েল, ফলের রস, গ্লিসারিন ইত্যাদি বিশুদ্ধিকরণে হামেশাই চারকোলকে ব্যবহার করা হয়। গ্যাসোলিন সংরক্ষণের জন্যেও ন্যাচারেল গ্যাস ইণ্ডাষ্ট্রীতে অ্যাকটিভ চারকোল ব্যবহার হচ্ছে। গ্যাসোলিনকে শোষণ করিয়ে নিয়ে এইভাবে ফিরিয়ে পাওয়া যায়। গ্যাসোলিনের অপচয় যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা।

নারকোলের ছোবড়া থেকে ফুরফুরাল (furfural) নামক একটি বিশেষ জৈব পদার্থ মিলছে। এটি নাইলন উৎপাদনেরও একটি উপাদান। নারকেলের ছোলাকে অন্তর্ধূম পাতনের সাহায্যে পায়রোলিগনিয়াস অ্যাসিড, টার আর চারকোলে রূপান্তরিত করা হয়। প্রতিটিই প্রয়োজনীয়। পাইরোলিগনিয়াস অ্যাসিড (pyroligneous acid) থেকে অ্যাসিটোন, মিথাইল অ্যালকোহল আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। আর টারকে পাতিত করে ফিনল (phenol) এবং ফিনলজাতীয় যাবতীয় পদার্থ মিলছে। অবশিষ্টাংশ পিচও (pitch) উড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজে লাগছে।

কৃষিজাত দ্রব্য ও বেগেজ থেকে চিনি

আখ থেকে চিনি শোষণ করার পর অবশিষ্টাংশ যা পড়ে থাকে তার বৈজ্ঞানিক নাম বেগেজ (bagasse)। বেগেজ একটি অর্থকরী উপজাত উপাদান। বেগেজ থেকে মিলছে আরও চিনি আর যেহেতু চিনি থেকে অ্যালকোহল আর অ্যালকোহল থেকে নানা রাসায়নিক পদার্থ, বেগেজও নানা রাসায়নিক পদার্থের উপাদান। অন্য কৃষিজাত অবশিষ্টাংশও; যেমন কর্ণ-কবস (corn cobas), আলফালফা (alfalfa)। আগেও এদেরকে চিনিতে রূপান্তরিত করা হতো। তবে বিক্রিয়াটিকে ভালভাবে ঘটানো সম্ভব হতো না; পরিমাণের দিক দিয়েও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ আশানুরূপ

ভাবে সম্পাদিত হয় নি। চিনি ছাড়া অন্য উপজাত পদার্থই বেশী জুটতো (যেখানে অ্যাসিড দিয়ে এই বিক্রিয়া চালানো হয়েছিল)।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এতে সহজে বেগেজ এবং অন্যান্য কৃষিজাত পদার্থ চিনিতে রূপান্তরিত হতে পারছে আর পরিমাণও অত্যধিক। বিক্রিয়াটি আর অন্য কিছুই নয়। অ্যাসিডের বদলে এনজাইমের ব্যবহার। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এনজাইম দিয়ে উপজাত পদার্থ বেশী হয় না। চিনিই প্রধান বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ।

সেলিউলোজ (cellulose) দু-রকমের। একটির নাম আল্ফা সেলিউলোজ, অপরটির নাম বিটা-সেলিউলোজ। যে রেয়ন (rayon) বাজারে মিলে সেটি আলফা-সেলিউলোজ থেকেই (alpha-cellulose)। এই আলফা-সেলিউলোজকেই এনজাইম দিয়ে ভাঙা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যদি পূর্বে কোন দ্রাবকের সাহায্য নেওয়া হয় তবে গ্লুকোজের পরিমাণ অত্যধিক বাড়ে। তাই এখন এনজাইম দিয়ে আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটাবার পূর্বে সেলিউলোজ জাতীয় পদার্থসমূহকে দ্রাবক দিয়ে মেশানো হয়। এই দ্রাবকটির নাম কেডক্সেন (cadoxen)। এটি পাঁচ শতাংশ (5%) ক্যাডমিয়াম অক্সাইডকে (cadmium oxide) আঠাশ শতাংশ (28%) ইথিলিনডাইঅ্যামিন (ethylene-diamine) জলীয় দ্রবণে গুলে নিয়ে তৈরি করা হয়। এই দ্রাবকের বিশেষত্ব হলো—একে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। প্রথমতঃ দ্রাবক দিয়ে ধুয়ে নিয়ে মিথাইল অ্যালকোহল আর পরে জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ক্যাডমিয়াম, ক্যাডমিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর পরে তার থেকে ক্যাডমিয়াম অক্সাইড (উত্তাপ দিয়ে) মিলছে। আর বাড়তি জলীয় দ্রবণকে (ধৌত করার পর) বাষ্পীভূত করে আঠাশ শতাংশ (28%) ইথিলিনডাইঅ্যামিনও মিলছে। এই নতুন পদ্ধতিতে শুধু যে চিনি মিলছে (এখানে গ্লুকোজ) তাই নয়, গ্লুকোজকেও পরে অ্যালকোহল আর নানা রাসায়নিক পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়। এখন পেট্রোলের বদলে অ্যালকোহলের ব্যবহার নিয়েই চর্চা চলছে।

মন্তব্য

দেশের দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার এখনই বন্ধ করার প্রয়োজন। উপজাত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার থেকে বহু মূল্যবান জিনিস মিলেছে। জ্বালানির অভাব মিটছে, রাসায়নিক দ্রব্যের চাহিদাও মিটছে। অথচ এই উপজাত পদার্থের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় নি বলে বিদেশ থেকে বহু জিনিস আমদানী করে নিতে হচ্ছে। এই বাবদ খরচাটাও মন্দ নয়। বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারও প্রায় নিঃশেষ হতে চলছে। আর দিনে দিনে আমদানী খরচও লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় করতে হলে আমাদের উপজাত সকল পদার্থের সদ্ব্যবহারের জন্যে উপযুক্ত টেক্‌নোলজি দরকার। বৈদেশিক সাহায্যেই হউক বা অন্য যে কোনভাবেই হউক সর্বাগ্রে প্রযুক্তি-বিদ্যার জ্ঞান আহরণ একান্ত প্রয়োজন।

বেগেজ এখন যুক্তরাষ্ট্রে সবরকম কাগজের উৎপাদনের যোগান দিচ্ছে। আমাদের দেশে জ্বালানি হিসেবেই তার অধিকাংশটা খরচা হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজের দাম রুখতে বেগেজকে কাজে লাগাতে পারলে একটা সুরাহা হতো। তাই সেই সব টেকনোলজির প্রয়োগের দরকারও আমাদের দেশে আছে।

কারারুদ্ধ আলোক

চন্দন দাশগুপ্ত*

[সূর্যালোকের শক্তিকে কিভাবে আবদ্ধ করে রেখে কাজে লাগানো যায়, এই প্রবন্ধে তাই আলোচনা করা হয়েছে।]

বর্তমান পৃথিবীর যে সমস্যাটি বিজ্ঞানীদের খুব বেশী ভাবিয়ে তুলেছে, তা হল ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত শক্তি-সম্পদগুলির (কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি) ক্রমহ্রাসপ্রাপ্তি। এমতাবস্থায় বহিঃপৃথিবী থেকে আগত শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বহির্বিশ্ব থেকে যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে আসে, সৌরশক্তিই হল তার সিংহভাগ। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে আগত সৌরশক্তির 1%-এরও কম সবুজ উদ্ভিদ ধরে রাখতে সক্ষম হয় এবং সেই সঞ্চিত শক্তির এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ আহরণ করেই পৃথিবীর প্রাণীকুল বেঁচে রয়েছে। আবার একথাও সত্য যে, অন্ততঃ আরও 1% সূর্যরশ্মিকেও যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়, তা হলে প্রত্যেক পৃথিবীবাসী জীবনকালে 1 কোটি টাকার মালিক হতে পারে।

সৌরশক্তি সঞ্চয়ের পদ্ধতি বুঝতে হলে আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। নিউটনের 'কণিকা তত্ত্ব' (Corpuscular Theory) এবং হাইজেনের 'তরঙ্গবাদ' (Wave Theory)—উভয়েরই কয়েকটি ত্রুটি আবিষ্কৃত হবার বেশ কিছু দিন পর 1873 খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন যে, আলোক হল 'তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ' (electromagnetic wave)। পরবর্তীকালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রমুখ 'কোয়াণ্টাম' তত্ত্বানুসারে আলোক শক্তিকে ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বানুসারে আলো হল কতকগুলি শক্তি কণিকার প্রবাহ—যাদের বলে 'ফোটন'। প্রমাণিত হয়েছে আলোর সাথে আলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যায় ক্ষেত্রে তরঙ্গবাদ প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যেখানে পদার্থ এবং বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া জড়িত, সেখানে যথার্থ ব্যাখ্যাদানে সক্ষম কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। অর্থাৎ, আলোকের প্রকৃতি কখনও তির্যক তরঙ্গের মত, আবার কখনও বা কোয়াণ্টার মত। অবশ্য 1926 খৃষ্টাব্দে ডি ব্রগলী (De Broglie) দেখিয়েছেন যে, একটি ফোটনকে এক মুহূর্তের জন্যে একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ এবং ঠিক পরমুহূর্তেই তাকে দ্রুতগামী ফোটন কণিকা বলে ধরা যেতে পারে।

আমরা জানি, তাপ ও আলোকরশ্মির পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, বিকীর্ণ তাপ এবং আলোকরশ্মি – উভয়ের প্রকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ হলেও এদের মূল পার্থক্য দুটি। আলো চোখে সাড়া জাগায়, তাপ সাড়া দেয় ত্বকে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 8×10^{-5} সে. মি. থেকে 4×10^{-2} সে. মি. হলে সেটি বিকীর্ণ তাপরশ্মি। কিন্তু আলোকরশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অতি ক্ষুদ্র, 8×10^{-5} সে. মি. থেকে 4×10^{-5} সে মি.।

এখন বিকীর্ণ তাপের পরিবাহিতা (K : একক দৈর্ঘ্য বাহুবিশিষ্ট ঘনকের দুই বিপরীত তল একক উষ্ণতায় পার্থক্যে থাকাকালীন একক সময়ে লম্বভাবে ঐ পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দিয়ে বাহিত তাপ) পদার্থের

20/1B, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা—700 054

উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। যেসব পদার্থ কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত বিকীর্ণ তাপকে নিজের ভিতর দিয়ে যেতে দেয়, তাদেরকে সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যগুলির সাপেক্ষে তাপ-স্বচ্ছ (diathermanous) বলে। আবার যেসব পদার্থ কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত বিকীর্ণ তাপকে নিজের ভিতর দিয়ে যেতে দেয় না, তাদেরকে সেই সেই বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপরোধী (athermanous) বলে।

অধিকাংশ পদার্থই কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপস্বচ্ছ হতে পারে, আবার অন্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাপেক্ষে তাপরোধী হতে পারে। সূর্যালোক ধরবার জন্য বিজ্ঞানীরা নির্বাচন করেছেন কাচকে। কাচের একটি বিশেষ গুণ হল, এর মধ্যে দিয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যসম্পন্ন রশ্মি সহজেই যেতে পারে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি যেতে পারে না। কাচের এই বিশেষ ধর্মটিরই ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটানো হয়ে 'সবুজ বাড়ীতে' (green house)। এই ব্যবস্থায়, কাচনির্মিত ঘরের ভিতরে মাটি, ও গাছপালা রাখা হয়। সূর্যালোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে সহজেই ঘরের ভিতর ঢোকে এবং এতে ভিতরের জিনিসগুলি গরম হয়ে ওঠে। পরে রাত্রিবেলা সূর্যের অনুপস্থিতে পরিবেশের উষ্ণতা যখন কমে আসতে থাকে, তখন কাচের ঘরের ভিতরের জিনিসগুলিও নিজস্ব স্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরে পেতে চায়। ফলে প্রেভস্টের 'তাপ বিনিময়' সূত্রানুসারে (Prevost's theory of heat exchange) তারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-তরঙ্গদৈর্ঘ্যসম্পন্ন তাপরশ্মির বিকিরণ সুরু করে। সবুজ বাড়ীর কাচের দেয়াল ঐ রশ্মিকে নির্গত হতে বাধা দেয়। ফলে ঘরের ভিতরটা সব সময়েই ঈষতুষ্ণ হয়ে থাকে।

শীতপ্রধান দেশগুলিতে সবুজ বাড়ীর প্রচলন আছে। গাছপালা সংরক্ষণে এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। পারমাণবিক শক্তি আজকাল অনেক দেশই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছে—সৌরশক্তি সংগ্রহেরও নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই যথেষ্ট জটিল যান্ত্রিক প্রস্তুতির দরকার। তাই অতি সাধারণ ব্যবস্থায় সূর্যালোককে কারারুদ্ধ করতে হলে সবুজ বাড়ীর সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান

মৎস্য-চাষে বীজ সমস্যা

প্রেমতোষ ঘোষ*

জলের ফসল মাছ, মনুষ্য সমাজকে দেহপুষ্টির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় জান্তব প্রোটিন জোগান দেয়। তার মধ্যে দেশের অভ্যন্তরের ঘেরা জলাশয়গুলি স্বল্পপরিসরের মধ্যেই অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা চাষীদের পক্ষে সহজ নিয়ন্ত্রণসাধ্য। সে কারণে সব দেশেই বদ্ধ জলাশয়ে মাছের চাষে উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর পড়েছে বহুদিন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা দ্রুতবর্ধনশীল বা উচ্চফলনশীল জাতের চাষযোগ্য মাছের বীজের জন্য চাষীদের পরনির্ভরতা। মিষ্টি জলের আবাদী জলকরের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত চাষযোগ্য মাছ রুই, কাত্‌লা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, প্রভৃতি এদেশী ও বিদেশী পোনা মাছ। মৎস্য জগতে ওরা সবাই 'সাইপ্রিনিডি' বা 'কার্প' পরিবারভুক্ত। পুকুরের জলে ওরা কেউই প্রজনন করে না, প্রজনন করে মিষ্টি জলের নদীতে। মাছচাষীদের ফার্ম বা আবাদী জলাশয় থেকে বহু দূরে নদী থেকে এসব মাছের ডিমপোনা সংগৃহীত হয় এক শ্রেণীর জেলেদের জালে। তারপর তা বিক্রী হয় ডিমপোনার পাইকারী বাজারে। সেখান থেকে তা চালান যায় নার্শারী পালকদের নার্শারী পুকুরে বড় আকারের 'চারা পোনা' (ফ্রাই, ফিংগারলিং) রূপে গড়ে ওঠার উদ্দেশ্যে। আর চারা পোনাদের বীজ হিসাবে কেনে মাছচাষীরা তাদের জলাশয়ে চাষের জন্য মৎস্যভোজীদের ভোগ্য ফসল হিসাবে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। কাজেই নদী থেকে সংগৃহীত মাছের ডিমপোনা শেষ পর্যন্ত আবাদী জলাশয়ে এসে পৌঁছায় 3-4 শ্রেণীর হাত ঘুরে। প্রকৃত মাছচাষী চায় তাদের জলাশয়ে মাছের ফসলের পরিমাণ বাড়িয়ে এবং চাষের খরচ কমিয়ে লাভের পরিমাণ বাড়াতে। এক্ষেত্রে মৎস্যবীজের উৎকর্ষের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। কোন কোন পোনা মাছের চারা পোনায় তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধি দ্রুত তালে বাড়ে, আবার কোন কোন পোনা মাছের চারাপোনায় 'গ্রোথ রেট' যথেষ্ট কম, এই সব ব্যাপার চারা পোনা কেনার সময় বোঝা যায় না—চাষ করতে করতে পরে বোঝা যায় কেননা ওসব ব্যাপার 'ফলেন পরিচয়তে'।

অন্য দিকে হয়তে কোন মাছচাষীর জলাশয়ে কাত্‌লা মাছের ফসল সর্বাধিক হারে মেলে, কারো জলাশয়ে সর্বাধিক 'গ্রোথ' রুই মাছে, কারো বা মৃগেল মাছের ক্ষেত্রে। ঐ সব ক্ষেত্রে মাছচাষীরা চাইবে যে 'চারা পোনা' অথবা 'ধানী পোনা' কিনবো তাদের 100 শতাংশই শুধু মাত্র কাত্‌লা, 100 শতাংশই শুধু মাত্র রুই বা 100 শতাংশই মৃগেল। কিন্তু সেভাবে 'পিওর' মৎস্য বীজ (ধানী পোনা, চারা পোনা) পাওয়া শক্ত। কেননা নদীতে সংগৃহীত ডিমপোনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে রুই, কাত্‌লা ও মৃগেল-এর সংমিশ্রণ থাকে। আর সেই সঙ্গে থাকে ডুমুলি, বাটা, পুঁটি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতের মাছের ডিমপোনা। মোট কথা উৎকৃষ্ট মৎস্যবীজের ক্ষেত্রে দেশের মাছচাষিগণ অসহায়ভাবে পরমুখাপেক্ষী।

মাছচাষীদের এই পরনির্ভরতা দূর করার জন্য

*68/B/2, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-700 010

মৎস্যবিজ্ঞানী সমাজ বহুদিন ধরেই সচেতন। কেননা এ ব্যাপারে মাছচাষীদের সাহায্য করলে মৎস্যবীজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে দেশের আবাদী জলাশয়ে মাছের ফসল উৎপাদনের হার ও পরিমাণ বাড়বে। তাতে শেষ পর্যন্ত দেশের মৎস্যভোজীদেরই উপকার হবে। সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মৎস্য বিজ্ঞানিগণ নদীতে প্রজননকারী ঐ সকল চাষযোগ্য উৎকৃষ্ট জাতের মাছ যাতে পুকুরের বদ্ধ জলেই প্রজনন করে সে বিষয়ে গবেষণা চালাতে থাকেন।

এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম সফল মৎস্য-বিজ্ঞানী আর্জেন্টিনার ডঃ বি. এ হাউসে। 1930 সালে এই সাফল্যলাভ ঘটে। প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন মাছকে পিটুটারী হর্মোন ইনজেকশান দিয়ে পুকুরের জলে তাদের প্রজনন করানোর পদ্ধতিই মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বা প্ররোচিত প্রজনন বা প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতি নামে পরিচিত। পরে 1934 সালে ব্রেজিল, 1937 সালে রাশিয়া, 1940 সালে মার্কিন যুক্তরাস্ট্র, 1955 সালে লাল চীন, 1957 সালে ভারত, 1958 সালে জাপান প্রভৃতি রাস্ট্রসমূহে ঐ গবেষণা সফল হয়। ভারত সরকারের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার মৎস্যবিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরী রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি এদেশী পোনা মাছের প্রণোদিত প্রজননে সফল হন 1957 সালে।

ডঃ চৌধুরী উদ্ভাবিত পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির কলাকৌশলের মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য লুকানো নেই। পুকুরের বদ্ধ জলে পূর্ণ বয়স্ক পোনা মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই পুকুরে পুষে রাখা 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বড় স্ত্রী ও পুরুষ পোনা মাছগুলির জীবনে প্রতি বছর মে, জুন, জুলাই মাসে প্রজননের মরশুম এলেও তারা প্রজননের আকর্ষণ অনুভব করে না বা প্রকৃতির সেই আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক মাছগুলি পুকুরে প্রজনন করে না। ঐ সকল মাছের দেহে ইনজেকশনের মাধ্যমে পিটুটারী হর্মোন প্রয়োগ করা হলে মাছগুলির দেহাভ্যন্তরের অপুষ্ট জননেন্দ্রিয়গুলি প্ররোচিত হওয়ায় তাদের সঠিক পুষ্টিবিধান ঘটতে থাকায় শেষ পর্যন্ত সেগুলির পরিপূর্ণ বিকাশলাভ ঘটে। ফলে পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণবয়স্ক পোনা মাছগুলি প্রজননের ক্ষমতা অর্জন করে। পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন বা প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির মূল কথা এটাই।

প্রজনন করানোর জন্য 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের বড় মাছগুলির মধ্যে সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট মাছদের বেছে নিতে হয় প্রজনন মরশুম শুরু হওয়ার 2-3 মাস আগে। স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের পৃথক করে পৃথক পৃথক পুকুরে রেখে যত্ন-পরিচর্যা করে লালন-পালন করতে হয়। পর্যাপ্ত খাদ্য জোগান দিতে হবে, নিয়মিত পরিশ্রম করাতে হবে যাতে তাদের দেহে চর্বি জমতে না পারে। এই সময়ের মধ্যে 4-5 সপ্তাহ অন্তর ওদের প্রত্যেকের দেহে প্রাথমিক মাত্রায় হর্মোন ইনজেকশন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রজননের মরশুমে প্রজনন পুকুরের জলের পি-এইচ-ভ্যালু 6·5 থেকে 7·0-এর মাত্রায় থাকা, জলের উষ্ণতা 25-31 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড-এর সীমার মধ্যে থাকা ও তিথি-নক্ষত্র ত্রয়োদশী থেকে দ্বিতীয়া পর্যন্ত (কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষ)-এর মধ্যে থাকা। এই তিন নির্ধারক (ফ্যাকটর)-এর সামঞ্জস্য ঘটলে প্রজনন পুকুরে পোনা মাছের প্রজননের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে সময় পৃথক পৃথক পুকুরে বিশেষ যত্ন পরিচর্যার মধ্যে পুষে রাখা স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলিকে ধরে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত মাছদের বেছে নিয়ে পুনরায় তাদের দেহে পিটুটারী হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করে সেই ইনজেকশন-দেওয়া স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের একসঙ্গে প্রজনন পুকুরে সঠিক অনুপাতে (স্ত্রী ও পুরুষ মাছের সংখ্যার অনুপাত) ছেড়ে দিতে হবে। সব কিছু ঠিক হলে উপযুক্ত সময়ে প্রজননের উদ্দেশ্যে প্ররোচিত মাছগুলি সেই প্রজনন পুকুরেই প্রজনন করে।

হর্মোন প্রয়োগের মাত্রা হল যে মাছের উপরে তা প্রয়োগ হবে তার দৈহিক ওজন যত কিলোগ্রাম, তত গ্রাম ওজনের (মাছটির দৈহিক ওজনের 1 হাজার ভাগের 1 ভাগ মাত্র) পিটুটারী গ্ল্যাণ্ড-এর নির্যাস। আর প্রজননের উদ্দেশ্যে প্রজনন পুকুরে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ একসঙ্গে ছাড়ার উপযুক্ত আনুপাতিক হার হবে স্ত্রী মাছগুলির মোট ওজন যত হবে, পুরুষ মাছগুলির মোট ওজনও তার সমান রাখতে হবে। এতে যদি 5টি স্ত্রী মাছের মোট ওজন 10 কিলোগ্রাম হয় তবে পুরুষ মাছগুলির মোট ওজন 10 কিলোগ্রাম করতে 7টি পুরুষ মাছের সংখ্যা দাঁড়ায় সে ক্ষেত্রে ঐ সেট-এর আনুপাতিক হার হবে স্ত্রী : পুরুষ=5 : 7।

প্রজনন পুকুরে মাছের প্রণোদিত প্রজননের ক্ষেত্রে পুকুরের জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন ও 'টারাবিডিটি'র মাত্রারও যথেষ্ট প্রভাব আছে। যে বছরে পোনা মাছের প্রজনন মরশুমে ভাল বৃষ্টিপাত হয় সে বছরে মাছের প্রণোদিত প্রজনন বেশী সফল হয়। যে বছরে ঐ সময়ে খরা চলে সে বছর একাজে ব্যর্থতা জোটে বেশী। আর প্রজননের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত মাছদের প্রজনন পুকুরে ছাড়ার সময়ে তাদের দেহে সর্বশেষ বার ইনজেকশন করা হর্মোনের মাত্রা নির্ধারণ নির্ভর করে সেই মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির বিকাশ-এর সঠিক অবস্থার ওপর। এক্ষেত্রে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই দক্ষতা এনে দেয়।

মোট কথা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির সাহায্যে সকল মাছচাষীই যদি তাদের আবাদী জলাশয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট চারা পোনা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ জলাশয়ের উৎকৃষ্ট বড় মাছদের হর্মোন ইনজেকসান প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ফার্মে প্রজনন করিয়ে উৎকৃষ্ট জাতের ডিমপোনা উৎপাদন করিয়ে নেয় তবে রাজ্যে মৎস্যবীজের কণামাত্র ঘাটতি থাকে না। তাছাড়া মৎস্যবীজের উৎকর্ষের অবনতি ঘটতে পারে না। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশ এই ভাবেই তাদের সমস্যা মিটিয়েছে।

1957 সালে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানী বদ্ধ জলাশয়ে পোনা মাছের প্রজনন করানোর উপায় আবিষ্কার করলে 60-এর দশকে সরকার প্রচার করতে থাকেন অদূর ভবিষ্যতে সারা দেশ জুড়ে মৎস্যবীজের প্লাবন আসন্ন। রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেট্‌কী, ভাঙন, পারশে, ইলিশ, বাগ্‌দা, গল্‌দা, কৈ, শিঙি, মাগুর প্রভৃতি সকল উৎকৃষ্ট জাতের কোটি কোটি সংখ্যক মাছকে তাদের প্রজননের মরশুমে মাছেরই পিটুটারী গ্রন্থির নির্যাস ইনজেকশন দিয়ে প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রজনন করানো হবে। তার ফলে প্রতি বছর ঐ সকল মাছের এত সীমাহীন সংখ্যক ডিম পোনা উৎপাদিত হবে যাতে সারা রাজ্যের ভৌগোলিক আয়তনকে (2·19 কোটি একর) 10 ফুট পুরু আস্তরণে (মাছের ডিম পোনার আস্তরণ) ঢেকে ফেলা যায়। মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির যুগান্তকারী আবিষ্কারের 22 বছর পরেও সেই 'অ্যাকোয়াপ্লোশান' দূরের কথা পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যবীজের ঘাটতি বেড়েই চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গে পোনা মাছের ডিমপোনা সংগ্রহের পরিমাণ 1958 সালে ছিল বার্ষিক 18 হাজার 'কুনকা' (450 কোটি সংখ্যক ডিমপোনা)। আর 1978 সালে তা হয়েছে বার্ষিক 12 হাজার 'কুনকা' (300 কোটি সংখ্যক ডিমপোনা)। অথচ উপরিউক্ত 24 বছরের ব্যবধানের মধ্যে (1958-1978) 21 বছর আগে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানে সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সম্পূর্ণ হয়েছে যা 'অ্যাকোয়াপ্লোশান'-এর স্বপ্ন দেখিয়েছে এদেশের মৎস্যবিজ্ঞানীদের, আর সেই আবিষ্কারের পরবর্তী 20 বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মৎস্য-বিজ্ঞানিগণ শুধু পশ্চিমবঙ্গের অন্তত 500 জন মৎস্য বিজ্ঞানী, মৎস্য দপ্তর ও বেসরকারী মহলের কর্মীদের ঐ বিশেষ পদ্ধতির কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু ঐ অদ্ভুতকর্মা হাতিয়ারটির সাহায্যে সারা দেশ জুড়ে 'অ্যাকোয়াপ্লোশান' বা 'জলের প্রাণী

কুলের সংখ্যা বিস্ফোরণ' বা সংক্ষেপে 'মৎস্যবীজ প্লাবন'কে কার্যকরী করার উপযোগী সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন-এর অভাবে পশ্চিমবঙ্গে সেই স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। মৎস্যবীজের প্লাবন-এর বদলে মৎস্যবীজের উৎপাদন 24 বছর আগেকার তুলনায় 33 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আমাদের মৎস্যবীজ-এর সংকট আরও বেড়েছে।

তবে ঐ আবিষ্কারের সুফল পোনা মাছ প্রজননের কয়েকটি ছোট উৎস মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার 'বাঁধ' নামে পরিচিত বিশেষ ধরনের ছোট ছোট জলাধার-এর ডিমপোনা উৎপাদক ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ভাল ভাবেই ভোগ করতে সক্ষম হয়েছে। ডিমপোনা উৎপাদনের ঐ মরা গাঙে এখন বান ডেকেছে। আর সংশ্লিষ্ট ডিমপোনা ও ব্যবসায়ীদের উপার্জন বেড়েছে 26·6 গুণ, ঐ উৎস-গুলিতে ডিম পোনার উৎপাদন 4 গুণ হয়েছে।

ঐ বাঁধগুলিতে পোনা মাছের ডিমপোনার উৎপাদন ছিল 1954 সালে বার্ষিক 500 কুনকা (12·5 কোটি সংখ্যক) যা রাজ্যের মোট জোগানের (18 হাজার কুঁনকা) নাম মাত্র (2·7 শতাংশ),। উৎপাদিত ডিমপোনার মোট দাম 1·50 লক্ষ টাকা (কুনকা প্রতি দর গড়ে 300 টাকা)। বর্তমানে (1978) সেখানে উৎপাদিত হয় বার্ষিক 2 হাজার কুনকা (50 কোটি সংখ্যক) ডিমপোনা যা রাজ্যের এখনকার মোট জোগানের (12 হাজার কুনকা) 16·6 শতাংশের সমান। আর ঐ 2 হাজার কুনকা ডিমপোনা বিক্রী করে ডিমপোনা ব্যবসায়ী ও ডিমপোনা উৎপাদকগণের উপার্জন বার্ষিক 40 লক্ষ টাকা। . (কুনকা প্রতি দর গড়ে 2000 টাকা)।

'বাঁধ'গুলির এই শ্রীবৃদ্ধি এসেছে পোনা মাছের কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির কল্যাণে। এখন মে, জুন, জুলাই মাসে একদল শিক্ষিত কর্মী বাঁধগুলিতে ভীড় করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং পোনা মাছের মাথা কেটে সংগ্রহ করা পিটুটারী গ্রন্থি ইত্যাদি নিয়ে। ওখানকার পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণবয়স্ক পোনা মাছ 10-15 টাকা কিলো দরে প্রজনন মরশুমের জন্য ভাড়া নেয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে তাদের দেহে হর্মোন ইনজেকশন প্রয়োগ করে এক সঙ্গে বহু সংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ মাছদের 'বাঁধ' নামে পরিচিত জলাধারে ছেড়ে দেয়। সব মাছের দেহে ইনজেকশন দিতে হয় না মাত্র গুটি কয়েক-এর দেহে তা প্রয়োগ করে। কিন্তু প্রজনন করে সব কটি মাছই—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'সিমপ্যাথেটিক ব্রীডিং' আর গ্রাম্য পরিভাষায় বলে 'হুপে পাল খাওয়া'। 3-4 জনের কর্মী গোষ্ঠী এই স্বল্প মেয়াদী মরশুমে 3 4 হাজার টাকা লগ্নী করে 10.15 এমন কি 20 হাজার টাকাও উপার্জন করছে, উৎপাদিত ডিমপোনা সেই উৎপাদন কেন্দ্রেই ডিমপোনা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে। ইনজেকশনের কাজে নেমেছে স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তহশীলদার, গ্রামসেবক প্রভৃতি সরকারী কর্মচারী, স্কুলের ছাত্র আর শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত বেকার যুবক।'

'বাঁধ'গুলির ক্ষেত্রে শুধু মাত্র হর্মোন ইনজেকশন ও 'সিমপ্যাথেটিক ব্রীডিং'-এরই সাহায্য নেওয়া হয়েছে তা নয়—ঐ সাহায্য ছাড়া অন্য ভাবেও বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঐ এলাকার মাটি 'ল্যাটেরাইট-সয়েল' শ্রেণীভুক্ত, যার রং লাল। ভূপৃষ্ঠে 'ঢাল' বা 'স্লোপ' রয়েছে সর্বত্র। ঢালের নীচের অংশকে অর্ধচন্দ্রাকারে বাঁধ দিয়ে ঘেরা হয়, উঁচুর দিকের তিনদিক বাঁধ দেওয়া হয় না। তাই বর্ষাকালে ঐ বাঁধ শূন্য উঁচু দিক দিয়ে ভূপৃষ্ঠ ধোয়া বৃষ্টির জল গড়িয়ে এসে জমে বাঁধবন্দী অংশে। আর এই ভাবে বাঁধবন্দী জমিতে জল জমলে ঐ অগভীর জলাধারে মাটি ও জলের গুণে এবং মাছের প্রজননের উপযুক্ত তাপমাত্রায় সেখানে পোনা মাছের স্বাভাবিক প্রজননের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ওখানকার পুকুরের জল ও মাটির গুণে পুকুরে পুষে রাখা পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছের দেহাভ্যন্তরের জননেন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ বিকাশ-লাভ ঘটে বলেই বর্ষাকালে পোনা মাছের

প্রজননের মরশুমে মাছ প্রজননের জলাধারগুলিতে (বাঁধ) উপযুক্ত সময়ে পুকুর থেকে মাছ ধরে স্ত্রী ও পুরুষ মাছগুলিকে বাঁধগুলিতে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে তারা যথাসময়ে স্বাভাবিক প্রজনন করে। তবে অতীতে বাঁধে পোনা মাছের প্রজননের জন্ম বর্ষাকালীন বৃষ্টির জলধারার ওপর নির্ভর করতে হত। বর্তমানে সে নির্ভরতা আর নেই। এখন ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের জলাধারে সঞ্চিত জলরাশি থেকে সেচ-খাল-বাহিত জল মাছের প্রজননের মরশুমের গোড়ার দিকেই "বাঁধ"গুলিতে ইচ্ছামত বা প্রয়োজন মাফিক তুলে বাঁধগুলিতে পোনা মাছের প্রজননের পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। এটাও বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া। এই সাহায্য ওখানে পাওয়া গেছে বলে ওখানে পোনা মাছের প্রজনন ব্যাপক রূপ নিতে পেরেছে। ফলে উৎপাদিত ডিমপোনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-ধন্য মাছের ডিমপোনা উৎপাদন কেন্দ্রটি রাজ্যের মাছচাষ ব্যবস্থাকে সুফল দিতে পারে নি। কেননা বাঁধগুলিতে ডিমপোনার দ্রুত বর্ধনশীলতা বীজ হিসাবে উৎকর্ষের মান যথেষ্ট অবনমিত হয়েছে। ঐ সকল ডিমপোনা থেকে তৈরী চারা পোনা ও চালা মাছের 'গ্রোথ-রেট' বা 'বাড়' খুবই কম। কারণ ওরা তো সব অপুষ্ট ও অপরিণত পিতামাতার সন্তান (ডিম)। তাই মাছচাষের আবাদী জলাশয়ে 15 বছর আগে পোনা মাছের দেহের ওজন বৃদ্ধি যে হারে হত এখন সে হার তুলনামূলক ভাবে যথেষ্ট কম।

বর্তমানে ঐ বাঁধগুলিতে যে রকম অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন পোনা মাছের লালন-পালন চলে তাতে প্রজননকারী পিতামাতা মাছগুলির 'জেনেটিকাল ডিজেনারেশন' অনিবার্য।

অতীতে প্রজননের কাজে ব্যবহারের জন্ম ওখানকার পুকুরে পুষে রাখা হত বড় আকারের পোনা মাছ (5 থেকে 10 কেজি ওজন)। 5 কিলোগ্রামের কম ওজনের মাছকে একাজে ব্যবহার করা হত না। বর্তমানে পুকুরগুলিতে ঠাসাঠাসি করে পুষে রাখা হয় বহু সংখ্যক পোনা মাছ। স্থান ও খাদ্যের অভাবে ওরা 'ষ্টান্টেড গ্রোথ' বিশিষ্ট বেঁটে আকারের হয়ে ওঠে। বয়সে 3 বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের হলেও ঐসব মাছ 250 গ্রাম থেকে 1·5 কিলোগ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। এই ভাবে গত 10—15 বছর ধরে ছোট, খর্বাকৃতি, বামনত্বসম্পন্ন পিতামাতা মাছদেরই প্রজনন করানো হচ্ছে।

পরিবেশজনিত কারণে সাময়িকভাবে অর্জিত বৈশিষ্ট্য (এক্ষেত্রে 'বামনত্ব') সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় না—একথা ঠিক। কিন্তু ঐ পরিবেশ বছরের পর বছর ধরে (10—15 বছরব্যাপী) চললে এবং সেই পরিবেশের মধ্যে প্রজননকারী পিতা-মাতাদের 3—4 প্রজন্ম অতিবাহিত হলে সেই পরিবেশজনিত সাময়িক বৈশিষ্ট্যটি (ঐ বামনত্ব) পরবর্তী প্রজন্মের দেহকোষের 'ক্রোমোসোম'-এর 'জিন'-এ সঞ্চারিত হয় (ল্যামার্ক এর 'অর্জিত বৈশিষ্ট্যে'র উত্তরাধিকার সূত্র)। এরূপ পরিস্থিতিতে বেঁটে পিতামাতা মাছেদের উৎপাদিত মৎস্যবীজের দ্রুতবর্ধনশীল বৈশিষ্ট্য লোপ পাওয়ায় ঐসব মৎস্যবীজ থেকে তৈরী চারা পোনাদের প্রচুর খাদ্য জোগান দিলেও তারা বেঁটেই হয়। তাদের দেহের ওজন বৃদ্ধির হার কিছুতেই পুরাতন স্বাভাবিক স্তরে পৌছায় না।

এই দুর্দৈবের কারণে পশ্চিমবঙ্গে আবাদী জলাশয়ে মাছের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ কমেছে, আর চাষের জন্ম বেশী সংখ্যক হারে চারা পোনা ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে বীজের ঘাটতি বেড়েছে। মৎস্য বীজের উৎকর্ষ বৃদ্ধির হাতিয়ার পেয়েও আমরা তার অবনতি ঘটিয়েছি, বিজ্ঞানের আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ ভোগ করছি আমাদেরই দোষে।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাবের সাম্প্রতিক কাজকর্ম

গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের শাখা, গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব সাম্প্রতিককালে অনেকগুলি কর্মোদ্যোগে নিযুক্ত রয়েছে। এই ক্লাবের পৃষ্টপোষকতায় বিগত 15-2-80 তারিখ বসিরহাট মহকুমার কাটিয়াহাট সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে 'কাটিয়াহাট বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়, —এই অঞ্চলে এই প্রথম একটি বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব টেলিস্কোপ ও স্লাইড প্রোজেকটার নিয়ে যায়। টেলিস্কোপে সূর্য পর্যবেক্ষণ করে প্রায় 300 ছাত্র-ছাত্রী। সন্ধ্যায় স্লাইড প্রোজেক-টর-এর মাধ্যমে 'গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিতে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস'-শীর্ষক ছবি বক্তৃতা সহকারে দেখানো হয়। এরপরে আলিপুর চিড়িয়াখানার জীব-জন্তুদের সম্পর্কে মনোজ্ঞ স্লাইডও দেখানো হয়। বিকাল 4-টায় কাটিয়াহাট বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ক্লাব কি ও কেন'? এই বিষয়ে আলোচনা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে দীপক দা বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব 'জহর শিশুভবন' আয়োজিত ষষ্ঠ রাজ্য বিজ্ঞান মেলায় বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ মডেল প্রস্তুতকারক' হিসাবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় স্বপন চক্রবর্তীর 'মৌমাছি পালন ও সমীক্ষা', কল্যাণ মল্লিকের 'আধুনিক উনুন' এবং কৃষ্ণেন্দু পালের Double Instensity lamp মডেল ও প্রজেক্ট কাজ পাঠিয়েছিল।

সংস্থার নিজস্ব ঘরে গত 17.2.80, রবিবার, 4-টায় এক বিজ্ঞান আলোচনা-চক্রে দেবপ্রসাদ ঘোষ দস্তিদার 'মাটি পরীক্ষার পদ্ধতি ও আবশ্যকতা' সম্পর্কে আলোচনা করেন। সংস্থা 'মাটি পরীক্ষা' করার একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

গোবরডাঙ্গা বিজ্ঞান ক্লাব সম্প্রতি 15পঃ মূল্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু-স্মারক টিকিট প্রকাশ করে। 'গ্রামীণ বিজ্ঞান প্রজেক্ট' কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। এবছর সংস্থা দু-মাসের 'মৌমাছি পালনের' প্রশিক্ষণ ক্যাম্প করেছে। 15 জন এই ট্রেনিং নিয়ে মৌমাছি পালন করছে। সংস্থার প্রায় 100 সদস্য বর্তমানে মৌমাছি প্রকল্পের কাজে যুক্ত আছে। 1979 সালে এদের মধু উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 4 কুইন্টাল হয়েছিল। এবছর উৎপাদন পরিমাণ দ্বিগুণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংস্থার আরো কতকগুলি শাখা কেন্দ্র আছে। প্রতিষ্ঠান পরিচালিত 'এলেন রায় আদিবাসী বিদ্যালয়ে' 40টি ছাত্র-ছাত্রী বিনা বেতনে পড়ে। এদের জন্য সামান্য টিফিন ও ঔষধ দেওয়া হয়। সংস্থার নিজস্ব 15 কাঠা জমিতে এই কর্মোদ্যোগ গত আড়াই বছর ধরে চলেছে। এছাড়া শিশুদের উপর 'শারীর-মানসিক'-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সংস্থা

একটি নার্শারী বিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা 55 জন।

অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা

উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থার উদ্যোগে গত 20শে জানুয়ারী, 1980 বাণীপীঠ বিদ্যালয়ে 'ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশে শিক্ষাব্যবস্থা' সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়। লণ্ডনের কুইন্‌স্ মেরী কলেজের অধ্যাপক দীপঙ্কর রায় ভারত, আমেরিকা ও বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ঐ আলোচনাচক্রের সভাপতি রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তা চীন, রাশিয়া ও বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার উপর আলোকপাত করেন। 'গ্রামীণ উন্নয়নে প্রযুক্তিবিদ্যা' সম্পর্কে স্লাইড সহযোগে ভাষণ দান করেন শ্রীদীপক দাঁ।

জানবার কথা

ডিমে রক্তবিন্দু দেখা যায় কেন ?

পাখীর জরায়ু থেকে যখন ডিমের ইয়োক' বেরিয়ে আসে তখন কোন রক্তবাহী শিরা ফেটে যেয়ে রক্ত-বিন্দু দেখা দেয়। ভিটামিন-'এ'র অভাবও এর কারণ হতে পারে।

ডিমের আকার কিসের ওপর নির্ভর করে ?

নিম্নলিখিত কারণগুলির ওপর ডিমের আকার বড় হবে কি ছোট হবে নির্ভর করে খাদ্যে প্রোটিন বা আমিষের পরিমাণ, অ্যামিনো অ্যাসিড-এর পরিমাণ, লিনোলিক অ্যাসিডের পরিমাণের ওপর। এছাড়া বংশগত গুণ, জননের জন্য পরিণতির অবস্থান, বয়স এবং কিছু পরিমাণে কোন্ কোন্ ওষুধের প্রভাবের ওপর ডিমের আকার নির্ভর করে।

বাদামী এবং সাদা ডিমের মধ্যে পার্থক্য কি ?

বাদামী বর্ণের ডিমের থেকে সাদা ডিমের গুণগত উৎকর্ষ একটু বেশী। সাদা ডিমে খাদ্যপ্রাণ B_1 ও B_2 (থিয়ামিন ও রাইবোফেলামিন)-এর পরিমাণ বেশী থাকে, প্রায় 0·01% বেশী। সাদা ডিমে কোলেস্টেরল এবং রক্তবিন্দুও কম থাকে। বাদামী ডিমের সঙ্গে এগুলিই এর গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। বাদামী ডিমের খোসা আপাতঃদৃষ্টিতে শক্ত মনে হলেও খাচায় ভাঙে বেশী এই ডিম।

ডিমের সঙ্গে ভিটামিন-'সি' থাকা চাই

হরিয়ানা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের গৃহ বিজ্ঞান কলেজের খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের অধ্যক্ষা ডাঃ মিসেস ভাট বলেন যে ডিমের সঙ্গে খাদ্যে অবশ্যই ভিটামিন-'সি' থাকা চাই কারণ ডিমে ভিটামিন-'সি' থাকে না। তিনি বলেন ডিমের সঙ্গে লেবু, টম্যাটো, আমলা বা কমলালেবু খাওয়া উচিত। ভিটামিন-'সি' ডিমের মধ্যে যে লোহা থাকে তা হজম করার জন্যে প্রয়োজন। হরিয়ানা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত করা হয়।

খাদ্য হিসেবে শৈবাল

মিষ্টি জলে যে সব শৈবাল জন্মায় তারা ক্ষুদ্র সবুজ রঙের এবং খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। অধুনা এই শৈবালের ওপর লোকের দৃষ্টি পড়েছে কারণ খাদ্য, পশু-পাখীর খাদ্য, জৈব সার এবং জৈব শক্তির উৎস হিসেবে শৈবাল নতুন পরিচিতি লাভ করেছে।

এই শৈবাল নিয়ে 6 বছর যাবত অনুসন্ধান চলেছে কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান সংস্থায়। এই অনুসন্ধানের ফলে বেশী পরিমাণে শৈবাল উৎপাদন ও তা থেকে অন্যান্য জিনিস তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

ইট, পিভি, সি, প্লাসটিক সিট, রবটার বা এ ধরণের জিনিস দিয়ে তৈরী চৌবাচ্চার মধ্যে শৈবাল হতে পারে। এদের জন্য বাণিজ্যিক স্তরে তৈরী সারের প্রয়োজন হয়। কার্বনের (ভাল হয় কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে) প্রয়োজন হয় এই শৈবাল তৈরি করতে। এছাড়াও অল্প পরিমাণে আখের গুড়, রক্ত এবং মূত্র সংযোজনে চৌবাচ্চায় শৈবাল হতে সাহায্য করে।

'সিনেডেসমাস' নামে শৈবাল তৈরি করতে গুড় থেকে কার্বন সংগ্রহ করা হয়। গ্রামে এই শৈবাল তৈরির জন্য 'স্পাইরুলিনা' নামক শৈবাল বেশী উপযোগী বলে জানা গেছে। এই শৈবাল খড়ের ঢকনাওয়ালা চৌবাচ্চায় তৈরি করা যায়। কাপড়ে

ছেকে রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে এই শৈবাল পশুখাদ্যে ব্যবহার করা যায়।

এভাবে হেক্টরে 60-70 টন শৈবাল পাওয়া যায় যাতে 45-55% আমিষ পদার্থ আছে যা অন্য যে কোন সজীব আমিষ পরিমাণের চেয়ে বেশী। এই পাউডারে ভিটামিন-'বি' কমপ্লেক্স ও অন্যান্য খনিজ লবণ থাকে। এতে প্রচুর কোরাটিন থাকে থাকে যা পাখীকে খাওয়ালে পাখীর ডিমে হলুদ অংশ হতে সাহায্য করে।

মিষ্টিজলের শৈবাল খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের খবর পাওয়া যায় মেক্সিকো এবং আফ্রিকা থেকে। কেলাবেলা নামে শৈবাল থেকে তৈরী বড়ি অপুষ্টির জন্য ব্যবহার হয়।

[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ, কৃষি ভবন, নতুন দিল্লী (No. 45 (5) A.I S, ফেব্রুয়ারী, '80)-র সৌজন্যে।]

চৌম্বক বালার রোগ নিরাময় ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই

বাংলাদেশ উচ্চতর চিকিৎসা বিজ্ঞান সমিতি উচ্চ রক্তচাপ ও বাত নিরাময়ের আশায় জনগণকে আর্মব্যাণ্ড (বালা) ব্যবহারে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। গত 26শে নভেম্বর সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, পত্রিকায় বালা ব্যবহার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এদ্বারা নিরীহ রুগীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। কারণ, উচ্চ রক্তচাপ ও বাতের চৌম্বক নিরাময়ের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। এতে বলা হয় যে, বিজ্ঞাপনের ভুয়া আশ্বাসে যেন তারা প্রতারিত হয়ে কষ্টার্জিত টাকা এই বালার জন্য ব্যয় না করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে, যদি বালার পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপন করা যায় তবে সমিতি তা মেনে নেবে।

[বিজ্ঞান পরিক্রমা, বেতাগা, খুলনা, বাংলাদেশ]

একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তাবনা

সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান

[অভিযান করব, কিন্তু কেন এবং কোথায়? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। অজানাকে জানার চেষ্টা, বাঁধা ধরা জীবনের বাইরে যে বিরাট জগৎ রয়েছে তাকে জানা ও চেনার নেশায় মানুষ অভিযানে বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞান ক্লাবের সভ্যরা এই প্রস্তুতি নিয়েছে—কেন নিয়েছে তার বর্ণনা নীচে উপস্থাপন করা হল]

প্রাকৃতিক সম্পদ ও রহস্যে ঘেরা সুন্দরবন। সেখানে পথে পথে রোমাঞ্চ। পদে পদে অজানার হাতছানি। তা'র বর্ণময় বৈচিত্র্য, আরণ্য বৈভব, দুরন্ত নদী, ভয়ঙ্কর ও নিরীহ পশু, উচ্ছ্বসিত পক্ষীকুল, উদার ভূপ্রকৃতি, অফুরন্ত কৃষিজ সম্পদ এবং প্রাণচঞ্চল অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার সংবাদ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার সংকল্প হাতে নিয়েছেন গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁ ইনস্টিটিউট। ভাবতে অবাক লাগে অর্থ নৈতিক ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের লীলাভূমি সুন্দরবন অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে নমুনা সংগ্রহের জন্য এযাবৎ কোন সংগঠিত বেসরকারী উদ্যোগ দেখা যায় নি।

সুন্দরবনে শুধু নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীই নয়, সেখানে প্রকৃতির মত মানুষও বিচিত্র। বিচিত্র তাদের জীবন ও জীবিকা। কেউ বঞ্চিত কৃষক, কেউ মৎস্য শিকারী, কেউ মধু সংগ্রাহক, কেউ মাঝি, কেউ ওঝা, কেউ দালাল, কেউবা জোতদার। সেখানকার মানুষের ধর্ম-বিশ্বাসও সাধারণ অঞ্চলের মত নয়। হিন্দুরা বিশ্বাস করে বনবিবিকে, মুসলমানেরা পূজো দেয় দক্ষিণ রায়ের মন্দিরে। খৃষ্টান—গীর্জার কীর্তনের সুরে যীশুর ভজনা করে। এমন করে একাকার হয়ে যায় বিভিন্ন ধর্মমত—সুন্দরবনের উদার পটভূমিতে। সমাজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য এধরণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র বোধ করি আর দুটি নাই।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা পরিচিত ও বিলীয়মান জীবজন্তুর বাসভূমি সুন্দরবনে তথ্যানুসন্ধানীর জন্য অজস্র উপাদান ছড়ানো রয়েছে। এ যেন চ্যালেঞ্জ। কীভাবে অনেক প্রজাতি বংশ লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তার চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

পক্ষীআলয়ের নিরপদ আশ্রয়ে পাখীর ডানায় কখন কত রং ফোটে, গলায় কত সুর ঝরে তার হিসাব রাখা যেতে পারে তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। আবার জানা-অজানা অজস্র কীটপতঙ্গের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে বিস্ময়ে হয়ত অবাক হতে হবে। ভারসাম্য বজায় রাখতে এ সব তুচ্ছ পতঙ্গরাও কীভাবে সাহায্য করে তা সন্ধানের বিষয় জীববিজ্ঞানীর। সুন্দরবনের বৃক্ষের কোন সম্পূর্ণ নির্দেশিকা আজও প্রস্তুত হয় নি। এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। কোন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর সংগ্রহশালায় সমৃদ্ধ হতে পারে সুন্দরবনের পুষ্পরাজির সমাবেশ।

ভূবিজ্ঞানী ও কৃষিবিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণীয় এখানকার জমি যার অধিকাংশই এক ফসলী এবং একমাত্র ধানই সেই ফসল। অথচ কার্পাস, গম, সূর্যমুখী ফুল ইত্যাদি নানা রকমের অর্থকরী ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তুলতে তাদের সতর্ক দৃষ্টি ও সুপারিশসমূহ সহায়ক হবে। এছাড়া পর্যটনের স্থান নির্বাচন নিয়ে তথ্য পাওয়া দরকার।

এমনকি ভিজনীল্যাণ্ডের মত কল্পনাশ্রয়ী যাত্রীদের দর্শনীয় প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে।

এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী মূলধন করে গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তরুণদের নিয়ে একটি অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবের কষ্টসহিষ্ণু, উৎসাহী, সাহসী, অনুসন্ধিৎসু অভিযাত্রীদের নিয়ে একটি দল গঠন করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেড় মাসাধিক-কালের জন্য জলে, স্থলে এই অভিযান পরিচালিত হবে। গৃহীত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে পরবর্তী কার্যক্রম।

সকল শ্রেণীর দরদী মানুষের আর্থিক সাহায্যের উপর এই অভিযানের সার্থক রূপায়ন নির্ভর করছে।

অভিযান সম্পর্কে কিছু বই-এর তালিকা অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার জন্যে দেওয়া হল। এসব বই পড়লে অভিযানের একটা মানসিক প্রস্তুতি হবে।

1. Travels of Mungo Park
2. (a) The R. A. Expedition
   (b) Sea routes of Polynesia
   (c) American Indian in the Pacific
   } Thor Heyer dahal
3. Mankind and mother earth —Toynbee
4. Man of Everest— Autobiography of Tenzing
5. Travelling with the innocents abraod – Mark Twain
6. Heroes of exploration—Ker & Cleaver
7. সমুদ্র থেকে আকাশ অভিযান—হিলারী
8. (a) নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টী
   (b) স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
   } গৌরকিশোর ঘোষ
9. ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বিভিন্ন বই

মণি দাশগুপ্ত
গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট
পোঃ—খাটুরা, জিলা—24পরগণা
PIN—743273

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

লোবাচেভস্কি—এক অভিনব জ্যামিতির স্রষ্টা

নন্দলাল মাইতি*

ভাব ও চিন্তাজগতে বিপ্লব সূচনা করে যাঁরা মানব সভ্যতার অগ্রগতি সাধন করেছেন, জীবদ্দশায় তাঁদের বেশীর ভাগের ভাগ্যে দুঃখ-কষ্ট জুটেছে। এমন কি চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও যে কেউ কেউ পেয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সক্রেটিসকে বিষপানে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, আর গ্যালিলিও অন্ধকার কারাগৃহে লাঞ্ছনাময় জীবন কাটিয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি আধুনিক যুগে আইনস্টাইনকে তাঁর দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ঠিক এমনিভাবে লোবাচেভস্কিও এক অভিনব জ্যামিতি আবিষ্কারের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর জীবদ্দশায় পান নি। শেষ জীবনে এই তত্ত্ব সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটি যখন তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন, তখন তিনি ছিলেন অন্ধ। অথচ ওই কাজান বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিকল্পে তিনি কী-ই না করেছেন!

নিকোলাই আইভ্যানোভিচ লোবাচেভস্কি 1793 খ্রীস্টাব্দের 2রা নভেম্বর রাশিয়ার ম্যাকারিয়েফ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ গণিতবিদের মত ছোটবেলা থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতা ছিলেন সামান্য মাইনের সরকারী কর্মচারী। নিকোলাই মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর পিতাকে হারান। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় সন্তান। কিন্তু তাঁর মা প্রাস্কোভিয়া আইভ্যানোভনা ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী মহিলা। ছোট ছোট তিনটি সন্তান

*পোঃ—ঠাকুরাণিচক, জেলা—হুগলী।

নিয়ে তিনি দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকেন। তাঁর তিনটি সন্তানই ছিল বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান।

সন্তানদের ঠিকমত মানুষ করার জন্য বিধবা প্রাস্কভিয়া আইভ্যানোভনা কাজান শহরে চলে এলেন। তিনি তাদের জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি করে দিলেন এবং তারা সবাই একের পর এক বৃত্তি পেয়ে উচ্চতর শ্রেণীতে উঠতে লাগল। নিকোলাই মাত্র আট বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়। গণিত ও প্রাচীন সাহিত্য—দুয়েতেই ছিল তার অসাধারণ অনুরাগ।

লোবাচেভস্কি মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং 1807 খৃস্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে 1811 খৃস্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। একুশ বছর বয়সে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে যোগ দেন। সহকারী অধ্যাপক, অধ্যাপক ও রেক্টর হিসাবে এখানেই তাঁর জীবনের চল্লিশ বছর কেটেছে। মাত্র তেইশ বছর বয়সে অধ্যাপকপদে উন্নীত হবার পর তাঁকে অনেক কাজের গুরুদায়িত্ব বহন করতে হয়। গণিতের পঠন-পাঠন তো ছিলই, তার উপর আবার কখনো কোন সহকর্মী ছুটিতে থাকলে তাঁকে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়াতে হত। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান ও কিউরেটারের দায়িত্বও বহন করতে হয়েছে। 1827 খৃস্টাব্দে তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটারের পদলাভ করেন। আমাদের আশুতোষের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদমর্যাদা লাভ করেও তিনি শারীরিক শ্রমকে অমর্যাদাকর বলে মনে করতেন না। লাইব্রেরী ও মিউজিয়ামের উন্নতির প্রয়োজনে কোর্ট-সার্ট খুলে পরিশ্রম করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। একবার এক বিদেশী পর্যটক কোর্টবিহীন রেকটরকে দারোয়ান বা সাধারণ একজন কর্মী ভেবে লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম দেখানোয় সাহায্য করার জন্য বলেছিলেন। এই জ্ঞানতপস্বী গণিতবিদ অবশ্য পর্যটকের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়ে বিদেশী ভদ্রলোকের পছন্দ মত সংগ্রহ ও লাইব্রেরী দেখিয়ে তিনি এমন চমৎকৃত করেছিলেন যে, ভদ্রলোক যাবার সময় তাঁকে লোভনীয় বখশিস দিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য, লোবাচেভস্কি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় গভর্ণরের ডিনার-টেবিলে মহান এই গণিতবিদের পরিচয় পেয়ে ঐ বিদেশী পর্যটকের যে কি অবস্থা হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গণিতে যে বিষয়টির তিনি স্রষ্টা তার নাম অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি। এই অভিনব বিষয়টির উপর কাজানের ফিজিক্যাল ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে (Physical Mathematical Society) 1826 খৃস্টাব্দে প্রথম বক্তৃতা করেন, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা কেউ বুঝতে পারল না। বলা হয় তিনটি প্রকল্পের উপর তিন ধরনের জ্যামিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটি, সমকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি, দ্বিতীয়টি, সূক্ষ্মকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর লোবাচেভস্কির জ্যামিতি ও

তৃতীয়টি স্থূলকোণ সম্পর্কিত প্রকল্পের উপর রীম্যানীয় জ্যামিতি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের জ্যামিতিকে একত্রে অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বলা হয়।

অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নাই। তাই, লোবাচেভস্কীয় জ্যামিতির অবাক হওয়ার মত দু-একটি উপপাদ্যর উল্লেখ করা হল :

(1) ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

(2) চতুর্ভুজের কোণসমষ্টি চার সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

(3) দুটি অপসারী সরলরেখার একটিমাত্র সাধারণ লম্ব আছে।

যুগান্তকারী এ-সব কাজ সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বনিবনা না হওয়ায় তাঁকে অধ্যাপক ও রেকটারের পদ থেকে 1846 খ্রীস্টাব্দে অপসারিত করা হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করা ছাড়া তাঁর আর কোন সুযোগই রইল না।

এরপর তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়। 1855 খ্রীস্টাব্দে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উৎসবে তিনি তাঁর সমগ্র জ্যামিতিক গবেষণা সম্বন্ধে পুস্তকটি উপহার দেন। অবশেষে 1856 খৃঃ 24শে ফেব্রুয়ারী তাঁর মৃত্যু হয়।

জোনাকী

অশোক বিজলী*

বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে প্রায় দেড় হাজার রকমের জোনাকী আছে। এদের আলোর রং আলাদা আলাদা, আলো বিকিরণের সময়ও আলাদা। কারও গা থেকে দু-সেকেণ্ড অন্তর আলো বের হয়। আবার এমন জোনাকী আছে যারা আট থেকে দশ মিনিট অন্তর আলো দেয়।

জোনাকীর সময়জ্ঞানও খুব বেশী, এদের আলো দেবার নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার ঠিক পরে। সময়ের ব্যাপারে জোনাকীরা ঘড়ির কাঁটার মত নির্ভুল। গবেষণাগারে নকল অন্ধকার সৃষ্টি করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, জোনাকীদের কখনও ভুল হয় নি। দিন ও রাত্রির পার্থক্য বুঝতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, জোনাকীর দেহে লুসিফেরিন নামে রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সংমিশ্রণের ফলেই সৃষ্টি হয় এই আলো। জোনাকীর আলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে আলো আছে কিন্তু তাপ নেই, তাই বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছে ঠাণ্ডা আলো। দেখা গেছে একটি মোমবাতি থেকে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ আলো সৃষ্টি করতে চল্লিশটি জোনাকীর দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী সৈনিকরা এই ধরণের ঠাণ্ডা আলো প্রচুর পরিমাণে

*গ্রাম—বনগোপালপুর, পোঃ—সুতাহাটা, জেলা—মেদিনীপুর।

কাজে লাগিয়েছিল, তারা মৃত জোনাকীর দেহ গুঁড়ো করে সঙ্গে রাখত। দরকারমত সেই গুঁড়ো কিছুটা হাতের চেটোয় নিয়ে তাতে জল মিশিয়ে আলো জ্বালাত। এই আলোয় হাতও পুড়ত না, অথচ বনের মধ্যে অন্ধকারে ম্যাপ দেখা ইত্যাদির মত ছোট-খাট কাজ সহজেই করতে পারত।

পৃথিবীর নানা দেশে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য প্রসাধন হিসাবে ব্যাপকভাবে জোনাকীর ব্যবহার দেখা যায়, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা শরীরের শোভা বাড়াবার জন্য মাথার চুল ও দেহের নানা অংশে জোনাকী গেঁথে রাখে। জাপানে ছোট ছোট নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাড়ির দরজা জানালা ও লতাপাতার মধ্যে রাত্রিবেলা জোনাকী আটকে রেখে দেয়, মধ্য আফ্রিকায় গভীর অরণ্যে যেসব মানুষ বাস করে তারা রাত্রে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার সময় জুতোতে কিংবা পায়ের পাতায় কয়েকটি জোনাকী বসিয়ে নেয়, ফলে তাদের পথচলার সুবিধে হয়।

জোনাকীর খাদ্য হল পুকুরের ছোট খাট শামুক, গুগলি ও অন্যান্য পোকামাকড়, রাত্রে এদের শাঁসটুকু খেয়ে জোনাকিরা খোলাগুলি ফেলে দেয়।

ওজোনকে বাঁচানো দরকার

শিশির বন্দ্যোপাধ্যায়*

[শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী, বিমানের বর্জিত গ্যাস স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে। তার ফলে আরও বেশী পরিমাণ অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাবে যাতে মানুষের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।]

পৃথিবীর উপরে আছে বায়ু। আমরা বায়ু-সমুদ্রে ডুবে আছি। এই বায়ু কতকগুলি গ্যাসের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। মাটির উপরে বায়ুর প্রথম অংশটাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। বিষুবরেখা থেকে প্রায় $23\frac{1}{2}^{\circ}$ উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের অঞ্চলগুলিতে বায়ুর এই অংশের গড়-উচ্চতা প্রায় 16 কিলোমিটার হয়। মেরু ও মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই উচ্চতা প্রায় 8 থেকে 10 কিলোমিটার হয়। ট্রোপোস্ফিয়ারে উচ্চতা যতই বাড়তে থাকে, বায়ুর তাপমাত্রা, চাপ এবং ঘনত্ব ততই কমতে থাকে। একদম উপরের তলের তাপমাত্রা 210°k হয়। ট্রোপোস্ফিয়ার স্তরেই মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি সীমাবদ্ধ থাকে এবং এসবের ফলে ঐ অংশের দূষিত পদার্থগুলি অনেকাংশে দূর হয়। ট্রোপোস্ফিয়ারের উপরের প্রান্ততলকে বলা হয় ট্রোপোপজ। এই ট্রোপোপজের উপরে বায়ুর আর একটা বিরাট অংশ রয়েছে। এর নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এর উচ্চতা প্রায় 50 কিলোমিটার হয়। এখানকার কাজ হয় ট্রোপোস্ফিয়ারের

*পোঃ+গ্রাম—মল্লিকপুর, জেলা—24 পরগণা

ঠিক বিপরীত। এখানে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ে। মেরু অঞ্চলে প্রথমে কিছুদূর তাপমাত্রা স্থির থাকে এবং পরে উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে তাপমাত্রা বাড়ে। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ঠাণ্ডা বা ভারী বাতাস নীচে থাকে এবং গরম হালকা বাতাস উপরে থাকে। ফলে এই অংশে বাতাসের চলাচল খুব কম হয় এবং মিশ্রিত অপদ্রব্যের দূরীকরণও প্রায় হয় না বললেই চলে। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় দূষিত গ্যাসীয় পদার্থগুলি বছরের পর বছর থেকেই যায়। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানগুলি (supersonic transport aircrafts) এই দূষিত গ্যাসীয় পদার্থের জন্য দায়ী। স্ট্রাটোস্ফিয়ারের নীচের অংশ দিয়ে উড়ে যাবার সময় ঐ বিমানগুলি যেসব গ্যাস ছাড়ে তার মধ্যে নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পই প্রধান। এখানে এই সব গ্যাস তিন চার বছর থাকে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুমণ্ডলের এই অংশে অর্থাৎ স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজোন (O_3) গ্যাস থাকে। ওজোন গ্যাসের কাজ হলো সূর্য থেকে নিঃসৃত যেসব অদৃশ্য রশ্মি জীব ও উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর, সেই সব রশ্মিগুলিকে শোষণ করা। ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মি থেকে আরম্ভ করে খুব বড় তরঙ্গের নিঃসরণ সূর্য থেকে হয়। $3200\mathring{A}$ (10^{-8} cm $= 1\mathring{A}$)-এর চেয়ে ছোট তরঙ্গের রশ্মিগুলিই ক্ষতিকর। এইসব রশ্মি খুব কমই পৃথিবীতে আসে। ওজোন $3200\mathring{A}$ থেকে শোষণ করতে আরম্ভ করে। $2950\mathring{A}$-এর চেয়ে ছোট তরঙ্গের কোন রশ্মিকে এই গ্যাস পৃথিবীতে আসতে দেয় না। বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে অতিবেগুনী রশ্মি (ultra-violet) পৃথিবীতে চলে আসে এবং জীব ও উদ্ভিদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এই রশ্মি খালি চোখে দেখা যায় না। যেসব রশ্মি দেখা যায় তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $4000\mathring{A}$-এর উপরে। দীর্ঘ দিন ধরে এই অতিবেগুনী রশ্মি (uv – B) শরীরের উপর এসে পড়লে কর্কট রোগ (cancer) হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। অনুমান করা হচ্ছে যে ওজোন 1% কমলে অতিবেগুনী রশ্মি 2% বাড়ে এবং এর ফলে প্রতি বছরে প্রায় 10,000 লোক কর্কট রোগে আক্রান্ত হতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধিও রোধ হতে পারে এবং উদ্ভিদ অকালে মারা যেতে পারে। এসব ছাড়া অতিবেগুনী রশ্মিস্রোত বাড়লে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাপমাত্রার পরিবর্তন আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটায়। তার ফলে কেবলমাত্র আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে তাই নয়, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাবার সম্ভাবনা।

যতদূর জানা যায়, সূর্য থেকে নির্গত ফোটন কণা কোন অনুঘটকের উপস্থিতিতে যখন অক্সিজেনের উপর পড়ে তখন ওজোন (O_3) উৎপন্ন হয়।

$$O_2 + \text{ফোটন কণা} \rightarrow O + O$$

$$O_2 + O \rightarrow O_3$$

আগেই বলা হয়েছে শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানগুলি উড়ে যাবার সময় নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO) ছাড়ে। এই NO গ্যাস O_3-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে NO_2 তৈরি করে।

$$O_3 + NO \rightarrow O_2 + NO_2$$

এই NO_2 আবার ফোটন কণা ও O-এর দ্বারা NO গ্যাস পরিণত হয়।

(i) NO_2 + ফোটন কণা → NO + O

(ii) $NO_2 + O \rightarrow NO + O_2$

এই ভাবে NO গ্যাস ওজোনকে ধ্বংস করে।

বর্তমান বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে যদি এই ওজোন গ্যাসকে ধরে না রাখা যায় তাহলে ক্ষতির মাত্রা দিনের পর দিন বাড়বে এবং শেষে এর প্রভাব মানুষকে একটা বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেবে।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির মাংসভোজী প্রাণী হলো এক জাতের বাদামী রঙের ভালুক। এই ভালুক অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায় না, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যেই এদের বাস। এরা কাটমাই ভালুক নামে পরিচিত। সাধারণতঃ একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কাটমাই ভালুকের ওজন 1500 পাউণ্ডের মত এবং সাধারণতঃ এরা নয় ফুট লম্বা হয়। একটা পূর্ণবয়স্ক বাঘ বা সিংহের তুলনায় এরা তিনগুণ বড় হয়ে থাকে। বিশাল দেহ এবং প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হলেও এদের স্বভাব মোটেই উগ্র নয়। খুব কাছাকাছি না গেলে বিপদের বড় একটা আশঙ্কা থাকে না। গ্রীষ্মকালে এদের প্রিয় খাদ্য হলো স্যামন মাছ। খরস্রোতা নদী থেকে এরা স্যামন মাছ শিকার করে উদরসাৎ করে। বিশাল শরীরের ভারে এদের গতি মন্থর হলেও কাজের সময় কিন্তু খুব ক্ষিপ্রতার পরিচয় দেয়। সব সময় এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে। গা চুলকালে বা শরীরের ময়লা পরিষ্কার করবার জন্য এরা প্রথমে নরম মাটি বা বালির উপর একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসে পড়ে এবং সেই অবস্থায় চারদিকে ঘুরতে থাকে। এর ফলে দু-এক মিনিটের মধ্যে এক ফুট বা তারও বেশী গভীর একটা বৃত্তাকার গর্ত তৈরি হয়ে যায়।

সুগন্ধের উৎস

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

আমরা অনেকেই, বিশেষ করে মহিলারা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে যাবার সময় সাজপোষাকের পর একটু সেন্ট (scent) ব্যবহার করি। কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা বেশীর ভাগ সুগন্ধি দ্রব্য তৈরী হলেও উদ্ভিদ-জগৎ এবং প্রাণী-জগৎ থেকেও মূল্যবান মনমাতানো সুগন্ধি প্রস্তুত করা হয়। আশ্চর্যের কথা, উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ মূল পদার্থগুলি প্রথমাবস্থায় সুগন্ধ-যুক্ততো নয়ই বরং গন্ধহীন বা দুর্গন্ধযুক্তই বটে। নিম্নে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

গন্ধগোকুল (Civet)—গ্রামের লোক গন্ধগোকুলকে ভালোভাবেই জানেন। ধারেকাছে গন্ধগোকুল এলেই নাকে চাপা দিতে ইচ্ছে করে। ঐ গন্ধগোকুলের লাঙ্গুলের মূলের নীচের দিকে দুটি গ্রন্থির নিঃসৃত রস থেকে অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈরি হয়। 1 কিঃ গ্রাঃ পরিস্রুত ঐ রস থেকে 36·000—40·000 টাকার সুগন্ধি তৈরি হয়।

অ্যামবারগ্রিস (Ambergris)—এই বস্তুটি গ্রীষ্মমণ্ডলের সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়। অনুমান করা হয় এগুলি পুরুষ তিমির বমি। সুরাসারে বিগলিত ঐ বস্তু পরিস্রুত হয়ে কিঃ গ্রাম প্রতি 2,00,000 টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রীত হয়।

কস্তুরি—কস্তুরিমৃগের কথা অনেকেরই শোনা আছে। এই জাতীয় মৃগ এশিয়ায় বিশেষ করে হিমালয়ের উপরভাগে বাস করে। এর নাভির কাছে একটি পিণ্ডাকার অংশ গন্ধযুক্ত। এই অংশগুলি সংগ্রহ করার জন্য প্রাণীটিকে হত্যা করা হয়। পিণ্ডটি বের করে নিয়ে প্রাণীটিকে ফেলে দেওয়া হয়। এক কিঃ গ্রাঃ কস্তুরির মূল্য এক লাখ পঁচাশী হাজার থেকে আড়াইলাখ টাকা।

ক্যাষ্টোরিয়াম (Castoreum)—বীবর নামক প্রাণীর গ্রন্থির রস। বীবর (Beaver) একটি খরগোশের মত চতুষ্পদ প্রাণী। ক্যানাডা এবং রাশিয়ায় পাওয়া যায়।

লাবডেনাম (Labdanum)—এক প্রকার উদ্ভিদের আঠালো রস। মিষ্টি গন্ধযুক্ত সুগন্ধি তৈরি হয়।

নাখলা (Nakhla)—এটিও সামুদ্রিক প্রাণী থেকে পাওয়া যায়। শুকনো অবস্থায় মাছের আঁশের মত দেখায় এবং ঐ অবস্থায় কোন গন্ধ থাকে না।

*25A, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006

সবুজ বানর থেকে সাবধান

কমল চক্রবর্তী*

বানর দেখতে কেমন সকলেই জানি। কিন্তু সবুজ বানর কি তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। আসলে সবুজ বানর কিন্তু বানরই নয়, এটা একটা অসুখের নাম। 1975-এর ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার লোকেরা হঠাৎ এক রোগের সম্বন্ধে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। সেই রোগের বৈজ্ঞানিক নাম 'মারবার্গ-ভাইরাস' (Marburg Virus)। এরই চলতি নাম 'সবুজ বানর'।

জার্মানীতে 1967 সালের এক সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 31 জন লোক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। আফ্রিকায় এক ধরনের বানরের থেকে এই রোগের বিস্তারলাভ হয়েছে। এই রোগের বীজাণু রক্তে প্রবেশ করলে তা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগ বেশ ছোঁয়াচে। যার জন্য এই রোগের সংস্পর্শে অন্যকে অসুস্থ করে তোলে। হাসপাতালের নার্স ও ডাক্তাররাও এই রোগের চিকিৎসায় নিজেরাই রুগী বনে যান। একজন অস্ট্রেলিয়াবাসী, যখন রোডেশিয়া হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তিনি এই রোগে আক্রান্ত হন। তাঁকে জোহানসবার্গ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিন্তু তাঁকে বাঁচান সম্ভব হয় নি। এই অস্ট্রেলিয়াবাসীর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল, সেও কিছুদিন পর এই রোগে আক্রান্ত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসায় মেয়েটি রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তার শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

1967 সাল থেকে এই রোগ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার জন্য পৃথিবীর বহু মানুষই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। 1975 সালে জার্মান এবং যুগোস্লাভ সরকারকে বেশ ভাবিয়ে তুলল এই রোগ। এরপর 1976 সালের শেষদিকে এই রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিল সুদান ও জাইরেতে।

যে ভাইরাস এই রোগের কারণ তার নাম 'মারবার্গ ভাইরাস'। এই রোগের প্রথমে বেশ জ্বর হয় এবং পরে রক্ত বমি শুরু হয়। বেশী রক্ত-বমি হলে জীবন সংশয় হয়ে ওঠে। সুতরাং ডাক্তারদের কাছে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল, কারণ এই ধরণের রোগের মোকাবিলা তাঁদের আগে করতে হয় নি। এই রোগ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বহুলোক প্রাণ হারাতে লাগল। তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থাও চলতে লাগল ব্যাপকভাবে। এখন পর্যন্ত ডাক্তাররা এর ভাল ওষুধের সন্ধান পান নি। প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে এই বীজাণু আট থেকে নয় মাস পর্যন্ত থাকতে পারে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চোখ থেকে এই রোগের ভাইরাস বের করে ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ডাক্তাররা এই অসুখের নিরাময় করতে পেরেছেন কিন্তু এখনও তারা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন নি। আমাদের দেশে এই রোগ এখনও আসে নি, তাই আমরা এবিষয়ে খুব বেশী ভীত নই। কিন্তু পৃথিবীর সব মানুষই আমাদের আপন আমরা চাই এই রোগ থেকে সকলেই যেন মুক্তি পান।

---

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা।

মৌমাছির বিষ

আমিনুল ইসলাম*

[মৌমাছির বিষ-এর গঠন, প্রয়োগ, রাসায়নিক ও ভেষজ গুণাবলী আলোচিত হয়েছে ।]

মৌমাছির গুন গুন শব্দ কবিদের উন্মোন্ন যতই ঘটাক না কেন, খুব কম লোকই আছেন যিনি এই গুন গুন শব্দে ভয় পান না । সত্যি হয়তো এতে ভয়ের কিছু থাকে না কারণ মৌমাছি সাধারণতঃ হুল ফোটায় না যদি না ওদের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটান হয় । যাই হোক এই বিষ, বিগত কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

এই বিষ একটি গ্রন্থির নিঃসৃত পদার্থ । রূপান্তরিত সহকারী জনন অঙ্গসমূহ, সাধারণতঃ একজোড়া অম্লগ্রন্থি (acid gland), একটি বিষথলি, (poison reservoir) একটি ক্ষার গ্রন্থি (alkaline gland) এবং একটি সম্মিলিত নালী নিয়ে বিষগ্রন্থি গঠিত এবং এই সাধারণ নালীটি হুল-এর সঙ্গে যুক্ত । হুল ফোটানোর সময় শিকারের দেহে হুলটি ফুটে গেলে ইনজেকশনের ন্যায় ঐ স্থানে বিষ নিক্ষিপ্ত হয় । কিন্তু সুখের বা দুঃখের কথা এই যে, মৌমাছি ঐ ব্যবহৃত হুলটি আর শিকারের দেহ থেকে বের করে আনতে পারে না ফলে ঐ হুল নামক ব্রহ্মাস্ত্রটি মৌমাছি সারা জীবনে একবারই ব্যবহার করতে পারে, তারপর ঐ বিষের আর কোন মূল্যই থাকে না । কারণ একবার খসে গেলে হুল আর নূতন করে তৈরি হয় না ।

মৌমাছির বিষ স্বচ্ছ, উগ্র গন্ধযুক্ত ও তিক্ত স্বাদযুক্ত, এটি অম্লজাতীয় তরল, এতে ফর্মিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, অরথোফসফোরিক অ্যাসিড পাওয়া গেছে । এ-ছাড়া পাওয়া গেছে হিস্টামিন, ট্রিপটোফ্যান, সালফার, তামা এবং ক্যালসিয়াম । মেলিটিন নামক এক প্রকার পদার্থ এর জ্বালা এবং ক্ষতের জন্য দায়ী । মৌমাছির বিষে দুটি উৎসেচকও পাওয়া গেছে— হায়ালিউরোনিডেজ এবং ফসফোলাইপেজ ।

হুল ফোটানোর সময় একটা মৌমাছি প্রথমবারে যে বিষটুকু ঢালে সেটা বিষাক্ত নয় । সেই মাত্রার দশ গুণ হলে সেটি হয় বিষাক্ত এবং মারাত্মকভাবে বিষাক্ত হতে গেলে দরকার এক-শ' গুণ । সাধারণতঃ 200-300 হুল ফোটানো একজন মানুষের সংজ্ঞা লোপের পক্ষে যথেষ্ট এবং 500 বা ততোধিক হুল মানুষের মৃত্যু ঘটায় । মৌমাছির বিষ নার্ভতন্ত্রের উপর কাজ করে, এবং প্রাথমিকভাবে শ্বাসঅঙ্গ ও হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হয় ।

এই বিষকে কোন চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা এনিয়ে বিজ্ঞানীমহল বহুকাল ধরে ভেবে আসছেন । প্রাচীনকাল থেকেই মৌমাছির বিষ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে ।

* 'সেবায়ন', নিউ হসপিটাল রোড, চুঁচুড়া, হুগলী (712 101)

মৌমাছির বিষের দ্বারা যে রোগটির চিকিৎসা সর্বজনবিদিত সেটি হল 'বাত'। সর্বপ্রথম ভিয়েনার একজন চিকিৎসক এফ. ট্রেটস্ (F. Tretsch) এই বিষ দ্বারা বাতের চিকিৎসায় সুফল লাভ করেন। তিনি দেখান যে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের কোন একটি বিশেষ অংশ এই রোগে আক্রান্ত হয়, এই বিষের প্রভাবে সেটি তার স্বাভাবিক গুণাগুণ ফিরে পায়।

বাতের পরেই উল্লেখযোগ্য রোগ হল নিউরাইটিস (neuritis) এবং নিউরালজিয়া (neuralgia)। বিষদ্বারা এই রোগের চিকিৎসা সর্বপ্রথম করেন একজন রাশিয়ান চিকিৎসক—ইরুসালিমচিক (Erusalimchik), 1938 সালে।

এই বিষ দ্বারা কিছু চোখের রোগেরও চিকিৎসা হয়ে থাকে যেমন—কেরাটো-কনজাংটিভাইটিস (kerato-conjunctivitis) ; আইরিটিস (iritis) এবং আইরিডোসাইক্লিটিস (iridocyclitis)। এছাড়াও মৌমাছির বিষ রক্তচাপ কমানোর উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন চামড়ার রোগের বিরুদ্ধে, এমনকি বিভিন্ন স্ত্রীরোগ এবং শিশুদের রোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মৌমাছির বিষদ্বারা চিকিৎসা সরকারীভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে রাশিয়ায়, আমেরিকায়, চীনে এবং রুমানিয়ায়। এখন মৌমাছির বিষ থেকে ভাইর‍্যাপিন (virapin) এবং এপিসারথ্রন (apisarthron) নামে দুটি ওষুধও প্রস্তুত করা হয়েছে। মৌমাছির বিষ দিয়ে চিকিৎসা করতে গেলে সবসময়ই কোনো না কোনো বিশেষজ্ঞ দিয়ে করানো উচিত ; বিশেষত যখন শিশু এবং বৃদ্ধদের চিকিৎসা করা হবে।

যাঁরা মৌমাছির চাষ করেন তাঁরা খালি মধু এবং মৌমাছির মোমের কথাই ভাবেন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিষও দরকারী এবং দামী, এবং হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সাপের বিষের মতো মৌমাছির বিষও অর্থনৈতিক দিক থেকে মূল্যবান হয়ে দাঁড়াবে। অতএব দেখা যাচ্ছে বিষ খালি বিষই নয় ওষুধও, অবশ্য দুটোই মাত্রাভেদে।

মধু উৎপাদনের কথা

তরুণকুমার দেবনাথ*

[লেখক নিজে একজন মৌমাছি পালক। কিভাবে মধু উৎপাদন করা যায় তা লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে এই নিবন্ধে বিবৃত করা হয়েছে।]

মধু সর্বকালে সর্বদেশে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য ও ঔষধ হিসাবে গণ্য। মধুর শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট। এক পাউণ্ড মধুতে প্রায় 1600 কিলো ক্যালরি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, (1 গ্রাম জলের 1° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাকে 1 ক্যালোরি বলে) যা কিনা দুধের তাপশক্তি উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে প্রায় 6 গুণ বেশী। মধুতে আছে গ্লুকোজ, লেভুলোজ, অর্গানিক অ্যাসিড, ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য যা শরীর গঠনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মধু সহজপাচ্য কারণ মৌমাছির শরীরেই এর পাচন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। মাতৃদুগ্ধে যে সমস্ত উপাদান থাকে না তাও মধুতে বর্তমান। মাছ, মাংস ও শাকসব্জী অপেক্ষা মধুর ক্যালোরি উৎপাদন ক্ষমতা অধিক। কলোরাডো কৃষি মহাবিদ্যালয়ের জীবাণুবিদ ডাঃ ডব্লিউ. বি. স্যাকেট (Dr. W. B. Sacket) বিভিন্ন পরীক্ষার পর মধুর জীবাণুনাশক বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। মধু নিম্নলিখিত জীবাণুনাশক হিসাবে কাজ করে, (1) টাইফাস্, (2) প্যারাটাইফাস্, (3) এনটীরিডিস্, (4) ডিসেণ্ট্রি, (5) সুইফেসটিফার ইত্যাদি। এ ছাড়াও রুশ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন যে মৌমাছি মধু, পরাগ ও জল মিশিয়ে যে 'বী ব্রেড' শূককীটকে খাওয়ায় তার ব্যবহারে ক্যান্সারের জীবাণুও নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া মধু ফুসফুসের রোগ, হৃদরোগ, লিভার বা যকৃতের রোগ সারাতে ব্যবহৃত হয়। মধু প্রসাধনসামগ্রী হিসেবে খুব ভাল। মধুর ব্যবহারে যৌবন ও লাবণ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক 100 গ্রাম থেকে 200 গ্রাম এবং প্রত্যেক শিশু দৈনিক 30-60 গ্রাম মধু নির্বিঘ্নে খেতে পারে। কোন রোগের উপশমের জন্য মধু অন্তত দেড় থেকে দু-মাস খাওয়া উচিত।

এত সময় ধরে যে মধুর ব্যবহার ও খাওয়ার নিয়ম বলা হল এতেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যায় না। এই মধু কিভাবে উৎপাদন করা যায় তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণত চার ধরণের মৌমাছি দেখা যায়, যেমন—(1) পাহাড়ীয়া মৌমাছি (Apis Dorsata), (2) ভারতীয় মৌমাছি (Apis Indica), (3) ক্ষুদে মৌমাছি (Apis Floriea), (4) ডামার মৌমাছি (Damar Bee)। ভারতীয় মৌমাছি বাক্সে রেখে নিজেদের তত্ত্বাবধানে পালন করা যায় কারণ এই জাতীয় মৌমাছি অন্ধকারে থাকতে ভালবাসে এবং এদের চাক থেকে ভাল মধু

* গ্রাম—বেস্তপুল, ডাকঘর—মছলন্দপুর, জেলা—24 পরগণা

পাওয়া যায়। ভারতীয় মৌমাছি পালন করার জন্যে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। যেমন (1) এ টাইপ মৌমাছি বাক্স (A type bee hive), (2) ধোয়াদানী (smoker), (3) মধু নিষ্কাশন যন্ত্র (honey extractor) ইত্যাদি।

A type মৌমাছি বাক্সের 5টি ভাগ আছে (1) বটম বোর্ড (bottom board), (2) ব্রুড চেম্বার (brood chamber), (3) সুপার চেম্বার (super chamber), (4) ক্রাউন বোর্ড (crown board), (5) টপ (top)।

এখন প্রশ্ন, ভারতীয় মৌমাছির চাক দেখতে পেলে সেই স্থানে বাক্স রেখে দিলেই কি মৌমাছি বাক্সে ঢুকবে? না, তা নয়। প্রকৃতির থেকে চাক ধরে কিভাবে বাক্সে আনা যায় তা এখানে বলা হল। প্রশিক্ষণ না নেওয়া থাকলে মৌমাছিরা চাক ধরার কালে হুল ফোটাতে পারে। কয়েকটি হুল খাওয়ার পর যদি কেউ এই মৌমাছি পালন করা ছেড়ে দেন তাহলে তিনি মস্ত বড় ভুল করবেন। কারণ মৌমাছির হুলে যে বিষ থাকে সেই বিষে ফরমিক অ্যাসিড, অর্থ-ফসফোরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে। অন্যান্য পদার্থের মধ্যে থাকে হিসটামিন (histamin), সালফার ইত্যাদি। চাক ধরতে হলে যে সমস্ত জিনিষ সঙ্গে নিতে হয় তা হল হাইভ (কুইনগেট সহ) ধোয়াদানী, নারিকেলের ছোবড়া, হাতুড়ি, বাটালি, ছুরি, কলার সুতো ইত্যাদি। চাক ধরা কাজ গরমের দিনে সকাল 9টার পূর্বে এবং শীতের দিনে সকাল 9টা থেকে বিকেল 4 টার মধ্যে সেরে নিতে হয়। মনে করা যাক একটি গাছের কোটরে একটি চাক আছে। ঐ চাকটিকে বাক্সে আনতে হলে কোটরের মুখ ছোট থাকলে বড় করে কেটে নিতে হবে। এখন ধোয়াদানীর সাহায্যে ধোয়া দিলে মাছি কিছু বেরিয়ে আসবে এবং কিছু কোটরের মধ্যে জমা হবে। এখন চাকটির যে অংশ কোটরে জোড়া ছিল ঐ অংশে কেটে দিতে হবে। চাক বের করবার পর যদি দেখা যায় চাকে মধু জমা আছে তাহলে ঐ মধু জমা অংশটিকে কেটে বাদ দিতে হবে। বাকী যে অংশে ডিম, শূককীট, মূককীট রয়েছে ঐ অংশকে ব্রুড ফ্রেমে (brood frame) কলার সুতার সাহায্যে বেঁধে দিতে হবে। মধু অংশকে সুপার ফ্রেমে (super frame) বাঁধা যেতে পারে। ফ্রেমে চাক বাঁধা শেষ হলে কুইন গেট (queen gate) তালপাতা দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এখন যে সমস্ত মাছি কোটরে বসে ছিল ওদের হাত দিয়ে নিয়ে এসে রুমাল তুলে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে বাক্সে দিতে হবে। এসময় রাণী যদি বাক্সে প্রবেশ করে তাহলে অন্যান্য মৌমাছিরা বাক্সে ঢোকার জন্য ভীড় করতে থাকবে। তখন তালপাতা সরিয়ে নিলে সমস্ত মাছি ভিতরে প্রবেশ করবে। এই অবস্থায় বাক্সকে ঐ স্থানে একদিন রেখে দেওয়া উচিত। কুইন গেট লাগানোর ফলে রাণী বাইরে বেরোতে পারবে না কিন্তু শ্রমিকরা তখন তাদের কাজ শুরু করে দেবে। যে সমস্ত জায়গায় ফুল বেশী তার কাছে বাক্স রেখে দিলে মধু বেশী পাওয়া যাবে। চাক পর্যবেক্ষণ কালে যদি দেখা যায় সুপার চেম্বারের ফ্রেমের চাকগুলির মুখ মোম দিয়ে এঁটে দেওয়া এবং সোনালী রঙ হয়েছে তা হলে বুঝতে হবে চাকে মধু রয়েছে। এই

অবস্থায় মধু নিষ্কাশন না করলে তারা আর মধু জমানোর জায়গা পাবে না। মধু জমা হলে সামান্য ধোয়া দিয়ে সুপার ফ্রেমটি তুলে আনতে হবে। তখন যদি তাতে কিছু মৌমাছি থাকে তাদের ব্রাশের সাহায্যে বা সামান্য ঝাঁকুনি দিলে তারা উড়ে যাবে। এখন ছুরি সামান্য গরম করে মোমের উপর ধরলে মোম গলে যাবে। তারপর ঐ চাকটিকে মধু নিষ্কাশন যন্ত্রে বসিয়ে দিতে হবে। আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করি তার নাম 'টেনজেনশিয়াল এক্সট্রাকটর'। এই যন্ত্রে একবারে চারটি ফ্রেমের মধু বের করা যায়। চাকগুলিকে যন্ত্রের মধ্যে লম্বভাবে বসিয়ে যদি যন্ত্রের হাতল ঘোরানো হয় তাহলে মধু বেরিয়ে আসবে কিন্তু চাকের কোন ক্ষতি হবে না, এই চাক আবার মৌমাছিরা ব্যবহার করতে পারবে। এই যে মধু পাওয়া গেল এই মধুকে তখন না খেয়ে বিশুদ্ধ করে খাওয়া ভাল। মধুকে বিশুদ্ধ করতে হলে মধু ছেকে নিয়ে মধু পাত্রটিকে একটি জলগাহের মধ্যে রেখে 140°—150° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপ দিলে মধু বিশুদ্ধ হবে এবং এই মধু অনেকদিন ভাল থাকে এবং এই মধু স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।

প্রশ্ন ও উত্তর

1. **প্রশ্ন : (ক)** সম্প্রতি আমাদের অঞ্চলে কয়েকটি আলু গাছে ফুল ধরতে দেখা যায়। ক্রমশ সেগুলি গোলাকৃতি সবুজ বর্ণের ফলে রূপান্তরিত হয়। এর কারণটা কি? এই ফল থেকে কি বীজ হয়, যা দিয়ে আবার আলুর চাষ হতে পারে?

(খ) টেলিভিশনের পর্দায় যে ছবি দেখি সেগুলি কি ক্যামেরায় তোলা যাবে?

দেবতোষ সাহা (বয়স 16)
কামদেবপুর, হুগলী

উত্তর : (ক) সব আলু গাছেই স্বাভাবিকভাবে ফুল ও তাথেকে ফল হওয়ার কথা। কারণ আলু হচ্ছে স-পুষ্পক গোষ্ঠীর দ্বি-বীজপত্রীয় গোত্রের সোলেনেসী পরিবারের উদ্ভিদ যার বোটানি-নাম হচ্ছে সোলেনাম টিউবারোসাম (Solanum tuberosum)। বেগুন, লঙ্কা, টমাটোও এই সোলেনেসী পরিবারভুক্ত। কিন্তু আলু গাছের মাটির তলায় অবস্থিত কাণ্ডের কিছু শাখা তাদের প্রান্তভাগে প্রচুর খাদ্যসম্ভার সঞ্চয় করে স্ফীত (tuber) হয়ে ওঠে। ঐ স্ফীত অংশের উপরিভাগে অনেকগুলি গর্ত সৃষ্টি হয় যাকে বলে 'চোখ', সেই চোখ থেকে আবার সহজেই নতুন কাণ্ড বা গাছ গজিয়ে আলুর বংশবিস্তার ঘটায়। তাই এদের ফল থেকে বীজ সংগ্রহ না করে ঐ স্ফীত কাণ্ডকেই বীজ হিসাবে ব্যবহার করে সহজেই আলুর চাষ করা হয়। আর ফলের বীজ থেকে গাছ তৈরি করা বেশ কষ্টকর। সব পরিবেশে তা হয়ও না। সেই বীজ

থেকে ভাল আলু হয় না, গাছও ভাল হয় না, আর ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে গেলে ততদিনে নীচের আলুগুলি নষ্ট হয়ে যাবে।

(খ) নিশ্চয়ই, তবে ভাল ক্যামেরা ও অভিজ্ঞতা চাই।

2. প্রশ্ন : (ক) এক হাঁড়ি ফুটন্ত জলের মধ্যে কিছু চাল দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ির মুখ ভাল করে বন্ধ করে চুল্লি থেকে নামিয়ে একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে এমনভাবে বন্ধ করা হল যাতে হাঁড়ির তাপ কোন মতে বাইরে বেরোতে না পারে। তাতে চাল ফুটে ভাত হবে কি ?

(খ) আমাদের দেহে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে যেসব হর্মোন নিঃসৃত হয় সেই সব হর্মোন কি কি মৌল (যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, লোহা, সালফার ইত্যাদি) দিয়ে তৈরী ?

(গ) হরমোন কি রক্ত থেকে পৃথক করা যায় ?

(ঘ) টেস্টোস্টেরন হরমোন ও শুক্রাণু কি একই জিনিষ ?

(ঙ) আমাদের দেহে হরমোন ও উৎসেচকের মধ্যে কোন্‌টির গুরুত্ব বেশী ?

গোবিন্দ পাল
শ্রীপল্লী, বর্ধমান

উত্তর : (ক) সবটা নির্ভর করছে কতখানি চাল, কতটা জল এবং কতক্ষণ কাঠের বাক্সে রাখা হবে তার উপর। চালগুলি সিদ্ধ হওয়ার জন্য যে পরিমাণ তাপ দরকার, ঐ ফুটন্ত জলের সামগ্রিক তাপ সেই অনুপাতে থাকলে চালগুলি অবশ্যই সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে হাঁড়িকে যেভাবেই বন্ধ করা হোক না কেন তা থেকে কিছু তাপ স্বাভাবিকভাবে বিকিরিত হয়ে যাবেই। সেইজন্য সময়ের গুরুত্ব অর্থাৎ বিকিরিত হয়ে যেতে যেতে যে পরিমাণ তাপ জলে থাকবে তা কতখানি চালকে সিদ্ধ করতে পারবে সেটাই বিবেচ্য। অবশ্য চাল ফুটে কথাটা ঠিক নয়, ফুটন্ত বা গরম জলে চাল সিদ্ধ হয় মাত্র, ফুটে না।

(খ) হরমোনের রাসায়নিক গঠনে সবক্ষেত্রেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, এই তিন মৌল বিভিন্ন ধরণের রিং যাকে বলে হাইড্রোকার্বন রিং বা চেন ফর্মে আছে। সমস্ত স্টেরয়েড হরমোনই এই তিন মৌল দিয়ে তৈরী। নন্‌-স্টেরয়েড বৃহত্তর হরমোনগুলি মূলত প্রোটিন বা তার অংশ বিশেষ—পলিপেপটাইড্‌স্‌ ও অ্যামাইনো অ্যাসিড—দিয়ে গঠিত। আর নাইট্রোজেন না হলে কোন প্রোটিন বা অ্যামাইনো অ্যাসিড হয় না। আবার কোন কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডে সালফার মৌল থাকে। তাই ঐসব হরমোনে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেন অবশ্যই আছে, তার সঙ্গে সালফার মৌলও থাকতে পারে। এছাড়া থাইরয়েড হরমোনে আছে আইওডিন—

যেটা দিয়েই এই হরমোনের গুরুত্ব। তবে বিভিন্ন মৌলের সংযোজনই বড় কথা নয়, গঠন কাঠামোয় ঐসব মৌলের পারস্পরিক অবস্থিতি ও তাদের সামগ্রিক বিন্যাস-বৈচিত্র্যই (structural arrangement) তাদের ভিন্নতর শক্তিশালী জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটায়।

(গ) অবশ্যই। অধিকাংশ হরমোনই সঞ্চালিত রক্তে কমবেশী বিদ্যমান। তা থেকে তাদের পৃথক করে সংগ্রহ করা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে রক্তে এদের পরিমাণ এত কম যে প্রমাণযোগ্য হরমোন সংগ্রহ করতে হলে শরীরের বেশীর ভাগ রক্তই বের করে নিতে হবে।

(ঘ) মোটেই না। হরমোন হচ্ছে রাসায়নিক দ্রবণ, আর শুক্রাণু হচ্ছে শরীরের বিশিষ্ট কোষ (cell)—যাকে বলে জননকোষ, প্রথমটির প্রভাবে দ্বিতীয়টি তৈরি হয়।

(ঙ) যে যার ক্ষেত্রে উভয়েই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনেক উৎসেচকের উৎপত্তি ও তাদের কর্মধারা বিভিন্ন বা নির্দিষ্ট হরমোন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশ্ন ঃ যে সব পদার্থে তড়িৎ-আধান সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে তাকেই পরিবাহী বলে। ধাতু এবং অ্যাসিড উভয়েই সেইমতো পরিবাহী। তবে, ধাতুর পরিবাহিতা ইলেকট্রনের জন্য, কিন্তু অ্যাসিডের পরিবাহিতা আয়নের জন্য কেন? আয়ন এবং ইলেকট্রনের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্যটা কি?

স্বপন দাস
শান্তিপুর, নদীয়া।

উত্তর ঃ 'যে পদার্থে তড়িৎ-আধান সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারে তাকেই পরিবাহী পদার্থ বলে'—ঠিকই, তবে ঐ-তড়িৎ আধানটি হচ্ছে ইলেকট্রন, অন্য কিছু নয়। প্রচণ্ড গতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ধাবমান ইলেকট্রনই হচ্ছে বিদ্যুৎপ্রবাহ। অবশ্য এই ধাবমান কথাটিও প্রকৃত অর্থে যুক্তিযুক্ত নয়। ইলেকট্রনগুলি তখন অতিদ্রুততালে—প্রায় আলোর গতিতে—স্থান পরিবর্তন করে মাত্র। একই ইলেকট্রন পরিবাহীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যায় না। পরিবাহী পদার্থের পরমাণুদের বহিঃকক্ষে অসম্পৃক্ত ইলেকট্রন থাকে—তাদের অল্পায়াসে উত্তেজিত করে স্থানচ্যুত করা যায়। সেই বিচ্যুত ইলেকট্রনগুলি সন্নিহিত পরমাণুর অনুরূপ ইলেকট্রনে আঘাত করে তাদের গতিশীল করে দেয়, তারা আবার পর্যায়ক্রমে একই কাজ করে চলে। এক পরমাণুর ইলেকট্রন পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রনকে স্থানচ্যুত করে তার জায়গাটা দখল করে নেয়। অতিদ্রুত ধারাবাহিকভাবে এই কাজ চলে। ফলে সেই পদার্থের সমস্ত পরমাণুর বাইরের ইলেকট্রনগুলি ক্রমান্বয়ে প্রচণ্ড গতিপ্রাপ্ত হয়, তার পরিমাণ নির্ভর করে বৈদ্যুতিক বিভব-প্রভেদের মাত্রার উপর। ধাতুর পরমাণুতে এই অবস্থা সহজে হয় বলেই

তারা সুপরিবাহী, আর যেসব পদার্থের পরমাণুতে সহজে বিচ্ছিন্ন করার মত ইলেকট্রন থাকে না তারা সেই অনুপাতে অপরিবাহী।

এখন অ্যাসিডে পরিবাহিতা ঘটে কিছুটা অন্যভাবে। দ্রবীভূত অবস্থায় অম্ল (অ্যাসিড), ক্ষার (অ্যালক্যালী), ও লবণ (সল্ট) জাতীয় পদার্থের অণুগুলি বা মূলকগুলি (radicals) সেই দ্রবণের মধ্যে দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং ওদের একভাগে ধনতড়িত ও অন্যভাগে ঋণতড়িতের সমাবেশ ঘটে তাদের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে। দ্রবণের মধ্যে এইভাবে ঐ অণু বা মূলকগুলির দু-ভাগে দুই বিপরীত তড়িৎ-অধানে বিভাজিত হয়ে যাওয়াকে বলে আয়নাইজেশন। আর ওদের প্রত্যেক অংশকেই বলে আয়ন—একটি ধনায়ন, অপরটি ঋণায়ন। সমগ্র দ্রবণে ঐ ধনায়ন ও ঋণায়ন সমমাত্রায় থাকায় দ্রবণটিকে তড়িৎ-যুক্ত বলে মনে হয় না। কিন্তু তার মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করলে ঐ দ্রবণে বিক্ষিপ্তভাবে ভাসমান আয়নগুলি তাদের বিদ্যুৎধর্ম অনুসারে পরিপূর্ণরূপে দু-ভাগে পৃথক হয়ে যায়, একদিকে পজিটিভ চার্জ বা ধনায়ন, অন্যদিকে নেগেটিভ চার্জ বা ঋণায়ন। বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিশীল ইলেকট্রনগুলি এদের কাছে পৌঁছলে ধনায়নগুলি ঐ ইলেকট্রনদের ধরে নিয়ে অপরপ্রান্তে ঋণায়ণে পৌঁছে দেয়। আসলে ধনায়ন যার অপর নাম ক্যাটায়ন—তার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রনের অভাব। সেইজন্যই তাদের পজিটিভ-চার্জ, তাই নেগেটিভ ইলেকট্রনদের তারা স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়। আর ঋণায়ন বা অ্যানায়ন-এ ইলেকট্রনের আধিক্যই রয়েছে। এই ইলেকট্রনের কমবেশীর জন্যই তাদের বৈদ্যুতিক চার্জের তফাৎ। আর সেইজন্যই আয়নিত মাধ্যমে ইলেকট্রনের গতি ধাতুর থেকে ভিন্ন ধরণের। একইভাবে যে পরিস্থিতিতে পদার্থের পরমাণুগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটন বিশেষ শক্তির প্রভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (যেমন প্লাজ্‌মা অবস্থায় বা আয়নমণ্ডলে) সেই অবস্থাকেও আয়নিত অবস্থা বলে। সেখানে ইলেকট্রনও প্রোটন প্রত্যেকেই তখন এক একটি আয়ন এবং তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্যুৎপরিবাহিতা শক্তি। এবারে নিশ্চয়ই আয়ন ও ইলেকট্রনের মধ্যে সম্পর্ক বা পার্থক্যটা বোঝা গেছে ইলেকট্রন হচ্ছে পরমাণুর মৌল কণা-সবসময়ই নেগেটিভ চার্জ, আর আয়ন হচ্ছে তড়িতযুক্ত পরমাণু বা পরমাণুর অংশ অথবা তড়িৎযুক্ত মূলক। এরা অবস্থা অনুসারে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জ-যুক্ত হয়।

[এই সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন পরিষদের 'হাতে-কলমে কেন্দ্রের' সত্যসুন্দর বর্মন]

নদী সংস্কার ও বন্যানিয়ন্ত্রণ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর, 1979 সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত আমার কয়েকটি নিবন্ধের উপর শ্রীদেবেশ মুখার্জি মহাশয়ের যে সমালোচনাটি ডিসেম্বর, 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নরূপ :—

তিনি লিখেছেন, "বন্যায় প্লাবিত অঞ্চল সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রার চেয়ে প্রবাহিত জলের আয়তনের উপর অধিক নির্ভর করে" কথাটি ঠিক। তাহলে 1978 সালে D. V. C.-র জলাধারগুলিতে আসা সর্বোচ্চ 8.5 লক্ষ কিউসেক প্রবাহকে 1.6 লক্ষ কিউসেকে কমিয়ে ও দুর্গাপুরে দামোদরের অনুমিত সর্বোচ্চ 11 লক্ষ কিউসেক প্রবাহকে 3.8 লক্ষ কিউসেকে নামিয়ে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের যে দাবী করা হয় তা কি ঠিক? কিংবা যদি বলা হত যে, 1978 সালে যখন প্রায় 55 লক্ষ একরফুট জল নিম্ন-দামোদর উপত্যকাকে ধ্বংস করেছে, তখন মাত্র 10 লক্ষ একরফুট জল জলাধারগুলিতে রাখা সম্ভব হয়েছে, (পৃ: 136 ও পৃ: 520) তাহলে D.V.C-র বক্তব্য ও প্লাবিত অঞ্চলের মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হত কি? এছাড়া প্লাবন রোধে জলাধারগুলির সীমিত ক্ষমতার কথা মনে রেখে নদী সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন নয় কি?

দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য কিভাবে 1978 সালে বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চল ও কয়লাখনি অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হয়তো হতে পারে তা 4?6 পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে।

শ্রীমুখার্জি দামোদরকে বাঁকুড়া জেলায় সোমসার থেকে সোজাপথে বইয়ে দেওয়ার বক্তব্য মেনে নিয়ে বলেছেন যে, পরিকল্পনাটির রূপায়ণ অবাস্তব। আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীতে হুগলী জেলায় মুণ্ডেশ্বরী নামে কোন নদী ছিল না, শুধু ছিল কয়েকটি খাল—মুণ্ডেশ্বরী খাল, বেগোর খাল ও ডেছুয়া খাল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বেগোর হানাপথ দিয়ে খালগুলির সঙ্গে সংযোগ ঘটে দামোদরের। ঐ খালগুলির পথ শক্তিগড় থেকে বেগোর হানা পর্যন্ত দামোদরের পথের সঙ্গে সরল হওয়ায় দামোদরের জলের পূর্বলব্ধ তীব্র গতি খালগুলির পথে সঞ্চারিত হয়। ফলে ধীরে ধীরে দামোদর তার পূর্ব পথকে পরিহার করে চলেছে এবং আমাদের শত বাধা সত্ত্বেও এই বিংশ শতাব্দীতে গড়ে উঠেছে একটি নদী—নাম তার মুণ্ডেশ্বরী। নিম্ন দামোদর মজে গেছে, কিন্তু মুণ্ডেশ্বরী সম্পূর্ণ গড়ে ওঠে নি,—এ কারণেই দামোদর আজও দুঃখের নদ।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে "কেলেঘাই-এর বাঁককে কেটে অনেক জায়গায় সোজা করা হয়েছে, খাতকে গভীরতর করা হয়েছে। ফলে কেলেঘাই-এর বন্যার প্রকোপ লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।" [দ্রষ্টব্য বারোমাস, নভেম্বর, 1978 সংখ্যার 106 পৃষ্ঠায় লিখিত প্রাক্তন সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জির বক্তব্য]। এছাড়া ইউরোপে রাইন নদী ও আমেরিকায় মিসিসিপি নদীর পথকে সরলায়িত ও খাতকে গভীর করায় শুধু বন্যার প্রকোপ কমেনি, শত শত মাইল নাব্য জলপথও গড়ে উঠেছে। অতএব নদীখাত সরল

করা কোন অসম্ভব কাজ নয়। শ্রীমুখার্জি মহাশয়ের মতে কখনও নতুন তথ্য উপস্থিত হলে পরিকল্পনাগুলির হেরফের করা উচিত। তাহলে 1978 সালের লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচনাগুলি অনুচিত কেন?

ফরাক্কা ব্যারাজ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ছিল যে, ব্যারাজটি হুগলী নদীকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে না, পরন্তু গঙ্গার খাত পরিবর্তিত হতে পারে, যার ফলে একটা মহাপ্লাবন ঘটে যেতে পারে। ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে তিনি কোন যুক্তিসম্মত আলোচনা রাখেন নি, পরিবর্তে কয়েকটি অবান্তর মন্তব্য করেছেন।

পৃথিবীর সবদেশে ব্যারাজ হয়েছে জলাধারের জল বিতরণের জন্য। ব্যারাজের সাহায্যে নদীর পুনরুজ্জীবনের নজীর আছে কি? ফরাক্কা ব্যারাজের চেয়ে গঙ্গার তথা নিজেদের অস্তিত্ব আমাদের অধিকতর কাম্য। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা নিবন্ধটি নেতিবাচক কেন?

সবশেষে নদনদী-পরিকল্পনা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনাগুলি প্রকাশ করার জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' কর্তৃপক্ষকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিবরাম বেরা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

সুরমা সাধারণত প্রসাধনী সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ আবার চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে, জ্বালাযন্ত্রনা কমাতেও চোখে সুরমা লাগান। সুরমার প্রধান উপকরণ অ্যাণ্টিমনি সালফাইড। এর অভাবে এখন লেড সালফাইড সুরমা প্রস্তুতে ব্যবহার হচ্ছে। লেড বা সীসার বিষক্রিয়ার জন্য সুরমা ব্যবহারে এখন সতর্ক হতে বলা হচ্ছে। লেড ছাড়াও কোন কোন সুরমায় মেনথল বা ঐ জাতীয় কিছু থাকলেও চোখের ক্ষতি হয়।

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7 বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন ও অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের গ্রাহক হইবার জন্য আবেদন

সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলী এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণের সুবৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মূল্য : 30 টাকা

[15ই জুন, 1980 সালের মধ্যে 20 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 25 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন। পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে।]

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

লেখক – দ্বিজেশচন্দ্র রায়

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ, পরিবর্তিত ও সংশোধিত আকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের পূর্ণ-জীবনী এবং মৌলিক গবেষণাগুলির বিবরণ আছে।

মূল্য : 25 টাকা

[15ই জুন, 1980 সালের মধ্যে 15 টাকা জমা দিয়া যাঁহারা গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা 20 টাকায় পুস্তকটি পাইবেন। পুস্তকটি সংগ্রহ করিবার সময় বাকী টাকা দিতে হইবে।]

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

প্রকাশক :

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সত্যেন্দ্র ভবন

পি-23 রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—700006,

ফোন 55-0660

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 4, এপ্রিল, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ　　এপ্রিল, 1980　　চতুর্থ সংখ্যা

আবহাওয়া ও পরিবেশ

রতনমোহন খাঁ

সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম শিকার পরিবেশ। দেশকে দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধ করতে এবং ফলনের হার বাড়িয়ে তুলতে সরকারী ও বেসরকারী প্রচার ও প্রচেষ্টার সাথে সহযোগিতায় আমরা যতটা তৎপর, ঠিক ততটা সাবধানতার বাণী আমাদের স্মরণে থাকে না, মরমে পশে না ও বিবেচনায় স্থান পায় না। আশু প্রয়োজন মেটাতে, লোভের সসীমতাকে বর্জন করতে আমরা ভুলে যাই ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথা, ভুলে যাই প্রাকৃতিক সাম্যের কথা। এই হল বোধ হয় পরিবেশ দূষিতকরণের অন্তর্নিহিত কারণ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, দারিদ্র্যের প্রকটতা, সম্পদ বণ্টনে বিরাট অসাম্যতা এবং উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের নামে স্বার্থ-সিদ্ধির কুটিল প্রবণতা ভারতীয় উপমহাদেশ ও আফ্রিকার পরিবেশ দূষিতকরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সস্তায় বাজি মাত করার মানসিকতা রাজনৈতিক দলগুলিকেও পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন কঠোরভাবে পালন বিষয়ে জনমত গঠনে সোচ্চার হতে বিরত রেখেছে।

বোম্বাই-এর একটি বিজ্ঞান সংস্থার (Institute of Science) সমীক্ষার প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতের বড় বড় শহর সংলগ্ন প্রায় সব নদীগুলির জল নানা আবর্জনায় বিষাক্ত। বেশির ভাগ কারখানাই পলিউশন সংক্রান্ত বিধি-নিয়মাবলী মানে না। ফলে নদীর জল হয়েছে নানা রোগের উৎস, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অস্তিত্ব হয়েছে বিপন্ন। আবার ঐ জল সেচনে উৎপন্ন ফসল পরিণত হচ্ছে অখাদ্যে। গঙ্গার পবিত্র জল আজ স্নানের অযোগ্য এবং বহু চর্মরোগের কারণ।

সাগর-মহাসাগরের বিশাল ফেনিল জলরাশি

আমাদের অসাবধনতা ও বি...........নের পর দিন দূষিত হয়ে চলেছে। পেট্রোল প্রভৃতি খনিজ তৈলজনিত কারখানার বর্জ্যপদার্থ এবং নদীনালা ও নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত আবর্জনা এই দূষিতকরণের মূল কারণ। পৃথিবীর প্রধান শিল্পগুলির মধ্যে তৈলশিল্প অন্যতম। বছরে প্রায় 8×10^8 টন তেল জাহাজে সাগর পাড়ি দেয় আর সাগরের লবণাক্ত জলকে করে তোলে বিষাক্ত, বহু সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের অবলুপ্তিকে করে ত্বরান্বিত। বেশি দিনের আগের কথা নয়। 1978 সালের মার্চে ফ্রান্সের তীরে Amoco Cadiz-এর ট্যাঙ্ক ফেটে প্রায় 23×10^4 অশোধিত (crude) তেল জলে ছড়িয়ে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির টনক নড়ে ও ট্যাঙ্ক নিরাপত্তার উপর আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। এর আগেও এরূপ ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। 1967 সালের মার্চে Torrey Canyon সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের সাগরে প্রায় 6×10^4 টন তেলের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে ঐ অঞ্চলে স্থলে ও জলে বিপদের সূত্রপাত করে। 1912 থেকে 1949– এই দীর্ঘ 38 বছর ধরে কানাডা ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে সমুদ্রের জল দূষিতকরণকে সীমিত করার জন্যে যে সব নির্দেশাবলী রচনা করেছিল তা যে যথাযথ পালিত হচ্ছে না, এই সব ঘটনাই তার প্রমাণ।

সবুজ বিপ্লবকে জোরদার করতে যথেচ্ছ সার প্রয়োগ করা হচ্ছে, আর রোগ ও কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষার জন্যে নানা কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যবহারিক সাবধানতার প্রতি সাধারণ মানুষ পুরাপুরি ওয়াকিবহাল না হওয়ায় যথেচ্ছ প্রয়োগ মাটির উর্বরতা করছে নষ্ট, পরিবেশ করছে দূষিত। আবার উৎপন্ন ফসল খাদ্য হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের স্বাস্থ্যহানিও ঘটাচ্ছে। বনভূমি উচ্ছেদ করে চাষের জমি এবং কারখানা ও নগর পত্তনের জায়গা বাড়ানোর ফলে ব্যাহত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

মানুষের দ্বারাই পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কৃত্রিম উপায়ে নানাভাবে। বিজ্ঞানীরা এই দূষিতকরণের বিরুদ্ধে বারবার মত প্রকাশ করেছেন এবং প্রতি-বিধানের নানা পদ্ধতির কথাও ব্যক্ত করেছেন। মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে এই সব আবেদন একেবারে ব্যর্থ হয় নি। 1972 সালের জুন মাসে ষ্টকহোমে বিশ্বজাতিপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে মানব-পরিবেশের (Human Environment) উপর প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 114টি রাষ্ট্রের প্রায় 1200 জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন এবং তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে কতকগুলি মূল্যবান ও গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন। ঐ সভায় পরিবেশ সংক্রান্ত কর্মসূচীকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—যথা অগ্রগণ্য ক্ষেত্র ও কৃত্য। অগ্রগণ্য ক্ষেত্রগুলি হল—(i) মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সুবিধা; (ii) বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ; (iii) সমুদ্র; (iv) শক্তি; (v) ভূমি, জল ও মরুভূমির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ; (vi) প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃত্য হল—(i) প্রাকৃতিক পরিবেশের সমীক্ষা; (ii) পরিবেশ রক্ষণ; (iii) উন্নয়নমূলক সহযোগিতা। জাতিপুঞ্জের আহ্বানে 1978 সালের 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। 1979 সালের অগাষ্টে ব্যাঙ্ককে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রে যোগদান করে 15টি রাষ্ট্র। এই সম্মেলন প্রতিটি রাষ্ট্রের কাছে আবেদন রাখে—"কলকারখানা স্থাপন ও শক্তির প্রয়োগ যেন প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া না ঘটায় অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হয়।"

কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশ দূষিতকরণের থেকে আর একটি ভয়াভয় পরিণতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্রকৃতি আপন খেয়ালে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে। 1979 সালের ফেব্রুয়ারীতে জেনেভায় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই এই মত ব্যক্ত করেন যে, তুষারযুগ এগিয়ে

আসছে। 15,000 বছর পরেই সারা পৃথিবী তুষারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। সযত্নে লালিত আমাদের সুখ, দুঃখ, ভালবাসার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। উত্তর গোলার্ধের উষ্ণতা হ্রাস পাচ্ছে, যদিও হ্রাসের হার খুবই কম। দু-এক দশকে এই হ্রাসের ফল উপলব্ধি করা যাবে না। বিগত শতাধিক বছরের উপর সমীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে আসছেন যে, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। গত একদশকে নানা স্থানে খরা, শৈত্যের প্রাবল্য, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি, ঝড়ের প্রকোপতা বৃদ্ধি প্রভৃতির মূলে আছে এই পরিবর্তন। পরিবর্তনের কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন—জটিল ও অসম ভূপ্রকৃতির গঠন, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ এবং সৌরকলঙ্ক। অবশ্য পরিবর্তনে সহায়তা করছে মানুষ কলকারখানা স্থাপন করে, বনাঞ্চল বিলোপ করে এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। তবে আনন্দের কথা এই যে, অনেক বিজ্ঞানী তুষারযুগ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান।

সামুদ্রিক জীব-জগৎ ও শব্দ

শশধর দে*

[সামুদ্রিক জীব, বিশেষতঃ মাছের শব্দ সৃষ্টির কৌশল ও এই শব্দের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।]

শব্দ সৃষ্টি করে আমরা যোগাযোগ রক্ষা করি। স্থলচর জীবের মত মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণীরাও শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। অনেক সময় জলের মধ্যে শব্দ সৃষ্টি করে জেলেরা মাছের অস্তিত্ব বুঝতে চেষ্টা করে।

মাছের শব্দ সৃষ্টির কৌশল জানতে সকলেই উৎসুক। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, মাছের পেটের ভিতর যে পটুকা আছে, তার দোলনের কম্পাঙ্ক উদ্ভূত শব্দের মূলস্বরের কম্পাঙ্কের সমান। কিছু Catfish দ্বারা শব্দ সৃষ্টির কথা বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন। Catfish-এর মধ্যে যে স্থিতিস্থাপক স্প্রিং থাকে, তা শব্দ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বড় বড় দাঁত, পাখ্‌নার কাঁটা এবং অন্যান্য শক্ত অংশও শব্দ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে। ছোট পুকুরে জলচর প্রাণীদের মধ্যে যারা কর্কশ শব্দ করতে পারে, তারা সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট শব্দ সৃষ্টিকারী বলে পরিচিত।

পরিবেশ অনুযায়ী মাছের শব্দ সৃষ্টির কথাও অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন। অনেকে এই শব্দকে ভয়ের বা বিপদের সংকেত বলে অনুমান করেন। বিভিন্ন শ্রেণীর সমুদ্রজ মাছের শব্দ সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, অনেক মাছ শব্দ সৃষ্টি করতে বাহ্যতঃ সমর্থ। সামুদ্রিক প্রাণীর শব্দ সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে পর পর দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে আমরা সমুদ্র জগতে জীব-শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারি।

স্বাভাবিক অবস্থায় জলচর প্রাণীদের শব্দ নথিভুক্ত করা এক দুরূহ সমস্যা। যেহেতু শ্রোতা প্রায় অন্ধভাবে কাজ করছেন, সেজন্য শব্দ সৃষ্টিকারীকে সনাক্ত করা অসম্ভব হচ্ছে। জলের নিচে টেলিভিশন দ্বারা ধ্বনি তরঙ্গের পর্যবেক্ষণ করা এই সমস্যা সমাধানের বড় উপায়। এই পদ্ধতির দ্বারা এখন মাছের ধ্বনি তরঙ্গের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

মাছের শব্দ-সৃষ্টি ও শব্দ গ্রহণের ব্যাপার জানতে গেলে জল মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের গুণাবলী জানা দরকার। বায়ুর চেয়ে জল ঘনতর মাধ্যম; জলে শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1500 মিটার কিন্তু

*ওল্ড ইঞ্জিনীয়ারিং অফিস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম

বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে 332 মিটার। বায়ুতে শব্দের বেগ উষ্ণতা ও আর্দ্রতার দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু চাপের দ্বারা হয় না। অগভীর জলে চাপ ও উষ্ণতা প্রভাব বিস্তার করে না, কিন্তু গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা চাপের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সমুদ্রের উপরিতলে বেগ 1546 মিটার/সে. কিন্তু 915 মিটার নিচে শব্দের বেগ 1464 মিটার/সে.। আবার, জলে লবণাক্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দের বেগ বাড়ে।

যেহেতু জল বায়ু অপেক্ষা প্রায় 1000 গুণ ঘন, কাজেই জলে শব্দের বিস্তার সৃষ্টি করতে বেশী শক্তি দরকার। কিন্তু একবার শব্দের বিস্তার হলেই শব্দশক্তি জলে দ্রুত ছড়াবে। এই বিস্তার জলের উপরিতল থেকে, সমুদ্রের পাদদেশ থেকে এবং বিভিন্ন উষ্ণতা দ্বারা সৃষ্ট জলের বিভিন্ন স্তর থেকে শব্দের প্রতিফলনের ফলে আরও বৃদ্ধি পায়। আবার, সমুদ্রের উপরিতলে তরঙ্গগতির দ্বারা সৃষ্ট শব্দ, পাদদেশের বিরুদ্ধে জলস্রোতের ঘর্ষণ, জাহাজ চলাচল ও সামুদ্রিক প্রাণীদের শব্দ সব মিলে শান্ত সমুদ্রেও কলরব শোনা যায়। আবার, সামুদ্রিক জীব-জগতে স্বাভাবিক শ্রবণযোগ্য কম্পাঙ্কের সীমার চেয়েও কম কম্পাঙ্কের শব্দের বিষয় আলোচিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে 20,000-এরও বেশী প্রাণীদের মধ্যে মাত্র কয়েক শ' প্রাণীকে শব্দ সৃষ্টিকারী হিসাবে সনাক্ত করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে অনেক শব্দ সৃষ্টি করতে পারে বলে অনুমান করা হয় কিন্তু এখনও সেই সব শব্দ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নি

মাছের শব্দ সৃষ্টির সাধারণত: তিনটি কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়: (1) শরীরের কোন শক্ত অংশ, যেমন দাঁতের ঘর্ষণের দ্বারা, পাখ্‌নার কাঁটার দ্বারা বা হাড়ের দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। (2) মাছের সাঁতরে চলার গতি থেকে, বিশেষত: দ্রুত বেগ বা গতির পরিবর্তনের দ্বারা শব্দ সৃষ্ট হয়। (3) মাছের সাঁতার-থলি যখন নিকটস্থ পেশী বা সংলগ্ন পেশী দ্বারা কাঁপে, তখন সেটি শব্দ-অভিক্ষেপক হিসাবে কাজ করে।

অনেক মাছই দাঁত দিয়ে খাবার কামড়াবার সময় শব্দ সৃষ্টি করে। কিছু shark ও ray মাছ এরূপভাবে শব্দ সৃষ্টি করে, কিন্তু elasmobranch কোন বিশেষ ক্ষেত্রে শব্দ সৃষ্টিকারী নয়। clown মাছ ও sea horse নিকটস্থ হাড়ের ঘর্ষণের দ্বারা শব্দ সৃষ্টি করে। এই প্রকার শব্দে কম্পাঙ্ক 100-এর কম থেকে 8000 Hz পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণত: 1000—4000 Hz পর্যন্ত কম্পাঙ্কের সীমা এবং এর স্থায়িত্ব খুবই পরিবর্তনশীল।

অনেক ক্ষেত্রে সাঁতার-থলি অনুনাদকের কাজ করে এবং উদ্ভূত শব্দের জাতি পরিবর্তন করে। এই থলি শব্দ সৃষ্টিতে ড্রামের কম্পনের মত কাজ করে। Trigger মাছ সাঁতার-থলিকে বুকের উপরের পাখ্‌না দ্বারা ঘা মেরে শব্দ সৃষ্টি করে। কিছু কয়াতের মত প্রাণীদেরকেও কান্‌কোতে ঘা মেরে শব্দ সৃষ্টি করতে দেখা যায়।

কিন্তু eels ও catfish যে বায়ু বুদবুদ উদ্‌গিরণ করে, তা থেকে শব্দ ধরতে পারা যায়। characid মাছ জলতলে বায়ুর সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে। শব্দ সৃষ্টিকারী মাছদের মধ্যে ড্রাম ও ক্রোকার শ্রেণী উল্লেখযোগ্য। সাঁতার-থলির কাছে যে পেশী থাকে, তা দিয়ে ড্রাম বাজানো শব্দের মত বা টক্ টক্ শব্দ সৃষ্টি করে। এরা স্নায়ুকে উত্তেজিত করে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টিকারী পেশী দ্বারা শব্দ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় মাছদের মধ্যে drum fish, squirrelfish, tiger fish, scorpaenid উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় বেশীর ভাগ মাছেরই মূলস্বরের কম্পাঙ্ক 75—100 Hz; codfish ও haddock-এর কম্পাঙ্ক 40—50 Hz-এর মধ্যে থাকে। বিভিন্ন মাছের সাঁতার-থলির গঠন বিভিন্ন বলে বিভিন্ন রকম শব্দ সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ শব্দের জাতি আলাদা। প্রথম গবেষণা আরম্ভ হয় toadfish দিয়ে, তারপর আস্তে আস্তে

sea robins ও অন্যান্য মাছ নিয়ে কাজ চলতে থাকল।

সাঁতার-থলিকে আমরা জলতলে লাউডস্পীকারের সঙ্গে তুলনা করে কিভাবে শব্দ শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে, তার ব্যাখ্যা করতে পারি। যদি কোন কারণে catfish-এর সাঁতার-থলি নষ্ট হয় বা জলে ভরে যায় তবে দেখা যায়, শব্দ সৃষ্টিকারী পেশী ও স্থিতিস্থাপক স্প্রিং থেকে উদ্ভূত শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যায়, যদিও জাতি এক থাকে। squirrel মাছদের সাঁতার-থলি যদি কোন কারণে সম্পূর্ণ জলে ভরে যায়, তবে তারা শব্দ বুঝতে পারে না। আংশিক বাতাস বের হয়ে গেলে শব্দ বিস্তার কমে যায় কিন্তু মূলস্বর বা অন্য গুণাবলী বদলায় না। আমরা জানি, জলে কোন বস্তু চললে সরণের সৃষ্টি হয়। সাঁতার কাটা অবস্থায় মাছের শরীর ও পাখ্না দ্বারা সৃষ্ট এই সরণ ও সঙ্কোচন তরঙ্গ জলে এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই শব্দ জলের গতি থেকে উদ্ভূত শব্দ। অনেকে বলেন, সাঁতার কাটা অবস্থায় মাছ তাদের পেশী ও হাড়ের কাঠামোর নড়নচড়নের ফলে শব্দ সৃষ্টি করে। যখন মাছ খুব দ্রুত গতিতে ঘোরে, বা তার বেগ পরিবর্তন করে, তখন এই শব্দ খুবই জোরালো হয়।

Beluga Sturgeon জাতীয় মাছ কমপক্ষে চার রকম শব্দ সৃষ্টি করতে পারে; (ক) হুইসেল্ (কম্পাঙ্ক 3800Hz), (খ) দীর্ঘ হিস্সিং, (গ) তীক্ষ্ণ পাল্স (কম্পাঙ্ক 100-125 Hz), (ঘ) ক্ষণস্থায়ী ক্লিক্ (4000 Hz)। বৈদ্যুতিক মোক্ষণের সাহায্যে electric ray, Torpedo mormorate মৃদু কম্পাঙ্কের (100 Hz-এর নীচে) শব্দ সৃষ্টি করে।

যেহেতু মাছ শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, যুক্তিসম্মত-ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে তারা শুনতেও পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেছে, মাছ মধ্যম কর্ণ ও পার্শ্বিক রেখার (lateral line) মধ্য দিয়ে শব্দ শক্তি গ্রহণ করতে সমর্থ। তারা জলবাহিত শব্দ বেশ বুঝতে পারে। জাপানীরা বঁড়শীর সুতোর শব্দ সৃষ্টিকারী ছোট যন্ত্র বেঁধে মাছকে আকৃষ্ট করার কৌশল অবলম্বন করে বেশ সুফল পায়।

ফ্লুট, টিউনিং ফর্ক ইত্যাদির সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে দেখা গেছে, বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দের পার্থক্যও কোন কোন মাছ বুঝতে পারে। neurophysiological technique-এর সাহায্যে কম্পাঙ্কের পার্থক্য লক্ষ্য করার কৌশলও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মাছকে পথনির্দেশ করার জন্য শব্দের ব্যবহার ব্যবসার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। শব্দ সৃষ্টি করে মাছকে আকর্ষণ করার কথা আমরা জানি। বিভিন্ন জায়গার জেলেদের মধ্যে মাছের শব্দ শোনার ব্যাপারে আমরা সুপরিচিত। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণা চালিয়ে গেলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

শব্দ-তরঙ্গ পাঠিয়ে মাছের ঝাঁককে এক বিশেষ দিকে নিয়ে যেয়ে জালে ফেলে ধরা হয়। আবার, মাছের থলি শব্দোত্তর তরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে বলে মাছের ঝাঁক কোন্ দিকে যাচ্ছে বা কত গভীরে আছে জানা যায়। শব্দের উদ্দীপনার সাহায্যে বড় বড় মাছকে পথ নির্দেশ করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। দেখা গেছে, এক রকমের মাছ মৃদু কম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টি করে অন্য মাছদের আকর্ষণ করে। বিভিন্ন রকম মাছের শব্দ বিনিময় ও যোগাযোগের ব্যাপার নিয়ে গবেষণা দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

অপরাধ-অনুসন্ধান বিজ্ঞান

অতসি সেন*

"লোকটি যথেষ্টই বিদ্বান বুদ্ধিমান। বছর তিনেক আগেও আর্থিক অবস্থাটা বেশ ভালই ছিল, তবে বর্তমানে কিছুটা অর্থকষ্টে আছে। হয়ত বা কোন বদনেশার পাল্লাতেই পড়ে থাকবে, আর সেই-জন্যেই বেচারা, স্ত্রীর ভালবাসাটা পর্যন্ত হারাতে বসেছে।"

'নীল পদ্মরাগ' গল্পে সামান্য একটা তালতোবড়া টুপি থেকে শার্লক হোমসের এ জাতীয় সিদ্ধান্ত শুনে শুধু ডক্টর ওয়াটসনই নয়, সে-যুগের পাঠক-পাঠিকারাও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ এমনি মজা, একশো বছর আগে কনান ডয়েল আমাদের পূর্বপুরুষদের যতটা আশ্চর্য করেছিলেন, আধুনিক "অপরাধ-অনুসন্ধান বিজ্ঞান" আজ তাঁর মত লোক-কেও তার চেয়ে কম আশ্চর্য করত না।

একথা বললে অবশ্য খুব অতিশয়োক্তি হবে না যে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আজ আমরা এতটা এগুতে সক্ষম হয়েছি। 'শোমবে-কাহিনী'-তে, সেদিন সেই জালিয়াৎটার জামার হাতা থেকে দস্তা আর তামার গুঁড়ো আবিষ্কারের পর থেকেই পুলিশ-বিভাগ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। আজ অবশ্য শুধু কেবল ওই একটা যন্ত্রই নয়, তুলনামূলক অণুবীক্ষণ, বর্ণালি-লেখ (স্পেকট্রোগ্রাফ) সম্বলিত বিরাট বিরাট পরীক্ষাগার তো আছেই, সেই সঙ্গেই নিয়োজিত হয়েছে বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগ। রক্তমস্ত-বিজ্ঞানী (সেরোলজিষ্ট) অনুসন্ধান করছেন রক্তের শ্রেণী বিভাগের, বিষ বিশেষজ্ঞরা খুঁজছেন রাসায়নিক আর উদ্ভিজ্জ বিষ। আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদরা ব্যস্ত বন্দুক আর বুলেট নিয়ে; এছাড়া রাসায়নিক, জীববিদ, পদার্থবিদ, খনিজ বিজ্ঞানী—সকলেই সমবেত আজ এই একই প্রচেষ্টায়।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্লাইস্টারের মতে, ঘটনাস্থলে কোন সূত্র ফেলে না রেখে, কিম্বা অকুস্থল থেকে কোন সূত্র বহন না করে কোন অপরাধীরই নিস্তার নেই। নিহত ব্যক্তিটির চুলটাও অন্ততঃ জড়িয়ে থাকবে হত্যাকারীর পোষাকে অন্যথার হত্যাকারীর সোয়েটারের রোঁয়াটা খুঁজে পাওয়া যাবে নিহত ব্যক্তিটির নখের তলায়। আর প্যান্টের ভাঁজটা উল্টালে তো আর কথাই নেই, কি যে বেরোবে না তার ভেতর থেকে সেইটাই বলা কঠিন

রক্তকণিকা আর বুলেট, ধুলো মাটি, মানুষের চুল কি পশুলোম, কম্বলের রোঁয়া কি কাপড়ের আঁশ, এ সব কিছুই গত অর্ধশতাব্দী ধরে অপরাধ প্রমাণে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। উনিশ শো তেষট্টি সালের জুনবিখ্যাত সেই 'বিরাট মেল ডাকাতি' মামলায় অসামীর জুতোয় লাগা রঙের ছিটেগুলির বর্ণালি-লেখ পরীক্ষাই তো সেদিন তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল।

আমাদের মত সাধারণ লোকেদের কাছে এক-মুঠো ধুলো অন্য মুঠো ধুলোর মতই বিশেষত্ব বর্জিত, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আজ তার মধ্যে থেকেও এক-ডজনেরও বেশী এমন সব উপাদান আবিষ্কার, করেছেন, যা তাদের সাদৃশ্য অথবা পার্থক্য প্রমাণে অপরিহার্য। চুলের এক রঙ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। বর্তমানে কিন্তু এর থেকেও আঠারো রকমের তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলির সংখ্যা এবং পরিমাণের বিভিন্ন বর্ণ, জাতি এবং দেশভেদে, স্ত্রী-পুরুষ, বালক,

---

*সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরি, 3, কিড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700016

বৃদ্ধের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এঙ্গলির অবশেষমাত্র খুঁজে পাওয়া গেলেই, ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত চুলটি সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির কিনা, তা সঠিক বলা সম্ভব। এছাড়া চুলটি কাটা না ছেঁড়া এবং কোন্ অঙ্গের তাও সহজেই বলা যায়।

রক্তের ফোঁটাগুলি তো আমাদের অনেক কথাই শোনায়, কখনও কখনও হয়তো বা ডিটেকটিভ বই-এর চেয়েও বেশী। 1966 সালে মার্গারেট পেরেরা আর ব্রয়োন কুলিফোড-এর আবিষ্কারের পর থেকে রক্ত বিন্যাস অনুসন্ধান এতই অগ্রসর হয়ে চলেছে যে খুব শীঘ্রই তার প্রোটিন-চিত্রগুলি আঙুলের ছাপের মতই স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন হয়ে উঠবে। জমাট-বাঁধা রক্তের ফোঁটার 'হিমোগ্লোবিন-এস'-এর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি থেকেই বিচার করা সম্ভব লোকটি ম্যালেরিয়াবিহীন দেশের অধিবাসী না ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেশের।

আসামীদের যেহেতু অকুস্থলে ফেরৎ পাঠিয়ে বেশী মাত্রায় সূত্র সংগ্রহ সম্ভব নয়, সেই জন্যেই, সামান্যতম সূত্র থেকেও যাতে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, অপরাধ অনুসন্ধানে বহুমূল্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির তাই আজ এত প্রয়োজন। অপরাধ অনুসন্ধানে নিয়োজিত বহুবিধ যন্ত্রপাতির মধ্যে 'গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফীই' সমধিক উল্লেখযোগ্য। এক কথায় এর প্রয়োগক্ষেত্রটা প্রায় সীমাহীনই বলা চলে। এক ফোঁটা রক্তের দু-শো ভাগের এক ভাগ পরীক্ষা করেও বলা যায় তাতে 0 0000005 গ্রাম সুরা আছে কি না, অর্থাৎ 'আসামী মাতাল অবস্থায় গাড়ী চালাচ্ছিলেন কি-না।

অপরাধ-বিজ্ঞান সাধারণতঃ অপরাধীকে খুঁজে বের করা অথবা অপরাধের সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তিটির সম্পর্ক প্রমাণ করতেই বেশী ব্যবহৃত হলেও, নিরপরাধকে সন্দেহমুক্ত করতেও এরা সাহায্য করে কম নয়। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিটির পরিচয় অনুসন্ধান করেও এর প্রয়োগ অপরিহার্যই বলা চলে। হাত বা পায়ের বড় বড় হাড় থেকে ব্যক্তিটির আনুমানিক উচ্চতা হিসাব করা যায়, বয়স হিসাব করা হয় দাঁত পরীক্ষা করে। শুধু শ্রোণীচক্রের (পেলভিক) হাড়ই নয়, বক্ষপঞ্জরের হাড় থেকেও লিঙ্গ পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব। আর সর্বাধুনিক প্রক্রিয়ায় তো নিখোঁজ ব্যক্তিটির ফটো-নেগেটিভটিকেই সরাসরি উদ্ধারপ্রাপ্ত কঙ্কালের ফটোটির উপর উপস্থাপিত করে মিলিয়ে দেখা হয়।

কোন দুটি আঙুলের ছাপই যে এক রকম হতে পারে না এ জ্ঞানটা আজ নেহাৎ নাবালকেরও আছে। কাচ কি ধাতুই শুধু নয়, সাবান, চুলের ক্রীম, এমনকি গুঁড়ো ময়দার ওপর থেকেও আজকাল আঙুলের ছাপ তোলা হচ্ছে। প্রথমে কিছুটা তরল গালা স্প্রে করে স্থানটিকে সামান্য শক্ত করে নেয়া হয়। তারপর চারপাশে প্ল্যাষ্টার ঢেলে মালার সাহায্যে সেটিকে অল্প অল্প করে ছাপটার ওপর ছড়িয়ে দেয়া হয়—যাতে প্ল্যাষ্টারের চাপে চিহ্নটি নষ্ট হবার কোন সম্ভাবনাই না থাকে। "গ্রাহাম-গ্রে পদ্ধতিতে" শীষার গুঁড়ো ছড়িয়ে 'ইলেকট্রন অটিওগ্রাফী'র সাহায্যে ডাকটিকিট, বইয়ের মলাট, এমনকি মৃতদেহের ওপর থেকেও আঙুলের ছাপের ফটো তোলা সম্ভব হচ্ছে। পুরানো মৃতদেহের শক্ত কুঁচকানো আঙুল থেকে ছাপ তুলতে হলে, প্রথমে হাল্কা কস্টিক সোডা দ্রবণে ভিজিয়ে আঙুলটার "স্বাভাবিকত্ব" ফিরিয়ে আনতে হয়। আর বেশী পচে গলে গেলে পাৎলা ভেসলিন, গরম জল, গ্লিসারিন, গলানো মোম প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আঙুলের ছাপের মতই পায়ের চিহ্নও অনেক খবর দেয়। আর জুতোর পেরেকটা যদি ভাগ্য গুণে (?) বে-জায়গায় লাগানো থাকে, তবে তো সেটি প্রায় আঙুলের ছাপের মতই বিশেষত্বসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বালি, কাদা, তুষারের ওপর থেকেও আজকাল পায়ের ছাপ তোলা সম্ভব হচ্ছে। শক্ত করে নেবার জন্যে তুষারের ক্ষেত্রে গন্ধক আর বালির ক্ষেত্রে মোম ব্যবহৃত হয়। তারপর প্রয়োগ করা হয় উপরিউক্ত 'ঢালকাটা পদ্ধতিটা'। গালচের ওপর

পায়ের দাগটা তেমন বোঝা যায় না বলে ডক্টর গ্রীনউড ছোট ছোট প্ল্যাষ্টিকের গুটিকা ছড়িয়ে এক নতুন ধরণের ছবি তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। নাইলনের গাল্‌চে কি প্ল্যাস্টিকের টালির ওপর পায়ের ঘর্ষণে যে 'স্থিতীয় বিদ্যুৎ আধান' উৎপন্ন হয়, সেটিই গুটিকাগুলিকে আকর্ষিত করে এই আজব চিত্রের সৃষ্টি করে।

বন্দুক আর বুলেটগুলিও আঙ্গুল কি পায়ের দাগের মতই স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন। চার্লস ওয়েটের মতে আঙ্গুলের ছাপের মতই কোন দুটি রাইফেলের গুলিও কখনও এক রকমের হয় না। যন্ত্রে তৈরী বন্দুকের নলের ভেতরটা সম্পূর্ণ নিখুঁত হয় না বলে বুলেটের গায়ে এমন সব আঁকিবুঁকি ফুটে ওঠে যেটাকে ডক্টর গ্রাভেল আবিষ্কৃত 'তুলনামূলক অণুবীক্ষণের' সাহায্যে পরীক্ষা করলে অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়—ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত গুলিটি সন্দেহভাজন বন্দুকটি থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কি-না। অটোমেটিক পিস্তলের স্বতোচ্ছেদক (ইজেকটর) নিক্ষিপ্ত খালি খোলের গায়েও এ জাতীয় 'ট্রেডমার্ক'-এর ছাপ পড়ে। এছাড়া মৃতদেহের ভেতর গুলিটির কৌণিক পথ অবলোকন করলেও বোঝা যায় গুলিটি কোন্ অবস্থা থেকে ছোঁড়া হয়েছে আর জামাকাপড়ে কি দেহে বারুদের ছোপ লেগে থাকা না থাকা থেকে অনুমান করা যায় হত্যাকারী আর নিহত ব্যক্তির ব্যবধান দূরত্বটা।

হস্তলিপিবিশারদদের কথাও আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বর্তমানে তাদের সাক্ষ্যের চেয়েও লেখার কালি আর কাগজের রাসায়নিক পরীক্ষার মূল্য অধিক। বর্ণালীবীক্ষণ (স্পেকট্রোস্কোপ) দ্বারা কালির বয়স তথা লেখার সময়কাল সহজেই অনুমান করা যায়। টাইপ করা কাগজের নেগেটিভটাকে বহুগুণ বর্ধিত করে সন্দেহভাজন লেখাটির ফটোর উপর প্রতিস্থাপিত করলেই জানা যায় তারা অভিন্ন কি-না। একই কোম্পানীর তৈরী হলেও কোন দুটি টাইপরাইটারের ছাপাই সম্পূর্ণ অভিন্ন হতে পারে না—খুঁত আর লাইনের অসমতা থেকেই তাদের অভিন্নতা অথবা পার্থক্য প্রমাণিত হয়। এছাড়া দলিলপত্রে সংযোজন এবং পরিবর্তন অনুসন্ধানে অবলোহিত এবং অতিবেগনী ফটোর দান তো অপরিসীমই।

দেহে মাইক্রোতরঙ্গের প্রভাব

প্রদীপকুমার দত্ত*

[নানা ক্ষেত্রে মাইক্রোতরঙ্গের ব্যবহার আজ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এই তরঙ্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। গবেষণায় দেখা গেছে এই তরঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। তবে ক্ষতির পরিমাণ নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।]

বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে মাইক্রোতরঙ্গের (microwave) ব্যবহার আজ সুপ্রচলিত। তা ছাড়া নানা ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এই তরঙ্গ স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ কি? মাইক্রোতরঙ্গ ব্যবস্থার সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাদের উপর এই তরঙ্গের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি? দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মাইক্রোতরঙ্গ ভীতি এত প্রবল হয় যে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী এ নিয়ে গবেষণা শুরু করতে বাধ্য হন। স্বভাবতঃই প্রথমে মনুষ্যেতর প্রাণীদের উপর গবেষণা পরিচালিত হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে স্বল্প দৈর্ঘ্যের মাইক্রোতরঙ্গের প্রয়োগের ফলে পরীক্ষাধীন পশুদের অণ্ডকোষ (testes) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে (যথা মাথা, চোখ প্রভৃতি) কি পরিমাণে মাইক্রোতরঙ্গ শোষিত হয় তা নির্ণয় করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কারণ এর দ্বারা একটা ধারণা করা যাবে এই তরঙ্গ মানুষের দেহের কতটা গভীরে প্রবেশ করে এবং তার তাপীয় ক্রিয়া কি হতে পারে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে দেহে মাইক্রোতরঙ্গের প্রভাব বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। (1) তরঙ্গের শক্তি যত বেশী তার ভেদশক্তি (penetrating power) তত বেশী হয়, (2) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যত কম হয় দেহে তরঙ্গ শোষণের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়, (3) তরঙ্গ শোষণের পরিমাণ তরঙ্গের স্থায়িত্বের সঙ্গেও বৃদ্ধি পায়, (4) বাতাসের বেগ বৃদ্ধি পেলে তরঙ্গের প্রভাব হ্রাস পায়, (5) বাতাসের আর্দ্রতা বা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশী হলে তরঙ্গের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, (6) দেহের যে সব অংশে রক্ত সরবরাহের পরিমাণ কম (যথা চোখের লেন্স, গল ব্লাডার (gall bladder), গ্যাসট্রো-ইনটেসটিনাল নালীর (gastrointestinal tract অংশ বিশেষ প্রভৃতি) সে সব স্থান সহজেই আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাধারণ ভাবে অবশ্য যে সব স্থান পোশাকে ঢাকা থাকে সেই সব স্থানে তরঙ্গের অধিকতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

পশুদেহে (যথা ইঁদুর, কুক্কুট শাবক প্রভৃতি) অবিরাম মাইক্রোতরঙ্গ প্রয়োগ করলে তাদের মৃত্যু হতে দেখা যায়। পরীক্ষার জন্য এক বিশেষ ধরণের প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়। প্রকোষ্ঠের ডান দিকে পরীক্ষাধীন প্রাণীটিকে রাখা হয় এবং বিশেষ ধরণের মাইক্রোতরঙ্গ অ্যানটেনার (antenna) সাহায্যে বাম দিক থেকে প্রকোষ্ঠের মধ্যে মাইক্রোতরঙ্গ পাঠানো হয়। 165 মিলিওয়াট/বর্গ. সে.মি শক্তি সম্পন্ন মাইক্রোতরঙ্গ ইঁদুরের উপর প্রবল প্রতিক্রিয়ার

*ইনস্টিটিউট অফ রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্টি করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তারা প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে, আর 40 মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রাণীদেহের যে অংশে বিকিরণ আপতিত হয় সে অংশটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই উত্তাপ প্রথমে পরিবহণ প্রক্রিয়ায় এবং তারপর রক্ত বাহিত হয়ে দেহের অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়ায় দেহের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অবশেষে দেহের তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিকল হয়ে যায়। ফলে দেহের তাপমাত্রা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাধীন প্রাণীটির মৃত্যু ঘটে

মাইক্রোতরঙ্গের প্রয়োগের ফলে কলাগুলি তাপ দগ্ধ হয় এবং কখনও কখনও এই আক্রান্ত কলাগুলি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। এই তরঙ্গের প্রয়োগে মানুষের চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই তরঙ্গ দেহের স্নায়ুতন্ত্রকেও (nervous system) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। দেহের সমস্ত অংশের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রই সহজে খুব কম শক্তিসম্পন্ন (10 মিলি-ওয়াট/বর্গ সে.মি. বা তারও কম) মাইক্রোতরঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ইঁদুরের অণ্ডকোষ 250 মিলিওয়াট/বর্গ সে.মি শক্তিসম্পন্ন মাইক্রোতরঙ্গ দ্বারা 10 মিনিটেই আক্রান্ত হয় এবং তার এণ্ডোক্রিন গ্রন্থিসমূহের (endocrine system) কার্যকলাপ ও অ্যানড্রোজেন নিঃসরণ (androgen output) বিঘ্নিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গ অণ্ডকোষের ক্ষতিসাধন করে এবং এই তরঙ্গের প্রভাবে মানুষের যৌনক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনকি উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন না করলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রাডার (radar) যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মাইক্রোতরঙ্গ কর্মীদের প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মাইক্রোতরঙ্গের ক্ষতি করার ক্ষমতা উপেক্ষণীয় নয়। এজন্য মাইক্রোতরঙ্গ ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্য তাদের বিশেষ ধরণের পোষাক, দস্তানা, গগল্‌স্ প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয়।

ইন্সুলিনের জন্মরহস্য ও ডায়াবেটিস

তারকেশ্বর চক্রবর্তী*

14 বছরের বালক লিওনার্ড টম্সন ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে টরেন্টো জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। অত্যন্ত অসুস্থ, সারাদিনে মূত্রের পরিমাণ 3-5 লিটার এবং রক্তে শর্করার (blood sugar) পরিমাণ প্রতি 100 মিলিলিটারে 500 মিলিগ্রাম। চিকিৎসকেরা তার জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিলেন। মেজর ব্যানটিং ও ডঃ বেস্ট (টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়) তখন সবেমাত্র অগ্ন্যাশয়ের নির্যাসে ইন্সুলিন আবিষ্কার করেছেন। মেজর ব্যানটিং সেই নির্যাস 1922 খ্রীষ্টাব্দের 11 জানুয়ারী থেকে প্রতিদিন টম্সনকে ইন্জেকসন দিতে শুরু করলেন। আশ্চর্য ঔষধ, মন্ত্রের মত কাজ করল। মূত্র ও রক্তে শর্করার পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এল। টম্সন সুস্থ হয়ে উঠল। তার জীবন রক্ষা পেল। এই ফলপ্রসূ ইন্সুলিনের আবিষ্কার বহু ডায়াবেটিস রোগীর জীবনে নূতন আশার সঞ্চার করল। এর প্রায় 33 বছর পরে 1955 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে ডায়াবেটিসের অপর একটি ঔষধ, টলবুটামাইড প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে জৈব রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের যৌথ প্রচেষ্টায় আরও অনেক রকমের ঔষধ ও বড়ি এই রোগে ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু কোনটিই এমনকি ইন্সুলিনও ডায়াবেটিস রোগকে নির্মূল করতে পারে নি। রোগীকে ঔষধ সেবন ও সেই সঙ্গে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ করেই বাকী জীবন কাটাতে হয়। এই কারণে ডায়াবেটিস রোগীকে সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়। অবশ্য নিয়মিত চিকিৎসাধীনে, তাঁরা স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করে বহুদিন সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, চরকসংহিতায় ও শুশ্রুতসংহিতায় ডায়াবেটিস, 'মধুমেহ' বা 'বহুমূত্র' নামে আলোচিত হয়েছে। এই রোগে মূত্রের পরিমাণ খুব বাড়ে এবং মূত্রে শর্করাজাতীয় পদার্থ বেরিয়ে যেতে থাকে (মূত্রাস্থা মক্ষিকাভাশ্চির-মপি বহুমূত্রাখ্যরোগে প্রবৃদ্ধে'—আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ)। এছাড়া অত্যধিক ক্ষুধা, দুর্বলতা, ঘন ঘন তৃষ্ণা, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই প্রসঙ্গে রক্তপরীক্ষার বিধান আছে। কারণ ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ হিসাবে রক্তে শর্করার (blood sugar) পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণ সুস্থ অবস্থায় প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তে 80-120 মিলিগ্রাম শর্করা পাওয়া যায়। রক্তে শর্করার এই ভারসাম্য নষ্ট হলে ডায়াবেটিস দেখা দেয়। এছাড়া রক্তে কোলেষ্টেরল (cholesterol) ও ফ্যাট বা ট্রাইগ্লিসেরাইডের (triglycerides) পরিমাণ বাড়ে। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় বিভিন্ন দেশীয় গাছগাছড়ার রস বা বড়ির ব্যবহার এবং তার সঙ্গে খাদ্যনিয়ন্ত্রণেরও উল্লেখ আছে। তেলাকুচো (Coccinea indica), মেষশৃঙ্গী (Gymnema sylvestre), নয়নতারা (Catharanthus roseus), করলা (Momordica charantia) ইত্যাদি গাছগাছড়া ব্যবহার করে অনেক সময় ডায়াবেটিস রোগীরা উপকৃত হন। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে এজাতীয় বনৌষধি নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় মেষশৃঙ্গী, তেলাকুচো, নয়নতারা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের নির্যাস ডায়াবেটিক ইঁদুরকে ইন্জেকশন দিলে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে। এবিষয়ে বর্তমানে আরও গবেষণা চলছে।

* স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা

এদেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় 2 ভাগ ডায়াবেটিসের রোগী। এটি একটি বংশগত রোগ বলেও চিহ্নিত এবং প্রায় 25 শতাংশ ডায়াবেটিস রোগী বংশগত কারণে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। অবশ্য যাঁরা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মানসিক অশান্তিতে ভোগেন বা অতিরিক্ত স্থূলকায় তাঁদের মধ্যে এই রোগের প্রবণতা অধিক। শিশু, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেরই এই রোগ হতে পারে। এমনকি 5দিনের শিশুও যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে। বয়সের অনুপাতে রোগের প্রবণতা, কম বা বেশী হয়; সেই অনুযায়ী চিকিৎসার বিধান। তাই ডায়াবেটিস ব্যাধিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: অপ্রাপ্ত বয়স্কের ডায়াবেটিস (juvenile diabetes) 20 বছর বয়সের মধ্যে, প্রাপ্তবয়স্কের ডায়াবেটিস (adult diabetes) সাধারণত যৌবনে বা মধ্য-বয়সে এবং প্রৌঢ়ত্বের ডায়াবেটিস (maturity onset diabetes) উত্তরচল্লিশ বয়সে প্রকট হয়। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে শৈশবে অথবা যৌবনে যাঁরা আক্রান্ত হন তাঁদের প্রায় সকলকেই ইন্সুলিন ইনজেকশনের সঙ্গে পথ্যনিয়ন্ত্রণ করে সারাজীবন কাটাতে হয়। খাদ্যনিয়ন্ত্রণ ডায়াবেটিস চিকিৎসার অত্যাবশ্যক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক ক্ষেত্রে শুধু খাদ্যনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই চিকিৎসা করা যায়। পথ্য-নিয়ন্ত্রণ না করে কেবল ঔষধসেবনে সুফল হয় না। এখন প্রশ্ন, রোগীকে কি ধরনের খাদ্য দেওয়া উচিত? কোনরকম মিষ্টান্ন বা মিষ্টধরনের খাদ্য খাওয়া চলে না। সাধারণত ভাত বা রুটি কম পরিমাণে, প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে এবং স্নেহপদার্থ সীমিত পরিমাণে খেতে হয়। কিন্তু বৃক্কের (kidney) কোন দোষ থাকলে অথবা রক্তচাপ বেশী হলে ঘি, মাখন, প্রোটিন ইত্যাদির পরিমাণ আরও কমিয়ে দিতে হবে। রোগীর খাদ্য তাঁর বয়স, উচ্চতা, ওজন ও শারীরিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় খাদ্যনিয়ন্ত্রণ এত প্রয়োজনীয় কেন, এর উত্তর এককথায় দেওয়া যায় না। এই রোগে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা তিনটি প্রধান খাদ্যের বিপাকেই বিঘ্ন ঘটে; ফলে জীবকোষে স্বাভাবিক ক্রিয়া ও শক্তির উৎপাদন ব্যাহত হয়। যানবাহনের ইঞ্জিন খারাপ হলে চালক ও যাত্রীদের কর্মসূচী বিপর্যস্ত হতে বাধ্য; ঠিক তেমনি দেহের বিপাকক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে কোষের জৈবক্রিয়ার স্বাভাবিকতাও বজায় থাকে না। এই অস্বাভাবিকতার অনিবার্য ফল নানাপ্রকার শারীরিক পীড়া, যেমন দৃষ্টিহীনতা, স্নায়বিক যন্ত্রণা (neuritis) ফোড়া বা চুলকানি, ক্ষত নিরাময়ে অত্যধিক বিলম্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুভূতিলোপ ও পক্ষাঘাত, উৎসাহহীনতা, পুরুষত্ব-হানি, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, হৃদরোগ (coronary heart disease), মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা রক্তচলা-চলের বিপর্যয় (cerebrovascular accident) ইত্যাদি। তাছাড়া ডায়াবেটিস রোগীরা সহজেই জীবাণুঘটিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। এই সকল কারণে ডায়াবেটিসকে বিপাকীয় রোগ (metabolic disease) বলা হয়। বলাবাহুল্য, এ রোগের উৎপত্তির কারণ আজও সঠিক জানা যায় নি। যেহেতু অগ্ন্যাশয়ে উৎপন্ন ইন্সুলিন এই রোগের অন্যতম ফলপ্রদ ঔষধ তাই মনে করা হয়, ইন্সুলিনের অভাবই এই রোগের কারণ। ইন্সুলিনের এজাতীয় ভূমিকা সম্বন্ধে আরও কিছু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অগ্ন্যাশয়ে ইন্সুলিন হয়তো ঠিকমত তৈরি হচ্ছে না বা সেখান থেকে উপযুক্ত পরিমাণে রক্তে প্রবেশ করে তার জৈবক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছে না, হয়তো বা পিটুইটারি (pituitary), অ্যাড্রেন্যাল (adrenal) থাইরয়েড (thyroid) ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থির হর্মোন অগ্ন্যাশয়ের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। আবার এমন হতে পারে, দেহে ইন্সুলিনকে নষ্ট করবার মতন পদার্থ (antibodies) সৃষ্টি হচ্ছে। ডায়াবেটিসের নানা সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এখানে

শুধু অগ্ন্যাশয়ে ইন্সুলিনের উৎপত্তি নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করব।

আমাদের অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলি কর্মধারা অনুসারে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের (islets) আকারে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, সেই সবের বিভিন্ন কোষে পলিপেপ টাইড্ হর্মোন (polypeptide hormone) এই বস্তুটি থেকেই ইন্সুলিন উৎপন্ন হয়ে থাকে। স্তন্যজীবী, পাখি, মাছ ইত্যাদি প্রায় 20টি শ্রেণীর প্রাণী এবং কিছু কিছু অমেরুদণ্ডী পতঙ্গেও প্রো-ইনসুলিনের সন্ধান মিলেছে। মানুষ, গরু, শুকর, ইঁদুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর অগ্ন্যাশয় থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশোধিত প্রো-ইন্সুলিনের
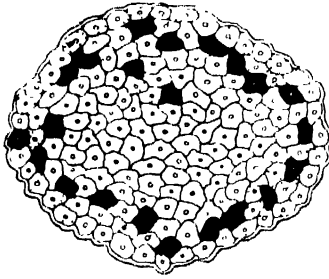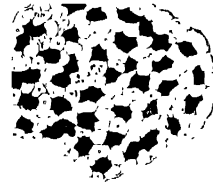
1নং চিত্র

আমেরিকার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডঃ রোজার এইচ. উঙ্গার এই রেখাচিত্রের উল্লেখ করেছেন।

নামক প্রোটিনজাতীয় জৈব যৌগের সৃষ্টি হয় (1নং চিত্র); যেমন A-কোষে গ্লুকাগন (glucagon), B-কোষে ইন্সুলিন, D-কোষে সোমাটোষ্ট্যাটিন (somatostatin) এবং F-কোষে বিশেষ ধরণের পলিপেপ্টাইড। এ সকল হর্মোন অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়ে সরাসরি রক্তের সঙ্গে মিশে জীবকোষের বিপাকপদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ইন্সুলিন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ডঃ ডোনাল্ড এফ্ ষ্ট্যাইনার (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ রোনাল্ড চ্যান্স (লিলি ল্যাবরেটরিস, ইণ্ডিয়ানা) ও তাঁদের সহকর্মিগণ 1967-68 খ্রীষ্টাব্দে মানুষ ও গরুর অগ্ন্যাশয়ে ইন্সুলিনের পূর্বাবস্থার যৌগটির (precursor of insulin) অস্তিত্ব প্রমাণ করেন এবং তার নাম দেন প্রো-ইন্সুলিন (proinsulin)।

কেলাস পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। প্রো-ইন্সুলিন অণু ইন্সুলিনের মতই একটি পলিপেপ্টাইড, আণবিক ওজন প্রায় 9500 ডালটন অর্থাৎ ইন্সুলিনের আণবিক ওজনের তুলনায় প্রায় 3000 ডালটন বেশী। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ইন্সুলিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডের (amino acid) সংখ্যা বিভিন্ন, অতএব তাদের প্রো-ইন্সুলিন অণুতেও অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা একরূপ নয়— মানুষ, ষাঁড় ও কুকুরের প্রো-ইন্সুলিন অণুতে যথাক্রমে 86, 81 ও 78টি অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান; কিন্তু প্রাথমিক গঠনের বৈশিষ্ট্যে এগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সব ক্ষেত্রেই প্রো-ইনসুলিন অণুটি অ্যামিনো অ্যাসিডে গঠিত একটি রেখাকার শৃঙ্খলের মত দেখায়, তিনটি খণ্ডে বিন্যস্ত—ইন্সুলিন;

সংযোজক পেপ্টাইড (connecting peptide or C-peptide) এবং সংযোজক পেপ্টাইড ও ইন্সুলিনের মধ্যে সংযোগ সাধনকারী দু-জোড়া অ্যামিনো অ্যাসিডে গঠিত (arg-arg and arg-lys) পেপ্টাইড্ (2নং চিত্র)।

1976 খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ষ্ট্যাইনার ও তাঁর সহকর্মীরা ইঁদুরের অগ্ন্যাশয়ে প্রিপ্রোইন্সুলিন (preproinsulin) নামে অপর একটি পলিপেপ্টাইডের সন্ধান পেলেন; এই বস্তুটি প্রো-ইন্সুলিনে পরিবর্তিত হয়ে পরিণামে ইন্সুলিন উৎপাদন করে। এই সকল গবেষণায় ইন্সুলিনের জন্মরহস্যের এক নূতন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

2নং

প্রিপ্রোইন্সুলিন একটি শাখাহীন রেখাকার পলিপেপ্টাইড্ অণু, অত্যন্ত অপ্রতিষ্ঠ, আণবিক ওজন প্রায় 12000 ডালটন অর্থাৎ প্রো-ইন্সুলিনের তুলনায় 2500-3000 ডালটন বেশী। এই অতিরিক্ত অংশটুকুকে প্রাক-অংশ (preregion) বলা হয়, যা প্রিপ্রোইনসুলিন অণুর মূল অংশের একপ্রান্তে যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু অগ্ন্যাশয়ে প্রিপ্রোইন্সুলিনের ক্রমবিবর্তনে কিভাবে ইন্সুলিন উৎপাদন হয়?

ল্যাংগারহ্যানস-বর্ণিত কোষদ্বীপের (islets of Langerhans) B-কোষগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের কারখানার মত অষ্টপ্রহর ইন্সুলিন অণু সৃষ্টি করে চলেছে। এই কোষের নিউক্লিয়াস থেকে ডি. এন এ-বাহিত বংশধারার বার্তা বহন করে প্রো-ইন্সুলিন উৎপাদক m-RNA (messenger RNA) সুনির্দিষ্ট-অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি দিয়ে কোষের রাইবোজম (ribosomes) কণায় প্রিপ্রোইন্সুলিন সংশ্লেষণ

করে। তারপর প্রাক্‌-অংশটি (preregion) অণুর মূল অংশ থেকে প্রোটিন বিশ্লেষক এনজাইমের (proteolytic enzyme) সাহায্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রো-ইন্‌সুলিনে পরিবর্তিত হয় এবং B-কোষের গল্‌গি-বডি (golgi-body) নামক অংশে প্রবেশ করে। এই স্থানে কার্বক্সিপেপটাইডেজ্‌-B (carboxy-peptidase-B) ও ট্রিপ্‌সিন (trypsin) নামক দুটি প্রোটিনবিশ্লেষক এনজাইমের দ্বারা প্রো-ইন্‌সুলিন অণুর স্থানবিশেষে জলবিশ্লেষ (hydrolysis) ঘটিয়ে ইন্‌সুলিন উৎপত্তি করে। প্রতিটি প্রো-ইন্‌সুলিন অণু থেকে সম-আণবিক (equimolecular) পরিমাণে ইন্‌সুলিন ও সংযোজক পেপটাইড এবং সেই সঙ্গে দু-জোড়া অ্যামিনো অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। অতঃপর দস্তা (zinc) আয়ন ইন্‌সুলিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এরকম বহু ইন্‌সুলিনের অণু একত্রিত হয়ে দানার আকারে (insulin granules) সঞ্চিত থাকে। এই ইন্‌সুলিন দানা এবং সংযোজক পেপ্‌টাইড অণুগুলি অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়ে রক্তের মাধ্যমে যকৃতে যায়। নিঃসৃত ইন্‌সুলিনের প্রায় 40 শতাংশ যকৃতে বিনষ্ট হয়, অবশিষ্টাংশ এবং সংযোজক পেপ্‌টাইড রক্তের সাহায্যে সর্বদেহে ছড়িয়ে পড়ে বিপাক পদ্ধতির স্বাভাবিকতা অব্যাহত রাখে। বলা বাহুল্য, অগ্ন্যাশয় থেকে ইন্‌সুলিন নিঃসরণের সময়ে অল্প পরিমাণে অপরিবর্তিত প্রো-ইন্‌সুলিনও রক্তে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রো-ইন্‌সুলিনের জৈবক্রিয়া ইন্‌সুলিনের তুলনায় নগণ্য। তাই রক্তে ইন্‌সুলিনের পরিবর্তে প্রো-ইন্‌সুলিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিপাকপদ্ধতি বিঘ্নিত হয়; এবং

হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কি অসম্ভব ?

শিবরাম বেরা*

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', অক্টোবর 1979 সংখ্যার একটি নিবন্ধে আমি আলোচনা করেছি যে, ফরাক্কা-জঙ্গীপুর ফীডার ক্যানাল দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট 40 হাজার কিউসেক জল হুগলী নদীর উপর কোন প্রভাব ফেলবে না এবং যেহেতু হুগলী নদীতে জোয়ার-ভাঁটায় 20 বা 15 লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত হয়, সেহেতু 4 বা 5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা ছাড়া এরূপ নদীর চর কাটা অসম্ভব। অতীতে ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি নদনদীগুলি দিয়ে গঙ্গা-পদ্মা থেকে বর্ষাকালে 4 বা 5 লক্ষ কিউসেকের বন্যা আসত এবং জলাধারগুলি নির্মাণের পূর্বে দামোদরের পথে অনুরূপ প্রবাহ নামত বলেই বিশাল হুগলী নদী গড়ে উঠেছিল। এখন হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবনের জন্য কিভাবে বর্ষাকালে গঙ্গা-পদ্মা থেকে ঐ জল আনা সম্ভব, তা আলোচনার পূর্বে ভাগীরথী মজে যাওয়ার প্রাকৃতিক কারণগুলি ও তাদের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম কারণ—গঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পদ্মা ও ভাগীরথী। যতই দিন যাচ্ছে ভাগীরথীর ধারা ক্রমেই শুষ্ক হয়ে উঠছে আর পদ্মার ধারাটি প্রবল হতে চলেছে। এর কারণ পদ্মার পথ অনেকটা সরল কিন্তু ভা পথে রয়েছে অসংখ্য বাঁক। জল তো সরল পথে দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে আর বাঁক থাকলে তার গতি প্রতিটি বাঁকে বাধা পাবে—এত অতি সাধারণ কথা। ফলে ভাগীরথী অসংখ্য বাঁকের বন্ধনে বন্দী হয়ে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। অতীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর রেনেলের মানচিত্রে (চিত্র 1) কিন্তু পদ্মার পথেই ছিল অসংখ্য বাঁক, যেগুলি পরবর্তীকালে সরল হয়ে ওঠে। ফলে গঙ্গার জলধারা ক্রমান্বয়ে অধিকতর হারে পদ্মার পথে ছুটে চলে।

তাই ভাগীরথীকে বাঁচাতে প্রথমেই দরকার মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় এর পথকে সরলায়িত করা, যার ফলে ঐ অংশে নদীটির পথ বর্তমান পথের প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। ফলে ঢাল দু-গুণ হয়ে প্রবাহমাত্রা দু-গুণ হবে। এছাড়া বাঁক না থাকায় জলের গতি বাধা পাবে না ফলে প্রবাহমাত্রা আরও বাড়বে। তখন জলের প্রবল গতি নদীখাতমুখী হওয়ায় তার পথের পলি সরিয়ে দেবে। প্রসঙ্গত বলি দু-শ' বছর পূর্বে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের মধ্যে ছিল কয়েকটি বাঁক—যার ফলে ঐ দুটি শহরের মধ্যে নৌকাপথে প্রায় একদিন সময় লাগত, যদিও স্থলপথে ঐ দূরত্ব প্রায় 5 মাইল। সে যুগে নৌ-বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে 1788 সালে দুটি শহরের মধ্যে একটি খাল কেটে যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীকালে ভাগীরথী সেই ছোট্ট সরল খালটিকে নদীরূপে গড়ে নেয় এবং পুরানো খাতটি একটি বাওড়ে পরিণত হয়। তাই ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর আর এক নাম কাটিগঙ্গা। আমরা কি অনুরূপ কয়েকটি কাটিগঙ্গা সৃষ্টি করে ভাগীরথীর পথকে সরল করে দিতে পারি না? এরপর দ্বিতীয় কারণটি আলোচনার পূর্বে আমি সমভূমি অঞ্চলে নদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করব।

নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখা নদীর জন্ম-মৃত্যু—নদীবিজ্ঞানের মূলকথাগুলি যা পূর্বে

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700006

1নং চিত্র—বাংলার সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর বর্তমান ও অতীত পথ

[কুশী I—চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কুশী নদী, কুশী II—পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কুশী নদী, কুশী III—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রেনেলের মানচিত্রে কুশী নদী। (1764 সাল থেকে 1777 সাল পর্যন্ত মেজর রেনেল পূর্বভারতের নদীনদীর সার্ভে করেন এবং রেনেলের মানচিত্রই প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়।) গঙ্গা 1—পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গা নদী, গঙ্গা II—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনেলের মানচিত্রে গঙ্গানদীর পথ। তিস্তা I—1787 সাল পর্যন্ত কয়েকটি শাখায় বিভক্ত তিস্তানদী। ব্রহ্মপুত্র I—সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র ; ব্রহ্মপুত্র II—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র। খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা—দামোদরের অতীত পথ। Reference :—1. "The changing face of Bengal" by Dr. Radhakamal Mukherjee. C. U. Publication 2. "Rivers of the Bengal delta" by S. C. Mazumder, Calcutta University Publication and (3) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব, 1ম খণ্ড) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, [পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি]

চিত্রে বিভিন্ন স্থানের নাম ; 1- কুর্শেলা, 2—মণিহারী, 3—গৌড়, 4—দয়ারামপুর, 5—ফরাক্কা, 6 লালগোলাগঞ্জ, 7—জঙ্গীপুর, 8- মুর্শিদাবাদ, 9—কাশিমবাজার, 10—কর্ণসুবর্ণ, 11—কংকাগ্রাম, 12- কাটোয়া, 13—নবদ্বীপ, 14—ত্রিবেণী, 15—বর্ধমান, 16—দুর্গাপুর, 17—তিলপাড়া, 18—লালগোলা, 19—গোদাগাড়ি 20—রাজসাহী, 21—জলাঙ্গী, 22—কুষ্টিয়া, 23—গোয়ালন্দ, 24—শিবচর, 25—ঢাকা, 26—জলপাইগুড়ি।

প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ['জ্ঞান ও বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী 1979] আলোচনা করেছি, তা একটি মাত্র বাক্যে লিপিবদ্ধ করলে দাঁড়ায় "ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষম বিস্তৃত প্রায় সরল পথই যে কোন একটি নদীর কাম্য।" কারণ ঢালই নদীর জলে নতুন গতির সঞ্চার করে, গতিমুখ একই থাকলে বিভক্ত হয়ে বইতে পারে। যদি তার পূর্বপথটি ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, তবে সে তার পুরানো পথে ফিরে যায়। কিন্তু যদি নতুন পথটি পূর্বপথের চেয়ে ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সে নতুন পথে বইতে থাকে (চিত্র 2B)। এভাবে নদী তার পথ পরিবর্তিত করে।

চিত্র 2 — সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম আর মৃত্যু।
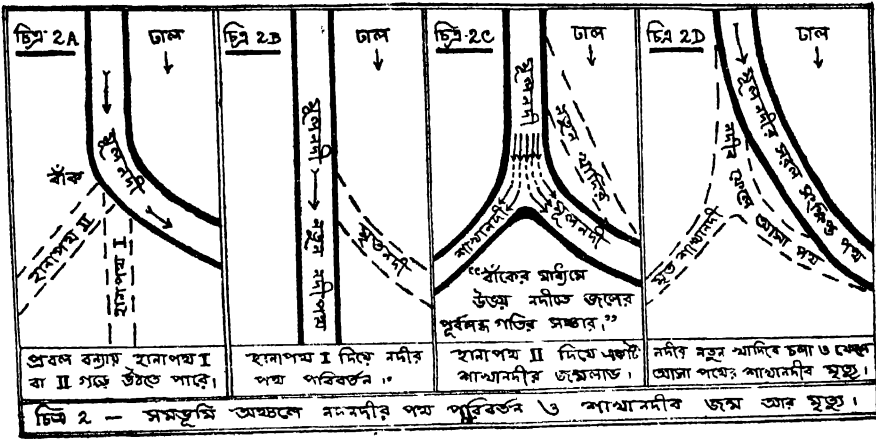
পূর্বলব্ধ গতি অনেকটা বজায় থাকে, সুষম বিস্তার জলের গতিকে সংহত রাখে এবং পথের সরলতা সেই গতিকে নদীখাতমুখী করে। উপরিউক্ত পরিবেশে নদী সাবলীলভাবে বয়ে চলে ও ঐ পরিবেশের অভাব ঘটলে নদী বন্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে। পার্বত্য অঞ্চলে ঢালই নদীপথকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সমভূমি অঞ্চলে ঢাল কম থাকায় নদী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন দিকে বইতে পারে। যেমন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঢাল প্রায় দক্ষিণমুখী হলেও নদী দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বইতে পারে। এখানে নদীর গতিমুখ নদীকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। নদীর পূর্বোক্ত পরিবেশের অভাব ঘটলে কোন এক বর্ষায় প্রবল স্রোতে সাধারণত কোন এক বাঁকে নদী একটি হানাপথ কেটে নেয় (চিত্র 2A)। পরে নদীটি তার পূর্বপথে ফিরে যেতে পারে বা ঐ হানাপথ দিয়ে নতুন পথে চলতে পারে কিংবা দুটি ধারায় বিহারে কুশীনদীর বারবার পথ পরিবর্তন কিংবা, 1787 খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে তিস্তার নতুন পথে চলা এরূপ কয়েকটি ঘটনা।

কিন্তু যদি উপরের নদীর জলের গতি উভয় পথে সঞ্চারিত হয়, তবে উভয় নদীই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং এভাবে একটি শাখানদী গড়ে ওঠে (চিত্র 2C)। ভবিষ্যতে কখনও যদি মূলনদীটি এমন ভাবে বইতে থাকে, যাতে শাখানদীর উৎসের কাছের বাঁকটি মিলিয়ে একটি সরল পথ গড়ে ওঠে, তবে উপরের নদীর জলের গতি আর শাখানদীতে সঞ্চারিত হয় না। তখন শাখানদীর উৎসমুখে জলের গতি স্তব্ধ হওয়ায় ঐ অঞ্চলে পলি জমে সে দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে (চিত্র 2D)। এটাই ভাগীরথী ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি নদনদীগুলির মৃত্যুর প্রধান কারণ (চিত্র 1) এমন কি শাখানদীর পথটি উপরের নদীপথের সঙ্গে অধিকতর সরল হলে নিম্নাংশে

মূলনদীটিও মিলিয়ে যেতে পারে। পূর্ববঙ্গে পদ্মার কীর্তিনাশা খাতে বয়ে যাওয়া কিংবা পশ্চিমবঙ্গে বেগোর হানা দিয়ে দামোদরের মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলা এরূপ দুটি দৃষ্টান্ত। মনে রাখা দরকার নদীপথে বাঁকের অবস্থিতির উপর নির্ভর করে শাখা-নদীর জীবন মাত্র কয়েক বছর থেকে কয়েক শ' বছর হতে পারে।

উৎসের কাছে গঙ্গানদী বর্তমানে ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রায় সরল পথে বয়ে চলেছে এবং ভাগীরথী সেই পথের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে গঙ্গানদীর মাঝ বরাবর জলের যে তীব্র গতি আছে, তা শুধু পদ্মার পথে ছুটে চলে ও ভাগীরথীর পথে সঞ্চারিত হয় না। ফলে ভাগীরথীতে যে জল আসে তাতে গতি সামান্যই থাকে আর সেই
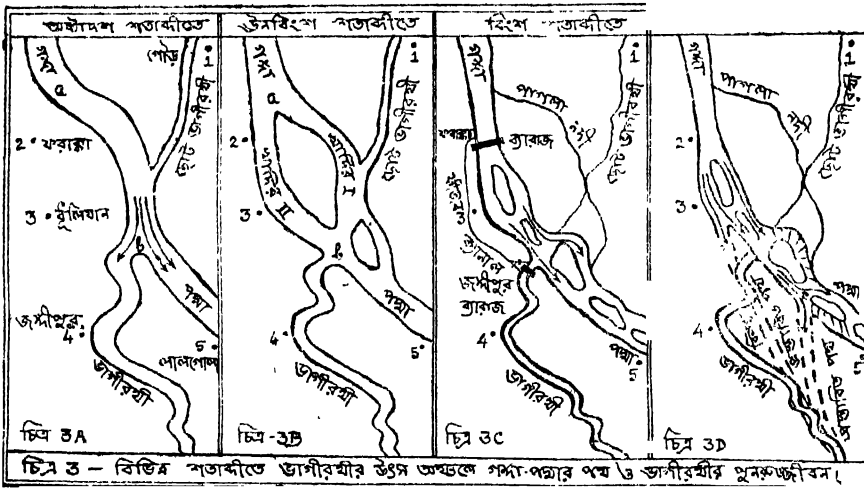
চিত্র 3 — বিভিন্ন শতাব্দীতে ভাগীরথীর উৎস অঞ্চলে গঙ্গা-পদ্মার পথ ও ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন।

এছাড়া অন্য কারণেও নদীর পথ পরিবর্তিত হতে পারে। যেহেতু জলের দ্রুতগতির দিক সমভূমি অঞ্চলে নদীপথকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে, সেহেতু হয়তো কোন পার্বত্য উপনদীর বন্যার ক্ষিপ্র গতি একটি বিশাল নদীর খাতকে পরিবর্তিত করতে পারে। এককালে মণিহারীতে পতিত কুশীনদীর জন্য মালদহ জেলায় গঙ্গার খাত পরিবর্তন কিংবা পূর্ববঙ্গে তিস্তার বন্যাগুলির জন্য ব্রহ্মপুত্রের পথ পরিবর্তন এরূপ দুটি উদাহরণ। এছাড়া ভূমিকম্পের ফলে ভূস্তরের পরিবর্তন হয়ে নদীর পথ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এখানে বলা দরকার উপরের আলোচনাটি নদীর পথ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ, যদিও নদীর অববাহিকায় পলি জমে ঢালের পরিবর্তন এর পরোক্ষ কারণ।

দ্বিতীয় কারণ—মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর স্বল্প গতির জল শুধু পলি ঝরিয়ে দিতে পারে। পলি সরিয়ে নদীকে গভীর করার ক্ষমতা তার কোথায়? এই কারণে ঐ অঞ্চলে ভাগীরথীর খাত প্রতি বছর 3 ইঞ্চি হিসাবে উঁচু হয়ে উঠছে। তাহলে এতদিন ভাগীরথী বেঁচেছিল কেমন করে? এজন্য ঐ অঞ্চলে গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর অতীত পথের মানচিত্র সন্নিবেশিত হল।

দূর অতীতে গঙ্গানদী মালদহ জেলায় কালিন্দী ও মহানন্দার পথে বয়ে যেত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মেজর রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে, গঙ্গানদী রাজমহলের নীচে যে পথে বয়ে চলেছে তাতে দুটি বাঁক a ও b রয়েছে [চিত্র 3A] ও নদীটি মালদহ জেলার ভিতর দিয়ে চলেছে। নদীর b বাঁকটি ভাগীরথীর উৎসের ঠিক উপরে থাকায় গঙ্গার

জলের গতি পদ্মা ও ভাগীরথী উভয়ের পথে সঞ্চারিত হত। পরবর্তীকালে গঙ্গানদী a থেকে b পর্যন্ত রাজমহল পাহাড়ের কোল দিয়ে অন্য একটি পথ কেটে নেয় এবং উনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী ঐ অঞ্চলে প্রধানত দুটি খাদিরে বয়ে চলে [চিত্র 3B]। আবার যেহেতু দ্বিতীয় খাদিরের পথটি উপরে গঙ্গার ও নীচে পদ্মার পথে সঙ্গে প্রায় সরল ছিল, সেহেতু গঙ্গানদী দ্বিতীয় খাদিরের পথটি বেছে নেয় এবং প্রথম খাদিরটি দ্রুত মিলিয়ে যায়। এভাবে বিংশ শতাব্দীতে গঙ্গার বর্তমান পথটি গড়ে ওঠে [চিত্র 3C]। প্রথম খাদিরটির অবশেষ পাগলা নদী ও ছোট ভাগীরথীর অংশবিশেষ হয়ে সেই গঙ্গার পথরেখারূপে আজও বর্তমান আছে। এভাবে গঙ্গার সমস্ত প্রবাহ পদ্মার পথে ছুটে চলেছে এবং ভাগীরথী গঙ্গার জলের গতি না পাওয়ায় উৎসমুখে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

এখন ভাগীরথীকে পুনর্জীবিত করতে হলে এর উৎস গঙ্গার কোন বাঁকে স্থাপিত করা দরকার। যদিও গঙ্গানদী ঐ অঞ্চলে দক্ষিণমুখী থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়েছে, তবু ঐ অঞ্চলে সেরূপ কোন বাঁক নেই। কিন্তু গঙ্গার পথের উপর মাঝনদীতে একটি দ্বীপের উত্তরাংশ ও অন্য দ্বীপের দক্ষিণাংশ বন্ধ করে এরূপ বাঁক c সৃষ্টি করা সম্ভব [চিত্র 3D]। যদি উপরিউক্ত বাঁক গড়ে তোলা সম্ভব না হয়, তবে ধুলিয়ান শহরের দক্ষিণপূর্বে গঙ্গার যে স্বাভাবিক বাঁক আছে, সেখান থেকে ভাগীরথীর পথটি এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে গঙ্গার জলধারার দক্ষিণমুখী তীব্রগতি ভাগীরথীর পথে বহুদূর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয় [চিত্র 3D বিকল্প পথ]। আর তখনই মুমূর্ষু ভাগীরথী নতুন জীবন লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া অজয় ও ময়ূরাক্ষীর পথদুটি সংযোগ-স্থলে ভাগীরথীর পথের সঙ্গে সরল করলে ঐ নদীদুটি ঐ অঞ্চলে পলি ঝরিয়ে না দিয়ে পলি সরাতে সাহায্য করবে এবং দামোদর ও দ্বারকেশ্বরকে পূর্বে প্রকাশিত নিবন্ধে বর্ণিত পথে পরিচালিত করলে এদের বন্যাগুলি হুগলী মোহানার পলি দূর সাগরে নিক্ষেপ করবে। ['জ্ঞান ও বিজ্ঞান', ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল, 1979]

প্রসঙ্গত বলি বর্তমানে শুখা মরশুমে গঙ্গার জলবণ্টন নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের নদী-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা চলছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ভাগীরথী-হুগলীর পুনরুজ্জীবনে গ্রীষ্মের জল নিয়ে অহেতুক বিরোধের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ গ্রীষ্মের সামান্য জল দিয়ে কোন নদী বাঁচে না, বর্ষার হঠাৎ-নেমে-আসা বন্যাগুলিই নদীকে গড়ে তোলে। কাজেই বর্তমান নিবন্ধে বর্ণিত পথে গঙ্গার বন্যা থেকে 4 বা 5 লক্ষ কিউসেক প্রবাহ যদি ভাগীরথীর বক্ষে বইয়ে দেওয়া যায়, তবে একদিকে যেমনি হুগলী নদী পুনরুজ্জীবিত হবে, অন্যদিকে তেমনি প্রমত্তা পদ্মাও শান্ত হবে।

হুগলীর তলকর্ষণ ও গঙ্গার ভাঙন—বর্তমানে কলিকাতা বন্দরকে বাঁচাতে হুগলী নদীর তলকর্ষণ বা ড্রেজিং করতে প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা ব্যয়িত হয়। কিন্তু তলকর্ষণ দ্বারা নদীকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় চিরকাল। এখন ভাগীরথী-হুগলী এবং অজয়-দামোদরকে নিবন্ধে বর্ণিত পথে পরিচালিত করলে 5 বা 6 বছরের মধ্যে নদীগুলি নিজেদের গড়ে তুলবে এবং তলকর্ষণের কোন প্রয়োজন থাকবে না।

বিহারের মণিহারী থেকে রাজমহল পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে চলা প্রায় 50 মাইল দক্ষিণমুখী সরল পথে গঙ্গানদীর জলধারা প্রবল গতি পায়। গঙ্গা-পদ্মার পরবর্তী পথটি প্রায় দক্ষিণ-পূর্বমুখী হওয়ায় জলের পূর্বোক্ত দক্ষিণমুখী প্রবল গতি ধুলিয়ান শহর থেকে লালগোলা পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার তীরবর্তী প্রায় 60 মাইল দীর্ঘ বাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রতি বছর গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে চলে। প্রতি বছর ভাঙন রোধে বিপুল অর্থ ব্যয়িত হলেও পরের বছর নতুন ভাঙনের সৃষ্টি হয়।

আমার মতে গঙ্গার ঐ ভাঙন রোধের উপায় হল গঙ্গার জলধারার ঐ দক্ষিণমুখী গতিকে কোন নদী-খাতে বইয়ে দেওয়া, যাতে ঐ শক্তিকে নদীখাত কাটানোর কাজে নিয়োজিত করা যায়। এছাড়া ফারাক্কা ব্যারাজের জন্য ও ব্যারাজ-পণ্ডে (Barrage-Pond) পলি জমার জন্য ফরাক্কার উজানে মালদহ জেলায় 45 মাইল দীর্ঘ তীরবাঁধে প্রবল চাপ পড়ছে। ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান', অক্টোবর 1979 দ্রষ্টব্য) সব মিলিয়ে বলা যায় যে, নিবন্ধে বর্ণিত পথে ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন ও ফরাক্কা ব্যারাজের বন্ধন থেকে গঙ্গার মুক্তি গঙ্গার ভাঙন, ভাগীরথীর প্লাবন ও হুগলীর তলকর্ষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাব্য উপায়।

আজ মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙন রোধে 293 কোটি টাকা পরিকল্পনা করছি। আমরা কি ঐ 293 কোটি টাকার কিছু ভগ্নাংশ দিয়ে নিবন্ধে বর্ণিত উপায়ে ভাগীরথী হুগলীর পুনরুজ্জীবন করে কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে পারি না? কিংবা গঙ্গানদীকে ফরাক্কা ব্যারাজ থেকে মুক্ত করে গঙ্গার ভাঙন রোধ করতে পারি না?

মাটির উর্বরতা শক্তি যাচাই ও সার প্রয়োগ

দেবপ্রসাদ ঘোষদস্তিদার*

পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হারে খাদ্যশস্য উৎপাদন না বাড়ালে দুর্ভিক্ষ-মহামারী অবশ্যম্ভাবী। তাই প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস। গাছপালা মাটি থেকেই তাদের দরকার মত খাদ্য-উপাদান সংগ্রহ করে, কিন্তু অধিকাংশ এলাকার মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সব সময় মজুত থাকে না। গাছপালার আশানুরূপ বৃদ্ধির জন্য ঐ সব মাটিতে মাটির ভৌত ধর্মের প্রভূত পরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে উৎপাদনও ব্যাহত হয়; তাই দরকার জৈব সারের। মাটিতে জৈব সার যত বেশী পরিমাণ ব্যবহার করা যায় মাটির উর্বরতা শক্তিও ততোধিক বৃদ্ধি পায়। তবে সার প্রয়োগ পদ্ধতিও মাটির প্রকারের উপর নির্ভরশীল। সার প্রয়োগের যথাযথ সুফল পাওয়ার জন্য মাটির উর্বরতা শক্তি, মাটির প্রকারভেদ ও বিভিন্ন ফসলের খাদ্যের চাহিদা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

মাটিতে গাছপালার খাদ্যের পরিমাণ

মাটিতে শস্যের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খাদ্য সুষম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হলে, সেই মাটিতে বিভিন্ন উদ্ভিদখাদ্য কি পরিমাণে আছে তা জানা প্রয়োজন। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষার দ্বারাই তা জানা সম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি পরীক্ষাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাপমাত্রামাপক যন্ত্রের (থার্মোমিটার) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মাটি পরীক্ষার দ্বারা সাধারণতঃ কি পরিমাণ জৈব কার্বন, গ্রহণযোগ্য ফস্‌ফেট ও গ্রহণযোগ্য পটাশ রয়েছে, তা নিরূপণ করা হয়। জৈব কার্বনের মান থেকেই জৈব পদার্থ (organic matter) ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ স্থির করা হয়।

মাটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে মাটির বিভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণকে (1) অতি উচ্চ, (2) উচ্চ (high), (3) মাঝারি (medium), (4) মাঝারি নিম্ন (medium low), (5) নিম্ন (low), (6) অতি নিম্ন (very low)—এই ছয়টি মানে প্রকাশ করা হয়। মান নির্ধারণের জন্য নীচের তালিকাটি অনুসরণ করা হয়:—

	উদ্ভিদখাদ্য	অতিউচ্চ	উচ্চ	মাঝারি	মাঝারি নিম্ন	নিম্ন	অতিনিম্ন
1.	জৈব কার্বন	1%এর বেশী	0.81% —1.0%	0.61% -0.80%	0.41%-0.60%	0.21 -0.40%	0.20%-এর কম
2.	গ্রহণযোগ্য ফস্‌ফেট কেজি/হেক্টর	115-এর বেশী	93-115	71-92	46-70	23-45	0-22
3.	গ্রহণযোগ্য পটাশ কেজি/হেক্টর	360-এর বেশী	301-360	241-300	181-240	121-180	0-120

*ইনসেক্টিসাইডস কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, মেদিনীপুর, (পঃ বঃ সরকার)

মাটিতে সুষম খাদ্য-উপাদান সরবরাহের জন্ত সাধারণতঃ জৈব ও রাসায়নিক দু রকমেরই সার প্রয়োগ করা হয়।

জৈব সার :—মাটিতে হিউমাস নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ মাটির গঠনগত উন্নতি ও উর্বরতা শক্তি বাড়ানোর জন্ত প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ জমিতেই জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেনের অভাব রয়েছে। কাজেই জৈব সারের প্রয়োজনও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব এলাকার মাটিতে কমবেশী রয়েছে। জৈব সারে মোটামুটি ভাবে উদ্ভিদ খাদ্যের পরিমাণ হল—নাইট্রোজেন (N) 0·5%−1·0%, ফস্‌ফেট (P_2O_5)0·2%−0·5% এবং পটাশ (K_2O)00.3%−0.6%।

মাটির প্রকার ভেদ এবং আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে এই উদ্ভিদখাদ্যের মধ্যে শতকরা 30—40 ভাগ নাইট্রোজেন, 10—12 ভাগ ফস্‌ফেট ও 40—50 ভাগ পটাশ ফসলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়।

সাধারণভাবে বিভিন্ন ফসলের জন্ত নিম্নরূপ জৈব সারের সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

ধান—	হেক্টর প্রতি	$8\frac{5}{7}$	টন
গম—	"	14	"
পাট—	"	7	"
আখ—	"	30	"
আলু—	"	28	"
তৈলবীজ„	"	6	"

রাসায়নিক সার :—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটির পরীক্ষার ফলাফল থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদখাদ্যের পরিমাণ নিরূপণের পর ফসলের চাহিদা (বিভিন্ন ফসলের খাদ্য উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন) অনুযায়ী রাসায়নিক সার হিসাবে গাছের প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান নাইট্রোজেন, ফস্‌ফেট ও পটাশ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়ে থাকে। এই সুপারিশে কি ভাবে সার প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ সারিতে ছড়িয়ে কিংবা স্প্রে করে তারও উল্লেখ থাকে।

বিশেষ কয়েকটি নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সারের ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে অথবা অতি বৃষ্টির ফলে মাটিতে অম্লত্ব আসে। পি. এইচ-এর মান মৃত্তিকা পরীক্ষার সময় নির্ণয় করা হয় এবং এই পি. এইচ. মানের সাহায্যে বলে দেওয়া যায় কোন্ মাটি অম্ল, কি ক্ষারীয়, কি সাধারণ। পি. এইচ. 6.5—7.2 এককের মধ্যে হলে মাটিকে সাধারণ মাটি (normal soil), 6.5-এর নীচে হলে তাকে আম্লিক (acidic soil) এবং 7 2-এর বেশী হলে ক্ষারীয় মাটি (calcareous soil) বলে। মাটির অম্লত্ব ফসলের সহের সীমা পার হয়ে গেলে ফলন কমে যায়। সে ক্ষেত্রে অম্লত্ব সংশোধন করা প্রয়োজন। অম্লত্ব দূরীকরণের জন্ত চুনাপাথর, চক্‌গুঁড়া, ডলোমাইট, পোড়াচুন, বেসিক স্লাগ ও কলকারখানার উপজাত চুনাপদার্থ ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন পি. এইচ. সম্পন্ন আম্লিক মাটিকে লাইমের সাহায্যে সংশোধনের জন্ত কি পরিমাণ চুন (lime) প্রয়োজন তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

পি. এইচ.	হেক্টর প্রতি লাইম
5·5—5·7	4 টন
5·8—6·1	3 "
6·2—6 4	2 "
6·5	0 "

মনে রাখা দরকার, জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হলে অন্ত কোন সার দেওয়ার, গাছ লাগানোর বা বীজ বোনার অন্ততঃ একমাস আগে জমিতে সমান ভাবে ছড়িয়ে আড়াআড়ি লাঙল দিয়ে মাটিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। শুধু চুন ব্যবহারে মাটির গঠনগত মান যথেষ্ট কমে যায় তাই চুন প্রয়োগের সময় জৈব সারও পরিমাণ মত অবশ্যই জমিতে দেওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে চুনের পরিবর্তে টাটা ও রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা থেকে উপজাত পদার্থ হিসাবে বেসিক স্লাগ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে। এই বেসিক স্লাগে 45% ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO); 9% ফস্‌ফেট থাকে।

মাটি পরীক্ষার সরকারী ব্যবস্থা :—সরকারী ব্যবস্থাপনায় কলিকাতায় টালিগঞ্জে একটি, বর্ধমানে একটি এবং মেদিনীপুরে একটি মাটি পরীক্ষাগার রয়েছে। এছাড়া বর্ধমানে একটি ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষাগার রয়েছে। কৃষকেরা বিনা খরচায় এই সব পরীক্ষাগার থেকে মাটি পরীক্ষা করাতে পারেন। এছাড়া ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুর ও শিলিগুড়িতে মাটি পরীক্ষাগার রয়েছে। মাটির নমুনা পরীক্ষাগারে পাঠানোর আগে নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হওয়া দরকার। কারণ নমুনা সংগ্রহে ত্রুটি থেকে গেলে নমুনা পরীক্ষার ভিত্তিতে তার প্রয়োগের পরিমাণও ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে এবং লাভজনক ফলন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। মাটির নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে উন্নয়ন সংস্থার কৃষিসম্প্রসারণ কর্মী ও গ্রাম-সেবকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া যাবে। অবশেষে বলতে হয় কৃষি-বিজ্ঞানী ও গবেষকদের সঙ্গে কৃষকদের সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস ততই ফলপ্রসূ হবে। তবেই কৃষিবিপ্লব হবে সফল।

বিজ্ঞান-সংবাদ

আমাদের পূর্বপুরুষ

উপরের চিত্রটি এজিপটোপিথেকাস (Aegyptopithecus)-এর—যাকে বিজ্ঞানীরা নর বানরের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ বলে মনে করেন। বিড়ালের ন্যায় ছোট এই প্রাণীটির জীবাশ্ম মিশরের সাহারায় পাওয়া গেছে। নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, এই প্রাণী প্রায় তিন কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। ছবির নীচে দু-পাশে দু-রকম দাঁতের ছবির একটি হল পুরুষ প্রাণীর (বামদিকে), অপরটি হল স্ত্রীপ্রাণীর (ডানদিকে)। ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট, ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশান এবং মিশরীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার বিজ্ঞানীদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে।

ভারতীয় ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানীর গবেষণা

তৈল ও গ্যাস শিল্পের মস্কো গুব্‌কিন ইনস্টিটিউটের বিশেষ অ্যাকাডেমিক পরিষদ ভারতের মোহনচন্দ্র পাণ্ডেকে মাস্টার অব সায়েন্স (ভূতত্ত্ব ও খনিজতত্ত্ব) ডিগ্রী প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন সাতাশ-বছর-বয়স্ক এই স্নাতকোত্তর ভারতীয় তৈল-সমৃদ্ধ কাস্পিয়ান-কুবিন্‌কা এলাকায় মধ্যজীবীয় যুগের মজুদ ভাণ্ডারের ভূ-পদার্থগত পর্যবেক্ষণের জন্য যে সর্বাঙ্গীন পদ্ধতির কথা বলেছেন, পরিষদের বিজ্ঞ সদস্যরা তার উচ্চ-প্রশংসা করেছেন। মোহনচন্দ্র পাণ্ডে স্নাতকোত্তর পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন তৈল ও রসায়নের আজারবাইজান ইনস্টিটিউট থেকে (এম আজিজবেকভের নামে যে ইনস্টিটিউটের নাম)।

তরুণ এই গবেষক ইনস্টিটিউটের ভূ-পদার্থগত তথ্য নিয়ে তিন বছর যাবৎ অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করছেন।

আজারবাইজানের কয়েকটি সম্ভাব্য তৈলসমৃদ্ধ এলাকায় ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে তাঁর কাজ থেকে পাওয়া যাবে বৈজ্ঞানিক, পদ্ধতিগত ও বাস্তব প্রয়োগ।

তাঁর থিসিসের সাফল্যমণ্ডিত প্রতিপাদনের পরে মোহনচন্দ্র পাণ্ডে বলেছেন, "ভূ-পদার্থগত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য যে পদ্ধতি আমি এখানে বিশদভাবে দাঁড় করিয়েছি সেটি আমি প্রয়োগ করব উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের গিরিরেখায় ভূ-পদার্থগত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য। ভূতত্ত্বগত কাঠামোর দিক থেকে এই এলাকা আজারবাইজনের কোন কোন এলাকার সমতুল্য। এ-কারণে বাকুতে প্রাপ্ত ফলাফল আমার নিজের দেশেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবার গবেষণায় সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ও ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা যে বিপুল সহায়তা করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী। ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নে এবং ভারতের বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণে আজারবাইজান প্রচুর সাহায্য করছে।

অরণ্য বিষয়ক সম্মেলন

গত 16ই জানুয়ারী থেকে 19শে জানুয়ারী দেরাদুনের ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অরণ্য সংক্রান্ত গবেষণায় বহু সংস্থা ও বিজ্ঞানীদের একটি সম্মেলন হয়েছিল। প্রায় আড়াই-শ' বিজ্ঞানী ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করে ভারত সরকারের বন বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল বি. পি. শ্রীবাস্তব শক্তি সমস্যা ও পরিবেশ দূষিতকরণ সমস্যার সমাধানে অরণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন। তিনি বলেন ভারতের বিবিধ অরণ্য সম্পদ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য এই বিভাগের দ্রুত উন্নয়ন করা দরকার। সম্মেলনে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা বলেন, এই শতাব্দীর শুরুতে ভারতের শতকরা প্রায় 37 ভাগ অঞ্চল ছিল অরণ্য, এখন তা কমে শতকরা 23 ভাগে এসেছে তাঁরা মনে করেন, এর পরও বন নষ্ট করা হলে প্রকৃতিতে যে ভারসাম্যের অভাব হবে তার ফল হবে মারাত্মক। তাঁরা ইউক্যালিপটাস, পাইন, পপলার প্রভৃতি গাছ রোপণের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এই গাছগুলি শুধু তাড়াতাড়ি বেড়েই ওঠে না। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এগুলি খুব উপযোগী।

ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা আর. সি. ঘোষ বলেন, এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর তৈল ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে। একমাত্র অরণ্যই পারে খুব সস্তায় শক্তি সমস্যার সমাধান করতে। তিনি বলেন, গতানুগতিক বৃক্ষরোপণের চেয়ে যে সমস্ত প্রজাতির গাছ সৌরশক্তিকে ভালভাবে অধিক-মাত্রায় কাজে লাগাতে পারে সে-রকম গাছই রোপণ করা দরকার। বহু প্রতিনিধি উদ্ভিদের লেটেক্স (latex)-কে জ্বালানী তেলে রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি যাতে শক্তি সমস্যার সমাধানে বনসম্পদ বৃদ্ধিতে আরও উদ্যোগী হন সেজন্য সম্মেলন থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দক্ষিণ মেরুর হিমবাহে ছিদ্র করা হয়েছিল কি-ভাবে ও কেন?

ওয়াই দুজাকারভ

আগামী পঞ্চাশ থেকে একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর মহাদেশগুলির উপকূলভাগের সমস্ত নীচু এলাকা সমুদ্রের গ্রাসে চলে যাবে—বিজ্ঞানীরা অনেকে এই মত পোষণ করেন। কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়ার ভি. যোয়েভ উদ্ভাবিত তাপ-বিদ্যুৎ ড্রিলের সাহায্যে দক্ষিণ মেরুতে যে অনুসন্ধান-কার্য চালানো হয়েছে তা থেকে ধারণা হয় যে এমন একটি বিপর্যয় নাও ঘটতে পারে।

দক্ষিণ মেরুর পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ভাসমান হিমবাহ 'রস্'। বরফের এই আস্তরণটি স্থানে স্থানে 800-মিটার গভীর। যতখানি আয়তন জুড়ে আছে তা কৃষ্ণসাগরের আয়তনের সমান। বহু স্থানে এই হিমবাহের তলার দিক সমুদ্রগর্ভের উঁচু হয়ে ওঠা মাটিতে ঠেকে আছে। অতএব হিমবাহটি আছে দৃঢ়বদ্ধ অবস্থায়, ফলে ভেসে যেতে পারে না। উপরন্তু হিমবাহটি হয়ে উঠেছে একটি প্রতিবন্ধক বা বাঁধের মত যা দক্ষিণ মেরু ঘিরে থাকা বিপুল বরফরাশিকে স্থানচ্যুত হতে দেয় না। এই বরফরাশিকে বলা হয় পশ্চিম কুমেরু। বরফের এই আস্তরের মোট পরিমাণ ত্রিশ লক্ষ ঘন-কিলোমিটারেরও বেশী।

উল্লিখিত তত্ত্বের কথায় আসা যাক। এই তত্ত্বের প্রবক্তরা মনে করেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে রস্ হিমবাহ গলতে থাকবে। তার ফলে হিমবাহটি দুর্বল হয়ে পড়বে এবং পশ্চিম কুমেরুর বরফরাশির চাপ সামলাবার ক্ষমতা হারাবে। তখন এই হিমবাহের একটা অংশ গড়িয়ে পড়বে সমুদ্রের মধ্যে এবং সেখানে গলে যাবে। ফলে বিশ্বের মহাসাগরে জলস্তর আরো 5-6 মিটার উঁচু হয়ে উঠবে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এম. মইযারের ভাষায়, "ব্যাপারটা যা ঘটবে তা হয়তো দ্বিতীয় একটি মহাপ্লাবন নয়, কিন্তু মহাদেশগুলির সমস্ত বন্দর-শহর ও উপকূলঅঞ্চল জলে ডুবে যাবে।"

সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাডেমির ভূগোল ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আই. গেরাসিমভ এবং আকাদেমির পত্র-সদস্য ভি. আভসিয়ুক, এম. বুদিকো ও ভি. কোৎলিয়াকভ বিষয়টি নিয়ে গুরুতর ভাবনাচিন্তা করেছেন।

ছ'বছর আগে নেব্রাস্কার লিঙ্কন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা রস্ হিমবাহ নিয়ে গবেষণা করার জন্য একটি প্রকল্প রচনা করেন। প্রকল্পের উদ্দেশ্য, জানতে চেষ্টা করা হিমবাহটি প্রকৃতই গলছে কিনা এবং বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে হিমবাহের অবস্থা কি হতে পারে। প্রকল্পে কাজ করার জন্য বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রিতদের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানী ছিলেন তিনজন—আই. জোতিকভ, ভি জাগোরোদনভ, ওয়াই. রাইকোভস্কি।

ইগর আলেক্সিয়েভিচ জোতিকভ হচ্ছেন কুমেরু বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। ছয়মাস তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হানোভারে এবং মার্কিন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একযোগে রস্ হিমবাহের বরফের নমুনা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

রস্ হিমবাহে মার্কিন কুমেরু শিবিরের নাম ছিল

রেন বাইন। গত বছর 24শে নভেম্বর তারিখে বিজ্ঞানীরা সেখানে উপস্থিত হন। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন হিমবাহের নীচের দিকে কি ঘটছে, সেখানে বরফ গলছে কিনা এবং বরফের নতুন স্তর তৈরি হচ্ছে কিনা।

সেজন্য প্রয়োজন ছিল বরফের আস্তরের মধ্যে দিয়ে একটি ছিদ্র করার এবং একেবারে তলা থেকে বরফের নমুনা তুলে আনার। ছিদ্র করার ভার ছিল আমেরিকানদের ওপরে।

তখন থেকেই সংগ্রাম শুরু। 1968 সাল বার্ড স্টেশনে আমেরিকানরা একটি বৈদ্যুতিক-মেকানিকাল ড্রিলের সাহায্যে রস্ হিমবাহে ছিদ্র করতে শুরু করেন ও 2,164 মিটার গভীরতা পর্যন্ত পৌছান। ছিদ্রটি ঘণ্টাকয়েক খোলা থাকে, তারপরে জমাট বেঁধে বন্ধ হয়ে যায়। বোঝা গেল, ছিদ্র করার সাবেকী পদ্ধতি কুমেরু এলাকায় অচল। চার বছর পর আবার তাঁরা উপস্থিত হন ছিদ্র করার বিশেষ যন্ত্রপাতি নিয়ে। এবারেও ব্যর্থ হন। মাত্র 320 মিটার গভীরতায় পৌছেই ছিদ্র করার যন্ত্র অচল হয়ে যায়। আমেরিকানরা তখন সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের সাহায্য চান। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা নিয়ে আসেন লেনিনগ্রাদের ইঞ্জিনিয়ার ভি. মোরেভ উদ্ভাবিত একটি তাপ-বিদ্যুৎ ড্রিল ইউনিট।

মোরেভ উদ্ভাবিত যন্ত্রে প্রধান অংশ হচ্ছে একটি "ইস্ত্রি"—এক্ষেত্রে একটি তামার কর্ক-স্ক্রু নল, তার ভিতরে উত্তাপ সৃষ্টি করার কুণ্ডলী বরফের ওপরে স্থাপিত হলে বরফ গলতে থাকে ও ছিদ্র হয়ে চলে। পদ্ধতিটি এতই সরল যে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যান। গোড়ার দিকে অন্য অসুবিধা কিছু দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা শুধরে নেওয়া হয়।

মোরেভ উদ্ভাবিত এই ড্রিলের সাহায্যে রেন-বাইন শিবিরে ছিদ্র করার কাজ শুরু হয় গত বছর 4ঠা ডিসেম্বর তারিখে। হিমবাহটি সেখানে 400 মিটার গভীর। দিনে 50 মিটার করে ছিদ্র করার কাজ চলতে থাকে এবং বিভিন্ন গভীরতা থেকে বরফের নমুনা উঠে আসে।

410 মিটার গভীরতায় পৌছবার পরে প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে। শর্ট সার্কিট হবার ফলে যন্ত্র থেমে যায়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, যন্ত্র সম্ভবত লবণমিশ্রিত বরফের স্তরে পৌছেছে। ব্যাপারটা দেখা গেল তাই। তুলে আনা বরফের নমুনায় পাওয়া গেল লবণ-জল।

এই দুর্ঘটনা থেকেই ঘটে যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। রস্ হিমবাহের তলা থেকে তুলে আনা বরফের নমুনা নিয়ে গবেষণা অবশ্যই চলতে থাকবে, কিন্তু তবুও এই গোড়ায় পর্বেই বলা চলে—হ্যাঁ, রস্ হিমবাহের বরফ গলছে, তবে সেজন্য কোন বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই। গলা বরফের জল আবার জমে যাচ্ছে ও নতুন বরফের স্তর যুক্ত হচ্ছে। গলনের প্রক্রিয়ার চেয়ে জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া দ্রুততর।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

বিজ্ঞান-সাধক সুবোধচন্দ্র

বিদ্যুৎকুমার মেদ্দা*

[ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনা শুরু হয় দুটি ধারায়—একটিতে বিজ্ঞান-বিষয়ক নানা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার সূত্রে বাঙালী একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেছে; অন্যদিকে বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিবিধ প্রয়োগ ও পরীক্ষায় বাঙালীর বৈজ্ঞানিক মনীষা আত্মনিয়োগ করেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সৃষ্টি ও অন্যদিকে বিজ্ঞানের প্রয়োগ-পরীক্ষার সমবায়েই বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। শারীর-বিজ্ঞানের মৌলিক ধারায় এবং প্রয়োগক্ষেত্রেও সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের সেই স্মরণীয় অবদানের কথাই এখানে বলা হয়েছে।]

জীবনপ্রবাহের অসংখ্য জীবনজিজ্ঞাসায় জীবনবিজ্ঞানের উদ্ভব। জীবের কাঠামো নিয়ে নাড়াচাড়া করলে জীবনরহস্যের মূল সূত্রগুলি খুঁজে পাওয়া যায় না। মৌল বিজ্ঞান হিসাবে শারীরবৃত্ত বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হলেও ভারতে এটি অনাদৃত ও উপেক্ষিত হয়ে আসছে। শারীরবৃত্তকে এর বিজ্ঞান-সম্মত যথোচিত মর্যাদা এতদিন দেওয়া হয় নি। মেডিক্যাল কলেজের বাইরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শারীরবিদ্যার উচ্চশিক্ষাকে যথোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে

*21/সি, বীরপাড়া লেন, কলিকাতা-30

কয়েকজন শিক্ষাবিদ প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ অন্যতম। শারীরবিজ্ঞানকে মৌলবিজ্ঞান হিসাবে গুরুত্ব দিতে ভারতে তিনিই প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং শারীরবিজ্ঞানী হিসাবে তিনি ভারতের বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ 1867 সালে 4ঠা মার্চ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গুরুচরণ মহলানবিশ এবং মাতা রুক্মিণীদেবী। গুরুচরণের পৈত্রিক নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার পঞ্চসার গ্রামে। সুবোধচন্দ্রের শৈশবকাল ও বাল্যকাল কেটেছিল শহরেই। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ-এ পড়ার সময় তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে তাঁর প্রখর বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় দেন। এফ. এ. পড়া সম্পূর্ণ না করে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষালাভ করতে যান। আবার কয়েক বছর পরে চিকিৎসাবিদ্যা অসম্পূর্ণ রেখে 1891 সালে উচ্চশিক্ষার্থে ব্রিটেন যাত্রা করেন। ব্রিটেনে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর শিক্ষার বিষয়গুলির মধ্যে শারীরবিদ্যা ছিল অন্যতম। আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় ভর্তি হয়েও তা বর্জন করেন এবং শারীরবিদ্যা শিক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স ও পদক লাভ করেন। যে বিষয়গুলিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিদীপ্তির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল ফিজিওলজিক্যাল কেমিস্ট্রি (শারীরবৃত্তীয় রসায়ন), হিস্টলজি (কলাস্থান), প্র্যাক্‌টিক্যাল কেমিস্ট্রি (ব্যবহারিক রসায়ন), পেট্রোলজি (শিলাতত্ত্ব), প্ল্যান্টফিজিওলজি (উদ্ভিদ-শারীরবিজ্ঞান) এবং প্র্যাকটিক্যাল মেটিরিয়া মেডিকাতে (ব্যবহারিক ঔষধতত্ত্বে) লাভ করেন। এসব ছাড়াও ব্যবহারিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চিত্র অঙ্কনের জন্য এবং আণুবীক্ষণিক স্লাইড প্রস্তুতির জন্য তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

1896-97 সালে সুবোধচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস-এ শারীরবিদ্যা বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে স্যামন (Salmon) মাছের উপর তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1897-98 সালে এ. ডি. ডাব্লিউ গ্রেগ, জে. সি. ডানলপ, ই. ডি. বয়েড এবং নোবেল প্যাটন প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানিগণ তাঁর সঙ্গে এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। 1898 সালে নোবেল প্যাটনের সম্পাদনায় গবেষণার ফলাফলের বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির নাম—'The Life History of the Salmon'। সুবোধচন্দ্র প্রধানত স্যামন মাছের পেশীতে স্নেহদ্রব্যের পরিবর্তন, বিশেষত যখন স্যামন মাছ সমুদ্রে বিচরণ করে এবং জননের উদ্দেশ্যে নদীতে প্রত্যাবর্তন করে সেই সময় পেশীতে স্নেহদ্রব্যগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি দেখেছিলেন, স্যামন মাছের সমুদ্রে সাঁতারের সময় পেশীতন্তুগুলির এবং উপতন্তুগুলিরও ফাঁকে ফাঁকে স্নেহদ্রব্য সঞ্চিত হতে থাকে। স্যামন মাছের নদীতে প্রত্যাবর্তনের পর পেশীর এই সঞ্চিত স্নেহদ্রব্য শক্তি উৎপাদনের কাজে এবং যৌনাঙ্গ গঠনে ব্যয়িত হয়।

এছাড়া আরও কতকগুলি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ তিনি বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির মধ্যে নূতন ধরনের মায়োগ্রাফ, ডাবল-কমিউটেটর, এবং একটি বিশেষ ধরণের বৈদ্যুতিক চাবির বিষয়ে প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1899 সালে

19শে ডিসেম্বর এডিনবার রয়্যাল সোসাইটির এক সভায় তিনি তাঁর নূতন ধরণের মায়োগ্রাফ যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন। মায়োগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষাগারে পেশী সংকোচনের রেখালিপি গ্রহণ করা যায়। দু-প্রকার পেশী সংকোচনের উপরই (যথা—আইসোমেট্রিক এবং আইসোটনিক সংকোচন) বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আইসোমেট্রিক (সমদৈর্ঘ্য) সংকোচনের সময় পেশীকোষ বা পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু টান (tension) বৃদ্ধি পায়। আইসোটনিক (সমটান) সংকোচনের সময় পেশীতন্তুর দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় এবং স্থূলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এর আয়তন প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। সুবোধচন্দ্রের উদ্ভাবিত নূতন মায়োগ্রাফের সাহায্যে পেশীর উপর দু- প্রকার সংকোচনই অতি সহজেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হত। স্নায়ু বা পেশীতে পরপর বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে এবং যদি প্রতিটি উদ্দীপনা উদ্দীপিত পেশীর সম্প্রসারণ কালের মধ্যে পড়ে তা হলে পেশী-সংকোচনের একটি মাত্র তরঙ্গায়িত লেখচিত্র (graph) লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। শারীরবৃত্তে এটিই পেশীর টিটেনাস রেখালিপি। পরীক্ষাগারে দ্রুত এবং পুনঃ পুনঃ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা প্রয়োগে পেশীর অবিরাম সংকোচনের বা টিটেনাসের রেখালিপি গ্রহণ করে শারীরবৃত্তে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। সুবোধচন্দ্রের উপরিউক্ত মায়োগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে পেশীর ক্লান্তি ও অবিরাম সংকোচন বা পেশীর টিটেনাস অতি সহজেই গ্রহণ করা সম্ভব হত। 1900 সালের 10ই মার্চ লণ্ডনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির এক সভায় তিনি তাঁর নির্মিত নূতন ধরণের ডাবল-কমিউটেটরের গঠন এবং ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদরূপে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাঁর এই ডাবল-কমিউটেটরের সাহায্যে দু-জোড়া ইলেকট্রোডের (তড়িদ্দ্বার) মধ্য দিয়ে যে কোনও একজোড়া তড়িদ্দ্বারের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা যেত এবং প্রবাহমান বিদ্যুৎ-এর দিক পরিবর্তন করা সম্ভব হত। ইনডিউসড (আবিষ্ট) তড়িৎ প্রয়োগের মাধ্যমে পেশী এবং স্নায়ুর উদ্দীপনা ঘটাবার সময়ে 'শকের (অভিঘাত) সৃষ্টি হত। সুবোধচন্দ্রের নির্মিত ডাবল-কমিটেটরের সাহায্যে অভিঘাত দূর করা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও এই যন্ত্রটির সাহায্যে মুহূর্তকালের মধ্যে বিদ্যুৎ-সঞ্চালন করা যেত। পরীক্ষামূলক শারীরবিদ্যার অনুশীলনে ডাবল-কমিউটেটরের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 1898 সালে এপ্রিল মাসে এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস. ই.) এবং লণ্ডনের রয়্যাল মাইক্রোস্কোপিক সোসাইটিরও ফেলো (এফ. আর. এম. এস.) নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 1897 সালে কার্ডিফের ইউনিভার্সিটি কলেজে শারীরবিদ্যা বিভাগের প্রধান ও ইনটেরিম প্রফেসরের পদলাভ। এটা খুবই গর্বের বিষয় যে, এই পদে তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয়। 1899 সালে তিনি ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (1900)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর কর্মজীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হয়। তিনি অবিভক্ত বাংলা জীববিদ্যা শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁরই চেষ্টায় 1900 সালে

প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বায়োলজি বিভাগের পত্তন হয় এবং তিনি এর প্রফেসর পদে আসীন হন। প্রথমে উদ্ভিদবিদ্যা এবং শারীরবিদ্যা একই বিভাগে শিক্ষাদান করা হত। পরে বেকার ল্যাবরেটরি তৈরী হলে 1913 সালে শারীরবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে ঐখানে স্থানান্তরিত হয়। কলেজের অধ্যাপনা কাজের সঙ্গে সঙ্গে একাগ্রচিত্তে সুবোধচন্দ্র বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্রতী থাকতেন। সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাগারে উন্নত ধরনের কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। অর্থের অভাব, উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাব, কিছুই তাঁর উৎসাহ-উদ্যমকে প্রতিহত করতে পারে নি। পুরানো যন্ত্রের সংস্কার-সাধন করে তিনি গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতেন। সুবোধচন্দ্র 1904-46 সাল পর্যন্ত প্রায় 43 বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনেটের এবং 1906-28 সাল পর্যন্ত প্রায় 23 বছর সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় 1910 সালে স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যা পাঠ্যক্রম চালু হয়। 1916 সাল নাগাদ তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে 'ডিনের' পদ লাভ করেন। এর কয়েক বছর পরে তিনি সিনিয়র প্রফেসর পদে উন্নীত হন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। 1934 সালে সুবোধচন্দ্র, নীলরতন সরকার এবং নরেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখের প্রচেষ্টায় 'ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। সুবোধচন্দ্রই ছিলেন প্রথম প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। 1936 সালে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি শারীরবিদ্যার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বোটানিক্যাল সোসাইটি অফ বেঙ্গলেরও সভাপতি ছিলেন। 1938 সালে তাঁরই চেষ্টায় স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিজ্ঞান কলেজে স্থানান্তরিত হয়।

বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তা ও জীবনধারার প্রতি অধ্যাপক মহলানবিশের ছিল অবিচলিত আস্থা ও আনুগত্য। শিক্ষক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর বাচনভঙ্গী ও ভাববিন্যাস ছিল মনোগ্রাহী এবং ঐশ্বর্যে ভরপুর। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁর ছিল গভীর জ্ঞান এবং স্বচ্ছ বিচারশক্তি। তিনি ছিলেন অমায়িক, তাঁর হৃদয়টি ছিল আন্তরিকতায় পূর্ণ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি, কিন্তু ছাত্রদের নিকট তিনি ছিলেন সামান্য ও সাধারণ একজন অধ্যাপক। গবেষক ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন প্রাণ, মন ও হৃদয়। কয়েকটি স্কুল পাঠ্য ছাড়াও তাঁর কতকগুলি লোকরঞ্জক বাংলা প্রবন্ধ, (যেমন—জলাতঙ্ক, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেশ, প্রেমের উপাদান, সমন্বয় কি অসম্ভব? হেনরী ড্রামণ্ড, আনন্দময় এ বিশ্ব শোভা-সুখপূর্ণ, প্রবাসী, দেবালয়, নব্যভারত) তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সুবোধচন্দ্র সমাজকল্যাণ ও সংগঠন কর্মেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রসারণে ও আন্দোলনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি প্রায় 3 বছর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, বেথুন কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন প্রভৃতির পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন।

1953 সালে 31শে জুলাই শুক্রবার 90 নং পার্ক স্ট্রীটস্থ বাড়ীতে এই বিরাট কর্মজীবনের শেষ হয়। পরাধীন ভারতে নানা প্রতিকুলতার মধ্য দিয়ে তিনি যে বিজ্ঞান সাধনা করে গেছেন তা জাতি চিরকাল সসম্মানে স্মরণ করবে। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, পরানুকরণ নয়, পরমুখাপেক্ষিতাও নয়, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সৎ-চিন্তা ও সৎ-আদর্শের পরিপোষণই হল সত্যকারের মনুষ্যত্ব।

প্রাণীর শীতঘুম

কল্যাণ মুখোপাধ্যায়*

প্রাণীজগতের এক বিশাল অংশ শীতকাল কাটায় ঘুমিয়ে। এই শীতঘুম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে হয়েছে।

বহুপ্রাণী শীতকাল কাটায় ঘুমিয়ে। একে বলা হয় শীতঘুম। শীতঘুম প্রকৃতপক্ষে বাঁচার জন্য সংগ্রামের একটি অঙ্গ। পৃথিবীর শীতপ্রধান অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ প্রাণী শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায়। ঠিক যে ঘুমিয়ে থাকে তা নয়। ঐ সময় তাদের হৃদ্‌ঘাত হয় এক বা দুই মিনিটে একবার। পরিবেশের সঙ্গে দেহের উষ্ণতার পার্থক্য হয় অতি সামান্য। সমস্ত প্রকার বিপাকীয় কার্যের হার যায় কমে। ফলে মৌলবিপাকীয় হারও (B.M.R.) কমে আসে। তারা খাদ্যগ্রহণ না করে দেহমধ্যস্থ ফ্যাটের জারণে বেঁচে থাকে। বসন্তের প্রথম সূর্যের কিরণের সাথে সাথেই আবার তারা বেঁচে ওঠে। ঠিক বেঁচে ওঠে না, জেগে ওঠে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অধিকাংশই সারা শীতকাল কাটায় ডিম্ব অবস্থায়। তাদের ডিমের খোসা তাপের অত্যন্ত কুপরিবাহী। ফলে ডিম্বস্থিত ভ্রূণ (embryo) সহজেই বেঁচে থাকে।

বহু প্রজাপতি এবং মথ শীতকাল কাটায় পিউপা অবস্থার মাধ্যমে। চারিদিকে গুটি থাকায় বাইরের শৈত্য থেকে এরা সহজে বাঁচে। অবশ্য দুই-এক রকমের প্রজাপতি বা মথ আছে যারা শীতের আগে একটি শুকনো নিরালা জায়গা বেছে নিয়ে সারা শীতকাল সেখানে আচ্ছন্নভাবে কাটিয়ে দেয়।

বিভিন্ন ধরণের শামুক শীতকাল ঘুমিয়ে কাটায় পাথর বা কাঠের গুঁড়ির তলায়। এক ধরণের স্থলশামুক একসঙ্গে অনেকে একটি শক্ত আবরণে আবৃত হয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মাছেদের মধ্যে প্রকৃত শীতঘুম আছে কিনা সন্দেহ। একথা সবার জানা যে জলের অ্যানোমোলাস এক্সপ্যানসনের জন্য সমুদ্র বা জলাশয়ের তলদেশের জলের তাপমাত্রা শীতকালে 4°C-এর কম হয় না। ফলে মাছেরা সহজেই সক্রিয় থাকে। তবে কিছু কিছু মাছ শীতকালে আচ্ছন্নভাবে কাদায় আংশিক ডুবে থাকে। তবে একে প্রকৃত শীতঘুম বলা যায় না।

তবে মজার ব্যাপার কয়েক প্রজাতির মাছের ক্ষেত্রে গ্রীষ্মনিদ্রা (aestivation) দেখা যায়। পৃথিবীর উষ্ণ অঞ্চলে এই জাতের মাছ দেখা যায়। গ্রীষ্মে নদী যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কাদায় গর্ত করে তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং নিজেদের মিউকাস বা শ্লেষ্মার আবরণে ঢেকে ফেলে। একটি সরু ছিদ্রপথে এরা শ্বাসকার্য চালায়। এই সময় তারা খাদ্যগ্রহণ করে না। বৃষ্টির জলে আবার জলাশয় পূর্ণ হলে মাছগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে। উদাহরণ স্বরূপ মাগুর মাছের উল্লেখ করা যায়।

* 2/1, মহিষকাপুর রোড, 'বি' জোন, দুর্গাপুর-5

ব্যাঙ, কচ্ছপ, সাপ, গিরগিটি এবং বিভিন্ন জাতের সরীসৃপ অত্যন্ত সুপরিচিত হাইবারনেটর বা শীতঘুমকারী প্রাণী। এরা প্রত্যেকেই মাটির তলায় আশ্রয় নেয়। ফলে কুয়াশা ও তুষারের হাত থেকে রক্ষা পায়। দেহের তাপমাত্রা সর্বদা পরিবেশ অপেক্ষা 2°C থেকে 1°C বেশী থাকে। ব্যাঙের ক্ষেত্রে বৃক্কের উপরেই থাকে ফ্যাটবডি। শীতঘুম ঘুমানোর সময় এরাই পুষ্টির যোগান দেয় বলে মনে করা হয়।

পাখীদের মধ্যেও প্রকৃত শীতঘুম বড় একটা দেখা যায় না। কারণ বোধ হয় তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে উড়ে যেতে পারে। ফলে যেমন খাদ্যের অভাব হয় না তেমনি শীতের হাত থেকে বাঁচা যায়। তবে একধরণের আমেরিকান নাইটজার (whip-poor-will) শীতের অধিকাংশ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। কিন্তু দেহের তাপমাত্রা কখনোই 20°C-এর নীচে নামে না। ফলে একে প্রকৃত শীতঘুম বলা যায় না। বাদুড়, সজারু প্রভৃতি স্তন্যপায়ী প্রাণীও প্রকৃত শীতঘুমকারী প্রাণী।

সজারু কীট-পতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু শীতকালে মাটি বরফাবৃত হওয়ার সাথে সাথে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। পরিবেশের তাপমাত্রা 60°F-এর নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে সজারু গাছের কোটরে প্রবেশ করে এবং বলের মত গুটিয়ে শুয়ে পড়ে। এর পরই তার শীতঘুম শুরু হয়। পরিবেশের তাপমাত্রা কমার সাথে সাথে সজারুরও দেহের তাপমাত্রা কমতে থাকে। কিন্তু জীবনধারণের জন্য সর্বদা পরিবেশ অপেক্ষা দেহের তাপমাত্রা 2°F থেকে 1°F বেশী থাকে। অর্থাৎ দেহের তাপমাত্রা কমার একটা সীমা আছে। সেই সীমার পরে আর তাপমাত্রা কমে না। রেফ্রিজারেটরের থার্মোস্ট্যাট্‌, যে কাজ করে ঠিক তেমনি কাজ করে সজারুর দেহ। সজারু সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় থাকে কিন্তু তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ ঠিকমত ঘটে।

শীতঘুম যাদের অভ্যাস তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরভাবে অভিযোজিত এবং বিস্ময়কর প্রাণী বাদুড়। বাদুড় দিনে ঘুমায়, রাত্রে শিকার করে। এই দিনে ঘুমানোর সময়েই বাদুড়ের রক্তের তাপমাত্রা কমে, হৃৎঘাৎ ধীর হয়—সে কি গ্রীষ্ম, কি শীত। শীতকালে বাদুর 50°F-এর নীচে তাপমাত্রা নামলেই শীতঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এই সময় এদের দেহ অত্যন্ত শীতল হয়। বাদুড়ের রক্ত বরফের থেকে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও বাদুড় বেঁচে থাকে। বিপরীত ক্রমে শীতঘুম ঘুমাবার সময় এরা অতি অল্প শব্দ, আলো বা স্পর্শে জেগে ওঠে এবং সচল হয় যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। বাদুড়ের শোবার কায়দাটাও অদ্ভুত। তারা মাথা নীচের দিকে করে ঝুলে থাকে। এই অবস্থায় থাকতে তারা আদৌ ক্লান্তিবোধ করে না, কারণ তাদের দেহের ভারেই পায়ের পেশী সংকুচিত হয়, এর জন্য আলাদাভাবে শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন হয় না।

কাঠবেড়ালী, ছুঁচো প্রভৃতি প্রাণী আবার ঘুমের মাঝে মাঝে জেগে উঠে খাবার খেয়ে নেয়। কাঠবেড়ালী গ্রীষ্মকালে গাছের কোটরে অসংখ্য ছিদ্র করে তাতে খাবার জমা করে রাখে। কিন্তু মজার কথা প্রথমদফার ঘুমের পরেই সে খাবারের কথা আর মনে করতে পারে না।

খাদ্যের অভাব, তাপমাত্রার হ্রাস এবং শীতের ছোটদিনের অর্থাৎ দিনের আলোকিত অংশের ক্রমহ্রাস প্রভৃতির প্রভাবে সম্ভবতঃ শীতঘুমের সূচনা হয়। আবার বসন্তের সূর্যের উত্তাপ শীতঘুমের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

মহাকাশ অভিযানের কাহিনী

ভোলানাথ গঙ্গোপাধ্যায়*

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ রহস্যালোকের সন্ধান পাবার চেষ্টা করে আসছে এবং তারই ফলশ্রুতি আজকের মহাকাশ অভিযান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আশ্চর্য অগ্রগতির ফলে মানুষ আজ মহাকাশ পাড়ি দিয়েছে এবং মানুষের তৈরী মহাকাশযান অসীম শূন্যে ছুটে চলেছে সৃষ্টি রহস্য ভেদ করবার উদ্দেশ্যে।

1957 সালে রাশিয়া প্রথম মহাকাশে স্পুটনিক পাঠিয়েছে। তারপর মার্কিন বিজ্ঞানীরা 1969 সালের জুলাই মাসে মহাকাশযান অ্যাপোলো-11-এর সাহায্যে মানুষ পাঠিয়েছে চাঁদে—তাঁরা চাঁদের মাটিতে মানুষের প্রথম পদক্ষেপের চিহ্ন রেখে এসেছেন।

1971 সালে রুশ বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে মার্স-2 এবং মার্স-3 এই দুটি মহাকাশযান পাঠিয়েছেন মঙ্গলগ্রহে তথ্যসংগ্রহের জন্যে। এরা মঙ্গলের কাছ দিয়ে ঘুরে যায় এবং সোভিয়েট পতাকাচিহ্নিত একটি পেটিকা মঙ্গলের মাটিতে নামিয়ে দেয়।

1972 সালে রুশবিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহে দুটি রকেট পাঠান। প্রথমটি শুক্রের বুকে আছড়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। দ্বিতীয়টি ভেনেরা-7 শুক্রের মাটিতে ধীরে ধীরে নামতে সমর্থ হয়, কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই তার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায়। যেটুকু তথ্য সে পাঠিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, শুক্রের আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘন আস্তরণ রয়েছে—তাই শুক্র থেকে প্রতিফলিত রশ্মিতে শুক্রকে এত উজ্জ্বল দেখায়। শুক্রের মাটি কঠিন প্রস্তরময় এবং তার উষ্ণতা 300° সেঃ। শুক্রের চৌম্বক ক্ষেত্র নেই।

সৌরমণ্ডলের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে 1976 সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিজ্ঞানীরা একশো কোটি ডলার খরচ করে মঙ্গলগ্রহে দুটি মহাকাশযান ভাইকিং-1 এবং ভাইকিং-2কে পাঠিয়েছে। পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে কম দূরত্ব $3\frac{1}{2}$ কোটি মাইল। ভাইকিং ল্যাণ্ডার মঙ্গলগ্রহে নেমে নানা বিস্ময়কর তথ্য পাঠিয়েছে।

মঙ্গলগ্রহ একটি রঙ-করা মরুভূমি। এর মাটির উপর আয়রন অক্সাইডের একটি পাতলা আস্তরণ আছে—জং ধরলে যেমন চেহারা হয়, সেইরকম। মাটির প্রধান উপাদান লোহা, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, টাইটেনিয়াম, এবং অ্যালুমিনিয়াম। মঙ্গলগ্রহে আগ্নেয়গিরি এবং গভীর খাত আছে। ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে মঙ্গল জীবন্ত গ্রহ। মঙ্গলের বুকে লম্বা লম্বা খালগুলি এককালে নদীগর্ভ ছিল। আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা নামতো এবং খালগুলিতে জলের প্লাবন হতো। নদীখাতগুলির বয়স 100 কোটি বছর হবে। তখন মঙ্গলের বায়ুর ঘনত্ব ছিল বেশী এবং ভূত্বকের চাপও ছিল বেশী, ফলে মাটির উপরের জল উপরেই থাকতো।

*মবলাতলা, পোঃ চুঁচুড়া, হুগলী

মঙ্গলের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় $\frac{1}{10}$অংশ, ব্যাস 4 হাজার মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক। 24 ঘণ্টা 35 মিনিটে মঙ্গলের 1 দিন হয়।

পৃথিবীর মত মঙ্গলের ঋতুচক্র আছে। মেরুপ্রদেশে জল জমাট হয়ে বরফ হয়ে থাকে। মঙ্গলের উষ্ণতা -122° F। মঙ্গলে এখন তুষার যুগ চলেছে।

মঙ্গলের আবহমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও কিছু অক্সিজেন আছে; তাছাড়া নাইট্রোজেন ও আর্গন গ্যাসেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। মঙ্গলের আবহাওয়া বেশ খারাপ। মঙ্গলে সহজেই ধুলার ঝড় ওঠে এবং সারা গ্রহকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। মঙ্গলের পাতলা আবহমণ্ডলে যে ধুলোর কণা ভেসে বেড়ায়, তা থেকে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মঙ্গলের আকাশকে গোলাপী রঙে রাঙিয়ে দেয়। মঙ্গলগ্রহে জীবন আছে কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

1978 সালের 20শে অগাষ্ট মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের তৈরী ভয়েজার-2 এবং 5ই সেপ্টেম্বর ভয়েজার-1 মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ওদের পাঠানোর উদ্দেশ্য সৌরজগতের দূরতম প্রদেশে অন্য কোন আকারে জীবন থাকা সম্ভব কিনা তা অনুসন্ধান করা।

বৃহস্পতিগ্রহ সূর্য থেকে 48 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে এবং শনিগ্রহ 88 কোটি 72 লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত।

ভয়েজার-1 বৃহস্পতি থেকে 1 লক্ষ 73 হাজার মাইল দূর দিয়ে এবং ভয়েজার-2-এর দ্বিগুণ দূর দিয়ে চলে যাবার কথা।

খুব দূরের গ্রহগুলিতে সূর্যের আলো খুব কমই পৌঁছায় বলে সৌরশক্তি চালিত ব্যাটারি কার্যকর হবে না—তাই ভয়েজার নিউক্লীয় শক্তিচালিত ব্যাটারি প্রয়োজনীয় তড়িৎ সরবরাহ করবে।

ভয়েজারদ্বয় বৃহস্পতি, শনি এবং তাদের উপগ্রহগুলির তথ্য সংগ্রহ করবে। যদিও ইতিপূর্বে দুটি মহাকাশযান 1973 এবং 1974 সালে ঐ দুই গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করেছে, তবুও এরা নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করে ওদের ছবি পাঠাবে। পূর্বে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, বৃহস্পতি এবং শনি উভয় গ্রহই বিরাট গ্যাসীয় গোলক। উভয়েরই উপরিভাগে কোন কঠিন পদার্থ নেই—প্রত্যেকেরই অভ্যন্তরে শক্তির উৎস আছে। ওরা সূর্য থেকে যে বিকিরণ শক্তি পায়, তার দ্বিগুণ বিকিরণ শক্তি ওদের আছে। উপগ্রহসমেত ওদের প্রত্যেকেই একটি ছোট সৌরজগৎসদৃশ। ওদের উপাদান প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম—দুই আদি বস্তু যা থেকে সূর্য এবং গ্রহ সৃষ্ট হয়েছে।

বৃহস্পতির ব্যাস 88700 মাইল পৃথিবীর ব্যাসের 11 গুণ। পৃথিবী থেকে ওর নিকটতম দূরত্ব 36 কোটি মাইল। বৃহস্পতির মোট 13টি উপগ্রহ আছে। তার মধ্যে চারটি উপগ্রহ ছোট গ্রহের মত। ঐ চারটির মধ্যে আইও এবং ইউরোপা উপগ্রহদ্বয় কঠিন শিলাময়। আইওতে লবণের আস্তরণ আছে, ইউরোপার উপর বরফ জমে থাকে। গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো নামক দুটি উপগ্রহের অভ্যন্তরভাগ কঠিন শিলাময় কিন্তু উপরিভাগ জলের ঘন স্তর দ্বারা আবৃত। ঐগুলির উপর বরফের চাঙড় ভেসে থাকে—চাঙড়গুলিতে তেলের মত

কালো পদার্থ মেশানো। বৃহস্পতির প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র আছে এবং এই গ্রহ বিকিরণ বলয় দ্বারা বেষ্টিত। এর রঙের পরিবর্তন হয়, তবে একে প্রায়ই লাল দেখায়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, বৃহস্পতিগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব।

গত মার্চ মাসে ভয়েজার-1 ঘণ্টায় 81000 মাইল গতিবেগ নিয়ে বৃহস্পতিগ্রহ থেকে 1,73,000 মাইল দূরে দিয়ে যাবার সময় যে তথ্য পাঠিয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে বিচিত্র রঙের মেঘ ও একটি স্থির লাল চিহ্ন দেখা গেছে। বৃহস্পতি গ্রহের 960 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত্যা বইছে এবং ঐ লাল চিহ্নের চারদিকে একটা জটিল আবহাওয়ার আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। বৃহস্পতি থেকে অবিরাম তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত হচ্ছে এবং তেজস্ক্রিয় কণিকার আঘাতে তার উপগ্রহ আইও-এর ভূত্বকের উপরের স্তর বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে বিলীন হয়েছে।

বৃহস্পতিগ্রহে নিয়ত রহস্যজনক শব্দ শোনা যায়—আইও থেকে আগত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্রোতের জন্যই এই শব্দ হওয়া সম্ভব।

আইও একটি হলুদ ও কমলা রঙের গোলক—এর মাঝে মাঝে কালো অঞ্চল দেখা যায়। আগ্নেয়গিরি সমেত সবরকম ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এতে আছে। ইউরোপা একটি ফিকে সোনালী রঙের উজ্জ্বল রত্নসদৃশ। এর মাঝে মাঝে বাদামী দাগ দেখা গেছে। সবচেয়ে বড় উপগ্রহ গ্যানিমীড বাদামী রঙের। ক্যালিস্টো ঘন বাদামী রঙের—এর মাঝে মাঝে উজ্জ্বল দাগ আছে।

শনিগ্রহের ব্যাস 75000 মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের $9\frac{1}{2}$ গুণ। এর চৌম্বক ক্ষেত্র আছে।

শনির উপগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম টাইটান। এটা বুধগ্রহ অপেক্ষা বড়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, টাইটান থেকে জৈব অণু গঠিত হচ্ছে—তা যদি হয় তবে পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টির রহস্য ভেদে তা আলোকসম্পাত করবে।

উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ভয়েজারদ্বয় বজ্রনির্ঘোষে আকাশের বুক চিরে ছুটে চলে পিছনে লেলিহান আগুনের শিখার লম্বা পুচ্ছ সৃষ্টি করে। অনন্তপথের যাত্রী এরা। ভয়েজার-1 সোজা পথ ধরে বৃহস্পতির পাশ দিয়ে গিয়ে শনির রাজ্য অতিক্রম করবে 1980 সালের নভেম্বর মাসে।

ভয়েজার-2 বৃহস্পতির পাশ দিয়ে গেছে গত বছর অগাস্ট মাসে। উভয়ের যাত্রাপথ বৃহস্পতি এবং এর উপগ্রহ আইও-এর মাঝে 400000 ভোল্ট বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে। ঐ স্থান মেরুজ্যোতির মত প্রভাযুক্ত। বৃহস্পতির আকর্ষণ বল মহাকাশ যানদুটিকে শনির দিকে চালিত করবে।

ভয়েজার-2 শনির রাজ্য অতিক্রম করবে 1981 সালের অগাস্ট মাসে।

তারপর যাত্রা সুরু হবে ইউরেনাসের দিকে। ইউরেনাসের কাছ ঘেঁষে যেতে 1986 সালের জানুয়ারী হয়ে যাবে। ওখান থেকে ওরা নেপচুনের দিকে এগুবে। নেপচুনের সীমানার কাছে যাবে 1989 সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ। তারপর তারা চলে যাবে সৌরজগৎ

পেরিয়ে অনন্ত শূন্যে। বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় 30 বছর ধরে মহাকাশযানদুটির সাত হাজার তিন-শ' কোটি মাইল যাত্রাপথের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে পারবেন।

ভয়েজারদ্বয় প্রথম অসীম পথের যাত্রী নয়—এদের অনেক আগে চলে গেছে পথপ্রদর্শক হিসাবে মার্কিন বিজ্ঞানীদের মহাকাশযান পাইওনীয়র-10।

সে যাত্রা সুরু করেছে 1972 সালের মার্চ মাসে সেকেণ্ডে 10 মাইল গতিবেগ নিয়ে এবং ছুটে চলেছে দূরে দূরে অনন্ত শূন্যে। 6 মাসের মধ্যে মঙ্গলের কক্ষপথ পার হয়ে বৃহস্পতির কাছ ঘেঁষে যাবার সময় তার গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় 82 হাজার 500 মাইল।

সে এখন এই প্রচণ্ড বেগ নিয়ে নিঃসীম শূন্যে ছুটে চলেছে—শনি ও ইউরেনাসের সীমানা পেরিয়ে যাবে 1987 সালে—তারপর প্লুটোর রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হবে—সেখান থেকে পাড়ি দেবে মহাপ্রস্থানের পথে—তারার রাজ্যে।

জীবজগতে সহজাত প্রবৃত্তি

সুভাষচন্দ্র দাস*

প্রতিটি জীবেরই কিছু না কিছু সহজাত প্রবৃত্তি আছে। এই সব প্রকৃতির প্রত্যেকটিই বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমণ্ডিত। এগুলি সবার অলক্ষ্যে প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই জীবকুলকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। যেমন—বিভিন্ন প্রজাতির পাখীদের দেখা যায় তারা বংশপরম্পরায় একই বস্তু দিয়ে একই নিয়মে বাসা তৈরি করছে। কেউই তাদের শিখিয়ে দেয় নি; তবুও বাবুই পাখীর বাচ্চারা বড় হয়ে কি সুন্দর সুন্দর ঘরই না তৈরি করে। আর এর পিছনের ইতিহাসও কি কম কৌতুহলোদ্দীপক! প্রজনন ঋতুর শুরুতে দেখা যায় পুরুষ বাবুই-এর ঘাড়ের কাছে নানা রং-এর পালক গজিয়ে ওঠে। এই সময়ে এরা নীড় তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিরামহীনভাবে তারা কাজ করে যায়, কিন্তু কাজ অর্ধেক এগুতে না এগুতেই ফাগুনের হাওয়া এসে তাদের মনে আগুন জেবলে দিয়ে যায়। কাজ বন্ধ করে দিয়ে তারা উদাস নয়নে পথ চেয়ে বসে থাকে। কখন একটি স্ত্রীবাবুই আসবে তার সংগে ঘর করবার জন্যে। এই সময় এক-একটি বাবুই পাড়ায় এমনি অর্ধসমাপ্ত অনেক বাসাই চোখে পড়ে। এর পর আসে স্ত্রীবাবুই। সে এসে ঘুরে ঘুরে এক একটি বাসা ও তার মালিককে দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যাকে তার পছন্দ হয় তার সংগেই সে জুটি তৈরি করে। তখন তারা তাড়াতাড়ি করে ঘরের কাজ শেষ করে সুখের নীড় বাঁধতে। আর এই নিয়ম চলে তাদের বংশপরম্পরায়।

অপর দিকে কাকের তো ঝরা পাতা, শুকনো ডালপালা যা হোক একটা কিছু জড়ো করতে পারলেই বাসা তৈরি হলো। আবার কোকিল কিন্তু কখনো বাসাই বাঁধে না। ডিম পাড়বার

* গোবরডাঙা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউশন, পোঃ—খাঁটুরা, 24 পরগণা

সময় হলে কোকিল দম্পতি খুঁজে ফেরে এমন একটি কাকের বাসা যেখানে তারা দুটি ডিম পেড়েছে ইতিমধ্যেই। প্রথমে পুরুষ কোকিল যেয়ে ঐ বাসা বা তার আশপাশে ঘুরতে থাকে। বাসায় যে কাকটি থাকে ওকে দেখেই সে তাড়া করে নিয়ে যায় অনেক দূরে। আর এই ফাঁকে স্ত্রী-কোকিল কাকের ডিম দুটি ফেলে দিয়ে নিজে সেখানে দুটি ডিম পেড়ে রেখে সরে পড়ে। কাক ফিরে পূর্বের মতই ডিম দুটিকে যত্ন করতে থাকে। সহজাত প্রবৃত্তির এই ধারা তাদের বয়ে চলে পুরুষানুক্রমে।

শুধু পাখীরা নয়, কীটপতঙ্গও বাসা তৈরি করতে ব্যাপক ভাবে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। নারকেল, সুপারী, আমগাছের ফাঁকে যে সব মাকড়সা জাল বিস্তার করে বসে থাকে শিকার ধরবার আশায় তাদের সেই জালের নকসা যে নিপুণ শিল্পীর সযত্ন শিল্পকর্মের সমান তা যে কেউই স্বীকার করবেন। প্রথমে এরা দৈর্ঘ্যের দিকের সুতাগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে তার মাঝ দিয়ে সমান্তরাল ও চক্রাকারে সুতা সাজিয়ে এই জাল তৈরি করে। মথ জাতীয় প্রজাপতির শুঁয়াপোকা তো জীবনে একবারই গুটি তৈরি করে। অথচ প্রত্যেকটিই আকার, আকৃতি ও গঠনে কি সুনিয়ন্ত্রিত।

সহজাত প্রবৃত্তি যে শুধুমাত্র একক চরিত্রে প্রকাশিত হয় তা নয়। নালসো পিঁপড়ে, বোলতা, ভীমরুল, মৌমাছি প্রভৃতির বাসা তৈরির মধ্যে যে কারুকার্য কিংবা কৌশল দেখা যায় অথবা বাসার মধ্যে ডিম, বাচ্চা, খাদ্য ও পরিত্যক্ত বস্তুসমূহ রাখবার যে ব্যবস্থা তার মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় সহজাত প্রবৃত্তি কি সুন্দরভাবে প্রাণীদের যৌথ জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। নালসো পিঁপড়ে যখন একের পিছনে অন্যকে ধরে শিকল তৈরি করে দুটি দূরবর্তী পাতাকে কাছে টেনে এনে বাচ্চাদের লালা দিয়ে এঁটে বাসা তৈরি করে কিংবা এক গাছ থেকে অন্য গাছে যাওয়ার সময় দুটি দূরবর্তী পাতার একদিকে পা ও অন্যটিকে মুখ দিয়ে ধরে থেকে পুল তৈরি করে তা দেখলে অবাক হতে হয়।

মাটির কাজ করবার জন্যই যদি মৃৎশিল্পীদের নাম কুমোর হয়ে থাকে তবে কুমোরেপোকার নাম নিঃসন্দেহে যথাযথ। কালো, বাদামী, হলুদ বা এদের মিশ্র রং-এর মস্তক, বক্ষ ও উদরবিশিষ্ট এই পোকা (অবশ্য শুধু স্ত্রীপোকা) ডিম পাড়বার সময় হলে (ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ) সাধারণতঃ ঘরের কোন নির্জন আলো-আঁধারী কোণকে খুঁজে নেয়। তারপর আশপাশের কোন জায়গা থেকে ভিজে এঁটেল মাটির সঙ্গে ওর মুখের লালা মিশিয়ে এনে যেখানে ডিম পাড়বে তার চার পাশ দিয়ে দেয়াল তুলে দেয়। এই জায়গা লম্বায় প্রায় $1\frac{1}{2}$ থেকে 2 সে. মি. এবং চওড়ায় 1 থেকে $1\frac{1}{2}$ সে. মি. পর্যন্ত হয়। এরপর এরা দেয়ালগুলিকে ভিতর দিকে চেপে নিয়ে এসে একটা ঘর তৈরি করে। এর দরজা থাকে শীর্ষস্থানে। তখন মা তার শরীরের পিছনভাগকে ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে প্রথমে ডিম পাড়বার জায়গায় ওর শরীর থেকে নির্গত এক প্রকার আঠালো পদার্থের প্রলেপ দিয়ে দেয় এবং তারপর সেখানে প্রায় $\frac{1}{2}$ সে. মি. লম্বা সাদাটে ঘিয়ে রং-এর একটি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার পরেই শুরু হয় এদের ভবিষ্যতের বাচ্চার জন্য খাদ্য অন্বেষণের কাজ। ঘরের দেয়ালে যে মাকড়সা থাকে (লম্বা পাওয়ালাগুলি ছাড়া) সেগুলিকেই এরা ধরে নিয়ে আসে। মাকড়সাকে কামড়ে ধরে

এরা তার শরীরে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে অচেতন করে ফেলে। তারপর তাকে কুঠুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। পরে ডিম থেকে যে শুককীট বের হয় সে ঐ মাকড়সাকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে মূককীটে পরিণত হয়। সহজাত প্রবৃত্তি এমনই একটা গুণ যে জন্মলগ্নে শুধু একবার মাত্র এই খাদ্য ও কুঠুরীর সংস্পর্শে এসে এবং এই মাকড়সা শিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও পরিণত বয়সে তারা সবাই একই রকম আচরণ করছে।

শোল মাছ, ল্যাটা মাছ বাচ্চারা কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত পাহারা দিয়ে রাখে। যেন অন্য মাছে তাদের খেয়ে না যায়। একজাতের কাঁকড়া আছে যারা বাচ্চাদের বুকের কাছে রেখে লালন করে। আবার এক প্রকারের ব্যাঙ বাচ্চাদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। মুরগীর বাচ্চাদের খাবার খাইয়ে নিয়ে বেড়ায় উঠানে, রাস্তাঘাটে অথবা ঝোপঝাড়ের মধ্যে। কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সে তার ডানা দুটিকে ফুলিয়ে দিয়ে এক বিশেষ ধরনের কটকট শব্দ করতে থাকে। আর সব বাচ্চারা সঙ্গে সংগে ছুটে এসে মায়ের ডানার নীচে লুকিয়ে পড়ে। আবার সদ্য ডিম ফুটে বের হওয়া মুরগীর বাচ্চাকে চাল ও কাঠের গুঁড়া এক সংগে মিশিয়ে খেতে দিলে সে খুটে খুটে শুধু চালগুলিই খায়। এইসব সহজাত প্রবৃত্তিকে এরা বিবর্তনের ধারায় অর্জন করেছে এবং এগুলি আজ পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে সঞ্চারিত হয়ে প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করে এদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করছে।

আবার প্রাণীদের একের মনোভাবকে অন্যের কাছে প্রকাশের জন্য রয়েছে বহু রকমের সহজাত প্রবৃত্তি। পিঁপড়ে শুধু একটু শুঁড়ের ছোয়ায় কত কথাই না বলে তার সাথীদের সংগে। মৌমাছি কোথাও খাবারের সন্ধান পেলে ডানার শব্দের দ্বারা সংগীদের সেখানে আহবান করে নিয়ে যায়। মধুর সন্ধানে এ গাছ থেকে ও গাছে ঘুরতে ঘুরতে তারা কয়েক মাইলের পথ (সর্বোচ্চ 3 মাইল) অতিক্রম করেও আবার সঠিক পথ চিনে বাসায় ফিরে আসে।

শীতের দিন এলে সুন্দর বন ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছেয়ে যায় যাযাবর পাখীর ভীড়ে। ওরা পথ চিনে চিনে কেউ আসে সাইবেরিয়া থেকে কেউ বা তিব্বত থেকে, কেউ আবার হয়তো অন্য কোন শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে। প্রতি বছর এরা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে আসে আবার ফিরেও যায়। কখনো এদের দিক ভুল হয় না। ইলিশ প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ যে সমস্ত নদী দিয়ে মিষ্টি জল সাগরে নামে প্রজনন ঋতুতে তার উৎস মুখের দিকে ছুটতে থাকে এবং সেই স্রোতেই ডিম পাড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে অনেক মাছ আছে যারা বছরের পর বছর একই নদীতে উঠে আসে। এমনও অনেক মাছ আছে যে নদীতে তাদের জন্ম হয় সেখানেই ফিরে আসে ডিম পাড়তে।

কথায় বলে কুকুর রাজা হলেও সে হাড় চিবানো ছাড়ে না, অর্থাৎ সুযোগ পেলেই সে হাড় চিবোবেই—তা সে যত ভাল খাদ্যই তাকে দেওয়া হোক না কেন। বিছানা তার যতই বিস্তৃত আর মোলায়েম হোক না কেন সে শুতে গিয়ে কুণ্ডলী পাকাবেই আর সুযোগ পেলে ধুলোয় বা ঘাসে গড়াবেই। এটাই তার সহজাত প্রবৃত্তি। তেমনি একটি শিয়াল কোথাও ডাকলে আশপাশে যারা থাকে তারাও ডেকে ওঠে।

ইতরপ্রাণী খাটাস থাকে জংগলে জংগলে। স্বভাবে নিশাচর। তার চেয়েও বড় স্বভাব এরা যেখানেই থাকুক না কেন পায়খানা করতে প্রতি রাতে একই জায়গায় এসে হাজির হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার শুধু নামে নয় মেজাজও তার রাজার মত। সুন্দরবন এলাকায় বহু নদী আছে যার স্রোতে বেশ জোর। এরা যদি কখনো এই সব নদী পার হয় তাহলে নদীতে নামবার আগেই অপর পারে লক্ষ্যবস্তু ঠিক করে নেয় এবং সেখানেই ওঠে। যদি স্রোতের টানে পাশে সরে যায় তাহলে কূলে না উঠে তারা আবার ফিরে যায় এবং নতুন করে সাঁতার দেয়। এমনই এদের স্বভাব-ধর্ম।

সবার শেষে সুন্দরবনের আরো দুটি প্রাণীর কথা বলবো। উভয়েই এরা মৃগ। তবে একজন ডালে ডালে ঘোরে তাই শাখা-মৃগ, আর অন্যটি থাকে মাটিতে। একজন গাছের ডালে বসে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে আর বন্ধুকে ডাকে কু-উ-উ, কু-উ-উ, ডাক শুনে হরিণ ছুটে আসে আর মনের সুখে সেই সংগে বন্ধুকে জানায় কৃতজ্ঞতা। তার গভীর চোখের সরল চাহনিতে।

প্রশ্ন ও উত্তর

সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপুর

প্রশ্ন : (ক) ধোঁয়া কি আমাদের চুলের কোন ক্ষতি করে? যদি করে—তা কি ধরণের?

উত্তর : অল্পস্বল্প সাময়িক ধোঁয়ায় চুলের তেমন ক্ষতি হয় না। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষতির সম্ভাবনা। ধোঁয়ায় নানারকমের ময়লা (যথা ধূলিকণা, অঙ্গারকণাসহ নানান জৈব-অজৈব অণু) ও বিভিন্ন ধরণের গ্যাস থাকে। ওসব নির্ভর করে ধোঁয়ার উৎসের উপরই। এতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দু-ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় চুলে। ধুলো ময়লা কার্বনকণায় চুলগুলি নোংরা হয়ে জট পাকিয়ে যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে সাধারণভাবে পরিষ্কার করলেই তা ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পন্ন বিভিন্ন অণু ও গ্যাস চুলের উপর প্রত্যক্ষ বিক্রিয়া ঘটিয়ে চুলের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে, চুলের রং-ও বদলে দিতে পারে। এগুলি সবই সাময়িক প্রতিক্রিয়া। কারণ চুলের মূলগুলি ঠিক থাকলে সেখান থেকে পরে স্বাভাবিক চুলই তৈরি হবে। ত্বকমধ্যস্থ লোমকূপগুলি থেকে চুল তার জীবনীশক্তি সংগ্রহ করে। ধোঁয়ার উপাদানগুলি জমা হয়ে সেই লোমকূপের মুখ বন্ধ করে দিলে চামড়া ও চুল উভয়েই অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে চর্মের উপরে ও ভিতরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাতে ব্যাক্‌টিরিয়া ও পরজীবীরাও জড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে চুলের খাদ্য সরবরাহী গ্রন্থিগুলি অসুস্থ হয়ে পড়ে। চুলে তখন অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটে চুল স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রশ্ন : (খ) ক্লোরোফিল থাকায় গাছের পাতার রং সবুজ হয়। কিন্তু পতঙ্গশ্রেণীর প্রাণী গঙ্গাফড়িং-এর রং সবুজ কেন ?

উত্তর : বিভিন্ন জীবের—উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় দলেরই—গায়ের রং গড়ে ওঠে তাদের বংশগতির ধারা অনুসারে। অবশ্য এতে পরিবেশের প্রভাবও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। জীবমাত্রই বাঁচার জন্য (মূলতঃ খাদ্যসংগ্রহ ও বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে) পরিবেশের সঙ্গে বিশেষ ধরণের খাপ খাইয়ে চলার চেষ্টা করে। জীবনসংগ্রামে এই প্রচেষ্টার নামই অভিযোজন। কালক্রমে এই প্রচেষ্টা বংশগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় এবং জীবের বংশাণু বা জিন কর্তৃক সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এতে শুধু গাত্রবর্ণ নয় জীবের আকৃতি-প্রকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যের অধিকাংশই ঐ জিন প্রভাবে স্থিরীকৃত হয়। মানুষের মত উচ্চতম প্রাণীর ক্ষেত্রেও ঐ কথাই প্রযোজ্য।

গায়ের রং তৈরি হয় বিভিন্ন ধরণের পিগমেন্ট বা রঞ্জক কণা দিয়ে জীবদেহের বহিরাংশে কিছু বিশিষ্ট কোষ (specialised cell) থাকে যারা এই রঙীন কণা তৈরি করে। গঙ্গাফড়িং-এর গায়ের রং সেইভাবেই তৈরী। তার সঙ্গে ক্লোরোফিলের কোন সম্পর্ক নেই। তবে সব পতঙ্গের রং সবুজ হয় না, যে যার আবাসস্থল অনুসারেই গাত্রবর্ণ বা গাত্রবর্ণ অনুসারেই অভিযোজনের ধারায় তাদের আবাসস্থান ঠিক করে নিয়েছে। গাত্রবর্ণ সবুজ বলেই সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে গঙ্গাফড়িংরা থাকে। আর একটি কথা ক্লোরোফিল থাকলেই পাতার রং সবুজ হয় না। তাতে আলোর প্রক্রিয়ার গুরুত্ব রয়েছে, আলোকবঞ্চিত হলে সবুজপাতাও সাদা হয়ে যায়। অথচ তখনও তাতে ক্লোরোফিল থাকে। আবার উপযুক্ত আলোর মধ্যে থেকেও সব উদ্ভিদের পাতা সবুজ হয় না। অনেকের পাতা বিচিত্র বর্ণের হয়। এমন কি একই সবুজ উদ্ভিদের কিছু পাতা আবার বিশেষ সময়ে রঙীন হয়ে উঠে। এ সবই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের বিশিষ্ট বংশাণু দিয়ে। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য বিশেষ হর্মোনের ক্রিয়া আছে।

প্রশ্ন : (গ) সূর্যরশ্মি মানবদেহে পড়লে ত্বকের রং কৃষ্ণবর্ণ হয় কেন ? এতে কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে।

উত্তর : সূর্যরশ্মি মানবদেহে পড়লে ত্বকের রং কৃষ্ণবর্ণ হয়—একথাটা মূলতঃ ঠিক নয়। তবে ব্যাপারটি বিপরীত দিক থেকেই সত্য। অর্থাৎ সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টায় জীবজগৎ তার দেহের বহিরাংশে বা ত্বকে বিভিন্ন ধরনের স্থায়ী আবরণ তৈরি করে নিয়েছে। মানুষের ত্বকের রং-ও এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক একটি স্থায়ী সর্বাঙ্গব্যাপী আবরণ বা আস্তরণ—যদিও তার দেহমধ্যস্থ কোষ ও কণাগুলি সূর্যকিরণের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। এই আস্তরণটি তৈরী মেলানিন নামে একপ্রকার পিগমেন্ট বা রঞ্জককণা দিয়ে। ত্বকের মধ্যেই মেলানোসাইট নামে এক ধরনের বিশিষ্ট কোষ থাকে—যারা এই রঞ্জককণা তৈরি করে। মাতৃগর্ভস্থ জীবনেই এই কাজের শুরু এবং সেই সময় থেকেই গাত্রবর্ণ স্থিরীকৃত। তখন তো সূর্যরশ্মির কোন প্রভাবই নেই। মনে রাখতে হবে যতদিন পর্যন্ত সূর্যরশ্মির ক্ষতিকর প্রক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্থির করতে

পারেনি ততদিন পর্যন্ত জীবজগতের অবস্থান ছিল মহাসমুদ্রের গভীর জলের আবরণের মধ্যেই। তারপরে আত্মরক্ষামূলক বিশেষ গাত্রাবরণ তৈরির কৌশল আয়ত্ত করেই তারা ধীরে ধীরে জলের বাইরে এসেছে। এই কার্যক্ষমতাটি তাই তাদের বংশগতির ধারার বংশাণুর মধ্যেই নিহিত। সেই বংশাণু বা জিন প্রভাবেই বিভিন্ন প্রজাতির বা একক সত্তার গাত্রবর্ণ গড়ে ওঠে। গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যকিরণ প্রখর ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষের ত্বকে সেই রংগীন আবরণটিতে মেলানিন কণার পরিমাণ বেশী হয় এবং তার রং-ও বেশী গাঢ় হয়ে কৃষ্ণবর্ণের হয়। কারণ কালো রং-ই সূর্যকিরণের অপক্রিয়া প্রতিহত করতে বেশি সক্ষম,—কালো ছাতা বা কালো পর্দাই যার সহজ উদাহরণ। একই কারণে শীতপ্রধান দেশে ত্বকে ঐ মেলানিন কণার পরিমাণ হয় কম এবং তার রং-ও তত গাঢ় নয়। তাই ওসব দেশের মানুষের চামড়া ফর্সা বা হাল্কা রং-এর হয়। উন্মুক্ত দেহে বেশী মাত্রায় প্রখর সূর্যকিরণ পড়লে ত্বকে মেলানিন কণার উৎপাদন মাত্রা সাময়িকভাবে বেড়ে যায়। তখন চামড়ার রং আরও একটু গাঢ় বা কালো হয়ে উঠে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিরণের প্রভাব চলে গেলে ত্বকে মেলানিনের উৎপাদন হার কমে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। দেহের রং পূর্বাবস্থা পায়।

শুভঙ্কর বর্মণ, একাদশ শ্রেণী, বসন্তিয়া হাইস্কুল, মেদিনীপুর

প্রশ্ন : সব জীবের গায়ের রং স্থির নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু বহুরূপী (chameleon) ও গিরগিটিরা কি করে অত তাড়াতাড়ি তাদের রং বদলায় ?

উত্তর : মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চামড়ার রং-এর মূলে রয়েছে মেলানিন নামে এক ধরনের রংগীন কণা। এই কণাগুলি তৈরি করে মেলানোসাইট নামে এক বিশেষ ধরনের কোষ যারা ত্বকের বাইরের স্তর—যাকে বলে এপিডার্মিস (epidermis)—ঠিক তার তলার দিকেই থাকে এবং আমৃত্যু প্রয়োজনমত মেলানিন কণা তৈরি করে চলে। ঐ রঞ্জক কণাগুলি প্রথমে ঐ কোষের মধ্যে মেলানোজোম নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ultramicroscopic অসংখ্য দানার (granules) মধ্যেই সঞ্চিত হয়। ঐ দানাগুলি প্রথমে থাকে বর্ণহীন, অতিসূক্ষ্ম সুতার মত জিনিষ। সেই দানা ও তার ভিতরের সুতাগুলির আকার আয়তন (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ) ও সামগ্রিক সংখ্যার উপরেই ঐ মেলানিনের রং-এর মাত্রা ও পর্যায় নির্ভর করে। এই কণাগুলি বিভিন্ন প্রাণী ও প্রজাতিতে কিছু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয় তাদের জিন-চরিত্র অনুযায়ী। আবার চর্মের মধ্যে তাদের বিন্যাসভঙ্গীও (distribution pattern) বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন ধরণের হয়। এই তারতম্য অনুসারেই বিভিন্ন প্রাণীদেহে রং-এর তারতম্য বা বৈচিত্র্য ঘটে। মেলানোসাইটের ভিতর থেকে কণাগুলি শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়ে চর্মের অন্যান্য কোষ ও কণার মধ্যে বিক্ষিপ্ত ও সংক্রান্ত হয়ে দেহে একটি স্থায়ী আবরণ তৈরি করে এবং তারই ফলে প্রাণীদের গায়ের একটা নির্দিষ্ট রং হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে বংশগতির ধারায় যেমন নির্দিষ্ট জিনের প্রভাব রয়েছে তেমনি অগ্র-পিটুইটারী (anterior pituitary) গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হর্মোন—সংক্ষেপে এম. এস. এইচ. (M.S.H.) নামে একটি হর্মোনেরও প্রভাব রয়েছে। বহুরূপী

বা গিরগিটিদের দেহে এই হর্মোনটির নিঃসরণ অতি আকস্মিকভাবে বাড়ে আর কমে, হঠাৎ বেশীমাত্রায় নিঃসৃত হয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার একেবারে কমে যেতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এরকম হয় না। এদের দেহে ঐ হর্মোনটি মোটামুটি স্থির নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে। তাছাড়া বহুরূপীদের মেলানোসাইট কোষেও অন্যান্য প্রাণীদের থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদের মেলানিন কণাগুলির বেশীর ভাগই ঐ জনক কোষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে বাইরে বিক্ষিপ্ত হয় না। মানুষ ও অন্যান্য জীবে তার বিপরীতই হয়। এখন ঐ এম. এস. এইচ. হর্মোনের প্রভাব বহুরূপীদের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। ঐ হর্মোনটি কমে গেলে মেলানোজোমগুলি মেলানোসাইট কোষের কেন্দ্রে নিউক্লিয়াসের পাশে গিয়ে জমা হয়। তখন বাইরে থেকে তাদের রংটা একেবারে হাল্কা দেখায়। আবার এম. এস. এইচ নিঃসরণ আরম্ভ হওয়া মাত্রই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মেলানোজোমগুলি কোষের কেন্দ্র থেকে বাইরের অর্থাৎ কোষ-প্রাকারের দিকে সরে আসতে থাকে। ঐ হর্মোনের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেলানিন কণাগুলি কোষ আবরণের গায়ে ঘন সন্নিবদ্ধ হয়ে জমা হয় যাতে তাদের রং একেবারে কালো দেখায়। এইভাবে ঐ হর্মোনের মাত্রা অনুসারে বহুরূপীর গায়ের রং একেবারে হাল্কা থেকে গভীর কালো পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তরিত হয় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। হর্মোনটি কমে গেলেই বিপরীত অবস্থা হয়। এইভাবেই বহুরূপী ও গিরগিটিরা সহজে রং বদলায়।

প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন গুণধর বর্মণ]

সমীরকুমার পর্বত, ধলডাঙা, বাগদলা, বাঁকুড়া

প্রশ্ন : (ক) যে কোন প্রাণী, পাখী বা প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ কোন তরলে না ডুবিয়ে কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

(খ) প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ কিভাবে সংরক্ষণ করলে দীর্ঘ দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।

(গ) বাজারে অনেক সময় বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক মাছ পাওয়া যায়, সেগুলি কি সরাসরি 10% ফরম্যালিনে ডুবিয়ে রাখলেই চলবে ?

(ঘ) কোন্ কোন্ প্রাণীর দেহে চুনঘটিত পদার্থ বিদ্যমান ?

(ঙ) কাচের জার কি বায়ুশূন্য রাখতে হবে ?

(চ) এই বিষয়ে তথ্যবহুল কোন পুস্তক বাজারে পাওয়া গেলে পুস্তক ও লেখকের নাম।

উত্তর : (ক) বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী প্রাণী ও পাখীদের কোন তরলে না ডুবিয়ে সংরক্ষণ করার সময় সাধারণতঃ taxidermy করা হয়। taxidermy পদ্ধতিটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ। বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের চামড়া শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে "skin preparation" করতে হয়, যার ফলে চামড়াটি নষ্ট হয়ে যায় না, বরং নরম থাকে। skin preparation করার সময় বিভিন্ন skin-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন preservative ব্যবহার করা হয়; যেমন পাখী বা ছোট স্তন্যপায়ী, যাদের

skin খুব thin বা "papery", তাদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত preservativeটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়।

chalk :	$1\frac{1}{2}$ lb
common curd soap :	$\frac{1}{2}$ lb
chloride of lime :	$\frac{1}{2}$ oz.
tincture of musk :	$\frac{1}{2}$ oz.

(এক pint জলে সাবান ও চক্‌কে একসাথে boil করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাবানটি জলে গলে না যায়। এরপর chloride of lime ধীরে ধীরে মেশাতে হবে এবং নাড়তে হবে। ঐ সময় যে গন্ধ বের হয় তা inhale করা উচিত নয়। ঠান্ডা হলে tincture of musk মেশাতে হয়।)

পাখী বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মাথাটি গলা থেকে কেটে নিয়ে চক্ষুগোলক (eyeball) এবং মস্তিষ্ক (brain) বের করে দেওয়া হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে মাথার চামড়াটি সাবধানে ছাড়িয়ে নিয়ে skullটি সামান্য caustic potash মিশ্রিত জলে ফুটিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এরপর প্রাণীটির শরীরের মাপ অনুযায়ী clay model-এর উপর অথবা কাঠের মডেলের উপর চামড়াটি লাগিয়ে দেওয়া হয়। প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গের দেহ "কাইটিন" দ্বারা আবৃত হওয়ার ঐ পতঙ্গরা মরে যাওয়ার পর অন্য প্রাণীদের মত পচে যায় না। তাই এদের কাচ লাগানো কাঠের বাক্সে (insect box) অথবা "সেলোফিন" কাগজ লাগানো পিচবোর্ডের বাক্সে insect pin" দ্বারা আটকে রাখা যায়। শুধু কিছু "antifungal agent" ব্যবহার করা হয়, যেমন napthalene powder এবং carbolic acid ও camphor 3 : 1 অনুপাতে মিশিয়ে তুলো দ্বারা ভিজিয়ে বাক্সের এক কোণে পিন দ্বারা আটকে রাখা হয়। তবে এই তুলো সাধারণতঃ প্রত্যেক বর্ষাকালের আগে পাল্টে দেওয়া উচিৎ। এই ভাবে সংরক্ষণ করলে এই জাতীয় পতঙ্গরা দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(খ) 1নং উত্তরের শেষ অংশ।

(গ) সামুদ্রিক মরামাছ সরাসরি 10% formalin-এ ডুবিয়ে রাখা চলে, তবে এদের পেটের অভ্যন্তরে কিছুটা করে 10% formalin hypodermic syringe দ্বারা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ভাল।

(ঘ) যেমন শামুক জাতীয় প্রাণী।

(ঙ) না রাখলেও চলে।

(চ) "A Hand Book For Zoological Collectors"
Edited by
Director, Zoological Survey of India,
34, Chittaranjan Avenue, Calcutta-12.

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন প্রণবকুমার মল্লিক]

পরিষদ-সংবাদ

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 29শে মার্চ, '80, শনিবার বৈকাল 5-00টায় 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' হলে একটি জনপ্রিয় স্লাইড বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল—'আফ্রিকার একটি আদিম জনগোষ্ঠীর সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। স্লাইড বক্তৃতা দেন—দীপক দাঁ, গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট। সভার প্রারম্ভে বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী/বিষয়ে বক্তৃতা দেন শ্রীমণি দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানটি বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমভাগে আপার ভোল্টা বর্তমানে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগেও এখানে রাজতন্ত্র চলে আসছিল। এই রাজ্যের একটি আদিম জনগোষ্ঠী মোবেলস (আদিবাসী)—যাদের মধ্যে আধুনিক সভ্যতার আলো মাত্র 35 বছর আগেও প্রজ্বলিত হয় নি, সেই জন গোষ্ঠীর সামাজিক—শিক্ষা—অর্থ নৈতিক—কৃষি প্রভৃতি উন্নতিতে UNESCO একটি বিশেষ নৃতাত্ত্বিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গত 30-35 বছর ধরে UNESCO এখানে একটি প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। আধুনিক বাড়ি তৈরী, হসপিটাল, রাস্তা, আধুনিক কৃষি, জলসেচ, স্কুল, প্রভৃতির মাধ্যমে এদের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। স্লাইড বক্তৃতায় এই উন্নতির ক্রমবিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক মডেল প্রতিযোগিতা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। হাতের কাছে অতি সাধারণ জিনিসপত্র দিয়ে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলির উপর তৈরী মডেল আহ্বান করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত সব মডেল ফেরৎ দেওয়া হবে। যোগদানের শেষ তারিখ 31শে মে, 1980। কোন প্রবেশ মূল্য নাই।

প্রথম পুরস্কার 100.00 টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার 75·00 টাকা
তৃতীয় পুরস্কার 50·00 টাকা

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55 0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিষদ বিজ্ঞপ্তি

অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (দ্বিতীয় বর্ষ)

বিষয় : "ভারতে গ্রামীণ শিল্প উদ্যোগ ও শক্তিসমস্যা"

প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ—15ই জুলাই (1980)

পুরস্কার : 1ম পুরস্কার—150·00 টাকা, 2য় পুরস্কার—100·00 টাকা

বিঃ দ্রঃ (ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, (খ) প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখে পাঠাতে হবে, (গ) যোগদানকারীদের বয়স ঐ তারিখের মধ্যে অনধিক একুশ বছর হতে হবে। প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা—কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006, (ঙ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং প্রবন্ধগুলি প্রয়োজনবোধে পরিষদ কর্তৃক প্রকাশের অধিকার থাকবে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিভাষা প্রণয়ন ও সঙ্কলন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নে ও সঙ্কলনে উদ্যোগী হয়েছে। পরিভাষা সংক্রান্ত ইংরেজি শব্দ এবং পরিভাষা সংগ্রহ পরিষদ কার্যালয়ে (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006, ফোন 55-0660) 30শে জুনের (1980) মধ্যে পাঠিয়ে এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জনপ্রিয় বক্তৃতা

বিষয় : সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক অভিযান

বক্তা : মণি দাশগুপ্ত

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006)

সময় : বৈকাল 5-30 মিনিট

তারিখ : 20শে জুন, 1980, শুক্রবার

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। বিগত বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 5, মে, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" শারদীয় সংখ্যায় (1980) প্রকাশের জন্ত লেখক / লেখিকাদের বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জক প্রবন্ধ পাঠাবার জন্ত অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রবন্ধ "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার অনধিক চারপৃষ্ঠা (ছবিসহ) হওয়া বাঞ্ছনীয়। 1980 সালের 31শে জুলাইয়ের মধ্যে সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পি-23. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন 55-0660) এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাতে হবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়ত্রিংশত্তম বর্ষ | মে, 1980 | পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান

সুকুমার গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের তথা সারা ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটা বিশিষ্ট ও ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সেই জন্যেই সমস্ত রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে এখন রাষ্ট্রীয় সাহায্য দিয়ে এ বিষয়ে শিক্ষণ, গবেষণা, হাসপাতালের ব্যবস্থা, শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হোমিও ডাক্তার নিয়োগ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়াসও চলছে। এতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে এদেশের চিন্তাবিদ্‌-মহলে হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে সাধারণভাবে স্বীকৃত। হোমিওপ্যাথির জনক মহামতি ডঃ হ্যানিম্যান (1755-1843) ছিলেন সে যুগের উন্নত বিজ্ঞান-সম্মত এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ চিকিৎসক। কিন্তু তাঁর অপার-অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী-মন প্রচলিত চিকিৎসা-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থেকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আরও উন্নতিকল্পেই এই নবতর বা উন্নততর পদ্ধতি প্রচলনে প্রয়াসী হন। আমাদের দেশেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচলনের পিছনে আছেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মত বিশিষ্ট বিজ্ঞান সাধক,— যিনি ভারত-বর্ষে সাধারণ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলনে এবং এদেশে ব্যাপক বিজ্ঞান গবেষণা প্রসারে অন্যতম মহান পথিকৃৎ। আর আদিতে তিনিও এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। এ ছাড়া আমরা জানি বিদ্যাসাগরের মত কালজয়ী সুপণ্ডিত সে সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় শুধু অনুরক্ত ছিলেন না, শেষ জীবনে নিজ সাধনায় এই চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করে নিজেই ডাক্তার হিসাবে

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এই হোমিওপ্যাথির অশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব মন্তব্য—"এলোপ্যাথিতে যত ঔষধ যে পরিমাণে শরীরে ঢোকান হয় তার কোন প্রয়োজন নেই। শরীর সে সব গ্রহণ করে না,—করতে পারে না। এই দেখনা ক্যালসিয়াম। এলোপ্যাথিতে যে রকমভাবে ক্যালসিয়াম খাওয়ানো হয়—এই এতখানি করে—তার কিছুই শরীরে assimilated হয় না। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোষ। তার গ্রহণ বর্জন সবই সূক্ষ্ম, একগাদা করে ঔষধ খেলেই কি কাজ হয়? শরীর তা ফিরিয়ে দেয়।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ—মৈত্রেয়ী দেবী) রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের মধ্যেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তাধারা রয়েছে।

ডাঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের প্রবর্তিত চিকিৎসা পদ্ধতির (হোমিওপ্যাথি) মূল বৈশিষ্ট্য 'সদৃশবিধান' মতে চিকিৎসা (law of similars)। তিনি দেখেন,—সুস্থ শরীরে সিঙ্কোনা ছাল সেবন করলে কম্পজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আবার সিঙ্কোনা-ছালই এই কম্পজ্বরের প্রধান ঔষধ। এইভাবে বেলেডোনা প্রভৃতি তৎকালীন এলোপ্যাথিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শক্তিশালী ঔষধ নিজ শরীরে এবং অনুগত ছাত্র ও সুস্থ বন্ধুবান্ধবদের শরীরে প্রয়োগ করে তার লক্ষণাবলী পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে বিভিন্ন রোগে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয়, সুস্থ শরীরে সেই ঔষধ কিছু বেশী মাত্রায় (toxic dose)-এ ব্যবহার করলে সেই সেই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বহু পরীক্ষা করে তিনি দেখেন যে প্রতিটি শক্তিশালী ঔষধ সুস্থ মানবদেহে একপ্রকারের রোগ সৃষ্টি করে। ঔষধ যত শক্তিশালী হয় তার রোগ লক্ষণও তত বেশী প্রকট হয়। আবার সেই একই ঔষধই অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করে সেই সব রোগ-লক্ষণ প্রশমিত করা যায়। পরীক্ষিত ঔষধগুলি যত কম মাত্রায় দেওয়া হয় তার ক্রিয়া কিছু ধীরে হলেও ফল অনেক ভাল দেখা যায় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। এর থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে যে-ঔষধ নীরোগ দেহে যে-রোগের লক্ষণ প্রকা করে সেই ঔষধ দিয়েই ঐ রোগের আরোগ্য হওয়া উচিৎ। এই মতবাদই সদৃশবিধানমতে চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথি। তিনি ঘোষণা করেন যে জীবনীশক্তির অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনে রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় সুতরাং অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় ভেষজশক্তি প্রয়োগ করে সেই রোগ আরোগ্য করা যায়। রোগ নিরাময়ে অতি সূক্ষ্মমাত্রায় ঔষধ ব্যবহার পদ্ধতিই ডঃ হ্যানিম্যানের প্রধান ও বিশিষ্ট অবদান। তবে মানুষের দেহের সঙ্গে তার মানসিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই সব কথা মনে রেখে চিকিৎসকের কর্তব্য রোগীর চিকিৎসা করা, রোগের নয়। সুতরাং একই ঔষধে বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন রোগীর একই ফল হতে পারে না। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরতম জ্ঞান যেমন দরকার তেমনি তার মানসিক ও পরিবেশগত অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে চিকিৎসককে যথেষ্ট সচেতন হতে হবে। রোগীর চরিত্রগত লক্ষণ ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকলে এই চিকিৎসা ফলবতী হতে পারে না। জটিল রোগগুলিতে বহু পুরাতন বিষক্রিয়া মানব দেহে দীর্ঘস্থায়ীভাবে অতি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করে, তার শরীর ও মনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। ঐ বিষয়ে যথার্থ অনুসন্ধান ও গভীর জ্ঞান ব্যতীত তার চিকিৎসা বা নিরাময় সম্ভবই নয়।

প্রায় দু'শত বছর আগে ডঃ হ্যানিম্যান যে উন্নততর চিকিৎসার পরিকল্পনা ও প্রবর্তন করেন সেই চিকিৎসা পদ্ধতির উপর পরবর্তীকালে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় নি। অথচ এই দুটি শতাব্দীতেই পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান ভাণ্ডারের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলেছে। চিকিৎসা শাস্ত্র আজ আর কোন মতে একটি বিচ্ছিন্ন পৃথক বিজ্ঞান শাখা নয়। বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখার সংযোগ, সহযোগিতা ও অগ্রগমনের সঙ্গে চিকিৎসা-

বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই পথে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসকগণ ও হোমিও চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ কতখানি আন্তরিকভাবে সক্রিয়—সেইটাই আজকের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যে এলোপ্যাথি থেকেই হোমিওপ্যাথির জন্ম, সেই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা (এলোপ্যাথি) পদ্ধতির সঙ্গে হোমিওপ্যাথির যেন একটা স্থায়ী অন্তর্বৈরী ভাব বিদ্যমান। কিন্তু কেন? উভয় পদ্ধতিতেই যেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বা রোগে অত্যাশ্চর্য ফল দেখা যায়; তেমনি উভয় পদ্ধতিতেই যথেষ্ট ব্যর্থতা বা ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সীমারেখা রয়েছে। কোথায় সেই সীমারেখা? কেন সেই বিফলতা? এসবের অনুসন্ধান ও গবেষণার কাজ আজও তো কোথাও হচ্ছে না। ধরা যাক অ্যান্টিবায়োটিকের (anti-biotic) কথা। এলোপ্যাথি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অ্যান্টিবায়োটিক্‌স্—একেবারে বিপ্লব আনিয়ে দিয়েছে। অথচ হোমিও-প্যাথিতে তার কোন জ্ঞানই নেই, কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষাই হয় নি। যদি "Similia Similibus Curantur"—এ বিশ্বাস করা যায় তবে টেরামাইসিনের বা ক্লোরোমাইসিটিনের বিষক্রিয়ায় যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সব লক্ষণে হোমিও-প্যাথি মতে ঐসব ঔষধ দিয়েই কি চিকিৎসা সম্ভব? তা যদি হতো তবে তো চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হোমিও-প্যাথির জয়যাত্রা শীর্ষস্থানেই পৌছত। এলোপ্যাথি হয়তো আবার পিছিয়ে পড়ত। অন্ততঃ কেউ কারও প্রতি উন্নাসিকতা দেখাতে পারতো না। অধিকন্তু একে অপরের সহযোগী ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে চলত। তা কেন হলো না বা হচ্ছে না? ঠিক তেমনি ভিটামিন ও অন্যান্য কেমোথেরাপির (Chemotherapy) ক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথির কোন প্রয়োগ-বিধি নেই। কারণ এসব হ্যানিম্যানের সময় ছিল না। তাই এ নিয়ে তিনি কোন কাজ করে যেতে পারেন নি। ফলে এগুলি আর হোমিওপ্যাথির অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পরবর্তীকালে যোগ্য কোন হোমিওপ্যাথ এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামাচ্ছেন না। জীবদেহের প্রতিটি কোষের এবং শারীরবৃত্তীয় অত্যাবশ্যক নিত্যকর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন ভিটামিন একান্তই অপরিহার্য। এবং অন্যান্য ঔষধের তুলনায় এলোপ্যাথিতেও ভিটামিনের প্রয়োগ হয় সাধারণ ভাবে সূক্ষ্মমাত্রায়। হোমিওপ্যাথিতে সেই ভিটামিনের প্রয়োগবিধি শুধু নাই নয়, হোমিওপ্যাথি ঔষধ সেবন-কালে কোন ভিটামিন খাওয়া চলবে না বলেই গোঁড়া হোমিওপ্যাথদের অভিমত। তাহলে আমাদের দৈনন্দিন সাধারণ খাদ্যের মধ্যে যেসব ভিটামিন (প্রায় সব ভিটামিনই) স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যমান তার সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না কেন? তাছাড়া শুধুমাত্র কোন ভিটামিনের অভাবে বা আধিক্যহেতু যে রোগের প্রকোপ ঘটে হোমিওপ্যাথিতে সে সব রোগের নিরাময় কী করে সম্ভব? এসব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথগণ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা থেকে নিশ্চিতভাবেই পিছিয়ে রয়েছেন।

আবার যে কোন ঔষধের (বা বস্তুর) গুণাগুণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে বা বিভিন্ন পরিবেশে তার কার্য ক্ষমতা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কিছু জানতে বা বলতে হলে রসায়নশাস্ত্রের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। রসায়নশাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞান ও তার অনুমোদিত নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তু বা ঔষধের গুণ ও ধর্ম সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য বা সত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন হতে পারে না। হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রস্তুতিতে, তার মান নির্ণয়ে, জীবদেহে সেই ঔষধের গতিবিধি ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এই রসায়ন বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও মতামত কোথায় কিভাবে কতখানি কাজ করছে বা করতে পারে—তার চেষ্টা কোথাও আছে কি? হোমিওপ্যাথি ঔষধের বিশুদ্ধতা নিরূপণে তাই "ড্রাগ কন্ট্রোল" আইনেরও কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে একে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা কি করে বলব?

গরীব দেশে সস্তায় চিকিৎসার বিকল্প উপায় হিসাবে সরকার এখন হোমিওপ্যাথি প্রচলনে সচেষ্ট। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রকৃত

বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের তথা রাষ্ট্রনেতাগণের কতখানি আন্তরিক আগ্রহ এবং সে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞানভিত্তিক কোন চিন্তাধারা কাজ করছে কি? দেশ পরিচালনে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসন ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান ও মনের অধিকারী না হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান হিসাবে হোমিওপ্যাথিকে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী আওতায় আনা বা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের চেষ্টা অভাবক্লিষ্ট অসহায় বৃহত্তর জনগণকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে শান্ত রেখে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

এদেশের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষাপদ্ধতির সর্বত্রই যথার্থ বিজ্ঞান মানসিকতার একান্তই অভাব। তারই পূর্ণ প্রতিফলন অতি স্বাভাবিক ভাবেই হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রেও, তবু মানুষের জীবন নিয়ে প্রত্যক্ষভাবেই যেখানে কাজ সেই হোমিওপ্যাথির শিক্ষা ব্যবস্থা, গবেষণা ও চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে বিজ্ঞানের সামগ্রিক প্রয়োগ ও তার উপযোগী মানসিকতা তৈরি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। হোমিওপ্যাথি নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন বা চিন্তা করছেন তাঁদের আজ সামগ্রিক বিজ্ঞান জগতের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত হতে হবে। নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়াও বৃহত্তর ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা ও বিজ্ঞান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিকে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হবে। চেষ্টা করলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতেও পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম*

মেঘনাদ সাহা

[প্রসঙ্গকথা ঃ মেঘনাদ সাহা একজন প্রথিতযশা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী মাত্র নন, সমাজ সচেতনতা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রসারে তাঁর দৃঢ় মনোভাব অনেক রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন শিক্ষিতদের যথেষ্ট বিব্রত ও বিপর্যস্তও করেছিল। দামোদর নদী-পরিকল্পনা, মাথাপিছু জাতীয় আয় নির্ধারণ, জাতীয় অর্থনীতি পরিকল্পনা, ক্যালেণ্ডার সংশোধন, তাত্ত্বিক ও ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরাজী ও বাংলায় বহু প্রবন্ধ লিখেছেন—বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে।

একদা 'সব ব্যাদে আছে'—এই তির্যক ব্যঙ্গোক্তিমূলক প্রবন্ধ হিন্দু রক্ষণশীল শিক্ষিতদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। তার প্রতিবাদে তিনি এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়। নতুন চিন্তা ও মানসিকতার প্রসারে তাঁর সাহসী প্রত্যয়শীল মন বাঙলা নবজাগরণের শেষ অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করেছে।]

"সবই ব্যাদে আছে।"

অনেক পাঠক আমি আমার প্রথম প্রবন্ধে "সবই ব্যাদে আছে" এইরূপ লিখায় একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি 'বেদের' প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। এই বাক্যটির প্রয়োগ সম্বন্ধে একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। প্রায় 18 বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহর নিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহ ভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা, যাহা Theory of Ionisation of Elements দিয়া সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই এক মিনিট পরপরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই ব্যাদে আছে।" আমি দুই একবার

* 'ভারতবর্ষ', ফাল্গুন, 1346-27 বর্ষ—2য় খণ্ড, 3য় সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, "মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন্ অংশে আছে, অনুগ্রহপূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "আমি ত কখনও 'ব্যাদ' পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবী কর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে।" অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্য দেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহাদির গতি, রসায়নবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিন শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচার শক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্ট ভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছে? কিন্তু এই সমস্ত "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে একথা বলেন নাই। তিনি কোথায়ও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোন হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কেপ্‌লার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয়, দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।

এই শ্রেণীর লোক যে এখনও বিরল নয় তাহার প্রমাণ সমালোচক অনিলবরণ রায়। তিনিও সবই ব্যাদে আছে এই পর্যায়ভুক্ত, তবে সম্ভবত তিনি 'বেদ' মূলে না হউক, অনুবাদ পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সবই বেদে আছে এইরূপ অপজ্ঞান আরও জোর গলায় প্রচার করা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি "সবই ব্যাদে আছে" এই উক্তিতে বেদের প্রতি কোনও রূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করি নাই। অনিলবরণ রায় মহাশয়ের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি মাত্র।

বেদে কি আছে?

এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ—আঠার বৎসর পূর্বে আমার বেদ পড়া ছিল না। বলা বাহুল্য, বেদ বলিতে এস্থানে আমি ঋগ্বেদ-ই বুঝিয়াছি। পরে ইংরাজী ও বাঙ্গলা অনুবাদে ঋগ্বেদ সংহিতা পড়িয়াছি, কারণ মূল বৈদিক সংস্কৃতে পড়ার সাধ্য নাই, সমালোচক অনিলবরণ রায়ও বোধ হয় মূল 'বৈদিক সংস্কৃতে' বেদ পড়েন নাই, আর মূলে পড়িলেও তাহা বিশেষ কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঋগ্বেদ পাণিনির সময়েই (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা পঞ্চম শতাব্দীতে) দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সায়নাচার্য খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উহার অর্থ বুঝিতে প্রয়াস পান (সায়ন-ভাষ্য)। কিন্তু প্রধানত য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণই সম্পূর্ণ বেদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন এবং বিবিধ উপায়ে উহার দুর্বোধ্য অংশ সমূহের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সত্ত্বেও অধিকাংশ স্থলে অর্থ সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহার কারণ অনেক—একটি প্রধান কারণ এই যে, বেদের বিভিন্ন অংশ অতি প্রাচীন কালে রচিত হয় এবং যে সময়ে যে

দেশে অথবা যে সমস্ত অবস্থার মধ্যে যে শ্রেণীর লোক দিয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে লোকে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞানের back ground না থাকিলে প্রকৃত অর্থবোধ হওয়া দুঃসাধ্য এবং পরবর্তী দিগকে কষ্ট কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। প্রথম জানা দরকার, 'বেদ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল?' বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বাল গঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ইত্যাদি দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের' সময় নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি বর্তমান লেখকের সমালোচকগণ, যাঁহারা এককালে গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর বিস্তার না করিয়া এই সমস্ত প্রবন্ধ পড়িলে নিজেদের মানসিক জড়তা (mental inertia) দূর করিতে পারিবেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটিকেই খৃষ্টীয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খৃঃ পূঃ 2500 অব্দ হইতে 800 অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতিমাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খৃঃ 505 অব্দে 1939 অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকাকারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত 1434 বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতি মাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খৃঃ অব্দের 2500 বৎসর পূর্বে ফেলিতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণেরও বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা যাহা 17, 28,000 বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের 21,65, 0'40 বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খৃঃ পূঃ 2500 অব্দে পৃথিবীতে নানা স্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খৃঃ পূঃ 4200 অব্দে পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খৃঃ পূঃ 2700 অব্দে মিশরে পিরামিড ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ 2600 অব্দে ইরাক দেশে সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভবত খৃঃ পূঃ 1900 অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ বেবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খৃঃ পূঃ 2500 অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, 'বৈদিক সভ্যতা' এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোন আদান প্রদান ছিল কি না? — বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 1450 খৃঃ পূঃ অব্দের মিটানীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজগণ আধুনিক মোসাল্ (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিশরীও ও বাবিলোনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদি প্রাচীন মিটানীয়গণ, ইরানিয়ান অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক

আর্যগণ—সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবতকাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব লিপি ছিল বলিয়া কোনও অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তীকালের তুর্কীদের বা মধ্যএশিয়াবাসীদের মত তাঁহারা যখন যে দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এখিমিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দরায়াবুস) ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ 500 খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহাদের অনুশাসন পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন বেবিলোন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষে বিশেষত সীরিয়া দেশ প্রচলিত Aramaic লিপি। 1450 খৃ: পূঃ অব্দে মিটানীয়গণ তাহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, নাসত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও বেবিলোন প্রচলিত কীলক (cuneform) লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ 500 খৃঃ পূঃ অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 250 খৃঃ পূঃ অব্দের অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়ত এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজস্ব কোন লিপি (script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্জন করিয়াছে? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবীলিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হুন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীনলিপি, পারস্যে ফারসীলিপি এবং রুশিয়াতে cyrillic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাহাদের নিজেদের কোন লিপি ছিল না।

সুতরাং আশা করি সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খৃঃ পূঃ 2500 অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ইজিপট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদাদির উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশে প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতার সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোন উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক, যাহাদের কোনও রূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়—যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ বেবিলোন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে অথর্ববেদ 1500—1600 খৃঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও বেবিলোনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।

ঋগ্বেদ নানা পরিবারস্থ বা গোত্রভুক্ত ঋষিগণ

কর্তৃক সূর্য বা সবিতা, চন্দ্র বা সোম ইত্যাদি প্রাকৃতিক দেবতা এবং ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীর সমষ্টি মাত্র। অনেকের মতে মিত্র, বরুণ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতাও সূর্যেরই প্রতীক মাত্র। কিন্তু গ্রহ নক্ষত্রাদি ও প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের স্তবস্তুতি করা বৈদিক আর্যদের মৌলিক আবিষ্কার বা একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল না। বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতাতে এবং প্রায়শ সর্বত্রই প্রাচীন সভ্যতার স্তরবিশেষে সর্বজাতির মধ্যে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়গণ সূর্য বা 'রা' দেবতাকে প্রধান দেবতা ও সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিতেন। Sirius তারকা বা লুব্ধক নক্ষত্র, যাহা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শ্রেষ্ঠস্থানীয়, তাহাকে তাঁহারা তাহাদের Isis দেবীর প্রতীক মনে করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয়গণের অধিকাংশ দেবতাই ছিল গ্রহনক্ষত্রাদিমূলক। যেমন—

An or Anu আকাশ বা দ্যৌ ; Shamash বা Babbar—সূর্য, ন্যায় ও আইনের দেবতার ; Sin বা Nannar-চন্দ্র ; Istar-সৌন্দর্যের ও প্রেমের দেবী, Venus বা শুক্র গ্রহকে ইহার প্রতীক মনে করা হইত ; Marduk দেবতাদের রাজা, ইনি ছিলেন বৃহস্পতি বা Jupiter গ্রহ ; Nabu দেবতাদের লেখক, ইনি আমাদের Saturn বা শনিগ্রহ ; Nergal যুদ্ধের দেবতা, আমাদের Mars বা মঙ্গলগ্রহ। এই সমস্ত দেবতা এবং অন্যান্য সমুদ্র, নদী বা পর্বতাত্মক দেবতাদি সম্বন্ধে প্রাচীন সুমেরীয় কবি বা ঋষিগণ যে সমস্ত স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ বর্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং British Museum-এর সুমেরীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ডক্টর গ্যাড্ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইজিপ্টীয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রাবলীও Egyptian Book of the Dead নামক গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক ব্রেস্টেড্ তাঁহার Dawn of conscience in the world এই গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বাইবেলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার বাণীকে যীশুখৃষ্টের মুখনিঃসৃত বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহার অধিকাংশই তাবত নয়, এমনকি, অক্ষরও প্রাচীন ব্যাবিলোনীয় ও মিশরীয় শাস্ত্রাদি হইতে ধার করা। অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষে 4000 পূঃ-খৃঃ অব্দ হইতে 600 খৃঃ-পূঃ অব্দ পর্যন্ত দুইটি সুপ্রাচীন সভ্যজাতি তাঁহাদের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সমস্ত আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব (Altruistic Philosophy) আবিষ্কার করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাহাই খৃষ্টীয় ধর্মের 'আধ্যাত্মিকতা'র ভিত্তি গঠন করিয়াছে। কিন্তু খৃষ্টধর্মে এবং আরও অপরাপর ধর্মে গ্রহনক্ষত্র ও নদীপর্বতাত্মক 'দেবতা সমূহ' নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি গঠনের জন্য বহু দেবতার উপাসনার কোন প্রয়োজন নাই।

বেদ ও বেদ-পরবর্তী শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিলেও একবিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মহেঞ্জোদারোর সময় (খৃঃ-পূঃ 2500 অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খৃঃ-পূঃ 300 অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূল সূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়। বৈদিক সভ্যতা ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার দুইটি বা তিনটি বিভিন্ন ধারার সঙ্গমের ফলেই ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সভ্যতা গঠিত হয়, পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ 300 অব্দের পরবর্তীকালের) লিখিত মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ ইত্যাদিতে এই 2200 বৎসরের ঘটনাবলীর অস্পষ্ট শ্রুতিমাত্র পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন নিশ্চয়ই ঘটা করিয়া যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ওঠে। উপনিষদে এই সন্দিগ্ধ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় ; উপনিষদের 'আধ্যাত্মিকতা' ব্রহ্মবাদের উপর

প্রতিষ্ঠিত, উহাতে বৈদিক দেবতাদি পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈনগণ 'বেদকে' সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের ধর্মমত গঠন করেন। কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্র বা দর্শন খাঁটি সনাতনী বলিয়া প্রচলিত, মূলত তাহাদের অনেকাংশই বেদ বিরোধী। যেমন ধরা যাউক সাংখ্যদর্শন; ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন "বেদের অবজ্ঞা সাংখ্যে কোথাও নাই, বরং বৈদিকতার আড়ম্বর অনেক, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচনকার বেদের দোহাই দিয়া শেষে বেদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন।"

বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ হিন্দুশাস্ত্রের সমস্ত মত বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধের পঞ্চম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত 'মত' অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেদ "অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত" এই মত অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে অর্থাৎ পুরাণাদি রচনার সময় প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট মত প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন মতই বেদকে 'অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত' প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে নাই।

একটা কথা উঠিতে পারে, বেদের এতটা প্রতিপত্তির কারণ কি? যাঁহারা বেদমতবিরোধী তাঁহারাও বেদের দোহাই দেন কেন? একথার উত্তর আর একটি ধর্ম হইতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইতেছে ইসলাম ধর্ম—যাহা কোরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। হজরত মোহম্মদ 'ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ' শুনিয়া যাহা বলিয়া যাইতেন তাঁহার শিষ্যগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিতেন, এই সংগ্রহই হইল কোরাণ! কিন্তু হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর কুড়ি বৎসরের মধ্যেই নানা কারণে বিশাল ইসলাম জগতের বিভিন্ন অংশে কোরাণের নানারূপ পাঠ ও অনুলিপি প্রচলিত হয়। তখন খলিফা বা ইসলাম জগতের অধিনায়ক ছিলেন ওসমান। খলিফা ওসমান দেখিলেন যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের কোরাণের প্রচলন হইতে থাকিলে শীঘ্রই ইসলামধর্মে অনৈক্য দেখা দিবে, ইসলাম-জগৎ শতধা বিভক্ত হইবে। ইহার প্রতিকার-কল্পে তিনি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎকালে হজরত মোহম্মদের যে সমস্ত শিষ্য ও কর্মসঙ্গী জীবিত ছিলেন তাঁহাদিগের একটি বৃহতী সভা আহ্বান করিলেন এবং বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কোরাণের রচনাবলী বাস্তবিকই হজরতের মুখনিঃসৃত কি-না তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বহু দিন এইরূপ পরীক্ষার পর যে সমস্ত রচনা প্রকৃতপক্ষে হজরতের মুখনিঃসৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'কোরাণের' পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করিলেন এবং নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন যে, যদি ভবিষ্যতে কোরাণের কোনও অনুলিপিতে কিছুমাত্র ভুল থাকে, তাহা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে—এই কড়া নিয়মের জন্য বিগত চতুর্দশ শতাব্দী ধরিয়া বিশাল ইসলাম-জগতের কোথাও কোরাণের পাঠ পরিবর্তন সম্ভবপর হয় নাই। ইসলাম-জগতে সর্বত্রই কোরাণ এক!

কিন্তু এইরূপ কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইসলামধর্মে নানারূপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অধ্যাপক তারাচাঁদের মতে বর্তমানে ইসলামে 72টি বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সকল সম্প্রদায়ই বাহ্যত কোরাণকে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় (অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের মুখনিঃসৃত ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস আচার ব্যবহার অনেক সময় আকাশপাতাল তফাৎ, গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণ-সঙ্গত নয়। এই সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোরতর যুক্তিবাদী মোতাজীল সম্প্রদায় হইতে (যাঁহারা বাস্তবিকপক্ষে সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল্ প্রভৃতি প্রাচীন যুক্তিবাদী গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদে বিশ্বাসবান ছিলেন) আগাখানী সম্প্রদায় পর্যন্ত (যাঁহারা অবতার ও জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি ভারতবর্ষীয় মতে বিশ্বাসবান) সমস্ত পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীই আছেন।

তাহার কারণ, ইসলামধর্ম অতি অল্পকাল মধ্যেই সীরিয়া, পারস্য, ইরাক, মধ্যএশিয়া ইত্যাদি নানা দেশে প্রচারিত হয় এবং এই সমস্ত দেশের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেও বাস্তবিক স্বদেশ-প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই। অনেক স্থলে প্রাচীন গ্রীক ও ভারতীয় ধর্মদর্শন অনুরক্ত পণ্ডিতগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেও ইসলামীয় ধর্মমতে শ্রদ্ধাবান হইতে পারেন নাই। কিন্তু রাজশক্তি ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কথা বলিবার মত সাহসও তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং বাহ্যত কোরাণের দোহাই দিয়া, তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে গোঁড়া মুসলমানদের মতে কোরাণ বিরুদ্ধ ধর্মমত পোষণ করেন।

'বেদের অভ্রান্ততার' সম্বন্ধেও এই বক্তব্য চলে বৈদিক আর্যগণ যখন 2500 খৃঃ পূঃ অব্দের কিছু পূর্বে বা পরে উত্তর ভারতের সর্বত্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন, তখন তাহাদের নেতা পুরোহিত (ঋষি) ও রাজগণ খুব আড়ম্বর করিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে তাঁহারা তাঁহাদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে স্তোত্র গান করিতেন এবং পশু বলি প্রদান করিতেন। পাণিনির পূর্বেই এই সমস্ত স্তোত্রাদি সংকলিত, গণিত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। কিন্তু উপনিষদের যুগ হইতেই চিন্তাশীল ঋষিগণ বৈদিক যাগযজ্ঞের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে থাকেন। এদিকে প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতায় যে সমস্ত লোকের ধর্মবিশ্বাস ছিল (সম্ভবত পাশুপতধর্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম) তাহাও ক্রমে অন্যপ্রকারে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে চেষ্টা করিতে থাকে। দেশের রাজশক্তি ও পুরোহিত শক্তি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রগাঢ় বিশ্বাসবান, সুতরাং তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচার করার সাহস প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসীদের ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের বেদের অস্পষ্ট সূক্তাদির দোহাই দিয়া নিজেদের ধর্মমতাদির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য প্রাগ্বৈদিক 'শিবপশুপতি' বেদের অমঙ্গলের দেবতা রুদ্রের সহিত এক হইয়া গেলেন এবং 'বেদের' সৌরদেবতা বিষ্ণুর সহিত নারায়ণীয় ধর্মের নারায়ণের একত্ব সম্পাদনের প্রয়াস হইল। পাশুপত ও নারায়ণীয় মতাবলম্বীগণ এইরূপে বেদের দোহাই দিয়া অবৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা ধর্মবিশ্বাস 'জাতে' উঠাইয়া লইলেন, যদিও অনেক স্থলে গোঁড়া বেদবিশ্বাসীগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু জৈন বা বৌদ্ধেরা ঐ পথে মোটেই গেলেন না, তাঁহারা সরাসরিভাবে বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে নিরর্থক বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

বর্তমান লেখক বৈজ্ঞানিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুর বেদ ও অপরাপর ধর্মের মূল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে অবজ্ঞা বা অবহেলার কোন কথা উঠিতে পারে না। তাহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহ যে সমস্ত জাগতিক তথ্য (world-phenomena), ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিরূপে 'বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।

[রচনাটি সংগ্রহে এবং 'প্রসঙ্গ কথা'টি লিখে সাহায্য করেছেন গোবরডাঙা রেনেশাঁস ইনস্টিটিউট (পোঃ- খাঁটুরা, 24 পরগণা)-এর রেখা দাঁ।]

আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সোম*

[বর্তমান প্রবন্ধে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের প্রকৃতি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, উৎপন্ন করার উপায় এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।]

আমরা জানি যে বস্তুর কম্পনই হল শব্দের উৎস অর্থাৎ বস্তুকে কোন রকম ভাবে আঘাত কিংবা উত্তেজিত করলে বস্তুটির যান্ত্রিক কম্পন (mechanical vibration) শুরু হয়। সেই কম্পন চারপাশে অবস্থিত মাধ্যমে (যদি মাধ্যমটি স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন বস্তু হয়) একটি আন্দোলন (disturbance) সৃষ্টি করে। আন্দোলন তখন তরঙ্গাকারে মাধ্যমের মধ্যে বিস্তারলাভ করার চেষ্টা করে।

শব্দতরঙ্গের কম্পন সংখ্যা 20 হার্জ (Hertz) থেকে 20,000 হার্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মানুষ সেই সব শব্দ শুনতে পায়। (হার্জ হল কম্পন সংখ্যার একক। বৈজ্ঞানিক হাইন্‌রিখ হার্জের [Heinrich Hertz] নামানুসারে রাখা হয়েছে। কোন বস্তু প্রতি সেকেণ্ডে 20 বার পূর্ণ সংখ্যায় যদি কম্পিত হয় তবে বস্তুর কম্পনসংখ্যা হবে 20 হার্জ)। শ্রাব্যতার উচ্চতার সীমা (audibility limit) অবশ্য সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান নয়। বয়স বাড়তে থাকলে এই সীমা কমতে থাকে। 20,000 হার্জের চেয়ে বেশী কম্পন সংখ্যাবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গকে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ (ultrasonic wave) নামে অভিহিত করা হয়। 2×10^4 হার্জ থেকে 10^{10} হার্জ কম্পন সংখ্যার মধ্যেই আলট্রাসোনিক তরঙ্গের সীমা।

শ্রাব্যতার উচ্চতার সীমা বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। কুকুর অনেক বেশী কম্পন সংখ্যা যুক্ত শব্দ তরঙ্গের প্রতি সংবেদনশীল। আলট্রাসোনিক হুইসিল্ (ultrasonic whistle) থেকে আগত 'শব্দ' নিঃশব্দভাবে শিকারী কুকুরকে সংকেত দেয় এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। বহু পাখি আছে যাদের শ্রবণ যন্ত্র 25,000 হার্জের আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাশিয়ায় সীগ্যাল (sea-gull) নামক পাখীকে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের দ্বারা ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে পানীয় জলের বড় বড় আধারগুলিকে নষ্ট না করে ফেলে। বাদুড়ের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল। তবুও তারা অনায়াসে রাতের বেলায় পথ চিনে নেয় এবং শিকার ধরে। বৈজ্ঞানিকেরা বাদুড়ের দ্বারা আল্ট্রা-

*মেট্রিরিয়্যাল ডিভিসন, আলট্রাসোনিক সেকশন, ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি, হিলসাইড রোড, নিউ দিল্লী-12

সোনিক তরঙ্গের সৃষ্টি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে নানা কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। মুখ দিয়ে বাদুড় 20,000 থেকে 50,000 হার্জ পর্যন্ত আলট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং প্রতি সেকেণ্ডে 5 বার থেকে 60 বার পর্যন্ত আলট্রাসোনিক তরঙ্গ-পুঞ্জ বা আলট্রাসোনিক পাল্স্ (ultrasonic pulse) বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, সেই পাল্স্ যদি কোন বস্তু দ্বারা বাধা পায়, তাহলে প্রতিফলিত হয়ে বাদুড়ের কাছে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলট্রাসোনিক তরঙ্গপুঞ্জকে বিশ্লেষণ করে বাদুড় বস্তুটির প্রকৃতি, অবস্থান এবং দূরত্ব সহজেই নির্ণয় করতে পারে।

শ্রাব্য শব্দ এবং আলট্রাসোনিক শব্দের তুলনা

শ্রাব্য শব্দতরঙ্গ এবং আলট্রাসোনিক শব্দতরঙ্গ উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য এক উৎস (source) প্রসারণের জন্য স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন মাধ্যম (elastic medium) এবং গ্রহণ করার জন্য গ্রাহক-যন্ত্র (receiver)। মানুষের শ্রাব্যতার সীমার মধ্যে অবস্থিত শব্দতরঙ্গের নিয়মগুলি সম্পর্কে আমরা পরিচিত। আলট্রাসোনিক তরঙ্গও একই প্রকার নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু যেহেতু এর কম্পন সংখ্যা বেশী, তাই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যও খুব কম। ব্যবহারিক প্রয়োগক্ষেত্রে সেইজন্য আলট্রাসোনিক তরঙ্গ, শ্রাব্য শব্দতরঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধাজনক ভাবে কার্যকরী।

আলট্রাসোনিক তরঙ্গ মানুষের শ্রাব্যতার উচ্চ-সীমার বাইরে থাকার জন্য, ব্যবহৃত আলট্রাসোনিক যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন শব্দ কোন রকম অসুবিধার (noise) সৃষ্টি করে না। তার ফলে আরামপ্রদ ভাবে কাজ করার সুবিধা হয়। দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত কাজে উচ্চস্বরণযুক্ত বলের প্রয়োজন হয় সেইসব ক্ষেত্রে এই উচ্চকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ ব্যবহারের দরকার হয়। তৃতীয়তঃ আলট্রাসোনিক তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য খুব ছোট হওয়ায় তরঙ্গমালা সমতলীয় (planar) হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই শর্ত মেনে চলা বাঞ্ছনীয়—বিশেষতঃ যেখানে পরীক্ষণীয় বস্তুটির আকার যদি খুব ছোট হয়। চতুর্থতঃ কম্পনসংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য আলট্রাসোনিক তরঙ্গকে খুব সহজেই নাভিকেন্দ্রিক (focus) করা যায়।

আলট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ট্রান্সডিউসার

শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা এবং তাকে গ্রহণ করা যে যন্ত্রের (device) দ্বারা সম্ভব তাকে ট্রান্সডিউসার (transducer) বলা হয়। ট্রান্সডিউসারের কাজ হল শক্তির রূপান্তর সাধন অর্থাৎ এক ধরণের শক্তিকে অন্য ধরণের শক্তিতে রূপান্তরিত করা। অ্যাকুস্টিক্যাল ট্রান্সডিউসারের সাহায্যে অ্যাকুস্টিক্যাল শক্তিকে অর্থাৎ শব্দশক্তিকে বৈদ্যুতিক (electrical), যান্ত্রিক (mechanical) কিংবা তাপীয় (thermal) শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। আবার এর সাহায্যে উল্টো প্রক্রিয়া (reversible process) ঘটানো চলে অর্থাৎ উপরিউক্ত শক্তিগুলিকে শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত করা।

আলট্রাসোনিক সৃষ্টি করা যায় প্রধানতঃ চার প্রকার ট্রান্সডিউসারের সাহায্যে ; যথা :—

ক) তড়িৎ-যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসার (electro-mechanical)

খ) বিশুদ্ধ যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসার (purely mechanical)

গ) তড়িৎ-চৌম্বক ট্রান্সডিউসার (electro magnetic)

ঘ) স্থির-তড়িৎ ট্রান্সডিউসার (electro-static)

বিশুদ্ধ যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসার

আলট্রাসোনিক তরঙ্গ আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে রুডল্‌ফ্ কোয়েনিগ্ (Rudolph Koenig) যান্ত্রিক উপায়ে সৃষ্টি করেন। সুরশলাকা (tuning fork), স্টীলের পাত (steel bar) এবং অরগ্যান্ পাইপ (organ pipe) ব্যবহার করে

তিনি 90,000 হার্জ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গ বাতাসের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

1883 সালে গ্যাল্টন (Galton) এক ধরণের আল্ট্রাসোনিক হুইসিল্ তৈরি করেন যা 'গ্যাল্টন হুইসিল' নামে খ্যাত। এর সাহায্যে সর্বোচ্চ 25 হাজার হার্জ কম্পাঙ্ক-বিশিষ্ট আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। এর মূল নীতি হল বিশেষভাবে নির্মিত ধাতব নলের মধ্যে আবদ্ধ বাতাসকে স্পন্দিত করা। নলের যে স্থানটির মধ্যে বাতাস স্পন্দিত হয় তার দৈর্ঘ্য নলের বন্ধ দিকে অবস্থিত পিস্টনকে সরিয়ে বাড়ানো বা কমানো যায়। স্পন্দিত বায়ুস্তম্ভের (vibrating air column) কম্পাঙ্ক, শব্দের গতিবেগ, স্থানটির দৈর্ঘ্য এবং প্রবাহের চাপের উপর নির্ভর করে। পরে আরো অনেক বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ধরণের হুইসিলের উদ্ভাবন করেন এবং উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। সাইরেনের (siren) সাহায্যেও 30 হাজার হার্জ পর্যন্ত আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব।

যান্ত্রিক উপায়ে উৎপন্ন আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের ব্যবহারিক প্রয়োগ নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ। উপরিউক্ত ট্রান্সডিউসার নির্মাণ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। উৎপন্ন তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সীমায় সীমিত এবং নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন।

তড়িৎ-চৌম্বক এবং স্থির-তড়িৎ ট্রান্সডিউসার

তড়িৎ-চৌম্বক এবং স্থির-তড়িৎ ট্রান্সডিউসারের সাহায্যে আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব হলেও এদের কম্পন সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী হয় না। শেষোক্ত ট্রান্সডিউসারটি যেখানে খুব কম ক্ষমতার আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের প্রয়োজন হয়, সেইখানেই সীমিত সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমটির সাহায্যে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন তরঙ্গ সৃষ্টি করা গেলেও এর কম্পন সংখ্যা খুব কম হয়। তাই এদের ব্যবহার পরীক্ষাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

তড়িৎ-যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসার

তড়িৎ-যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গের সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ হওয়ায় ফলে বিবিধ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে এই ধরণের ট্রান্সডিউসার বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে তৈরি হচ্ছে এবং এর নানাদিক নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণায় লিপ্ত। এই ধরণের ট্রান্সডিউসারে ব্যবহৃত হয় কতগুলি বিশেষ ধরণের পদার্থ যার মধ্যে নিহিত রয়েছে পিজোইলেক্ট্রিক (piezoelectric) ধর্ম কিংবা ম্যাগ্নেটোস্ট্রিকটিভ (magnetostrictive) ধর্ম।

পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট

পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট, 1880 সালে, কুরীভ্রাতৃদ্বয় (Curie Brothers) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত কোয়ার্জ (quartz) নামক কেলাস দ্রব্যে তাঁরা এই ঘটনা লক্ষ্য করেন। কোয়ার্জ কেলাস থেকে বিশেষ ভাবে কেটে নেওয়া চাকতি (disc) কিংবা পাত (slab)-কে যান্ত্রিক পীড়নের (mechanical stress) দ্বারা প্রভাবিত করলে সমান এবং বিপরীত-ধর্মী বৈদ্যুতিক আধান (electrical charge) দ্রব্যটির সমান্তরাল পৃষ্ঠদ্বয়ে দেখা দেয়। যদি কেলাস দ্রব্যটির বিকৃতি (strain) স্থিতিস্থাপকতার সীমার মধ্যে (within elastic limit) থাকে, তবে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক আধানের ঘনত্ব (electrical charge density) প্রযুক্ত পীড়নের (stress)-এর সঙ্গে সমানুপাতিক।

1881 সালে লিপ্ম্যান (Lipmann) বিপরীত ক্রিয়া (reversible process) আবিষ্কার করেন। কেলাস দ্রব্যটির একটি সুনির্দিষ্ট দিকে বিদ্যুৎ-বিভব প্রয়োগ করলে দ্রব্যটির আকৃতির (dimensions) পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ দ্রব্যটির দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধের পরিবর্তন হয়।

কোয়ার্জ কেলাস ছাড়া প্রকৃতিতে প্রাপ্ত টুরম্যালিন (tourmaline) কেলাস দ্রব্যেও উপস্থি-

উক্ত ধর্ম বিদ্যমান। তাছাড়া কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন রশেলি সল্ট (rochelle salt), লিথিয়াম সালফেট (lithium sulphate), অ্যামোনিয়াম ডাইহাইড্রোজেন ফসফেট (ADP) এবং লেড নিওবেট (lead niobate) ইত্যাদি কেলাস দ্রব্যগুলির মধ্যেও পিজোইলেকট্রিক এফেক্ট আবিষ্কৃত হয়েছে।

পিজোইলেকট্রিক ক্রিস্টাল ট্রান্সডিউসার

যদি প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক বিভব, পরিবর্তী (alternating) ধরণের হয় তবে কেলাস দ্রব্যটির আকার বাড়তে এবং কমতে থাকে অর্থাৎ প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক বিভবের পরিবর্তনকে অনুসরণ করে কেলাস দ্রব্যটি কম্পিত হতে থাকে। সুতরাং পিজোইলেক্ট্রিক দ্রব্যকে ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক শক্তিকে (electrical energy) স্পন্দন শক্তিতে (vibrational energy) রূপান্তরিত করাই হল পিজোইলেকট্রিক ট্রান্সডিউসারের মূল কথা, বৈদ্যুতিক বিভব সাধারণ ব্যবহারে যে কম্পাঙ্কে পাওয়া যায়, ট্রান্সডিউসারে তা ব্যবহার করা হয় না। উচ্চকম্পাঙ্কবিশিষ্ট দোলকের (high frequency oscillator) সাহায্যে, সাধারণ পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহকে উচ্চতর কম্পাঙ্কে পরিবর্তন করে ট্রান্সডিউসারে দেওয়া হয়। ট্রান্সডিউসারে কেলাস দ্রব্যটি ব্যবহার করার আগে মূল কেলাস থেকে বিভিন্ন ভাবে বিশেষ আকারে কেটে নেওয়া হয়। কোয়ার্জ থেকে বিভিন্ন ভাবে যে সব কেলাস দ্রব্য কেটে নেওয়া হয় তাদেরকে X-cut, Y-cut, Z-cut, AT-cut ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। প্রয়োজনানুযায়ী এদের আকার আয়তাকার পাত কিংবা গোলাকার চাকতির মত রূপ দেওয়া যায়।

ট্রান্সডিউসারের দ্বারা উৎপন্ন তরঙ্গের ধর্ম, ব্যবহৃত কেলাস দ্রব্যটি কি ভাবে মূল কেলাস থেকে কেটে নিয়ে তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ দ্রব্যটির পৃষ্ঠদেশ crystallographic অক্ষের সঙ্গে কিভাবে অবস্থিত রয়েছে তার উপর নির্ভর করে। যেমন X-cut কোয়ার্জ কেলাসটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় সংকোচন তরঙ্গ (compressional wave) উৎপন্ন করার জন্য। এর বিকিরণ তল (radiating surface), X-অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে। কেলাস দ্রব্যটির পৃষ্ঠদ্বয় ধাতব দ্রব্য লেপনের দ্বারা আবৃত করা তড়িদ্দ্বার (electrode) হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। তেমনি মোচড় তরঙ্গ (shear wave) সৃষ্টির জন্য Y-cut কোয়ার্জ কেলাস। এ ক্ষেত্রে বিকিরণ পৃষ্ঠদ্বয় Y-অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে কেলাস দ্রব্যের উপর পরিবর্তী বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করলে, কেলাসের ভিতর পীড়নও (stress) পর্যাবৃত্তভাবে (periodically) পরিবর্তিত হয়। ফলে কেলাস দ্রব্যে স্পন্দন দেখা দেবে। প্রযুক্ত বিভবের কম্পাঙ্ক অনুসারে এই স্পন্দনের কম্পাঙ্কও এক হবে। যদি প্রযুক্ত বিভবের কম্পাঙ্ক ট্রান্সডিউসারে ব্যবহৃত কেলাস দ্রব্যটির একটি সাধারণ কম্পাঙ্কের (natural frequency) সঙ্গে মিলে যায় তবে স্পন্দনের বিস্তার সবচেয়ে বেশী হবে। এই ঘটনাকে বলা হয় অনুনাদ (resonance) এবং কেলাস দ্রব্যটির কম্পাঙ্ককে তখন অনুনাদ কম্পাঙ্ক নামে (resonant frequency) অভিহিত করা হয়। উচ্চতম শব্দ শক্তি পাওয়ার জন্য সাধারণতঃ কেলাস দ্রব্যকে তার প্রাথমিক স্বাভাবিক অনুনাদ কম্পাঙ্কে (fundamental resonant frequency) স্পন্দিত করা দরকার। কিন্তু উচ্চতর কম্পাঙ্ক পেতে গেলে দ্রব্যটিকে তার প্রাথমিক কম্পাঙ্কের উচ্চগুণিতকে (upper harmonics) স্পন্দিত করা প্রয়োজন। কেলাস দ্রব্যটিকে তার দৈর্ঘ্য বরাবর কিংবা বেধ বরাবর স্পন্দিত করা যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী স্পন্দনের সংখ্যাও আলাদা হয়। একটি নির্দিষ্ট ধরণের তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য দ্রব্যটির মধ্যে এমন ভাবে পীড়ন সৃষ্টি করা দরকার যাতে অপরাপর তরঙ্গ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পীড়ন অনুপস্থিত থাকবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় কেলাস দ্রব্যটির আকার সেইভাবেই ঠিক করে নেওয়া দরকার।

কোয়ার্জ কেলাসকে প্রায় 573°C তাপমাত্রা পর্যন্ত ঝিমিয়ে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন cut-এর কোয়ার্জ কেলাসের সাহায্যে কয়েক কিলো হার্জ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ থেকে শুরু করে কয়েক শত মেগাহার্জ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ পাওয়া যায়। কোয়ার্জ-এর কম্পন সংখ্যার তাপমাত্রা গুণাঙ্ক (temperature coefficient of frequency) এবং শক্তির আভ্যন্তরীণ হ্রাস (internal loss of energy) কম হওয়ার জন্য বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে এর প্রয়োগ এখনও ব্যাপক, কোয়ার্জ ছাড়া আরো অনেক কেলাস দ্রব্য রয়েছে যাদের মধ্যে পিজোইলেকট্রিক ধর্ম নিহিত। কিন্তু নানাবিধ রাসায়নিক এবং ভৌতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। ট্রান্সডিউসারে কেলাস দ্রব্য ব্যবহার করতে গেলে নিম্নলিখিত সর্তগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কেলাস দ্রব্যটি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন ধরণের আকার দেওয়া যায়।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে এর নানাবিধ ধর্মের পরিবর্তন যেন কম হয়।

রাসায়নিক এবং ভৌতিক ভাবে কেলাস দ্রব্যটি যেন স্থায়ী (stable) হয়।

বিভিন্ন ধরণের স্পন্দনের ক্ষেত্রে (different mode of vibration) কেলাস দ্রব্যটির পিজোইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্য যেন সন্তোষজনক হয়।

পিজোইলেকট্রিক সিরামিক ট্রান্সডিউসার

তড়িৎ-যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসারের কার্যক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হয়েছে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কতগুলি 'ফেরোইলেকট্রিক' (ferroelectric) দ্রব্যকে পিজোইলেকট্রিক বস্তু হিসাবে ব্যবহার করার ফলে। উদাহরণ স্বরূপ বেরিয়াম টাইটানেট্ (barium titanate), লেড জারকোনেট টাইটানেট (lead zirconate titanate) ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়। এই সব বস্তুকে ট্রান্সডিউসারে ব্যবহার করার আগে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোলারাইজ্ড্ (polarised) করে নেওয়া হয়। ফলে ফেরোইলেকট্রিক দ্রব্যটি কোয়ার্জ-এর মতই পিজোইলেকট্রিক ধর্ম প্রদর্শিত করে। যেহেতু এই দ্রব্যগুলি 'পলি-ক্রিস্টালিন' (poly-crystalline), সেই জন্য এরা সমদর্শী (isotropic) অর্থাৎ কোন বিশেষ দিকে এর বিশেষ ধর্ম নিহিত থাকে না। তাই কোয়ার্জ এবং অন্যান্য কেলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে যেরকম বিশেষ ভাবে কেটে নেওয়া হয়, এক্ষেত্রে তার আর প্রয়োজন হয় না। দরকার অনুযায়ী নানারকম আকার এদেরকে দেওয়া যায়। এই সব দ্রব্যকে সিরামিক (ceramic) বলা হয় এবং এদের ব্যবহার করে যে ট্রান্সডিউসার তৈরি হয় তাদের সিরামিক ট্রান্সডিউসার (ceramic transducer) বলা হয়। 'সিরামিক' দ্রব্যগুলির পিজোইলেকট্রিক ধ্রুবক (piezoelectric constant) উচ্চ হওয়ার এবং 'impedance' কম হওয়ার জন্য এরা উচ্চশক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রে কোয়ার্জের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

ম্যাগ্নেটোস্ট্রিক্টিভ ট্রান্সডিউসার

তড়িৎ-যান্ত্রিক ট্রান্সডিউসারে আর একরকম পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যাকে 'ফেরাইট্স' (ferrites) বলা হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এই সব দ্রব্য রাখলে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ দ্রব্যটির উপর যান্ত্রিক চাপ (mechanical pressure) দিলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যতা (intensity of magnetic field) বৃদ্ধি পায়। একেই বলা হয় ম্যাগ্নেটোস্ট্রিক্টিভ এফেক্ট (magnetostrictive effect)। নিকেল ফেরাইট ($NiO.\ Fe_2O_3$), ফেরাস ফেরাইট ($FeO.\ Fe_2O_3$), ম্যাগ্নেসিয়াম ফেরাইট ($MgO.\ Fe_2O_3$) প্রভৃতি দ্রব্যগুলি উপরিউক্ত ধর্ম উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রদর্শিত করে। এই সব 'ফেরাইট' দ্রব্যের

অক্ষ বরাবর যদি পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তবে দ্রব্যটি প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ সংখ্যায় স্পন্দিত হবে। দ্রব্যটিকে প্রযুক্ত ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কে স্পন্দিত করার জন্য প্রথমে উচ্চ প্রাবল্যযুক্ত একমুখী (direct) চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় এবং পরে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আল্ট্রাসোনিক তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য এই সব ট্রান্সডিউসার সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ী উচ্চ এবং নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন আলট্রাসোনিক তরঙ্গের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। সেইজন্য দরকার হয় বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সডিউসারের। নানা রকমের পিজোইলেকট্রিক কেলাস, সিরামিক এবং ম্যাগ্‌নেটোস্ট্রিক্টিভ পদার্থ এবং বিভিন্ন উপযুক্ত ম্যাচিং পদার্থ দিয়ে তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে নানা ধরণের ট্রান্সডিউসার। ট্রান্সডিউসারকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজন হয় উপযুক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি এবং তা পাওয়া যায় উপযুক্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি থেকে। বর্তমানে ইনটিগ্রেটেড সার্কিট (integrated circuit)-এর ব্যবহারের ফলে প্রয়োজনানুযায়ী যন্ত্রপাতিও তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ভিদে পলিপ্লয়েড প্রজনন

অসিতবরণ মণ্ডল*

[পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ কাকে বলে, তার শ্রেণীবিন্যাস এবং উদ্ভিদ প্রজননে এদের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে]

সাধারণত প্রাণীকোষের মতই উদ্ভিদকোষেও জোড় সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। এই জোড় সংখ্যক ক্রোমোজোমকে ডিপ্লয়েড সংখ্যা বলে। এই জোড় সংখ্যক ক্রোমোজোমকে '2n' দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তাহলে কোন উদ্ভিদকোষে '2n' সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকলে সেই ধরণের উদ্ভিদকে ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ বলা হয়। এর n সংখ্যক ক্রোমোজোমকে (স্ত্রী-অথবা পুং জননকোষে n সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে) 'জিনোম' হিসাবে ব্যক্ত করা হয়। তাহলে প্রকৃতিতে যে-সব উদ্ভিদ আছে সাধারণত তাদের কোষগুলি 2n সংখ্যক ক্রোমোজোম বা দুটি একই ধরণের জিনোম দিয়ে গঠিত। এই ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোমের বা এর জিনোমের কোনরকম পরিবর্তন ঘটে নূতন ক্রোমোজোম সংখ্যা উৎপন্ন করলে তাকে পলিপ্লয়েড সংখ্যা বলে এবং এই ধরনের উদ্ভিদকে পলিপ্লয়েড উদ্ভিদ বলে। পলিপ্লয়েড উদ্ভিদকে বিজ্ঞানীরা দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(1) ইউপ্লয়ডি (Euploidy) এবং (2) অ্যানুপ্লয়ডি (Aneuploidy)। যখন একই ধরণের বা বিভিন্ন ধরণের জিনোম গুণিতক উপায়ে বাড়তে থাকে তখন সেই উদ্ভিদকে ইউপ্লয়ডি আর যখন এই জিনোম গুণিতক উপায়ে না বেড়ে এক, দুই, তিনটি করে এর ক্রোমোজোম সংখ্যার পরিবর্তন ঘটতে থাকে তবে সেই ধরণের উদ্ভিদকে অ্যানুপ্লয়ডি উদ্ভিদ বলে। ইউপ্লয়ডিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (a) অটোপলিপ্লয়েড (Autopolyploid)—যখন কোষের একই ধরণের জিনোমের বিবর্তন (Multiplication) গুণিতক উপায়ে ঘটতে থাকে তখন তাকে অটো-পলিপ্লয়েড বলে এবং (b) অ্যালোপলিপ্লয়েড (Allopolyploid)—উদ্ভিদকোষের বিভিন্ন ধরণের দুটি বা তারও বেশী জিনোমের বিভাজন যখন গুণিতক উপায়ে ঘটতে থাকে তখন সেই উদ্ভিদকে অ্যালোপলিপ্লয়েড উদ্ভিদ বলে। কয়েকটি উদাহরণ নিলে এগুলি স্পষ্ট হয়ে যাবে। ধরা যাক পাট এবং সরষের কথা। পাটের কোষে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম 2n = 14টি থাকে, এর জিনোমিক ফর্মুলা হবে AA (পাটের জিনোমকে যদি A দিয়ে চিহ্নিত করা যায়), এর হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা হবে n = 7. এই হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে বা A জিনোমকে তিনগুণ এবং চারগুণ বাড়িয়ে দিলে যথাক্রমে 21 এবং 24টি ক্রোমোজোম উৎপন্ন হবে। এখন এই ধরণের উদ্ভিদগুলিকে ট্রিপ্লয়েড (AAA) বা টেট্রাপ্লয়েড (AAAA) উদ্ভিদ বলা হয়। এগুলি অটোপলি-প্লয়েডির অন্তর্ভূক্ত। আবার এদের 14টি ক্রোমোজোম থেকে কোন উপায়ে একটি ক্রোমোজোম নষ্ট হয়ে যে উদ্ভিদ উৎপন্ন করে তাকে মনোজোমিক (2n-1 = 13) বলে। তেমনি একটি, দুটি ক্রোমোজোম যুক্ত হয়ে ট্রাইজোমিক (2n+1) এবং টেট্রাজোমিক (2n+2) উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। এর পর সরষের কথায় আসা যাক। সরষের বেশ কয়েকটি প্রজাতি

*বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কল্যাণী, নদীয়া

(species) আছে। যেমন—ব্রাসিকা ক্যাম্পেসট্রিস (Brassica campestris), ব্রাসিকা নাইগ্রা (Brassica nigra) এবং ব্রাসিকা জুনসিয়া (Brassica juncea) ইত্যাদি। কাল সময়ে বা ব্রাসিকা নাইগ্রা উদ্ভিদের 16টি ক্রোমোজোম থাকে এবং এর জিনোমিক ফর্মূলা BB এবং ব্রাসিকা ক্যামপেসট্রিসের থাকে 20টি ক্রোমোজোম এবং এর জিনোমিক ফর্মূলা AA। এখন এদের মধ্যে অন্তর প্রজাতি সংকরণ (interspeitfic hybridization) ঘটে নূতন ধরনের উদ্ভিদ ব্রাসিকা জুনসিয়া উৎপন্ন হয়েছে, এর ক্রোমোজোম সংখ্যা 36টি এবং জিনোমিক ফর্মূলা AABB। তাহলে এই নূতন উদ্ভিদটি A এবং B দুই ধরণের আলাদা জিনোম দিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি জিনোম সংখ্যায় দ্বিগুণ। এই নূতন উদ্ভিদটি অ্যামফিডিপ্লয়েড বা অ্যালোপলিপ্লয়েডের অন্তর্গত। প্রকৃতিতে এই ধরণের বিভিন্ন অসংখ্য প্লয়ডির সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য যেমন কোল্চিসিন (colchicine) প্রয়োগ করে সুবিধা মত এদের তৈরিও করা হয়েছে।

দেখা গেছে ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কোষের আকৃতিও বৃদ্ধি পায়। আবার ক্রোমোজোম সংখ্যা বৃদ্ধি মানেই ক্রোমোজোমের মধ্যে ডি এন এ (DNA) অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি। এই ডি. এন. এ অণুই কোষের যাবতীয় কার্যকে পরিচালিত করে। ফলে কোষে জৈব-রাসায়নিক (Biochemical) পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ আসে। যেমন পলিপ্লয়েড উদ্ভিদকোষে তৈল, প্রোটিন-শর্করা জাতীয় বস্তুর পরিমাণ সাধারণ উদ্ভিদের তুলনায় বেশী।

এই ধরনের পলিপ্লয়িডি বিভিন্ন উদ্ভিদে বেশ পরিমাণে পাওয়া গেছে। বিশেষ করে সপুষ্পক উদ্ভিদের শতকরা 50%-70% উদ্ভিদ পলিপ্লয়ডির অন্তর্গত। এই ধরনের ক্রোমোজোম সংখ্যা প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে অনেক ধরনের তৈরী করাও হয়েছে। এই সব প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পলিপ্লয়েডগুলি কোষ বিজ্ঞান (cytology) এবং উদ্ভিদ প্রজনন-বিজ্ঞানে (plant breeding) বিশেষ বিশেষ ভূমিকা নেয়। একদিকে কোষ এবং বংশাণুবিজ্ঞানী (Cyto geneticist) অন্যদিকে প্রজনন-বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই বিজ্ঞান ক্রমশ সমৃদ্ধ লাভ করছে।

প্লয়েড উদ্ভিদগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে প্রজননে সহায়তা করে। গমের কথায় আসা যাক। ক্রোমোজোম সংখ্যা অনুযায়ী গম উদ্ভিদকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যে উদ্ভিদগুলি ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম (2n=14) বহন করে সেগুলি আইনকর্ন (einkorn), অ্যালোটেট্রাপ্লয়েড উদ্ভিদগুলি এমার এবং হেক্সাপ্লয়েড গমগুলি ভালগেয়ার (vulgare) শ্রেণীর অন্তর্গত। ভালগেয়ার শ্রেণীর ট্রিটিকাম এসটিভাম (Triticum aestivum) প্রজাতির গম আমাদের ভারতবর্ষে শতকরা 88% জমিতে চাষ করা হয় এবং এখন যে সমস্ত খর্বাকৃতি গম যেমন সোনালিকা U.P.-262, কল্যাণ-সোনা প্রভৃতি জাতগুলি বের হয়েছে এরা ভালগেয়ার শ্রেণীর অন্তর্গত। এই গমগুলি রুটি তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়।

তাছাড়া শতকরা 11% জমিতে মার্কিনী গম বা ট্রিটিকাম ডুরাম (Triticum durum) জাত চাষ হয়। এই গম বেকারীতে (bakery) পাউরুটি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় প্লয়ডি উদ্ভিদগুলি বহু পূর্বে প্রকৃতিতে স্বতস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ তারা প্রাকৃতিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এছাড়া এমার প্রজাতির গম উদ্ভিদগুলিতে রোগ প্রতিরোধক্ষম জিন আছে, এগুলিকে পাতা এবং কাণ্ডের বিভিন্ন ধসা-রোগ (rust diseases) প্রতিরোধক্ষম প্রজাতি সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। গমের মতই ব্যাপকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যার পুনর্বিন্যাস ঘটেছে তুলা ও সরষের ক্ষেত্রে। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে পলিপ্লয়েড সৃষ্টি হয়েছে রাই

ye) উদ্ভিদে যার বৈজ্ঞানিক নাম সিকেল সিরিয়েল ecale cereal) এবং কতকগুলি গো-খাদ্যে। ্যানজাত (horticultural) এবং সুশোভন rnamental) উদ্ভিদগুলিতেও বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি- ন আকর্ষণীয়। বীজবিহীন তরমুজ, আঙ্গুর, দার জাতগুলি যেমন আকৃতিতে তেমনি গুণগত শিষ্ট্যে অতুলনীয়। সবচেয়ে ওরনামেণ্টাল উদ্ভিদে যুক্তি প্রজনন সাফল্যজনক। কারণ প্রযুক্তি দ্বারা লাসী উদ্ভিদ—এদের ফল, ফুল, পাতা কাণ্ডকে নেকাংশে মনোরম করা যায়। নূতন নূতন উদ্ভিদের াবির্ভাব ঘটিয়েই প্রজনন বিজ্ঞানীরা ক্ষান্ত হন নি। ক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে অথবা এক গোত্র থকে অন্য গোত্রে (genus) ক্রোমোজোম, ক্রোমো- জোমের অংশ বিশেষ অথবা জিন স্থানান্তরিত করে ূতন প্রকৃতির উদ্ভিদ (যেমন ট্রিটিকেল), রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতসৃষ্টি, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মানোর জন্য বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রিটিকেল (ট্রিটিকাম ডুরুগেয়ার সিকেল সিরিয়েল-এর সংকর) আমাদের কাছে আজও আশা হয়ে রয়েছে যে এটি গমের মতই ফলন দিয়ে আমাদের খরা এবং সেচবিহীন অঞ্চলগুলিতে জন্মাতে পারবে। এর চেয়ে আরো চমকপ্রদ ঘটনা ট্রিটিকাম-আগ্রোপাইরন সংকর উদ্ভিদগুলির—এদের সংকরণ থেকে কিভাবে গম উদ্ভিদকে বহুবর্ষজীবী (perennial) করে বছরের পর বছর চাষ করা যাবে তার চেষ্টা চলছে। এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর এবং চমকপ্রদ ঘটনা বার্লি (barly) এবং গম উদ্ভিদের সংকরায়ণে সাফল্যলাভ।

এর থেকে বুঝা যায় পলিপ্লয়ডির সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যতে আরও অনেক উদ্ভিদের গোত্র অথবা প্রজাতিগত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা যাবে।

কোষ-বিজ্ঞানীরা পলিপ্লয়েডের সাহায্য নিয়ে কোন উদ্ভিদের ক্রোমোজোমের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকেন। বিশেষ করে পুরানো পলিপ্লয়েড উদ্ভিদগুলির ক্রোমোজোমগুলির কোষ থেকে উৎপত্তি তা জানা সম্ভব হয়। কোষবংশাণু- বিজ্ঞানীরা অ্যালুপ্লয়েডের (যেমন মনোজোমিক, নালিজোমিক) সাহায্য নিয়ে ক্রোমোজোমে জিনের স্থান নির্ণয়ে এবং এর থেকে ভবিষ্যতে কোন এক জাত থেকে অন্য জাতে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরণের সুবিধা পান। জন্ম দেয় নূতন নূতন রোগ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক জাতের।

যখন থেকে উদ্ভিদে ক্রোমোজোম সংখ্যা পরিবর্তনের উপায় উদ্ঘাটন হয় তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে এক বিরাট আশা সঞ্চারিত হয়। তাঁদের মনে এই ধারণাও সৃষ্টি হয় যে এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষিজ উদ্ভিদে বিপ্লব আনা যাবে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই আশা ঠিক ততখানি পূরণ হয় নি। কারণ এই পলিপ্লয়িড প্রজননে অনেক বাধা আছে। সাধারণত উদ্ভূত পলিপ্লয়েডগুলি প্রকৃতিতে খাপ খাওয়াতে পারে না। এই বাধা অতিক্রম করতে বছরের পর বছর লেগে যায়। তৎসত্ত্বেও উদ্ভিদবিজ্ঞানে পলিপ্লয়েড প্রজননের যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তাতে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান ও সমাজ

বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন প্রসঙ্গে

দীপককুমার দাঁ*

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দুই দশক ধরে স্কুলের বাইরে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ শুরু হলেও, তা সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে সমাজের অধিকাংশ নিরক্ষর মানুষের কাছে বিজ্ঞান ক্লাব কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি।

বিজ্ঞান ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য কি? বিজ্ঞান ক্লাবের সার্থকতা বলতে কি বোঝায়? এই প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আজও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করি নি এবং এজন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের তুলনায় যেমন, কেরালা, মহারাষ্ট্র এর থেকে আমরা যথেষ্ট পিছিয়ে পড়েছি। কেরালায় 'গণবিজ্ঞান আন্দোলনের' পটভূমি বিবেচনা করলে আমাদের আক্ষেপ আরও বাড়ে। তাদের সঙ্গে আমাদের চিন্তার, কাজের তফাৎটা একটু পর্যালোচনা করা দরকার।

(1) পঃ বঙ্গের স্কুলে বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যা 100টি এবং স্কুলের বাইরে 250 প্রায়। আজকাল অনেক স্কুল বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে এবং অনেক স্কুলে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে বছরে একবার বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পঃ বঙ্গে 3000 মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে প্রায় 500টি স্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়। প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর কোন চিন্তা বা কর্মপ্রয়াস নেই।

1962 সালে কেরালায় মালয়ালাম ভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার প্রয়াসে একটি সংস্থার জন্ম হয়। নাম কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ। এই সংস্থা কেন্দ্রীয় ভাবে সমগ্র কেরালায় এক ব্যাপক 'গণ বিজ্ঞান আন্দোলন' গড়ে তুলেছে, সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। 'এক হাজার বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোল'— এই আওয়াজ তারা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সফল করেছে। কেরালায় স্কুলে ও স্কুলের বাইরে বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যা কয়েক হাজার। এছাড়াও, প্রাথমিক স্কুলেও শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলায় 'বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান' প্রতিযোগিতায় প্রায় 3 লক্ষ শিশু অংশগ্রহণ করে। কেরালার লোকসংখ্যা বর্তমানে সওয়া 2 কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 5 কোটি।

(2) পঃ বঙ্গে স্কুলে বা স্কুলের বাইরে বিজ্ঞান ক্লাব অনুরাগীদের শতকরা 90 জনই ছাত্র-ছাত্রী। স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক খুবই সীমিত সংখ্যায় বিজ্ঞান ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সাধারণভাবে ডাক্তার, ইন্জিনীয়ার বা পেশাগত বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত নন। এছাড়াও পঃ বঙ্গের বিজ্ঞান ক্লাবগুলিতে নিরক্ষর সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষকরা নেই। এঁদেরকে ডাকার আয়োজন কোথাও দেখা যায় না। কারণ, এখানে বিজ্ঞান ক্লাব যে ধরণের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে, তা এদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পর্কবিহীন

কেরালায় বিজ্ঞান ক্লাবের পটভূমিতে বিজ্ঞানী-ডাক্তার-ইন্জিনীয়ার ও সাধারণ মানুষ এক প্ল্যাটফর্মে মিলিত হয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ, কেরালার

*গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, পোঃ—খাটুরা, 24-পরগণা

অধিকাংশ মানুষ স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন (60·4%) ও অর্থনৈতিক বৈষম্যও কিছুটা কম। এছাড়া কেরালায় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলা হচ্ছে একটা পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে—'সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের হাতিয়ার' হিসাবে (to build up a mass movement for social revolution)। বিকল্প কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ—প্রভৃতি জাতীয় সমস্যার মোকাবিলায় বিজ্ঞান ক্লাব অনেক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। কেরালায় সায়লেন্ট ভ্যালী প্রজেক্ট—বিতর্ক। রাজ্য সরকার প্রথমে এখানে একটি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। এই অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—এর অদ্ভুত অরণ্য পরিবেশ। এই প্রকল্প রূপায়িত হলে কেরালায় পরিবেশ সমস্যা প্রকট হতে পারে, এই চিন্তা থেকে এক ব্যাপক জনমত তীব্র আকার ধারণ করে। এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেরালা শাস্ত্র-সাহিত্য পরিষদ। আন্দোলনের চাপে সরকার সিদ্ধান্ত বদলাবার কথা ঘোষণা করেছেন। নাগরিক সচেতনতার জন্যই এই বিপদ এড়ানো সম্ভব হল। এধরণের নজীর ভারতবর্ষে প্রথম বলা যায়।

(3) মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের কাজ পঃ বঙ্গে অনেকদিন থেকে শুরু হলেও—বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনা যা প্রকাশিত হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয়েছে মালয়ালাম ভাষায়। কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ বর্তমানে 5টি বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞানের পত্রিকা ও বই প্রকাশ করছে। নয় বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য ইউরেকা, প্রকাশ সংখ্যা 45,000। 9 থেকে 15 বছর বয়সী স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'শাস্ত্র কেরালাম', সাধারণ পাঠকদের জন্য 'শাস্ত্রগ্রথি', ত্রৈমাসিক (trend of science), সচিত্র রঙীন বিজ্ঞানের দেওয়াল পত্রিকা 'বালশাস্ত্রম (Balshastram) (size—90cm × 58cm), বছরে 8টি সংখ্যা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের Shastragrathi Vigyan Pareeksha'। কেরালায় এই সব বিজ্ঞানের কাগজ কেনার পাঠক তৈরি হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে, বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারের জন্যেই।

পঃ বঙ্গে একমাত্র নিয়মিত বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা বলতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাটি বোঝায়। 33 বছর যাবৎ প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছয়-সাত হাজার। আর যে সব পত্রিকা বেরোয়—তা যেমন স্বল্পস্থায়ী, তেমনই কলেবরও ক্ষীণ। আসলে formal বিজ্ঞান পড়ার চাহিদার প্রসার হলেও, পাঠ্য বিষয়ের বাইরে বিজ্ঞানের পড়াশুনার কৌতুহলের কোন উল্লেখযোগ্য প্রসার এ রাজ্যে হয় নি।

পঃ বঙ্গে কিছু প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ অনেকটা একক ভাবে বিজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রামমোহন থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনা ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান প্রসারের কাজ মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কোন চিন্তাই আন্দোলনে পর্যবসিত হতে পারে নি। 'বিজ্ঞান ক্লাব' যে একটা সামাজিক পরিবর্তনের আন্দোলন এবং সারা দেশে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তুলে একটা বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রয়াস সৃষ্টি সম্ভব—একথা ভাবতেই আমরা শিখি নি। কেরালায় বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন করা হয় নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে সমাজ বৈজ্ঞানিক স্পৃহার বিস্তারে ও বিজ্ঞানকে অতি সাধারণ মানুষের জন্য কাজে লাগাবার প্রয়াসে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। ওখানে বিজ্ঞান ক্লাব সামাজিক প্রয়োজনে অপরিহার্য ভাবে জন্ম নিয়েছে। আর এখানে কতিপয় আগ্রহী যুবক ও মানুষ কিছু করব—এই ভাবনা থেকে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী হয়েছে। আমার কাছে এটা একটা মৌলিক পার্থক্য বলে মনে হয়েছে।

(4) কেরালার গণ বিজ্ঞান আন্দোলন (People

Science Movement) গড়ে তোলা হয়েছিল—গ্রামের মধ্যে দিয়ে পথ পরিক্রমা করে, গ্রামের মানুষের মধ্যে সভা করে, গ্রামের স্কুলে শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে একত্র বসে আলোচনার মধ্যে দিয়ে। 1977 সালের 2রা অক্টোবর 40 জন ডাক্তার-বিজ্ঞানী-শিক্ষক ছাত্রদের দল কেরালার উত্তর থেকে দক্ষিণে এক পদযাত্রায় 11,000 কি.মি. পথ গ্রামের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, 840টি সভা করেছিলেন এবং 50 লক্ষ মানুষের সংস্পর্শে তাঁরা আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পঃ বঙ্গে এধরণের কোন অনুষ্ঠান কখনও হয় নি। এখানে বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মোদ্যোগ আজও অনেকটা পাঠ্যনির্ভর। হাওড়ার পাটকলগুলি স্থানীয় পরিবেশের উপর এবং গঙ্গার জলে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করছে ; বা কলকাতার ময়লা আবর্জনা নাগরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি করছে—এ নিয়ে কোন সিরীয়াস বিতর্ক বা আন্দোলন করা বিজ্ঞান ক্লাবদের মধ্যে দেখা যায় না। কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ এই বিষয়ে একটি নজীর স্থাপন করেছে। কালিকটের কাছে একটি বড় কাগজের কলের ময়লা-আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ ঐ এলাকার নাগরিক ও গো-মহিষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব তৈরি করছিল। এবং ঐ এলাকার জেলেদের কঠিন সমস্যার মুখে ঠেলে দিয়েছিল, কারণ দূষিত পদার্থের জন্য নদীতে মাছের উৎপাদন কমে গিয়েছেল। স্থানীয় লোকেরা এই সমস্যার কথা তুলে ধরলেও, তা প্রথমে কোন গুরুত্বই পায় নি। পরিষদ এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করে প্রথমে এলাকার স্বাস্থ্য সমীক্ষা গ্রহণ করে। সমীক্ষার ভয়াবহ রিপোর্ট রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করে একটা তীব্র জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। সবশেষে, সরকার খরার সময় কারখানা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে, কারণ নদীতে ঐ সময় জল বেশ কম থাকে এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ দূষণ নাশক (pollution control measurement) ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

পঃ বঙ্গে বনের পরিমাণ বেশ কম। অথচ বন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্পদ এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখায় বৃক্ষের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পঃবঙ্গের বিজ্ঞান ক্লাবগুলি কি অরণ্য সৃষ্টি ও বনাঞ্চল সংরক্ষণে একটি জাতীয় দায়িত্ব হাতে নিতে পারেন না? তেমনই, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ অর্থনৈতিক ও পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ক্লাবগুলি কি একটি সক্রিয় কর্মোদ্যোগ গড়ে তুলতে পারেন স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে?

পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিজ্ঞান ক্লাবদের এমন কয়েকটি কাজের পোগ্রাম নিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে, বিজ্ঞান ক্লাব সত্য সত্যই সক্রিয় ভাবে সামাজিক উপকারে নিয়োজিত হতে পারে। গরু-মহিষ-ছাগল হাঁস-মুরগী-মৌমাছি পালন, মাছ চাষ, মাটি পরীক্ষা, সেচ ব্যবস্থা, গ্রামীণ শিল্প, (যেমন, কামার, কুমোর, ছুতার, রাজমিস্ত্রী, কাঁসা-পিতল-বাসন-প্রস্তুত শিল্প, জুতা ইত্যাদি), কম খরচে বাড়ী তৈরি, বন্যা রোধ ইত্যাদি—তাহলে বিজ্ঞান ক্লাব সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা যোগসূত্র রচনা করতে পারবে।

(5) আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানের পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। বর্তমানে হিন্দীতে কয়েকটি ভাল বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া তামিল, মালয়ালাম, কানাড়া প্রভৃতি ভাষায় বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞানের পাঠক তৈরি হয় নি ; বা যাঁরা পত্রিকা বের করেন তাঁরা একাজটা ততটা গুরুত্ব দিয়ে করেন না—এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক? কয়েকটি বিজ্ঞান ক্লাব মাঝে মাঝে অনিয়মিত ভাবে পত্রিকা বের করেন। এসব পত্রিকার মান যথেষ্ট উন্নত নয়। প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক 500 থেকে 1000 এক-একটির। এর অন্যতম কারণ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকরা এসব কাজে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে চান না, বিজ্ঞানের কাগজ না

থাকলে, বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসারে জনমত কিভাবে গড়ে উঠবে?

বাংলা ভাষায় কটা বিজ্ঞানের বই বেরোয়—বছরে? ভাল বই প্রায় 10-15টি মাত্র। সম্প্রতি রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কিছু বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অভিযোগ' যে তাঁদের বই-এর ভাষা বড় খটমট। এছাড়া দামও বেশ বেশি। বাংলায় ভাল বিজ্ঞানের বই খুব কম প্রকাশিত হয়। যা হয়, তার বিষয়বস্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকের বিজ্ঞানের কথাই বেশী থাকে। বিগত 40-50 বছরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে অগ্রগতি হয়েছে তার পরিচয় বাংলাভাষায় খুব কমই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা লেখেন না—এ অভিযোগ সত্য। তাহলে, নতুন লেখক গোষ্ঠী বিজ্ঞান ক্লাবের মধ্যে থেকেই গড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(6) বিজ্ঞান ক্লাবদের আর্থিক সমস্যা আছে। কিন্তু কিভাবে মিটবে? আগেই বলেছি, বিজ্ঞান ক্লাবের জন্ম সংঘবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হয় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজ্ঞানের মডেল তৈরির ছবির মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান ক্লাবের জন্ম হয়েছে। প্রথম প্রথম এর খরচ মিলত সদস্যদের পকেট থেকে। যখন ক্লাব আর একটু বড় হল তখন বেছে বেছে সমাজের কতিপয় মানুষের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে কাজ চালানো হতে লাগলো। এখন, বিজ্ঞান ক্লাবগুলি আরও একটু বড় হতে চাইছে, শক্ত ভিত গড়তে চাইছে। তাদের মনে হচ্ছে, এবার সরকারী সাহায্য পাওয়া দরকার। কিন্তু সমস্যাও আছে। (1) সরকার কোন্ কোন্ বিজ্ঞান ক্লাবকে সাহায্য দেবেন? (2) কি পদ্ধতিতে ও কতটা সাহায্য দেবেন? (3) সাহায্য এককালীন হবে, না প্রতি বছরে একটা নির্দিষ্ট grant পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমিটি (6, ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-17) বলেছেন, বিজ্ঞান ক্লাবগুলি নির্দিষ্ট প্রজেক্ট কাজের জন্য দরখাস্ত সহ টাকা চাইলে, তাঁরা আবেদনপত্র পরীক্ষা করে টাকা দেবেন। ইতিমধ্যে, গুটি কয়েক বিজ্ঞান ক্লাব টাকা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। অধিকাংশ বিজ্ঞান ক্লাবের বৈজ্ঞানিক প্রথা, নিয়ম মেনে প্রজেক্ট কাজ করার বৈজ্ঞানিক কুশলতা নেই।

সরকারী সাহায্য যেমন প্রয়োজন, তেমনই বিকল্প অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা চাই। যেমন, প্রত্যেকটি বিজ্ঞান ক্লাব অঞ্চল ভিত্তিক সম্পদের ভিত্তিতে কিছু নিজস্ব উৎপাদন প্রকল্প গড়ে তুলতে পারে এবং এই উৎপাদন থেকে লব্ধ অর্থ বিজ্ঞান ক্লাবের কিছুটা ব্যয় নির্বাহে সাহায্য করবে। কিন্তু সরকারী সাহায্য গ্রহণের দোষটা হল, এতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগটা কমে যায়; কতকগুলি নিয়মতান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে ওঠে; কাজের উদ্যম ব্যাহত হয়। আর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কোন উদ্দেশ্যকে আন্দোলনে পরিণত করা কি সম্ভব? আমরা তো বর্তমানের স্কুল কলেজের অবস্থা দেখছি!

(7) নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিজ্ঞান ক্লাব এগিয়ে আসতে পারে। বর্তমানের সামাজিক অবস্থায় নতুন ধরণের বর্ণ পরিচয়ের বই-এর কথা ভাবা দরকার। বিজ্ঞান ক্লাব স্কুল-কলেজের বাইরে non-formally audio-visual scientific aid-এর সাহায্যে বিজ্ঞানের কথা তুলে ধরবে। প্রদর্শনীও এরই একটি অঙ্গ। প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্লাবের হাতে telescope, microscope, slide projector, film projector থাকা দরকার।

প্রত্যেক বিজ্ঞান ক্লাবকে সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে কাজ করার জন্য এভাবে চিন্তা করতেই হবে। নতুন ভাবনার প্রসার এভাবে ঘটাতেই হবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনাসভা

গত 3রা মে 'আন্তর্জাতিক সৌর দিবসে' কলকাতার সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা। 16ই ফেব্রুয়ারী পূর্ণগ্রহণ উপলক্ষে আমাদের দেশে যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, সেগুলির পর্যালোচনা করা যেমন সভার একটি উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি আমাদের দেশের জনমানসে যে আলোড়ন প্রকট হয়ে উঠেছিল, ব্যাপক ভাবে যে 'বুদ্ধিগ্রহণ' ঘটেছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে তাকে বিশ্লেষণ করাও ছিল সভার অন্য একটি উদ্দেশ্য।

আলোচ্য সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে যে সব তথ্যাদি এ পর্যন্ত জানা গেছে, সেগুলির সারাংশ স্লাইড সহযোগে বর্ণনা করে তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন। সূর্যগ্রহণের দৃশ্যে অভিভূত আদিম মানুষের মনে স্বভাবতঃই ভয় ও বিস্ময় দানা বেঁধেছিল—তারই জের হিসেবে যে সব কুসংস্কার আজো অজস্র মানুষের মনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, বিজ্ঞানের আলোর প্রভাবে কিভাবে সেগুলি দূর করা যায়, সে বিষয়েও তিনি আলোচনা আহ্বান করেন।

আলোচ্য বিষয়গুলিকে দু'টি মূল ধারায় ভাগ করা হয়—এক, পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ও দুই, জীব বিজ্ঞান বিষয়ক। প্রথম ভাগে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রমাতোষ সরকার ও শ্রীগোপীনাথ (বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম), শ্রীঅলোক সেন (কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র), শ্রীরবীন চক্রবর্তী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীমৃণাল সুর (ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া), শ্রীস্বপন সুর (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেসন অব সায়েন্স), ডঃ স্বপন চৌধুরী (ইণ্ডিয়া ডি-এক্স ক্লাব ইণ্টার-ন্যাশনাল, শ্রীরণতোষ চক্রবর্তী (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), শ্রীমুকুল সাহা, ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিট্যুট) ও শ্রীসোমেন গুহ (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা)। কয়েকজন বক্তা পূর্ণগ্রহণের বর্ণনা দেন নিজেদের তোলা আলোক চিত্রের সাহায্যে। গ্রহণের সময় সূর্যালোকের তীব্রতা, বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা, আয়নমণ্ডলে বেতার তরঙ্গের গতি ইত্যাদি কিভাবে পরিবর্তিত হয়, সেই সব বিষয়ে বিশদ তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়। ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী তাঁর মুভি ক্যামেরার সাহায্যে পুরীতে তোলা পূর্ণগ্রহণের যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন, দর্শকদের মধ্যে তা সবিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। এই চলচ্চিত্রে সূর্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার ছটামণ্ডলের (corona) যে দ্রুত পরিবর্তন আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায়, তার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে কয়েকটি সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করা হয়।

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, সূর্যগ্রহণের মত একটি প্রাকৃতিক ঘটনায় অজানা হয়তো কিছু থাকতে পারে কিন্তু অলৌকিক কিছু নেই। অজানাকে জানতে ও বুঝতে হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

জীবজগতের উপর সূর্যগ্রহণের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন ডঃ সঞ্জীব চক্রবর্তী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন

সাহ (কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ দিবাকর সেন, ডঃ রমা চক্রবর্তী ও ডঃ জ্যোতির্ময় দত্ত (বসু বিজ্ঞান মন্দির), শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), শ্রীমতী বন্দনা বসু (গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়), ডঃ গুণধর বর্মন (বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ) ও ডঃ রতনলাল ব্রহ্মচারী (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিট্যুট)। বনচাঁড়াল, তুলসী প্রভৃতি উদ্ভিদ এবং বিভিন্ন প্রাণীর দেহে সূর্যগ্রহণের যে প্রতিক্রিয়া হয়, সেই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল পরিবেশিত হয়। আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, সূর্যগ্রহণের সময় বিভিন্ন ভৌত রাশির যে পরিবর্তন হয়ে থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার মাধ্যমে জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়, তবে দু'-একটি ক্ষেত্রে আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জীবদেহের উপর সূর্যগ্রহণের প্রভাব সঠিকভাবে বুঝতে হলে যা দরকার, তা হল সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জ্ঞান ও জীবদেহে নানারকম প্রক্রিয়ার কলাকৌশল সম্বন্ধে সম্যক ধারণা।

আলোচনা-সভার শেষে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সম্পাদক ডঃ রবীন মজুমদার। সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রাবল্য আমাদের দেশে দেখা যায়, এই ধরণের বৈজ্ঞানিক আলোচনাদির মাধ্যমে তার মোহপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক—গুণধর বর্মন
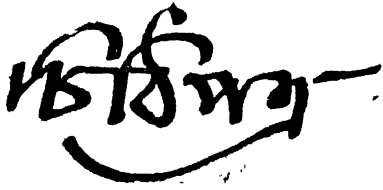
বিজ্ঞান কংগ্রেসের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী (1980) সংখ্যায় দুটি সম্পাদকীয়তে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ঔদাসীন্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও এ প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

4ঠা ফেব্রুয়ারী (1980) সেণ্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বক্তৃতা-কক্ষে বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোগে 'মলিকিউল অ্যাণ্ড ম্যান' শিরোনামে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল।

উল্লিখিত বক্তৃতাটিতে ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর, এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্য, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়নের ডক্টরেট ডিগ্রিধারী এই বিজ্ঞানী (?), ডঃ সিং, স্লাইড এবং বক্তৃতার সাহায্যে আমাদের মত সাধারণ শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে life cannot arise from matter। তিনি Information Theory এবং অন্যান্য তত্ত্বের ধোঁয়াজাল সৃষ্টি করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে জীবনের মূল উপাদান আত্মা (atma)। এবং ভক্তিযোগ (bhakti-yoga)-এর মধ্যে দিয়ে আমরা তার সন্ধান পাব। আমাদের বিজ্ঞানীরা এই বিষয়বস্তুর উপর তাঁকে জনপ্রিয় (!) বক্তৃতা দিতে দিলেন, নিজেরা অনেকে সভায় অনুপস্থিত থাকলেন, আর আমরা কিছু নিবোধ শ্রোতা এবং উপস্থিত দু-একজন বিজ্ঞানী (?) সভা শেষে বক্তা এবং বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানালাম!

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সদস্য এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছে আমরা জনপ্রিয় বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র মাধ্যমে রাখতে চাই। প্রথমতঃ জনপ্রিয় বক্তৃতার শ্রোতা হিসেবে তাঁরা মূলতঃ কাদের উপস্থিতি আশা করেন—প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের অথবা সাধারণ মানুষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের? দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতার বিষয়বস্তু নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁরা কি উপস্থিত শ্রোতাদের কথা মনে রাখেন? অর্থাৎ শ্রোতা যদি সাধারণ মানুষ অথবা সাধারণ ছাত্রছাত্রী হয় তা হলে কি ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া চলে সে সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবনা-চিন্তা করেন? আর সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি করতে চাই তা হল কি ধরণের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক বলে মনে করা হয়? কোন বৈজ্ঞানিক সংগঠনের, সাধারণ মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের সামনে বক্তৃতা দেবার জন্য একজন বক্তাকে মঞ্চ ছেড়ে দেবার আগে কি তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু আদৌ বিজ্ঞান কিনা—সেটা বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত নয়? কোন বিজ্ঞানীর বক্তব্য যদি অন্য বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের স্বীকৃত মঞ্চ থেকে পরিবেশিত হয়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কি, সেটা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

বক্তৃতা শোনার পরে আমাদেরই একজন একটা গল্প বলল। বিজ্ঞানীর লজ্জাকর এক বৈজ্ঞানিক অপরাধের গল্প—ন্যায়ের দরবারে দাঁড়িয়ে সর্বকালের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ অয়লার জনৈক ভগবানে অবিশ্বাসীকে গাণিতিক ধাঁধার ফাঁদে ফেলে স্বীকার করতে বাধ্য করছিলেন যে ভগবান আছে। যদিও তিনি নিজেও জানতেন যে তিনি যা করলেন তা পরিপূর্ণ মিথ্যা, অর্থহীন এবং পাগলের প্রলাপের মত। ডঃ লিং-এর বক্তৃতার চরিত্র এরই কাছাকাছি। সেই স্লাইড শোয়ের পর্দারগুলো কতটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা যাঁরা না দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন না।

জানি না, বিজ্ঞানীরা কি ভেবেছিলেন, কি ভাবছেন। হয়তো কোন দিন দেখব যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে রাহু, কেতুর জন্ম মৃত্যুর তত্ত্ব আলোচনায়।

কান্তা প্রামাণিক
গৌতম বিশ্বাস
অসমঞ্জ বিশ্বাস
কলিকাতা

পুস্তক-পরিচয়

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়*

জীবের ক্রমবিকাশ—ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কলিকাতা। 1979। মূল্য-35 টাকা। 384 পৃঃ

ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে আরও কয়েকখানি বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে বাঙালী পাঠক সমাজে সুপরিচিত হয়েছেন। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থটি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনার আর একটি নতুন দিক উদ্ভাসিত করলো। জীববিজ্ঞান আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের পাঠ্য হিসেবে এখন একটি জনপ্রিয় বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মাফিক সিলেবাসের নির্ধারিত বাঁধধরা সূচী অনুযায়ী অনেক বই-ই জীববিজ্ঞান বিষয়ে অধুনা লেখা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ পাঠক যারা বাংলাভাষার মাধ্যমে আজকের দিনের দ্রুত উন্নতিশীল এই বিষয়টির আবিষ্কৃত তথ্য ও সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে উৎসুক তাদের জন্য লেখা গ্রন্থ বিশেষ নেই বললেই চলে। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব অনেকাংশে দূর করায় বাঙালী বিজ্ঞান পাঠক মাত্রই আনন্দিত হবেন। এই বইয়ে ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় এমনভাবে আলোচনা করেছেন যে গল্পের ছলেও অনেক দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা অনুধাবন করতে পারবেন। জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনায় লেখকের হাত যে পাকা তা প্রতিটি পরিচ্ছেদেই সুস্পষ্ট।

গ্রন্থটিতে জীববিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে ছয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু সর্বপ্রথমে গ্রন্থখানির ভূমিকায় লেখক প্রকৃতির ভারসাম্য, বাস্তব্যবিদ্যা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি

*শারীরবৃত্ত বিভাগ, হুগলী মহসীন কলেজ, হুগলী

মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বে বর্তমান জীবজগতের সঙ্গে পরিচয় ও তাদের শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বটির বিষয়বস্তু জীবমণ্ডল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তৃতীয় পর্বে জৈবনিক প্রক্রিয়া সমূহ, চতুর্থ পর্বে প্রজননবিদ্যা ও বংশ-বিস্তার এবং পঞ্চম পর্বে অভিব্যক্তিবাদ আলোচিত হয়েছে। ষষ্ঠ বা শেষ পর্বে আলোচিত হয়েছে জীবের ক্রমবিকাশ। এই শেষ পর্বটি গ্রন্থখানির সবচেয়ে বেশী মূল্যবান হয়েছে বলে আমার ধারণা। বিশেষ করে প্রায় 70 পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচিত অভিযোজন নামক পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। উদ্ভিদ-জগত ও প্রাণীজগতের মধ্যে যে বিচিত্র ধরণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ও আত্মরক্ষার উপায় যুগ যুগ ধরে উদ্ভাবিত হয়েছে তা অজস্র চিত্র সহযোগে গ্রন্থকার খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন; তবে সেই তুলনায় তৃতীয় পর্বটি যেখানে জৈবনিক প্রক্রিয়া সমূহ আলোচিত হয়েছে সেটি একটু সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল হয়েছে বলে মনে হয়। ঐ প্রসঙ্গে আর একটু বিস্তৃত আলোচনা হলে পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তি ও বোঝার পক্ষে সহজতর হত। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ পর্বগুলি আলাদা করে জীবের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নাম দিয়ে প্রকাশ করলে এবং প্রথম তিনটি পর্বকে আরও সম্প্রসারিত করে জীবজগত ও জৈবনিক প্রক্রিয়া এইরূপ নামে একখানি ভিন্ন গ্রন্থ রচনা করলে হয়তো পাঠকদের আরও বেশী লাভ হত। যাই হোক এটা সমালোচকের মত। গ্রন্থকার একমত নাও হতে পারেন।

তথ্যগত ভুলত্রুটি অল্পই চোখে পড়লো। দুই একটি উল্লেখ করছি। 82 পৃষ্ঠায় নীচের দিকে লেখা হয়েছে, "রক্ত যকৃত থেকে বুকে পৌছায়।" আবার 88 পৃষ্ঠায় আছে "সাধারণভাবে পার্শীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ অনুভূতি বহন···আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ হল কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে স্নায়বিক কার্যকলাপের সূত্রপাত এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। আবার 90 পৃষ্ঠায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পায়ে মশা কামড়ালে হাত দিয়ে চাপড় দিয়ে মশাটা মারবার ব্যাপারটা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া নয় কিন্তু প্রদীপের শিখায় হাত লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নেওয়া হল এটা প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া। আবার 91 পৃঃ আছে "আমাদের দেহে এমন কতগুলি স্নায়ু আছে যারা মস্তিষ্ক বা সুষুম্নাকাণ্ডের অধীন নয়"। এই কথাগুলো ঠিক নয়। আর একটি কথা। স্নায়ু কথাটা না লিখে 'নার্ভ' লেখাই ভাল। 186 পৃষ্ঠায় অভিব্যক্তি সম্পর্কে লামার্কের মতবাদ কেন বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন নি ঠিক ভাবেই বলা হয়েছে। তবে 367 পৃঃ লেখা "ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে মানুষের হাতের অঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো-আঙুল আকারে বড় হতে লাগলো"···কথাটা লামার্কের মতবাদের মত শোনাচ্ছে না কি? 361 পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "ডারউইন প্রমাণ করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক উচ্চতর বানর থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে এবং কেন এই পরিবর্তন ঘটল, তা তিনি বলেন নি। এসব প্রশ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্। তিনি বলেছেন প্রাগৈতিহাসিক মানব-সদৃশ বানর ছিল পশু, কিন্তু সচেতন শ্রমই তাকে মানুষে রূপান্তরিত করেছে।" কথাটা কি সত্যি? শুধু সচেতন শ্রম কথাটা ব্যবহার করলেই সঠিক ব্যাখ্যা হল কি? মানুষের ভাষা ও রূপকের ব্যবহার ক্ষমতা কি এই রূপান্তরের জন্য কম দায়ী ছিল? আসলে এ নিয়ে বহু বৈজ্ঞানিক বহু গবেষণা করেছেন এবং এ সম্বন্ধে বহু মতবাদই আছে তবে সঠিক ব্যাখ্যা এখনও কারও কাছ থেকেই পাওয়া যায় নি। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস জীব-বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন সমাজতত্ত্ববিদ ও কার্লমার্ক্সের সহযোগী। রুশদেশ থেকে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে অবশ্য এই ধরণের কথা প্রায়ই লেখা থাকে! ছাপার ভুল খুব বেশী নেই। 103 পৃঃ Bayliss কে Bylias লেখা হয়েছে। 57 পৃঃ lipase কে Lypase ছাপা হয়েছে। 58 পৃঃ আছে "পেপসিন, রেনিন, ট্রিপ্সিন

ইত্যাদি নানাপ্রকার এমিনো এসিড"। 62 পৃষ্ঠায় হান্‌স্. ক্রেব্‌স্‌কে ইংরেজ বিজ্ঞানী বলা হয়েছে। কথাটা আইনস্টাইন বা খোরানাকে আমেরিকান বিজ্ঞানী বলার মতই সত্য। যদিও খোরানাকে ভারতীয় বংশোদ্ভব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্যই এই সব ত্রুটি উল্লেখ করা হল। আর একটি কথা। গ্রন্থখানিতে অনেক জায়গায়ই ইংরেজীতে লেখা দীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু সেগুলির বাংলা তর্জমা দেওয়া হয় নি। তাতে যে সব পাঠক পাঠিকা ইংরেজী জানেন না তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়ে মূল ইংরেজী লেখাটির উৎস নির্দেশ করে দিলেই ভাল হত।

যাই হোক চার-শ' পাতার বইয়ে এরকম অল্প দু'-একটি ভুলত্রুটি বা অসংগতি থাকলেও বইটির সামগ্রিক মূল্য কিছুমাত্র কমে নি। পুস্তকখানিতে নয়খানা রঙীন চিত্র এবং প্রায় চার-শ' হাফটোন ও রেখাচিত্র আছে যা এই ধরণের বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হবে। বইখানির ক্রয়মূল্য যে এই কারণেই একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সাধারণের পক্ষে কষ্টলভ্য হয়েছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সব বই এর দামই ক্রমশঃ বাড়ছে। আজকাল অনেক উপন্যাসও এই দামে বিক্রয় হয়। সুতরাং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসুক পাঠকের পক্ষে এই ধরণের একখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

একটু হাসুন

জয়ন্ত বসু*

বাবা: হ্যাঁরে, টি ভি খোলা থাকলেই কি তোকে সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হবে?

ছেলে: টি ভির ভেতর ইলেকট্রনিক সার্কিটগুলো কী আশ্চর্য ভাবে কাজ করছে, তাই ভাবতে ভাবতে আমি হাঁ হয়ে যাই।

* *

স্ত্রী: এখন তো আমায় যা নয় তাই বলছো। বিয়ের আগে আমাকে চাঁদের সঙ্গে তুলনা করতে, তা মনে আছে?

স্বামী: এখনো করি। আমি সূর্যের মত জ্বলেপুড়ে তোমার কাছে যা এনে দিই, তারই দৌলতে তোমার যত জৌলুস।

* *

বিজ্ঞানী (বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের বক্তৃতায়): সিনেমার পেছনেও অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে।

শ্রোতা: ঐজন্যেই সিনেমা দেখে মাঝে মাঝে মাথা ধরে যায়।

* *

ভাই: জানিস তো, ময়ূরের কী সুন্দর পেখম আছে, ময়ূরীর তা নেই—ময়ূরীর থেকে ময়ূর দেখতে অনেক সুন্দর। এ থেকে কি বুঝলি?

বোন: মানুষের সঙ্গে ময়ূরের তফাৎটা বুঝলুম। মানুষের বেলা মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের তুলনা করলে যা হয়, ময়ূরের বেলা ঠিক তার উল্টো।

* *

মাস্টারমশাই: জেট বিমান যে আকাশ দিয়ে উড়ে চলে, তার মূলে রয়েছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র।

ছাত্র: স্যর, ঝড়ে যদি বিমান ধ্বংস হয়, তবে তা কোন্ সূত্র অনুযায়ী?

মাস্টারমশাই (স্বগত ভাবে): বিমানের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি?…(তারপর গলা তুলে): ওটার পিছনে নিউটনের পঞ্চম সূত্র।

* সাহা ইনস্টিটুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-9

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

জীব-রহস্যসন্ধানী—ক্যুভিয়ার

রেখা দাঁ*

স্থান ঃ ফ্রান্স অ্যাকাডেমী, সাল—1799। জীববিজ্ঞানের অভিধান রচনায় 'কাঁকড়ার নামকরণ ও তার স্বভাব'—নিয়ে আলোচনা চলছিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এর মধ্যে একজন বললেন, 'কাঁকড়া হলো একটি লাল মাছ, যে পশ্চাৎ দিকে চলতে পারে'।

ক্যুভিয়ার উঠে দাঁড়ালেন, মুচকি হেসে বললেন, 'কাঁকড়া মাছ নয়। এর দেহের কোথাও লাল চিহ্ন মাত্র নেই। আর কখনই পিছন দিকে হাঁটে না।'

হ্যাঁ। ইংল্যাণ্ডের যেমন চার্লস ডারউইন, ফ্রান্সের তেমন ব্যারন জর্জ ক্যুভিয়ার। 1769 খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের মাউণ্ট বেলিয়ার্ডে এক দরিদ্র পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জার্মানীর এক 'মিলিটারী অ্যাকাডেমী'-তে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেছিলেন। এই অ্যাকাডেমীতে নিয়মকানুনের কড়াকড়ি ছিল খুব বেশী। এজন্য অনেক ছাত্রই শিক্ষা শেষ হওয়ার আগেই চলে যেতে বাধ্য হত। এখানেই বিখ্যাত জার্মান কবি শীলার (Schiller) তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

ক্যুভিয়ার ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। জীবজন্তু নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। জীবের দৈহিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি আমৃত্যু অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। তাঁর সময় পর্যন্ত এই বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। প্রাচীন গ্রীক-বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল ছিলেন তাঁর খুব প্রিয়।

---

*গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, খাঁটুরা—পোঃ, 24 পরগণা

সমুদ্রের আকর্ষণে ক্যুভিয়ার জীবনের একটা বড় অংশ সামুদ্রিক প্রাণী অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে কাটিয়ে গেছেন। শামুক, ঝিনুক, তারামাছ, হাঙর, শংকর ও ইলেকট্রিক-রে-ফিস ইত্যাদি বহু প্রাণীর তিনি অজস্র নিখুঁত ছবি এঁকে গেছেন। এদের স্বভাব নোট বুকে লিখে রাখতেন। প্রাণীর অন্তর্গঠন নিয়ে পর্যালোচনা তিনিই প্রথম শুরু করেন। বাসগৃহটি তাঁর নিজের অজ্ঞাতেই একটি চিড়িয়াখানায় পরিণত হয়েছিল। তাঁর আঁকা ছবি ছিল বিজ্ঞান-সম্মত এবং অতি উচ্চমানের। এ থেকেই তাঁর সুনাম সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

1795 খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাসের সংগ্রহশালায় comparative anatomy বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিভিন্ন প্রাণীর কংকালতন্ত্রের পার্থক্য তিনিই প্রথম সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। বিভিন্ন প্রাণীর [একমাত্র মানুষ বাদে] দেহ ব্যবচ্ছেদ করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছিলেন এবং নিখুঁত ছবির সাহায্যে তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন। ক্যুভিয়ারের মত ছিল, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যংগের মধ্যে একটা সংযোগ আছে। বিভিন্ন প্রাণীর দৈহিক গঠন বিষয়ে তাঁর এমনই সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছিল যে, তিনি বলতেন, 'আমাকে একটা দাঁত দাও—আমি সমগ্র প্রাণীটির সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছি'।

1796 খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস (classification) একটি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রাণীজগৎকে দেহগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তিনি মূল চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। (1) Articulata—যে সব প্রাণীর দেহাংশগুলি জোড়া থাকে। (2) Radiates (রেডিয়েটস)—দেহের বিভিন্ন অংগ সমপার্শ্বীয়ভাবে কেন্দ্রীয় অক্ষকে ঘিরে থাকে। (3) Mollusks—শক্ত খোলকের আবরণে যাদের শরীর ঢাকা থাকে। (4) Vertebrates—হাড়ের শক্ত কাঠামোয় যাদের শরীর গঠিত।

মৎস্য, সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের নিয়েও তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন। comparative anatomy বিষয়ে তাঁর মতামতের বিরোধিতাও হয়েছিল যথেষ্ট, 1799 খ্রীষ্টাব্দে তিনি college-de-France-এ অধ্যাপকের চাকরি নেন। নেপোলিয়ান (1ম) ও অষ্টাদশ লুইসের সময়েও তিনি ইমপেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলার ছিলেন। 1831 খ্রীষ্টাব্দে ব্যারন (Baron) উপাধিতে ভূষিত হন।

জীবাশ্ম (fossil) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর অদম্য কৌতূহল ছিল। লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের ছবি দেখে তিনি তাদের দেহাকৃতির গঠন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনুসন্ধান করে বহু অজানা তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর একটি স্মরণীয় অনুসন্ধান হল—বর্তমান পাখীদের অতীত বংশধর 'টেরোডাকটাইল' —পাখীর জীবাশ্ম উদ্ধার। তিনিই প্রথম এই প্রাণীর জীবাশ্ম কংকালের সংগে বর্তমান পাখীর মিল দেখেছিলেন। টেরোডাকটাইলরা প্রায় 20 কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছে। জীবাশ্মের নমুনা পরীক্ষা করে তিনি এর তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত ঘটান। হাতীর সংগে অন্যান্য স্থূলচর্মবিশিষ্ট চতুষ্পদপ্রাণীর (pachyderm) যেমন, জলহস্তী, গণ্ডার, টাপির প্রভৃতির যে আত্মীয়তা আছে, তা ক্যুভিয়ার দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর গৌরবময় কর্মজীবনে, তিনি ফ্রান্সের কলেজে প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের চিরস্থায়ী সেক্রেটারী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, লর্ডসভার সভ্য ছিলেন এবং সম্মানিত উপাধি পেয়েছিলেন।

1817 খ্রীষ্টাব্দে ক্যুভিয়ার তাঁর 'Animal Kingdom Distribution According to its Organization' বইটি প্রকাশ করেছিলেন।

1832 খ্রীষ্টাব্দে ক্যুভিয়ারের গৌরবময় কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

পশ্চিম বাংলার ব্যাঙ

প্রণবকুমার মল্লিক*

পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর থেকেই জৈব বিবর্তনের (organic evolution) ধারা শুরু হয়েছে। যে সমস্ত জীবের অভিযোজন প্রাকৃতিক পরিবেশের অনুকূল হয়েছিল, তারাই বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করেছিল। আর যারা তা পারল না, তারা বেঁচে থাকার অধিকার হারাল। তাদের জীবাশ্ম (fossil) পৃথিবীর পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে থেকে গেল জৈব বিপ্লবের ইতিহাসের রসদ যোগাবার জন্য।

বারে বারে অভিযোজনের ফলে প্রাণীদের আকারের ভিন্নতা প্রকাশ পেল। তারা নানাভাবে নানা শ্রেণীতে, বিভিন্ন বর্গে, নানা গোত্রে, গণে এবং অসংখ্য প্রজাতিতে বদলি হয়ে বর্তমানে এক বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগত সৃষ্টি করেছে।

জলবাসী মেরুদণ্ডী (chordate) প্রাণী বারবার ডাঙ্গায় ওঠার চেষ্টা করেছে। এদের মধ্যে যারা ক্রমবিকাশের সিঁড়ি বেয়ে চারটি পা লাভ করে প্রথম জল থেকে ডাঙ্গায় বসেছে, তারা হল উভচর (amphibia)। ডাঙ্গায় শ্বাসকার্যের জন্য এই প্রাণীরা লাভ করেছে ফুস্‌ফুস। এদের ঠাণ্ডা রক্ত সাধারণত যে কোন তাপের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। এদের না আছে বহিঃত্বকীয় লোম, না পালক, না জোড় পাখ্‌না, আছে গ্ল্যাণ্ডযুক্ত নগ্ন চামড়া, যা দেহকে সাধারণতঃ আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। ডিম ছাড়ার সময় এরা জলাশয়ের ধারেকাছেই জমায়েত হয় এবং এদের মাছের মত দেখতে ব্যাঙাচি (বা tadpole) অবস্থা পুরোপুরি জলেই কাটে।

এই মেরুদণ্ডী উভচর প্রাণীর এক প্রশাখাই হল আলোচ্য পশ্চিম বাংলার ব্যাঙ, যাদের ডাক ছাড়া পশ্চিম বাংলার বর্ষাকাল সত্যই বেমানান। দিনের বেলায় পাখীদের কলকাকলি আর রাত্রে ব্যাঙেদের ঐকতান যেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে (Noble, 1931)। এই নগণ্য প্রাণীগুলিকে বর্ষার সন্ধ্যায়, রাত্রের অন্ধকারে পথে-ঘাটে, জলাশয়ের ধারে, গ্রামেগঞ্জে, মানুষের ঘরে-প্রাঙ্গণে চলাফেরা করতে দেখা যায়। সাহিত্যের আসরে এদের বলা হয় ভেক বা দাদুরী।

প্রাণীজগতে ব্যাঙের স্থান বিচার করলে দেখা যায় যে এরা মেরুদণ্ডী পর্বের (Phylum Chordata) উভয়ের শ্রেণীর (Class-Amphibia) অন্তর্ভুক্ত স্যালিয়েনসিয়া বর্গের (Order salientia) অন্তর্গত লেজহীন প্রাণী। পশ্চিম বাংলার এই বর্গের সাধারণত চারটি গোত্রের (Family) ব্যাঙ দেখা যায়। গোত্রগুলি হল—র‍্যানিডী (Ranidae), বিউফোনিডী (Bufonidae), মাইক্রোহাই-লিডী (Microhylidae)-এবং র‍্যাকোফোরিডী (Rhacophoridae)। র‍্যানিডী গোত্রের অন্তর্গত ব্যাঙের সংখ্যা সর্বাধিক। বাকি তিনটি গোত্র প্রত্যেকেই অল্প সংখ্যক প্রজাতি নিয়েই পরিচিত (তালিকা-1)। র‍্যানিডী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত রানা গণ (Genus-Rana)-এর বিভিন্ন প্রজাতির (Species) ব্যাঙ পশ্চিম

*রিসার্চ সেন্টার অন্ ক্যাচারাল সায়েন্স, দুইল্যা, হাওড়া-711302

বাংলার মানুষের কাছে কারাও "কোলা বা সোনা ব্যাঙ", কারাও "ধানক্ষেতের ব্যাঙ", আবার কারাও "ছ্যাড় ছেড়ে ব্যাঙ" (জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের "সংকলন" নামক পুস্তকে এই নামকরণ পাওয়া যায়)। বিউফোনিডী গোত্রের বিউফোগনের ব্যাঙরা "কুনো ব্যাঙ" নামেই সবিশেষ পরিচিত। কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যারা সাধারণ ভারতীয় কুনো ব্যাঙ (Common Indian Toad), বৈজ্ঞানিক নাম বিউফো মেলানোস্টিকটাস (Bufo melanostictus), তারা লোকালয়ে বাস করতে ভালবাসে। পছন্দ করে ঘরদোর বা ঘরের আশপাশ, এদের নাম হয়েছে কুনো ব্যাঙ। মাইক্রোহাইলিডী গোত্রের ব্যাঙ সাধারণতঃ মাটির নীচে গর্ত করে বলে এদের "মেটো ব্যাঙ" (মল্লিক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1979) বলা হয়। র‍্যাকোফোরিডী গোত্রের ব্যাঙে গাছের উপরে বাস করে বলেই এদের "গেছো ব্যাঙ" (ভাদুড়ী, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1960 ; মল্লিক, 1979) বলা হয়। (তালিকা—1)।

বাসস্থান অনুসারে ব্যাঙদের সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—পূর্ণজলবাসী, আংশিক জলবাসী, পূর্ণ স্থলবাসী। স্থলবাসীদের মধ্যে রয়েছে গর্তবাসী ও উদ্ভিদবাসী। উদ্ভিদবাসীদের মধ্যে কোন কোন ব্যাঙ জলজ উদ্ভিদে বাসস্থান করে, আবার কেউবা স্থলজ উদ্ভিদ বাসস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছে (তালিকা—2)।

তালিকা—1

গোত্র (Family)	গণ (Genus)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)	সাধারণ নাম (Common name)
র‍্যানিডী (Ranidae)	রানা (Rana)	রানা হেক্সাড্যাকটাইলা (Rana hexadactyla	
		রানা সায়ানোফ্লিক্টিস (Rana cyanophlyctis)	
		রানা টাইগ্রীনা (Rana tigrina)	কোলা ব্যাঙ
		রানা ভেরুকোষা (Rana verrucosa)	
		রানা লিমনোক্যারিস (Rana limnocharis)	
		রানা ক্রাসা (Rana crassa)	
		রানা এরিথ্রিয়া (Rana erythrea)	
বিউফোনিডী (Bufonidae)	বিউফো (Bufo)	বিউফো মেলানোস্টিক্টাস্ (Bufo melanostictus)	কুনোব্যাঙ
		বিউফো স্টোমাটিকাস্ (Bufo stomaticus)	

গোত্র (Family)	গণ (Genus)	বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name)	সাধারণ নাম (Common name)
মাইক্রোহাইলিডী (Microhylidāe)	মাইক্রোহাইলা (Microhyla)	মাইক্রোহাইলা অর্নাটা (Microhyla ornata)	
	ইউপেরোডন (Uperodon)	ইউপেরোডন গ্লোবিউলোসাম্ (Uperodon globulosum)	মেটো ব্যাঙ
		ইউপেরোডন সিস্টোমা (Uperodon systoma)	
	ক্যালিউলা (Kaloula)	ক্যালিউলা পুলক্রা (Kaloula pulchra)	
র‍্যাকোফোরিডী (Rhacophoridai)	র‍্যাকোফোরাস্ (Rhacophorus)	র‍্যাকোফোরাস ম্যাকিউলেটাস (Rhacophorus maculatus)	গেছো ব্যাঙ

তালিকা—2

গোত্র	প্রজাতি	বাসস্থান: পূর্ণ জলবাসী	আংশিক জলচর	পূর্ণ স্থলবাসী	গর্তবাসী	উদ্ভিদবাসী: জলজ উদ্ভিদ	উদ্ভিদবাসী: স্থলজ উদ্ভিদ
র‍্যানিডী	রানা হেক্সাড্যাকটাইলা	হ্যাঁ	না	না	না	না	না
	রানা সায়ানোফ্লিক্টিস্	হ্যাঁ	না	না	না	না	না
	রানা টাইগ্রীনা	না	হ্যাঁ	না*	না	না	না
	রানা ভেরুকোসা	না	হ্যাঁ	না*	না	না	না
	রানা লিমনোক্যারিস্	না	হ্যাঁ	না*	না	না	না
	রানা ক্রাসা	না	হ্যাঁ	না*	না	না	না
	রানা এরিথ্রিয়া	না	না	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ (ধানগাছ ইত্যাদি)
বিউফোনিডী	বিউফোমেলানোস্টিকটাস	না	না	হ্যাঁ	না	না	না
	বিউফো স্টোমাটিকাস	না	না	হ্যাঁ	না	না	না
মাইক্রোহাইলিডী	মাইক্রোহাইলা অর্নাটা	না	না	হ্যাঁ	?	না	না
	ইউপেরোডন গ্লোবিউলোসাম	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না
	ইউপেরোডন সিস্'টোমা	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না
	ক্যালিউলা পুলক্রা	না	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	মাঝেমধ্যে দেখা যায়
র‍্যাকোফোরিডী	র‍্যাকোফোরাস ম্যাকিউলেটাস	না	না	—	না	না	হ্যাঁ

* জলাশয়ের ধারে কাছেই বাস করে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে ব্যাঙ জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন দেখা যায়। অভিযোজন ঘটেছে পরিবেশের প্রভাবে। অভিযোজনের ফলস্বরূপ দেখা যায় এদের দৈহিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন গঠনগত এবং ব্যবহারিক আচরণ অনুসারে। উদাহরণ হিসাবে এদের পায়ের গঠনের কথাই ধরা যাক। এদের সামনের পা দুটি পিছনের পা অপেক্ষা লম্বায় ছোট হলেও বেশ মজবুত। লাফিয়ে পড়ার সময় সামনের পা দুটি দিয়েই ভারসাম্য রক্ষা করে। আবার বসে থাকার সময় সামনের পা দুটিই তো শরীরকে উঁচু রাখতে সাহায্য করে। বাসস্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গণের এমনকি প্রজাতির পিছনের পায়ের গঠন ভিন্ন ভিন্ন। রানা গণের যে সকল প্রজাতি পূর্ণ জলবাসী, তাদের পিছনের পা দুটি আকারে বেশ লম্বা ও পেশীবহুল, আঙুলগুলি পাতলা চামড়ার পর্দা দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে জোড়া। ফলস্বরূপ এরা একদিকে যেমন সুদক্ষ সাঁতারু হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই এদের সুদীর্ঘ লাফ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এদের এই অভিযোজনকে নকল করে মানুষ ডুবুরীর কাজের জন্য রবারের তৈরীর মোজা, যাকে "ফ্রগ লেগ" বলে, ব্যবহার করে। যেসব রানা ব্যাঙ আংশিক জলবাসী, যারা জলাশয়ের ধারেকাছে বাস করে, তাদের মজবুত পিছনের পায়ের আঙুলগুলি আংশিকভাবে পাতলা পর্দার দ্বারা জোড়া থাকে। এরা ডাঙাতে যেমন দীর্ঘ লাফ দিতে পারে, তেমনি স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে পারে। পুরোপুরি ডাঙার বাসিন্দা কুনো ব্যাঙের পিছনের পা পূর্ণ জলবাসী ব্যাঙের তুলনায় ছোট, আঙুলগুলি গোড়ার দিকে পাতলা পর্দার দ্বারা জোড়া। এরা সাঁতারু হলেও ডাঙায় দীর্ঘ লাফ দিয়ে চলতে পারে না। যে সব ব্যাঙ মাটির নীচে বাস করে তাদের পিছনের পায়ের আঙুল বাদে একটা "খুন্তার" মত অংশ (metatarsal tubercle) থাকে, যা মাটি খুঁড়তে সাহায্য করে। গেছো ব্যাঙ প্রয়োজনে দীর্ঘ লাফ দিয়ে গাছ বদল বা শাখা বদল করতে সক্ষম। সে কারণে এদের পিছনের পা দুটি কৃশ হলেও সবিশেষ লম্বা, পেশীগুলিও বেশ শক্তিশালী, দীর্ঘ লাফে স্থান বদলে সহায়ক। আবার সামনের ও পিছনের পায়ের প্রত্যেকটি আঙুলের ডগায় একটি করে গোলাকার ডিস্ক (disc) বা সাকার (sucker) বর্তমান, যার সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে লাফিয়ে গিয়ে আটকে যায়।

ব্যাঙেরা তাদের সীমিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে সচল জীবন্ত প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

বিভিন্ন গণের প্রজাতি বিশেষে বিচিত্র এদের ব্যবহারিক জীবন। বাসস্থানের বৈচিত্র্য, খাদ্যাখাদ্যের বিচার এবং প্রজননকালের আচরণ বড়ই চমকপ্রদ। প্রকৃতির এই নগণ্য ও কদাকার দর্শন জীবগুলি মানুষের নিকট ঘৃণ্য হলেও এরা মানুষের উপকারই করে। (মল্লিক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1979)। এদের জীবনযাত্রার প্রণালী বড়ই অদ্ভুত, যা জানলে, বুঝলে অবাক হতে হয়।

সমুদ্রের ঢেউ থেকে তড়িৎশক্তি

অজিত চৌধুরী*

[সমুদ্রের ঢেউ থেকে তড়িৎশক্তি উৎপাদনের একটি পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।]

যে হারে প্রচলিত শক্তির উৎস, যথা—কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদির খরচ হচ্ছে, তাতে বিজ্ঞানীদের মতে এই শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবীতে সঞ্চিত সব কয়লা, পেট্রোল ফুরিয়ে যাবে। তাই আগামী দিনের শক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা শক্তির অপ্রচলিত উৎসগুলির (যথা—সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রের ঢেউ, ভূতাপীয় শক্তি ইত্যাদির) কথা ভাবছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে কাজও বেশ কিছু হয়েছে। তবে এদের যথাযথ ব্যবহার ও খরচের দিকে অবশ্যই চিন্তার আছে। যাই হোক, সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে তড়িৎ উৎপাদনের ব্যাপারই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতা পরিবর্তনশীল এবং তা চন্দ্র, সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এছাড়া ঋতু এবং ভৌগোলিক অবস্থানও ঢেউয়ের আকার প্রভাবিত করে। প্রধানত এই কারণেই
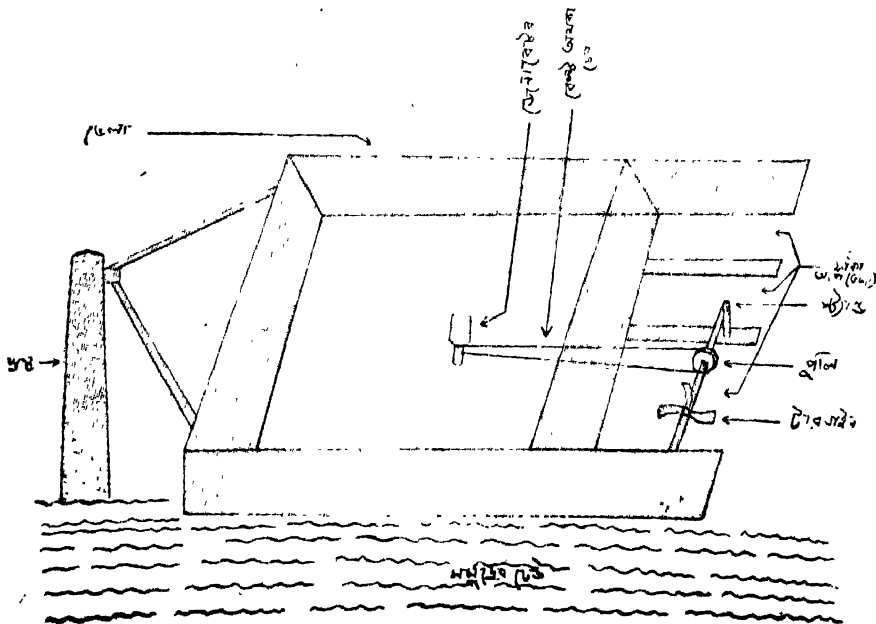
সমুদ্রের ঢেউ থেকে তড়িৎ উৎপাদনের অসুবিধা। বিভিন্ন দেশে এ নিয়ে গবেষণা চলছে। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান সম্ভবত: সহজেই করা যেতে পারে। সমাধানটি হল "ভাসমান পদ্ধতি"।

সমুদ্রের তরঙ্গের গতির অভিমুখ সাধারণতঃ সমুদ্রের কেন্দ্র থেকে তীরের দিকে (পরে

*কৃষ্ণা ব্লক, রূপশ্রী পল্লী, পোঃ-রাণাঘাট, নদীয়া

জল সমুদ্রে ফিরে যায়)। তবে এই গতিরও কিছু হেরফের হয় অর্থাৎ কখনও বেশী, কখনও বা কম। এই পদ্ধতিতে তড়িৎ উৎপাদক কেন্দ্রটি নির্মাণ করতে হবে সমুদ্রের তীর থেকে বেশ কিছুটা ভিতরে (সমুদ্রের মধ্যে) ; এই দূরত্ব হবে আনুমানিক 1000 ফুট।

এক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে একটি বড় ভেলা (raft or flash) [চিত্রের ন্যায়] যা সমুদ্রে ভাসতে পারে। এর কিছু অংশ থাকবে সংরক্ষিত, বাকি অংশ থাকবে অসংরক্ষিত। অসংরক্ষিত অংশে থাকবে অনেক কাটা কাটা ফাঁকা অংশ (gap)। টারবাইনগুলি স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে ঐ সব ফাঁকা অংশের মধ্যে এইরূপে স্থাপন করতে হবে যাতে টারবাইনগুলির নিম্নাংশ জলে ডুবে থাকে। এর জন্য টারবাইনগুলি একটু নিচু করে স্থাপন করতে হবে। টারবাইনগুলির নিম্নাংশের কিছুটা জলে ডুবে থাকতে হবে।

সমুদ্রের মধ্যে একটি স্তম্ভ (pillar), প্রয়োজনবোধে একাধিক গেঁথে তুলতে হবে। ভেলাটি যুক্ত থাকবে স্তম্ভের সঙ্গে—তা হলে, বলা বাহুল্য, ভেলাটি ভেসে চলে যাবে সমুদ্রের ঢেউ-এ। কিন্তু ভেলাটি এমন ভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে তা উঠানামা করতে পারে। এতে ঢেউয়ের উচ্চতার তারতম্যের সঙ্গে ভেলাটিও উঠা-নামা করতে পারবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের উচ্চতার যতই পরিবর্তন হউক না কেন, ভেলাটি সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকবে, ফলে টারবাইনগুলির নিম্নাংশ সর্বদা জলের সংস্পর্শে থাকবে এবং ঢেউয়ের গতিশক্তির জন্য টারবাইনগুলি ঘুরতে থাকবে।

টারবাইনগুলির অক্ষের সঙ্গে পুলি (pulley) যুক্ত করতে হবে। পুলির সঙ্গে বেল্ট বা চেন দিয়ে সংরক্ষিত অঞ্চলে অবস্থিত জেনারেটর যুক্ত করতে হবে [চিত্রে শুধু একটি জেনারেটর, একটি টারবাইন দেখানো হয়েছে]। টারবাইনগুলি যখন ঘুরতে শুরু করবে, তৎক্ষণাৎ জেনারেটরের কাজ শুরু হবে এবং তড়িৎ উৎপাদিত হবে। জেনারেটরকে সংরক্ষিত অঞ্চলে রাখার উদ্দেশ্য যাতে জেনারেটরে জল না লাগে। সংরক্ষিত অংশের উপর আচ্ছাদন দিতে হবে। উৎপন্ন তড়িৎ সহজেই তারের মাধ্যমে স্থলভাগে নিয়ে যাওয়া যাবে।

এই পদ্ধতিতে তড়িৎ উৎপাদন করতে প্রথমেই যা খরচ হবে, কিন্তু পরে প্রায় বিনা পয়সায় তড়িৎ পাওয়া যাবে। কারণ এক্ষেত্রে শক্তির উৎস—সমুদ্রের ঢেউ—একটি প্রাকৃতিক উৎস। কাজেই শক্তির উৎস আমদানির প্রশ্নই উঠে না। আর এর ফলে কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদির ব্যবহারও কমিয়ে দেওয়া যাবে।

ভেলা বড় করে, টারবাইনের সংখ্যা এবং জেনারেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তড়িৎশক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তরঙ্গশক্তির উপর তড়িৎ-এর পরিমাপ নির্ভর করবে। যে সমুদ্র যত বেশী উত্তাল (যেমন আরব সাগর) সেখানে তত বেশী তড়িৎশক্তি পাওয়া যাবে।

জলের দাম অনেক

দীপঙ্কর খাঁ*

[বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলি ছাড়াও পোস্টার বা দেয়াল পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞানের কথাগুলি মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায়। সুন্দর অংকন, রঙ এবং উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনের মাধ্যমে এই কাজটিকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এখানে ছবির সাহায্যে একটি সামান্য জিনিসকে কিভাবে সহজে বোঝানো যায় তার চেষ্টা করা হয়েছে।]

জলের অপচয় ও দূষণ

আমরা জানি পৃথিবীর 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল
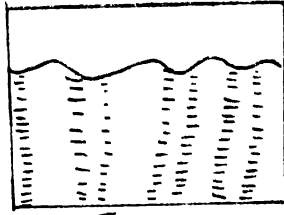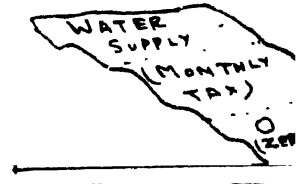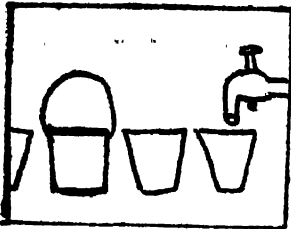
অর্থাৎ জলের কোন অভাবই নেই।

WATER SUPPLY (MONTHLY TAX)

জলের জন্য কোন করই দিতে হয় না। কিন্তু তা বলে কি জলের কোন দামই নেই।

* 10, গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক-6, ফ্ল্যাট নং-71, কলিকাতা-3

কোন কারণে যখন জল সরবরাহ বন্ধ হয় তখনও কি আমরা কিছুই বুঝি না।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝা উচিত তেমনি জল থাকতে জানা।

বাড়ীতে বা রাস্তায় যখন তখনই তো আমরা মজা করার জন্য কল খুলে রাখি।
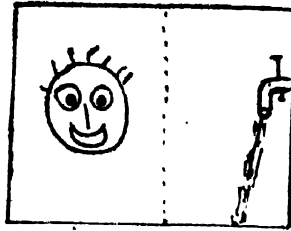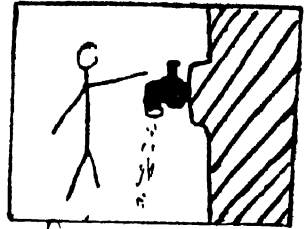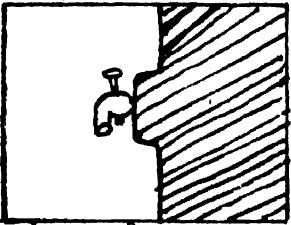
পৌরকর্মীরা শহরের প্রতিটি কলে Tap লাগালেন জলের অপচয় বন্ধ করতে

কিন্তু কদিন পরেই Tap গুলি উধাও।

আমরা বোকা তাই বুঝি না যে এ কাজের ফলভোগ আমাদেরই ভোগ করতে হবে।

জলের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন চাষে

যেমন— সেচ

কিন্তু খরার সময় জলের অভাবে কি দুর্গতি।

যে জল আমরা হেলায় নষ্ট করি তার ১ ফোঁটাও হয়ত এ গাছটিকে বাঁচাতে পারত, এই চাষীটির মুখে হাসি ফোটাতে পারত

তাছাড়া যে জল আমাদের ঘরের দোরগোড়ায় আসছে

তার পেছনে কি আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান কম?

সেই সমস্ত প্রচেষ্টার কি কোনো দামই আমরা দেব না।

তাই প্রত্যেক দেশের মানুষের এই সামান্য কাজগুলিতে লক্ষ্য রাখা উচিত —

যেমন, জলের অপচয় কমানো

WATER SUPPLY

রাস্তা খোঁড়ার দরকার হলে সাবধান হওয়া।

জনসাধারণের জিনিস চুরি বন্ধ করা ও সতর্ক হওয়া।

আর জলাধার থেকেই যে রোগের প্রাদুর্ভাব।

তাই উচিত জল ফুটিয়ে খাওয়া।

নিজস্ব জলাধার গুলি পরিষ্কার রাখা ও প্রয়োজন মত সংস্কার করা।

বড়দের উচিত ছোটদের জলের অপচয় ও জলের দূষণ সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া।

তাহলেই এই হাসিমুখ গুলি আমাদের আনন্দ দিতে ব্যর্থ হবেনা
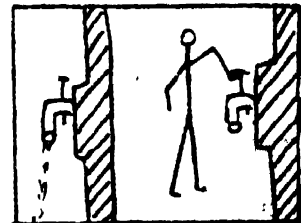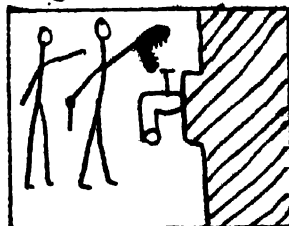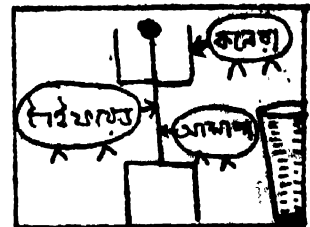
কৃত্রিম হাত

খবরে প্রকাশ সুইডেনের বিজ্ঞানীরা প্রতিবন্ধী বর্ষে প্রতিবন্ধীদের জন্যে কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই হাতের ওজন 210 গ্রাম। ছোট ইলেকট্রিক মোটর সহ এই হাত দু-বছরেরও ছোট শিশুদের শরীরে লাগান যায়। মোটরটি 6 ভোল্ট ব্যাটারিতে চলে। খুব ছোট বেলায় এই হাত লাগিয়ে নিলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হাতের মতই শরীর গ্রহণ করে ও কোন কাজের অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : (1) শীতকালে নারকেল তেল জমে যায়, সরষের তেল জমে না কেন ?

(2) জলে নুন মেশালে ফুটতে দেরী হয় কেন ?

(3) H_2O_2-কে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বলা হয় কেন ?

সুশান্ত সেন
জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ

উত্তর : (1) নারকেল তেলের গলনাংক 22-27°C-এর মধ্যে থাকে। শীতকালে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা 22°C-এর নীচে নেমে গেলেই নারকেল তেল জমে যায়। আবার 27°C-এর ওপর নারকেল তেল কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। কিন্তু সরষের তেলের গলনাংক 0°C-এর চেয়ে বেশ নীচে। শীতকালেও আমাদের বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা সরষের তেলের গলনাংকের চেয়ে বেশী থাকায় সরষের তেল জমতে পারে না।

(2) কোন তরল পদার্থ তখনই ফোটে যখন তাহার বাষ্পচাপ সেই সময়ের বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান হয়। যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন বিশুদ্ধ তরল পদার্থের সর্বাংশ থেকে তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়, সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে ঐ তরল পদার্থের স্ফুটনাংক বলে। স্ফুটনকালে তরল পদার্থের উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে এবং তরল পদার্থের বাষ্পচাপ প্রমাণ বায়ুচাপের সঙ্গে সমান হয়।

বিশুদ্ধ তরল পদার্থের সঙ্গে কোন অনুদ্বায়ী দ্রাব মেশালে যে দ্রবণ পাওয়া যায় তাতে দ্রবণের বাষ্পচাপ বিশুদ্ধ দ্রাবকের বাষ্পচাপের চেয়ে কম হয়। সুতরাং দ্রবণের বাষ্প-চাপ দ্রাবকের বাষ্পচাপের সমান করতে হলে, দ্রবণের উষ্ণতা বাড়াতে হবে। এই কারণে নুনজলের (দ্রবণের) বাষ্পচাপকে বিশুদ্ধ জলের (দ্রাবকের) বাষ্পচাপের সমান করতে হলে উষ্ণতা বাড়াতে হবে এবং এই জন্যই নুনজল ফুটতে দেরী হয়।

(3) পটাসিয়াম পারসালফেট কেলাসের এক্স-রশ্মিগত গঠনে দেখা গেছে যে এর পারসালফেট আয়নের গঠন হচ্ছে—

```
O\              /O
O— S—O—O—S—O
O/              \O
```
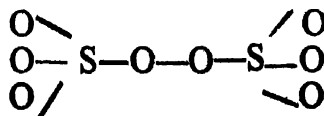
পারসালফিউরিক অ্যাসিডকে H_2O_2-এর জাতক (derivative) বলা হয়। সুতরাং H_2O_2-এর মধ্যে ডাই-হাইড্রক্সী গঠন আছে। এর গঠন হচ্ছে—

$$\begin{array}{c} H \\ / \\ O \\ | \\ O \\ / \\ H \end{array}$$

; H_2O_2-এর মধ্যে O—O বন্ধন থাকার জন্য একে পার-অক্সাইড বলা হয়। H_2O হচ্ছে হাইড্রোজেনের স্বাভাবিক অক্সাইড। হাইড্রোজেনের আরেক অক্সাইড হল H_2O_2 ; স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেশী পরিমাণে অক্সিজেন কোন মৌলের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকেও পারঅক্সাইড বলা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যে সব ধাতুর ডাই-অক্সাইড লঘু খনিজ অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে H_2O_2 উৎপন্ন করে, তাদের পার-অক্সাইড এবং যারা H_2O_2 উৎপন্ন করে না তাদের ডাই-অক্সাইড বলে।

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন কমল চক্রবর্তী]

প্রশ্নঃ (1) আমরা জানি যে, মানবদেহ কতটা লম্বা হবে তা নির্ভর করে মস্তিষ্কের অধস্তলে অবস্থিত ছোট একটি হরমোন গ্রন্থি, পিটুইটারি থেকে নির্গত হরমোন, growth stimulating হরমোন-এর উপর। উচ্চতা খুব কম এমন মানুষ কি লম্বা হওয়ার জন্যে হরমোন ইনজেকশন নিতে পারেন? এর ফলে শরীরের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি? কোন অসুবিধা না থাকলে তিনি কি ভাবে হরমোন ইনজেকশন নিতে পারেন?

(2) মানুষের মুখে যে ব্রণ দেখা যায় সেগুলি কেন হয়? এর কোন প্রতিকার আছে কি?

(3) অনেকের সারা শরীর (কিছু অংশ বাদে) বড় বড় কালো লোমে ছেয়ে যায়। লোমগুলি দূর করার উপায় কি? দূর করার ফলে শরীরের কোন ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি?

অসিত ধক
সুগন্ধা, হুগলী

(4) বৃষ্টির জলে ঘামাচি মরে এ কথাটি কি সত্যি? যদি তাই হয় তবে কেন মরে? সাধারণ জলেই বা ঘামাচি মরে না কেন?

মনোরঞ্জন সাহা
3নং শাখারী পুকুর, বর্ধমান

উত্তর : (1) হরমোনের সাহায্যে শরীরকে দীর্ঘ করা বাস্তবে সম্ভব নয়। অন্তঃস্রবা গ্রন্থিগুলির কার্যকারিতা পারস্পরিক সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে। যে তন্তুর উপর যে অন্তঃস্রাবী রস ক্রিয়া করে সেই তন্তুগুলির অন্তর্নিহিত অক্ষমতার উপরও অনেক কিছু নির্ভর করে। এছাড়া শরীরের সকল অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে পরীক্ষা না করে হরমোন ব্যবহার করা উচিত নয়—এতে ক্ষতি হতে পারে।

(2) ব্রণ কেন হয় তার সঠিক কারণ এখনো নির্ধারিত করা যায় নি। অনেকের মতে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির রসের অসামঞ্জস্যই এর কারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রণ আপনা আপনিই সেরে যায়। যদি সারতে দেরী লাগে বা পেকে যায় তাহলে চিকিৎসা করাই উচিত। ব্রণের নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নাই, তবুও চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মিলে উপকার পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে ফল পেতে দেখা যায়।

(3) গায়ে লোমের আধিক্য দমন করার কোন ঔষধ আছে বলে জানা নেই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সীমিত জায়গায় লোম তুলে ফেলা অথবা ক্ষৌরকার্যের সাহায্য নিতে পারা যায়। ফল সাময়িক।

উপরিউক্ত তিনটি প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন কর্তার নয়, সমগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটা সমস্যা।

(4) বৃষ্টির জলে ঘামাচি সারে এটা একটা প্রচলিত ধারণা। বৃষ্টির জলে ঘামাচি সারার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সারে কি না সারে নিজেরাই প্রত্যক্ষভাবে গবেষণা করে দেখুন না। ঘামাচিতো এমনিই সারে; গরমকাল কেটে গেলেই সেরে যায়।

[প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

বিশুদ্ধ গণিতবিদদের সুনাম সহজে হয় না। বিখ্যাত বিশুদ্ধ গণিতবিদ হার্ডি ছিলেন ভারতীয় গণিতবিদ রামানুজনের বন্ধু, শিক্ষক ও পরামর্শদাতা। রয়্যাল সোসাইটি হার্ডিকে যখন তাঁর গাণিতিক প্রতিভার জন্য কপ্‌লি মেডাল দেন হার্ডি তখন রামানুজনকে বলেছিলেন, 'লোকে যখন সম্মান দেওয়ার জন্য ব্যগ্র হয় তখন প্রাপককে ভাবতে হবে—এটা কিসের ইংগিত'।

—ঐ পুরস্কার পাওয়ার কুড়ি দিন পর হার্ডির মৃত্যু হয়।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

মহেশতলা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদ

24 পরগণার মহেশতলা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদের চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 1লা মে (1980) পরিষদের উদ্যোগে 'ভারতের বর্তমান জ্বালানী সমস্যা' সম্পর্কে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পারমাণবিক জ্বালানী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সৌর জ্বালানী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় শিক্ষক শ্রীশম্ভুনাথ সেন। ডক্টর আনন্দমোহন ঘোষ বিভিন্ন জ্বালানীর তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে পারমাণবিক (কেন্দ্রীন) জ্বালানীর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা তুলে ধরেন। তিনি ভারতে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের জ্বালানী এবং বায়ুস্রোত, জলস্রোত এই দুই অপ্রত্যক্ষ জ্বালানীর ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সৌরশক্তির ব্যবহারের কৌশল সঠিক ভাবে রপ্ত করার উপর ভবিষ্যতের জ্বালানী সমস্যার সমাধান যে নির্ভরশীল তাও তিনি উল্লেখ করেন।

সেমিনারের সভাপতি হিসাবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা ভারতের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানী সমস্যার সমাধানের পরামর্শ দেন। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন—তাঁদের প্রতিভাকে সরকার সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অন্যান্য সমস্যার মত ভারতের জ্বালানী সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

ঐদিন সন্ধ্যায় সংস্থা আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা প্রধান অতিথির ভাষণে বিজ্ঞান প্রসার এবং জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে বিজ্ঞান ক্লাবগুলিকে আহ্বান জানান। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহেশতলা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি ডঃ চঞ্চল পাল। এর আগে 27শে এপ্রিল সংস্থার উদ্যোগে 'পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিষদ-সংবাদ

শোক-সভা

গত 21শে মে রাত্রি 9-20মিঃ এ পরিষদের 28 বছরের কর্মী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হাজরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গত 29শে মে তারিখে সন্ধ্যা 6টায় সত্যেন্দ্র ভবনে আয়োজিত একটি শোক সভায় পরিষদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

"বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য, কর্মী ও অনুরাগীদের এই শোক সভা পরিষদের দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মী বীরেন্দ্রনাথ হাজরার অকালে মর্মান্তিক প্রয়াণে গভীর শোকসন্তপ্ত। এই সভা দীর্ঘদিনের তাঁহার পরিষদের প্রতি নিবেদিত কর্মধারা, পরিষদের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা, তাঁহার শান্ত অমায়িক ব্যবহার ও নীরব নিষ্ঠা—গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতেছে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে তাঁহার অকাল প্রয়াণে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

পরিষদ বিজ্ঞপ্তি

ষষ্ঠ বার্ষিক শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা

বক্তা : শ্রীকুমার রায়

বিষয় : মানুষের মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্য

তারিখ : 8 জুলাই, 1980, মঙ্গলবার

সময় : বৈকাল 5 টা

স্থান : 'সত্যেন্দ্র ভবন', বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006)

* * * *

অষ্টাদশ বার্ষিক রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

বক্তা : অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

বিষয় : বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষা

স্থান : "সত্যেন্দ্র ভবন" বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ (পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006)

তারিখ : 2 অগাষ্ট, 1930, শনিবার

সময় : বৈকাল 4 টা

সম্পাদক সচিব—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত

... 37/7 বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ... প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে। টাকা চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি. কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। বিগত বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 6, জুন, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট— বিশ্বনাথ মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিধি ও নিয়মাবলী মুদ্রিত হয়েছে এবং এর মূল্য ধার্য হয়েছে এক টাকা। পরিষদ দপ্তরে এই বিধি ও নিয়মাবলী পাওয়া যাবে।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়ত্রিংশত্তম বর্ষ জুন, 1980 ষষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

স্কুলে জীববিজ্ঞান

অজিতকুমার মেদ্দা

আজকের জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর কিংবা পঁচিশ বৎসর, এমন কি দশ বৎসর পূর্বেকার জীববিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর তুলনা হয় না। বহু অবিষ্কারের দ্বারা জীববিজ্ঞান আজ অনেক সমৃদ্ধ, মানব জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করার জন্য, এবং হয়ত এটি অত্যুক্তি নয় যে আজকের বিশেষ করে তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জীববিজ্ঞানে বিশদ জ্ঞান ও ব্যাপক উন্নততর গবেষণা অপরিহার্য। বর্তমানে স্কুলে জীববিজ্ঞানের পাঠ্যনির্ঘণ্টের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে শারীরবৃত্তের (Physiology) সংযোজনে জীববিজ্ঞানের অখণ্ডতা এবং সম্পূর্ণতা রক্ষা করা। এই মৌল বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সকল দেশের মানুষ তথা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের জন্য বর্তমানে জীববিজ্ঞানের পাঠ্য-নির্ঘণ্টের রূপান্তর এই অপরিহার্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ বলে মনে করি।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের জীববিজ্ঞানের সিলেবাস বা পাঠ্যসূচীর উপযুক্ততা বুঝতে পারব যদি আমরা অতীতের এবং বর্তমানের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস পর্যালোচনা করে দেখি। প্রায় 40 বৎসর পূর্বে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিজ্ঞান বাধ্যতা-মূলক বিষয় ছিল না। সেই সময়কার পাঁচ আনা মূল্যের অনুমোদিত চতুর্থ শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় গাছপালার কথার মধ্যে "গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বীজ ও গাছের জন্ম (বীজের অঙ্কুরণ), শিকড় ও উহার কাজ, কাণ্ড ও উহার কাজ, পাতা

ও তার কাজ, পাতার বিভিন্ন অংশ, পাতার আকার, মৌলিক ও যৌগিক পাতা, পাতার শিরাবিন্যাস, ফুল (বিভিন্ন অংশ, সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল), ফল (নীরস ও রসাল ফল, গুচ্ছ ফল, মৌলিক ও যৌগিক ফল), গাছ ও আলো, কয়েকটি সাধারণ গাছ চিনিবার উপায়, প্রকৃতির ডায়েরী, ডায়েরী রাখার আদর্শ, বনফুল সংগ্রহ'' সিলেবাসের মধ্যে অন্তভুক্ত ছিল। এই একই পুস্তকে প্রাণীর কথার মধ্যে পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি, মশা, মাকড়সা এবং ব্যাঙের আকৃতি-প্রকৃতি ও জীবনকাহিনী এবং চড়াই ও কাকের আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা আছে। চতুর্থ শ্রেণীর এই অনুমোদিত পুস্তকখানি 1938 খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

ইণ্টারমিডিয়েট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্ত 1936-1946 খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত প্রায় 587 পৃষ্ঠার একটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত উদ্ভিদবিদ্যা পুস্তকে (Text Book of Botany) এই বিষয়গুলি ছিল :—Part I —Morphology : structure and germination of seeds, root, stem, leaf, armature of plants, inflorescence, flower, pollination and fertilization, fruit, dispersal of fruits and seeds, Part II—Histology : cell, cell-wall, cell-inclusions, cell formation, tissues, tissue systems, primary body, secondary growth in thickness, healing of wounds, tyloses and leaf-fall ; Part III—Physiology : nutrition, metabolism, respiration, growth, movements, reproduction : Part IV—Ecology ; Part V – Natural Orders (Principles of classification, dicotyledons, monocotyledons) ; Part VI—Life History : Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms. এই সময়কার বায়োলজি বা জীববিদ্যা পুস্তকের বিষয়বস্তুর পরিমাণ এবং পুস্তকের কলেবর প্রায় একই ধরনের। যাঁরা 1946 খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আই. এস. সি. পড়েছেন তাঁদের হয়তো মনে থাকতে পারে ইংরাজী (300 নম্বর) ও বাংলা (100 নম্বর) ব্যতীত পদার্থবিদ্যা (দুটি খণ্ড), রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং অঙ্কের পাঠ্য-নির্ঘণ্টের পরিমাণ। 1950 খ্রীস্টাব্দের পর থেকে শারীরবৃত্তের সংযোজনে নতুন জীবনবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর বিভিন্ন অনুমোদিত বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যপুস্তকের মধ্যে লিখিত জীববিদ্যার বিষয়গুলি হচ্ছে—পৃথিবীর জীব—সেকালের উদ্ভিদ ও প্রাণী, জীব ও জড়ের পার্থক্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য, বীজের কথা, বীজ ও গাছের জন্ম, মূল ও তার কাজ, কাণ্ড ও তার কাজ, পাতা ও তার কাজ, ফুল ও তার কাজ, ফুল নিয়ে পরীক্ষা, ফুল সংগ্রহ, ফসল কাটার পদ্ধতি, ফল ও বীজের বিস্তার, ধান, মটর, উদ্ভিদেরা আলোক, তাপ, অভিকর্ষ ও জলের উত্তেজনায় সাড়া দেয়, উপকারী উদ্ভিদ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ, প্রাণী-জগতের শ্রেণী বিভাগ, উদ্ভিদ ও প্রাণী দেহ সংরক্ষণ প্রণালী, রোগের সংক্রমণ, সংক্রামক রোগের জীবাণু, রোগ-সংক্রমণ নিবারণের উপায়, মাটি, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সার, প্রজাপতি, গুটিপোকা, মশা, পিপীলিকা, মৌমাছি ও ব্যাঙ, আপেল শামুক, নানাপ্রকার মাছ, মাছের চাষ, উপকারী ও অপকারী পতঙ্গ, পতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ, কেঁচো, মাকড়সা, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন, মানবদেহ—নরকঙ্কাল, আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি, রক্ত ও রক্তকণিকা, নার্ভতন্ত্র, বিশেষ সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক), কোষ ও বিভিন্ন কলা, রক্ত-সংবহনতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র, খাদ্য ও তার বিভিন্ন উপাদানের কার্যকারিতা, সুষম খাদ্য, বিভিন্ন ও ভারতীয় খাদ্যের উপাদানের তালিকা, প্রভৃতি।

একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের পঠন-পাঠন আরম্ভ হওয়াতে নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত জীববিদ্যার (উদ্ভিদ বিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা)

সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি এবং এই সময়কার প্রাক্-জীববিদ্যারও সিলেবাসের গুরুভার অনেকেরই জানা আছে। নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রকাশিত তিন খণ্ড পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখেছি প্রায় 1100 এবং কয়েকজন গ্রন্থকার তাঁদের অনুমোদিত পুস্তকে আরশোলার বর্ণনা 19 পৃষ্ঠা, টিংড়ির বর্ণনা 43 পৃষ্ঠা ও কুনোব্যাঙের বর্ণনা 117 পৃষ্ঠা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সময়কার নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসের মধ্যে শারীরবৃত্ত (Physiology) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুতরাং, মানুষের বা প্রাণীর বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে ছাত্র ছাত্রীদের কোন জ্ঞানলাভ হতো না, যদিও বিজ্ঞানসম্মতভাবে শারীরবৃত্ত বাদ দিয়ে জীববিদ্যা শিক্ষা অসম্পূর্ণ বলেই স্বীকৃত।

বলা বাহুল্য গত দশ বৎসরে জীববিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে জীবন বিজ্ঞান (Life Science) নামকরণ করে মাধ্যমিকের এবং জীববিদ্যা (Biology) নামকরণ রেখে উচ্চ-মাধ্যমিকের যে পাঠ্যনির্ঘণ্টের প্রবর্তন করা হয়েছে তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটার কিছুটা ধারণা হবে যদি আমরা সাম্প্রতিককালের তৃতীয় শ্রেণী থেকে জীববিদ্যার অংশটুকু পর্যালোচনা করে দেখি। বর্তমানের সিলেবাস অনুসারে তৃতীয় শ্রেণীর জীব-বিদ্যার বিষয়গুলি হচ্ছে—"গাছগাছড়ার কথা—গাছের নানা অংশ, শেওলা, মস্ আর ফার্ন, বীজ থেকে চারাগাছের জন্ম, লতা, পাতা, ফুল, ফল, বীজ; স্থলচর শামুক, মাছ, ব্যাঙ, কাক, চড়ুই, শালিক, বাবুই, টুনটুনি, যে সব পাখি উঁচুতে ওড়ে, চিল, শকুনি, পাখির পা, পাখির খাবার, পেঁচা, বাদুড়, খেঁকশিয়াল, ইঁদুর, যে সব প্রাণী শীতকালে ঘুমোয় আর খোলস বদলায়—সাপ, ব্যাঙ, শামুক, কচ্ছপ, যারা গায়ের রঙ বদলায়।" চতুর্থ শ্রেণীর "প্রকৃতি পরিচয়ে" জীববিদ্যার অংশগুলি হচ্ছে—"শাক-সব্জির চাষ (শাকজাতীয় আর লতানো গাছ, শীতকালের সব্জি), গাছপালার পরিচয় (পাতা, ফুল, ফল, কয়েকটা সাধারণ গাছ চেনা), প্রাণীর কথা (মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী—কেঁচো কীট-পতঙ্গ, মাকড়সা, শামুক, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ (প্রজাপতি, সামাজিক কীট-পতঙ্গ, অপকারী কীট-পতঙ্গ, কীট-পতঙ্গের শত্রু), পাখি (দোয়েল, বুলবুল, টিয়া, ময়না, কোকিল, পাপিয়া, বৌ কথা কও, কাঠ-ঠোকরা, বসন্ত-বউরি, মাছরাঙা, বাজ, শিকরে বা শিকরা, হাঁস, বক, গো-বক বা গাই-বগ্‌লা) স্তন্যপায়ী জীব (হরিণ, হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, উট, জলহস্তী, ক্যাঙ্গারু, বাঘ, সিংহ, তিমি, বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, মানুষ) এবং আমাদের দেহ (কঙ্কাল, মাংসপেশী, পরিপাক বা হজম করার যন্ত্র, রক্ত-চলাচলের যন্ত্র, শ্বাসযন্ত্র, দূষিত পদার্থ নির্গমনের যন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, পঞ্চ ইন্দ্রিয়)।" প্রায় 67 পৃষ্ঠার মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর পুস্তকে এইগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর জীববিদ্যার অংশগুলির মধ্যে দেখা যায় উদ্ভিদের কথার মধ্যে "বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুলের কার্য, ফুলের বিভিন্ন অংশ ও কয়েকটি সাধারণ ফুলের বর্ণনা ও পরীক্ষা, ফুল সংগ্রহ ও ফুলের সংগ্রহপুস্তক, পরাগমিলন, বৃক্ষ ও বৃক্ষের শাখাবিন্যাস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, বৃক্ষের ত্বক ও শাখামুকুলের পরীক্ষা, জলের মধ্যে গাছের ডাল রেখে তার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ, ফসল কাটার পদ্ধতি, তার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ" রয়েছে। উপরন্তু কয়েকটি প্রাণীর জীবন-কথার মধ্যে "প্রজাপতি, গুটিপোকা বা রেশম মথ, মশা, মৌমাছি, পিপীলিকা, ব্যাঙ, এবং মানবদেহ" অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মানবদেহের বর্ণনার সঙ্গে কঙ্কাল কাঠামো, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড, খাদ্যনালী এবং আভ্যন্তরীণ অন্যান্য যন্ত্রগুলির চিত্র দেখানো হয়েছে। ব্যাঙাচির রূপান্তরের বর্ণনা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকটি পুস্তকেই দেওয়া আছে।

প্রায় 6-7 বৎসর পূর্বে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা

ও শারীরবিদ্যা—এই তিনটি স্বতন্ত্র মৌল বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে জীবনবিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশ জীববিদ্যার পাঠ্যসূচীর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের জীবনধারণের জন্য পারস্পরিক নির্ভরতা, প্রকৃতির সৃষ্ট জীবের বৈশিষ্ট্য, মানুষের অন্তর্জগতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য, প্রকৃতির সঙ্গে জীবের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিগূঢ় সম্বন্ধ, জৈব অভিব্যক্তির দ্বারা এককোষী প্রাণী থেকে মানব-জীবনের ক্রমবিকাশের ফলে শারীরস্থানীয় জটিলতার সঙ্গে শারীরবৃত্তীয় জটিলতার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতির মূল তথ্যগুলির সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আমাদের আছে। পরিবেশের অজীব ও সজীব বস্তুর সঙ্গে প্রাথমিক পরিচিতি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণ, আলো, বাতাস, পুষ্টিকর খাদ্য ও জলের আবশ্যকতা, গাছ, মাছ ও মানবের বহিরাকৃতি প্রভৃতি যে বিষয়গুলি ষষ্ঠ শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞানে আলোচ্য বিষয় তাছাড়া উদ্ভিদ ও প্রাণী রাজ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য আরও কিছুটা গভীর ভাবে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত। সেই উদ্দেশ্যে উদ্ভিদরাজ্য ও প্রাণীরাজ্য এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ, মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজের বহিরাকৃতি ও প্রকার, প্রজাপতি, আরশোলা, শামুক, মাছ, ব্যাঙ, টিকটিকি, পক্ষী এবং স্তন্যপায়ীদের বহিরাকৃতি, বীজের অঙ্কুরোদগম, ব্যবহারিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবরণ এবং তাদের প্রতিপালন, খাদ্যের উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, ভেষজ উদ্ভিদ, ক্ষতিকারক ও রোগ বিস্তারণকারী প্রাণী, পরীক্ষাগারে কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে পাঠ্যসূচী সপ্তম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যার থেকে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা যেরূপ প্রয়োজন, সেরূপ তাদের দেহাভ্যন্তরে গঠন-বৈশিষ্ট্য, জৈবনিক কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ দরকার। অষ্টম শ্রেণীর জীবনবিজ্ঞান কেঁচো, আরশোলা ও ব্যাঙের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং কাণ্ড, মূল ও পাতার গঠন ব্যতীতও উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষ এবং কলাতন্ত্র, ব্যাপন, আস্রবন, শোষণ, সংবহন ও প্রস্বেদনের ন্যায় অবশ্য প্রয়োজনীয় জৈবনিক কার্য সম্বন্ধে আলোকপাত করবে। জীবের অন্তঃপরিবেশে কতকগুলি শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি, যথা সালোকসংশ্লেষ, শ্বসন, পুষ্টি, সংবহন এবং রক্ত, চলন-গমন, রেচন, মৃত্তিকা, ভাইরাস, জীবাণু প্রভৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের সহায়ক নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী। স্নায়ুতন্ত্র, সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয়, হর্মোন, কোষবিভাজন, বৃদ্ধি ও জনন, বংশগতি, অভিব্যক্তি, অভিযোজন, রাসায়নিক পদার্থের চক্র, বাস্তুতন্ত্র ও সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয় দশম শ্রেণীর পাঠ্য নির্ঘণ্টের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জীবদেহের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য এবং কার্যের সমন্বয় সাধন, অন্তঃপরিবেশের সমস্থিতি বা আন্তরসাম্য, শরীরের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় বার্তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হওয়া, পরিবেশের সঙ্গে জীবের সামঞ্জস্য রক্ষা করে বেঁচে থাকা, জীবের অন্তঃপরিবেশের উপর বহিঃপরিবেশের প্রভাব, পরিবেশ ও জীবের মধ্যে এবং বিভিন্ন জীবের মধ্যে ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভব।

শতাধিক বৎসরের অধিককালের বহু গবেষণালব্ধ তথ্যের দ্বারা আজ কোষরূপ জটিল সংগঠনের অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ আমাদের অজানা নেই। এককোষী জীবের একটি কোষই সকল প্রকার শারীরবৃত্তীয় কার্য করে। বিভিন্ন জীবকোষের গঠন, বিন্যাস, এককোষী ও বহুকোষী জীবের এবং মানবেরও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি, মাতৃকোষ থেকে অপত্যকোষে বৈশিষ্ট্যসূচক গুণাবলী পরিবহণ, জীবের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের মাধ্যমে এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব, পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য নতুন গঠন বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি, একটি জননকোষ থেকে বৃদ্ধি ও রূপান্তরের ফলে জটিলতর জীবের সৃষ্টি, শারীরবৃত্তীয় কার্যগুলির বিভিন্ন যন্ত্র এবং তন্ত্রের মধ্যে

সুপরিকল্পিত বণ্টন-ব্যবস্থা, শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতিগুলির সমন্বয় বিধান, শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপের রাসায়নিক বনিয়াদ, পরিবেশে জীবদের মধ্যে পরস্পর নির্ভরতা, পরিবেশ দূষিতকরণ সম্পর্কে সচেতনতা প্রভৃতি সংযোজনে, এবং পরিশেষে মানবের জনন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে এই অত্যাবশ্যকীয় শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জীববিজ্ঞান পঠন-পাঠনের নব-প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে—জীববিজ্ঞানের গ্রন্থকারগণ কর্তৃক জীববিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যথাযোগ্য উপস্থাপনের এবং যোগ্যতর শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে জীববিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট অতি সহজ, সরল ও সুন্দররূপে বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করে একে আকর্ষণীয় ও অপরিহার্য বিজ্ঞান হিসাবে প্রমাণিত করার উপর; এবং এই সঙ্গে আবশ্যক ছাত্রছাত্রীদের সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসা। তথ্যগত জ্ঞানের সীমিত পরিধির মধ্যে তিনটি মৌলবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে সৃষ্ট জীবন বিজ্ঞানের পাঠ্যনির্ঘণ্টের খুঁটিনাটি বা সমষ্টিগত রূপ-পর্যালোচনা বা সমালোচনা করলে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞান প্রবন্ধ

ম্যালেরিয়া পরভোজী আবিষ্কারের শতবার্ষিকী

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করার যুগ এটা। মহান ব্যক্তিদের জন্ম-শতবার্ষিকী তো হয়ই, গত জানুয়ারীতে এককোষী পরভোজীর প্ল্যাজমোডিয়াম ম্যালেরিয়ারও (Plasmodium Malarice) আবিষ্কারের শতবার্ষিকী পালিত হলো কলকাতায়। ভারতের এবং 15টি বিদেশের চিকিৎসক ও ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞগণ ঐ আলোচনা সভায় যোগদান করে ম্যালেরিয়ার বিষয় বিশেষ করে তার প্রতিরোধের বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন।

ম্যালেরিয়া রোগের অস্তিত্ব এবং উৎপাত অবশ্য প্রাচীন কালেও জানা ছিল। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস এ রোগের কথা জানতেন। চরক সংহিতায় এ ধরণের রোগের নাম 'জনপদোদ্ধংসনীয়' অথবা আগন্ত বিষম জ্বর। রোগটির সঙ্গে তখন পরিচয় ছিল কিন্তু রোগ উৎপাদনকারীর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এই পরিচয় করিয়ে দেন ফরাসী সৈনিক বিভাগের চিকিৎসক Alphonse Laveran 1880 খ্রীঃ। তাহলে 1980 সালেই তার জন্ম-শতবর্ষ পূর্ণ হল নাকি? ঐ ফরাসী চিকিৎসক অ্যালজিয়ার্স-এ তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করার সময় লক্ষ্য করেন যে লোহিত কণিকার মধ্যে এক ধরণের বহিরাগত ক্ষুদ্রবস্তু অবস্থান করছে। পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হলো Laveran-এর দেখা ঐ বস্তুগুলি প্ল্যাজমোডিয়া ম্যালেরিয়া জীবনচক্রের একটি পর্যায়।

জীবাণুর সঙ্গে তো পরিচয় হলো কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম প্রাণীগুলি কেমন করে সরাসরি একেবারে রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করল? উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটালে (যার নাম এখন শেঠ সুখলাল কর্ণানি স্মৃতি হাসপাতাল) গবেষণায় রত ছিলেন ডাঃ রোনাল্ড রস্ (Ronald Ross) 1897 সালে তিনি আবিষ্কার করলেন যে এক প্রজাতির মশার কামড়েই এই রোগ বিস্তারিত হয়। এই দুই আবিষ্কারের বছর দশেকের মধ্যেই ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র, সংক্রমণের বাহক ও রোগ প্রসারের নির্ভুল পরম্পরা আবিষ্কৃত হয়ে গেল। এর অব্যর্থ ঔষধ কুইনিনের ব্যবহার পূর্বেই জানা ছিল। তাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হলো।

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করলে কিভাবে রোগ সংক্রমিত হয় এবং কিভাবে শরীরের ক্ষতিসাধন করে সেটা ভালভাবে বোঝা যাবে। এই এককোষী জীবের জীবনযাত্রায় দুটি বিভিন্ন অংশ—একটি অযৌন এবং অপরটি যৌন বিভাজন। অযৌন বিভাজন তথা বংশবৃদ্ধি চলে

*25A, নিবেদিতা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

মানব দেহে এবং যৌন বিভাজন তথা বংশবৃদ্ধি চলে মশকের দেহাভ্যন্তরে।

মানবদেহে অযৌন বংশবৃদ্ধি

মানুষ যেমন সুবিধাজনক জায়গা বেছে বসতি স্থাপন করে তেমনি অন্যান্য প্রাণীরাও পছন্দমত জায়গা বেছে বাসা বাঁধে। যে সব সূক্ষ্ম জীবাণু মানুষের দেহ আক্রমণ করে তারাও শরীরের এক একটি নির্দিষ্ট দেহযন্ত্র বা তন্তু আশ্রয় করে বংশবৃদ্ধি করে। মশকের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর বীজগুটি বা অযৌন জননাংশ (spore) মানুষের রক্তে মিশে যায়। বীজগুটিগুলির বোধহয় লাল রং খুব পছন্দ। লাল রক্তের মধ্যে লাল রক্তকণিকা-গুলিকে ভেসে বেড়াতে দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং অনতিবিলম্বে একটা আংটির আকার ধারণ করে। তারপর ঐগুলি ইতস্তত: উপাংগ বের করে এবং নড়াচড়া দ্বারা (অ্যামিবয়েড্ মুভমেন্ট) কলেবর বৃদ্ধি করে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কণিকার মধ্যস্থিত হেমোগ্লোবিন আত্মসাৎ করে কণিকার প্রায় সব অংশটুকু দখল করে নেয়। এর পর অযৌন ভাবে 15/20 অংশে বিভক্ত হয়ে রক্তকণিকার আবরণ ভেদ করে রক্তপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ে। একই সঙ্গে বহু সংখ্যক রক্তকণিকা এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শরীরের মধ্যে এই অঘটনের প্রতিক্রিয়া হলো আক্রান্ত ব্যক্তির কম্প দিয়ে জ্বর আসা। জীবাণুর ঐ বিচ্ছিন্ন কোষগুলি হলো অযৌন বিভাজনের প্রথম বংশধর (Merozoite)। ঐ মেরোজয়েটগুলির প্রায় শতকরা 90টি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই ধ্বংসের কাজ করে রক্তের শ্বেতকণিকা, প্লীহা, যকৃত এবং হাড়ের মজ্জায় অবস্থিত ম্যাক্রোফাজ (macrophage) নামক কোষের দ্বারা। বাকী জীবিত মেরোজয়েটগুলি আবার নূতন রক্তকণিকার মধ্যে প্রবেশ করে পূর্বের জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তি করে। প্রতিবারেই আবার কম্প দিয়ে জ্বর আসে এবং রক্তকণিকার ক্ষতিসাধন করে। এর ফলে রোগীর শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমান্বয়ে রক্তাল্পতা (anaemia) হতে থাকে। এই যে বারে বারে রক্তকণিকায় মধ্যে অযৌন বংশবৃদ্ধি ঘটছে এর একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে। 4টি প্রজাতি, জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে। এর মধ্যে একটা প্রজাতি 24 ঘণ্টা অন্তর, একটি 48 ঘণ্টা অন্তর এবং 72 ঘণ্টা অন্তর বংশবৃদ্ধি করে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিদিন, 1 দিন অন্তর ও 2 দিন অন্তর কম্পজ্বর দেখা দেয়। একাধিক প্রজাতির দ্বারা আক্রান্ত হলে জ্বর হবার সময়সূচী এলোমেলো হয়ে যায়। বাকী জীবিত মেরোজয়েটের কতকগুলি আবার যৌন জননকোষে (gamate) পরিণত হয়। পরে মশকের পাকস্থলীতে যৌন বিভাজনের জন্য অপেক্ষা করে।

মশার দেহে যৌনভাবে বংশবৃদ্ধি

শুধুমাত্র অযৌনভাবে জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি চলতে থাকলে এদের বংশলোপ পাবার সম্ভাবনা তাই এরা যৌনমিলনের দ্বারা বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া গ্রহণ করে। এই জীবন চক্রটি চলে মশকের দেহে। মশা যখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর রক্ত শোষণ করে তখন সেই রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার অযৌন জননাংশ (spare) এবং যৌন জননাংশ (gamete) শোষণ করে নেয়। এখানেও আবার স্থান-পাত্রের নির্বাচনের প্রশ্ন আছে। কেবলমাত্র অ্যানোফিলিস প্রজাতির মশার আশ্রয় নিতেই এরা পছন্দ করে। সব প্রাণীরই বংশধর আসে স্ত্রী-প্রাণীর অভ্যন্তরে। এক্ষেত্রেও স্ত্রী-মশার পাকস্থলীতে যৌন জীবনচক্র চলে। কারণ অবশ্য কেবলমাত্র স্ত্রী-মশাই মনুষ্যরক্তপায়ী। অ্যানোফিলিসের স্ত্রী-মশাগুলি যখন ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত শোষণ করে সেই সময় রক্তের মধ্যে কিছু হৃষ্টপুষ্ট স্পোর এবং কিছু যৌন জননাংশ তাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। স্পোরগুলি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং যৌন জননাংশগুলি প্রথমে স্ত্রী ও পুরুষ দু-ভাগে বিভক্ত হয় এবং পরে উভয়ের যৌনমিলনের ফলে নূতন

প্রজন্মের সূত্রপাত হয়। মিলনের পর নূতন বংশধর অর্থাৎ আবার অযৌন জননাংশ হতে সময় লাগে 10 দিন। ঐ অযৌন জননাংশগুলি তখন মশার পাকস্থলী ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে (চিত্রে 'ক' দ্রষ্টব্য) তার দেহাভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলি ক্রমশঃ মশকের লালাস্রাবী গ্রন্থিতে অবস্থান করে। এই অবস্থায় মশক যখন মানুষের রক্তশোষণ করে সেই সুযোগে লালা গ্রন্থি থেকে চোষণাঙ্গের মধ্য দিয়ে কিছু জননাংশ মানুষের দেহে উদ্গীরিত হয় এবং রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে যথারীতি আবার চলে অযৌন বংশবৃদ্ধি। নিচের চিত্রাকারে জীবনচক্র দুটি দেখানো হয়েছে।
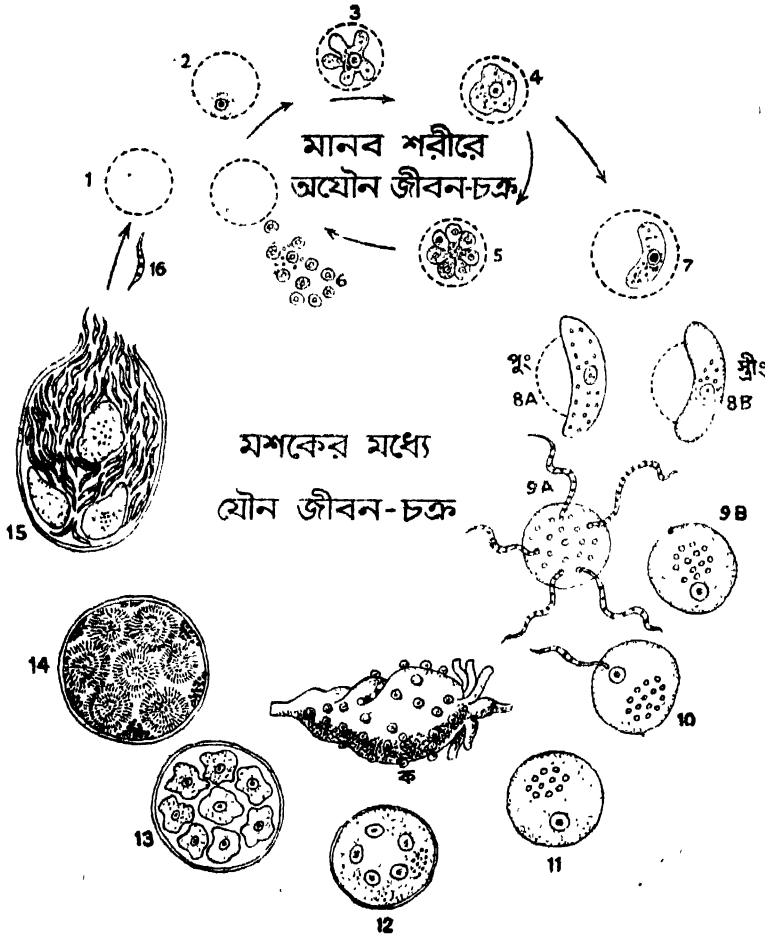
(1) রক্তকণিকা—অন্তঃস্থিত এবং অথবা মশক-দষ্ট অযৌন জননাংশের আক্রমণের অপেক্ষায়; (3/4) জীবাণুর কলেবর বর্ধন, (5) অযৌন জননাংশ বিভাজিত—কণিকা ভেদ করবার জন্য প্রস্তুত, (6) অযৌন জননাংশ (Merozoite), (7) যৌন জননাংশ গঠন—মশকের দ্বারা চোষিত হয়ে পাকস্থলীর মধ্যে, (8A, 8B) পুং ও স্ত্রীঅংশে বিভাজিত, (9A) পুং-জননাংশ, (9B) স্ত্রী-জননাংশ, (10) মিলন, (11) গর্ভাধান, (12/13) অযৌন জননাংশ গঠনের প্রস্তুতি, (14) অযৌন জননাংশ গঠন, (15) মশকের দেহে জননাংশের বিস্তার, (16) মশকের লালা-নিঃসৃত অযৌন জননাংশ রক্তকণিকাকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত।

আগেই বলা হয়েছে অ্যানোফিলিস প্রজাতির মশা ম্যালেরিয়া ছড়ায়। সাধারণত দুই রকম মশা দেখা যায়—অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স। অ্যানোফিলিস মশার ডানায় ছিট্‌ ছিট্‌ দাগ থাকে। এরা যখন দেয়ালে বসে তখন দেহাংশ সরল রেখায়, দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লম্বভাবে থাকে কিউলেক্স দেহাংশ কুব্জভঙ্গীতে থাকে। মশা কামড়াবার অন্ততঃ 10 দিন পরে রোগের লক্ষণ দেখা যায়

সাধারণত ম্যালেরিয়া খুব মারাত্মক রোগ নয়। কেবলমাত্র প্ল্যাজমোডিয়াম ফ্যাল্‌সিপেরাম (Pl. Falciparume) প্রজাতির আক্রমণ হলে মারাত্মক হবার সম্ভাবনা থাকে। একে বলা হয় ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া (malignant malaria)। এতে মস্তিষ্ক ও খাদ্যনালীর প্রদাহ ঘটে এবং প্রবল জ্বর হয় (106°—107°)। এছাড়া আপাতদৃষ্টিতে ম্যালেরিয়া মারাত্মক না হলেও পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে ক্রমান্বয়ে রক্তাল্পতা হতে থাকে এবং শরীর যারপরনাই দুর্বল হয়ে যায়। যকৃত এবং বিশেষ করে প্লীহার আকার অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপে পড়ে বাংলার অসংখ্য বর্ধিষ্ণু গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছিল।

রোগনিরাময়কারী ঔষধ প্রয়োগ এবং মশকবংশ ধ্বংস করে বহু দেশেই ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের কয়েকটি দেশে এর প্রতাপ এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। আমাদের দেশে 60-এর দশকে প্রবল প্রচেষ্টায় এ রোগ খুবই সীমীত হয়ে গেছল। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রচেষ্টার শিথিলতায় এবং গাফিলতির দরুণ আবার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। পূর্বে ম্যালেরিয়া ছিল গ্রামের অসুখ এখন কলকাতার মত শহরেও মহামারীর মত ম্যালেরিয়া দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করবার একাধিক অব্যর্থ ঔষধ আছে। কিন্তু একটা আক্রমণ সেরে যাবার পর যদি নিয়মমত ঔষধ না খাওয়া হয় তাহলে পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য রোগ সারবার পর অত্যন্ত 6 সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে 1 বার করে ম্যালেরিয়ানাশক ঔষধ খাওয়া উচিত (Chloroquin or Camaquin)। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত স্থানে গেলে ঐ নিয়মে ঔষধ খেলে রোগ নিবারণ করা যায়

ম্যালেরিয়া রোগ হলে ঔষধ সেবন এবং পুনরাক্রমণ রোধের ঔষধ সেবন করা অবশ্য প্রয়োজন; তেমনি জীবাণুবাহী মশা বিতাড়িত না হলে ম্যালেরিয়া নিবারণ করা সম্ভব নয়। মশা নিবারণ করতে গৃহাভ্যন্তরে কীটাণুনাশক (ডি. ডি. টি. প্রভৃতি) ঔষধ পিচকারী দ্বারা ছড়ানো উচিত। রাত্রে মশারী ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া মশকদংশন নিবারক মলমের মত এক ধরণের ঔষধ পাওয়া যায় (যথা odomos) সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ছাড়া যেখানে মশার বংশবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা—স্বল্পপরিসর জায়গায় জমে থাকা জল, ডোবা, পুকুরের কিনারা—এগুলিতেও কীটনাশক ঔষধ ছড়ান উচিত। বাস্তবে এই কার্যটি ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। এর একটি প্রধান কারণ হলো মশককুল প্রচলিত কীটনাশকগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলেছে অর্থাৎ ঐগুলির ব্যবহারে আর তারা বিনষ্ট হচ্ছে না। যাই হোক নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা সম্ভব। উপরিউক্ত ক্রিয়াগুলি ছাড়াও বাসস্থানের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর না করে তুলতে পারলে এবং জনগণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হতে পারলে ম্যালেরিয়া বিতাড়ন পুরোপুরি ভাবে সফল হওয়া কঠিন। একদিকে যেমন সরকারের পক্ষে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হবে অপরদিকে সাধারণ মানুষেরও ব্যক্তিগত-ভাবে ম্যালেরিয়া রোধের চেষ্টা রাখা উচিত।

মনুষ্যপ্রকৃতির উৎস সন্ধানে

শ্রীকুমার রায়*

[সত্যি কি বিশাল প্রাণী-জগতে মানুষের সমকক্ষ আর কেউ নেই ? 1863 খ্রীস্টাব্দে টমাস হাক্সলে (Thomas Huxley) তাঁর 'Man's place in Nature' গ্রন্থে এবং 1871 খ্রীস্টাব্দে চার্লস ডারউইন 'Desent of Man' গ্রন্থে তুলনামূলক শারীরস্থান পর্যালোচনা করে প্রমাণ করলেন যে গোরিলা এবং শিম্পাঞ্জীরা আকৃতিগতভাবে মানুষের সমতুল্য। বিংশ শতাব্দীর মানুষ দাবী করতে পারে যে আকৃতিতে তার তুলনা মিললেও প্রকৃতিতে সে প্রাণী-জগতে অদ্বিতীয়। কিন্তু সত্যই কি তাই ? বানরের সঙ্গে কি তার কোন সাদৃশ্যই নেই ? এই প্রবন্ধে প্রাণী-জগতে মানুষের সংস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।]

আকৃতির দিক থেকে নৃতাত্ত্বিকেরা বর্তমান মানুষকে ককেশয়েড (Caucasoid), মঙ্গোলয়েড (Mongoloid) অস্ট্রেলয়েড (Australoid) ইত্যাদি ভাগে ভাগ করলেও পৃথিবীতে আজ যত মানুষ দেখা যায় তাদের সকলের একই বৈজ্ঞানিক নাম—হোমো সেপিয়ন্স (Homo Sapiens)। ল্যাটিন ভাষায় হোমিনিস কথার অর্থ মানুষ এবং সেপিয়ন্স অর্থে জ্ঞানী, হোমো সেপিয়ন্স অর্থাৎ জ্ঞানী মানুষ। এরা প্রায় দশ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীতে আছে। হোমো সেপিয়ন্সের আদিপুরুষ হোমো ইরেকটাস (H. Erectus) যাদের জীবাশ্ম জাভা, পিকিং প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া গেছে এবং ইরেকটাসদের আকৃতিই ক্রমে পরিমার্জিত হতে হতে পর পর সোয়ান্সকোম্ব (Swanscomb) মানুষ, শানিদার (Shanidar) বা স্খুল (Skhul) মানুষ, ক্রোম্যাগনন (Cromagnon) এবং অবশেষে বর্তমান আকৃতির মানুষের আবির্ভাব। কিন্তু মানুষের উৎস কী ?

1863 খ্রীস্টাব্দে হাক্সলে (Thomas Huxley) এবং 1871 খ্রীস্টাব্দে ডারউইন (Charles Darwin) যথাক্রমে "Man's Place in Nature" এবং "Descent of Man" গ্রন্থে নানা রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, মানুষের আকৃতি বিশালাকৃতি মহাকপির (যথা গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-উটাং) উদ্বর্তিত রূপ। প্রাণীবিদরাও শ্রেণী-বিন্যাসে মানুষকে বানরবর্গে (Order—Primate) বিন্যস্ত করলেন। কিন্তু নর ও বানরের সম্পর্ক আমরা মেনে নিতে বাধ্য হলেও কথাটা আমাদের আদৌ মনঃপূত হয় নি, কারণ আমরা মনুষ্য প্রজাতির বুদ্ধি এবং সংস্কৃতির অভিনবত্বে গর্বান্ধ। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বানর বর্গের 193 রকম প্রজাতির মধ্যে একমাত্র মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন 1500 সি. সি.র উর্ধ্বে এবং প্রাণী-জগতে মানুষের তুল্য সংস্কৃতিও দুর্লভ তবু আমাদের প্রকৃতিরও অনেক কিছুরই বানরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

আকৃতির বিবর্তনের মত প্রকৃতির বিবর্তনও জঙ্গম এবং এর ধারা বহে চলে একই দিকে, উত্তরণের পথে। কোন প্রাণীর ব্যক্তিগত বা প্রজাতিগত

* বি. এফ. 118, সল্ট লেক সিটি ; কলিকাতা-700064

আচরণের উৎস অনুসন্ধান শুরু করার আগে নতুন প্রজাতি কি করে সৃষ্টি হয়, জানা প্রয়োজন। আমরা উদাহরণ হিসাবে সাদা বাঘের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি।

বাঘ বাংলাদেশের নিজস্ব প্রাণী। তার গাত্রবর্ণ যে হলুদে অন্তত বাঙালী পাঠককে তা বলা বাহুল্য। আকৃতি বা প্রকৃতিতে সাধারণ বাঘের সঙ্গে সাদা বাঘের এত সাদৃশ্য আছে যে, এদের মনে হয় প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু সাদা বাঘকে কেবল প্রকৃতির খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলেই চলবে না। সাধারণ বাঘের শুক্রকীট (sperm) বা বাঘিনীর ডিম্বকোষ (ovum)-এর কোন এক জীন (gene)-এর মিউটেশান (mutation) বা পরিব্যক্তির ফলে কোন এক ব্যাঘ্রদম্পতির একদা এক সাদা রঙের শাবক জন্মেছিল। শাবকটি বেঁচে রইল এবং 1951 সালের মে মাসে রেওয়ার জঙ্গলে বন্দী করে তাকে চিড়িয়াখানায় আনা হল। তার নাম রাখা হল 'মোহন'। তারপর বয়সকালে প্রথমে স্বগোষ্ঠীর 'বেগম' নামে হলুদে বাঘিনী এবং পরে স্ববংশের হলুদ বর্ণের 'রাধা' (কন্যা) ও শ্বেতবর্ণা 'সুকেশী' (পৌত্রী) নামে সাদা বাঘিনীর সঙ্গে তাকে মিলনে বাধ্য করা হল। এইভাবে অন্তর্মিলন (inbreeding) ঘটাতে ঘটাতে মোহনের নিজস্ব এক বংশ সৃষ্টি হল। মেণ্ডেলের (Mendel) বংশগতি সূত্র অনুযায়ী তার যে সব বংশধরের মধ্যে ওই পরিব্যক্তিত জীন-এর সাদা সুপ্তগুণ (recessive character) বর্তালো তারই রঙ হল সাদা।

আমরা এখন মোহন ও তার বংশধরদের সম্বন্ধে সম্ভাবনার কথা ভাবতে পারি। কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় হলুদে রঙের ব্যাঘ্র গোষ্ঠীতে কিছু সাদা বাঘ দেখা গেল। কিন্তু এখনও সাদা বাঘের দল রঙ বিচার না করেই প্রজননের জন্য দার পরিগ্রহণ করছে। সুতরাং জীব-বিজ্ঞানীর কাছে এখনও তারা "প্যান্থেরা টাইগ্রিস" (Panthera Tigris) প্রজাতির প্রাণী, কোন স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়, কারণ তাঁরা বলেন—প্রজাতি একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যারা নিজেদের মধ্যে মিলনে এবং প্রজননে সক্ষম এবং অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে প্রজননিক দৃষ্টিকোণ বিচ্ছিন্ন।" (অবশ্যই প্রাণীদের প্রজনন ব্যাপারটা মানুষের হস্তক্ষেপ এবং সুযোগের উপর নির্ভরশীল।) ভবিষ্যতে অবশ্য একটা সম্ভাবনা থাকবে যে ক্রমশ তারা সাদা বাঘের মধ্য থেকেই প্রজননার্থে সঙ্গী বাছা পছন্দ করবে এবং বহু বহু বছর পরে হয়তো হলুদে বাঘের সঙ্গে তাদের মিলন অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। তখন অবশ্য তাদের এক বিশেষ প্রজাতি বলা চলবে। ডি-ভ্রাইসের (de-Vries) মতবাদ তাই। অবশ্য আমরা যে সাদা বাঘের কথা আলোচনা করলাম তা মনুষ্যকৃত কৃত্রিম নির্বাচনের (artificial selection) একটি উদাহরণ। প্রাণী-জগতে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) প্রক্রিয়ায়।

আবার এমন হতে পারত যে "মোহন প্রজননক্ষম বয়েসে পৌঁছবার আগেই মারা গেল। সে সম্ভবনাও ছিল প্রচুর। প্রথমতঃ নিজের গোষ্ঠীতে সে ছিল অদ্ভুত আগন্তুক। সুতরাং তার আশপাশের হলুদে বাঘেরা তাকে সুনজরে নাও দেখতে পারত। দ্বিতীয়তঃ সাদা রঙ মোহনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপন্থী হতে পারত। অর্থাৎ, রেওয়ার জঙ্গলে না জন্মে যদি সে আফ্রিকায় জন্মাত? সেখানে বিষুবীয় সূর্য মারাত্মকভাবে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) বিকিরণ করছে যা মেলানিন রঙ (melanin pigment) বিহীন গাত্রচর্ম প্রতিরোধ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে তার বা তার সাদা বংশধরদের বাঁচাই হত মুশ্‌কিল্‌। পক্ষান্তরে, যদি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বদলে যেত, যদি কোন কারণে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে না পৌঁছত, তবে সাদা গাত্রচর্ম তার হলুদে জাতভাই-এর চেয়ে তাকে অনেক বেশী বাঁচার সুযোগ করে দিত। তখন

হয়ত পৃথিবী জুড়ে সাদা বাঘই দেখা যেত আর আমাদের “রয়াল বেঙ্গল টাইগার” হয়ে যেত ব্যতিক্রম মাত্র। এই যে অভিযোজন প্রক্রিয়া (adaptation), এটাই ক্রমবিবর্তনের একটা মস্ত বড় কথা।

হল্দে বাঘের সঙ্গে সাদা বাঘের সাদৃশ্য দেখে এবং মোহনের যে বংশতালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে এ রকম অনুমান খুব ভুল না-ও হতে পারে। কিন্তু মানুষের উৎস অনুসন্ধান তত সহজ নয়। প্রথমতঃ জীব জগতের বৃহত্তর চিড়িয়াখানায় আকৃতি বা বুদ্ধিতে তার সঙ্গে অন্য কোন প্রাণীর বড় একটা মিল নেই। আকৃতির দিক থেকে নরের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় বানর বর্গের বিশালাকৃতি মহাকপিদের (যথা গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং) সঙ্গে। তবু সাদা এবং হল্দে বাঘের মধ্যে যত না পার্থক্য, নর ও বানরের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়ে অনেক বেশী। বানর লোমশ এবং তারা একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না অথচ মানুষের গাত্রচর্ম প্রায় নির্লোমই বলা চলে এবং তারা সোজা দাঁড়ায়। এই দুটি সুপ্রকট পার্থক্য ছাড়াও ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে নর ও বানরের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য আছে। বানরের ভ্রূর অস্থি (super cilliary ridge) অনেক বেশী উঁচু; কপাল মানুষের মত গোল নয়, চ্যাপ্টা; হনু বলা; ওষ্ঠ অন্তর্মুখী;
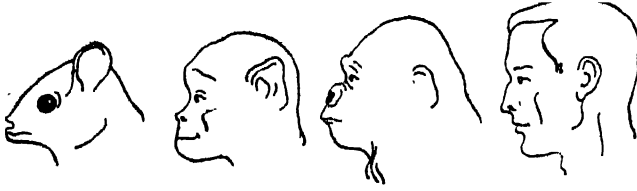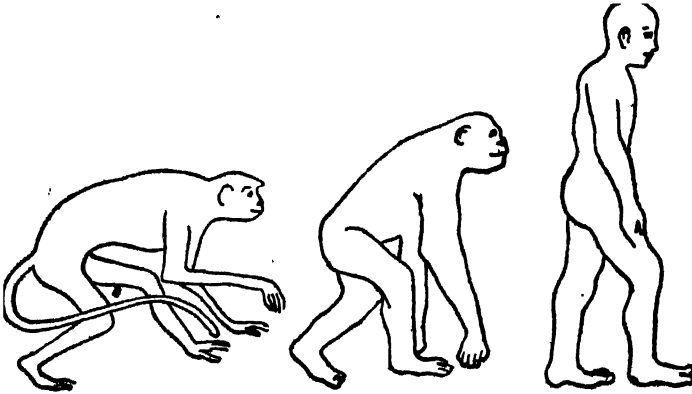
চিত্র (ক)

চিত্র (খ)

চিত্র (ক)—বানরবর্গের প্রাণীদের মুখমণ্ডল। বাম থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে লেমুর, দেশী বানর, গোরিলা এবং মানুষের মুখ। চোখের সম্মুখ সরণ (forward shifting) নাসিকা, কর্ণ, অধরওষ্ঠ এবং চিবুকের ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয়।

চিত্র (খ)—বানর বর্গের প্রাণীদের গতিভঙ্গী। বামে—বানর, মধ্যে গোরিলা বা শিম্পাঞ্জী এবং দক্ষিণে মানুষ। লক্ষণীয়—মানুষ ব্যতীত আর কেউই হস্তদ্বয় সম্পূর্ণ মুক্ত করে দাঁড়াতে পারে না।

বক্র, বড়। বানরের শরীরের তুলনায় হাত লম্বা। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গঠন এমন যে ওরা মানুষের মত। কোন জিনিষ কুড়িয়ে নিতে বা মুঠি করে ধরতে পারে না। বানরের পদতলও সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপযুক্ত নয়, গাছের ডাল ধরার পক্ষেই বেশী উপযোগী, তাই ওরা কখনও কখনও দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটলেও ওদের চলন মানুষের মত নয়।

মানুষের উৎস অনুসন্ধানে দ্বিতীয় অন্তরায় হল মানুষ নিজে, কেননা মানুষ নিজেই নিজের উৎসের গবেষণা করছে। বানরের আকৃতির বিশেষ করে প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য খোঁজা "জ্ঞানী মানুষের" পছন্দ নাও হতে পারে। অন্তত অহেতুক দম্ভের জন্য তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে সাদা বাঘের ক্ষেত্রে আমরা যত সহজে তার ব্যাঘ্রত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলাম, নরের বানরত্ব সম্বন্ধে অত সহজে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে জীব-বিজ্ঞানীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

হাক্সলে, ডারউইনের পর নানা পরস্পরবিরোধী মত প্রকাশিত হলেও আজও জীব জগতের শ্রেণী-বিন্যাসে নর ও বানরকে অতি নিকট আত্মীয় বলে গণ্য করা হয়। শ্রেণী-বিন্যাস করার সময় বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেন। বর্ত্তমানে শ্রেণী-বিন্যাসের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা লিনিয়াস (Linneus) পদ্ধতি নামে খ্যাত। শ্রেণী-বিন্যাসের একক হল প্রজাতি, যার ধারণা পূর্বে দেওয়া হয়েছে। আশপাশে বা চিড়িয়াখানায় আমরা যে সব প্রাণী দেখি সকলেই এক একটি বিশেষ প্রজাতির। তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কয়েকটা প্রাণীর আকৃতিতে বেশ কিছু সাদৃশ্য রয়েছে যেমন নেকড়ে ও আলসেসিয়ান কুকুর অথবা বাঘ ও বিড়ালের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঘ আর বিড়ালের সাদৃশ্য দেখে তাদের উভয়কেই "ফেলিস" (Felis) গণীয় প্রাণী বলতেন। অবশ্য দু-জনার মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখে তাদের বিভিন্ন প্রজাতির, যথা বাঘকে 'টাইগ্রিস' (Tigris) এবং বিড়ালকে ডোমেসটিকাস (Domesticus), প্রাণী বলা হয়। এই ভাবে 'লিনিয়াস পদ্ধতি'তে প্রাণীদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলনা করে কয়েকটি প্রজাতি নিয়ে একটি গণ (Genus), কয়েকটি গণ নিয়ে একটি গোত্র (Family), গোত্র মিলিয়ে বর্গ (Order), বর্গের সমন্বয়ে শ্রেণী (Class) এবং কয়েকটি শ্রেণী মিলিয়ে এক একটি পর্বে (Phylum) বিন্যাস করলেন। সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য তুলনা করে জীববিজ্ঞানীরা বলেন নর ও বিশালাকৃতি মহাকপিরা এক প্রজাতি তো নয়ই, এমনকি তারা সমগণীয় বা সমগোত্রীয় নয়। তবে তারা উভয়েই বানর বর্গীয়।

সাধারণভাবে শ্রেণী-বিন্যাসে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও কোন প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস সর্বকালের জন্যে স্থির হতে পারে না। যেমন আগেই বলা হয়েছে বাঘকে এক সময় বলা হত "ফেলিস" গণীয় কিন্তু এখন বলা হয় "প্যান্থেরা" গণীয়। পণ্ডিতেরা যে প্রায়ই প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্তন করেন তার প্রধানত দুটি কারণ। প্রথমতঃ, মাঝে মাঝে প্রাণীদের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে যা পূর্বে জানা যায় নি এবং দ্বিতীয়তঃ, যদি নতুন কোন প্রাণী আবিষ্কার হয়। প্রসঙ্গত "গজক্ষয় অথবা মূষিক বৃদ্ধি" গল্পটা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক। রাজসভার পণ্ডিত আগে কখনও শূকর দেখেন নি। তাই রাজার কাছে তার বর্ণনায় বলেছিলেন, "প্রাণীটি হয় গজক্ষয় অথবা মূষিক বৃদ্ধি"। প্রথম দর্শনেই পণ্ডিত স্থির করে ফেললেন যে শূকর গজের সমগণীয় হতে পারে অথবা মূষিকের সমগণীয়ও হতে পারে। অবশ্য পণ্ডিত মহাশয় শূকরটির আকৃতি এবং প্রকৃতি বেশ কিছুদিন অনুধাবনের পর নিশ্চয়ই মত পরিবর্তন করেছিলেন।

মানুষের শ্রেণী-বিন্যাস আরও দুরূহ ব্যাপার। কারণ গল্পের পণ্ডিত শূকরজাতীয় একটিমাত্র

প্রাণী দেখেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন জীবাশ্ম আবিষ্কার হচ্ছে এবং পণ্ডিত সমাজ নর ও বানরের সম্পর্ক গুলিয়ে ফেলছেন। ডুবয় (Dubois) 1890 খ্রীস্টাব্দে জাভায় যে জীবাশ্ম পেয়েছিলেন, তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ তার নাম রাখলেন "পিথেক্যানথ্রোপাস—ইরেকটাস" (Pithecanthropus Erectus)। পিথেকাস (Pithecus) অর্থে বানর, অ্যানথ্রোপাস (anthropus) অর্থে নর এবং ইরেকটাস (Erectus) মানে দণ্ডায়মান। এই তিনটি শব্দের সন্ধি করে পণ্ডিতেরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটা এমন একটি প্রাণীর জীবাশ্ম যে মূলতঃ বানর কিন্তু প্রায় নরের মত সে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু কয়েক বছর পরেই রেমণ্ড ডার্ট (Raymond Dart) 1924 খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার তোং (Taung) উপত্যকায় যখন অস্ট্রেলোপিথেকাস (Austrelopithecus)-এর জীবাশ্ম আবিষ্কার করলেন এবং তার করোটিতে ফোরামেন ম্যাগনাম (Foramen Magnum)-এর অবস্থান থেকে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করলেন যে এরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত। তখন বোঝা গেল যে, বিবর্তনের সিঁড়িতে বানরের বানরত্ব সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে সে মানুষ হবার পথে পাড়ি জমিয়েছে। তাই পণ্ডিতেরা পিথেক্যানথ্রোপাসের নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করলেন "হোমো ইরেকটাস" (Homo Erectus)। তবু আজও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে "অস্ট্রেলোপিথেকাস"রা কতটা "মানুষ ক্ষয়" আর কতটা "বানর বৃদ্ধি"।

[যেহেতু মানুষের উৎস অনুসন্ধানে আমাদের যাত্রা, আমরা মানুষেরই শ্রেণী-বিন্যাস বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছি। বিষয় সংক্ষেপের জন্য অন্য প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস বিস্তারিতভাবে দেখান হয় নি। তালিকার বাম থেকে দক্ষিণে প্রাণীদের ক্রমোন্নতি দেখানো হয়েছে। যে সব জাতীয় প্রাণীর উদাহরণ দেওয়া হয় নি তারা হয় অবলুপ্ত নয় দুর্লভ। তারকাচিহ্নিত প্রাণী গোষ্ঠীগুলি বিষয় সংক্ষেপের জন্য আমি ব্যবহার করেছি।]

হাইড্রোজেনের তিন আকার

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

এখন যে প্রশ্নটি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেটি হলো এই যে হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। সাম্প্রতিককালে কলকাতায় যে বিজ্ঞান কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো তাতেও সেই একই প্রশ্ন। [হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের সম্ভাব্যতা কতটুকু তা নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে।]

তেল রপ্তানীকারী দেশগুলি তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। তাছাড়া তেলের মজুত ভাণ্ডারও অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে যদি তেলের ব্যবহার বর্তমানে যে ভাবে চলছে তাই অক্ষুন্ন থাকে আর নতুন সূত্র খুঁজে না পাওয়া যায়। হাইড্রোজেনকে তার পরিবর্তে কতটা ব্যবহার করা যেতে পারে তাই বর্তমানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাইড্রোজেনকে তিন আকারেই পাওয়া যায়। কঠিন, তরল এবং গ্যাস—সকল আকারেই হাইড্রোজেনের ব্যবহার আছে। যদিও গ্যাস আকারে এবং তরল আকারেই হাইড্রোজেনের অবস্থিতি সুবেদীয়, কঠিন আকারেও বর্তমানে হাইড্রোজেনকে পাওয়া গিয়েছে এবং তার ব্যবহারও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

তরল এবং কঠিন আকারের হাইড্রোজেন এখন জ্বালানি হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাইড্রোজেন স্বাভাবিক তাপে এবং চাপে গ্যাস আকারেই থাকে। কিন্তু নিম্ন তাপাংকে চাপের সাহায্যে একে তরলে রূপান্তরিত করা যায়। আর উচ্চচাপের বলে একে কঠিন আকারেও নিয়ে আসা সম্ভব। সকল মৌলের তুলনায় হাইড্রোজেন খুব হালকা।

তরল হাইড্রোজেনের ব্যবহার—আধুনিক কালে তরল হাইড্রোজেনকে বিমানে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সুপারিশ করেছেন। বিমানের জন্যে এতকাল পেট্রোলিয়াম অথবা পেট্রোলিয়াম থেকে লব্ধ জ্বালানিকেই ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা পেট্রোলিয়াম সূত্র থেকে তরল হাইড্রোজেনের দিকে সরে যাচ্ছেন।

তরল হাইড্রোজেনকে পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানির বদলে ব্যবহারের পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীদের কতকগুলি যুক্তিও আছে। তারা প্রথমতঃ ভাবছেন হাইড্রোজেন জ্বালানি ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষিত হতে পারবে না। অন্য জ্বালানির ব্যবহার থেকে পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় কারণটি হলো হাইড্রোকার্বন জ্বালানির (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ) তুলনায় হাইড্রোজেন জ্বালানি আরও বেশী শক্তিশালী। হাইড্রোজেনের এনার্জি কনটেন্ট (per unit weight) হাইড্রোকার্বনদের থেকে প্রায় তিনগুন বেশী (Science Today, P-56, February, 1980)।

হাইড্রোজেনের ব্যবহার নিয়েও নানা মত আছে। কেউ কেউ এর ব্যবহারকে সমর্থন করছেন আর কেউ কেউ তা সমর্থন করতে পারছেন না। অনেকেই মনে করেন হাইড্রোজেনের ব্যবহার থেকে দুর্ঘটনা পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 1920 এবং 1930 সালের হাইড্রোজেন থেকে ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনার ইতিহাসই এখন সেই সব ব্যক্তিদের কাছে (যাঁরা হাইড্রোজেনের ব্যবহার সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন) বড় যুক্তি। আবার কেউ কেউ মনে করছেন হাইড্রোজেন সকল মৌলের মধ্যে সবচেয়ে

পোঃ আগরপাড়া, নর্থ ষ্টেশন রোড, 24-পরগণা

হাল্কা বলে পোড়ালে উপরদিকেই এর শিখা বিস্তারিত হবে আর বিমানের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা কমই থাকবে। হাইড্রোজেন জ্বালানি অনায়াসে বাষ্পে পরিণত হতে পারছে কারণ এর স্ফুটনাংক কম। আর যে তাপ বিকিরণ হচ্ছে তাও কেরোসিনের তুলনায় বহুলাংশে কম (প্রায় এক-দশমাংশ)।

কঠিন হাইড্রোজেন—গ্যাস বা তরল আকারে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি জানা থাকলেও, হাইড্রোজেনকে যে কঠিন অবস্থাতেও পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে ইদানীংকাল পর্যন্ত সবিশেষ কোন প্রমাণ ছিল না। ওয়াশিংটনের দুই বিজ্ঞানী, পি. এম. বেল (P. M. Bell) এবং হো-কোয়াং মাও (Ho-Kwang Mao) উচ্চচাপ (57 Kilobar) প্রয়োগ করে কঠিন হাইড্রোজেন উৎপন্ন করেন।

সাধারণ তাপাঙ্কে এটিকে দেখতে সাদা, অনেকটা বরফের মত। এই আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন মেটালিক হাইড্রোজেন তৈরির পক্ষে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ (*Science Reporter*, P. 490, July, 1979)। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন মেটালিক হাইড্রোজেন হবে একটি সুপার কণ্ডাকটার। বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবহনে এবং সংরক্ষণে এটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। শক্তির অপচয় বন্ধে এটিকে কার্যকরী করে তোলা সম্ভবপর হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা কঠিন হাইড্রোজেনকে রকেট জ্বালানির একটি বিশেষ উপাদান বলে মনে করছেন। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটি ধর্মও দেখেছেন। উচ্চচাপে কঠিন হাইড্রোজেনের রংও পালটায়। একটু ঈষৎ হলুদ রংয়ে পরিণত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। রিফ্রেকটিভ ইনডেক্সও চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়ে [চাপের বৃদ্ধির সঙ্গে আলোকে বাকিয়ে দেবার ক্ষমতাও এর বেড়ে চলে]। বিজ্ঞানীদের এই পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতের অনেক অনুসন্ধিৎসার খোরাক জোগাবে।

হাইড্রোজেন প্রস্তুতি—হাইড্রোজেন বিভিন্ন উপাদান থেকে প্রস্তুত করা গেলেও এখন পর্যন্ত জল আর কয়লাই তার দুই প্রধান সূত্র। জলকে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করে হাইড্রাজেন মিলে। এটিই চলিত প্রথা। পারমাণবিক গবেষণায় উন্নতির সঙ্গে বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশও সম্ভব এবং এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে জলের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণে কাজে লাগানোও যাবে। কয়লা থেকেও হাইড্রোজেন পাওয়ার যে পদ্ধতি বর্তমান তাও কঠিন আর ষ্টীমের বিক্রিয়ার উপরই নির্ভরশীল।

সাম্প্রতিককালে এই দুটি বিক্রিয়ার বিশদ পরীক্ষাও (Nature 279, P. 301, 1979) হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন ইলেকট্রো-কেমিক্যাল গ্যাসিফিকেশন পদ্ধতির প্রয়োগও লাভজনক। জলের বেলাতেও তাঁরা দেখেছেন বৈদ্যুতিক শক্তি চলতি প্রথায় যা লাগতো (56·7 K cal / mol), নতুন পদ্ধতিতে (electro-chemical gasification process) তা অনেক কম। মাত্র 9·5 K cal/ mol। আবার ড্রাইভিং পটেনশিয়্যালও (driving potential) 1·23v থেকে নেমে 0 21v-তে দাঁড়ায়।

নতুন পদ্ধতিতে কয়লা থেকেও হাইড্রোজেন মিলছে। সাধারণতঃ লিগ্‌নাইট (lignite) বা চার্‌ই (char) ব্যবহার করা হয়। অ্যানোডিক অক্সিডেশনে (anodic oxidation) হাইড্রোজেন ক্যাথোডে সংগৃহীত হয় আর কার্বনডাই-অক্সাইড ও কার্বন-মনোক্সাইডের মিশ্রণটি অ্যানোডে সংগৃহীত হয়ে থাকে। অ্যাকটিভ কার্বন, ডায়মণ্ড আর গ্র্যাফাইটের উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সারফেস এরিয়া (surface-area) বাড়লে, পারটিক্যাল সাইজ (particle size) কমলে আর চারের (char) গ্র্যাফাইট (graphite) ধর্ম বেড়ে গেলেই এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন উৎপাদন সবিশেষ লাভজনক। পুরোপুরী বিশুদ্ধ কার্বন ব্যবহার করলে কিছু কিছু বাইপ্রডাক্টও মিলে। কাজেই কয়লার সব ভেরাইটিকেই ব্যবহার না করা ভাল।

উপসংহার—যদিও হাইড্রোজেন তৈরী নানা পদ্ধতিতেই সম্ভব (যেমন water gas process, steam-ion process), জলই যে তাদের প্রধান উপাদান তাতে সন্দেহ নেই। বাই-প্রডাক্ট হিসেবেও হাইড্রোজেনকে বাণিজ্যিক আকারে পাওয়া যেতে পারে। নুনের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ থেকে কস্টিক সোডা আর ক্লোরিনের উৎপাদনের সঙ্গে হাইড্রোজেনকে পাওয়া যায়। যদিও বিভিন্ন পদ্ধতি বর্তমান, খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে কয়লা আর জলই ভাল সূত্র। সুতরাং নতুন পদ্ধতিতে এই সব সূত্র থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করাই শ্রেয় হবে। জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের ব্যবহার কতটা যুক্তিযুক্ত হবে, তার কত ভাবে উন্নতি করা সম্ভব হবে (দামের দিক দিয়ে, চাহিদার দিক দিয়ে) তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যেও electro-chemical gasification পদ্ধতির প্রয়োগই হবে উত্তম। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের বর্তমান যে সংকট তা বিবেচনা করে নতুন সূত্রের দিকে এখন থেকেই লক্ষ্য রাখলে ভবিষ্যতে বিপদের আশংকা কম হবে। বর্তমান হারে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের ব্যবহার চললে আর পেট্রোলিয়ামের নতুন সূত্র আবিষ্কার না হলে যা মজুত ভাণ্ডার আছে তা নিঃশেষ হতে ত্রিশ বছরের বেশী লাগবে না। অবশ্য কয়লার ব্যাপারেও একই কথা। কয়লার যে মজুত ভাণ্ডার তাও প্রায় নিঃশেষের পথে। সুতরাং একমাত্র জলই ভরসা। এমতাবস্থায় হাইড্রোজেনের জন্যে আরও নতুন সূত্র খুঁজে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

মৎস্য-বিহার

অতসি সেন*

পাখীদের মত মাছেরাও পরিযান-বৃত্তিতে সমান পারদর্শী। বিজ্ঞানী হিপোর মতে এ জাতীয় ভ্রমণকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায় খাদ্যান্বেষণে, উন্নত পরিবেশ সন্ধানে আর সন্তান প্রসবক্ষণে। অপরদিকে ভ্রমণকারী মাছেদেরও আবার তেমনি চার ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একদলে আছে, যারা শুধু লোনাজলেই পরিভ্রমণ করে—যেমন প্লেস, কড ইত্যাদি, আর দ্বিতীয় দলে হেরিং প্রভৃতি, যারা মিষ্টি জলেই তাদের জীবন অতিবাহিত করে। এদের মধ্যেও অনেকে অবশ্য ডিম পাড়তে গভীর জল থেকে তীরের দিকে আসে, ভেসে ওঠে জলের ওপরে. আর অন্যেরা তীরের কাছে কি অগভীর জলে বাস করলেও, গভীর জলে যায় ডিম পাড়তে। ম্যাকারেলরা শরৎকালে সমুদ্রের তলায় নামতে থাকে, শীতকালটা কাটায় চল্লিশ থেকে একশো ফ্যাদম (72 থেকে 180 মিটার) জলের নীচে, বসন্তকাল হলেই আবার তারা ওপরে উঠতে থাকে। মিষ্টিজলের ট্রাউটরা শরৎকালে হ্রদের দল ছেড়ে স্রোতস্বিনী নদীবক্ষে প্রবেশ করে এবং সাঁতরাতে সাঁতরাতে উজানে বহুদূর চলে যায়। এ জাতীয় বিহার দূরত্বের মাপকাঠিতে বিশাল হলেও এক বিশেষ পরিবেশ-গণ্ডীতেই এটি সীমাবদ্ধ থাকে হেরিং মাছেরা উপকূলবর্তী কম লবণাক্ত এবং শীতল জলে বাস করে বলে, প্রত্যেক বছর উত্তপ্ত আর অধিক লবণাক্ত উপসাগরীয় স্রোত (গালফ স্ট্রীম) আসার আগেই তারা গভীর জলে ডুব মারে আর স্রোতের ধারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আর তারা ভেসে ওঠে না। সার্ডিং মাছেরা উত্তপ্ত ও লবণাক্ত জলে বাস করতে পছন্দ করে বলে, ঋতুভ্রমণটি হয় ঠিক এর বিপরীত। গ্রীষ্মের গোড়ায় ডিম পাড়তে পর্তুগালের তীর কি বিস্কে উপসাগর থেকে যাত্রা করে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে অনেক সময় উত্তর সাগর পর্যন্ত চলে যায়, তারপর একপাক ঘুরে আবার যথাস্থানে ফিরে আসে। কড মাছেরা ডিম পাড়ে উত্তর পশ্চিম আটলান্টিকের এক বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক যেখানটায় উত্তরের শীতল আর কম লবণাক্ত জলরাশি দক্ষিণের উত্তপ্ত আর অধিক লবণাক্ত উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে মিশেছে।

তবে সত্যি সত্যি দর্শনীয় ভ্রমণ বলতে গেলে তৃতীয় আর চতুর্থ দলকেই বলতে হয়। যারা জন্মায় এক রাজত্বে আর জীবন কাটায় অন্য রাজ্যে। স্মেল্ট, স্যামনেরা (মহাশোল) সমুদ্রের লোনাজলে জীবন যাপন করলেও ডিম পাড়তে ভেসে আসে নদীর মিষ্টি জলে, আর ঈল মাছেরা (সামুদ্রিক বান) নদীর মিষ্টিজল ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি জমায় সেই একই কারণে।

স্যামনেরা সমুদ্রে বাস করে বলে, নদীতে ঢোকার পর থেকেই তারা আর কিছুই খেতে পারে না। সেইজন্যেই যতদিন তারা নদীতে থাকে (একবছরও হতে পারে) ততদিন তাদের নিজেদের দেহের সঞ্চিত চর্বি হজম করেই জীবনধারণ করতে হয় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী বিরাট বিরাট নদীতে অগভীর পাথুরে জমিতে গর্ত করে তারা ডিম পাড়ে। কখনও কখনও তাদের হাজার দু-হাজার মাইল পথও সাঁতরে যেতে হয় বলে, শেষ পর্যন্ত তারা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, ডিম পাড়া সাজ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকেই মারা পড়ে। অন্যদিকে ইওরোপীয় স্যামনদের এতটা পথ পরিক্রমা করতে হয় না বলে, শীতটা নদীতে কাটিয়ে বসন্তের গোড়াতেই আবার তারা সমুদ্র যাত্রা করে। ডিম ফুটে বাচ্চারা ছয় থেকে আঠারো মাস পর্যন্ত জন্ম

*সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরি, 3, কিড স্ট্রীট, কলিকাতা-700016

স্থানেই বেড়ে ওঠে, তারপর তারাও সাগর অভিমুখে যাত্রা করে, বিজয়া দশমীর পর থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত আমরা যে কারণে ইলিশ মাছ খাই না। সেই একই কারণে বৃটেনেও সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জাল দিয়ে স্যামন ধরা আইনতঃ নিষিদ্ধ। সমুদ্রে স্যামনেরা দুই থেকে ছয় বছর পর্যন্ত জীবন যাপন করে, কেউ কেউ ওজনে কিলো দশেক পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায়, তারপর সুরু হয় তাদের সাগর থেকে ফেরা।

এক অদ্ভুত দিগ্‌দর্শন বলে তারা সঠিক পথের হদিশ পায়। ঘণ্টায় পয়তাল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত তারা সাঁতরাতে পারে, আর বাধা পেলে উচ্চতায় তিন মিটার আর আড়ে পাঁচ মিটার পর্যন্ত লাফাতেও পারে। সেইজন্যেই জুলিয়াস সীজারের সৈন্যেরা এদের নাম দিয়েছিল "স্যামো", লাতিন ভাষায় যার অর্থ "লাফানো"।

চতুর্থ আর শেষ দলের উল্লেখযোগ্য মাছ হল ঈল। বারমুডা আর বাহামা বেষ্টিত আটলান্টিকের শান্ত সারগাসো সাগরের উষ্ণ আর অধিক লবণাক্ত জলে, জলজ উদ্ভিদের রাজত্বে তারা ডিম পাড়ে। নবজাতকেরা জন্মমুহূর্তে লম্বায় মাত্র ছয় কি সাত মিলিমিটার হয় আর গ্রীষ্মের শেষে পঁচিশ মিলি-মিটার হতে না হতেই তারা তাদের সমুদ্রযাত্রা শুরু করে। পশ্চিমপাড়ের মাছগুলি যায় পূর্ব আমেরিকার দিকে আর পূর্বাঞ্চলের গুলি যায় পশ্চিম ইওরোপের দিকে। আমেরিকার ঈলগুলিকে মাত্র একহাজার মাইল পথ পার হতে হয় বলে তারা এক বছরের মধ্যেই নদীমুখে পৌছে যায়। অপর দিকে ইওরোপীয় মাছগুলির পথের দুরত্ব তিন হাজার মাইল কি তারও বেশী হওয়ায় সেগুলির লেগে যায় বছর তিনেক। আমেরিকার ঈলগুলির নদীমুখে পৌছতে ইওরোপীয়দের চেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ কম সময় লাগে বলে তাদের বাড় ইওরোপীয়দের চেয়ে তিনগুণ বেশী হয়। যাতে উভয় ক্ষেত্রেই নদীমুখে প্রবেশকালে তারা আকারে প্রায় সমান হয়।

পুরুষেরা নদীমুখেই বসবাস করতে রয়ে গেলেও, মেয়েরা সাঁতরে চলে উজান পথে। কুয়াশায় ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে হড়কাতে হড়কাতে এক নদী থেকে অন্য নদীতে এবং সেখান থেকে পুকুর কি ডোবাতেও গিয়ে পৌছয়। কান্‌কোতে ধরে রাখা ভিজে কাদা আর জলকণাগুলিই তাদের অন্যান্য মাছেদের চেয়ে বেশীক্ষণ জলের বাইরে বাঁচিয়ে রাখে। এভাবে অনেক সময় তারা আধ মাইল পথও অতিক্রম করে থাকে। পুকুর কি ডোবাতেই তারা বড় হতে থাকে। কেউ কেউ লম্বায় দেড় মিটার পর্যন্ত হয়, ওজনে হয় কিলো ছয়েক। এমনিভাবে সাত থেকে পনেরো কুড়ি বছর কাটাবার পর, কি এক অজানা আকর্ষণে আবার তারা সমুদ্রে ফিরে চলে। প্রত্যাবর্তনের পথে তারা ঘণ্টায় আধমাইল গতিতে অবিরাম সাঁতরাতে থাকে, এমনকি খাবার সময়টুকুও পায় না। দেহস্থ দিগ্‌যন্ত্রের নির্ভুল নিশানায় এইভাবে তারা তিন বছরের পথ ছয়মাসে পার হয়ে জন্মস্থানে গিয়ে পৌছয়। ডিম পাড়ে আর মারা যায়।

অধিকাংশ মাছেদের ক্ষেত্রেই জন্মের পর বিচরণ ক্ষেত্রে যাত্রা আর ডিম পাড়তে জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন, জীবনে মাত্র একবারই হয়। টুনিই এর বিশিষ্টতম ব্যতিক্রম। ভূমধ্যসাগরের উষ্ণজলে ডিম পেড়েই সে ফিরে যায় হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে কি উত্তর সাগরে আবার এক বছর পরে ডিম পাড়তে ফিরে আসে ভূমধ্যসাগরে। জন্মের পর থেকেই সে অবিরাম সাঁতরে চলে, মৃত্যুর আগে অবধি থামে না। 'নীল্‌চে-পাখা' টুনির মাসে আড়াই হাজার মাইল পথ পরিক্রমারও নজির আছে।

কেন যে মাছেরা এই বিরাট দুরূহ পথ বার বার পরিভ্রমণ করে, তার সঠিক কারণ আজও জানা যায় নি। তবে প্রায়শঃই যে, এটা জলের লবণমাত্রা এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল হয়, এটুকু দেখা গেছে। কোন কোন বিজ্ঞানীদের মতে, ডিম ভর্তি স্যামনদের অক্সিজেনের প্রয়োজন বেশী বলেই তারা

সমুদ্র ছেড়ে নদীর জলে প্রবেশ করে। কিন্তু তা হলে ঈলমাছেদের ক্ষেত্রে অমন সুন্দর পরিবেশটাও তাদের মনঃপুত হয় না কেন!

স্যামনদের চিহ্নিত করে দেখা গেছে, সমুদ্র থেকে বিশেষ নদীমুখটি চিনে নিতে কখনই তাদের ভুল হয় না। শুধু তাই নয়, শাখানদী, কি উপনদীর যে বিশেষ অংশটিতে তাদের জন্ম হয়েছিল, ঠিক সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়েই তারা ডিম পাড়ে। অতদিন পরেও যে কি করে তারা তাদের পথ চিনতে পারে তা সত্যিই রহস্যের বিষয়। 1957 খ্রীঃ ডঃ ডোনাল্ডসন এবং অ্যালেন পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে স্যামনদের বাচ্চাগুলিকে তাদের জন্মস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করলে, ডিম পাড়ার সময় তারা জন্মস্থানের পরিবর্তে সেই 'অন্যত্র' গিয়েই হাজির হয়, অর্থাৎ তাদের স্মৃতিটা 'জন্মগত' না 'অভিজ্ঞতালব্ধ'। পথনির্দেশিকার কারণগুলিও রাসায়নিক উদ্ভূত বলেই অনুমিত হয়, যার স্বাদগন্ধগুলি মাছেদের স্মৃতিতে এমনই ছাপ রেখে যায় যে পরবর্তী জীবনে তা চিনে নিতে তাদের বিন্দুমাত্রও অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন ধরণের খনিজ লবণ এবং জৈব ভগ্নাবশেষ বহন করে বলে নদী মাত্রেরই এক একটি বিশেষ ধরণের "নিজস্ব" গন্ধ থাকে, আর গন্ধ চিনতে মাছেরা মানুষের চেয়ে আড়াই-শ' থেকে পাঁচ-শ' গুণ বেশী পারদর্শী বলেই, অন্যান্য হাজার রকমের স্বাদ-গন্ধের মধ্য থেকেও সেই 'বিশেষ' গন্ধটিকে চিনে নিতে তাদের কখনই ভুল হয় না। স্যামনদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়ে কি নাকে তুলো গুঁজে দিয়ে দেখা গেছে, তারা আর পথ চিনতে পারে না। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বিশ্লেষণ করেও দেখা গেছে যে, গন্ধের সাহায্যেই তারা তাদের নদীমুখ চেনে।

স্যামনেরা যখন সমুদ্রে যায় তখন তারা নদী থেকে পিছু হেঁটে সমুদ্রে পড়ে, তাই সমুদ্র কি নদীতলের কোন পথচিহ্নও তাদের স্মৃতিতে ছাপ রেখে যাওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। স্যামন আর ট্রাউটদের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অনুভব শক্তিও অপরিসীম, তাই ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে তাদের দেহজ তড়িৎচৌম্বক স্পন্দনটিও কোন দিগদর্শন যন্ত্রের কাজ করে কিনা বলা কঠিন। মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের মতে, গন্ধ বিচারে নদীমুখ চেনা গেলেও, উন্মুক্ত সাগরে সূর্যের কৌণিক দূরত্বই পথের হদিশ দেয়। সূর্যের দিগংশ এবং উন্নতি উভয়ই এ ক্ষেত্রে সমান প্রয়োজনীয়। কার্যকারণ সম্বন্ধে মতানৈক্যের অবকাশ থাকলেও এ বিষয়ে ভুল নেই যে যাত্রাকালে কাউকে ধরে তার চলার পথ বদলে দিলেও কোন এক অজানা দিগযন্ত্রের মাধ্যমে মুহূর্তে সে তার নিজের সঠিক পথটিকে চিনে নিতে কদাচ ভুল করে না।

একটু রসিকতা

টমাস হাক্সলে একজন নাম করা শিক্ষক ছিলেন। একদিন ক্লাসে একটি বিষয় পড়ানোর পর তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন "সব পরিষ্কার হয়েছে তো?" একজন ছাত্র দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করে বলল "হাঁ স্যার, কেবলমাত্র আমার ও বোর্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আপনি যে অংশটুকু লিখেছেন সেটুকু বাদ দিয়ে।"

হাক্সলে মুহূর্তের জন্যে একটু বিষণ্ণ ও বিব্রত বোধ করলেন তারপর বললেন—"আমার বক্তব্য সহজ ও পরিষ্কার কিন্তু আমি নিজে অস্বচ্ছ।"

সাইনারজেটিক্স্

[সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির জীববিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের একদল গবেষক 1980 সালের লেনিন পুরস্কার লাভ করেছেন। এই গবেষকদের প্রধান ছিলেন কর্মাধ্যক্ষ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির পত্র-সদস্য গেনরিথ ইভানিৎস্কি। তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নতুন এক শ্রেণীর স্বতঃতরঙ্গের প্রক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ করেছেন উত্তেজনাপ্রবণ ব্যাপ্ত অবস্থার লঙ্ঘনে এই স্বতঃতরঙ্গের ভূমিকা।]

কয়েকটি ফলপ্রসূ আকস্মিক ঘটনার যোগাযোগে এই আবিষ্কার ঘটে গিয়েছে। যদিও এমন কথা বলা চলে না যে যে-কেউ আপেল গাছের নীচে বসলেই প্রকৃতিগত জগতের মৌলিক কোন নিয়ম আবিষ্কারে সমর্থ হবে।

আবিষ্কারটি যেখানে ঘটেছে সেই জীব বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের অবস্থান মস্কো থেকে 120 কিলোমিটার দূরে, পুশ্‌চিনো শহরে। এখানে জীববিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানের জন্য একযোগে কাজ করেন পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জৈবপদার্থবিজ্ঞানী, প্রজননবিজ্ঞানী ও মাইক্রোজীববিজ্ঞানীরা। সম্ভবত এই প্রথম ঘটনায় এমন এক শুভ যোগাযোগ ঘটল যার ফলে সাফল্য এসেছে। গবেষণার অনেকগুলি ধারা যেখানে এসে মিলিত হয় সেখানে প্রায়শ সৃষ্টি হয়ে থাকে নতুন ধ্যানধারণা ও সমাধান। এই আবিষ্কারের সারকথা কি? শুরু করা যাক শেষ থেকে—কাজের বাস্তব মূল্য থেকে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ছন্দ লঙ্ঘিত হয় কেন?

মানুষের জীবনকে গুরুতর রকমের বিপন্ন করে তোলে হৃদ্‌-চলাচলের ছন্দহীনতা এবং ফিব্রিলেশন (ফিব্রিলেশন হচ্ছে কার্ডিয়াক মাংসপেশীর ধড়ফড়ানি, যখন হৃৎপিণ্ড আর রক্ত পাম্প করে না)। বহু ইলেকট্রোডবিশিষ্ট একটি সমাবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এর সাহায্যে চিকিৎসকেরা আগে থেকেই জানতে পারেন অপারেশনের সময়ে হৃৎপিণ্ডের আচরণ কেমন হবে। জানতে হয়, কেননা অপারেশনের সময়ে প্রায়ই ফিব্রিলেশন ঘটে থাকে। এই জটিলতা যাতে না ঘটে তার জন্য চিকিৎসকরা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন—একটি হচ্ছে বিদ্যুতের ফিব্রিলেশন-নাশক বিমুক্তি। কিন্তু প্রাথমিক কারণটি এইভাবে দূর করা যায় না। জীবদেহ যদি নিজেই এই পীড়াকে জয় করতে না পারে তাহলে ফিব্রিলেশন ঘটতে পারে।

এখন আর আগেকার মত অন্ধকার নয়, কি থেকে কি হতে পারে সে-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই পরিচিত জৈবগত পদার্থগুলির মধ্যে থেকে সার্থক নির্বাচন সম্ভব, যা ফিব্রিলেশননিরোধক। সম্ভব নতুন নতুন পদার্থ সংশ্লেষণ করাও।

ব্যাপারটি প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। তবুও একথা বলা চলে, আবিষ্কৃত ব্যাপারের এটি হচ্ছে একটিমাত্র প্রয়োগ।

স্নায়ুর দমক ও দহন, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার

তরঙ্গ এবং শৃংখল-ক্রিয়ার চলাচল—এসবের মধ্যে একটা লক্ষণগত মিল আছে, যদিও প্রথম দর্শনে ব্যাপারগুলিকে বিসদৃশ মনে হয়ে থাকে। তাদের ভিত্তি রচনা করে স্বতঃতরঙ্গ প্রক্রিয়া। সক্রিয় উত্তেজনাপ্রবণ মাধ্যমে—শক্তিআবিষ্ট স্থানে (এই শক্তি জমা থাকে মাধ্যমের প্রতিটি বিন্দুতে এবং একটি বিন্দুতে যখন নিঃসৃত হয় তখন পার্শ্ববর্তী বিন্দু থেকে উত্তেজনা আসে ; বিন্দুগুলির মধ্যে যোগাযোগ বজায় থাকে ব্যাপনের মাধ্যমে)—ভ্রাম্যমান তরঙ্গের চলাচলটাই হচ্ছে স্বাভাবিক সক্রিয়তার ধরন।

একথা নিশ্চিতভাবেই জানা গিয়েছে এমনি একটি মাধ্যমে বৈসাদৃশ্য থেকে যায়। দেখা গিয়েছে ভ্রাম্যমান তরঙ্গের শেষভাগ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। তরঙ্গের চলাচলে ব্যবধানটি কম হলে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, তারপরে উৎপন্ন হয় একটি আবর্ত, তরঙ্গ গড়ে তোলে একটি সর্পিল আকার। এই হচ্ছে তরঙ্গের নতুন উৎস যা প্রধান তরঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলবে—একটি পরাবর্তক। একটি উৎসের দ্বারা প্রেরিত তরঙ্গে যখন বৈসাদৃশ্যের স্থানে বিচ্ছিন্নতা ঘটে তখন তার ফলে নতুন তরঙ্গ আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ, তরঙ্গের সংখ্যাবৃদ্ধি হতে পারে।

হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে কথাটা এই—ফিব্রিলেশন হচ্ছে বেড়ে-ওঠা স্বতঃতরঙ্গের অস্থিরতা।

এক কথায় বলা চলে, স্বতঃতরঙ্গ প্রক্রিয়ার উদ্ভবকে বলা চলে সক্রিয় মাধ্যমের আচরণের সম্পূর্ণ প্রকাশ। অন্যদিকে মাধ্যমের বৈসাদৃশ্যের আবির্ভাব থেকে পাওয়া যায় প্রক্রিয়ার স্থিরতা। মাধ্যমের মাপজোক পৃথক পৃথক করে নেওয়া হয়। তারা যদি একটির দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে স্বতঃতরঙ্গের উৎসগুলির জীবনকাল এবং তাদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার কমানো যেতে পারে। এ থেকেই পাওয়া যায় ছন্দচ্যুতি-রোধক ব্যবস্থার সার্থক অনুসন্ধান।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ সোভিয়েত ইউনিয়নে ও অন্যত্র ব্যাপক স্বীকৃতিলাভ করেছে। তবে এই স্বীকৃতি তাড়াতাড়ি আসে নি। এনরিকো ফের্মির ভাষায় বলা চলে, বিজ্ঞানে নতুন কোন সূত্র একমাত্র তখনই গ্রাহ্য হয় যখন বেরিয়ে আসার অন্য কোন পথ থাকে না।

নতুন নতুন প্রয়োগ

আবিষ্কৃত এই ব্যাপারের আশ্চর্য গুণাগুণ লক্ষ্য করে সারা বিশ্বে এ-বিষয়ে প্রচুর পরীক্ষামূলক ও তত্ত্বমূলক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যবেক্ষণের ফলাফল সর্বত্রই সমানভাবে স্বীকৃতিমূলক। কোষগত ব্যবস্থায় পাওয়া গিয়েছে সর্পিল তরঙ্গ। সেখানে এই তরঙ্গের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ—কি চোখের রেটিনায়, কি মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়া অবনমনের তরঙ্গের পর্যবেক্ষণে (এ থেকে পাওয়া যায় অবনমনের ক্রিয়াকৌশল পর্যবেক্ষণে নতুন পথ)।

আমেরিকান গবেষকেরা এই ব্যাপারটিকে উপোসী অ্যামিবার কর্ষণক্ষেত্রে ধরতে পেরেছেন। উপোসী থাকার কারণেই অ্যামিবারা হয়ে ওঠে সুনির্দিষ্ট সক্রিয় মাধ্যম। অ্যামিবারা সন্নিবিষ্ট হয় সেই অ্যামিবার কাছে যে উচ্চতর কম্পনমাত্রায় শূন্যস্থানে উৎক্ষেপণ করে কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ। গঠিত হয় একটি ভ্রূণ অবয়ব (অ্যামিবাদের একটি জোট) এবং পুনর্জন্মের পদ্ধতিতে বড় রকমের বিভিন্নতা ঘটে। অ্যামিবারা অতঃপর আর বিভক্ত হয় না, তবে বীজরেণু নিঃসরণ করে। একমাত্র যখন উপোসী অবস্থা কেটে যায় তারা আবার হয়ে ওঠে অ্যামিবা।

মহামারীর বিস্তারেও স্বতঃতরঙ্গ প্রক্রিয়া সমান-ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আরও বহু ক্ষেত্রে নতুন এই আবিষ্কারের প্রয়োগ সম্ভব হবে মনে করা হচ্ছে। প্রযুক্তিবিদ্যাতেও প্রয়োগ করার চেষ্টা হচ্ছে।

এক কথায়, এই আবিষ্কার থেকে উদ্ভূত হয়েছে জৈব পদার্থবিদ্যা, ভৌত রসায়ন ও তরঙ্গ প্রক্রিয়ার তত্ত্বে নতুন নতুন শাখা। তার ফলে ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কিত নতুন এক বিজ্ঞান—সাইনার-জেটিক্স্।

পুস্তক-পরিচয়

জানা থেকে অজানায়, লেখক—বিজ্ঞানার্থী,
প্রকাশক—কমলা সাহিত্য ভবন, 4, শ্যামাচরণ দে
স্ট্রীট, কলিকাতা-700073 ; প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর,
1978 ; পৃষ্ঠা সংখ্যা-56 ; মূল্য—ছয় টাকা।

লেখক ছোটদের চোখে নানা ঘটনা দেখেছেন, ছোটদের মন নিয়ে লিখেছেন, তাই বইখানিও ছোটদের মনের মতই হয়েছে। বইটিতে আছে দশটি অধ্যায়। অধ্যায়ের নামগুলিও ছোটদের মনে ধরার মত। যেমন—'এক পা ফেলে দুই পা ফেলে', 'কুমীর যদি পাহারাদার হয়', 'ভূত অদ্ভুত নয়' ইত্যাদি। আবার ময়ূর মেঘ দেখে পেখম না মেলে পেখম গুটায়, ব্যাঙ মরা জিনিষ খায় না, মানুষ ছাড়া অন্য অনেক জীবের কিছুটা বুদ্ধি আছে, রকেট কেমন করে উড়ে, পাখির বড় শত্রু মানুষ, কেমন ভূত রাতে অন্ধকারে দরজায় কড়া নাড়ে—ঢিল ছোঁড়ে—বন্ধ ঘরে জোনাকির আলো ছড়ায়, এরূপ নানা আকর্ষণীয় ঘটনার ও প্রকাশভঙ্গিতে অধ্যায়গুলি মন কেড়ে নেয় সহজেই। অন্ধ বিশ্বাস বিজ্ঞানের কথা নয়। যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যাচাই করে সত্যকে জানা ও তা থেকে অজানার পথে পাড়ি দিয়ে নানা রহস্যের আবরণ উন্মোচনই বিজ্ঞান দর্শন ও বিজ্ঞানীর কাজ। ক্ষুদে পাঠকদের এই দর্শন উপলব্ধি করতে, বিজ্ঞান সচেতন করে তুলতে ও বিজ্ঞানীসুলভ মনোভাব গড়ে তুলতে পুস্তকখানি নিশ্চই সহায়ক হবে।

"চোরাকারবারীদের ঠেকাবার জন্যে বন অঞ্চলে কুমীর হবে পাহারাদার," "বন্যাকে কব্জা করতে নদীকে ধরতে হবে সমতলের আগেই—উৎসের কাছে" এরূপ দু-একটি মন্তব্যের উপর ভিন্ন মত পোষণ করার অবকাশ থাকলেও বইখানি থেকে শুধু ক্ষুদে পাঠকরাই লাভবান হবে তা নয়, বড়দেরও অনেক বিশ্বাসের হবে নবমূল্যায়ন।

শেষে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, লেখক যে আশা নিয়ে প্রতি পাতায় অর্ধেকটা ফাঁকা রেখেছেন, সেই আশা ক্ষুদে পাঠকরা নিশ্চয়ই পূরণ করবে তাদের কৌতূহল ধরে রাখতে লেখা ও ছবির মাধ্যমে। ছোট বড় সকলের কাছেই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে বইখানির বহুল প্রচার একান্ত কাম্য।

রঞ্জনমোহন খাঁ

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ

একটু হাসুন

জয়ন্ত বসু*

আগন্তুক : এখানে কি বাঁ হাতে কিছু না দিলে কোন কাজ-কারবার হয় না? এটাই কি নিয়ম?

অফিস-কর্মী : জানেন তো, বিজ্ঞানেও 'বামহস্ত নিয়ম' আছে। আর এটা তো বিজ্ঞানেরই যুগ।

*　　　　*

প্রশ্ন : সুপার-কনডাকটর কাকে বলে?

উত্তর : বাস-ট্রামে তো সাধারণ কনডাকটর থাকে। পাতাল রেল নিয়ে যা হৈ-চৈ হচ্ছে, ওর কনডাকটরকে নিশ্চয় সুপার-কনডাকটর বলা হবে।

*　　　　*

প্রশ্ন : ভর ও ভারের মধ্যে পার্থক্য কি, সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পার্থক্য শুধু একটা আ-কারে।

*　　　　*

আশাবাদী : মানুষ কম্পিউটার নামে এমন যন্ত্র তৈরি করেছে, যার বিচারবুদ্ধি আছে।

নৈরাশ্যবাদী : এইসব যন্ত্রকে বিচারবুদ্ধি দিতে গিয়ে মানুষের নিজের বিচারবুদ্ধি বোধহয় কমে যাচ্ছে।

*　　　　*

বন্ধু : মনে কর তুমি ইলেকট্রন, আমি প্রোটন। পরমাণুর মত একটা সংসার কি আমরা গড়ে তুলতে পারি না?

বান্ধবী : তাহলে তো আমাকে তোমার চারপাশে কেবল ঘুরতে হবে। ওর মধ্যে আমি নেই।

* সাহা ইনস্টিটুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-9
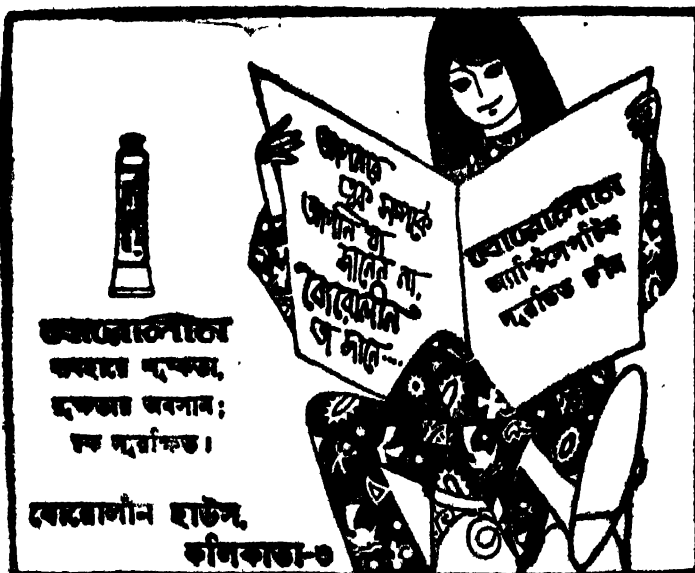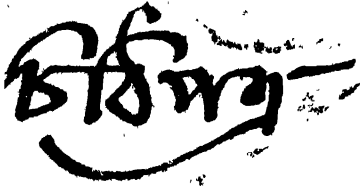
পাঠকরা কিরকম লেখা চান

(1)

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিয়মিত লেখা চাই

মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করে তার বিচারবোধ জাগ্রত না করে শুধু কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করে তাকে বিজ্ঞান সচেতন করা যায় না এ কথা আশা করি সকলে স্বীকার করবেন। সম্প্রতি (1979-80) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে সে কাজে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন দেখে আশান্বিত হয়েছি। এ প্রসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার, 'জনজীবন ও বিজ্ঞান' (শারদীয়া, 1979), শ্রীযুগলকান্তি রায়ের 'আত্মার দেহান্তর' (জুলাই, 1979) এবং কোষ্ঠী গণনা কি বিজ্ঞানসম্মত? (শারদীয়া, 1979), সত্যসুন্দর বর্মণের 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান চেতনা' (শারদীয়া 1979), সুব্রত পালের 'বিজ্ঞানের নামে' (মে, 1979) প্রভৃতি লেখাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, সমাজের শিক্ষিত-অশিক্ষিত বহু মানুষের মনকে যেভাবে এখন ঠাকুর-দেবতা, গুরু-বাবা, জ্যোতিষী, ঠিকুজী-কোষ্ঠী, দাগিকেন, বারমুডা ট্র্যাঙ্গল প্রভৃতি আচ্ছন্ন করে রেখেছে, জনসাধারণকে বিজ্ঞান সচেতন করতে গেলে ঐসবের বিরুদ্ধে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসা দরকার। একজন পাঠক হিসাবে আমার অভিমত এ ধরনের বিষয় নিয়ে প্রতি মাসে একটি করে লেখা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ ছাপানো হক।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারের লক্ষ্য নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী মেঘনাদ সাহার 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম' (মে, 1980) প্রবন্ধটি এবং কান্তা প্রামাণিক, গৌতম বিশ্বাস ও অসমঞ্জ বিশ্বাসের 'বিজ্ঞান কংগ্রেসের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা (মে, 1980) ও অনিলবরণ দাসের 'বিজ্ঞানীরা কি কুসংস্কার মুক্ত' (জুলাই, 1979) চিঠি দুটি প্রকাশ করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

প্রদীপ সেন
শিলিগুড়ি

(2)

ব্যক্তির যথার্থ বিশ্লেষণ হক

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের আলোচনা থাকে। এটা খুবই ভাল। কিন্তু সেই সমস্ত লেখায় যুক্তি-ভিত্তিক বিশ্লেষণ খুব কম থাকে। পাঠক যেমন বিজ্ঞানীদের (বা যে কোন কৃতী ব্যক্তির) ভাল দিকগুলি জেনে প্রেরণা পেতে পারে তেমনি তাঁদের ভুল-ত্রুটি, ব্যর্থতা প্রভৃতি থেকেও শিক্ষা পেতে পারে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিজ্ঞানীর জীবনী ও কর্ম আলোচনাতে এ দিকটি বিশেষ কিছু থাকে না।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পর্কে শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা (জানুয়ারী, 1979) এবং শ্রীবিমলেন্দু মিত্র (জানুয়ারী, 1980) মহাশয়ের লেখা অবশ্যই সুখপাঠ্য।

পৃথিবীর একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী হিসাবে এবং আমাদের দেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে আচার্য বসুর অবদানের কথা স্বীকার করেও এ প্রশ্ন মনে উঠে যে, তিনি বাংলাভাষায় কোন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ না লিখে তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন কি-না। এ প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণ হওয়া খুবই প্রয়োজন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঐ দুটি প্রবন্ধে এবং অন্য প্রবন্ধেও এ আলোচনা নেই।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মে, 1980 সংখ্যায় মেঘনাদ সাহার, "আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম" লেখাটি দেখে আনন্দ পেলাম। কিন্তু সম্পাদকমণ্ডলী কি জানেন অধ্যাপক সাহা বাংলায় যে বিজ্ঞান চর্চা হতে পারে তা বিশ্বাস করতেন না। তিনি এ ব্যাপারে কখনই উৎসাহ দেখান নি। ঐ লেখার সঙ্গে যুক্ত 'প্রসঙ্গ কথা'র সমাজ সচেতনতা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও তা কতখানি যুক্তিভিত্তিক ছিল এই প্রসঙ্গে ভাবা দরকার।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় মূলত একজন প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞানী। জীব বিজ্ঞানীর গভীর বিশ্লেষণ তাঁর গবেষণায় বিশেষ নেই। অথচ, শ্রীরতনলাল ব্রহ্মচারী মহাশয় (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জুন, 1979) ও আরও অনেকে তাঁকে জীব বিজ্ঞানী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া শ্রীব্রহ্মচারী যেভাবে ডারউইনের সঙ্গে গোপালবাবুর নাম উচ্চারণ করেছেন তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত পাঠকরা ভেবে দেখবেন।

এ ধরনের অনেক কথা অন্যান্য জীবনী আলোচনার ক্ষেত্রেও দেখানো যায়। ব্যক্তিপূজা নয়, ব্যক্তিকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কর্তৃপক্ষ সেদিকে দৃষ্টি দিলে ভাল হয়।

অসীম চক্রবর্তী
ভোরডুর, হাওড়া

(3)

সাধারণ অসুখ নিয়ে আরও লেখা দরকার

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ব্লাড প্রেসার' (জানুয়ারী, 1980) লেখাটি খুব ভাল লাগল। সর্দি-কাশি, হাম-বসন্ত, পেটের অসুখ প্রভৃতিতে আমরা সাধারণভাবে বেশ কষ্ট পাই। এই সমস্ত সাধারণ অসুখ-বিসুখ নিয়ে 'ব্লাড-প্রেসার'-এর মত সহজ পাঠ্য, লেখা বেরোলে আমার ধারণা, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সম্পাদক মণ্ডলী বর্তমানে জটিল বিষয় বাদ দিয়ে সহজ সরল প্রবন্ধ প্রকাশে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন; তাই, আশা করছি আমার অনুরোধটি তাঁরা ভেবে দেখবেন।

কৌশিক ব্যানার্জী
নৈহাটি

(4)

মডেলের লেখা কমছে কেন?

সম্পাদকমণ্ডলী দুর্বোধ্য প্রবন্ধ বাদ দিয়ে সহজ-বোধ্য লেখা প্রকাশ করছেন এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যাতে সাধারণ মানুষের উপযোগী হয় সেদিকে তাঁদের আরও গুরুত্ব দিতে অনুরোধ করছি।

আগে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই মডেলের লেখা থাকতো। এই দু বছর (1979-80) তার সংখ্যা অনেক কমেছে। মডেলের দ্বারা বৈজ্ঞানিক চিন্তা—ভাবনার উৎকর্ষের তেমন পরিচয় না পাওয়া গেলেও এর দ্বারা তরুণ ছাত্রছাত্রীরা হাতে-নাতে জিনিষ করতে উদ্যোগী হয় এটা নিশ্চয়ই সম্পাদকমণ্ডলী স্বীকার করবেন। তাই অনুরোধ, এ ধরণের লেখা আরও দিন।

চন্দ্রমা বিশ্বাস
সল্ট লেক, কলিকাতা

[বিঃ দ্রঃ—যুক্তিভিত্তিক গঠনমূলক আলোচনা আমরা চাই। চিঠির সঙ্গে পুরো নাম, ঠিকানা না থাকলে চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয়—সম্পাদকমণ্ডলী]
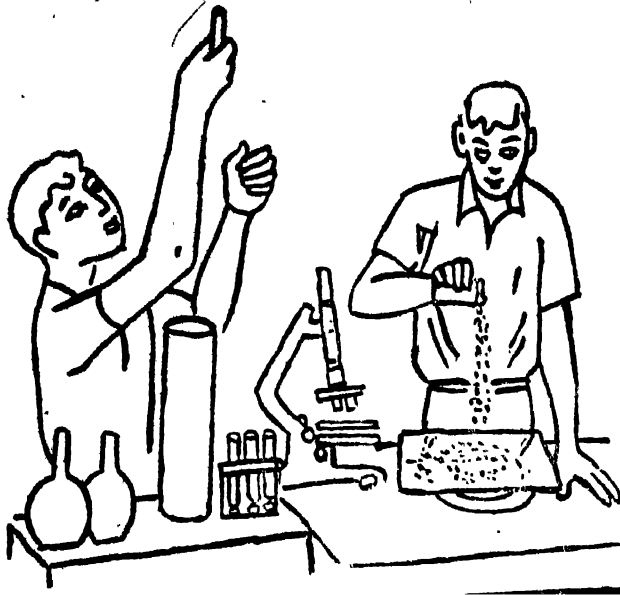
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

ইচ্ছাপূরণ

লতিকা বসু*

"ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়"—অতি প্রাচীন এই প্রবাদ। কিন্তু বাস্তবে কতখানি তা সত্য? ইচ্ছা করলেই কি বড় বিজ্ঞানী হওয়া যায়? হ্যাঁ—যায়, যদি সেই ইচ্ছার তেমন জোর থাকে,—আর থাকে নিজের কিছু যোগ্যতা। নিগ্রো বিজ্ঞানী জর্জ ওয়াশিংটন কারভার হচ্ছেন সেই রকম একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। একান্ত অসহায় নিগ্রো ক্রীতদাস হয়ে জন্মগ্রহণ করে কি করে পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন—সেই ঘটনাবহুল জীবনকাহিনী একটা রূপকথার মতই। অতি দীনতম অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত হয়েও জন্মগতভাবে অবহেলিত নিজ সমাজের দীন হীন মানুষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাদেরই মধ্যে থেকে তাদের উন্নতিবিধানে আত্মোৎসর্গের উদাহরণও পৃথিবীর ইতিহাসে বেশী নেই। সেই দিক দিয়েও বিজ্ঞানী কারভার অনন্য সাধারণ অত্যুজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বজোড়া খ্যাতির পেছনে কত যে কষ্টের কাহিনী তা ভাবতেও অবাক লাগে।

নতুন পৃথিবী (New world) আমেরিকায় ওয়াশিংটন নামে চারজন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্ম। এক—বীরযোদ্ধা—রাজনীতিবিদ—জর্জ ওয়াশিংটন (1732—1799)—আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা ও স্বাধীন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট। দুই—আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্যিক

---

* রামমোহন কলেজ, কলিকাতা-700009

ওয়াশিংটন আরভিং (Washington Irving—1783—1859)—রিপ ভ্যান উইংকল্ (Rip Van Winkle) যাঁর অন্যতম প্রসিদ্ধ লেখা। তিন—শিক্ষাবিদ-সমাজসংস্কারক—ওয়াশিংটন টি. বুকার (1856—1915),—দুঃস্থ নিগ্রো পরিবারে জন্মে কয়লাখনিতে কুলি হিসাবে বাল্যজীবন আরম্ভ করে আমেরিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্রূপে তাঁর সর্বাধিক পরিচিতি। সর্ববিধভাবে শোষিত অসহায় নিগ্রোসমাজের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম মহান পথিকৃৎ। শিক্ষানীতিতে তাঁর বিশেষ বক্তব্য "মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হাত-এর (Head, Heart and Hand) সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য হতে হবে। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এই তিনের সমন্বয় হয় না—সে শিক্ষা অপূর্ণ"। আর চতুর্থ ওয়াশিংটন হচ্ছেন আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানী কারভার (1864-1943)।

এই কারভার পদবীটি জর্জের পৈতৃক পদবী নয়—যেভাবে আমরা সাধারণত পরিচয় দিয়ে থাকি। ক্রীতদাসের পদবী স্থির হয় তাদের মনিবদের পদবী অনুসারে। জর্জও সেইভাবে তাঁর মনিবের পদবীই পেয়েছেন। আমেরিকার মিসৌরিতে মোসেস কারভার নামে এক ধনী ব্যক্তির ছিল বিরাট ক্ষেতখামার ও নানারকম ব্যবসা। বলাবাহুল্য আমেরিকার ধনী ব্যক্তিরা সবাই ইউরোপ থেকে আগত শ্বেতকায়ের দল। এখন জর্জ ও তাঁর মা ছিলেন সেই মোসেস কারভারের খামারে নিযুক্ত ক্রীতদাস। বাবাও ছিলেন ক্রীতদাস, তবে একই মালিকের অধীনে নয়। অন্য এক মালিকের কেনা। অল্প দূরের এক খামারেই তিনি থাকতেন। সেই পিতার সঙ্গে পুত্রের ও তার মায়ের দেখা-সাক্ষাতের উপায় ছিল না। সুতরাং শিশু জর্জের পারিবারিক অবস্থা কীরকম বেদনার্ত তা সহজেই অনুমেয়। মিসৌরির পাশেই আরকানসাস প্রদেশ। সেখানকার অধিবাসীদের বেশ কিছু ছিল বর্বর, দাঙ্গাবাজ ও দাসব্যবসায়ী। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ সেই আরাকানসাস দস্যুদের একদল এসে জর্জ ও তাঁর মাকে লুঠ করে নিয়ে যায়। জর্জ তখন নিতান্তই শিশু। তাঁর মালিক মোসেস কারভার অনেক কষ্টে জর্জের খোঁজ পেয়ে দস্যুদের কাছ থেকে তাঁকে আবার কিনে নেন একটি রেসের ঘোড়ার বিনিময়ে। এতটুকু শিশুকে নিয়ে দাসব্যবসায়ীদেরও লাভ ছিল না। কিন্তু সেই থেকে জর্জের মায়ের আর কোন হদিশ মেলে নি।

1861-1865 সাল পর্যন্ত আমেরিকায় এক বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ বেধেছিল—মূলতঃ ঐ ক্রীতদাস প্রথাকেই কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চলে তুলার ক্ষেতে ও তামাক চাষে এবং খনিতে কাজ করার জন্য ব্যাপকভাবে ক্রীতদাস নিয়োগ করা হত। উত্তরাঞ্চলে দাসব্যবস্থা ছিল না, দক্ষিণের লোকেরা তাদের লাভজনক সেই দাসব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উত্তরাঞ্চল থেকে পৃথক হয়ে যেতে চাচ্ছিল। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ বাধে। অজস্র প্রাণ ও প্রচুর ধন-সম্পদ ক্ষয়ের পর 1865 সালে সেই যুদ্ধের অবসান ঘটে। বিচ্ছিন্নতাকামীরা পরাজিত হয়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে তখন আইনগতভাবে দাস প্রথার বিলোপ হয়। ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। কিন্তু অসহায় বালক জর্জের স্বাধীনতা কোথায়? তাঁর ভরণ-পোষণের ভার কে নেবে? আগেই বলা হয়েছে তাঁর মালিক মোসেস কারভার ছিলেন যথেষ্ট সহৃদয় ব্যক্তি। আরাকানসাস দস্যুদের কাছ থেকে তাই বালক জর্জকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। মিসৌরীতে তাঁর খামারেই জর্জ বড় হতে থাকে।

ছোটবেলা থেকেই জর্জ ছিলেন রোগা এবং দুর্বল। তাঁর সদাশয় মনিব তাই জর্জকে কোন ভারী

কাজ করতে দিতেন না। মেয়েদের মত রান্না করা, বাসনমাজা, সেলাই করা, কাপড় ইস্ত্রি করা প্রভৃতি কিছুটা হাল্কা ধরণের কাজ করতেন জর্জ। তার বদলে অবশ্য পেতেন শুধু পেট-ভর খাওয়া, আর কিছু নয়। জর্জের কিন্তু ওসব ভাল লাগত না। তাঁর চোখে ছিল জ্ঞানের পিপাসা। খামার বাড়ীতে হঠাৎ একটি ওয়েবস্টারের বর্ণ পরিচয় ও বানানের বই পেয়ে প্রায় গোগ্রাসেই তা গিলে ফেলেন—মালিকদের সহায়তায় আদ্য-প্রান্ত মুখস্থই করে ফেলেন। তখন থেকে তাঁর প্রবল ইচ্ছা হলো লেখা-পড়া শেখার। জর্জের ব্যবহার ছিল অতি মধুর, সেই জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসত—তাঁর মনিবও। ভয়ে ভয়ে জর্জ একদিন সেই মনিবকে মুখ ফুটে বলেই ফেললেন যে স্কুলে গিয়ে তিনি লেখাপড়া শিখতে চান। বয়স তখন তাঁর মাত্র দশ বছর। মনিব খুশী মনেই জর্জকে ক্রীতদাসের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু অন্য কোন সাহায্য করতে পারলেন না। আর পড়াশুনো করবেন কোথায়? ধারেকাছে কোথাও তো স্কুল নেই। শুধু ক্ষেতখামারের রাজ্য। সুতরাং মুক্তো ছাড়া সেই মুক্তির আস্বাদ কই! লেখপড়া শিখতে হলে তো পয়সাকড়ি চাই। পয়সা না থাক—অদম্য মনের জোর রয়েছে জর্জের। সেই অমিত মনোবল সম্বল করেই কপর্দকহীন বালক জর্জ ঘৃণ্য ক্রীতদাসের অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির আস্বাদনে বেরিয়ে পড়লেন। কারভারের খামার থেকে প্রায় আট মাইল দূরে নিয়োশো (Neosho) নামে এক জায়গায় একটি সাধারণ প্রাথমিক স্কুল ছিল, সেই স্কুলে পড়ার ইচ্ছা নিয়েই সহায়-সম্বল-হীন জর্জ বেরিয়ে পড়েন। দু-বেলার খাওয়া জুটবে কোত্থেকে এই যার ঠিক নেই—সে অসহায় বালক বই খাতা যোগাড় করে স্কুলের বেতন দিয়ে পড়শুনা করবে কেমন করে? সারাদিন এর বাড়ী তার বাড়ী কাজ করে, ক্ষেত-খামারে খেটে—বাসন মেজে কাপড় কেচে মুটে মজুরি করে কোন রকমে দুমুঠো খাওয়ার সংস্থান যদিওবা হতো রাতে থাকা-শোওয়ার জায়গাই তার জুটতো না। ফাঁকা খামার বাড়ীর এক পাশে না হয় কোন খড় গাদায় শুয়ে কতদিন রাত কাটাতে হয়েছে সেই দশ বছরের বালককে—জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আকাঙ্খা নিয়ে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফাঁকে ফাঁকে মনিবদের বাড়ীতে অথবা অন্য যেখানে যখনই যা বই পেতেন অবসর সময়ে অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেইগুলি পড়ার চেষ্টা করতেন,—একা একাই বুঝতে চেষ্টা করতেন একাগ্র সাধনায়। এরই নাম জ্ঞানসাধনা। প্রকৃত তপস্যা। এইভাবে দারিদ্র্য ও বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে একক শক্তিতেই বালক জর্জ তাঁর শৈশবে বিদ্যার্জনের চেষ্টা করে চলেন।

কয়েক বছরের চেষ্টাতেও নিয়োশোতে সুবিধা করতে না পেরে সেখান থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেন জর্জ। এক মালগাড়ীতে চেপে ষাট মাইল দূরে কানসাস প্রদেশে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রথমে নানারকম বিদঘুটে কায়িক শ্রমের কাজ করে পেটের ভাত জোগাড় করতে চেষ্টা করলেন। সাদা সাহেবদের জুতা পালিশ থেকে আরম্ভ করে বাবুদের বাড়ীতে বা ক্লাবে বাসনমাজা রান্না করা ঘর ঝাঁট দেওয়া এবং সময় সময় কুলিগিরি করা সবরকমের বিশ্রী কাজ। তার থেকে কিছু পয়সা জমিয়ে একটা হাইস্কুলে ভর্তি হলেন পড়ার আশায়। কিন্তু নুন আনতে যার পান্তা ফুরোয় তার কি হাইস্কুলে পড়াশুনো সাজে? মাইনে দিতে না পারায় স্কুল থেকে নাম কাটা গেল একদিন। মনের দুঃখে জর্জ তাই কানসাস ছেড়ে পালালেন। চলে এলেন ইণ্ডিয়ানোলা (Indianola) নামে

আর এক জায়গায় ভাগ্যান্বেষণে। সেখানেও আগে তো পেটের চিন্তা। প্রথমে নানারকম কায়িক শ্রম করতে করতে অল্প কিছু পয়সাকড়ি জমিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে খুলেছেন একটি লণ্ড্রীর কারবার। জীবনের গতিপথ খানিকটা মোড় ফিরল এবার। লণ্ড্রীটা ভালই চলতে লাগলো, ফলে কিছুদিনের মধ্যে মিতব্যয়ী জর্জ বেশ কিছু টাকা জমাতে পারলেন। তাতে পড়াশুনার উদ্যম আবার ফিরে পেলেন। ভর্তি হলেন সেখানকার সিম্পসন কলেজে। পুরো তিন বছর পড়াশুনো করলেন সেখানে। লণ্ড্রীর কাজও চলল সেই সঙ্গে। তারপর 1890 সালে 'আইওয়া' (Iowa) স্টেট কলেজে ভর্তি হলেন। জর্জের বয়স তখন ছাব্বিশ। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে এখান থেকে চার বছর পরে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এস-সি পাশ করলেন। তার দু-বছর পরে 1896 সালে কৃষিবিজ্ঞানে পেলেন এম.এস-সি-ডিগ্রী।

ছাত্রাবস্থা থেকেই জর্জ গাছপালা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ও তাদের পরিচর্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সেই গুণের কথা অধ্যাপকদের সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই পড়াশুনার কালেই তিনি অধ্যাপকদের সহায়তায় নিজ কলেজে একটি চাকরী পেয়ে যান কলেজের সংরক্ষিত বাগান দেখাশোনার ভার। পরে পাশ করেই তিনি সেখানে অধ্যাপনার কাজে লেগে গেলেন।

এই সময়ই শিক্ষাবিদ ওয়াশিংটন টি. বুকার-এর বাণী ও আন্দোলনের কাহিনী কারভারের কাছে আসে এবং তিনি সেই আদর্শে একান্তভাবেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তখন থেকেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের অসহায় নিগ্রোদের সাহায্যের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে থাকেন। দক্ষিণের আলবামা নিগ্রো কলেজ—টুসকেগী ইনস্টিটিউট-এর অবস্থা তখন অত্যন্ত জরাজীর্ণ। অবহেলিত নিগ্রো সমাজের মতই ছিল তাদের জন্য তৈরী ঐ কলেজটির পরিস্থিতিও। কারভার আইওআ স্টেট কলেজ ছেড়ে সেই জীর্ণ টুসকেগী ইনস্টিটিউট-এ শিক্ষকতার কাজ করতে গেলেন—বাঁচাতে চাইলেন কলেজটিকে এবং সেই সঙ্গে নিজের মানুষদের। পরে তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় সেই কলেজের উন্নতি ঘটে এবং সারা দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়।

শুধু বিজ্ঞানী হওয়ার জন্যেই তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল না। বিজ্ঞানকে বৃহত্তর মানবকল্যাণে যথাযথ প্রয়োগই তাঁর শিক্ষা ও সাধনার মূল ব্রত ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তর জনসমাজই ছিল ক্ষেত-খামারে কাজ করা কৃষিজীবী নিগ্রোগোষ্ঠী। তুলো ও তামাক চাষের জন্যই তাদের ক্রীতদাস করে আনা হয়েছিল আফ্রিকা থেকে। কিন্তু পরে দেখা গেল দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তুলোর চাষ ভাল হচ্ছে না। তাই নিগ্রোরা যখন স্বাধীনতা পেল তখন তাদের পেট চালাবার ব্যবস্থা আর রইল না। বিজ্ঞানী কারভার প্রথমেই সে অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা করে গবেষণায় মন দিলেন তুলো তামাক বাদে অন্য আর কিসের চাষ সেই সব জায়গায় হতে পারে এবং দেখলেন যে ঐ মাটিতে চিনেবাদাম ও মিষ্টিআলুর (রাঙালু) চাষ ভাল হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি সারাদেশ ঘুরে চাষীদের চিনেবাদাম ও মিষ্টিআলুর চাষে উৎসাহিত করতে আরম্ভ করলেন এবং কী ভাবে তা করা যায় হাতে-নাতে শেখালেন। কিন্তু শুধু চাষ করলেতো হবে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে চাষীদের লাভবান

করা দরকার। তাই চিনেবাদাম ও মিষ্টিআলু থেকে কতরকমের শিল্পসামগ্রী ও বিভিন্ন রকমের ব্যবহারিক উপাদান তৈরি করা যায় তারই সাধনায় ব্রত হলেন কারভার। নিরন্তর সাধনা চলেছে তাঁর গবেষণাগারে। চিনেবাদাম থেকে আগে শুধু রান্নার তেলই তৈরি হত। একনিষ্ঠ সাধনায় কারভার নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে সেই চিনেবাদাম থেকে বহুবিধ উপাদান তৈরি করতে লাগলেন। তেল ছাড়া চিনেবাদাম থেকে গুঁড়োদুধ, মাখন, কফি, প্রাতঃরাশের জন্য বিশেষ ধরণের খাবার (Break-fast-food) কালি, দাড়ি-কামানোর লোশন, মেয়েদের নানারকম প্রসাধনী দ্রব্য ইত্যাদি প্রায় 300 রকমের বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় উপাদানের প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করলেন। শুধু চিনেবাদাম দিয়েই গড়ে উঠতে লাগল নানারকমের শিল্পকারখানা। সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গেল বদলে। কারভারকে নিয়ে আমেরিকার বিজ্ঞানী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। সবার কাছে তিনি পরিচিত হয়ে উঠলেন "পিনাট ম্যান" (Peanut-man) হিসাবে। একই সঙ্গে মিষ্টিআলু থেকে কমপক্ষে 118টি দ্রব্য প্রস্তুতও করার পদ্ধতিও তিনি বের করেন। সুতরাং কারভারের বিজ্ঞানশিক্ষা তাঁকে শুধু বিজ্ঞানীই করল না সারা দেশের দুঃস্থ চাষীদের জীবনধারাই দিল বদলে। লক্ষ লক্ষ মানুষের অনশনক্লিষ্ট মুখে ফুটিয়ে তুলল হাসি। প্রথমে ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানী পরে হয়ে উঠলেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ্। বিজ্ঞানী হিসাবে নাম ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কারখানা থেকে ডাক আসতে লাগলো চাকরী করার জন্য—অনেক মোটা মাহিনায় যে মাহিনা সে যুগে কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু তিনি যে শুধু বিজ্ঞানী নন,—কেমিস্ট মাত্র নন—অর্থলোলুপতা তাঁর জীবনের কাম্য নয়। তিনি যে বহুজনহিতায়' উৎসর্গীকৃত প্রাণ, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর জনকল্যাণই তিনি চান। যে অবহেলিত শোষিত সমাজে তিনি জন্মেছিলেন—যে দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের সূত্রপাত —সেই অগণিত নিপীড়িত জনগণের মধ্যে থেকেই তাদের সার্বিক কল্যাণই যে তাঁর জীবনের ধ্যান। তাই মোটা মাহিনার চাকরী নিয়ে স্বার্থপরের মত ব্যক্তিগত সুখ ও আরামের পথে তিনি পা বাড়ান নি। চিরকাল অতি সাধারণভাবে শ্রমের জীবনেই কাটিয়ে গেলেন। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অধিকাংশ কাজই নিজের হাতে করতেন। তারই মাঝে অবসর সময়ে নিজের তৈরী করা রং ও তুলি নিয়ে বসে যেতেন আঁকতে। উদার প্রকৃতির মাঝেই মানুষ হয়েছেন। উদার হৃদয়ে সেই প্রকৃতির বিবিধ রূপরেখা ফুটিয়ে তুলতেন, নিজের তৈরী রঙে ও তুলিতে, গাছের পাতা, ফুলের পাপড়ি, গাছের ছাল থেকে কত বিভিন্ন ধরণের সুন্দর সুন্দর রঙ তিনি নিজেই তৈরী করতেন। সেও আর এক গবেষণার দিক। ছোটবেলা থেকে সেলাই-এর কাজে তিনি ছিলেন যথেষ্ট পটু। নিজের প্রয়োজনীয় সেলাই নিজে করে নিতেন। নেকটাই পরতে ভালবাসতেন। সেই নেকটাই বিজ্ঞানী কারভার নিজেই বুনতেন। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সদাই নিজেকে কর্মে ব্যস্ত রাখেন। 1943 সালে উনাশী বৎসর বয়সে এই মহান বিজ্ঞানীর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। কিন্তু তাঁর আদর্শময় জীবনটা আমাদের সামনে আজও সমুজ্জ্বল। "তাই ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়"—"বিজ্ঞানীও হওয়া যায়"—একথা জর্জ ওয়াশিংটন কারভারের জীবন থেকে কি প্রমাণ হয় না ?

চা—বাগান থেকে পেয়ালায়

স্বজন সরখেল*

জলের পরেই মৃদু উত্তেজক পানীয় হিসেবে চা-এর ব্যবহার সর্বাধিক। চা পান-এর প্রচলন সঠিক কোন্ সময় থেকে হয়েছিল তা আজও অজানা। তবে পৃথিবীতে চা পান-এর প্রচলন যে চীন দেশে প্রথম হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনা শব্দ "t'-e" (উচ্চারণ 'টে') থেকেই আজকের 'চাহ' বা 'চা'-এর উৎপত্তি। আমাদের দেশে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা-এর চাষ শুরু হয়।

চা গুল্মজাতীয় গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম Camellia sinensis। সাধারণতঃ অম্ল মাটি, গরম আর্দ্র এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা নয় এমন জলবায়ু চা চাষের উপযোগী। বীজ থেকে চাগাছের জন্ম হয়। চাগাছ উচ্চতায় 18 মিটার পর্যন্ত হতে পারে কিন্তু যেহেতু কেবলমাত্র পাতারই প্রয়োজন সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছকে লম্বায় বেশী বাড়তে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে ছেঁটে দিয়ে (prunning) গাছকে "ঝোপের আকার" (bush shape) দেওয়া হয়। সময় মত যত্ন নিলে এক একটি গাছ 50 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। এই গাছ থেকেই "দুটি পাতা একটি কুঁড়ি"—চা-এর কাঁচা মাল হিসেবে সাধারণত প্রতি 7 থেকে 10 দিন অন্তর তোলা হয়। এই ভাবে তোলা কাঁচা চা-এর পাতাকে বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাজারে ব্যবহৃত চা-এর রূপ দেওয়া হয়। চা-এর গুণাগুণ এই প্রক্রিয়াগুলির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে।

সংগৃহীত কাঁচা চা-এর পাতাগুলিকে মুক্ত অথবা নিয়ন্ত্রিত বাতাসে রেখে পাতা থেকে জলীয় অংশ কমানো হয়। যান্ত্রিক উপায়ে পাতা ও সংযুক্ত কাণ্ডের কোষগুলিকে ভাঙ্গা হয় (break up of cells)। পরবর্তী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম "গাঁজানো প্রক্রিয়া" (fermentation process)। এই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এন্‌জাইম জারণ (enzymatic oxidation) পদ্ধতি দ্বারা চা-এ যে polyphenolic পদার্থসমূহ আছে সেগুলিকে জারিত করা হয়। পদ্ধতিটা সংক্ষেপে

পলিফেনলিক পদার্থসমূহ (polyphenolic compounds) (এন্‌জাইম জারণ)।

↓

(ক) অর্থো কিউনোন্স (orthoquinones)

↓

(খ) বিসফ্লাভানোল্স (bisflavanols) (ঘনীভবন)

↓

(গ) থিয়াফ্লাভিন্স (theaflavins) (ঘনীভবন)

↓

(ঘ) থিয়ারুবিগিন্স (thearulelgins)

---

* ইউ, ভি, আই, কলেজ রোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

শেষোক্ত রাসায়নিক পদার্থ দুটির উপস্থিতির উপরই তৈরী চা-এর লিকারের রং, শক্তি (strength) এবং উজ্জ্বলতা নির্ভর করে। এর পর গরম বাতাস (80°C—100°C) ব্যবহার করে চা-কে শুকিয়ে যান্ত্রিক চালুনির সাহায্যে 'পাতা-চা' (leaf tea) এবং গুঁড়ো-চা' (broken tea/dust tea) আলাদা করা হয়। চা-এর ডগার পাতা, কুঁড়ি, নিচের পাতা ইত্যাদি গুণাগুণের ভিত্তিতে তাকে বিভিন্ন গ্রেডে, যথা—Orange Peokoe, Peokoe, Flowery Peokoe, Broken Orange Peokoe, Broken Peokoe এবং fannings, ভাগ করা হয়। এক একর জমি থেকে 250 থেকে 300 কিলোগ্রাম শুকনো চা (made tea) তৈরি হয়। আমাদের দেশে মোট 363306 হেক্টরের (1 হেক্টর = 2·5 একর) কিছু বেশি জমিতে চা-এর চাষ হয় এবং উৎপাদিত চা-এর পরিমাণ 512 মিলিয়ন কিলোগ্রাম (1 মিলিয়ন = দশ লক্ষ)। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত চা-এর শতকরা 33 ভাগ চা আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে চা-এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। চা বাগানের কর্মীসহ এই চা-এর উপর নির্ভর করেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কয়েক লক্ষ পরিবারের জীবিকানির্বাহ হয়।

করে দেখ

জ্ঞানের আলো

সুব্রতকুমার বসু*

মেলায় বা খেলনার দোকানে 'জ্ঞানের আলো' নামে এক ধরণের খেলনা বিক্রী হয়। এতে একটা শক্ত মোটা কাগজের ওপর কতকগুলো ছোট ছোট প্রশ্ন ও তাদের উত্তর মিশিয়ে লেখা থাকে। কোন্ প্রশ্নের কোন্‌টা উত্তর হবে তা এটা থেকে জানা যায়।

এটা তৈরি করা খুবই সহজ এবং সম্ভবতঃ অনেকেরই জানা। একটা পাতলা কাঠ বা মোটা পিচবোর্ড-এর ওপর কতকগুলো ছোট-ছোট ছিদ্র করে প্রত্যেক ছিদ্রে একটা করে পিতল বা তামার পিন বা ছোট ছোট [প্রায় 2 ইঞ্চি] তামার তারের টুকরো আটকে নিতে হয়। ছিদ্রের সংখ্যা জোড়া (ever) হওয়া দরকার। এরপর যতগুলো ছিদ্র করা হয়েছে তার অর্ধেক ছিদ্রের পাশে ছোট ছোট প্রশ্ন লেখা হয়। তারপর এইসব প্রশ্নের উত্তরগুলো বাকী অর্ধেক গর্তের পাশে বসানো হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের পাশের পিন বা তারের সঙ্গে ঐ প্রশ্নের উত্তরের পাশের পিন বা তার কাঠ বা বোর্ডের নীচের দিক
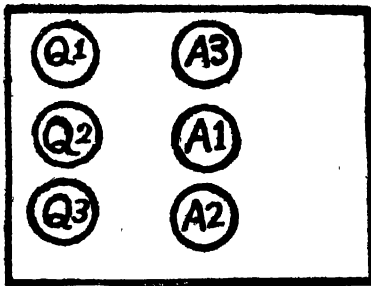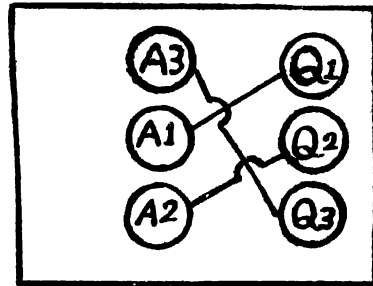
(i) সম্মুখভাগ (ii) পশ্চাৎভাগ

1নং চিত্র

Q_1, Q_2, Q_3 প্রশ্ন তিনটির উত্তর যথাক্রমে A_1, A_2 A_3 হলে প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে তার উত্তর এইভাবে তার দিয়ে যোগ করতে হবে।

দিয়ে রবার ঢাকা তার (rubber-insulated) দিয়ে যোগ করা থাকে (1নং চিত্র)। এটা উল্টোভাবেও করা যায়। অর্থাৎ আগে প্রশ্ন ও উত্তরের তার যোগ করে নিয়ে যে পিন বা তারের সঙ্গে যে পিন বা তারের যোগ আছে তাদের একটায় প্রশ্ন, অন্যটায় সেই প্রশ্নের উত্তর বসানো হয়। এইবার একটা 3 ভোল্ট বা 6 ভোল্ট-এর বৈদ্যুতিক বাতি ব্যাটারীর সঙ্গে লাগিয়ে ঐ বর্তনীর দুটি প্রান্তের এক প্রান্ত যে কোন

*ছাত্র, বেলমুড়ি ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশান্ সায়েন্স ক্লাব, বেলমুড়ি, হুগলী

প্রশ্নের পাশের পিন বা তারে ধরে অপর প্রান্তটা উত্তরগুলোর পাশের পিন বা তারে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে গেলে যে পিন বা তারে লাগলে আলো জ্বলে ওঠে তার পাশের উত্তরটাই সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর।

এখন এইভাবে তৈরী 'জ্ঞানের আলো'র আর একটু পরিবর্তন করলে কি রকম হয় দেখা যাক।

এখানে পরিবর্তন করা হয় শুধু তড়িৎ বর্তনীর সজ্জার। এখানে দুটি তড়িৎ বর্তনীর দরকার হয়। একটা বর্তনীতে থাকে লাল আলো। অন্যটাতে থাকে একটা সবুজ আলো ও একটা তড়িৎ চুম্বক (electromagnent)। লাল আলো (R) সবসময় (ঠিক উত্তর না আসা পর্যন্ত) জ্বলতে থাকে এবং যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ বুঝতে হবে ঠিক উত্তর আসে নি। আর যখন লাল আলো (R) নিভে গিয়ে সবুজ আলো (G) জ্বলে উঠবে তখনই বুঝতে হবে ঠিক উত্তরের পাশের তারে বা পিনে তার ঠেকানো হয়েছে। অর্থাৎ সঠিক উত্তর এসেছে।

2নং চিত্র
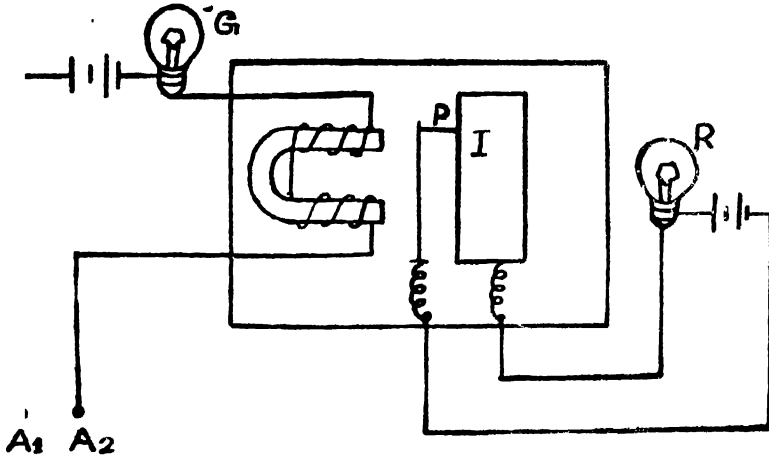
বর্তনীর সজ্জা 2নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। P একটা বিদ্যুতের সুপরিবাহী ধাতুর পিন যেটা একটা লোহার পাতলা পাতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যোগ করা আছে। I একটি তামার পাত যাকে P পিন স্পর্শ করে থাকে। এখন R বাতিটি ব্যাটারীর সঙ্গে যোগ করে বর্তনীর একপ্রান্ত I পাতে অন্য প্রান্ত লোহার পাতের সঙ্গে যোগ করা হল। P পিন I পাতে ঠেকে থাকায় তড়িৎবর্তনী অবিচ্ছিন্ন থাকবে ও R আলো জ্বলবে। কিন্তু P পিন I পাত থেকে উঠে গেলেই বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে আলো নিভে যাবে।

এখন লোহার পাতের ঠিক পাশে একটু ফাঁক রেখে তড়িৎ চুম্বকটি (এখানে U আকৃতি) রাখা হল। এই তড়িৎ চুম্বকের তারের একপ্রান্ত ব্যাটারী ও অন্যপ্রান্ত G বাতির সঙ্গে যোগ করা হল। এখন G বাতি থেকে চুম্বক হয়ে নির্গত এই তড়িৎবর্তনীর একপ্রান্ত (A_1) ও ব্যাটারীর এক প্রান্ত (A_2) যখন কোন প্রশ্ন ও তার সঠিক উত্তরে ঠেকানো হবে তখন সেই প্রশ্ন ও তার উত্তরের সংযোগকারী তারের মাধ্যমে

বর্তনী সম্পূর্ণ হবে এবং সবুজ আলো (G) জ্বলে উঠবে ও তড়িৎ চুম্বক চুম্বকে পরিণত হবে। কিন্তু চুম্বকে পরিণত হওয়ায় এটা কাছের চৌম্বক পদার্থ লোহার পাতকে আকর্ষণ করবে। ফলে P পিন ও I পাতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এজন্য লাল আলো (R) নিভে যাবে।

কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক উত্তর না আসে ততক্ষণ এই দ্বিতীয় বর্তনী সম্পূর্ণ হবে না। ফলে সবুজ আলো জ্বলবে না ও তড়িৎ চুম্বকে (তড়িৎ প্রবাহিত না হওয়ায়) চুম্বকত্ব সৃষ্টি হবে না এবং লোহার পাতকে সে আকর্ষণও করবে না এবং প্রথম বর্তনী অবিচ্ছিন্ন থাকবে ও লাল আলো জ্বলে থেকে একথা জানাবে যে, সঠিক উত্তর এখনও আসে নি।

পশ্চিম বাংলার ব্যাঙ

[রানা হেক্সাড্যাক্টাইলা (লেশন)]

প্রণবকুমার মল্লিক*

এই প্রজাতির ব্যাঙ পশ্চিম বাংলায় কম সংখ্যায় দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে এরা অধিক সংখ্যায় বাস করে (বুলেঙ্গার 1920)। সেই কারণে অনেকেই এদের "দক্ষিণী ব্যাঙ" (South Indian frog) নামে অভিহিত করেন (ভাদুড়ী-1931)। আবার এদের দেহের ঘন সবুজ বর্ণের জন্য ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে ও ওড়িযায় এদের "সবুজ ব্যাঙ" (green frog) বলা হয়। পশ্চিম বাঙলার মানুষের নিকট এরা সাধারণতঃ "কোলা ব্যাঙ" নামেই পরিচিত (1নং চিত্র)।

1নং চিত্র

*রিসার্চ সেণ্টার অন্ ন্যাচরাল সায়েন্স, দুইল্যা, হাওড়া-711302

দৈর্ঘ্যে প্রায় 4-5 ইঞ্চি (তুণ্ডের অগ্রভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত) ঘন সবুজ বর্ণের এই পূর্ণ জলবাসী ব্যাঙটিকে সাধারণতঃ ঘন সবুজ উদ্ভিদের বসতিপূর্ণ জলাশয়ে, বিশেষত পুকুরে দেখা যায়। যেহেতু এরা পূর্ণ জলবাসী, সেহেতু এরা প্রায় সব সময়েই জলে বাস করে। তবে ডাঙাতে যে আসে না তা নয়। আবাসিক পুকুরে বা জলাশয়ে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, খাবারের খোঁজে এবং প্রজনন ঋতুতে উপযুক্ত প্রজনন ক্ষেত্র পছন্দ করার তাগিদে এরা মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে আসে।

রানা হেক্সাডাক্‌টাইলাদের রানা গণের অন্যান্য প্রজাতির ব্যাঙ এবং অন্যান্য গণের ব্যাঙ থেকে খুব সহজেই সনাক্ত করা যায়। নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই এদের সনাক্ত করায় সাহায্য করে।

(1) এদের পৃষ্ঠদেশ সাধারণতঃ ঘন সবুজ বর্ণের কিন্তু অঙ্কদেশের রঙ সাধারণতঃ সোনালী হলুদ বা সাদাটে।

(2) এদের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি সাদা রেখা তুণ্ডের অগ্রভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। (যদিও অনেক সময় দাগটি অস্পষ্ট থাকে বা দেখা যায় না)।

(3) এরা বেশ হৃষ্টপুষ্ট সরলদেহী। কোমরের কাছে কোন খাঁজ নাই।

(4) এদের মাথাটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান হলেও অনেক সময় দেখা যায় দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থের মাপ বেশী এবং নীচের দিকে চাপা। নাসাঞ্চল স্থূলভাবে সরু (obtusely pointed) এবং মুখাগ্রে সামান্য প্রসারিত। নাসারন্ধ্র নাসাঞ্চলের অগ্রভাগের প্রান্তদেশে অবস্থিত।

(5) এই ব্যাঙগুলির সামনের পা পিছনের পা অপেক্ষা ছোট এবং গঠনে কৃশ। আঙুলগুলি সরু সরু ও সুচালো।

(6) এদের পিছনের পাগুলি মাংসল ও স্থূল এবং মোটামুটি ভাবে লম্বা। এই পাগুলি সামনের দিকে প্রসারিত করলে টিবিয়োটার্‌সাল সন্ধিস্থল প্রায় কানের পর্দার নিকট পৌঁছায়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের কাছ পর্যন্তও বিস্তৃত হতে দেখা যায়। পিছনের পাগুলিতে লিপ্ত-পদাঙ্গুলী। অর্থাৎ আঙুলগুলি পাতলা যোজক পর্দার দ্বারা যুক্ত, যেমন হাঁসের পায়ের পাতায় দেখা যায়। এই যোজক পর্দা আঙুলগুলির ডগা পর্যন্ত বিস্তৃত। চতুর্থ আঙুলটি তৃতীয় ও

2নং চিত্র

পঞ্চম আঙুল দুটি থেকে খুব বেশী লম্বা নয় (2নং চিত্র)। প্রতি পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল ব্যতীত আঙুলের মত একটি অতিরিক্ত উপাঙ্গ দেখা যায়। এটিকে বলে 'ইনারমেটাটারসাল টিউবারক্‌ল'

(innermetatarsal tubercle)। এই উপাংগটি পরপর সাজান 3টি বা 4টি টুকরো হাড়ের (ossicles) সমাবেশে গঠিত এবং আকারে ছোট হলেও স্পষ্ট দৃশ্যমান এবং সুচালো। ভিতর দিকের আঙুলের (প্রথম আঙুল) মাপের প্রায় 1-5 অংশ এটির দৈর্ঘ্য (বুলেঞ্জার—1920)। আঙুলের মত দেখতে এই অতিরিক্ত উপাংগটির (ষষ্ঠ) জন্যই এই ব্যাঙের প্রজাতি নামকরণ হয়েছে হেক্সাড্যাক্টাইলা (hexadactyla) (2নং চিত্র)।

(7) এই ব্যাঙদের পিঠের চামড়া মসৃণ। চোখের নিকট থেকে কাঁধ পর্যন্ত প্রতিদিকে একটি করে চামড়ার ভাঁজ থাকে। এই ভাঁজ দুটি একে অপরের সাথে আড়াআড়ি ভাবে সংযুক্ত। এই সংযুক্তি ঘটেছে চোখের পিছন দিয়ে মাথার উপরে। অংকদেশের চামড়া খসখসে যেন দানাদার। গলদেশের নিম্নভাগে এবং উরুর নীচে বড় বড় গুটি (warts) দেখা যায়। উদরাঞ্চলের দু-পাশে এবং দেহের উভয় পাশে সারিবদ্ধ গুটি দেখা যায়। বুলেঞ্জারের (1920) মতে উদরের ও দেহের পাশের সারিবদ্ধ গুটিগুলি সংবেদনশীল।

(8) পুরুষ ব্যাঙের পাশে একটি করে দুটি স্বরথলি থাকে। স্বরথলি হল পুরুষ ব্যাঙদের গৌণ যৌন লক্ষণ। হেক্সাড্যাক্টাইলার এই স্বরথলি দুটির রঙ বাইরে থেকে বোঝা যায় না। কেবল মুখবিবরের তলদেশের (floor) পার্শ্ব কিনারের প্রতিদিকে যে একটি করে ছিদ্র থাকে, তা স্বরথলির সাথে যুক্ত। স্ত্রী ব্যাঙদের স্বরথলি থাকে না। তবে স্ত্রী ব্যাঙদের পুরুষদের মত স্বরযন্ত্র আছে।

(9) একই বয়সের পুরুষ ব্যাঙ সাধারণতঃ স্ত্রী ব্যাঙের তুলনায় আকারে ছোট ও কৃশ।

পূর্বে এই ব্যাঙদের পৃষ্ঠদেশের ঘন সবুজ বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দেহের এই সবুজ রঙ জলজ উদ্ভিদের সবুজ রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে আত্মগোপন করে থাকায় সাহায্য করে। তাই সহজে এদের দেখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের এই ঘন সবুজ বর্ণ অবশ্য নির্ভর করে বাসস্থানে এদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। তবে ঘন সবুজ বর্ণের কোনও অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে না। ঘন সবুজ পরিবেশের পরিবর্তনে এদের স্বাভাবিক রঙের উপর কিছুটা প্রভাব পড়ে বৈ কি। পরীক্ষামূলকভাবে রানা হেক্সাড্যাক্টাইলাকে স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে সংগ্রহ করে অ্যাকুরিয়াম বা চৌবাচ্চার মধ্যে রেখে দেখেছি যে এদের দেহের মনোরম ঘন সবুজ রঙ পরিবর্তিত পরিবেশের প্রভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্রমে ক্রমে কালচে সবুজ রঙে পরিবর্তিত হয়। দেখা গেছে এই প্রকার বদ্ধ স্থানে কয়েক দিন থাকলেও স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসে না। তবে এই রকম ধরে রাখা হেক্সাড্যাক্টাইলাকে, যার দেহের রঙ কালচে সবুজ হয়ে গেছে, স্বাভাবিক পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি যে প্রায় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ক্রমে ক্রমে দেহের পূর্বের ঘন সবুজ বর্ণ ফিরে পায়। আবার এদের মৃতদেহ স্পিরিট বা 10% কোহল বা 4% ফর্মালিন আরকে ডুবিয়ে রাখলে দেহের স্বাভাবিক রঙ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে কালো সিসার রঙে (ভাদুড়ী—1931) পরিণত হয়।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে হেক্সাড্যাক্টাইলা পূর্ণ জলবাসী ব্যাঙ হলেও প্রয়োজনের তাগিদে ডাঙায় উঠে আসে। এরা ডাঙায় লাফ দিয়ে চলাফেরা করলেও আংশিক জলবাসী ব্যাঙদের তুলনায় লাফ দিতে যে অপটু তা বেশ বোঝা যায়। অথচ এরা জলে থাকাকালীন জলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে

সাঁতার দিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। সাঁতার দিয়ে চলাফেরা করার সময় এরা সাধারণতঃ ডুব-সাঁতার দিয়ে স্থান বদল করে। এদের এই আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে জলে ডুব দেওয়ার পূর্বেই এরা ঠিক করে নেয় কোন্ দিকে যাবে এবং সোজা সেই দিকেই অগ্রসর হয়। ডুব-সাঁতারে জলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় সাধারণতঃ দিক পরিবর্তন করে না। তবে ভয় পেলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণে অনেক সময় এরা ডুব দিয়ে অনেক গভীরে প্রবেশ করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে সক্ষম।

হেক্সাড্যাক্টাইলা সাধারণত নিরামিষ আহারেই অভ্যস্ত। আর সেই কারণেই বোধ হয় জলজ উদ্ভিদপূর্ণ পুকুরে বা জলাশয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে। তবে আমিষ খাদ্যে এদের কোন বিরাগ নেই। সুযোগ পেলেই মাঝে মধ্যে ছোট ছোট মাছ বা মাছের বাচ্চাও খেয়ে ফেলে। আমিষ খাদ্যে সাময়িক আসক্তি থাকলেও এরা জাতিভুক নয় (ভাদুড়ী—1931)।

পশ্চিম বাংলায় সব ঋতুতেই হেক্সাড্যাক্টাইলাদের পাওয়া যায়। বর্ষাকালে পুরুষ ব্যাঙদের ডাকই এদের অস্তিত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণত বর্ষাকাল হল ব্যাঙদের প্রজনন ঋতু। এই সময়ে এই প্রজাতির পুরুষ ব্যাঙরা জলে ভাসমান অবস্থাতেই ডাকতে সুরু করে। ডাকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর। স্থূল হৃষ্টপুষ্ট দেহাকৃতির তুলনায় এদের ডাক তেমন জুতসই নয়। ডাক জুতসই নাই হোক স্ত্রী ব্যাঙদের আকৃষ্ট করায় কোন অসুবিধা হয় না। স্ত্রী ব্যাঙেরা কাছে এলে ভাসমান অবস্থাতেই সাথী নির্বাচন কাজটি সুরু হয়। ভাসমান অবস্থাতেই স্ত্রী-পুরুষে মিলন (pairing) হয়। পুরুষ ব্যাঙটি স্ত্রী-ব্যাঙের পিঠের উপর উঠে অগ্রবাহু দিয়ে স্ত্রী-ব্যাঙটির বগলের নীচে বেষ্টন করে। এই ধরণের "জোড় মিলন" বা pairing-কে অ্যাক্সিলারী অ্যামপ্লেক্সাস (axillary amplexus) বলে। এই অবস্থায় ডিমছাড়া ও নিষেক কার্য সম্পন্ন হয়।

হেক্সাড্যাক্টাইলার ব্যাঙাচিগুলিকে অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে দেখলে শোল বা শাল মাছের বাচ্চা বলে ভুল হতে পারে। এই ব্যাঙাচিদের লেজ, মাথা ও ধড়ের যৌথ মাপের অপেক্ষা 2 থেকে $2\frac{3}{4}$ গুণ বড় এবং পশ্চাৎ বরাবর ক্রমশঃ সুরু। লেজের কাঁটাহীন পৃষ্ঠ পাখনাটি সামনের দিকে ধড়ের সাথে মিলিত এবং লেজের অনুরূপ অঙ্কীয় পাখনাটি সামনের দিকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। এদের মুখছিদ্র পিণ্ডবৎ দুটি ওষ্ঠের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ওষ্ঠগুলির রঙ সাদা এবং কালো রঙের রেখার দ্বারা বেষ্টিত। উপরের চোয়ালে (upper jaw) কাইটিনাস (chitinous) দাঁতের সারি এবং নীচের চোয়ালে (lower jaw) অনুরূপ কয়েকটি দাঁত থাকে। ব্যাঙাচি দশায় এরা সাধারণতঃ নিরামিষভোজী ঝাঁজি (hydrilla), শ্যাওলা (spirogyra) প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদ (দাশ—1979) খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

দক্ষিণ ভারত ও সিংহলে সীমাবদ্ধ (বুলেঞ্জার—1920) এই দক্ষিণী ব্যাঙ বা সবুজ ব্যাঙ পশ্চিম বাঙলা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকায় এদের সংস্থানক্ষেত্র খুবই প্রসারিত (ভাদুড়ী—1931)। বুলেঞ্জার (1920) এই প্রজাতিটিকে ভারতবর্ষের আদর্শস্বরূপ ব্যাঙ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে অন্যান্য অনেক প্রজাতির ব্যাঙদের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এদের অবদান আছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদেশে ব্যাঙ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। সেই কারণে

আজকাল হেক্সাড্যাকটাইলা ও অনুরূপ অন্য প্রজাতির ব্যাঙদের "বাণিজ্যিক ব্যাঙ" (commercial frog) বলা হয়। কেবলমাত্র বিদেশেই এদের রপ্তানি হয়, তা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উপাদেয় খাদ্য হিসাবে এদের কদর দিন দিন বাড়ছে। তাই বর্তমানকালে বর্ষাঋতুতে অর্থাৎ এদের প্রজনন ঋতুতে দলে দলে ব্যাঙ ধরিয়েরা গভীর রাত্রে তীব্র আলো, ছিপ ও কোঁচ নিয়ে ব্যাঙ ধরবার জন্য পশ্চিম বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায়। বড় বড় থলে ভর্তি ব্যাঙ নিয়ে বিক্রি করে। এতে যেমন একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর যথেষ্ট আয় বাড়ছে, তেমনই পশ্চিম বাংলার বুক থেকে সবুজ দক্ষিণী ব্যাঙদের ক্রমশঃ অবলুপ্তি ঘটছে। কয়েক বৎসর পরে হয়ত দেখা যাবে এই নয়নাভিরাম ঘন সবুজ বর্ণের দক্ষিণী ব্যাঙ বা পশ্চিম বাংলার "কোলা ব্যাঙ" সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই এদের সংরক্ষণের জন্য সর্বতোভাবে সচেতন থাকা উচিৎ।

পোস্টারে বিজ্ঞান

এ বিশ্ব কি বাসযোগ্য হবে ?

দীপঙ্কর খাঁ*

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে —

সকলের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

এতো এক শাশ্বত কামনা কিন্তু এর বিরুদ্ধে যাচ্ছি আজ আমরাই —

আমরাই আরো ভালো থাকতে গিয়ে ভুল পথে আরো খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছি -

আমাদেরই প্রয়োজন মেটাতে বাড়ছে কল কারখানা,

গাছ কাটা হচ্ছে নির্বিচারে .

বেড়ে যাচ্ছে আবর্জনা — দূষিত হচ্ছে আবহাওয়া,

তার উপর রাস্তায় কর্কশ হর্ন,

প্রতিদিনই কোন না কোন উপলক্ষে মাইকের তারস্বরে চীৎকার, এও এক ধরনের দূষণ,

* 10, গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক 6, ফ্ল্যাট নং-71, কলিকাতা-3

পুণ্যতোয়া গঙ্গাও
আজ অপবিত্র,

সমস্ত শহরের
নোংরা আবর্জনা
তার শরীরে ক্ষতের
সৃষ্টি করেছে।

পালতোলা নৌকার
স্থান নিয়েছে দ্রুতগামী
স্টীম ইঞ্জিন
আর করে চলেছে
বিষোদ্গার,

মানুষের জ্ঞানের
তৃষ্ণা মানুষের
সামনে খুলে দিয়েছে
নিউক্লীয় শক্তির অতুল
বিভব —

কিন্তু মানুষ তাকে
লাগিয়েছে ধ্বংস
আর পরিবেশ
দূষণের কাজে।

এছাড়াও
বসবাসের জন্যে
চলেছে বন সাফ
করার কাজ।

আমাদের উত্তরসূরীদের
কথা ভেবে আমাদের
সজাগ হবার সময়
এসেছে.

নইলে ওদের কাছে
আমাদের কৈফিয়ৎ
দেবার মত কি
থাকবে না, তাই
আজ আমাদের
প্রতিজ্ঞা —

"এ বিশ্বকে এ শিশুর
বাসযোগ্য করে যাব
আমি।
নবজাতকের কাছে এ
আমার দৃঢ় অঙ্গীকার

প্রশ্ন ও উত্তর

(ক)

প্রশ্ন : (1) হাতে কোন ঘষাঘষি না হলেও মানুষের হাতের চামড়া মাঝে মাঝে উঠে যায় কেন ?

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
রামপুরহাট, বীরভূম

(2) আমরা শীতে ও খুব পরিশ্রম করলে ঘামি কেন ? গ্রীষ্মেও খুব ঘামি। এই দুয়ের মধ্যে কি কোন তফাত আছে ? গরমে পাউডার মাখলে কি দেহের কোন ক্ষতি হয় ?

নিরঞ্জন ভৌমিক
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

(3) মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যেমন মৃত মানুষের শরীর থেকে চক্ষু সংগ্রহ করা হয়, সেই রকম রক্তও কি মৃত মানুষের দেহ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভবপর ?

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়
তেওয়ারীপাড়া, হুগলী

উত্তর : (1) মানুষের হাতের তলায় মরা চামড়া—stratified epithelial tissue উঠে যাচ্ছে। নীচের স্তরের রক্তবহা শিরা ও ধমনী মরা চামড়াকে উপরে ঠেলে দিচ্ছে। সুতরাং গাছের ছালের মত মরা চামড়া উঠে যাচ্ছে।

(2) শীত ও গ্রীষ্মে ঘামা একই কথা। পরিশ্রম হলে খাদ্যের মাধ্যমে তাপ সঞ্চিত থাকে। পেশী সঞ্চালনে তা জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। শ্বাসক্রিয়ায় সবটুকু বের হতে না পারায় চামড়া দিয়ে ঘাম হয়ে বেরোয়। সঙ্গে সঙ্গে সমব্যথী স্নায়ুও উত্তেজিত হয়ে নাড়ীর গতি বাড়ায়। পাউডার মাখা ভাল। চামড়ার গ্রন্থির উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বন্ধ হয়। তখন মৃদু মালিশও আরাম হয়।

(3) হাঁ, সম্ভবপর। শরীরের যে কোন কলা (Tissue) বা যন্ত্র (Organ) সংগ্রহ করার রীতি সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে চালু আছে। মৃত্যুর দু'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের দেশে রক্ত ও চোখ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা আছে।

[উত্তর দিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র]

(খ)

প্রশ্ন : (4) রেডিওতে প্রায়ই এরকম কথা বলা হয় যে, এখন অনুষ্ঠান শুনছেন 346 মিটারে এর অর্থ কি ?

দেবেশকুমার শীল
হুগলী

(5) ঝড় কি ও হয় কেন ?

জবা
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

উত্তর : (4) আমরা রেডিও-তে যে অনুষ্ঠান শুনে থাকি, তা শব্দ তরঙ্গরূপে সরাসরি রেডিও-তে আসে না, আসে বেতার-তরঙ্গ (Radio-wave) মারফৎ। এই বেতার-তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের মত প্রতি সেকেণ্ডে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কিন্তু এই বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wavelength) সাধারণ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বড়। এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক মিটার থেকে কয়েক শ' মিটার এবং রেডিও-তে অনুষ্ঠান প্রচারে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। "এখন অনুষ্ঠান শুনছেন 346 মিটারে" বলার অর্থ হল, যে বেতার-তরঙ্গ মারফৎ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য 346 মিটার।

(5) আমাদের পৃথিবীর উপর বায়ুমণ্ডল আছে। সেই বাতাস কখন ধীরে ধীরে, কখনও বা জোরে বয়ে চলে। বাতাসের গতি ঘণ্টায় 30 মাইলের অধিক হলে তাকে ঝড় বলে অভিহিত করা হয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বাতাসের গতি ঘণ্টায় 100 মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

সূর্যকিরণের উত্তাপে বা অন্য কোন কারণে কোন একটি অঞ্চল বেশী গরম হলে সেখানকার গরম বাতাস হাল্কা বলে উপরে উঠে যায়। ফলে সেখানে বায়ুমণ্ডলে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল সৃষ্ট হয়। চাপ সমান করার জন্য চারদিক থেকে বাতাস নিম্নচাপের দিকে ছুটে চলে, অর্থাৎ ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কখনও বা বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসা বাতাস পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) সৃষ্টি করতে পারে ঐ নিম্নচাপটিকে ঘিরে।

[উত্তর দিয়েছেন শিবরাম বেরা]

(গ)

প্রশ্ন ঃ (6) আমরা জানি সমপরিমাণ কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ফ্যাটের জারণে ফ্যাট বেশী শক্তি প্রদান করে। কিন্তু কেন ফ্যাট বেশী শক্তি প্রদান করে ?

গৌতম প্রামাণিক
বাগনান, হাওড়া

(7) কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বন আছে তাহলে কার্বন ডাই-অক্সাইড কি জৈব যোগ ? জৈব ও অজৈবে মূল পার্থক্য কি ?

প্রদীপ চক্রবর্তী
আসানসোল

(8) রান্নঘরে যে ঝুল হয় তা কি ভাবে হয় ? এর রাসায়নিক নাম ও ফরমূলা কি ?

সুভাষ চক্রবর্তী
চন্দননগর, হুগলী

উত্তর ঃ (6) তেল এবং ফ্যাট হচ্ছে গ্লিসারল এবং বহু রকমের জৈব অ্যাসিডের যৌগ অর্থাৎ বলা যায় গ্লিসারিল এস্টার। তেল ও ফ্যাটের আণবিক গুরুত্ব বেশ বেশী হয় এবং এতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের চেয়ে বেশী। তাই ফ্যাটের জারণে অধিক কার্বন পুড়ে বেশী শক্তি দেয়। প্রোটিন অণু গঠিত হয় অনেকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুর সংযুক্তির ফলে। প্রোটিনে —CONH গ্রুপটি থাকে এবং একে পেপটাইড বন্ধন বলে। প্রোটিন অণু জারণেও যথেষ্ট শক্তি পাওয়া যায়। তবে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে প্রোটিনের গঠনের ওপর। কার্বোহাইড্রেটের সাধারণ সংকেত $c_x(H_2O)_y$ এবং এদেরকে বলা হত কার্বনের হাইড্রেট। কিন্তু বর্তমানে কিছু যোগ আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের সংকেত সাধারণ সংকেতের থেকে ভিন্ন। কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (i) সুগার এবং (ii) পলিস্যাকারাইডস। এমন কার্বোহাইড্রেট আছে যার মধ্যে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা যথেষ্ট বেশী এবং সে সব ক্ষেত্রে কার্বহাইড্রেটের জারণে যথেষ্ট শক্তি পাওয়া যায়। তবে সরলতর কার্বোহাইড্রেট জারণে কম শক্তি দেয়।

(7) যাবতীয় জৈব যোগেই কার্বন থাকে। সেই জন্য জৈব যোগকে কার্বনের যৌগ বলা হয়। চাল, গম, তেল, চিনি প্রভৃতি পদার্থের উৎস প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ এবং তাদের জীবিত কোষ থেকে। এজন্য এদেরকে জৈব পদার্থ বলে। জৈব যোগে কার্বন ছাড়া

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি মৌল সাধারণত থাকে। সংজ্ঞা হিসেবে জৈব যৌগে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি আবশ্যিক না হলেও, দেখা যায় যে মোটামুটিভাবে প্রায় সব জৈব যৌগেই হাইড্রোজেন থাকে। প্রাণহীন খনিজ পদার্থ বা জড় বস্তু থেকে যে অ্যাসিড, ক্ষার, লবণ ও গ্যাস পাওয়া যায় তাদের অজৈব পদার্থ বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ধাতব কার্বনেট ইত্যাদি প্রধানত জড় বস্তু থেকে পাওয়া যায় বলে এদের অজৈব যৌগ হিসেবে ধরা হয়।

জৈব ও অজৈব যৌগের মূল পার্থক্য হল :—

(i) জৈব যৌগে কার্বন মৌলটি অবশ্যই থাকবে। কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি মৌল বিভিন্ন যৌগে থাকতে পারে। অজৈব যৌগ 92টি স্থায়ী মৌলের সমস্ত মৌল দিয়েই তৈরি হতে পারে।

(ii) উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট জৈব যৌগ জটিল অণু সৃষ্টি করে কিন্তু অজৈব যৌগে অণুর গঠন অপেক্ষাকৃত সরল।

(iii) জৈব যৌগ প্রধানত সমযোজী যৌগ এবং এরা সাধারণত উদ্বায়ী। এদের গলনাংক, স্ফুটনাংক সাধারণত কম হয়। অজৈব যৌগ প্রধানত তড়িৎযোজী যৌগ। এদের গলনাংক, স্ফুটনাংক অপেক্ষাকৃত বেশী।

(iv) জৈব যৌগ আয়নীয় নয় কিন্তু অজৈব যৌগ বেশীর ভাগই আয়নীয়।

(8) তার্পিন তেল, কেরোসিন তেল প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং এদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কার্বন আছে। পরিমিত বায়ুতে এদের দহন করলে যে শিখা বেরোয় তার সাথে ধোঁয়া হয়ে অতি ক্ষুদ্র কার্বনকণাও বেরোয়। এই ধোঁয়া রান্নাঘরের দেয়াল ও ছাদে ধাক্কা খেয়ে সেখানে কিছুটা ঠাণ্ডা হওয়ায় জমা হয়। একে ভুষা কয়লা বা ভুষাকালি বলে। রান্নার বাষ্প রান্নাঘরের ছাদ ও দেয়ালকে তেলচিটে করে। ঘরের মধ্যে যে সব ধূলিকণা থাকে তারাও দেয়ালের বা ছাদের তেলচিটে জায়গায় আটকা পড়ে। এইভাবে রান্নাঘরে ঝুলের সৃষ্টি হয়। এদের রাসায়নিম গঠন আসলে কার্বন কণার সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। কার্বন কণাগুলি তেলচিটে দেয়ালে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

[উত্তর দিয়েছেন—কমল চক্রবর্তী]

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'** পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা । সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না ।
2. **বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয় । বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা ।** আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা । যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন ।
3. **প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ;** মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে । এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে ।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য । টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না । ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায় ।
5. চিঠিপত্রে **সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন ।**
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না ।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয় । বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং **মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয় । প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন ।** কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয় । প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. **প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয় ।**
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে **চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে ।** প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয় ।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় । উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে । প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে ।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না । কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন । কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না । প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে ।
6. **'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'** পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে ।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তক ও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। বিগত বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 7, জুলাই, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন: 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়ত্রিংশত্তম বর্ষ জুলাই, 1980 সপ্তম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

অপবিজ্ঞান

গুণধর বর্মন

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আকৃতি-প্রকৃতি এবং বিবিধ কার্য-কারণ ঘটনা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান যেদিন নিতান্ত সীমিত ছিল সেদিন অধিকাংশ বিষয়ে নিছক কল্পনার আশ্রয় করেই তার ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছে, জড় ও জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবন-রহস্য, জরা মৃত্যু, রোগশোক, আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি বিষয়ে সহজ ব্যাখ্যা করতে না পেরে তখন সব কিছুকেই কোন এক সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তা মহান স্রষ্টার কার্যকলাপ বলে ভাবা হয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষের যখন জ্ঞানের বিকাশ ঘটে, কার্যকারণ যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় তখন ঐ সব ব্যাপারে কাল্পনিক ধারণাগুলি দূরীভূত হয়। এই ভাবেই বিজ্ঞানের জন্ম এবং তার সাহায্যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে মানুষ তার সভ্যতা ও জীবনমানের উন্নয়ন করে চলেছে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্ধবিশ্বাসের প্রাবল্য বিজ্ঞানের বিকাশ ও অগ্রগমনে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অধ্যাত্মবাদ। এক-কালে সারাপৃথিবীতে রাজশক্তি বা রাষ্ট্রীয়শক্তির পরেই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রাজশক্তির উপরেও ধর্মীয় নেতাদের স্থান ছিল। বিজ্ঞানের অবদানে তাঁদের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়াতে তাঁদের গোষ্ঠীপ্রাধান্য বজায় রাখার জন্যই ধর্মীয় নেতারা বিজ্ঞানের বিকাশে বাধা দিয়ে চলেন এবং এখনও চলেছেন। অধ্যাত্মদর্শনই তাঁদের মূল হাতিয়ার। এই দর্শনের মূল বক্তব্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অতীত কিছু কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ। আর বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে কার্যকারণ, চিন্তাভাবনার সবক্ষেত্র থেকে অলীক কল্পনা দূরীভূত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিষ্ঠা। ধর্মীয় মতবাদ অনুসারে

প্রচলিত অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কথা বলতে গিয়ে কোপার্নিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ মহান বিজ্ঞানীদের জীবনে যে সব দুঃখ-লাঞ্ছনা অত্যাচার ঘটেছে, তা সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মীয় নেতাদের কলঙ্কজনক কাহিনীরূপেই চিরস্থায়ী। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীমহলে ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেই অধ্যাত্মদর্শনের কিছু প্রভাব এখনও রয়েছে। তার ফলে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে, অভ্যাসে আচরণে কিছু অন্ধবিশ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায় অথবা ব্যবহারিক জীবনে অন্ধবিশ্বাসের অভ্যাস-আচরণের ফলেই তাঁরা ঐ কল্পিত অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাস করে চলেন।

এই অধ্যাত্মবাদের বিপজ্জনক দিকটাই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে ভাগ্যবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন করে ফেলা। বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি বা কার্য-কারণ ঘটনাপ্রবাহ যত কিছু চলছে তা সবই ঐ অদৃশ্য সর্বনিয়ন্তা মহান স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে—এটাই অধ্যাত্মবাদের মূল কথা। ফলে ব্যক্তি যে যাই করুক, সব কিছুর গুরুত্ব বা শেষ ফল নির্ভর করছে সেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা ঠাকুরের ইচ্ছাতেই। এই মতবাদ মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ করে তার স্বাভাবিক জীবনে এবং কর্মধারার কোথাও হঠাৎ বাধা বা বিপর্যয় কিছু দেখা দিলেই—একান্তভাবে আশাহত ও কর্মবিমুখ করে তোলে। তাতে তার ব্যক্তিগত এবং দেশ ও সমাজের সমষ্টিগত জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মোদ্যম প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে দেশ ও সমাজের সামগ্রিক ক্ষতি তো হয়ই, অধিকন্তু সে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথগুলি রুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের ভারতভূখণ্ড পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম চিন্তার দেশ নামেই খ্যাত। তার ফলভোগ হয়েছে জীবনযুদ্ধের সর্বক্ষেত্রে আমাদের অবনতি এবং যে দেশ একদা শৌর্যে, সম্পদে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল—তার চরম অধঃপতন ও দীর্ঘ-পরাধীনতা ভোগ। প্রাচীন ভারতের সেই শৌর্য সম্পদের যুগের কথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তখন এ দেশে যুক্তিবাদী জীবনধারার প্রাবল্যই ছিল। অন্ধবিশ্বাস ও অধ্যাত্মবাদের প্রাধান্য ছিল না। এখন এ দেশকে আবার সামগ্রিকভাবে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হলে সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যক্তিজীবনে—সর্বত্রই বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী জীবনধারার বলিষ্ঠ প্রচলন চাই। বৃহত্তর জনজীবনে সুষ্ঠু বিজ্ঞানচেতনা সৃষ্টি করে জনকল্যাণে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ চাই। দেশের চিন্তাবিদ মহল ভাল করেই বোঝেন যে বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া কোন দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। অনুন্নত অনেক দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে বঞ্চিত হয়েও—বিজ্ঞান সাধনার বলে আজ পৃথিবীর শীর্ষস্থানে। জাপান যার বড় উদাহরণ। আর আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমরা এখন অনগ্রসর দেশ হিসাবেই চিহ্নিত, তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাপক বিজ্ঞান চেতনার অভাব।

বিজ্ঞান চেতনার বিরুদ্ধে অধ্যাত্মবাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এখন আর কোন দেশে নেই। তবে বিভিন্ন ভাববাদী ও ভাগ্যবাদী আলোচনার মাধ্যমে সেই মনোভাবকে জিইয়ে রাখা হয়েছে এবং বিজ্ঞানকে সুকৌশলে প্রয়োগ করেই তাদের বক্তব্যের বলিষ্ঠতা প্রমাণে সেই মতবাদে বিশ্বাসীরা চেষ্টা করে চলেছে, এই অপচেষ্টাকে নিশ্চিতভাবে অপবিজ্ঞানই বলতে হয়। অপসংস্কৃতির চেয়ে এর প্রভাব ও লক্ষ্য সমগ্র জীবনপ্রবাহের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর।

সেই ভাগ্যবাদী চিন্তাধারার একটি মারাত্মক শাখা হচ্ছে এ দেশের জ্যোতিষী আলোচনা (Astrology)। যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানের (Astronomy) সঙ্গে তার কিছু সম্পর্ক রয়েছে তাই সুকৌশলে বিভিন্নভাবে জ্যোতিষীরা তাঁদের বক্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মত বলে এক জটিল অপবিজ্ঞানের প্রচার করে চলেছেন। সাধারণ জনমত তাতে বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না। বিশেষ করে যতদিন এদেশের সাধারণ সংবাদপত্রে, সাহিত্য প্রভৃতিতে সেই মতবাদের প্রকাশ চলবে ততদিন এই অপবিজ্ঞান দিয়েই দেশের সামগ্রিক বিজ্ঞানচেতনা ও জনজীবনে

বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ প্রচণ্ড রকমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চলবে। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা কি করে এই অপবিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে উঠেন! এতে এই কথাই ভাবতে হয় বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নিলেও বিজ্ঞানের মূল আদর্শ ও ভাবধারাকে তাঁরা কখনও মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। নিজেদের কিছু বুদ্ধিবৃত্তির জোরে গতানুগতিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা পেয়ে কোন রকমে চাকরী পাওয়ার মনোভাব নিয়েই তাঁরা গড়ে উঠেছেন। কোন স্বকীয়তা, স্বাধীন চিন্তা বা বিজ্ঞানে উদ্ভাবনী মনোবৃত্তি তাঁদের মধ্যে কাজ করে না। শিক্ষাকালে মুখস্থ করার মতই চাকরীজীবনে গতানুগতিকভাবে কিছু গবেষণার কাজও তাঁরা অনেকে করেন। তাতে বিশেষ ফল কখনও পাওয়া গেলেও প্রকৃত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় থাকে না। তাই এদেশের বিজ্ঞানশিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী, বিভিন্ন-স্তরের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রের বাইরে অর্থাৎ তাঁদের ঐ পড়ানর ঘর, গবেষণাগার বা বিভাগীয় ফাইলপত্রের বাইরে আসামাত্র তাঁরা বিজ্ঞানবিরোধী অন্ধসংস্কারের জীবনে অভ্যস্ত থাকেন। এর ফলে এ দেশের বিজ্ঞানশিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি প্রকল্পগুলিতে কোনকালে যথার্থ উন্নতি কি সম্ভব? সাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষক অধ্যাপকদের মধ্যে জ্যোতিষী আলোচনা, ভাগ্য গণনা, কুষ্ঠিবিচার, মাদুলী-কবচ-গ্রহ-রত্ন ধারনের প্রাদুর্ভাব যেমন ব্যাপক, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ জ্যোতির্বিদ্যার (Higher Astronomy) বিশিষ্ট অধ্যাপক ও কর্তাব্যক্তিদের অনেককেই যদি ঐ অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষী আলোচনায় অতি উৎসাহী হতে দেখা যায়, তা হলে এদেশে সুস্থ বিজ্ঞান চেতনা কিভাবে গড়ে উঠতে পারে? এর মূল কারণ প্রাথমিক জীবনে সুস্থ বিজ্ঞান চেতনার অভাব। শিক্ষক মহাশয়গণের অনুকরণে ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে ভাগ্যবাদী চিন্তার দাস হয়ে পড়ে। তাই তারা কোনরকম স্ব-নির্ভর কর্মপ্রচেষ্টায় উৎসাহী না হয়ে সারাজীবন ধরেই ভাবতে থাকে জন্ম সূত্রেই তাদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। তার উপরে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। এই ভাববাদী চিন্তাধারায় এদেশের তরুণ ও যুব সমাজ জীবন নিয়ে কাব্য করেই চলে, কাজ করতে চায় না। কারণ গঠনমূলক কর্মজীবনের প্রেরণা তারা পায় না। শেষ পর্যন্ত শুধু হতাশা ও বিভ্রান্তিতেই ভুগে চলে। ফলে জাতির মেরুদণ্ডটাই ভেঙ্গে যাচ্ছে। সুতরাং জ্যোতিষী বিদ্যাকে যথার্থ অপবিজ্ঞান হিসাবে ঘোষণা করে দেশের সমস্ত চিন্তাবিদ ও সংবাদপত্রাদি বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যমগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে জাতির ভবিষ্যত চিন্তা করে।

গুরুমোহান্তদের আশ্রমগুলিতে অপবিজ্ঞানের যে প্রাদুর্ভাব রয়েছে এখানে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু যখন দেখি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে (গত 4ঠা ফেব্রুয়ারী '80 যাদবপুরে) কালিফোর্নিয়া ভক্তিবেদান্ত ইন্‌স্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে "মলিকিউল অ্যাণ্ড ম্যান" নাম দিয়ে যে সাংঘাতিক রকমের একটি অপবিজ্ঞানের প্রচার করা হয়েছে তাতে হতভম্ব না হয়ে পারা যায় না। এই ঘটনার পিছনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের মতামত কি— যতা বিশেষ ভাবনার বিষয়। তার কিছুদিন পরেই যাদবপুরের কয়েকজন বিজ্ঞানী যে Phantom leaf effect বা Kirlian photography নামে বিজ্ঞানের এক ভৌতিক খেলা দেখিয়েছেন—তার মধ্যে কতখানি বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য রয়েছে তা জানা নেই। তাঁদের কাজ যদি প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত হয়, তবে সেই সংবাদ কোন বিজ্ঞান সভায় বা বিজ্ঞান পত্রিকায় সবিশেষ আলোচিত না হয়ে হঠাৎ সাধারণ পত্রিকার বিশেষ বিজ্ঞাপনের আকারে প্রকাশিত হল কেন? তবে ঐ পত্রিকায় সংবাদ দাতা বা লেখক ঐ সংবাদের বৈজ্ঞানিক সত্যাসত্য যাচাই না করেই তার উপরে দেহাতীত আত্মা প্রভৃতি নিয়ে যে ধরণের বিশেষ রসরচনা সৃষ্টি করেছেন—তাতে ঐ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাববাদী চিন্তাধারায় জঘন্য অপবিজ্ঞানের প্রকাশই ঘটেছে। এইখানে লক্ষণীয় যে এই দুটি

ঘটনার গবেষণা ও প্রচারে (বা অপপ্রচারে) কিছু বিদেশী সংস্থার যোগসাজস ও প্রত্যক্ষ অর্থানুকূল্য রয়েছে। Phantom leaf effect-এর ঐ ভিন বিজ্ঞানী (?) সেই অর্থানুকূল্যে আমেরিকায় চলে গেছেন তাঁদের সেই গবেষণাকে আরও ফলবতী করতে। তাহলে এদেশে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে বাধা দিয়ে অপবিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ছড়াতে বিদেশী চক্রের হাত কতখানি তাও ভাববার কথা! ভারতের বিপুল জনসমাজ বিজ্ঞান সচেতন হয়ে নিজেদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠলে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির কাছে তা বিপদসঙ্কেতই হয়ে দাঁড়াবে, তাই এদেশে অপবিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে ঐ বিদেশী চক্র সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন এবং ঐ ধরণের কার্যকলাপ যাঁদের দ্বারা সম্ভব তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করে যাবেন—এটাই স্বাভাবিক। এদেশের সংবাদপত্রে ও বলিষ্ঠ প্রচার মাধ্যমগুলিতে অপবিজ্ঞানের প্রচার বা বিজ্ঞানের অপপ্রচার সম্বন্ধে আরও বহু বেদনাদায়ক নজীর রয়েছে। তার দু-একটির উদাহরণ উল্লেখ করা বিশেষ দরকার। গত 16ই ফেব্রুয়ারী, 1980 সূর্যগ্রহণকালে এদেশের সাধারণ সংবাদপত্র ও অন্যান্য শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমগুলি যেভাবে অপপ্রচারের দ্বারা সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে সারাদেশের জনমানসে প্রবল ভীতির সঞ্চার করে সাধারণের বিজ্ঞান চেতনাকে কয়েক শত বছর পিছিয়ে দিয়েছে—সেটা কাদের ভুলে বা কোন্ চক্রান্তে? বিভিন্ন বিজ্ঞান সংস্থা ও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পত্রিকা সমূহ সাধারণ সাবধানতাসহ ঐ দুর্লভ সূর্যগ্রহণ অবলোকন করার জন্য সর্বসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল, তবে তাঁদের প্রচারক্ষমতা ছিল সীমিত। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে এবং তাঁদের কথায় ও মতামতে কর্ণপাত না করেই এদেশের সাধারণ সংবাদ পত্র, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমগুলি ঐ রকম অপকর্ম করে বসলেন কেন? এতে প্রথমে একটি কথাই ভাবতে হয় যে, যাঁরা ঐ সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সংবাদ তৈরি করেন এবং যাঁরা তা প্রকাশের নির্দেশ দেন তাঁদের মধ্যে সুস্থ বিজ্ঞান চেতনার একান্তই অভাব। বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা নিয়েও যে দেশে বিজ্ঞান চেতনা জাগে না, সেখানে বৈষ্ণব সাহিত্যে ডক্টরেট বিজ্ঞানসংবাদ লেখলে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি সম্পর্কে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। তাই 'নলজাতক শিশু' নিয়েও এদেশের সাধারণ সংবাদপত্রে যে হৈ চৈ হয়ে গেল তার মূলেও তো ঐ কারণ। এই সব অবৈজ্ঞানিক প্রচারের ফলে বিশ্বের বিজ্ঞান মহলে ভারতের মর্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্নই হয়েছে—বিজ্ঞান সংবাদগুলি যথাযথ পরিবেশণের ত্রুটিতেই। সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিতে (অর্থাৎ আকাশবাণীও দূরদর্শনে) বিজ্ঞান সংবাদ তৈরি ও প্রচারে দক্ষ লোক থাকলেও বেশীর ভাগ কর্মসূচীই নিয়ন্ত্রিত হয় উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা—যাঁদের মধ্যে প্রকৃত বিজ্ঞান চেতনার একান্তই অভাব। সেই একই রোগের প্রাদুর্ভাব। তবে বিজ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগ ছাড়া এই অনুন্নত দেশের সামগ্রিক উন্নতি যে কোন মতে সম্ভব নয় এই কথা যদি দেশনেতা ও বুদ্ধিজীবী তথা চিন্তাবিদমহল আন্তরিকভাবে অনুভব করেন তবে সর্বপ্রথমে অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সক্রিয় হতে হবে। না হলে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রসারই সম্ভব নয়।

আকুপাংচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

শতাধিক বছর আগে বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক অলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস (Oliver wendell Holmes) একটি বই লেখেন, The poet at the breakfast table। হোমস নিজেও ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সৃষ্ট এক চরিত্র আকুপাংচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি তখন কল্পনাও করতে পারেন নি যে সুদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার কর্ণধার চীন পাড়ি দিয়ে এই আকুপাংচারের কথা সারা বিশ্বে প্রচার করবেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় কোন কোন চিকিৎসক এই ধরনের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন অনেকদিন ধরেই, কিন্তু খুব কম লোকই সে খবর রাখতেন বা তা বিশ্বাস করতেন।

গত দশ বছরে এই প্রাচীন সূচ-চিকিৎসা সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অভিনন্দন এবং বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। চীনের হাসপাতালে শল্যচিকিৎসক রোগীর বুক কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে ফেলেছেন এবং রোগী হাসিমুখে কমলা লেবু চুষছেন এ-ধরণের সংবাদ শুনে ও ফটো দেখে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত। অবশ্যই প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয় না। কিন্তু অল্প পরিমাণ anaesthetic দিয়ে বা না দিয়ে যাঁদের এভাবে সজ্ঞান রেখেই বড় বড় শল্যচিকিৎসা করা হচ্ছে তাঁদের আসল রহস্যটা কি? কেউ কেউ এটার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন,—যেমন, অনেকে হারাকারি করতেন বা স্বেচ্ছায় সতীদাহের চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

এছাড়াও বহু ধরণেরব্যাধির চিকিৎসা করা হয়েছে আকুপাংচারের সাহায্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকম সুফল পাওয়া গিয়েছে। এদেশে 'অঙ্কুর' নামক সাময়িক পত্রিকায় শ্রীবিজয় বসু তাঁর সূচ-চিকিৎসার ফলাফলের পরিসংখ্যান দিয়েছেন। বাত জাতীয় রোগে সবচেয়ে বেশী (51%) সুফল পাওয়া গেছে।

তাই সকল চিন্তাশীল লোকেরই একটি প্রশ্ন,—"ধরে নেওয়া যাক চিকিৎসায় সত্যই সুফল পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কেন বা কি করে?"

বর্তমানে এর দুটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে। গত কয়েক বছরে জানা গিয়েছে যে শরীরে আঘাত বা বেদনায় একটি প্রতিক্রিয়া হলো এণ্ডরফিন, এনকেফালিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ। এগুলির বেদনানাশক ক্ষমতা রয়েছে। মরফিন অর্থাৎ আফিমের একটি অংশ মানব শরীরে বিশেষ receptors-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এটা জানা গিয়েছিল কিছু দিন আগে। তখন প্রশ্ন উঠেছিল মরফিনের মত একটা বাইরের জিনিষ (যা

---

*ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-700035

স্বাভাবিকভাবে মানবদেহে আসতেই পারে না) কেন ঐ receptor-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। শরীরে ঐ রকম receptor-এর উপস্থিতি হলোই বা কেন? এখন মনে হয় ঐ স্বাভাবিক বেদনানাশক পদার্থগুলির জন্তই ঐ receptor সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো এই শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার ফলেই সুদূর অতীতে আদিম মানুষের পক্ষে তীব্র আঘাতের বেদনা সহ্য করা বা জ্ঞান হারাবার আগে আস্তানায় ফিরে আসা সম্ভব হতো। বন্দীশালার নিপীড়ন কক্ষে যাঁরা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, তাঁদের অনেকের অভিজ্ঞতা—প্রথমে শারীরিক নির্যাতনের মাত্রা অসহনীয়, খানিকটা পরে বেদনার তীব্রতা কিছু কমে আসে। অনেকের ধারণা আকুপাংচারের ফলে শরীরে বিশেষ স্থানে যে মৃদু যাতনা সৃষ্ট হয় তারই ফলে এণ্ডোরফিন ইত্যাদির সংশ্লেষ ঘটে এবং রোগীর পক্ষে অবিশ্বাস্য রকমের অস্ত্রোপচার সজ্ঞানে সহ্য করা সম্ভব হয়। সে যাই হোক, বিশেষ করে কয়েকজন সুইডিশ বিজ্ঞানী দেখেছেন যে আকুপাংচারের ফলে বাস্তবিকই এণ্ডোরফিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ বিষয়ে বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীতেই গবেষণা হচ্ছে। এইবার দ্বিতীয় কারণটি আলোচনা করা যাক। এ বিষয়ে আমার সমস্ত জ্ঞানলাভ ও গবেষণার মূলে আছে WBSF বা বিজ্ঞান-কর্মী সংস্থার আয়োজিত একটি সভা। একজন চীন ফেরৎ আকুপাংচারিস্ট ডঃ গাঁতাইত সেখানে বক্তৃতা করেন। 1978 খ্রীঃ তিনি একটি চীনা হাসপাতালে আকুপাংচারের সাহায্যে ব্যাসিলারী আমাশয় নিরাময় করতে দেখেন। 1979-এ চীন দেশে যে আন্তর্জাতিক আকুপাংচার সভা হয় সেখানে চীনা বিজ্ঞানী ডঃ চিউ বা কিউ (Quiu) ঐ গবেষণার উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর থেকে জানা গেল যে আকুপাংচারের ফলে শরীরে অ্যান্টিবডি বেড়ে যায় এবং রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। শ্রীগাঁতাইত এবং শ্রীজগজ্জ্যোতি মুখার্জির সঙ্গে এই বিষয়ে একটি গবেষণা আরম্ভ করেছি, এবং তার প্রাথমিক আবিষ্কারগুলি এখানে বর্ণনা করছি।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় (অর্থাৎ, যখন কোন বিশেষ রোগজীবাণু বিপুল সংখ্যায় আক্রমণ করে নি) সূচি-চিকিৎসার ফল কি হবে? তাই ছয়জন স্বেচ্ছাসেবক এবং আমি নিজেদের শরীরে আকুপাংচার করালাম। শ্রীগাঁতাইত আমাদের পেটে ও পায়ে পাঁচটি বিন্দুতেই সূচ ঢুকিয়ে 15 মিনিট বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিয়ে দিলেন। চীনা বিজ্ঞানী তাঁর ব্যাসিলারী ডিসেণ্ট্রির রোগীদের চিকিৎসা করার সময় পেট ও পায়ের এই পাঁচটি বিন্দুতেই সূচ-চিকিৎসা করেছিলেন। প্রথমদিন আকুপাংচারের আগে এবং তিন দিন আকুপাংচারের পরে, দিনের একই সময়ে, আমাদের রক্তরস থেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাহায্যে γ-globulin (গামা গ্লোবিউলিন) অর্থাৎ অ্যান্টিবডি precipitate (পাতিত) করিয়ে নিলাম (দ্রষ্টব্য Hawk's Physiological chemistry) তারপর কলোরিমিটারের সাহায্যে তার পরিমাণ মাপা হলো। আরও নিখুঁতভাবে জেল (gel)-এর মধ্যে IgG এবং anti-IgG-এর প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে IgG (বা, এইভাবে অন্য শ্রেণীর অ্যান্টিবডি) পরিমাপ করা হয় এবং আমরাও এখন এভাবে অগ্রসর হচ্ছি। যা হোক, পাতনপ্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যান্টিবডির পরিমাণ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো আমাদের experimental error নিরূপণ করা। একই ব্যক্তির রক্তরসের একাধিক নমুনা একই সময়ে পরীক্ষা করা হলো এবং অ্যান্টিবডির পরিমাণ নির্ধারণ করা হলো। এভাবে experimental error অনেকটা নির্ণয় করা গেল। পরীক্ষার ফল দেখে মনে হয় তিন দিন আকুপাংচারের পর পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের রক্তেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ কমে গিয়েছিল। 2নং ও 5নং স্বেচ্ছাসেবকের বেলায় 20% এবং 19% কম অ্যান্টিবডি লক্ষ্য করা হয়। 5নং স্বেচ্ছাসেবকের ওপর সূচ-চিকিৎসা আরও চালিয়ে যাওয়া হয়। ছয় দিন পরে তাঁর অ্যান্টিবডি বৃদ্ধিলাভ করে এবং নয় দিন পরে তা

প্রাক্ চিকিৎসার নমবের তুলনায় 11% বেড়ে যায়। (তিন দিনের তুলনায় এটা প্রায় 30% বৃদ্ধি) 6 এবং 7 নং স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষেত্রে আকুপাংচার 10 দিন পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হয়। দু-জনেরই অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। 7নং-এর বেলায় এই বৃদ্ধি হলো 25%। এই স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে 5 জনের ওপর আকুপাংচারের প্রভাব অনস্বীকার্য। অ্যান্টিবডির পরিবর্তিত পরিমাণ experimental error-এর থেকে অনেক বেশি। তা হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত মোটামুটি এরকম দাঁড়াল এই যে "সুস্থ" মানুষের উপর আকুপাংচার তিন দিন পরে অ্যান্টিবডির পরিমাণ কমিয়ে দেয়, আরও পরে বাড়িয়ে দেয়। (আমাদের বেলায় প্রথম দিন আকুপাংচারের পর একদিন বাদ দিয়ে, পর পর আরও দু-দিন আকুপাংচার করা হয়)।

অ্যান্টিবডি প্রোটিনগুলির সংশ্লেষ হয় রক্তের B কোষে। এখন প্রশ্ন হলো—আকুপাংচারের ফলে এই B কোষের সংশ্লেষ কি করে প্রভাবিত হয়? আগামী-দিনের আকুপাংচার কিংবা অণুজীববিদ্যার গবেষণার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সম্প্রতি চীন-দেশের বাইরে ওমুরা (Omura) দেখেছেন যে আকুপাংচারের ফলে 2-7 দিনের মধ্যে অ্যান্টিবডির পরিমাণ বাড়তে থাকে। সাবলোনোভিচ (Sublo-novic) লক্ষ্য করেছেন B কোষ ও T কোষের সংখ্যাও সূচ-চিকিৎসার দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে।

মনুষ্যপ্রকৃতির উৎস সন্ধানে

শ্রীকুমার রায়*

[প্রথম প্রবন্ধে (জুন, 1980) মানুষের শ্রেণী বিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মানুষ ভূচারী, শিকারী প্রাণীতে কিভাবে রূপান্তরিত হল তা আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রাণীবিদের কাছে মানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্গত বানর-বর্গীয় প্রাণী মাত্র। তবু বুদ্ধি এবং সংস্কৃতিতে তো বটেই, এমনকি কয়েকটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যেও বিশাল প্রাণী জগতে মানুষ অতুলনীয়। প্রসঙ্গত মানুষের দাঁড়াবার বা চলার ভঙ্গিটি লক্ষ্য করার মত। প্রাগৈতিহাসিক ক্রেটেসাস্ (Cretaceous) যুগের রাজা-টিরানোসোরাস (Tyrannosauraus Rex) থেকে শুরু করে বর্তমানকালের পাখি, ক্যাঙারু ইত্যাদি অনেক প্রাণীই দ্বিপদী, এবং বানর, ইঁদুর, কাঠবেড়ালি প্রভৃতি আরো অনেকে মাঝেমধ্যে পিছনের দুটি পায়ে ভর দিয়ে বসে। উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এরা দু-পায়ে চলতেও পারে, কিন্তু এরা কেউই মানুষের মত সর্বাবস্থায় দ্বিপদী (Perpetually Biped) নয়। মানুষের এই বৈশিষ্ট্য হল কি করে এবং এর জন্যে তার কিই বা সুবিধা হয়েছিল সে সব প্রশ্ন মনে ওঠে।

প্রত্নতাত্ত্বিক রেমণ্ড ডার্ট (Raymond Dart) এবং রবার্ট ব্রুম (Robert Broom) দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল প্রদেশে যথাক্রমে করোটি এবং শ্রোণী অস্থির যে অশ্মীভূত অবশেষগুলি আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি পর্যালোচনা করে তাঁরা নিঃসন্দেহ হলেন যে আজ থেকে 10-20 লক্ষ বছর আগে অস্ট্রেলোপিথেকস্ (Austrelopithecus) নামের প্রাণীই হল আদিমতম দ্বিপদী। জাভা মানুষ (Java Man), পিকিং মানুষ (Peking Man), হাইডেলবার্গ মানুষ (Hydelburg Man) প্রভৃতি হোমো ইরেকটাসের দল বা আরও পরবর্তীকালের নিয়াণ্ডেরথাল মানুষেরাও ঈষৎ সামনে ঝুঁকে চলত বা দাঁড়াত। বর্তমান মানুষের "সেপাই" সুলভ "প্রস্তুতভঙ্গী" (attention attitude) ক্রোম্যো-সননদের সময় থেকে দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু অস্ট্রেলোপিথেকাসরাই বা প্রায়-চতুষ্পদী মহাকপি থেকে দ্বিপদী প্রাণীতে রূপান্তরিত হল কি করে? ইতিহাসটি মোটামুটি অনুমান-নির্ভর হলেও, পুরাতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে ইতঃবিচ্ছিন্ন, ততঃ-বিক্ষিপ্ত যে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে সেগুলি অনুধাবন করে এবং বাকিটা কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ওয়াশবার্ন (Washburn) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য পূর্ণ চিত্র উপহার দিয়েছেন। তাঁরা বললেন, যে বানর বর্গে মানুষের বিন্যাস, আবির্ভাব লগ্নে তারা ছিল ক্ষুদ্রকায় এবং প্রধানতঃ পতঙ্গভুক। আজ থেকে প্রায় 7-8 কোটি বছর আগে ওই সব ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ীরা মাংসাশী অতিকায় সরীসৃপ, খড়্গদন্তী বাঘ ইত্যাদি হিংস্র প্রাণীদের ভয়ে গভীর জঙ্গলেই আস্তানা করলো। কালক্রমে তাদের এক গোষ্ঠী বিবর্তিত হল মহা-

---

*বি. এফ 118 সল্টলেক সিটি, কলিকাতা-700 064

কপিতে। তারপর শুরু প্লাওসিন (Pliocene) যুগে যখন বিষুবীয় জঙ্গলের বিস্তৃতি কমলো তখন মহাকপিরা জঙ্গলের কিনারায়, [যেখান থেকে শুরু হয়েছে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বা সাভানা (Savanah)] সরে এল এবং ক্রমশ হাতের সাহায্যে গাছ থেকে মাটিতে ওঠানামায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল—খানিকটা কৌতূহলপরবশে, কিন্তু প্রধানতঃ নতুন খাদ্য ভাণ্ডারের সন্ধানে। এই অনুমানের প্রমাণস্বরূপ বর্তমান কালের গোরিলাদের ব্যবহার লক্ষণীয়। এরা আফ্রিকার কঙ্গো প্রদেশের গভীর জঙ্গলের কিনারায় বাস করে। বিশ্রাম, আত্মরক্ষা ইত্যাদি প্রয়োজন ছাড়া এরা দিনের বেশীর ভাগ সময় ভূচারী। এদের প্রিয় খাদ্যের মধ্যে ফল, বাদাম, পাখির ডিম ইত্যাদি পাওয়া যায় গাছের ডালে, আবার মাটিতে পাওয়া যায় সুস্বাদু মূল, আনারস, রুমেস্ক আবেসিনিস্কাস জাতীয় গাছের পাতা, কচি বাঁশ প্রভৃতি। উন্নতমানের হস্তপেশী এবং উরসন্ধির ফলে গাছ থেকে নামা-ওঠা ইত্যাদি নিত্যকর্মে হস্তদ্বয়ের ব্যাপকতর ব্যবহার এরা করতে পেরেছে।

প্লাওসিন যুগের প্রাগৈতিহাসিক মহাকপিরাও পর্যায়ক্রমে একবার গাছে একবার মাটিতে বাস করতে করতে এক সময় বুঝতে পারল দু-নৌকায় পা দিয়ে আর চলবে না, মাটিতে বাস করাই শ্রেয়, কারণ একদিকে যেমন বনভূমি সঙ্কুচিত হয়ে আসছে অন্যদিকে তেমনি মাটির বুকে সোজা দাঁড়িয়ে তারা দেখতে পারছে অনেক দূর, চলতে পারছে দ্রুত, হাত ব্যবহার করতে পারছে যথেচ্ছ। সুতরাং তারা স্থায়ীভাবে ভূচারী হয়ে পড়ল

মানুষের ভূচারী হবার এই ইতিহাসটি বেশ মননযোগ্য হলেও ভূচারী মানুষের দ্বিপদী হওয়ার কাহিনীতে মতপার্থক্য আছে। একদল বৈজ্ঞানিক মনে করেন অস্ট্রেলোপিথেকাসরা অল্ডওয়ান কুঠার (Oldowan Chopper) জাতীয় পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত বলেই তারা দু-পায়ে ভর দিয়ে, অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে হাত মুক্ত রেখে, দাঁড়াতে শিখল। এঁদের যুক্তি হল, শাখামৃগরা গাছের ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে চলাফেরা করলেও গোরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মহাকপিদের মধ্যে প্রায়ই দু-পায়ে দাঁড়াবার প্রবণতা দেখা যায় এবং বহু নিত্যকর্মে এরা হাত ব্যবহার করে। প্রখ্যাত শিম্পাঞ্জীবিশারদ জেন গুডঅল (Jane Goodall) দেখেছেন যে বন্য পরিবেশেও শিম্পাঞ্জীরা হাত দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে, লাঠি ব্যবহার করতে বা মাটি খুঁড়ে খাদ্য সন্ধান করতে পারে। অস্ট্রেলোপিথেকাসদের মধ্যে হাতের ব্যবহার আরও ব্যাপক সুতরাং তারা হাত দুটিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দাঁড়াতে পারবে এতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু রবিনসন (Robinson) প্রমুখ পুরাতাত্ত্বিকেরা এই মতবাদ অস্বীকার করেন। তাঁদের বক্তব্য, মহাকপিরা আগে দাঁড়াতে শিখল এবং তার ফলে যখন হাতের মুক্তি (emancipation of hands) সম্ভব হল তখনই তাদের পক্ষে চলা বা দাঁড়ান ছাড়া অন্য কাজে হাত ব্যবহার করা সম্ভব হল। অন্য এক শিম্পাঞ্জীবিশারদ ডেসমণ্ড মরিস (Desmond Morris) পরোক্ষভাবে রবিনসনের মতবাদ সমর্থন করে বললেন যে শিম্পাঞ্জীরা কেবলমাত্র বন্দীদশাতেই ঢিল ছুঁড়তে বা গাছের ডাল ইত্যাদি লাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, প্রাকৃতিক পরিবেশে নয়। মরিস আরও বললেন যে, কোন চতুষ্পদী প্রাণীকে যদি পেছনের দু-পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তবে স্বতই তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ দ্বিপদী হলেও তার দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী। এর কারণ, গর্ভাবস্থায় চতুষ্পদী প্রাণীশাবকদের করোটি শরীরের সঙ্গে সমকোণে থাকে এবং ভূমিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পূর্বে সেটি মেরুদণ্ডের সঙ্গে সম সরলরেখায় এসে যায় কারণ সমকোণ অবস্থা নিয়ে জন্মালে চারপায়ে চলার সময় তাদের দৃষ্টি সম্মুখপ্রসারী না হয়ে ভূমিনিবদ্ধ হয়ে যেত। মানুষের ক্ষেত্রে চতুষ্পদী বানরের গর্ভাবস্থা (অর্থাৎ করোটী মেরুদণ্ডের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত) ভূমিষ্ঠ হবার পরেও থেকে গেল।

মানুষের দ্বিপদিত্বের কার্য-কারণ পারম্পর্য সম্বন্ধে আবার মধ্যপন্থাবলম্বীদের মত হল এই যে, ধীশক্তির ক্রমোন্নতি, অস্ত্রের ব্যবহার, হাতের মুক্তি এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানো—এই গুণ চতুষ্টয় পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে একে অপরের উন্নতি বিধান করেছে, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় feed back mechanism.

খাদের মাংস সুখাদ্য ও পুষ্টিকর। কিন্তু বানর বর্গের প্রাণীদের পরিপাক প্রণালী কখনই ঘাসের দুষ্পাচ্য সেলুলোজ (cellulose) জাতীয় শর্করাকে সহজ পাচ্য করার উপযুক্ত নয়, পক্ষান্তরে তাদের খাদ্য-তালিকায় আবির্ভাব লগ্ন থেকেই কিছু না কিছু আমিষ খাদ্য (যথা পোকা-মাকড়, পাখির ডিম ইত্যাদি) থেকে গেছে। তাই তারা কাঁচা মাংসকেই
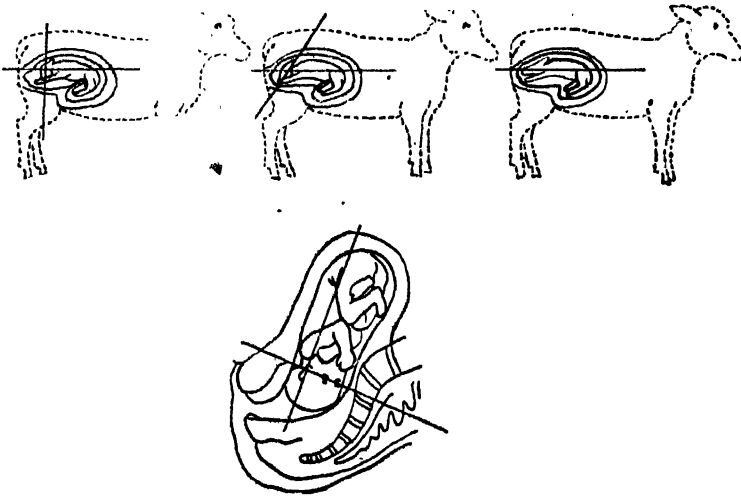
1নং চিত্র

উপরে—চতুষ্পদ প্রাণীর গর্ভাবস্থা। লক্ষণীয় প্রথমে মুণ্ড শরীরের সঙ্গে সমকোণে থাকে। জন্মের পূর্বে শরীর ও মুণ্ড সরলরেখায় হয়ে যায়। নিম্নে—মানুষের গর্ভাবস্থা—মুণ্ড সকল সময়ে এমনকি জন্মের পরও শরীরের সঙ্গে সমকোণে থাকে।

যাই হোক, আজ থেকে প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে মহাকপিরা দ্বিপদী, ভূচারী অস্ট্রেলোপিথেকাসে বিবর্তিত হয়ে উপলব্ধি করল যে, মাটির বুকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে সমসাময়িক তৃণভোজী এবং মাংসাশী প্রাণীদের সঙ্গে যারা তাদের অনেক আগে থেকেই জমি দখল করে রেখেছে। সুতরাং তাকে হতে হবে দক্ষতর শিকারী বা অধিকতর চারণপটু কারণ মাটির বুকে খাদ্য বলতে বোঝাত সাভানার তৃণ বা সেই তৃণ-ভূমিতে বিচরণকারী হরিণ প্রভৃতি অহিংস প্রাণী প্রধান খাদ্য (staple food) হিসাবে বেছে নিল। ভূচারী মহাকপি শিকারী অস্ট্রেলোপিথেকাসে রূপান্তরিত হল।

কিন্তু আমাদের সেই সব পূর্বসূরীরা প্রথমে ছিল অপটু শিকারী। খড়্গদন্তি বাঘের মত বড় বড় হিংস্র শ্বাপদের কথা ছেড়ে দিলেও একটা সামান্য নেউলও তাকে শিকার প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিত, হরিণ প্রভৃতি প্রাণীদের সঙ্গে না পারত তারা দৌড়ে আবার ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে তারা দৈহিক ক্ষমতায় এঁটে উঠতে পারত না।

2নং চিত্র—মানুষের বিবর্তন বৃক্ষ (কালে বিধৃত)

1. প্রথম প্রাণী, 2. বানরবর্গ (Order-Primate), 3. প্রোসিমিয়ান (Pro-Simian), 4. সিমিয়ান (Simian), 5. পশ্চিম গোলার্ধের বানর, 6. অলিগোপিথেকাস (Oligo-pithecus), 7. প্রো-প্লায়োপিথেকাস (Pro-pliopithecus), 8. পূর্ব গোলার্ধের বানর, 9. প্রো-কন্সাল (Pro-consul) বা মহাকপিদের পূর্বপুরুষ, 10. প্লায়োপিথেকাস (Plio-pithecus) বা গিবনের পূর্বপুরুষ, 11, 12, 13. গোরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, 14. রাম পিথেকাস (Rama Pithecus), 15. অস্ট্রেলোপিথেকাস (Austrelopithecus), 16. প্যারান্থ্রোপাস (Paranthropus), 17. হোমো-ইরেকটাস (Homo Erectus), 18. হোমো সেপিয়ান্স (Homo Sapiens), 19. মধ্যপ্রাচ্যের নিয়াণ্ডারথাল (শানিদার মানুষ), 20. ইউরোপের নিয়াণ্ডেরথাল, 21 ক্রোম্যাগনন (Cromagnon)।

সুতরাং সেই সব অস্ট্রেলোপিথেকাসরা বেশ কয়েক লক্ষ বছর কাটিয়ে দিল হায়নার মত উচ্ছিষ্টভোজী (scavenger) হয়ে। অবশ্য তারা স্বাধীন ভাবেও ছোট ছোট জন্তু বা জন্তুশাবক, মাছ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ করতো বই কি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, লিকি, রবিনসন প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দক্ষিণ আফ্রিকার ওল্ডোভাই (Oldovai) থেকে অস্ট্রেলোপিথেকাসের সমসাময়িক প্যারান্থ্রোপ্যাস (Paranthropus) নামে অপর এক ভূচারী মহাকপি গোষ্ঠীর জীবাশ্ম আবিষ্কার করেছেন। এই সব মহাকপি অবশ্য নতুন পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজনে তাদের পুরানো আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করতে পারল না; তারা না পারল আমিষ খাদ্যে অভ্যস্ত হতে, না পারল অস্ত্র ব্যবহার করতে। তাই অনেকটা মানুষে বিবর্তিত হয়েও সম্পূর্ণ মানুষ হতে তো পারলই না, কালক্রমে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল কারণ আমরা আগেই বলেছি জীব বিবর্তনে স্থাবরত্বের স্থান নেই। অথচ অস্ট্রেলোপিথেকাসেরা দ্রুত বিবর্তিত হল হোমো-ইরেকটাসে।

মনুষ্য প্রকৃতির বিবর্তনে তাদের শিকারী প্রাণীতে উদ্বর্তন নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শারীরস্থানিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বানর-সুলভ আচার-আচরণগুলিও আমূল পরিবর্তিত হতে শুরু করল। উদাহরণ স্বরূপ কায়িক শ্রমের কথাই ধরা যাক। বানর বা মহাকপিদের খাদ্য প্রচুর এবং সহজলভ্য। গাছের ডালে ফলপাতা তৈরি, কেবল হাত বাড়িয়ে পাড়া আর খাওয়ায় যা পরিশ্রম। স্বতই বানরেরা অলস প্রকৃতির। কিন্তু আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হত অনেক দক্ষতর প্রাণীদের সঙ্গে শিকার প্রতিযোগিতা করে সুতরাং তার শারীরিক পরিশ্রম গেল অনেক বেড়ে। মানুষের গাত্রচর্মেও সেই পরিশ্রমের ছাপ পড়ে তাকে বানরগোষ্ঠীতে এক বৈশিষ্ট্য এনে দিল ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন।

স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণীদের অন্যতম শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য হল যে তাদের গাত্রচর্ম ঘন লোমে আবৃত। অবশ্যই এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু ওই শ্রেণীর অন্তর্গত বানরবর্গে যে 193 রকম প্রজাতি দেখা যায় তার মধ্যে নগ্ন নামে বানরটির গাত্রচর্মেই তুলনামূলক ভাবে লোম কম। পণ্ডিতেরা এই আপাতঃ অর্থহীন শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করতে অনেক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন কেউ কেউ বলে ফেললেন মানুষ একেবারে শাখাচারী অবস্থা থেকে ভূচারী প্রাণীতে বিবর্তিত হয় নি, তারা মধ্যের কয়েক লক্ষ বছর জলচারী হয়ে কাটিয়েছে (প্রসঙ্গত হিপোপটেমাস্, তিমি প্রভৃতি জলচর স্তন্যপায়ীর গাত্রচর্ম নির্লোম)। কিন্তু মানুষের সে তুলনায় লোম কম তার কারণ হিসাবে বলা যায় শিকারী মানুষের কায়িক শ্রম। স্তন্যপায়ীরা উষ্ণশোণিত প্রাণী অর্থাৎ তারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ নিজেরাই সৃষ্টি করে এবং সংরক্ষণ করে। আভ্যন্তরীণ তাপ সংরক্ষণের দুটি উপায়, প্রথমত গাত্রচর্মে ঘন লোমের আবরণ এবং দ্বিতীয়ত ঠিক চর্মের গভীরে চর্বির স্তর। প্রথম উপায়টি ভূচারী স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয় উপায়টি তিমি প্রভৃতি জলচর স্তন্যপায়ীর তাপ সংরক্ষণের অস্ত্র। মানুষ শিকারী বানর বলে কায়িক তাপ অন্যান্য বানরের তুলনায় কিছু বেশীই তৈরী হয়। শরীরের আভ্যন্তরীণ তাপসাম্য বজায় রাখতে গেলে অতিরিক্ত তাপ বিকিরিত হওয়া দরকার। সুতরাং তার শরীর ঘন লোমে ঢাকা হলে, চলে না, আবার অপেক্ষাকৃত কম লোম থাকার ফলে চর্মের মাধ্যমে যাতে অতিরিক্ত তাপ প্রবাহ না হয় তার জন্যে চামড়ার নীচে চর্বির একটি প্রলেপও মানুষের গাত্রচর্মে বৈশিষ্ট্য এনে দিল।

বনজ সম্পদ ও তার সংরক্ষণ

রণতোষচক্রবর্তী*

[বনজ সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম। উত্তর বঙ্গের জঙ্গল প্রয়োজনীয় অনেক বৃক্ষরাজি ছাড়াও প্রাণী সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। জলদাপাড়া, মাদারিহাট, চিলাপাতা প্রভৃতি বনাঞ্চল লেখক ঘুরেছেন। ওখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ কি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং তা কিভাবে বন্ধ করা যায় সে কথাই এখানে আলোচিত হয়েছে।]

উত্তর বঙ্গের বনজ সম্পদ সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের বনজ সম্পদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি ডিভিসনের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল প্রয়োজনীয় বৃক্ষরাজি ছাড়াও প্রাণী-সমৃদ্ধ। সরকারী পরিচালনাধীন এই সব বনাঞ্চল-এর রক্ষা ও উন্নতি সাধনে সরকার সর্বদাই তৎপর। তবে বর্তমান বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর বঙ্গের এই বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ কিছুটা বিপন্ন। কিছুকাল আগে আমি ও সহকর্মী বন্ধু অধ্যাপক প্রবীরকুমার গাঙ্গুলী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চল ঘুরে যা প্রত্যক্ষ করেছি তারই কিয়দংশ এখানে আলোচিত হচ্ছে।

বনজ সম্পদ

উত্তরবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি ডিভিসনের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। পশ্চিমে জলদাপাড়া থেকে শুরু করে মাদারিহাট-চিলাপাতা হয়ে ভূটান সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর প্রভাবে এখানে শাল, একজাতীয় মেহগনি, শিশু, খয়ের, শিমুল, চাপ, গামার প্রভৃতি মূল্যবান গাছ হয়ে থাকে। বর্তমানে সেগুন চাষেরও চেষ্টা চলছে। ব্যবহারিক দিক থেকে এসব গাছের প্রয়োজন ও মূল্য সহজেই অনুমেয়। এছাড়া এসব এলাকা বেতগাছের পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল। প্রাকৃতিক নিয়মেই এই বনাঞ্চল বহু প্রাণীর আবাসভূমি। গণ্ডার, হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, শূকর, শম্বর, হরিণ, বাইসন ছাড়া পাখির ভেতর জাতীয় পাখি ময়ূর এখানে রয়েছে। রকমারী মাইগ্রেটরী (যাযাবর) পাখিরও এখানে আগমন হয়—বিশেষ করে শীতকালে। পশুদের ভেতর উল্লেখযোগ্য এক-শিংবিশিষ্ট গণ্ডার যাদের সংখ্যা বেশ কমে গিয়েছিল, বর্তমানে এই সব এলাকায় এরা অবশ্য বাড়তির দিকে। এই সব অরণ্যাঞ্চল থেকে আয়ও কিছু কম নয়। বছরে অন্ততঃ বেশ কয়েক লক্ষ টাকা সরকারী ভাণ্ডারে জমা পরে।

রক্ষণ ব্যবস্থা

বনজ সম্পদ রক্ষা ও পরিচালনা ব্যবস্থায় মূলতঃ ইংরেজ আমলের পদ্ধতিই এখনও বহাল আছে। সরকারী প্রণালী অনুসারে যে কোন বিশাল অরণ্যাঞ্চল (ডিভিসন) কয়েকটি রেঞ্জ-এ ভাগ করা হয়—প্রতি রেঞ্জ-এর পরিচালনার ভার একজন রেঞ্জ অফিসারের উপর ন্যস্ত। প্রতি রেঞ্জ আবার এর

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা 700009

আয়তন অনুযায়ী কয়েকটি বিট-এ বিভক্ত। বিট দেখার ভার একজন বিট অফিসারের উপর থাকে। জঙ্গল পরিচালনার ব্যাপারে একটি বিটকে একক বলা যেতে পারে। রেঞ্জ অফিসার বা রেঞ্জার তার অধীনস্থ এলাকার দায়িত্বে থাকেন, যদিও বিশেষ কতকগুলি কাজের জন্য তিনি তার উপরের ডিভিসনার ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে (D.F.O) যোগাযোগে কাজ করেন।

বিভিন্ন সমস্যা

উত্তর বঙ্গের বনজ সম্পদ খুবই সমৃদ্ধ। মূল্যবান খয়ের, শিশু প্রভৃতি গাছ অপহরণ বা বন্য প্রাণী যেমন হরিণ বা গণ্ডারের শিং অপহরণ এখানকার বিভিন্ন সমস্যার ভেতর অন্যতম। সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা এই সব কাজে লিপ্ত। অনেক জায়গায় জঙ্গলের খরস্রোতা তোরসার জলে গাছ কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হয়—দূরের কোন সুবিধামত জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়। অনেক জায়গায়ই বর্তমানে জঙ্গলের ভেতর গাড়ী যাতায়াতের রাস্তা হয়েছে। এই সব রাস্তায় ফরেস্ট বিভাগের বিনা অনুমতিতেই গাড়ী যাতায়াত করতে পারে। ফলে অরণ্য সম্পদ অপহরণে অধিকতর সুবিধা হয়েছে। অনেক স্থানে জঙ্গলের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ উপজাতিরা সরকারী ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট থাকায় জঙ্গল রক্ষায় এদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এদিককার অন্য একটি বিশেষ সমস্যা হচ্ছে—যদি হাতী অস্বাভাবিক আচরণ সুরু করে এবং শস্যের ক্ষতি বা মানুষের, প্রাণহানির কারণ হয়, তাহলে সেই জন্তুকে মারবার অনুমতি পাওয়া বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়া গত কয়েক বছর থেকে হাসিমারা অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ঘাঁটি তৈরী হওয়ায় বনজ সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। সদাচঞ্চল বিমান-ঘাঁটির প্রচণ্ড শব্দ শান্তিপ্রিয় প্রাণীদের এমনকি উদ্ভিদদের পক্ষেও খুবই ক্ষতিকর। এছাড়া পাখিদের বেলায় বলাই বাহুল্য—অনেক যাযাবর পাখি এ অঞ্চলে আসাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে।

সমাধানবিষয়ক আলোচনা

বর্তমানে যেভাবে বনজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাদের মূল কারণ প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, যেমন (1) জঙ্গল পরিচালনা ব্যবস্থা, (2) জঙ্গলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত উপজাতি সমস্যা, (3) বনজ সম্পদ ও জনসাধারণ।

জঙ্গল পরিচালনায় সরকারী ব্যবস্থাপনা বর্তমানে অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ। রেঞ্জার বা বিট অফিসারগণকে সরকারী কাজের দায়িত্বে যাবতীয় শহুরে ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে বনবাসী হয়ে থাকতে হয়। এদের দায়িত্ব যথেষ্ট, দায়িত্ব পালনে ঝুঁকিও আছে। জঙ্গলে শক্তিশালী দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করার মত শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই এদের নেই। এই দায়িত্ব পালনে উত্তর বঙ্গেই সরকারী কর্মীকে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে। সেই দিক থেকে, বনজ সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে তাদেরকে বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী করা উচিত, যেমন রেঞ্জারের অধীনেই জঙ্গল পুলিশ (রেল পুলিশের মত) এবং সেই সঙ্গে অপহরণকারীর বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ জঙ্গল অধিকর্তার উপর ন্যস্ত করা উচিত। জঙ্গল পরিচালনায় সরকারী কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও সেই সঙ্গে কর্তব্যপালনে প্রাণহানি হলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (compensation) দিতে হবে। কোন প্রাণীর অস্বাভাবিক আচরণে জঙ্গলের অন্য প্রাণীর বা মানুষের আশংকার কারণ ঘটলে তাকে মারবার ব্যবস্থা সেই জঙ্গলের রেঞ্জারের উপরই ন্যস্ত করা উচিত।

উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গলের সঙ্গে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে যুক্ত তারা হচ্ছে বিভিন্ন উপজাতি। এরা সরল, বিশ্বাসী ও সাহসী। সরকারী নিয়ম অনুসারে এই সব উপজাতি জঙ্গলের ধারেই 5-6 বিঘা জমিতে থাকতে পায়, দৈনিক মজুর হিসাবে জঙ্গলের কাজ করে—কিন্তু বছরের 4-5 মাসের বেশী এরা কাজ পায় না। কাজেই বাকী সময় চাষের উপর এদের নির্ভর করতে হয়, যার দ্বারা এদের জীবিকা মোটেই চলে না।

উপরন্তু বনের প্রাণীরা এদের শস্যের ক্ষতি এমনকি সময় সময় প্রাণহানিরও কারণ হয়ে থাকে। সরকারী ব্যবস্থা এসব ব্যাপারে মোটেই যথেষ্ট নয়, ফলে উপজাতিরা প্রায়ই সরকারী পরিচালনায় সন্তুষ্ট নয়, এবং সহযোগিতাবিমুখ। উপজাতিদের অর্থনৈতিক দুর্বলতায় সুযোগে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এদের চড়া সুদে টাকা ধার দেয় এবং এদের কাজে লাগায়। একই কারণে দুর্বৃত্তশ্রেণী এদের সহায়তায় বনজ সম্পদ অপহরণ করে থাকে। কেন না এই সব উপজাতির সহযোগিতা ছাড়া বনজ সম্পদ রক্ষা অসম্ভব এবং চিন্তা করাও অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে এরাও যেন বনজ প্রাণীর অংশ। বনজ সম্পদ রক্ষায় সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকারী ব্যবস্থায় এদের অর্থনৈতিক ও নৈতিক মান উন্নত করা একান্ত প্রয়োজন। এরাই হচ্ছে জঙ্গল রক্ষার প্রধান রক্ষা-কবচ।

বর্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জঙ্গলের আশে-পাশে লোকবসতি যথেষ্ট বেড়েছে। সাধারণকে জঙ্গল সম্বন্ধে সচেতন করা অতি-প্রয়োজনীয়। এখনও আমাদের দেশে বনজ সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সাধারণের কাছে তেমন করে তুলে ধরা হয় নি, যার প্রয়োজন বর্তমানে অতি-শহুরে পাশ্চাত্য দেশ বেশ ভালভাবে বুঝতে পারছে। এবিষয়ে আরও ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক ভাষা এসপেরান্তো

শ্যামসুন্দর পাল*

[বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষ অপর প্রান্তের মানুষের অনেক কাছে এসে গেছে। এর ফলে পরস্পরকে জানার আগ্রহ মানুষের বেড়েছে। এজন্যে চাই ভাষা। এমন কোন যন্ত্র আজও আবিষ্কার করা যায় নি যার দ্বারা একটি লোক যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন তা কোন শ্রোতার কানে যখন পৌঁছাবে তখন তা শ্রোতার জানা ভাষায় অনুবাদ হয়ে পৌঁছাবে। তা নাই বা হল যন্ত্র? যে যুক্তির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে, সেই যুক্তির সাহায্যেই কৃত্রিম উপায়ে একটি অভিনব ভাষা তৈরি করা হল; এই ভাষাটির নাম হচ্ছে এসপেরান্তো]

সারা পৃথিবীব্যাপী একটি সহজ ও সুন্দর ভাষার প্রয়োজনীয়তা মানুষের বহু দিনের। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ দেকার্তে 1629 খৃস্টাব্দে লিখেছিলেন,—"আমি এমন একটি বিশ্বজনীন ভাষার কথা ভাবছি যা সহজে শেখা যায়, লেখা যায়, বলা যায়, আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে,—এটি সমস্ত রকম ভাবপ্রকাশের এমন একটি সুন্দর হাতিয়ার হবে যে, বলতে গেলে এই ভাষায় ভুল করাটাই একটা অসম্ভব ব্যাপার হবে।"

কিন্তু এর পর প্রায় আড়াই-শ' বছর কেটে গেলেও কয়েকটি বিশেষ ভাষার উপর নির্ভরতা বাড়ানো ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই করা যায় নি। বিদেশী ভাষার অসুবিধা অনেক; সে ভাষাটি যাদের মাতৃভাষা তাদের সুবিধা হয় সর্বাধিক, ভাষাগত সাম্য এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার উপর আছে জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন। বিশ্ব এসপেরান্তো সংস্থার সভাপতি ডঃ টনকিন 1979 সালে তাই আক্ষেপ করে বলেছিলেন,—ধর্মগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত প্রভৃতি নানাবিধ সাম্যের কথা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেলেও ভাষাগত সাম্যের ভাবনা কিন্তু পিছিয়েই রয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা তৈরি করা বড় সহজ কাজ নয়। পৃথিবীতে এখন প্রায় 3000 বিভিন্ন ভাষায় মানুষ কথা বলে। সুদূর অতীতে কিন্তু এত ভিন্ন প্রকার ভাষা ছিল না। মূল কয়েকটি ভাষা বিকৃত হতে হতে ভাষার বিচিত্রতা বেড়ে উঠেছে। ভাষা সম্বন্ধে বা তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যখন মানুষ সংরক্ষণ-সচেতন ছিল না, তখনই ভাষাগুলি বিকৃত হতে হতে বেড়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে ভলটেয়ার বলেছেন, "অগাষ্টাসের রাজত্বকাল থেকে অ্যাটিলা ক্লড উইগ ও গনদেবন্দ-এর সময় পর্যন্ত চার শতাব্দীকাল পরিচিত জগতে কেবল একটি ভাষা ছিল। ইউফ্রেটিস থেকে এট্‌লাস পর্বত পর্যন্ত লোকে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতো। বর্তমানে বের্গামোর কোন গ্রাম্য লোক, খালি একটি ছোট পাহাড় দিয়ে আলাদা করা সুইস ক্যান্টন থেকে যদি আসে, তার

*35/1, কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া-1

একটা দোভাষীর দরকার হয় যেন সে চীনে ছিল। জীবনের এটা একটা দুর্ভাগ্যতম জিনিস।"

1887 খৃস্টাব্দে ডাঃ জামেনহফ নামে এক ইহুদী চিকিৎসক ভাষাগুলির বিভিন্নতা সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি দেখলেন সমস্ত ভাষাতেই এমন কিছু জিনিস আছে যা ভাব প্রকাশের জন্য আবশ্যিক নয় এবং সেগুলিই ভাষাগুলিকে জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। আমাদের মত করে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। বাংলায় বা হিন্দিতে সর্বনাম ও ক্রিয়াগুলি সম্মান বা ঘনিষ্ঠতা সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয় কিন্তু ইংরেজীতে হয় না। আবার হিন্দিতে লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় যা বাংলায় হয় না। বচন ও পুরুষ ভেদে বিভিন্ন কালের রূপগুলি এক এক ভাষায় এক এক রকম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এত রকমের পরিবর্তন না করলেও ভাব প্রকাশে কোন অসুবিধা হয় না পৃথিবীর সব ভাষাগুলি এমনি করে তুলনা করে দেখলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়।

ডাঃ জামেনহফ দেখালেন, এত পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নাই। মাত্র 16টি ব্যাকরণের নিয়মই মানুষের সমস্ত প্রকার ভাব প্রকাশের জন্য যথেষ্ট, বাকী যা, তা বাড়তি 'Internacia Lingvo' এই শিরোনামায় এবং D-ro Esperanto এই ছদ্মনামে, 1887 খৃস্টাব্দে ডাঃ জামেনহফ কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে একটি কৃত্রিম ভাষার রূপরেখা ফুটিয়ে তোলেন এবং এই ভাষাটিই পরবর্তী কালে এসপেরান্তো নামে পরিচিত হয়। ভাষাটিকে তিনি এমন একটি সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক নিয়মে বেঁধে ফেললেন যে ভাষাটি হয়ে উঠলো প্রায় বক্তব্য প্রকাশের অপেক্ষক।

ভাষাটির জন্য রোমান বর্ণমালাকে সামান্য সংস্কার করে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের সঙ্গে উচ্চারণগুলি সম্পূর্ণ সাযুজ্য রেখে চলে। একটি অক্ষরের জন্য একরকম ধ্বনি পাওয়া যায় এবং অক্ষরের বিন্যাস ভেদে ভিন্ন রকম উচ্চারণ হয় না। প্রতিটি অক্ষরই উচ্চারিত হয়। উচ্চারণের ঝোঁক (accent) সব সময় শেষের আগের স্বরবর্ণে পড়ে। শিল্পের কাঁচামাল যেমন প্রকৃতি থেকে আহরণ করা হয় তেমনি এই কৃত্রিম ভাষাটির জন্য শব্দমূল বা ধাতুমূলগুলি আহরণ করা হয়েছে পৃথিবীর সমৃদ্ধতম বনেদী ভাষাগুলি থেকে। এই ভাষায় 16টি উপসর্গ (Prefix) ও 31টি প্রত্যয় (Suffix) আছে। মূলগুলির সঙ্গে এই প্রত্যয় ও উপসর্গগুলির বিন্যাস বা সমবায়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করা যায়। এই কারণে অল্প কয়েকটি মূল জানা থাকলে অনেক শব্দের অর্থ জানা যায়। একটি মূল থেকে 40টি পর্যন্ত শব্দ গঠনের নজীরও আছে। তবে গড়ে একটি মূল থেকে 10টি শব্দ খুব সহজেই পাওয়া যায়। এই ভাষা সৃষ্টিকালে মাত্র 904টি মূল ছিল পরে পৃথিবীর বহু দেশে এর ব্যাপক বিস্তারের ফলে অনেক মূল সংগৃহীত হয়েছে। এস-পেরান্তো অভিধান Plena Ilustrio Vortaro-তে বর্তমানে প্রায় 16,000 মূল পাওয়া যায় যা থেকে খুব সহজেই 16,0000টি শব্দ গঠন করা যায়। মূলগুলি যদিও বেশীর ভাগ সংগৃহীত হয়েছে ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান, স্বাহিলী, সের্বো ক্রোট প্রভৃতি ভাষা থেকে তবুও নীতিগতভাবে এই ভাষায় এরকম একটি সংস্থান আছে যে যখন এই ভাষা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়বে তখন সেই সব স্থানের সমৃদ্ধ বনেদী ভাষা থেকে মূল চয়ন করা যাবে। চীন ও জাপানে বর্তমানে এই ভাষা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এই কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে।

এই ভাষায় কর্মকারকগুলি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত থাকায় এবং বিশেষণগুলি বিশেষ্যের সঙ্গে সমান ভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় (অনেকটা সংস্কৃতের মত) শব্দগুলি বিন্যস্ত হলেই বাক্য পরিণত হয়। বাক্য গঠনের এই অপূর্ব স্বাধীনতা ভাষাটিকে এক অনুপম কাব্যিক বৈশিষ্ট্য ও ভঙ্গিমাময় সৌন্দর্য (stylistic beauty) প্রদান করে।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য এই ভাষা শেখা অত্যন্ত সোজা। এল. এন. টলস্টয় একবার বলেছিলেন,

এটা শেখা এত সোজা যে, ছ'বছর আগে আমি যখন একটা এসপেরান্টো গ্রামার, একটা ডিকশনারি এবং ঐ ভাষায় লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ পেলাম তার দু-ঘণ্টার মধ্যেই ঐ ভাষায় লিখতে না পারলেও স্বচ্ছন্দে তা পড়তে পেরেছিলাম।

পৃথিবীর বহু বিজ্ঞান সংস্থা বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে এসপেরান্তোর ব্যবহারের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। এইগুলির অন্যতম হলো Science Council of Japan (1950), The manifesto of 85 Japanese Scientist (1951), The resolution of the Chinese Scientists (1951), বিশ্ব এসপেরান্তো মহাসভার একটি অংশ, "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এসপেরান্তো"—Munich 1951, Oslo 1952, ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় এসপেরান্তোর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক Vocabulary-ও প্রকাশিত হয়েছে। 1972 খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই 73টি বৈজ্ঞানিক অভিধান এসপেরান্তোয় প্রকাশিত হয়েছিল, আর 5 থেকে 50 পাতার pamphlet প্রকাশিত হয়েছিল 90টি। বিশেষজ্ঞ বা বৈজ্ঞানিকদের জন্য এত ব্যাপকভাবে অভিধান প্রণয়ন বোধ করি কোন জাতীয় ভাষাতেও হয় নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব এসপেরান্তো সংস্থা (UEA) একটি অন্যতম বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাকালেই (1908) 89টি দেশ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসে। ঐ সময় প্রায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই UEA-র ব্যক্তিগত সদস্য আছেন।

এই ভাষায় কথা বলা সহজ হওয়ায়, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে, প্রচুর বৈসাদৃশ্য আছে, এমন সব দেশেও এসপেরান্তোর গতি অব্যাহত। ইরানে মাত্র 10 মাসের মধ্যে 14,000 পাঠ্য পুস্তকের দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। জাপানেও 50,000 কপি বই-এর একটি সংস্করণ দ্রুত বিক্রয় হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় 30টি দেশের 16,500 জন ছাত্র 500টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর এসপেরান্তো শিখছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রধান প্রধান ভাষার মাধ্যমে এমন কি বাংলা ভাষার মাধ্যমেও এসপেরান্তো শেখার বই পাওয়া যায়। বই ছাড়াও শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য জিনিসপত্রও সংগ্রহ করা সহজ। আরো জানা গেছে বর্তমানে শতাধিক আন্তর্জাতিক মানের সভাসমিতি, আলোচনা চক্র ইত্যাদি দোভাষী ছাড়া এসপেরান্তোয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

1978 সালে 63তম বিশ্ব এসপেরান্তো মহাসম্মেলনে পৃথিবীর 50টি দেশের প্রায় 4,400 জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। গোর্কি, রোলাঁ, ম্যাক্সমুলার, রবীন্দ্রনাথ, ফ্রানসিসকোনিৎসি, মাও সে তুং, জে. বি. টিটো প্রমুখ এই ভাষার প্রশংসা করে গেছেন। এই সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্ধৃতিগুলি নিয়ে একটি পুস্তিকা "Pri internacia lingvo—dun jarcentoj" 1972 সালে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত ব্যক্তির বই এসপেরান্তোয় অনুবাদ করা হয়েছে। গীতা, কোরাণ ও রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণে"র অনুবাদও এসপেরান্তোয় করা হয়েছে। লণ্ডনে বৃটিশ এসপেরান্তো অ্যাসোসিয়েসন-এর গ্রন্থাগারে প্রায় 20,000 বই সংগৃহীত আছে। UEA-র গ্রন্থাগারেও আছে প্রায় 1,500 প্রকার এসপেরান্তো গ্রন্থ।

বিশ্বের বিভিন্ন বেতারকেন্দ্রগুলি থেকে নিয়মিত এসপেরান্তোয় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়ে থাকে। একটি পুরানো হিসাব (1971 খৃঃ) থেকে জানা যায় যে 16টি দেশের 19টি বেতার কেন্দ্র থেকে ঐ সময় 2,817টি অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়েছিল। বর্তমানের ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যাবে একটি উদাহরণ থেকে, চীন যেখানে সপ্তাহে 3 ঘণ্টা এসপেরান্তোয় বেতার প্রচার করতো, এখন তা বাড়িয়ে 10½ ঘণ্টা করা হয়েছে। রেডিও বেজিং সপ্তাহে তিনবারের পরিবর্তে রোজ তিনবার করে বেতার প্রচার করছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন ভ্রমণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যাতায়াত, গবেষণা, বিশেষজ্ঞগণের আদান-প্রদান

ইত্যাদিতে যত দিন যাচ্ছে ততই ভাষাটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

বহু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেমন KLM, SAS, BEA, Philips, Gevaert, Fiat, China National Machinery Import and Export ইত্যাদি তাদের কর্মধারা, contract, tender, সংবাদ ইত্যাদি এসপেরান্তোয় প্রচার করে ভাল ফল পাচ্ছে।

1922 খৃস্টাব্দে 21শে সেপ্টেম্বর তদানীন্তন League of Nations এই অভিমত পোষণ করতো যে, এসপেরান্তোর প্রসারের মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে "নৈতিক একতা" বৃদ্ধি পাবে।

পরবর্তীকালে (1954 খৃঃ) UNESCO এসপেরান্তো সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষাটিকে স্বীকৃতি জানায়। বহু সদস্য রাষ্ট্র এই ভাষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয় এবং এর সাহায্যে এগিয়ে আসে। বিশ্ব এসপেরান্তো সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে UNESCO-র যে যোগসূত্র রয়েছে UNESCO তা স্বীকার করে। UNO তথা UNESCO তাদের প্রচুর তথ্য এখন এসপেরান্তোয় প্রকাশ করছে এবং UNESCO মনে করে, "আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও সারা পৃথিবীর জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের সর্বক্ষেত্রে এসপেরান্তোর সফলতা অপরিমেয়।"

পৃথিবীতে এমন দেশ বহু আছে যেখানে একাধিক ভাষা প্রচলিত আছে। সেখানে জাতীয় ভাষা নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই মতান্তরের সৃষ্টি হয় অথচ কোন বিদেশী ভাষা গ্রহণ করাটাও চলে না। এই সব ক্ষেত্রে এসপেরান্তো সঠিকভাবে সমাধানের সূত্র হতে পারে। বেশীর ভাগ দেশ অনেক ভাষাকে সম্মান দিতে গিয়ে প্রচুর টাকা খরচ করছে শুধু অনুবাদ বাবদ। যেমন 1976 খৃস্টাব্দে ইরান সাত-শ' মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল সে দেশের 6টি ভাষার অনুবাদ বাবদ। আমাদের দেশের 14টি ভাষাকে সম্মান দিতে যে কি মূল্য দিতে হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এসপেরান্তো এ খরচ বাঁচাতে পারে।

কোন জাতীয় ভাষাকে শিক্ষা করতে গেলে যতক্ষণ না ভাষাটিকে সামাজিক ভাবে গ্রহণ করা হয়, লেখায় যেমন তেমন, বলায় ততটা দক্ষতা আসে না। কিন্তু এসপেরান্তোর সুবিধা এই যে এখানে তেমন কোন ব্যাপার নেই। একটি লিখিত আদর্শ সকলের সামনেই আছে সেটা সকলকে সমানভাবে শিক্ষা করতে হয়।

যদি আমরা ঠিক এখনই এসপেরান্তোকে গ্রহণ না করতে পারি তবে ভারতের ভাষাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে অধিকতর ব্যবহৃত বা সহজ গ্রাহ্য মূলগুলি নিয়ে জটিলতামুক্ত সহজ ব্যাকরণের সাহায্যে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা তৈরি করা যায়। যেহেতু ভারতের ভাষাগুলির বেশীর ভাগের উৎস সংস্কৃত তাই এমন একটি সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া বোধ হয় দুরূহ হবে না। অতীতের খণ্ড-বিখণ্ড ভারতবর্ষ যেমন আজ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, খণ্ডিত ভাষাগুলিও এভাবে একাকার হয়ে যেতে পারে। দশমিক প্রথা প্রবর্তনে যেমন আমরা হিসাবের গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি ভাষার গোলকধাঁধা থেকেও তেমনি করে একদিন আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো।

আব্রাহাম কভুর

যুগলকান্তি রায়

অলৌকিকত্ব বলে কিছু নেই, আছে
রহস্য—যা মানুষ অনুসন্ধিৎসার বলে
জানতে পারে।

তিন-চার বছর আগে ভারতে একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। না, সেটা কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ নয়, আর্যভট বা ভাস্করের উৎক্ষেপণও নয়। বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর নরসিংহাইয়া সাঁইবাবাকে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বসলেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত ভক্তের কাছেই সাঁইবাবা তখন সাক্ষাৎ 'অবতার'। তিনি শূন্যে হাত ঘুরিয়ে যে কোন জিনিস সৃষ্টি করেন, তাঁর ছবি থেকে 'বিভূতি' ঝরে, আরও কত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড। বিরাট 'আধ্যাত্মিক শক্তি' না থাকলে এসব কখনও হয়—ভক্তবৃন্দের এই অভিমত। নরসিংহাইয়া কয়েক জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে সাঁইবাবাকে অনুরোধ করলেন এই কমিটির সামনে তাঁর ঐ 'শক্তি' দেখাতে। তিনি খুব খোলা মন নিয়ে সাঁইবাবাকে জানালেন, তিনি যা সব করেন তা তো বিজ্ঞানীরা সম্ভব নয় বলে মনে করেন; তবে তিনি যদি ঐ সব দেখাতে পারেন তা'হলে, ঐ কমিটি বিজ্ঞানের এতদিনকার তত্ত্বগুলোকে বিচার-বিবেচনা করার জন্যে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানাবেন এবং তাঁরা সাঁইবাবাকে নিউটন, আইন-স্টাইনের উপরে স্থান দেবেন। কিন্তু, তা তো হবার নয়। 'অবতার'-রা চিরকালই মানুষকে ভয় করেন, তার মুখোমুখি হতে চান না। এক্ষেত্রেও তাই হল। 'ক্ষুদ্র মানুষ'-এর 'ক্ষুদ্র বিজ্ঞান-বুদ্ধি' দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি যাচাই করা যায় না—এই বলে সাঁইবাবা পরীক্ষা এড়িয়ে গেলেন। নরসিংহাইয়া ও তাঁর সহযোগীরা তাঁর আশ্রমে উপস্থিত থেকেও 'বাবা'-র সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন না।

এতেই যাঁরা যা বোঝার বুঝে গেছলেন। যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। পরিচয় গোপন রেখে তিনি বাবা-র সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুখে শূন্য থেকে রসগোল্লা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল, হাতসাফাই-এর কাজগুলোকে আধ্যাত্মিক শক্তি নাম দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ঠিক নয়। তিনি প্রকাশ্যে এও জানিয়ে দিলেন, সাঁইবাবার ছবি থেকে যে 'বিভূতি' ঝরে তা হল আসলে ল্যাকটিক অ্যাসিড স্ফটিকের গুঁড়ো—যা তাঁর শিষ্যরা সারা দেশ জুড়ে বেশ প্ল্যান করে তাঁর ছবিতে মাখিয়ে রাখেন।

এর পরও অবশ্য সাঁইবাবার কাছে মানুষ যাচ্ছেন। তা যান। নরসিংহাইয়া এবং যাদুকর জুনিয়র

সরকার মানুষের মনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন এটাই মস্ত বড় লাভ। আমরা অনেকে জেনে-শুনেও এসব এড়িয়ে চলি, কেউ কেউ আবার নিজের বুদ্ধি-বিচারকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই সমস্ত বাবাদের চরণামৃত সেবনে লালায়িত হই। শেষোক্তদের মধ্যে লম্বা লম্বা ডিগ্রি-ধারী বিজ্ঞানীর সংখ্যাও কম নয়, এটাই আমাদের মস্ত বড় 'ট্র্যাজেডি'। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন নরসিংহাইয়া ও তাঁর সহযোগিরা অভাবনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

নরসিংহাইয়ার এই কাজে যিনি সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর নাম আব্রাহাম কভুর। তিনি শুধু সাঁইবাবার দেবত্ব খণ্ডনেই এগিয়ে আসেন নি, সারা জীবন ধরে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য—উভয়লোকের দেবতাদেরই মানুষের মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন। বিজ্ঞানের উচ্চতম গবেষণায় ব্যস্ত থেকেও ধর্মের গোঁড়ামী, অন্ধ-বিশ্বাস, সাধু সন্তদের ভোজবাজীর বিরুদ্ধে জনমত কিভাবে জাগ্রত করা যায় কভুর তাঁর জীবনে দেখিয়ে গেছেন।

কেরলের মালাবার জেলায় তিরভোল্লাগ্রামের এক খৃস্টান পরিবারে 1898 সালের 10ই এপ্রিল আব্রাহাম কভুরের জন্ম। তিনি কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজে পড়েছেন। কেরলের কোট্টায়াম কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু, পরে শ্রীলঙ্কার জাফনা সিটি কলেজে ধর্মশিক্ষকের কাজ এবং শেষে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে অবসরগ্রহণ। জাফনা কলেজে অধ্যাপনাকালীন তাঁর বহু ছাত্র নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে তাঁর যুক্তিবাদী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। ছাত্রদের উপর তাঁর সে সময়ের প্রভাব, তাঁর শিক্ষাদান রীতি আমাদের ডিরোজিওর কথা মনে করিয়ে দেয়।

জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, এসবে তিনি আমেরিকার মিনেসাটো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেটও পেয়েছিলেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যাঁকে বিশ্ব সংস্থা 'বিবর্তনবাদের হারানো সূত্র' (Missing Link in the Theory of Evolution) বিষয়ে গবেষণার কাজে নিয়োগ করেন। অধ্যাপনা, গবেষণা নিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। এসবের মধ্যেও তিনি নানা সভা-সমিতিতে যোগ দিয়ে মানুষকে যুক্তিনিষ্ঠ হওয়ার আবেদন জানাতেন; তাঁরা যাতে গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেন এজন্যে তিনি বিভিন্ন বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁদের বোঝাতেন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বের কথা তাঁদের সহজ করে বলতেন। এমন কি, সমাজে বিজ্ঞানী বলে পরিচিত যে সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক আচার-আচরণ করেন তাঁদের সম্পর্কেও বার বার তিনি সতর্ক করেছেন। সাঁই-বাবার ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে যখন আমাদের দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী (?) সাঁইবাবার সমর্থনে বিবৃতি দিয়েছিলেন তখন কভুর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাঁদের নিন্দা করে বলেছিলেন, "ভারতের কিছু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বিজ্ঞান ছেড়ে ধর্মীয় মানুষের শরণাপন্ন হয়েছেন। এর কারণ হল, ঐ বিজ্ঞানীরা বুঝে নিয়েছেন বৈজ্ঞানিক গবেষণার বদলে ধর্ম, ঈশ্বরের নামে লোক ঠকালে পয়সা আসবে।"

অধ্যাপনা জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি 'শ্রীলঙ্কা যুক্তিবাদী সংস্থা' গড়ে তোলেন এবং সারা-জীবন এর মাধ্যমে মানুষের অজ্ঞতা দূরীকরণে চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি ঘোষণা করেছিলেন, কেউ তাঁকে কোন 'অলৌকিক শক্তি' দেখাতে পারলে তিনি তাঁকে এক লক্ষ টাকা দেবেন; এ জন্যে তিনি ব্যাঙ্কে সে টাকা গচ্ছিতও রেখেছিলেন। তবে, একটি শর্ত ছিল। যিনি এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করবেন কভুরের কাছে তাঁকেও আগে এক হাজার টাকা জমা রাখতে হবে। তিনি হেরে গেলে, বা কভুর তাঁর ছলা-কলা ধরে ফেললে সেই টাকা বাজেয়াপ্ত হবে। ভারতের বিভিন্ন সংবাদপত্রে কভুরের এই ঘোষণা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। 1975 সালে বাঙ্গালোরের বেঙ্কট রাও

কভুরের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক হাজার টাকা জমা রেখেছিলেন। তিনি 'ওঁ রাঘবেন্দ্র শরণম্' মন্ত্রের কি সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাবেন বলেছিলেন। কিন্তু পারেন নি; তাঁকে এক হাজার টাকা হারাতে হয়েছিল। কভুর সেই টাকা জনহিতে ব্যয় করেন।

শুধু বক্তৃতা, আলোচনা ও পত্র-পত্রিকাতেই তিনি থেমে থাকেন নি। মানুষের মন থেকে জন্মান্তরবাদের ধারণা দূর করার জন্যে তিনি মালয়ালম ভাষায় 'পুনর্জনম' নিয়ে একটি ফিল্মও করেন। বিজ্ঞান প্রচারে এখন বহু ক্লাব, বহু বিজ্ঞান লেখক এবং অনেক নামকরা বিজ্ঞানীর কথা শুনি। কিন্তু কভুরের মত একজন খাঁটি যথার্থ বিজ্ঞানী, একনিষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রচারক খুব কমই মেলে।

কভুর মানুষকে যা বলতেন নিজেও করতেন। ছেলেমেয়েদের কোনরকম ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্ধ আচার-আচরণের শিক্ষা দেবেন না এরকম প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরই তিনি একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। ঐ স্ত্রী মারা গেলে কভুর ছাত্রদের 'অ্যানাটমি' শেখার জন্যে স্ত্রীর মৃতদেহটি একটি মেডিকেল কলেজে দেন। তিনি নিজের ক্ষেত্রেও সেইরকম ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই মত তাঁরও মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে দেওয়া হয়েছিল। 1978 সালের 18ই সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান; কলম্বো মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের শেখার জন্যে তাঁর কঙ্কাল এখনও সেখানে টাঙানো আছে।

কভুর আমাদের নিঃস্ব করে যান নি, তিনি রেখে গেছেন তাঁর অসাধারণ গ্রন্থ 'Begone Godmen'। মনের অন্ধকার দূর করতে মানুষ বইটির কথা বার বার ভাববে। তিনি বলেছেন, অলৌকিকত্ব (Miracles) বলে কিছু নেই, আছে বিস্ময়, আছে রহস্য (Mystery) —যা মানুষ তার অনুসন্ধিৎসার বলে জানতে পারবে। মৃত্যুর দু-বছর আগে প্রকাশিত ঐ বইটিতে তিনি বলেছেন, "এ সমাজে যখন জন্মেছি, বড় হয়েছি তখন অনেক কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা আমার মাথায় ঢুকেছে, ঢোকানো হয়েছে। তা থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করেছি"। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার সংগ্রামে কভুরের মত একজন সাহসী, যুক্তিবাদী, মুক্ত-মনা মানুষই তো আমাদের আশা-ভরসা!

চৌম্বক ভাসমান রেলগাড়ির দিন আর বেশী দূরে নয়। চাকাওলা রেলগাড়ির একাধিপত্য 2000 সালের মধ্যেই শেষ হবে আশা করা হচ্ছে। চৌম্বক ভাসমান রেলগাড়ী পরিবেশকে দূষিত করবে না এবং চলবে নিঃশব্দে। এর জন্য যে খরচ করতে হবে তা উঠে আসতে সময় লাগবে খুবই কম। পরীক্ষামূলক একটি চৌম্বক ভাসমান ট্রেন চালু করেছেন নভোচেরকাস্ক্-এর (সোভিয়েত রাশিয়া) বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভ নির্মাণকার্যের সারা-ইউনিয়ন গবেষণা ডিজাইন ও প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউট। পরীক্ষামূলক এই তিন-টনের মডেলটি রেললাইন থেকে শূন্যে উঠে ভাসমান থাকছে এবং বিদ্যুৎচৌম্বক প্রলম্বন ও আকর্ষণের সহায়তায় গতিশীল হচ্ছে। এই পরীক্ষাকার্যের ফল থেকে পাওয়া যাবে 40 টনের একটি রেলগাড়ি, যাতে যাত্রী থাকবে 100 জন এবং যার গতি হবে ঘণ্টায় 400 থেকে 500 কিলোমিটার।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভবিষ্যতে দূর-পাল্লার সমস্ত পথে চৌম্বক ভাসমান ট্রেন চলাচল করবে এবং 2000 কিলোমিটার পর্যন্ত পরিবহণে বিমানের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। এর ফলে বিমানবন্দর ও রাজপথ তৈরি করার জন্য এখন যে বিপুল পরিমাণ জমি ব্যবহার করা হচ্ছে তা মুক্ত হয়ে যাবে। আজকের দিনে উৎপন্ন জ্বালানির চারভাগের তিনভাগ খরচ হয় বিমানে ও মোটরযানে। তার জন্য পরিবেশও দূষিত হয়। চৌম্বক ভাসমান রেলগাড়ি চালু হলে যেমন বাঁচবে জ্বালানি তেমনি পরিষ্কার থাকবে পরিবেশ।

বিশ্বের মৌল স্থিতিমাপ নির্ধারণের পদ্ধতি

ইয়াকভ জেলদোভিচ

জর্জ গ্যামো ও তাঁর ছাত্রেরা চল্লিশের দশকের শেষ দিকে উত্তপ্ত বিশ্বের যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন সেটাই এখন সর্বজনগ্রাহ্য। এই তত্ত্ব অনুসারে, প্রায় 1500 কোটি বছর আগে সবকিছু শুরু হয়েছিল অতিমাত্রায় ঘন ও অতিমাত্রায় উত্তপ্ত প্লাজ্‌মার সম্প্রসারণ থেকে।

ঘন প্লাজ্‌মার আগের অবস্থা কি ছিল আমরা জানি না। এমন যদি হয় যে আগের অবস্থাতেও কোন এক আকারে বিশ্বের অস্তিত্ব ছিল তাহলে বলতেই হয় সেই অবস্থায় সমস্ত কিছু অতিমাত্রায় ঘন ছিল ও অতিমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় অবলুপ্ত হয়েছে। তার লক্ষণ শুধু ধরা যেতে পারে নিউট্রিনো ও গ্র্যাভিটনের পটভূমির পর্যবেক্ষণ থেকে।

ষাট বছর আগে বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলেকসান্দার ফ্রীডমান আইনস্টাইনের সমীকরণের যে সমাধান পেয়েছিলেন, তার সঙ্গে বিশ্বের আধুনিক ধারণার সম্পূর্ণ মিল আছে। ধারণাগুলি এইরকম: বিশ্ব সম্প্রসারণশীল, সীমাহীন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ বিশ্বের চরিত্র সব জায়গায় প্রায় একই রকম। বর্তমানে এই আদর্শ চিত্র থেকে বিচ্যুতি যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ এক্ষেত্রে পটভূমিগত বিকিরণ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি।

সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত এই বিকিরণ মহাকাশের প্রতিটি বিন্দুতে সৃষ্টি করে একটি একক নির্দেশ-ব্যবস্থা। এই নির্দেশ ব্যবস্থায় দর্শকের ওপরে বিকিরণে পতিত হয় সমানভাবে ও সমস্ত দিক থেকে এবং এই দর্শক স্থিতিশীল। তবে বস্তু যদি গতিশীল হয়, চিত্রটি হবে ভিন্ন—কেননা, তখন গতিশীল দর্শকের পৃষ্ঠের দিকের চেয়েও বক্ষের দিকে পতিত হবে আরো অধিক ফোটন। এই অর্থে, পটভূমিগত বিকিরণ গ্রহণ করতে শুরু করে "নতুন ইথার"-এর ভূমিকা। এই কারণে যে, তার সাহায্যে তুলনাগত বিচার করে কোন কিছুর—ধরা যাক, পৃথিবীর—গতি ধরতে পারা যাচ্ছে।

'নতুন ইথার'-এর সঙ্গে তুলনাগত বিচারে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানীরা এখন শুধু আমাদের গ্যালাক্সির গতির মাপ নিতে পারেন। তথ্যটি জরুরি। কিন্তু নির্বিশেষ নির্দেশ-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনাগত বিচারে মহাকাশের অন্যান্য বস্তুকেও যদি নির্দিষ্ট করা যায় তাহলে ভাল হয়। সেটা কি সম্ভব? আমরা আশা করি, তত্ত্বগতভাবে যে পদ্ধতি আমরা নির্ধারণ করেছি তা অনুসরণ করে পরীক্ষা-কার্য যাঁরা করেন তাঁরা কাজটি সম্পন্ন করবেন।

পদ্ধতিটি সংক্ষেপে এই রকম: এক্স-রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা জানি, হাজার হাজার গ্যালাক্সির এই বিপুল জোটে রয়েছে উত্তপ্ত আন্তঃ-গ্যালাক্সীয় গ্যাস যার তাপ-মাত্রায় পরিমাপ কোটি-কোটি ডিগ্রী। তা থেকে পটভূমিগত বিকিরণের ফোটন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ছড়িয়ে-পড়া বিকিরণের লক্ষণ নির্ভর করে পটভূমির আপেক্ষিকে উত্তপ্ত গ্যাস-মেঘের গতির ওপরে। গ্যালাক্সির জোটের দিকে আকাশের রেডিও-উজ্জ্বলতার পরিমাপ নিলে তাদের বেগ ও গতিমুখ নির্ধারণ করা সম্ভব।

এই বেগ বিশ্বের সম্প্রসারণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

গ্যালাক্সিদের জোটের বাড়তি বেগ থাকতে পারে অপর কোন মহাকর্ষীয় বস্তুর সান্নিধ্যহেতু বা নিকটস্থ বস্তুর ঘনত্বে চাঞ্চল্যহেতু। এমনিভাবে এই সমস্ত আলোড়নের উৎস সম্পর্কে এবং বিশ্বে বস্তুর বিন্যাস সম্পর্কে তথ্য লাভ করা যেতে পারে।

গ্যালাক্সিদের জোটের রেডিও পর্যবেক্ষণ থেকে বিশ্বের গড়ন সম্পর্কে আর কি জানা যেতে পারে? উত্তপ্ত ইলেকট্রনের মেঘে পটভূমিগত বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ার ফলে তার বর্ণালী বিকৃত হয়। ফলে, তত্ত্ব অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে, জোটের দিকে পটভূমির রেডিও-উজ্জ্বলতা হ্রাস পাবে এবং মিলি-মিটারের চেয়েও কম মাত্রার পটভূমির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে। এই ক্রিয়াটির অনুসন্ধান, তৎসহ এক্স-রশ্মি তথ্য থেকে নির্ধারণ করা যেতে পারে জোটের উত্তপ্ত গ্যাসের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব, মেঘের আকার ও উজ্জ্বলতা। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সম্ভব হবে জোটের নির্বিশেষ ও কৌণিক আকারের পরিমাপ নেওয়া। এমনিভাবে অবশেষে পাওয়া যাবে বহুকাল ধরে যার সন্ধান চলছে সেই রেফারেন্স মূল্য বা গ্যাস-মেঘের ব্যাসার্ধ। উপরন্তু উত্তপ্ত গ্যাস-মেঘ হয়ে উঠবে উজ্জ্বলতার রেফারেন্স মূল্য।

আরো একটি সম্ভাবনা আছে যার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার মধ্যেকার বস্তুর গড় ঘনত্বের ওপরে। যদি এই ঘনত্ব হয় প্রতি ঘন মিটারে তিন কণিকার চেয়ে অধিক তাহলে বর্তমানে যে সম্প্রসারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার জায়গায় শত শত কোটি বছর পরে দেখা দেবে সংকোচন। ঘনত্ব যদি এই মাত্রার চেয়ে কম হয় তাহলে সম্প্রসারণ অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল চলতেই থাকবে। দূরস্থিত জোটের পর্যবেক্ষণ থেকে ভবিষ্যৎ বিশ্বের সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এই সমস্ত ক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্পন্ন হয়েছে পুল্‌কোভো মানমন্দিরের দূরবীনের সাহায্যে। এখন হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও-দূরবীনে। অপ্‌টিক্যাল যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে উত্তর ককেসাসে স্থাপিত বিশ্বের বৃহত্তম ছয়-মিটার দূরবীনটি। যে সমস্যার সমাধান করতে হবে তা অবশ্যই জটিল এবং তার জন্য চাই পরীক্ষাকার্যে উচ্চতর মাত্রার দক্ষতা।

আগে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান সচেতন করুন

(1)

অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানবজাতিকে ক্রমোন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সত্য, কিন্তু বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার পরেও কিছু মানুষের আচার-আচরণ সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে যদি কোন বলিষ্ঠ প্রচার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' দ্বারা সম্ভব হয় তবে একটা আশার আলো দেখা দিতে পারে। মাঝে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর একটি সংখ্যায় পুনর্জন্ম সম্পর্কে একটা লেখা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আরও জোরালো প্রচার কি সম্ভব নয়? যদিও বিজ্ঞান আন্দোলন আত্মা, ঈশ্বর, পরজন্ম প্রভৃতি ধারণাগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম, কিন্তু সে আন্দোলনের একটা ছোটখাটো রূপরেখা না তৈরি হলে তেমন কিছুই হবে হবে না। বিজ্ঞান পরিষদ এ ধরণের কোন আন্দোলনের কথা ভাবছেন কি?

শিবাশিস দত্ত
নৈহাটী, 24 পরগণা

(2)

গত 29শে মে, 1980 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে আয়োজিত শোকসভায় (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হাজরার মৃত্যুতে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী বললেন, মানুষের জীবন একেবারে নির্দিষ্ট। তার কোন্ দিন, কখন, মৃত্যু হবে সেটি একেবারে নির্দিষ্ট—সেকেণ্ডের নড়চড় হওয়ার উপায় নেই। আবার তিনিই বললেন, মানুষকে তার মানসিক টেনশন থেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারলে এ ধরণের আকস্মিক মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতে পারে।

একজন নামকরা বিজ্ঞানী যখন এ ধরণের মারাত্মক অবৈজ্ঞানিক কথা ও পরস্পর বিরোধী কথা বলেন তখন পরিষদ কর্তৃপক্ষ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার আগে, এ ধরণের শিক্ষিত বিজ্ঞানীদের (?) আগে বিজ্ঞান সচেতন করুন। এঁদের এই সমস্ত কথাবার্তায় দেশের অনেক বেশি ক্ষতি হয়।

পল্লব গাঙ্গুলী
বালী, হাওড়া

হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান

(1)

মে, 1980 সংখ্যায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ 'হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সুকুমার গুপ্ত মহাশয় বলেছেন, "যদি similia similibus curantur-এ বিশ্বাস করা যায় তবে টেরামাইসিনের বা ক্লোরোমাইসিটিনের বিষক্রিয়ায় যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সব লক্ষণে হোমিওপ্যাথি মতে ঐ সব ঔষধ দিয়েই কি চিকিৎসা সম্ভব? তা যদি হতো চিকিৎসাবিজ্ঞানে হোমিওপ্যাথির জয়যাত্রা শীর্ষস্থানেই পৌছত।"

লেখক জানেন না যে, হোমিওপ্যাথিতেও অ্যান্টি-

বায়োটিক পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরাম-ফেনিকল প্রভৃতি হয়ে মানুষের উপকারার্থে ব্যবহার হয়ে আসছে। Journal of the American Institute of Homoeopathy, Volume 50, No. 8 (August, 1957)-এ ডাঃ ডোনাল্ড ম্যাকফারলেন (Dr. Donald Macfarlan, M.D.) হোমিওপ্যাথিতে পেনিসিলিনের ব্যবহার উল্লেখ করেছিলেন (Allen's Materia Medica—Page No 404)।

ক্লোরামফেনিকল মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ড্রাগ রিসার্চ সেণ্টারে পরীক্ষিত হয়েছে এবং এর ব্যবহারও (কলিকাতা রায় পাবলিশিং হাউসের ডাঃ. এলেনের মেটিরিয়া মেডিকার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে 414নং পৃষ্ঠায় বলা আছে) চলছে। স্ট্রেপটোমাইসিনের হোমিওপ্যাথিতে প্রুভিং এবং তার পরীক্ষালব্ধ ফল এলেনের মেটিরিয়া মেডিকার বাংলা অনুবাদ গ্রন্থে (যা কলিকাতা রায় পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত) 414 পৃষ্ঠায় বলা আছে।

লেখক বলেছেন, "হোমিওপ্যাথিতে ঔষধ সেবন-কালে কোন ভিটামিন খাওয়া চলবে না বলে গোঁড়া হোমিওপ্যাথদের অভিমত।"

লেখকের জানা প্রয়োজন গোঁড়াদের জন্য হোমিও-প্যাথ নয়। বিজ্ঞানে গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। হ্যানিম্যান লিখিত "অর্গানন অব মেডিসিন" বইয়ে 72-82 section পর্যন্ত chronic disease সম্বন্ধে বলা আছে। ডাঃ মহেন্দ্র সিংহ অর্গানন অব মেডি-সিন বইয়ে হ্যানিম্যানের 72 section থেকে 82 section পর্যন্ত chronic disease-এর আলোচনা প্রসঙ্গে false chronic disease-এর উল্লেখ করে-ছেন। false chronic diease—maintaing cause-এর উপর নির্ভরশীল বলে কেবলমাত্র ঔষধ প্রয়োগে false chronic disease সারানো যায় না। আগে maintaining cause দূর করা প্রয়োজন। false chronic disease যদি খাদ্যা-ভাবজনিত হয় তবে তার আগে প্রতিদিনকার পরিমিত খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাই আমি একথা বলতে চাই যে কারোর maintaining cause যদি ভিটামিনের অভাবের জন্যে হয় তবে তার তো ভিটামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাঃ বোরিক তাঁর মেটিরিয়া মেডিকায় তাঁর বহু পরীক্ষালব্ধ টনিকের কথা উল্লেখ করেছেন।

তবে কথায় কথায় আমরা ভিটামিন দিই না এজন্য যে হোমিওপ্যাথি ঔষধ অনেকাংশে ভিটামিনের অভাব পূরণ করে।

ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের "অব্যর্থ ঔষধ" গ্রন্থে 146-148 পৃষ্ঠায় এই রকম ভিটামিন জাতীয় হোমিও-প্যাথি ঔষধের বর্ণনা আছে। সুতরাং "এসব ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথগণ বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা থেকে নিশ্চিতভাবে পিছিয়ে রয়েছেন" মন্তব্য করা কি অযৌক্তিক নয়?

লেখক আরও বলেছেন, "হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রস্তুতিতে, তার মান নির্ণয়ে, জীবদেহে সেই ঔষধের গতিবিধি ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে রসায়নবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও মতামত কোথায় কিভাবে কতখানি কাজ করছে বা করতে পারে তার চেষ্টা কোথাও আছে কি? যদি জিজ্ঞাস্য হয়, তবে বলব যে, হোমিওপ্যাথি Materia Medica, Pharmacy এবং কিছু কিছু অংশ organon এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। লেখককে এই তিনটি বিষয় ভাল করে পড়ে দেখতে অনুরোধ জানাই।

"হোমিওপ্যাথি ঔষধের বিশুদ্ধতা নিরূপণে ড্রাগ কণ্ট্রোল আইনের কোন ব্যবস্থা নেই—তাহলে একে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা কি করে বলব।"—লেখকের এই কথার উত্তরে বলব, ড্রাগ কণ্ট্রোল আইনের ব্যবস্থা নেই বলে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বলব না এটা কেমন কথা?

আমি লেখকের সাথে একমত সরকার ও জন-সাধারণের সহযোগিতায় হোমিওপ্যাথিতে আরো

গবেষণায় প্রয়োজন। চেষ্টা করলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে—অনস্বীকার্য

অমলেন্দু পাহাড়ী
মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, মেদিনীপুর

(2)

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মে, 1980 সংখ্যায় হোমিওপ্যাথি সম্পর্কে আলোচনাটি আমার ভাল লাগল। এধরণের লেখা মাঝে মাঝে থাকলে ভাল হয়।

টেট্রাসাইক্লিন গ্রুপ, ক্লোরোফেনিকল গ্রুপ, পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন (অ্যান্টিবায়োটিক গ্রুপ) ওষুধ এবং ভিটামিন 'এ' থেকে 'ই' পর্যন্ত সবই বিলেতে 'এ নেলশন অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড' তৈরি করে; জার্মানীতেও তৈরি হয়। বড় হোমিও ওষুধের দোকানে এ সমস্ত ওষুধ বিক্রি হয়। ভারতে এখন আমদানী বন্ধ আছে।

অনিলবরণ দাস
কলিকাতা

(3)

'হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে (মে, 1980) শ্রীসুকুমার গুপ্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথিকে 'প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত' করে তোলার জন্যে বিশদ আলোচনার কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'চেষ্টা করলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতেও পারে।' এই লেখার সূত্রে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি তাঁরা ঐ সম্পাদকীয়টির উপর একটি আলোচনার সভার আয়োজন পরিষদ ভবনে করলে দেশের কল্যাণই হবে

চিত্তপ্রিয় ঘোষ
যাদবপুর

খেলায় আমরা পিছিয়ে কেন?

জীবন থেকে খেলাধূলাকে বাদ দেওয়া যায় না। এখন এর প্রসার সর্বত্র আমাদের দেশেও। আমাদের দেশে খেলাধূলাকে নিয়ে যতটা হৈ-চৈ হয় এর উন্নতি ঘটানোর বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা ততটা নেই। কেউ এ নিয়ে বিশেষ কিছু বলেন না—ক্রীড়া সাংবাদিকরাও না। এ ব্যাপারে দূরের কথা, খেলাধূলা নিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক লেখা, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ থাকে না। অনেকদিন আগে হয়ত, সেই একবারই 'অলিম্পিক খেলাধূলা; উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 1977) সম্পর্কে শ্রী শ্যামসুন্দর দে-র একটি সুন্দর লেখা (বিজ্ঞানসম্মত) বেরিয়েছিল; এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। মস্কোতে 1980-র অলিম্পিক হয়ে গেছে। এই উপলক্ষেও কি, সম্পাদকমণ্ডলী একটি লেখা বের করতে পারেন না যা থেকে আমরা বুঝতে পারব আমাদের দেশ খেলায় পিছিয়ে কেন?

হীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা-26

গোপালবাবুকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর লেখা কেন?

আগরতলা (ত্রিপুরা) থেকে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান বিচিত্রা'-পত্রিকার জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, 1980 (4বর্ষ, 5 সংখ্যা) সংখ্যায় শ্রী যতীশ চক্রবর্তী 'অগ্রজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য' শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেন, "1977 সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃপক্ষ গোপালবাবুকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রধান সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন, অপরাধ গোপালবাবু স্নাতক নন।…যাঁর অধীনে বহু ডক্টরেট বেরিয়েছেন, তাঁকে চক্রান্ত করে অসৌজন্যভাবে আলোচনা না করে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ সভায় তাঁর অপসারণ পত্র তৈরী হয়।"

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার, কোন সাধারণ সভায় এ প্রসঙ্গ উঠে নি, পরিষদের তৎকালীন

কার্যকরী সমিতিই তাঁকে ঐ কারণে (স্নাতক না হওয়া) প্রধান সম্পাদকের বদলে প্রধান উপদেষ্টার পদ দেন। কার্যকরী সমিতির এই মনোভাবের নিন্দা করে পরিষদের কিছু সদস্য তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সংবাদপত্রেও এ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা হয়। কার্যকরী সমিতি অবিলম্বে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেন। গোপালবাবু তারপর প্রধান উপদেষ্টা পদে থাকতে সম্মত হন। তিনি এখনও সেই পদে আছেন। ব্যাপারটি এভাবে মিটে যাওয়ার পরও শ্রীচক্রবর্তী পুরো ঘটনাটি কেন জানালেন না জানি না—অর্ধসত্য, অসত্য অপেক্ষাও মারাত্মক!

দ্বিতীয় কথা হল, গোপালবাবুর অধীনে কোন ডক্টরেট বেরোন নি—গোপালবাবু সে রকম কোন পদে কোনদিনই ছিলেন না।

তৃতীয় কথা হল, শ্রীচক্রবর্তী যে লিখেছেন 'সম্মানী বৃত্তি হিসেবে তিনি (গোপালবাবু) মাসে এক-শ' টাকা পাচ্ছেন'—তা মোটেই সত্য নয়। টাকাটা পরিষদই দিচ্ছেন (গত বছর পর্যন্ত মাসে দু-শ' টাকা ছিল)। গোপাল বাবুর বয়স (প্রায় চুয়াশি), কার্যক্ষমতা এবং পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিচারে পরিষদের এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে আদর্শস্থানীয়। এ কথা স্বীকার করার মতো সুস্থ মানসিকতা না থাকাটাই দুঃখের। লেখক লেখার আগে গোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে লিখেছেন। তাহলে এধরণের লেখা বেরোয় কি করে? 'বিজ্ঞান বিচিত্রা' আমার প্রতিবাদ ছাপান নি, তাই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ জানালাম।

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
কলিকাতা-9

কিশোর

গণিত-পাগল সেই মানুষটি

দিলীপ সেন*

কার্ল ফ্রিডরিক গাউস (Carl Friedrich Gauss) হলেন উনবিংশ শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। শুনলে অবাক হতে হয় যে, এই গাউস মাত্র তিন বছর বয়সের সময় পিতার ব্যবসায়িক হিসেবের ভুল ধরেছিলেন, এবং আট বছর বয়সে শিক্ষকমশায়কে চমকে দিয়েছিলেন 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার নতুন পদ্ধতি বের করে।

জন্ম আজ থেকে দু-শ' তিন বছর আগে (30শে এপ্রিল, 1777) জার্মানীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। পিতার নাম গেবহার্ড এবং মাতার নাম গেবহার্ড ডরোথিয়া বেনজ। পিতার ইচ্ছা ছিল যে গাউস একজন সুদক্ষ তাঁতী হোক। কিন্তু তাঁর কাকার আপত্তিতে 7 বছর বয়সের গাউসকে শহরের স্কুলে পাঠানো হয়। গাউস স্কুলে নানা ব্যাপারে নিজের বুদ্ধির পরিচয় দেন। 15 বছর বয়সে গাউসকে কলেজে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি ভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়তে শুরু করলেন এবং 1795 সাল পর্যন্ত সেখানেই তিনি পড়াশুনা করেন। এই সময় তিনি অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারছিলেন না। সে সময়ে এক হৃদয়বান ডিউক কার্ল উইলহেলম্ ফার্ডিন্যান্ড, গাউসকে প্রতি মাসে কিছু নির্ধারিত ভাতা বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন গ্যোটিঙগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার জন্য।

*1/C, জোড়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-700006

গণিতের প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও তিনি ঠিক করতে পারেন নি বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নিয়ে পড়াশুনা করবেন, গণিত, না ভাষাতত্ত্ব। অবশেষে 1796 খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে গণিতের স্বপক্ষেই চূড়ান্তভাবে মনস্থির করেন, কেননা ওই সময় তিনি শুধুমাত্র একটি কম্পাস ও একটি মাপকাঠির সাহায্যে সতেরো দিক বিশিষ্ট সুসম বহুভুজ অংকন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি এই আবিষ্কারটিকে জীবনের অন্যতম কীর্তি বলে মনে করতেন, যদিও এই আবিষ্কারটি তাঁর অন্যান্য কীর্তির তুলনায় নগণ্য। যৌবনে গাউস গণিতের বহু কালের অমীমাংসিত একটি সমস্যার সমাধান করেন। ঐ সমস্যাটি ছিল, যে কোন বীজগাণিতিক সমীকরণের অন্ততঃ একটি বীজ থাকবে কিনা। তিনি প্রমাণ করে দেখালেন, হ্যাঁ—থাকবে। তাঁর এই আবিষ্কারটি এত উচ্চমানের ছিল যে, হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াই তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছিল। এই সময় একদিকে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে পিতার দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বভাব তাঁকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। পিতা চেয়েছিলেন, ছেলে বেশী অর্থ উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করুক। কিন্তু গাউস চাইলেন গণিত নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যেতে। গাউস চাইতেন গাণিতিক সত্যকে জানতে, আর্থিক উন্নতি নয়।

গাউস যখন সিরিস (Ceres) গ্রহাণুপুঞ্জের কক্ষপথ নির্ণয় করলেন, তখন তাঁর নাম কিংবদন্তীর মত পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। রাতারাতি তিনি উপকথার নায়ক হয়ে গেলেন। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকুরির সুযোগ আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তিনি 1807 সালে গ্যোটিঙগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিরেকটারের পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত (1855) এখানেই ছিলেন। বিশুদ্ধ গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রাশিতত্ত্ব এবং পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন শাখাতে গাউস অনেক নতুন বিষয় আবিষ্কার করেন। তিনি জটিল রাশি তত্ত্বকে (Theory of complex numbers) নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি দেখালেন যে জটিল সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার মতই লেখচিত্রে অংকন করা যায় এবং জটিল রাশিতত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে দৃঢ়ভিত্তিক নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর এই জটিল রাশিতত্ত্বকে সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অন্তরকল (differential) সমীকরণ তত্ত্বের প্রচণ্ডভাবে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তিনি দেখালেন সাধারণ বীজগাণিতিক, ত্রিকোণমিতিক এবং একস্পোনেনসিয়াল (Exponential) শ্রেণীকে অয়লারের (Euler, 1707—1783) আবিষ্কৃত হাইপার জ্যামিতিক (Hyper Geometric) শ্রেণীর আকারে প্রকাশ করা যায়।

আমরা—সাধারণ মানুষেরা, গণিতের ভিতরের চেহারা দেখতে চাই না, বাইরের চেহারাটাই দেখি এবং দেখে ভীত হই। গাউস সবসময় চাইতেন গণিতের ভিতরের চেহারা দেখতে। তিনি চাইতেন গণিতের মূল সত্য বের করতে। অর্থাৎ গণিতশাস্ত্রকে কিছু মৌলিক স্বতঃসিদ্ধে (axiom) রূপান্তরিত করে মূল তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে—যেমন রসায়নে সমস্ত যৌগ পদার্থগুলি 111 (এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত) মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ে গঠিত অথবা সঙ্গীতে সমস্ত রকম সুর 12টি স্বরগ্রামের (সা, রে, গা, মা,···) বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ে তৈরী, অথবা যে কোন

ভাষার বিভিন্ন কাব্য, সাহিত্য ঐ ভাষার বর্ণমালার বিভিন্ন প্রকার সমন্বয়ে গঠিত। গাউস এক্ষেত্রে কিছুটা সার্থক হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের গণিতবিদরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, সমস্ত গণিতশাস্ত্র জার্মেলো (Zermelo) ও ফ্রায়েনকেলের (Fraenkel) স্বতঃসিদ্ধের উপর নির্ভরশীল।

গাউস গণিতের জ্যামিতি শাখায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাঁর নতুন তত্ত্বকে বোঝানোর আগে জ্যামিতির পূর্ব ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো (Plato, 427—347 B. C.) এবং তাঁর ছাত্ররা জ্যামিতি চর্চা (systematic and axiomatic) সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ করেছিলেন। প্লেটো বলতেন দর্শন শিক্ষার জন্য জ্যামিতির চর্চা অপরিহার্য। তিনি এতই জ্ঞানী ছিলেন যে তাঁর জ্যামিতির তত্ত্বগুলি বিনা প্রমাণে তাঁর ছাত্ররা মেনে নিতেন। পরে তাঁর এক ছাত্র ইউক্লিড পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও প্রমাণসহ জ্যামিতির তত্ত্বগুলিকে একটি বই আকারে প্রকাশ করেন এবং সেই বইটি দু-হাজার বছর ধরে এখনও বিদ্যালয়ের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গাউস ভাবলেন একটি পাঠ্যপুস্তক দু-হাজারের অধিক বছর একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে না। কারণ, 'মানুষের' জানার শেষ নেই, সে সর্বদাই খুঁজে বেড়ায়। অর্থাৎ তিনি বললেন, ইউক্লিডই জ্যামিতির শেষ কথা নয়। এইভাবে তিনি নতুন জ্যামিতিশাস্ত্রের উদ্ভাবন করলেন যা নন-ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতি নামে পরিচিত। ইউক্লিড বলেছেন, যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে যে কোন সরলরেখার সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরলরেখা অঙ্কন করা যাবে, যে কোন ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হবে এবং যে কোন সরলরেখার দৈর্ঘ্য হবে অসীম। গাউস তাঁর নতুন ধরণের জ্যামিতিতে দেখালেন যে, যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে যে কোন সরলরেখার সমান্তরাল করে একটির বেশী সরলরেখা অঙ্কন করা যেতেও পারে, অথবা একটি সরলরেখাও অঙ্কন করা সম্ভব না হতে পারে। ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ নাও হতে পারে। সরলরেখার দৈর্ঘ্য সসীমও (finite) হতে পারে। গাউসের এই নতুন আবিষ্কৃত জ্যামিতির সাহায্যে বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় আইনস্টাইন মানুষের রূপবোধ এবং বুদ্ধিপ্রাণ মননশীলতার যুগপৎ সমন্বয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের যথার্থ রূপায়ণ করলেন তাঁর সবচেয়ে উঁচুদরের সৃজনমূলক শিল্পবস্তু আপেক্ষিকতা তত্ত্বে। আসলে গাউস জ্যামিতিতে এক বৃহত্তর শৃঙ্খলার সৃষ্টি করলেন।

শিল্প, সংস্কৃতি ও দর্শনের মত গণিতেরও বড় শত্রু হল পূর্ব ধারণা বা সংস্কার। পূর্ব ধারণা বা সংস্কার মন বা মাথা থেকে পুরোপুরি দূর করতে না পারলে নতুন ধারণার সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার প্রচণ্ড সাহসিকতা, মনের জোর। শোনা যায় অ্যারিস্টটলের বা নিউটন প্রমুখের ভুল ধরতে অনেকে ভয় পেতেন। গাউসের সেই সাহসিকতা ছিল বলেই তিনি পেরেছিলেন জ্যামিতির এত বড় সংস্কার করতে। এই সাহসিকতা তাঁর তৈরি হয়েছিল গণিতের প্রতি প্রচণ্ড ভালবাসা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের জন্য। 26 বছর বয়সের মধ্যেই তাঁর পৃথিবীব্যাপী নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল হওয়ার দরুণ তিনি এক ব্যবসায়ীর কন্যাকে

বিবাহ করেন। বিবাহের তিন বছরের মধ্যে সাংসারিক জীবনে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল। পিতা, কাকা, স্ত্রী, দুটি সন্তান সকলেরই একে একে মৃত্যু হল। দুঃখটা এতখানি ছিল যে, তিনি পাগলের মত দিশাহারা হয়ে গেলেন। তাঁকে শান্তি দিয়েছিল গণিত—যেমন দিয়েছিল প্যাস্কেলকে।

পরে তিনি আরেকবার বিবাহ করলেন। জীবনটা হল কাটা ঘুড়ির মত। কখন যে কি হয় কেউ বলতে পারে না। গাউসও এর থেকে নিস্তার পান নি। বিবাহের ঠিক দু-বছর পরেই তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী যক্ষ্মা রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। একটানা 18 বছর শয্যাশায়ী থাকার পর শেষ-পর্যন্ত মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। গাউস অনেক চেষ্টা করলেন, পারলেন না বাঁচাতে। শোকে ভেঙ্গে পড়লেন। এবারও তাঁকে শান্তি দিয়েছিল ঐ গণিতশাস্ত্রই। এই সময় তিনি তলমাত্রা তত্ত্বের (differential geometry) উপর অনেক কিছু আবিষ্কার করেন যার দ্বারা আইনস্টাইন দেখিয়েছেন যে, আলো মহাকাশে হ্রস্বতম (জিওডেসিক্স) পথে চলে এবং ত্বরণ মাধ্যাকর্ষণের জন্য উৎপন্ন হয় না, আসলে তা মহাশূন্যের বক্রতা (curvature) থেকেই সৃষ্টি হয়।

গণিতের আরেকটি শাখা-পরিসংখ্যানের (statistics) উপর তিনি অনেক আবিষ্কার করেন। যে কোন বিষয়ের পরীক্ষামূলক কাজে ভুলের পরিমাণ কত কমানো যায় পরিসংখ্যানের সাহায্যে তার একটি পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—যাকে ন্যূনতম বর্গ (least square) নিয়ম বলে। গণিতের প্রতি তাঁর এই আসক্তি দেখে লোকে তাঁকে পাগল ভাবত। তিনি জীবন ও জগতের সব কিছুকেই গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করতেন। লোকে হাসে কেন, কাঁদে কেন, ফুল সুন্দর কেন,—এগুলোর মধ্যে গণিতের যোগসূত্র বের করার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ তিনি মনে করতেন এই মহাজগতের মধ্যে রয়েছে একটি ঐকতান—সমস্ত জাগতিক নিয়মের মধ্যে গণিতের একটি সুর-সঙ্গতি আছে।

তিনি বলতেন আমরা গণিতকে দেখি অস্পষ্ট, ঝাপ্‌সা, অনেক দূর থেকে দেখার মত করে। অন্ধকার রাত্রির শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে রোমাঞ্চিত উষার আলোকিত বিস্ময় দেখার মত করে, গণিতের কাছে পৌঁছতে পারি না।

তিনি পথেঘাটে যা দেখতেন তাই নোটবুকে টুকে রাখতেন যদি ভবিষ্যতে কোন কাজে লাগে। কোন নতুন ধারণা যদি তাঁর মাথায় আসত তাহলে যতক্ষণ না সেই কল্পনা তাঁর কাছে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর মুক্তি ছিল না, অশান্ত গণিতশিল্পী যেন অনাস্বাদিত কল্পলোক থেকে কল্পনাকে ছিনিয়ে আনবেন, সৃষ্টিকে পূর্ণতা দিতে হবে তো।

তিনি গণিতশাস্ত্রকে কাব্যের সাথে তুলনা করেছেন। কাব্যের মত গণিতেরও নিজস্ব সৌন্দর্য, রূপ, রস ও নান্দনিক (এস্‌থেটিক) মান আছে। কাব্য যেমন সত্যকে রূপায়িত করে গণিতও তাই। তিনি বলতেন গণিতশাস্ত্র হল বিজ্ঞানের রাণী। প্লেটো গণিত বা দর্শনের বাস্তবে প্রয়োগকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। এর বিরোধী ছিলেন গাউস। গাউস বলতেন গণিত ও প্রকৌশলবিদ্যা পরস্পর পরিপূরক, বিরোধী নয়। তিনি তা কাজেও প্রমাণ করেছেন। জিওডেসি শাস্ত্রে, জমি জরীপ

(surveying) করার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। পৃথিবীর চুম্বক তত্ত্বে ও তড়িৎ ক্ষেত্রে তাঁর অনেক অবদান আছে।

পদার্থবিদ্যার স্থির তড়িৎশাস্ত্রে অনেক আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে রেডিও এবং টেলিভিসনের অনেক উন্নতিসাধন করা সম্ভব হয়েছে। তিনিই প্রথম তড়িৎ-চুম্বকন টেলিগ্রাফের আবিষ্কার করেছিলেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি গ্যোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সের সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। গণিতশাস্ত্র গাউসকে খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, শ্রদ্ধা—সকল পুরস্কারই এনে দিয়েছিল। গণিতের মধ্যে ডুবে থেকে তিনি সংসারের দুঃখকষ্ট ভুলে থাকতেন। গণিতের প্রতি এত ভালবাসা জন্মেছিল যে গণিতকে আরও ভাল করে জানার জন্যে তিনি দশ-বারটি ভাষা শিখেছিলেন। 1855 খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে এই বিখ্যাত জ্ঞানতাপসের মৃত্যু হয়।

গাউসের কথা ভাবলে জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ে—

"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—

আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে, আমাদের ক্লান্ত করে, ক্লান্ত-ক্লান্ত করে, লাস কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই।"

প্রাণীসমাজে বন্ধুত্ব

শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য*

[পৃথিবীতে টিকে থাকতে গিয়েই প্রাণীকুলকে পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম, শত্রুতায় যেমন অবতীর্ণ হতে হয়, তেমনি বাঁধা পড়তে হয় বন্ধুত্বের বন্ধনে। প্রাকৃতিক নিয়মে বা অন্য পরিবর্তিত অবস্থায় শত্রুতার প্রয়োজন না হলে মনুষ্যেতর প্রাণী-সমাজও কখনো অকারণ শত্রুতা জিইয়ে রাখে না। শত্রুতা তখন পর্যবসিত হয় নিবিড় বন্ধুত্বে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীমায় এই বন্ধুত্বের বন্ধন বিভিন্ন রকম, তারই স্বল্পপরিসর পর্যালোচনা এই প্রবন্ধ।]

কি মানব সমাজ, কি প্রাণীসমাজ, বাস্তবিক কোন সমাজেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম' কথাটি প্রযোজ্য হতে পারে না। পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে প্রকৃতির সাথে, প্রকৃতির সৃষ্টির সাথে প্রতিপদে সংগ্রাম করতে হয় প্রতিটি প্রাণীকে। তাই প্রাণীতে প্রাণীতে সংঘর্ষ, শত্রুতা আবার বন্ধুত্ব,—সবই প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে অকারণ শত্রুতা প্রাণীজগতে বিরল, কিন্তু অকারণ বন্ধুত্ব বা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘিত বন্ধুত্ব বিরল নয়। তাই, শত্রুতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের আকর্ষণ প্রাণীজগতে বেশী শক্তিশালী—বললে ভুল হবে না।

*3/43, বিবেকনগর, পোঃ—সন্তোষপুর, কলিকাতা-75

জৈব প্রয়োজনে বন্ধুত্ব : প্রাণীকুলের সর্বত্র যে ধরণের বন্ধুত্ব সর্বাধিক দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবেই তা প্রাকৃতিক নিয়মে বিভিন্ন জৈব প্রয়োজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে একই গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে বা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে। কখনো এই বন্ধুত্বের বাঁধন প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষ, কখনো নিবিড়, কখনো বা স্বল্প গভীর। কয়েকটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে এই বন্ধুত্বের ধরন আলোচনা করা যাক।

(ক) জীবনসঙ্গীর সাথে বন্ধুত্ব : জৈব আকর্ষণে পুরুষ প্রাণী বন্ধুত্ব পাতায় স্ত্রী প্রাণীর সাথে, মনুষ্যেতর প্রাণীজগতে এই ধরনের দাম্পত্য-বন্ধুত্ব সম্পর্কে আমাদের যতটা নীচু ধারণা ততটা বাস্তবিক নয়। চিতা, নীল তিমি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে এই বন্ধুত্ব আজীবনব্যাপী ও মোটেই মনুষ্যেতর ধরনের নয়। নীল তিমির ক্ষেত্রে নাকি শোনা যায় যে স্বামী-বিযুক্তা হলে স্ত্রী তিমি পূর্ণযৌবনা হলেও অন্য পুরুষগ্রস্তা হয় না কখনই, বিরহিনী যোগিনীর মত আমৃত্যু কাটায়। এই ধরনের দাম্পত্য-বন্ধুত্ব-জোট আজীবন ধরে দেখা যায় চিড়িয়াখানার বহু প্রাণীর মধ্যে। সব প্রাণী স্বাভাবিক পরিবেশে আজীবন দাম্পত্য জোট বজায় না রাখলেও বহু প্রাণীর পূর্বরাগ কাল বেশ দীর্ঘ এবং দোঁহে দোঁহে সীমাবদ্ধ। হাতী, প্রেইরী কুকুর (মারমট) এদের পূর্বরাগকালীন দাম্পত্য ব্যবহারও প্রায় ব্রজ পর্যায়ের।

(খ) খাদ্য বা অন্যান্য জৈব প্রয়োজনের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব : খাদ্য, আশ্রয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনে একই গোষ্ঠীর বা ভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণীদের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় সহযোগিতামূলক বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বে কখনও উভয়েরই উপকার হয়। যেমন—নদীতীরে দেখা যায় কুমীরদের করালদংষ্ট্রা শোভিত বিশাল হাঁ-করা মুখের ভিতর ঢুকে নির্ভয়ে কিছু পাখী দাঁত থেকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে। কুমীররাও তাদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদাতার প্রতি বিন্দুমাত্র হিংসা প্রকাশ করছে না। পরস্পর বিপরীত মুখী হয়ে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো ঘোড়া উভয়ে উভয়ের মুখের উপদ্রবকারী মাছিদের তাড়িয়ে দিচ্ছে কিম্বা আরামে গা এলিয়ে শুয়ে থাকা গরু-মোষদের কানের থেকে পোকা খুঁটে খাচ্ছে কিছু পাখী—এইরকম পরস্পর সহযোগী বন্ধুত্বের নিদর্শন বহু পাওয়া যায়। অপর যে ধরণের বন্ধুত্ব জৈব প্রয়োজনে গড়ে ওঠে তাতে এক বন্ধুর নিঃস্বার্থ অবদানে উপকৃত হয় অপর বন্ধু। যেমন—হাতির (আফ্রিকার) পিঠের উপর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে দেখা যায় বুবুলকাসইবীস নামক বকজাতীয় পাখীকে, হস্তীপদভারে কম্পিত ঝোপঝাড় থেকে লাফিয়ে ওঠা পোকামাকড়ের লোভে। কাকদের নিজেদের মধ্যে যতই ঝগড়াঝাটি লেগে থাকুক না কেন, কোন কাক বিপদে পড়লে তার উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিটি কাক সব কিছু ভেদ ভুলে। এক ধরনের পাহাড়ী ভেড়া তাদের ধীর স্বভাবের জন্য বিশ্রাম করতে সাহস পায় না। কেবলমাত্র তাদের বিশ্রাম জোটে কোন মারমটদের বিচরণ ক্ষেত্রের পাশে, কেননা কোন শত্রু কাছাকাছি লক্ষ্য করলেই মারমটরা তীক্ষ্ম শীস দিয়ে তাদের আগে থেকে সাবধান করে দেয়। জঙ্গলে বাঘ বেরোলে ফেউ, কাঁকর, হনুমান প্রভৃতি প্রাণী সমস্ত জঙ্গলের প্রাণীদের সাবধান করে দেয়। তিমি বা হাতীর শিশু মাতৃহারা হলে বা অন্য কারণে মাতৃলালন না পেলে তাকে লালন করে বড় করে তোলার দায়িত্ব নেয় অন্য কোন স্ত্রী তিমি বা হাতী।

প্রাকৃতিক নিয়ম ভেঙে বন্ধুত্ব বন্ধন : খাদ্য সংগ্রহ বা অন্য কোন জৈব কারণেই প্রাণীরা পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করে এবং এই শত্রুতা তাদের বংশগতিতে নিহিত থাকে। কিন্তু এই জৈব কারণকে যদি অন্য কোন ভাবে মেটানো যায় তবে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত অর্জনের মাধ্যমে প্রাণীদের বংশগত শত্রুতা দূর করে বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলা যায়। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক ভাবে বা মানুষের দ্বারা কৃত্রিমভাবে সাধিত হতে পারে। মানুষের পোষমানা প্রাণীরা এই ধরণের বন্ধু সৃষ্টির জ্বলন্ত উদাহরণ। হিংস্র বা বন্য প্রাণীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় মানুষ, ফলে তারাও খাদ্য বা অন্য তাগিদে শত্রুতা করার প্রয়োজন মনে না করায় মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে। শৈশবকাল থেকে পালিত হলে হিংস্র বন্যরাও মানুষের নিবিড় আকর্ষণে বাঁধা পড়ে। খৈরী বাঘিনী, এলসা-সিংহী এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় পুরুষের থেকে স্ত্রী প্রাণীরা এবং একক থেকে দলবদ্ধ বিচরণকারীরা বন্ধু হয়ে ওঠে বেশী। শুধুমাত্র মানুষের সাথে বন্ধুত্ব নয়, পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্পর্কযুক্ত প্রাণুরাও বন্ধুত্বের বাঁধনে বাধা পড়েছে পরিবর্তিত অবস্থায়—এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। মস্কো চিড়িয়াখানায় পরীক্ষামূলকভাবে শৈশবকাল থেকে একই সঙ্গে পালিত হতে থাকে দুটি নেকড়ে, একটি বাদামী ভালুক, তিনটি খাটাশ, ছয়টি র্যাকুন এবং ছয়টি শেয়াল। এরা স্বাভাবিক পরিবেশে পরস্পর শত্রু হলেও শৈশবকাল থেকে একই সঙ্গে পালিত হতে থাকার দরুণ কারোর মধ্যে কোন সময় শত্রুতা দেখা যায় নি। উপরন্তু নিজেদের মধ্যে খাবার বণ্টন বা অন্য কোন কারণে কোন সামান্য ঝঞ্ঝাট হলেও তা মিটিয়ে নিয়েছে একই আড্ডার বন্ধুদের মত। শৈশব থেকে পরস্পরের ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে যে কতকগুলি বন্ধুত্বের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত গড়ে উঠেছে তা পারস্পরিক অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে শত্রুতার অনপেক্ষ প্রতিবর্তকে দূর করেছে, এই ধরণের চমৎকার কতগুলি বন্ধুত্বের উদাহরণ দিয়েছেন প্রকৃতিবিদ পি. মান্তেইফল। মাংসাশীরা সাধারণতঃ দর্শন অনুভূতির থেকে ঘ্রাণশক্তিকে বেশী বিশ্বাস করে। মান্তেইফল ও তাঁর ছাত্র জীববিদরা ছয়টি মাতৃহারা ধেড়ে ইঁদুরের বাচ্চাকে নিয়ে যান সদ্য বাচ্চা দেওয়া এক মেঠো-বিড়ালনীর কাছে। ইঁদুর ছানাদের দেখা মাত্র স্বভাব অনুযায়ী সে আক্রমণমুখী হয়ে ওঠে। তখন তাঁরা বাচ্চাগুলিকে সরিয়ে নিয়ে তাদেরকে চান করান এক গামলা জলে—যে জলে আগে চান করানো হয়েছে মেঠো বিড়াল ছানাদের। এবার তাদেরকে বিড়াল ছানাদের সাথে, একসাথে ছেড়ে দেন বিড়ালনীর কাছে। পরম আশ্চর্যের সাথে দেখা যায় যে বিড়ালনী সমভাবে তার নিজের ছানার সাথে লালন করছে ইঁদুর ছানাদের। পরবর্তীকালে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ইঁদুরের সাথে গভীর বন্ধুত্ব হয় একসাথে বেড়ে ওঠা বেড়ালদের সাথে। একইরকম ভাবে বিড়ালের দ্বারা মুরগী পালনের ঘটনাও শোনা যায়। এইরকম নানা পরিবর্তিত ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা যায় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে। কুকুরের সাথে বিড়ালের, পোষা বাঘ, সিংহের, বিড়ালের সাথে কুকুরের এমনকি পাখী, ব্যাঙের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে এরকম অজস্র নিয়মবহির্ভূত বন্ধুত্বের ঘটনা পাওয়া যায়। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ শত্রু বা খাদ্য-খাদক সম্পর্কের জীবদের মধ্যেও আপদকালীন বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নোবেল বিজ্ঞানী কনরাড লোরেঞ্জ উত্তর আমেরিকার দীর্ঘ 12 ফুট

একটি গর্তে একই সঙ্গে শীতঘুমে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান— আড়াই-শ' র‍্যাটেল সাপ, বহু ব্যাঙ, গিরগিটি, কচ্ছপ, ইঁদুর, কাঠবিড়াল, প্যাঁচা, প্রেইরী কুকুর ও মৌমাছিকে। কি চমৎকার সহাবস্থান!

মানুষের সাথে অন্য প্রাণীর বন্ধুত্ব: মানুষের পোষ মানে না এমন প্রাণী প্রায় বিরল। পোষা, বন্ধু প্রাণীর কথা বলতে গেলেই গৃহপালিতদের কথা বলতে হয়। প্রতিটি গৃহপালিত প্রাণীর পূর্বপুরুষই বন্য। প্রাগৈতিহাসিক কালে আমাদের পূর্বপুরুষ এদের বন্য পূর্বপুরুষদের ধরে শৈশব-কাল থেকে লালন করেছিল বিভিন্ন প্রয়োজনে, তারাও নিশ্চিত আশ্রয়-খাদ্যের নির্ভরতা লাভ করে মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে।

গৃহপালিত পশুরা ছাড়াও কিছু প্রাণী স্বভাবগত ভাবে মানুষের নৈকট্য বা বন্ধুত্ব পছন্দ করে। কাক, চড়ুই, শালিখ, পায়রা, কাঠবিড়ালী প্রভৃতি এই রকম প্রাণী। তবে এদের মধ্যে সর্বাগ্রণী হলো ডলফিন, হয়তো বা বুদ্ধির পরিমাণে মানুষের নিকটতম বলেই। সমুদ্রতীরে বাচ্চার সাথে বল খেলা, জাহাজের পাশে পাশে সাঁতার কেটে জাহাজকে পথ দেখানো, বাচ্চাকে পিঠে করে সাঁতার কেটে আসা এরকম অজস্র সত্যি ঘটনা ডলফিনের মানুষের প্রতি বন্ধুভাব-এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখে। মানুষের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন প্রাণীদের মানুষের প্রতি ভালবাসাও প্রগাঢ়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এক ইংরেজ সৈনিক ঝড়ে ডানা ভাঙা কেস্ট্রেল পাখীকে শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলেন এবং মুক্ত করে দেন। কিন্তু সেই পাখী তাকে ছেড়ে কোথাও আর কোনদিন যায় নি। কৃতজ্ঞতা জানাতে সবসময় তার আশেপাশে থেকেছে এমন কি জার্মান ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় জেলঘর পর্যন্ত। এইরকম সত্য ঘটনার লোকাবর্তন থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে সিংহ এবং ক্রীতদাস বা অন্যান্য গল্প।

তাই সাধারণভাবে আমাদের কাছে মনুষ্যেতর প্রাণীজগৎটাকে শত্রুতা-সংঘর্ষের জগৎ বলে মনে হলেও সত্য নয়। শত্রুতা বা সংঘর্ষ তাদের মধ্যে হয় বেঁচে থাকবার জন্য যতটুকু মাত্র অবশ্যম্ভাবী ততটুকুই। বরঞ্চ প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের বাইরেও তারা বন্ধুত্ব পাতাতে আগ্রহী। প্রাকৃতিক নিয়মে শত্রুতার অপেক্ষা বন্ধুত্বের আকর্ষণ মনুষ্যেতর প্রাণীকুলে মানবকুলের থেকে মোটেই কোন অংশে কম নয়।

মৎস্য-কন্যার রহস্য

হীরক দাশ*

[ছোট বেলায় আমরা সবাই মৎস্য-কন্যার গল্প শুনেছি। যার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত রাজকন্যার মত দেখতে আর কোমরের নীচ থেকে মাছের মত। সমুদ্রে এইরকম মৎস্য-কন্যা নাবিকরা প্রায়ই দেখত; কিন্তু বিজ্ঞান এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে এখন জানা গেছে যে এরা একপ্রকার জলচর স্তন্যপায়ী প্রাণী।]

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারত মহাসাগরে মৎস্য-কন্যার দেখা পাওয়া যায়। বহু নাবিক দেখেছে সে দৃশ্য। ঠিক যেন একটি নারী কোমর পর্যন্ত জলের উপর তুলে রেখেছে। কয়েক-শ' বছর আগে জীব-বিজ্ঞানীরা এদের বলত "বিশপ ফিস্"—দু-হাত বাড়িয়ে জলকে যেন আশীর্বাদ করছে। প্রাচীনকালে পোর্তুগীজ ও স্পেনদেশীয় নাবিকেরা এদের "স্ত্রী-মাছ" বলত। অনেক জায়গায় এদের পুজোও করা হত। কিন্তু ইদানীং জানা গেছে এরা ভারত মহাসাগরের এক জলচর স্তন্যপায়ী জন্তু, নাম ডুগং; ক্যারিবিয়ান উপসাগরে এরা ম্যানাটি (Manatee) নামেও পরিচিত। নিরাবরণ নারীদেহের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য এদের। এরা সিরেনিয়া (Sirenia) বা মুন ক্রিয়েচারদের (Mun creature) শেষ বংশধর। হাতীদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়।

এরা বেশ লম্বা হয়, খাটো গলা, শরীর মোটা-লোমহীন চামড়া দিয়ে ঢাকা। বুকে দু-পাশের ছড়ানো বড় পাখ্না দুটি দেখতে ঠিক হাতের মত। মাঝে মাঝে স্ত্রীডুগং বা ম্যানাটিরা (Manatee) ছানাদের দুই পাখ্নার সাহায্যে বুকে জড়িয়ে রাখে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কোন মৎস্য কন্যা বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে আছে। জলের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এরা। দিনের বেলায় এরা দেখা দেয় না; চাঁদনী রাতে সাগরের বুকে উঁকি-ঝুঁকি মারে। তাই চাঁদনী রাতে আবছা আলোয় অতি সহজেই এদের মৎস্য-কন্যা বলে ভুল হয়।

খুব কম বিজ্ঞানী এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকাবাসী ও. ব্যারেট (O. Barret)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ম্যানাটিরা দারুণ ভীতু, সামান্য শব্দে এরা জলের গভীরে লুকিয়ে পড়ে। খাবার সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাখ্না দুটি দিয়ে জলজ ঘাসগুলোকে মুখের কাছে তুলে ধরে। এরা 4 থেকে 5 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজনে প্রায় 1 টনের কাছাকাছি। এরা সাগরের খুব গভীরে যায় না, মাঝে মাঝে নির্জন সমুদ্র তীরে বালুর মধ্যে নাক গুঁজে শুয়েও থাকে।

---

*30/10, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা-31

ডুগংদের বাস কিন্তু গভীর সমুদ্রে। এরা ম্যানাটিদের থেকে আকৃতিতে বড় এবং লম্বা। পুরুষ ডুগং-এর মুখের দু-পাশে বড় দুটো দাঁত আছে। এদের ওপরের ঠোঁটটি বিশাল বড়। ফলে নীচের ছোট ঠোঁটটি ঢাকা পড়ে যায়। এদের খাদ্য ভক্ষণের পদ্ধতি ম্যানাটিদের মত। মানুষ আর হাতীদের মত এরাও যন্ত্রণা বা কষ্টে অশ্রুবিসর্জন করতে পারে। শ্রীলঙ্কার কলম্বো চিড়িয়াখানায় একটি ডুগংকে ধরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু যে কয়মাস সে বেঁচেছিল ততদিন সে এক নাগাড়ে চোখের জল ফেলেছিল। সম্ভবতঃ মোজাম্বিকে (আফ্রিকা) শ্রীমতী ব্যারেট প্রথম ডুগং দেখেন। স্থানীয় জেলেদের হাতে ধরা পড়েছিল এটি। তবে ম্যানাটিদের চেয়ে ডুগংরা বেশী মানুষের মত দেখতে আর তাই পৃথিবীর সর্বত্র ভারত মহাসাগরের এই ডুগংদের নিয়ে প্রাচীনকালে নানান রূপকথা ছড়িয়ে ছিল।

মহাসাগরের নীচে শিলামণ্ডলের মানচিত্র

সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মহাসাগরের নীচে শিলামণ্ডলের একটি মানচিত্র রচনা করেছেন।

মানচিত্রে দেখা যায়, মহাসাগরের নীচে পৃথিবীর যে কঠিন খোলস রয়েছে সেটি 10 থেকে 90 কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু।

শিলামণ্ডল সবচেয়ে পাতলা মহাসাগরের কেন্দ্রস্থলে যেখানে রয়েছে মহাসাগরের শিরা। বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব অনুসারে, ঠিক এই সমস্ত এলাকাতেই শিলামণ্ডল গঠিত হয়। শিলামণ্ডল সবচেয়ে পুরু প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পশ্চিম অংশে এবং আটলান্টিক মহাসাগরের প্রাচীন গভীর অবনমনে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির সমুদ্রবিদ্যা ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ আন্দ্রেই আকসিয়োনভ বলেছেন, মহাসাগরের নীচে শিলামণ্ডলের বেধ ও গড়ন সম্পর্কিত তথ্য বহু তত্ত্বগত সমস্যার সমাধানের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষ করে আমাদের এই গ্রহ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিকে উপলব্ধি করার পক্ষে।

সমুদ্রতলে খনিজের সন্ধানে জরিপ করার জন্যও বিশ্বের মহাসাগরের শিলামণ্ডলের মানচিত্র প্রয়োজনীয়। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সমুদ্রতলে খনিজ সম্পদ আছে। এই সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে বিশ্বে প্রচুর আগ্রহ রয়েছে এবং এই আগ্রহ প্রতি বছরেই বেড়ে চলবে। কোন কোন দেশ ইতিমধ্যেই সমুদ্রতল থেকে তেল, গৃহনির্মাণের উপকরণ ও কিছু কিছু খনিজপদার্থ পাচ্ছে। আন্দ্রেই আকসিয়োনভ মনে করেন, সমুদ্রতলের গড়ন ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে গবেষণায় রত ভূবিজ্ঞানী ও ভূপদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে শিলামণ্ডলের এই মানচিত্র কাজের হবে।

মশা ও ম্যালেরিয়ার শমন

দীপঙ্কর খাঁ।*

প্রায় শতবর্ষ আগে গ্রামবাংলায় হত বারো মাসে তেরো পার্বণ; মোটা ভাত-কাপড়ের ছিল না অভাব।

সেই তখনই বাংলার ঘরে ঘরে হাহাকার তুলেছিল এক ব্যাধি নাম 'ম্যালেরিয়া'

প্রতি বছরই এই রোগে মারা যেত শত শত মানুষ।

এই বিভীষিকাময় অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় বাৎলালেন স্যার রোনাল্ড রস ১৯০০ সালে।

তারপর ধীরে ধীরে সরকারী প্রচেষ্টায় ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা কমে গিয়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে সেই ভয়ংকর আবার ফিরে এসেছে।

আমরা জানি ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী অ্যানোফিলিস মশা।

এই মশা আকারে ছোট, ডোরাকাটা, উড়বার সময় শব্দ করে, বসবার সময় 45° কোণ করে বসে

মশার জীবনে চারটি দশা।
i) ডিম,

ii) লার্ভা

iii) পিউপা

iv) পূর্ণাঙ্গ দশা, এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা ছাড়া বাকী তিন দশাতেই মশা জলে কাটায়।
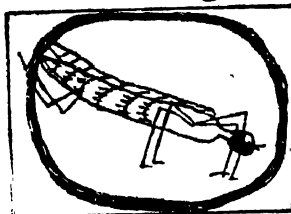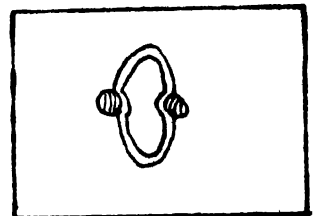
তাই মশার হাত থেকে বাঁচতে প্রয়োজন— বিল, ডোবা, পুকুর, নালা এবং অন্য বদ্ধ জলাশয়ে উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা.

বদ্ধ জলাশয়ে কেরোসিন বা অন্য কোন প্রতিষেধক স্প্রে করা।

যে সমস্ত জলাশয়ে প্রতিষেধক দেবার অসুবিধা সেখানে জৈব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যেমন লার্ভাখাদক মাছ চাষ করা।

শোওয়ার সময় মশারি ব্যবহার করা

বন্ধ্যা পুরুষ মশা প্রকৃতিতে ছেড়ে যৌন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও চলছে।

যাই হোক বাঁচতে হলে আমাদের চাই মনের জোর কারণ— "মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি।"
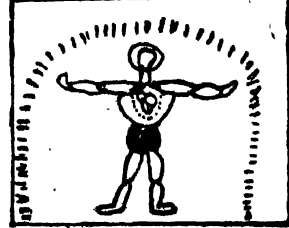
জীবন্ত ফসিল

কল্যাণ মুখোপাধ্যায়*

ফসিল বলতে সাধারণতঃ আমরা প্রাণীর দেহাবশেষকে বোঝাই। সে দেহাবশেষ হবে বহু বছরের পুরানো, মাটির তাপে ও চাপে তা পাথরের আকার নেবে আর বিজ্ঞানীদের কাছে বহন করে আনবে বহু লক্ষ বছর আগেকার কোন্ এক বিলুপ্ত প্রাণীর সাক্ষ্য। যদিও প্রস্তরীভূত পায়ের ছাপ ইত্যাদিকেও ফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবু ফসিল যেন বিবর্তনের ধাপে সেই প্রাণীর বিলুপ্তির কথাই ঘোষণা করে। কিন্তু বর্তমানে এমন কয়েকটি প্রাণীর জীবন্ত প্রতিনিধির সাক্ষাৎ মিলেছে যারা বিলুপ্তির হাত থেকে আশ্চর্যজনকভাবে আত্মরক্ষা করে আজও অস্তিত্বের সংগ্রামে টিকে আছে।

এমনই এক প্রাণী সিলাকান্থ (Coelacanth)। এদের বৈজ্ঞানিক নাম Latimeria chalumnae. লম্বায় প্রাণীটি 5 থেকে 6 ফুট। দেখতে প্রায় মাছেরই মত তবে এদের পাখ্‌নাগুলি কিছু মৌলিকত্ব বহন করে। দেহ থেকে সরাসরি ফিন্-রে (Fin-ray) উৎপন্ন হয়ে পাখ্‌না তৈরি হয় না। উপরন্তু পাখ্‌নার জায়গায় উৎপন্ন হয় কতকগুলি পেশীবহুল প্রত্যঙ্গ। সেই প্রত্যঙ্গগুলি থেকে উৎপন্ন হয় ফিন্‌রে সমন্বিত পাখ্‌নাগুলি। এদের পাখ্‌নার সংখ্যা 8টি—এক জোড়া বক্ষপাখ্‌না, এক জোড়া শ্রোণী পাখ্‌না, একটি পায়ু পাখ্‌না, একটি পুচ্ছ পাখ্‌না ও এক জোড়া পৃষ্ঠ পাখ্‌না। এই পেশীবহুল পাখ্‌নাকে সাধারণতঃ "সপিণ্ড পাখ্‌না" (lobbed fin) বলা হয়।

মনে করা হত যে ক্রিটেশাস যুগেই এই প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 1938 সালের মাঝামাঝি এই সিলাকান্থের এক বংশধর ধরা পড়ে আফ্রিকার উপকূলে এক জেলের জালে। সেখান থেকে বিজ্ঞানী-দের হাতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গবেষণার শুরু কিভাবে ও কেমন করে সিলাকান্থরা সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে রইল। এটা সত্যই অশ্চর্যজনক। মনে করা হয় সিলুরিয়ান যুগের শেষে পৃথিবীর ভূ-মণ্ডলে শুরু হয় দারুণ পরিবর্তন। ফলে অনেক স্থানে সমুদ্রের মাঝে জেগে ওঠে ডাঙা আর সমুদ্র সেই স্থানে পরিণত হয় অগভীর জলাশয়ে। ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যে মাছের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে ওঠে। ফলে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই সময় মাছেদের কিছু অংশ চেষ্টা করতে থাকে ডাঙ্গায় ওঠবার জন্য। কারণ ডাঙায় তখন পতঙ্গদের রাজত্ব। কিন্তু ফিনুরে সমন্বিত পাখ্‌না ডাঙায় ওঠার পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তাদের পাখ্‌নায় দেখা দেয় পরিবর্তন। পাখ্‌নাগুলি পূর্বোক্ত lobbed fin-এ পরিবর্তিত হয়ে যায়। দৈহিক আকৃতি ও আভ্যন্তরীণ গঠনেরও পরিবর্তন হতে থাকে। এই সময় উৎপত্তি হয় সিলাকান্থ জাতের প্রাণীদের। মনে করা হয় কোন না কোন উপায়ে পরবর্তীকালে সিলাকান্থদের কিছু অংশ সমুদ্রে পৌঁছায়—যেখানে পরিবর্তনের চাহিদা কম। ফলে তারা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজো টিকে আছে।

*2/1 মল্লিকাপুর রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-5

আর এক জীবন্ত ফসিল টুয়াটারা (Tuatara)। 'Tua'-এর অর্থ পৃষ্ঠদেশ, 'tara'-এর অর্থ কাঁটা। গিরগিটি জাতীয় এই প্রাণীটির পিঠের কাঁটা থেকেই এমন নামের উৎপত্তি। টুয়াটারার বৈজ্ঞানিক নাম sphaenodon punctatum. নিউজীল্যান্ডবাসী এই প্রাণীটি rhynchocephalianদের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি। লম্বায় হয় $2\frac{1}{2}$ ফুটের মত। নিশাচর ও গুহাবাসী। প্রাণীটি ডাইনোসরাসদের চেয়েও প্রাচীন। মনে করা হয় ডাইনোসরাসদের উদ্ভবের আগেই নিউজীল্যান্ড বিবর্তন কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে যায় ও সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে পড়ে পড়ে। ফলে এই টুয়াটারা জাতের সরীসৃপরা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কোন তীব্র সংগ্রামের সম্মুখীন হয় নি। তাই এদের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে আর বিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয় না। তবে বর্তমানে ইউরোপীয়দের আনা মাংসাশী প্রাণীদের পাল্লায় পড়ে এরা বিলুপ্তির সম্মুখীন হয়েছে।

আরো অনেক প্রাণীকেই জীবন্ত ফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। যেমন লাঙফিস, 'Diponoi' শ্রেণীর এই প্রাণীটির কয়েকটি প্রজাতি দেখা যায়। এদের প্রত্যেকরই পটকা (air bladder) এক ধরণের ফুসফুসে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া এদেরও আছে lobbed fin. মনে হয় এরাও উভচর ও মাছের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী প্রাণী। আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের ধারায় এই "জীবন্ত ফসিল"-দের গুরুত্ব অসামান্য। কারণ এদের বেঁচে থাকার উপায় ও কারণ বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় এমন সব তথ্য যা বিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমুদ্রের অনেক স্থানের পরিবেশ আজও অনেকাংশে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই মনে হয় সমুদ্রের বুকে এমন আরো অনেক প্রাণীর সাক্ষাৎ মিলতে পারে যারা আমাদের চোখে অনেক বছর আগেই গেছে বিলুপ্ত হয়ে। তাদের থেকে পাওয়া তথ্য হয়ত বিবর্তনের ক্রমিকধারাকে এক পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

(ক)

প্রশ্ন : (1) কাঁচা দুধ উপকারী ; কিন্তু জ্বাল দেওয়া দুধ ঠাণ্ডা অবস্থায় বিষতুল্য—এরকম একটা কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি ?

(2) ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়ায় বাত হয় বলে অনেকে বলেন। কথাটি কি সত্যি ? যদি হয়, কেন ?

(3) শিশুদের দাঁত ওঠার সময় সাধারণত পেটের গোলমাল হয় কেন ?

ভোলানাথ রায়
প্রসন্নগর, জলপাইগুড়ি

উত্তর : (1) দুধ সর্বদাই অমৃত, কোন অবস্থাতেই বিষতুল্য নয়। দুধের মধ্যে দূষিত পদার্থ এবং জীবাণুর অবস্থিতিই তাকে বিষতুল্য করে তুলতে পারে। কাঁচা দুধের বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, পরন্তু তাতে দূষিত পদার্থ অথবা জীবাণু মিশ্রিত থাকার সম্ভাবনাই বেশী—সুতরাং ক্ষতিকর। জ্বাল দেওয়া দুধ গরম বা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে সেই কারণে ক্ষতিকর।

(2) ইলেকট্রিক ফ্যানের হাওয়ায় 'বাত' হয় বলে মনে হয় না। নিদ্রিত অবস্থায় বহুক্ষণ জোরে হাওয়া লাগলে কারো কারো সর্দি লাগতে পারে অথবা গা ভারী হতে পারে।

(3) শিশুদের দাঁত ওঠার সময় শরীর খারাপ হওয়ার ধারণাটা খুব তথ্যভিত্তিক নয়। কারো কারো সামান্য পেটের গোলমাল অথবা জ্বরভাব হয়। এই ভুল ধারণা থাকার জন্যে অনেক মায়েরা শিশুদের জ্বর এবং উদরাময়ের প্রথম দিকে অবহেলা করে থাকেন। এটা যুক্তিসঙ্গত নয়।

[উত্তর দিয়েছেন হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

(খ)

প্রশ্ন : (4) ভূপৃষ্ঠে মানুষের বিভবমাত্রা শূন্য বলে শক্ খায় না। কিন্তু মানুষ যখন লাফায় বা শূন্যে কোন যানে (বেলুন, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি) থাকে তখন শক্ খায় না কেন ?

সুকুমার রায়
কলিকাতা-9

উত্তর : (4) পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুতে প্রতি মিটার উচ্চতাভেদে গড়ে প্রায় 100 ভোল্ট বিভব-ভেদ আছে। উচ্চতা বাড়লে এই বিভবভেদের পরিমাণ কমতে থাকে —50 কি.মি. উচ্চতায় এই বলক্ষেত্র বেশ দুর্বল। বায়ুমণ্ডলের উপরিতল থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত মোট বিভবভেদ প্রায় 400,000 ভোল্ট।

মানুষ বা অন্য প্রাণী এই বিভবভেদহেতু শক্ খায় না তার কারণ প্রাণীদেহ বায়ুর তুলনায় যথেষ্ট বেশি বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বায়ু থেকে যে-হারে চার্জ বা বিদ্যুতাধান প্রাণিদেহে জমা হতে থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি হারে তার পরিবহন হতে থাকে। ফলে সমগ্র প্রাণিদেহ সমবিভবতলে পরিণত হয়—তা সে ভূপৃষ্ঠে থাকুক বা শূন্যে ভাসমান থাকুক। ভূপৃষ্ঠে থাকলে তার বিভবমাত্রা O হবে, আর অনেকক্ষণ শূন্যে একই জায়গায় ভাসমান থাকলে বিভবমাত্রা অন্যতর হবে—এই যা প্রভেদ। তাই লাফালে বা বেলুনে চাপলেও মানুষ শক্ খায় না। এই বিভবভেদ বা তার পরিমাপ সম্পর্কে বিস্তৃততর তথ্যের জন্য পত্রলেখককে The Feyman Lectures on Physics-এর দ্বিতীয় খণ্ডের নবম অধ্যায় দেখতে অনুরোধ করি।

[উত্তর দিয়েছেন অরুণকুমার ঘোষ]

প্রশ্ন : (5) আমার তৈরী একটি নলাকার চোঙ (Circular pipe) বজ্র-নিরোধকের সাথে মাটির সঙ্গে যুক্ত। বজ্রপাতের পর চোঙটি Circular rod-এ পরিণত হতে দেখা গেল। এর কারণ কি ?

তুষার আইচ
বারাসাত

উত্তর : (5) বজ্রপাতের সময় বজ্রনিরোধক তার ও নলাকার চোঙের মধ্যে যে বিভব-পার্থক্য (Potential Difference) সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে উভয়ের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ (Discharge) হয়। লোহার রোধ (Resistance) বেশী হওয়ায় নলটি উত্তপ্ত হয়ে গলে নরম হয়ে যায়। আবার ঐ Discharge-এর সময় বজ্রনিরোধক ও লোহার চোঙের মধ্যে বিপরীত আধান-যুক্ত (একটিতে +ve ও অন্যটিতে −ve) তড়িৎ-কণার (charge) আকর্ষণে নরম লোহার নলটি একটি রড-এ (Rod) পরিণত হয়।

[উত্তর দিয়েছেন শিবরাম বেরা]

(গ)

প্রশ্ন : (6) কাঁচা আম টক, সেই আমই পাকলে মিষ্টি লাগে কেন ?

স্বপনকুমার মোদক
হরিপুর, বর্ধমান

(7) লঙ্কার ঝালের জন্য কোন্ পদার্থ দায়ী ?

(8) সাবান খোলা বাতাসে ফেলে রেখে ব্যবহার করলে বেশী দিন চলে কেন ?

সুদীপ মজুমদার
কাঁথি ইরিগেশন অফিস,
কাঁথি, মেদিনীপুর,

উত্তর : (6) কাঁচা আমে ম্যালিক এবং অন্যান্য জৈব অ্যাসিড থাকে। সেজন্য এটি টক লাগে। এনজাইম ও আলোকের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার দ্বারা ঐসব অ্যাসিডগুলি সুগারে পরিণত হয়। এই কারণে কাঁচা আম পাকলে মিষ্টি লাগে। ফলের কোষপ্রাচীরের মধ্যে ল্যামেলায় প্রোটোপেকটিন পাওয়া যায়। এটি সাধারণ অবস্থায় জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু ফল পাকার সময়ে প্রোটোপেকটিন দ্রবণীয় পেকটিনে পরিণত হয় এবং কলাগুলির (Tissues) ভিতর দৃঢ়তা কমে যায়। এর ফলে পাকা ফল নরম হয়ে যায়।

(7) লঙ্কার মধ্যে ক্যাপসিসিন নামে এক ধরণের পদার্থ থাকে। এর জন্য লঙ্কা ঝাল লাগে। জিহ্বার টেষ্টবাডের সঙ্গে এই পদার্থটি মিশলে ঝাল অনুভব করা যায়।

(8) সাধারণত সাবান হল উচ্চতর ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে সোডিয়াম বা পটাসিয়ামের লবণ। সাবানের অণুতে দুটি দিক থাকে। একদিকে পোলারিটি বেশী থাকে এবং অন্যদিকে পোলারিটি কম থাকে। পোলার দিকের গঠন COO^-Na^+ এবং এটি জলে দ্রবণীয়। সুতরাং সাবানে জল লাগলে পোলার দিকটা ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে, এজন্য খোলা বাতাসে রাখলে সাবানের ক্ষয় কম হয় এবং তাতে সাবান বেশীদিন চলে।

[উত্তর দিয়েছেন কমল চক্রবর্তী]

পৃথিবীর হিমবাহের মানচিত্র

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর উপরিতলের বড় অংশ হিমবাহের নীচে ঢাকা পড়েছিল। এই হিমবাহ কি-ভাবে চলাচল করছে তার একটি নকল এস্তোনিয়ার ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করেছেন। ডেরিক বা ভারী বস্তু উত্তোলন করার যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা নিষ্কাশিত করেছেন কাঠের অবশেষ ও উদ্ভিদ, যেগুলো উত্তর থেকে বরফ নেমে আসার ফলে হারিয়ে গিয়েছিল। এ থেকে বোঝা গিয়েছিল দূরে অতীতে কি-ভাবে আমাদের গ্রহ বরফে ঢাকা পড়েছিল। ভূমির, আবহাওয়ার ও মহাকাশের বিভিন্ন চক্র অনুধাবন করার জন্যও এই সমস্ত অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। য়ুনেস্কোর কর্মসূচী অনুযায়ী বহু দেশের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর হিমবাহের মানচিত্র রচনা করেছেন, এই মানচিত্রে এস্তোনিয়ার ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য ব্যবহৃত হবে।

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসারে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ক্লাব সংস্থা গড়ে উঠুক

গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত 26শে, এপ্রিল '80 পঃবঙ্গের বিজ্ঞান ক্লাবদের এক সম্মেলন কলিকাতার র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত, প্রধান অতিথি ছিলেন, পঃ বঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উপসচিব রণজিৎ মুখার্জী। 20টি বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষে প্রায় 80 জন প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমে আহ্বায়কের পক্ষে দীপক দাঁ বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত করা যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব দেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর সম্পাদক শুভব্রত রায়চৌধুরী বিজ্ঞান ক্লাবদের আর্থিক সমস্যা, প্রজেক্ট ধরণের কাজের গুরুত্ব ও মডেল পেটেন্ট করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সংস্থা সরকারী ভাণ্ডার থেকে বিজ্ঞান ক্লাবদের জন্য আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে। এই সংস্থার কাছে প্রতিটি বিজ্ঞান ক্লাবের কার্য বিবরণী জমা দিতে অনুরোধ করা হয়। তাহেরপুর বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ পাল গ্রামীণ পরিবেশে বিজ্ঞান ক্লাব পরিচালনার সমস্যা ও বিজ্ঞান ক্লাবের দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। ইনডিয়ান অ্যাসোঃ অফ কলেজ গোয়িং সায়েন্টিস্টের (পঃ বঃ) সভাপতি অসিত সরকার বিজ্ঞান ক্লাবের উদ্দেশ্য যুক্তিভিত্তিক চিন্তার প্রসার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দমদম বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষে অপরেশ পাল বলেন বেকার সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান ক্লাবকে এগিয়ে আসতে হবে। নবগ্রাম, হুগলীর পায়োনীয়ার হবি গ্রুপের পক্ষে কবীর সুরচৌধুরী বিজ্ঞান ক্লাব বন্ধুদের মডেল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখার কথা বলেন। অন্বেষা বিজ্ঞান ক্লাবের পক্ষে অপূর্ব মিত্র বলেন—বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তোলায় কেন্দ্রীয় সংগঠন অপরিহার্য। সায়েন্টিফিক সোসাইটি অফ স্টুডেন্টস এর পক্ষে সম্পাদক তন্ময় দাশ বিজ্ঞান ক্লাব কর্মোদ্যোগের প্রসারে অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের আরও বেশি সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানান। অ্যাসোঃ অফ ভলান্টারী ব্লাড ডোনারস এর পক্ষে ডাঃ অরুণ সেন রক্তদানের সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বুঝিয়ে বলেন, একাজে বিজ্ঞান ক্লাবকে প্রচারে নামতে হবে ও সাধারণ মানুষকে রক্তদানে উৎসাহিত করতে হবে। আল্‌ফা সায়েন্স ক্লাবের পক্ষে মানস চক্রবর্তী, চিনসুরা সায়েন্স ক্লাবের পক্ষে শহীদুল গণি বিজ্ঞান ক্লাব ও কুসংস্কার প্রসঙ্গে আকর্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। ঠাকুরনগর সায়েন্স ইনস্টিটিউটের পক্ষে বুদ্ধাশীষ বালা, পঃ বঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার পক্ষে ডঃ রবীন মজুমদার বিজ্ঞান ক্লাবের সাংগঠনিক গঠনের উপর জোর দেন। শ্রীমণি দাশগুপ্ত (জি. আর. আই.) বলেন, সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর না করে আদর্শের প্রতি অনুরাগে কাজ করতে হবে। সমাজ সংগঠনে বিকল্প নেতৃত্বের প্রসারে তিনি বিজ্ঞান ক্লাবের নেতৃত্বের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করায় কবীর

স্বয়চৌধুরীর প্রস্তাব সমর্থন করেন জি. আর আই এই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে আগ্রহী—একথাও তিনি উল্লেখ করেন।

সভার প্রধান অতিথি পঃ বঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের উপসচিব শ্রীরণজিৎ মুখার্জী বিজ্ঞান ক্লাবদের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করেন যে, কিভাবে গ্রামীণ কুসংস্কার দূর করতে সরকার বিজ্ঞান ক্লাবের পাশে থেকে সহযোগিতা করতে পারে। এ বিষয়ে তিনি সুনির্দিষ্ট প্রজেক্ট কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারে বিজ্ঞান ক্লাবের সমস্যাদির সমাধানে সরকার আগ্রহী একথাও তিনি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি অধ্যাপক অম্লান দত্ত মূল্যবোধ ও বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। মূল্যবোধ কিভাবে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে এবং বিজ্ঞান সংস্কৃতির প্রসারে যুক্তি-চিন্তার মুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার বিষয়ে তিনি বিজ্ঞান ক্লাবের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পঃ বঙ্গে অনেকগুলি বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

ডঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই সম্মেলনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

2

গরলগাছা সায়েন্স ক্লাব

গরলগাছা সায়েন্স ক্লাবের উদ্যোগে 16ই ডিসেম্বর, 1979 শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী স্লাইড সহযোগে" মানুষের মস্তিষ্ক" বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

30শে মে 1980 অপর একটি সেমিনারে "সূর্যগ্রহণ এবং তার প্রতিক্রিয়া" সম্পর্কে আলোচনা করেন বিজ্ঞান সাংবাদিক শ্রীসমরজিত কর। উপস্থিত শ্রোতাদের নানা প্রশ্ন ও আলোচনার মধ্য দিয়ে সেমিনারটি বেশ প্রাণবন্ত হয়। আলোচনা শেষে 3টি তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এগুলির মধ্যে সাম্প্রতিক সূর্যগ্রহণের সময় কোনারক থেকে তোলা ছবিও ছিল।

8ই জুন 1980, ক্লাবের পক্ষ থেকে নেহেরু শিশু সংগ্রহশালা, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম এবং বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। এই ভ্রমণে স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের প্রায় 50 জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এই ভ্রমণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

গরলগাছা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এবারের রথের মেলায় অন্যতম আকর্ষণ ছিল 'গরলগাছা সায়েন্স ক্লাবের' একটি বিক্রয় কেন্দ্র। এই বিক্রয়কেন্দ্রে চন্দননগরের নারিকেল গবেষণা কেন্দ্র থেকে আনা 200টি উন্নত জাতের নারিকেল চারা এবং 200টি উন্নত জাতের সুপারীর চারা উপযুক্ত পরামর্শসহ ন্যায্য দামে বিক্রয় করা হয়

পরিষদ-সংবাদ

শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা

8ই জুলাই, 1980 পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে 'শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা'টি দেন ডাক্তার শ্রীকুমার রায়। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মানুষের মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্য'।

বক্তৃতার প্রারম্ভে প্রয়াত চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ডাঃ রায় বলেন পেশায় ব্যবহার-জীবী হলেও সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। এছাড়া, বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর দাক্ষিণ্যধন্য। সেগুলির মধ্যে যাদবপুরের কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল একটি। ডাঃ রায় স্বীকার করেন যে, এই হাসপাতালে কাজ করার সময়ই তিনি মানুষের মেরুদণ্ডে যক্ষ্মারোগ তথা মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। একারণে বক্তৃতাটি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পেরে ডাঃ রায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

'মানুষের মেরুদণ্ডের বৈশিষ্ট্য' আলোচনাকালে তিনি বলেন বিশাল প্রাণী জগতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সর্বাবস্থায় দ্বিপদী। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দু-পায়ে দাঁড়ানোর ফলে মানুষের পৃষ্ঠ ও কোটিদেশের মেরুদণ্ড ইংরেজী 'S' অক্ষরের রূপ নিয়েছে যা অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। তাদের মেরুদণ্ডটি হয় ঋজু অথবা ধনুকাকৃতি। পরীক্ষায় জানা গেছে এই 'S' আকৃতির জন্যে মানুষের মেরুদণ্ড অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশ দুর্বল, তাছাড়া মানুষের মেরুদণ্ডে বাত বা spondilytis, যক্ষ্মা ইত্যাদি এমন কতকগুলি রোগ দেখা যায় যা অন্য প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় না। মনুষ্য শিশুর মেরুদণ্ড কিভাবে বিবর্তনের সবকয়টি ধাপ অনুসরণ করে—মেরুদণ্ডের ক্রম-বিবর্তন ও ভ্রূণের মেরুদণ্ডের গঠন প্রসঙ্গে সেকথাও ডাঃ রায় আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা।

2

জনপ্রিয় বক্তৃতা

গত 20 জুন 1980 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সত্যেন্দ্র ভবনে শ্রীমণি দাশগুপ্ত "সুন্দরবনে বৈজ্ঞানিক অভিযান" সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা দেন। তিনি তরুণদের সাহসী, আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন—যে কোন অভিযানে অসীম সাহস, পরিশ্রম, ধৈর্য প্রত্যয়শীল মন একান্ত প্রয়োজন। তিনি মনে করেন সুন্দরবনের উদ্ভিদ-জগৎ, প্রাণী জগৎ, কীট-পতঙ্গ জগৎ, মনুষ্য-জগৎ, পরিবহন-জগৎ এক কথায় সব বিষয়ের উপরে নতুন তথ্য, নতুন ভাবনা তরুণদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। সমস্ত রকম অভিযানের উপরে নানা ধরনের বই, মানচিত্র সংগ্রহ করে, পড়াশুনা করে রহস্যেঘেরা সুন্দরবনকে জানার জন্যে তিনি তরুণদের এগিয়ে আসতে বলেন। এই বিষয়ে গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট যে অভিযানের প্রস্তুতি করছেন তাতে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে। টাকা চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।
কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। বিগত বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে- জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 8, অগাষ্ট, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কমিশনের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকগণকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা 700006
ফোন—55-0660

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ | অগাষ্ট, 1980 | অষ্টম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

গ্রামে চাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

রঞ্জনমোহন খাঁ

মুক্ত আকাশ, বিমল বাতাস, কালো দীঘির টল টল জল, সবুজের হিল্লোল, বিস্তীর্ণ বনছায়া—এই নিয়ে বাংলার ছোট ছোট গ্রামগুলি শান্তির নীড়। এটাই কি গ্রাম-বাংলার বাস্তব চিত্র ?

বর্তমান সভ্যতার ছোঁয়াচ শহরের মত গ্রামেও লেগেছে, জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে, অবস্থাপন্ন পরিবার শহরমুখী হয়েছে, সরকারী-বেসরকারী প্রচেষ্টায় কাঁচা-পাকা রাস্তায় যানবাহন চলছে, কৃষি-কর্ম নতুন পথে মোড় নিচ্ছে, গ্রামের উৎপন্ন পণ্য সোজা শহরে চলে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিরাট অংশীদার গ্রামবাংলার মানুষ। বাস্তবে শহরের মত গ্রামেরও পুরা সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নতির চেয়ে শোষণ ও স্বার্থই বড়। সরকার এদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র।

ফলে, (i) সংস্কারের অভাবে পুকুর বা দীঘি মজে হয়েছে পচা জলের, আগাছার ও মশার বংশবৃদ্ধির আদর্শ আস্তানা। (ii) অধিক ফসল ফলানোর তাগিদে ও জনসংখ্যার চাপে বনাঞ্চল ও গোচারণ ক্ষেত্র সাফ করে হয়েছে চাষের জমি বা বাস্তুভিটে। (iii) সংস্কার, অর্থাভাব ও বিজ্ঞান সচেতনতা না থাকায় একই জলাশয়ে স্নান করে মানুষ, গবাদিপশু, চড়ে হাঁস, মেয়েরা করে মূত্র ত্যাগ, ছেলে-মেয়েদের চলে জলশৌচ, চলে কাপড় কাচা ও বাসন মাজা। আবার ঐ জলেই হয় রান্না ও অন্যান্য কাজ। (iv) ঘরের পাশে জমা হয় গোবর ও বাড়ীর আবর্জনা। পচে পোকা-মাকড় জন্মায়, আবহাওয়া হয় দূষিত, রোগজীবাণু বিস্তার হয় সহজতর। (v) প্রায় শতকরা পঁচিশটি পরিবারের একই ঘরে বাস করে মানুষ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী। (vi) পড়ো জায়গা নিঃশেষ হওয়ায়, পায়খানা তৈরির সামর্থ ও ইচ্ছা না থাকায় এখানে সেখানে মলমূত্র হয় জমা, অজ্ঞাতে ছড়িয়ে পড়ে নানা রোগ। (vii) বাসি পচা উচ্ছিষ্ট খাওয়া মানে রোগ ডেকে আনা বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা—একথা মনেও জাগে না আর জাগলেও অবস্থার বিপর্যয়ে কিছু করারও উপায় থাকে না। (viii) ময়লা কাপড় জামা তো অধিকাংশের অঙ্গের ভূষণ। (ix) পেট ভরে খাবার ও পানীয় জলেরই যেখানে অভাব সেখানে সুষম খাদ্যের কথা বাতুলতা মাত্র। তাই অধিকাংশ শিশুই অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে। (x) অধিক ফসল ফলানোর সাড়া জেগেছে, যথেচ্ছ সার ও কীট-নাশক ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে, সাবধানতার কোন প্রশ্নই নাই। (xi) লেখাপড়া করার স্বাদ মনে থাকলেও, ঐ বিষয়টি অবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। (xii) রোগ উপশমের জন্য, গ্রামবাংলার মানুষের চিকিৎসার জন্য সরকারী প্রচারের সত্যতার সাক্ষ্য হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তারহীন, ঔষধহীন কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র। এরূপ নানা সমস্যায় অবহেলিত গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। গ্রামের উন্নয়ন চাই এ তো প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই শ্লোগান। শ্লোগান নয় চাই কাজ। সেই কাজের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ পাক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

মনুষ্যপ্রকৃতির উৎস সন্ধানে

শ্রীকুমার রায়*

[প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে বনবাসী মহাকপির ভূচারী শিকারী প্রাণীতে রূপান্তর আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আবির্ভাব ক্ষণে মানুষের প্রকৃতি ছিল বন্য, ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের (1891) কথায় "স্যাভেজ"। তার পর তারা উন্নত হল বর্বর জাতিতে যাদের তিনি বলেছেন "বারবেরিয়ন্স"। অবশেষে দেখা দিল সভ্যতার আলো। কিন্তু সভ্য মানুষের প্রকৃতিতে কিছু বন্যভাব এখনও আছে। বর্তমান প্রবন্ধে মানুষের সেই দ্বৈত প্রকৃতির কারণ আলোচিত হয়েছে।]

আজ থেকে আনুমানিক 15 লক্ষ বছর আগে বনবাসী মহাকপি বিবর্তিত হল সাভানা প্রান্তরবাসী শিকারী অস্ট্রেলোপিথেকাসে এবং তার দ্বিপদিত্ব, হাতের মুক্তি ও চিন্তাশক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পরস্পরের ক্রমোন্নতির বিধায় এই রূপান্তর ঘটে গেল অতি দ্রুত ; মাত্র 5 লক্ষ বছরে অস্ট্রেলোপিথেকাস রূপ নিল হোমো-সেপিয়ন্সের। আমাদের সেই আদিপুরুষেরা ছিল সমসাময়িক জীব জগতে অপেক্ষাকৃত অক্ষম ও অপটু শিকারী তবু তীব্র বাঁচার সংগ্রামে তারাই পেল জয়টিকা, পেশীশক্তির জোরে নয়, ধীশক্তির জৌলুসে। বৈজ্ঞানিকেরা তুলনা করে দেখেছেন যে, বানরবর্গে হোমোসেপিয়ন্সের মস্তিষ্কের আয়তনই সর্বাধিক, 1500 m. l.-এর ঊর্ধ্বে, পক্ষান্তরে শিম্পাঞ্জী, অস্ট্রেলোপিথেকাস এবং হোমোইরেকটাস-দের মস্তিষ্কের আনুমানিক গড় আয়তন যথাক্রমে 400, 500, ও 1000 m. l.। আরও বিশদভাবে বলতে গেলে মস্তিষ্কের যে অংশটি স্মৃতি, মেধা, ধৃতি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় গুণাবলীর আধার, শারীর স্থানিকরা যাকে ফ্রণ্টাল লোব (frontal lobe) নামে অভিহিত করেন, মানুষের মস্তিষ্কেই সেটি সর্বাপেক্ষা পরিণত এবং স্বতঃই এই বর্ধিতায়তন ফ্রণ্টাল লোব ধারণের জন্য তার করোটির সম্মুখভাগ সুবর্তুল (1নং চিত্র)।

সেই উন্নতমানের বিচার বুদ্ধি দিয়ে আদিম মানুষেরা উপলব্ধি করেছিল যে, সমকালীন শিকার-দক্ষ শ্বাপদদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হলে স্বপ্রজাতির অভ্যন্তরে সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন, সুতরাং যূথবদ্ধ হতে হবে। অতএব সূচনা হল রুশো, হবস্, লক্ উল্লিখিত তথাকথিত চুক্তিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার। ক্রমশ ধী-শক্তির আয়ত

*বি. এফ 118 সল্টলেক সিটি, কলিকাতা-700 064

উদ্বর্তনের ফলে মস্তিষ্কের "ব্রোকা-স্থান" (Broca's area)-এর (2নং চিত্র) উন্নতি পরিলক্ষিত হল যার ফলে মানুষ হয়ে উঠল বাঙময় এবং নিপুণতর ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হল। স্বীকার করতেই হবে অন্তত এই ব্যাপারে মানুষের সমাজ অন্যান্য যূথবদ্ধ প্রাণী সমাজের চেয়ে উন্নত এবং আরও উন্নতির পথে ধাবমান।

বাসা ছেড়ে যায় হয় না। আদিম মানুষের সমাজ ব্যবস্থাও ছিল প্রায় অনুরূপ। নারীরা শিকার অভিযানে অংশ গ্রহণ করত না, তারা ব্যস্ত থাকত গৃহস্থালীর কাজে, বিশেষতঃ সন্তান প্রতিপালন ছিল নারীজাতীর প্রধান ও গুরু দায়িত্ব।

বস্তুতঃ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সন্তান পালনে নারীর দায়িত্ব সর্বাধিক। একেই দীর্ঘ 266 দিন তাকে গর্ভ-

1নং চিত্র
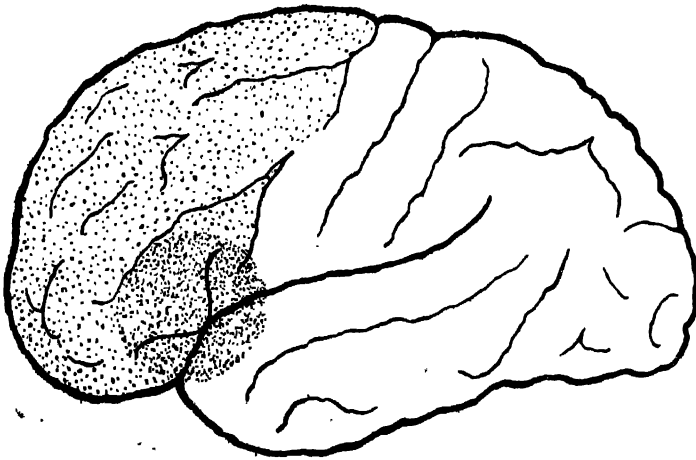
2নং চিত্র : মানুষের মস্তিষ্ক গোলক। বিন্দুকীর্ণ অংশটি ফ্রন্টাল লোব এবং ঘন সন্নিবিষ্ট অংশ "ব্রোকা" স্থান যেটি ডান হাতি লোকের বাম গোলার্ধে থাকে।

তবু এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তৎকালীন মনুষ্য সমাজের সঙ্গে অনেক শ্বাপদ সমাজব্যবস্থার মিলও দেখা যেত। উদাহরণ স্বরূপ হায়নাদের সমাজ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ্য। হায়নারা উচ্ছিষ্টভোজী (scavengers), তারা 10-100 জন মিলে এক একটি দলে বাস করে, প্রাণহানির আশঙ্কায় স্বেচ্ছায় দলছুট হয় না। এদের সমাজ পুরুষ প্রধান (patriarchial), স্ত্রী হায়নারা

ধারণ করতে হয়, তার ওপর জন্মলগ্নে পেশী এবং ধীশক্তি উভয়তই মনুষ্য শিশু সবচেয়ে অসহায় জীব। সুতরাং জন্মের পরেও বহুদিন ধরে তাকে সযত্নে লালন করা প্রয়োজন। মনুষ্য শিশুর অসহায়ত্বের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বানর শিশুর মস্তিষ্ক মাতৃগর্ভেই প্রায় পূর্ণতা লাভ করে এবং জন্মক্ষণে দেখা যায় তার মস্তিষ্ক পূর্ণায়তনের 70% এবং শিম্পাঞ্জী শাবকের

1 বছর বয়সেই মস্তিষ্ক পরিপূর্ণতা লাভ করে। পক্ষান্তরে জন্মলগ্নে মানব শিশুর মস্তিষ্ক পূর্ণায়তনের মাত্র 23%। তারপর ছয়বছর বয়স পর্যন্ত তার মস্তিষ্ক দ্রুতহারে বাড়লেও 23-24 বছর বয়সের আগে তা পূর্ণতা লাভ করে না।

সন্তান প্রপালিকা নারী ও শশিকলাবৎ বৃদ্ধিমান অসহায় শাবকদের আশ্রয়ের জন্য এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর শিকার অভিযান থেকে এক নির্দিষ্ট সুখ-নীড়ে ফেরার প্রয়োজনে সমাজের মধ্যে মানুষ দারা পুত্র কন্যা নিয়ে ছোট ছোট পরিবার সৃষ্টি করল যাকে বলা যায় ঘরের মধ্যে ঘর বা "sanctum sanctorium", এইভাবে সূত্রপাত হল গৃহব্যবস্থায়, তা সে হোমোইরেকটাসের গাছতলা, নিয়াণ্ডেরথাল মানুষের গুহা, ক্রোম্যাগননের ভূমিকন্দরস্থিত তাঁবু বা বর্তমান মানুষের apartment house, যেখানেই হোক না কেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শিকারী প্রাণীদের মধ্যে ঘর বাঁধার আগ্রহ কিছুটা পরিলক্ষিত হলেও বানর সমাজে এই প্রবণতা সচরাচর অনুপস্থিত।

মনুষ্যাদি শিকারী প্রাণীদের গৃহব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল পরিবারের পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা-বোধ। মানুষের ক্ষেত্রে এই বোধ এনে দিয়েছে দীর্ঘ-মেয়াদী নর-নারী বন্ধন যা আবার সন্তান পালনের পক্ষে অপরিহার্য। কেবল তাই নয়, আদিম সমাজে এই গৃহবোধ এত তীব্র ছিল যে অনেকে মনে করেন গৃহসুখের তাগিদেই আজ থেকে আনুমানিক 4 লক্ষ বছর আগে হোমোগণ আগুনের ব্যবহার শিখেছিল। বস্তুতঃ মানুষের চিকিৎসাশাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি অনেক প্রযুক্তি জ্ঞানই এই গৃহবোধের ফলশ্রুতি।

কেবল সমাজ জীবনেই নয়, ব্যক্তি প্রকৃতির বিবর্তনেও মানুষের শিকারী প্রাণীতে রূপান্তর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বনবাসী বানর অবস্থায় তাদের পক্ষে যে সব আচার আচরণ স্বাভাবিক ছিল, শিকারী প্রাণী হিসাবে অনেকগুলির আমূল সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। উদাহরণ স্বরূপ বানর ও যে কোন স্থলচর শিকারী শ্বাপদের আচার ব্যবহার তুলনীয়।

	বানর প্রকৃতি	শিকারী প্রাণীর প্রকৃতি
আহার ব্যবস্থা	1. নিরামিষ খাদ্য প্রধান	1. সম্পূর্ণ মাংসাশী
	2. খাদ্য প্রচুর, অনায়াস লভ্য	2. খাদ্য দুষ্প্রাপ্য, সংগ্রহ করা আয়াস সাধ্য।
	3. সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই।	3. শিকারপ্রাপ্তি অনিশ্চিৎ সুতরাং সঞ্চয় প্রয়োজন।
	4. প্রাচুর্যহেতু খাদ্য ভাগাভাগি অপ্রয়োজন।	4. প্রয়োজনে নিজপরিবারে, এমনকি স্বপ্রজাতির অপরের মধ্যে খাদ্য ভাগ করতে হয়।
	5. আহারের নির্দিষ্ট সময় নেই। সর্বদা মুখ চলে।	5. যখন শিকার পাওয়া যায় তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে নেয়। তারপর বেশ কিছুদিন উপবাসে ক্ষতি নেই।
	6. আহার সংগ্রহ ও গ্রহণ উভয়ই ক্ষুন্নিবৃত্তি মানসিকতা প্রসূত।	6. খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ ভিন্ন মানসিকতা। প্রথমটি ক্ষুধা নিরপেক্ষ, অনেকটা নেশার মত। খাদ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনে এ নেশা অপরিহার্য।

বাসস্থান	1. নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই।	1. নির্দিষ্ট বাসস্থান আছে।
	2. সাময়িক বাসস্থানের যত্ন নেয় না।	2. বাসস্থান যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।
মলমূত্র	1. যত্র তত্র মলমূত্র ত্যাগ করে।	1. বাসা থেকে দূরে মলমূত্র ত্যাগ করে। অনেক সময় মল মাটি চাপা দেয়।
যৌন জীবন	1. স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন নেই।	1. স্ত্রী-পুরুষ বন্ধন নিবিড় এবং কিছুটা দেহাতীত।
সমাজের প্রতি মনোভাব	1. শক্তি ও ব্যক্তিত্ব সাপেক্ষে মাতব্বরী স্পৃহা বিদ্যমান।	1. একনায়কতন্ত্র অচল। "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।"
	2. নিজেদের মধ্যে মারামারির প্রবণতা দেখা যায়।	2. স্বগোষ্ঠীতে শান্তি বজায় রাখতে চায় .

শিকারী প্রাণীতে বিবর্তিত হওয়ার ফলে আদিম মানুষ বাধ্য হল উল্লিখিত তালিকায় বানর প্রকৃতি-গুলির পরিবর্তে শিকারী প্রাণীর বেশ কিছু আচার আচরণ গ্রহণ করতে। কিন্তু জীব বিবর্তনের মাপ-কাঠিতে মহাকপি থেকে মানুষে রূপান্তর এত দ্রুত ঘটে গেল যে বানর বর্গের শিকারী দলছুটেরা ত্রিশঙ্কু অবস্থা প্রাপ্ত হল অর্থাৎ কয়েকটি ব্যাপারে শিকারী প্রাণী হয়েও তাদের মধ্যে বানর প্রকৃতির ছাপ থেকে গেল। যেমন খাদ্যের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ মাংসাশী নয়, বরঞ্চ মানুষকে উভভোজী বা omnivorous বলা যায় যদিও তাদের পরিপাক প্রণালী শিকারী প্রাণীর তুল্য। খাদ্য ভাগাভাগী বা সঞ্চয়ের ব্যাপারেও শিকারী প্রাণীর মত মানুষ অতটা উদার নয় যদিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের ব্যাপারে মানুষ শ্বাপদের চেয়েও বেশী নেশাগ্রস্ত। যৌন জীবনেও মনুষ্য সমাজে নরনারী বন্ধন বোধ হয় খুব নিবিড় নয়, তা যদি হত তাহলে রাম-রাবনের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র বা ট্রয়ের যুদ্ধের প্রয়োজন হত না। তাছাড়া মানুষের চেতন বা অবচেতন মনে মাতব্বরী স্পৃহা না থাকলে পৃথিবীর ইতিহাসটাই অন্যভাবে লেখা হত।

মানুষের এই দ্বৈত প্রকৃতি অস্বাভাবিক হলেও প্রাণীবিদের কাছে নতুন ঘটনা নয়। চিড়িয়াখানায় পাণ্ডা (Panda) নামে যে জন্তুটি দেখা যায় তাদের স্বগণীয় আর সব প্রজাতি আমিষভোজী হলেও পাণ্ডারা নিরামিষাশী। সুতরাং পণ্ডিতেরা মনে করেন মানুষ পাণ্ডাদের মতই অসম্পূর্ণভাবে বিবর্তিত প্রাণী। প্রকৃতির এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার জন্য খাদ্য ব্যবস্থা, যৌন জীবন, সমাজের প্রতি আচরণ ইত্যাদি ব্যাপারে সামাজিক ও ব্যক্তিগতভাবে মানুষ বহু সমস্যা জর্জরিত। কিন্তু মানুষ কেবল বুদ্ধিমান প্রাণী নয়, সে সংস্কৃতিবানও। তাই সভ্যতার উন্মেষ থেকেই তারা চেষ্টা করে চলেছে তাদের মধ্যেকার বানর প্রবৃত্তিগুলোকে সংস্কৃত করতে শিক্ষার দ্বারা, বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা, দর্শনের দ্বারা। সুতরাং এ কথা বললে হয়ত ভুল হবে না যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছে তার দ্বৈত প্রকৃতির প্রভাবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যিশু, বুদ্ধ, কনফুসিয়-এর উত্তর সুরীরা আজও পৃথিবীর ওপর মাতব্বরী করবার জন্য হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা ফেলে বা তাদের স্বপ্রজাতির কিছু প্রাণী যখন অনাহারে মরছে তখনও তাদের সঙ্গে নিজেদের খাদ্য ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না।

যাই হোক মনুষ্য প্রকৃতির উৎস সন্ধান অভিযানের শেষে আমরা দেখলাম কি করে আজ থেকে প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে শ্বাপদসঙ্কুল সাভানার নাট্যশালায় প্রাণীজগতের মহানায়ক প্রবেশ করেই ঘোষণা করল "অয়ম অহম্ ভোঃ" সেদিনের সেই অসহায়, অক্ষম, অপটু শিকারী আজ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে, একজনের হৃদপিণ্ড আর একজনের দেহে বেমালুম জুড়ে দিচ্ছে, গবেষণাগারে জীন (Gene) তৈরি করছে। তবু প্রাণীবিদের কাছে সে আজও অসম্পূর্ণ প্রাণী। সুতরাং মহাকালব্যাপী জীব বিবর্তনে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভরসা এই যে প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষই জানে উদ্বর্তনের মহামন্ত্র—চরৈবেতি।

রঞ্জক-শিল্পের বিকাশে বিজ্ঞানী বেয়ারের অবদান

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ*

প্রখ্যাত জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানী অ্যাডলফ ফন্ বেয়ার (Adolf von Baeyer) 1835 খ্রীস্টাব্দের 21 অক্টোবর বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে বুনসেন এবং পরে কেকুলের কাছে তিনি শিক্ষালাভ করেন। 1872 খ্রীস্টাব্দে তিনি স্ট্রাসবুর্গে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তারপর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যভার গ্রহণ করেন 1875 খ্রীস্টাব্দে।

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ নানারকম রং ব্যবহার করে আসছে। প্রাচীনতম বিবরণ যা পাওয়া যায়, তাতেও দেখা যায় যে, আদি-মানব নানারকম রং ব্যবহার করত প্রধানতঃ প্রেতাত্মার অশুভ প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রকৃতির বুকে যে রঙের বাহার, গাছপালায়, লতায়-পাতায়, ফুলেফলে, পাখির পালকে যে রঙের সমারোহ তাই দেখে দেখে মানুষ হয়তো নানাপ্রকার রঙের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। বেশভূষায় অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নানারকম রং ব্যবহার করে, আর, মাথার মুকুটে নানা রঙের পাখির পালক গুজে, বিচিত্র সাজে সাজবার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

প্রাচীনকালে মানুষ উদ্ভিদ থেকে দু-রকম রং তৈরি করতে শিখেছিল। ম্যাডার (Madder) বা মঞ্জিষ্ঠা একরকম লতাগাছ (Rubia tinctorum)। এর শিকড় থেকে পাওয়া যায় হলুদ রঙের অ্যালিজারিন (Alizarin)। রঙস্থাপক (Mordant) -এর সহায়তায় (যেমন—ফটকিরি), এদিয়ে কাপড়ে সুন্দর লাল রং করা হত। প্রথমদিকে ভারত, পারস্য এবং মিশরের রঞ্জন-শিল্পীরা এ জিনিস প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করত। পরে গ্রীক ও রোমানদের মধ্যেও এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডে বহুল পরিমাণে ম্যাডার বা মঞ্জিষ্ঠার চাষ হত।

প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকেই এশিয়রা নীলের কথা জানতো। আমাদের দেশে আগে প্রচুর পরিমাণে নীলগাছের (Indigofera tinctoria) চাষ করে তা থেকে নীল রং (Indigo) তৈরি করা হত এবং তাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল শোষণ ও অত্যাচারের এক বেদনাময় ইতিহাস।

1868 সালে জার্মান বিজ্ঞানীদ্বয় গ্রীব ও লিবারম্যান এবং তার পরের বছরেই ইংরেজ বিজ্ঞানী পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন প্রস্তুত করার শিল্প-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। প্রাকৃতিক মঞ্জিষ্ঠার চেয়ে এ হল বিশুদ্ধতর এবং বেশ সুলভ। এর অল্পকাল পরেই, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর আগে. (1878) সালে জার্মান বিজ্ঞানী বেয়ারের অক্লান্ত সাধনার ফলে নীলের অণুর গঠন-রহস্যের সমাধান হল। তারপর কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করাও সম্ভব হল। আর কৃত্রিম নীল সস্তায় বিক্রি আরম্ভ হতেই নীলগাছের চাষ বন্ধ করে দিতে হল। পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে ভারতের গরীব চাষী, নীলের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারল। এই সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের ফলে রসায়নের এক নতুন শাখা গড়ে উঠল। কালো কুৎসিত কয়লা থেকেই বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে সক্ষম হলেন নানা প্রকার উৎকৃষ্ট রং। কৃত্রিম রঞ্জক-শিল্প গড়ে ওঠার ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হলে এবং তাতে বেয়ারের অবদান কী তা বুঝতে হলে, সেই সময় রসায়নশাস্ত্রের অবস্থা কেমন ছিল, তাই বলে নেওয়া দরকার।

*77/1, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, ফ্ল্যাট নং 2, কলিকাতা-37

বলতে গেলে সত্যিকার রসায়ন-বিজ্ঞানের সূচনা হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে আজ-কালকার রসায়নশাস্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। এরপর থেকেই বিভিন্ন তথ্য আবিষ্কার হতে থাকল, আর বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাও সুশৃঙ্খলায়িত হতে লাগল। বিবিধ তত্ত্ব উদ্ভাবিত হল।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডাল্‌টন তাঁর পরমাণুবাদ প্রবর্তন করলেন। অ্যাভোগেড্রো অণুর ধারণা দিলেন, এবং অণু ও পরমাণুর পার্থক্য বুঝিয়ে দিলেন তারপর চললো বিবিধ যৌগিক পদার্থ প্রস্তুতি, তাদের শোধন, অণু-ভার নির্ধারণ, অণুর সংকেত প্রবর্তন প্রভৃতি। কেবল তাই নয়, নব রসায়ন-প্রণালীর, অর্থাৎ তড়িদ্‌বিশ্লেষণ-প্রণালীর, উদ্ভাবনের ফলে নব নব ধাতু আবিষ্কার সম্ভব হল। এই শতাব্দীতে কেবল খনিজ পদার্থের রসায়ন নয়, জৈব-পদার্থের রসায়নও ক্রমশঃ গড়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জৈব রসায়নের বিবিধ যৌগিক পদার্থ উদ্ভিদ বা প্রাণী থেকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। যেমন, 1825 সালে মাইকেল ফ্যারাডে সর্বপ্রথম কয়লা-গ্যাস থেকে আবিষ্কার করেন বেন্‌জিন। 1845 সালে হফ্‌ম্যান প্রমাণ করেন যে, আলকাতরার ভঞ্জক আসবন (বা, অন্তর্ধূম পাতন) প্রক্রিয়ায়ও পাওয়া যায় বেন্‌জিন। কেকুলে 1865 সালে বেন্‌জিন অণুর সংকেত নির্ধারণ করায় বিজ্ঞানীরা এক নতুন পথের সন্ধান পান। তাঁদের অক্লান্ত সাধনার ফলে পাওয়া গেল শত সহস্র অ্যারোমেটিক (বা গন্ধবহ) যৌগ, যাদের অণুর কাঠামোর থাকে এক বা একাধিক বেন্‌জিন-চক্র (benzene-ring)।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের কথা। জার্মান বিজ্ঞানী হফ্‌ম্যান তখন ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল কলেজ অব কেমিস্ট্রিতে অধ্যাপনা করেন। তরুণ বিজ্ঞানী উইলিয়াম হেন্‌রি পার্কিন। সে-যুগে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃতিজাত যৌগের গঠন-রহস্যের সমাধান, এবং কোন-না-কোন উপায়ে তার সংশ্লেষণ। হফ্‌ম্যান একদিনের এক বক্তৃতায় বললেন, অ্যারোমেটিক অ্যামিন থেকেই হয়তো কুইনিন তৈরি করা সম্ভব হবে। একথায় অনুপ্রাণিত হয়ে পার্কিন স্থির করলেন তাঁর পরবর্তী গবেষণার বিষয় হবে কুইনিনের সংশ্লেষণ। এই উদ্দেশ্যে, 1856 সালে, অ্যানিলিনকে ক্রোমিক অ্যাসিড দিয়ে জারিত (oxidise) করে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলেন একটি বেগ্‌নী রঙের পদার্থ। এটিই প্রথম কৃত্রিম রঞ্জক (Dye)। পার্কিনের বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। তাঁর মধ্যে এক অপূর্ব প্রতিভার সন্ধান পেয়ে হফ্‌ম্যান খুবই উৎসাহিত বোধ করলেন, এবং তাঁকে আরও গভীরভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার উপদেশ দিলেন। কিন্তু পার্কিন সে কথা শুনলেন না, এই নতুন রঞ্জকটির পণ্য-উৎপাদনের দিকেই অধিকতর মনযোগী হলেন। গ্রীন্‌ফোর্ড গ্রীন-এ ছোট্ট একটি কারখানা স্থাপন করে এই রঞ্জক-দ্রব্যের উৎপাদন শুরু করলেন, এবং এর নাম দিলেন মভ্‌ (Mauve)। দেশ-বিদেশের রঞ্জন-শিল্পীরা এই কৃত্রিম রঞ্জক-দ্রব্যটি সাদরে গ্রহণ করল, যদিও তখন তা ছিল প্রায় প্ল্যাটিনামের মতই মহার্ঘ।

এই আবিষ্কারে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে নতুন নতুন রঞ্জকের সন্ধানে গবেষণা শুরু হয়ে গেল। এর ফলে 1859 সালে লিয়ন্‌স-এর বিজ্ঞানী ভেরকুইন (Verqnin) মলিন অ্যানিলিনকে স্ট্যানিক ক্লোরাইড দিয়ে জারিত (Oxidise) করে পেলেন আর একটি লাল রঙের রঞ্জক। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ম্যাজেন্টা। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অপর একটি জারক ব্যবহার করেই পাওয়া গেল আর একটি নতুন ধরণের রঞ্জক, যা সর্বত্র সাদরে গৃহীত হল।

1865 খ্রীস্টাব্দে হফ্‌ম্যান ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মানীতে ফিরে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাংশ্লেষিক রসায়ন সম্পর্কিত গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুও ইংল্যাণ্ড থেকে জার্মেনীতে সরে গেল। গ্রন্থকার হালে

(Hale) তাঁর Chemistry Triumphant নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেছেন,—From this latter date (1865) to 1874 there was not even a professorship in Organic Chemistry in all England. No instance of such extreme stupidity on the part of two nations has ever been recorded in the history of the world as when France and England gave up the dye industry to Germany. By 1880 the dye industry, under German tutelage, was rapidly gaining recognition. The uninviting coal-tar distillates constituted the source of its various hydrocarbon starting points.

বলাবাহুল্য, রঞ্জক-শিল্পে জার্মেনীর একাধিপত্য আজও সমানভাবে বজায় রয়েছে। সে তুলনায় ভারত এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে তেমন উদ্যোগ-আয়োজন আজও কোথাও কিছু লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, ঐ সময় জার্মানীতে বেয়ারের ল্যাবরেটরীতে দুই তরুণ বিজ্ঞানী কাজ করতেন। একজন কার্ল গ্রীব (Carl Graebe), অন্যজন কার্ল লিবারম্যান (Carl Libermann)। এঁরা অ্যালিজারিন অণুর গঠন সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন, এবং 1869 সালেই তা সংশ্লেষণের উপায় উদ্ভাবন করেন। ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে একটি প্রাকৃতিক রঞ্জকের সংশ্লেষণের উপায় উদ্ভাবন করেন। ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়ে একটি প্রাকৃতিক রঞ্জকের সংশ্লেষণ এক অভূতপূর্ব সাফল্য হিসাবে সর্বত্র অভিনন্দিত হল।

এই পদ্ধতির পেটেন্ট নিয়ে, পণ্য-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে, তা জার্মেনীর বিখ্যাত বাদিসে আনিলিন-উণ্ড সোডা-ফাব্রিক (Badische Anilin-und Soda-Fabrik) নামক প্রতিষ্ঠানকে অর্পণ করা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পণ্য-উৎপাদনের পরিকল্পনা সফল হল না। কারণ, উৎপাদনের ব্যয় বেশি হওয়ায় তা লাভজনক হল না। তখন গ্রীব ও লিবারম্যান ওই প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী হাইনরিখ ক্যারো (Heinrich Caro) সহযোগিতায় পুনরায় গবেষণা শুরু করেন এবং ওই বছরই অ্যালিজারিন প্রস্তুতির একটি সহজ ও লাভজনক পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করেন। 1871 সালে কৃত্রিম অ্যালিজারিন বাজারে এলো, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তা প্রাকৃতিক অ্যালিজারিনকে বাজার থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হল।

এদিকে বেয়ার 1860 সাল থেকেই ইণ্ডিগো (বা নীল) সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন, এবং সুদীর্ঘ আঠারো বছরের চেষ্টায় এর গঠন সম্পর্কিত সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, 1878 সালেই এটি সংশ্লেষণের পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন।

বেয়ারের পদ্ধতিতে কৃত্রিম ইণ্ডিগো (বা, নীল) প্রস্তুত করা সম্ভব হল। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তা প্রাকৃতিক নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারল না। যাই হোক, 1890 সালেই বিজ্ঞানী হয়ম্যান (Heumann) নীল প্রস্তুতির আর একটি সহজ ও লাভজনক পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন কৃত্রিম নীল প্রাকৃতিক নীলের চেয়ে কম দামে বিক্রি করা সম্ভব হল। অল্পদিনের মধ্যেই কৃত্রিম নীল বাজার দখল করে ফেললো। এজন্য নীলগাছের চাষ একেবারে বন্ধ করে দিতে হল।

বেয়ারের নিরলস সাধনার ফলেই দুটি বিখ্যাত প্রাকৃতিক রঞ্জক, অ্যালিজারিন এবং ইণ্ডিগো (বা, নীল) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে রঞ্জক-শিল্প এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হল। বিজ্ঞানীদের কাছে এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত হল। আলকাতরাজাত বিভিন্ন রঞ্জক-দ্রব্যে বাজার ছেয়ে গেল। রসায়ন বিজ্ঞানীদের সম্মুখে, রসায়ন-বিজ্ঞানের একটি কঠিন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে, কঠিন শ্রম ও অধ্যবসায়ের যে মহান আদর্শ বেয়ার স্থাপন করলেন তার কোন তুলনা নেই।

জৈব রসায়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি 1881 সালে তাঁকে ডেভি পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আর 1905 খ্রীস্টাব্দে নোবেল কমিটি তাঁকে দিয়েছেন পরম শ্লাঘ্য রসায়নশাস্ত্রের নোবেল পুরস্কার।

এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয় 1917 সালের 20 আগস্ট।

চিল্কা—অমূল্য সম্পদ ও এদেশের গৌরব

পীযূষকান্তি ঘোষ*

[চিল্কা—বৃহত্তম নোনা জলের হ্রদ। এই অঞ্চলের 114টি গ্রামের 50,000-এর বেশী মানুষের রোজগারের পথ—চিল্কা। মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক এমনকি সমুদ্রঝাঁঝির বিপুল সমাহার এখানে। চিল্কার মৎস্যজীবী বা শিকারীরা নানা গোষ্ঠী বা শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা ব্যবহার করেন নানা ধরণের নৌকা ও খাদি, মেনজিয়া, পাতুয়া, নোলি, খেপলা ও টানা ইত্যাদি জাল।

চিল্কার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এর প্রাকৃতিক সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান ও এ অঞ্চলের লোকেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির কথা আমাদের ভেবে দেখা দরকার]
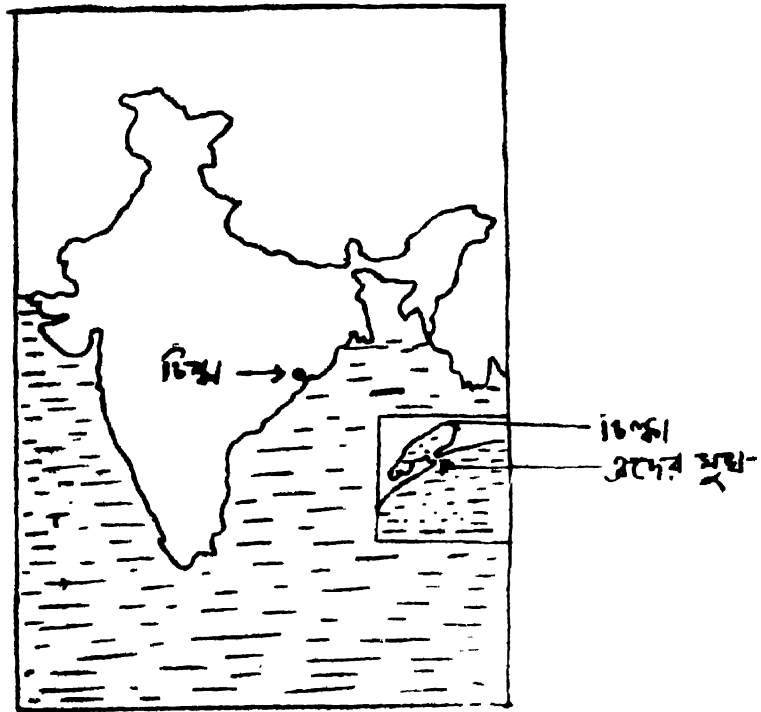
1নং চিত্র

চিত্রে চিল্কার অবস্থান ও হ্রদকে বড় আকারে সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত দেখা যাচ্ছে

* কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থা, কাকদ্বীপ

চিল্কা ভারতবর্ষের বৃহত্তম নোনা হ্রদ। যার ভূমিকা কেবল মাত্র উড়িষ্যাতেই সীমিত এমন নয় সারা দেশ জুড়ে এর অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বহুকাল থেকে বিশেষভাবে পরিচিত। চিল্কা কেবল মৎস্যজীবীদের অনুপ্রেরণা ও অন্ন জুগিয়ে এসেছে বা আজও আসছে—একথা যেমন সত্য তেমনি কবি, সাংবাদিক, দার্শনিক ও শিল্পীর চোখে এর দাম ও কদর যথেষ্ট। বহুকাল থেকে চিল্কার ভূমিকা—রূপ ও সৌন্দর্যে এঁদের কলমে ও তুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

বেড়ে দাঁড়ায় 1100 বর্গ কি.মি.। হ্রদের গড় গভীরতা 2 মি. বা কোথাও 3 মি.। ডিসেম্বর থেকে জুন অবধি হ্রদের জল নোনা থাকে। বর্ষাকালে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জল হ্রদে স্থান পাওয়ায় চিল্কা অন্য রূপ নেয় অর্থাৎ নোনা থেকে হয়ে দাঁড়ায় মিঠা জলের হ্রদ। একটি মাত্র ছোট প্রায় 200-300 মি. চওড়া এবং 35 কি.মি. লম্বা খালি দ্বারা চিল্কা বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে যুক্ত। মহানদীর শাখা দয়া নদী থেকে মিঠা জল চিল্কায় এসে পৌঁছায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে চিল্কার
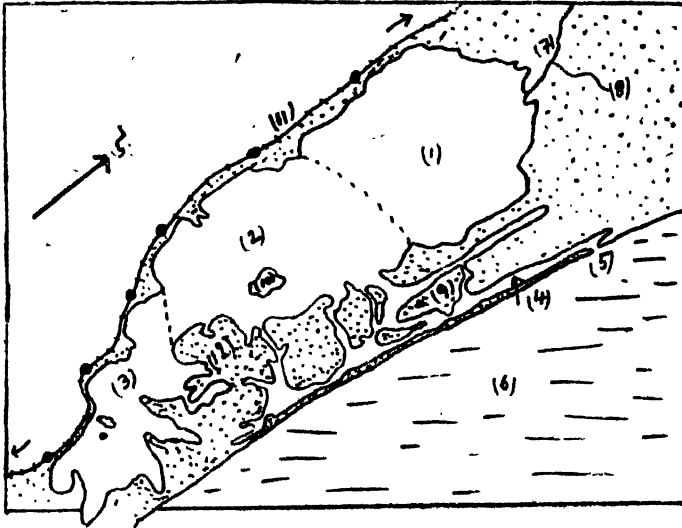
2নং চিত্র—চিল্কা হ্রদের ছবি (বড় আকারে)

(1)—উত্তর অঞ্চল, (2)—কেন্দ্র অঞ্চল, (3)—দক্ষিণ অঞ্চল, (4)—বাহির অঞ্চল, (5)—হ্রদের মুখ, (6)—বঙ্গোপসাগর, (7)—দয়া নদী, (8)—ভারগাভী নদী, (9)—সাতপারা, (10)—বালবাবা দ্বীপ, (11)—রেলপথ (হাওড়া থেকে মাদ্রাজ), (12)—পারিকুদ দ্বীপপুঞ্জ

ভৌগোলিক দিক থেকে চিল্কা ভারতের পূর্ব উড়িষ্যা রাজ্যের পুরী জেলার একেবারে দক্ষিণে—(বেশীর ভাগ) এবং বাকী অংশটুকু গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত। এই হ্রদ লম্বায়—65 কি.মি., চওড়া—16 কি.মি. এবং জলা এলাকা—900 বর্গ কি.মি.। জলাশয়ের আয়তন ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনীয়। বর্ষার জলে হ্রদের আয়তন

রূপ অপূর্ব। দক্ষিণে ও পশ্চিমে অনেকগুলি পাথুরে দ্বীপের সমন্বয়। উত্তরে গরিমাময় জলরাশি ও পূর্বে 'পারিকুদ' দ্বীপপুঞ্জ। উত্তর থেকে দক্ষিণে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে 'বালাবানা' নামে একটি দ্বীপ যেখানে কোন বসতি নেই কিন্তু আসল ডাঙা থেকে লোকেরা বুনো ঘাস ও গাছপালা সংগ্রহের উদ্দেশে এখানে যাওয়া-আসা করে। জেলের

চারপাশে নানা জাতীয় জলজ পাখী, অজস্র হাঁসের শীতকালীন সমাবেশ ও নানাপ্রকার হরিণের দল চোখে পড়ে।

কাজের সুবিধার জন্য চিল্কাকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে :—(1) উত্তর অঞ্চল—লেকের অন্য অঞ্চলের তুলনায় বেশী চওড়া—প্রায় 15 কি.মি.। দয়া ও ভারগাভী নদীর জলে বর্ষায় সবচেয়ে বেশী জল এসে জমা হয় এবং ফলে এই অঞ্চল তুলনামূলকভাবে দ্রুত পলি জমে মজে আছে।

(2) দক্ষিণ অঞ্চল—উত্তর ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চল কম প্রশস্ত। গরমের দিনে লেকে জলের পরিমাণ কমে দাঁড়ায় খুব জোর $2\frac{1}{2}$ মি.।

(3) কেন্দ্রীয় অঞ্চল—এ অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চলের তুলনায় গভীর—গড় গভীরতা $1\frac{1}{2}$ থেকে 2 মি.। কালিজাই পাহাড়ের কাছে গভীরতা সবচেয়ে বেশী। তলদেশ প্রায় সমান ও কাদা প্রকৃতির।

(4) বাহির অঞ্চল—সাতপাড়া গ্রামের কাছে মাগারমুখ থেকে এ অঞ্চলের শুরু ও সমুদ্রে মিশে শেষ। বাহিরের খাল আঁকা-বাঁকা পথে বিস্তৃত ও গভীর। খালের তলদেশে বালির ভাগ বেশী। মাগারমুখ সবচেয়ে অগভীর অঞ্চল যার গড় গভীরতা 20-25 সে.মি (মে এবং জুন মাসে)। [2নং চিত্র]

চিল্কার বুকে হরেক রকমের মাছ। চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক ও সমুদ্রঝাঁঝির বিপুল সমাহার। প্রকৃতির অফুরন্ত এই ভাণ্ডারে আছে নানা জাতের পারসে কলাগাছি ও আধ ভাজন, ইলিশ, চন্দনা, গুড়জাউলি, দাঁতনে, নিমচিংড়ি ও ভেটকী। এছাড়া আছে চিংড়ি—বাগদা, চাপড়া, হেঁদে-বাগদা, চাসনে ও হোন্নে ইত্যাদি, কাঁকড়া-রানী ও চিল্কা, ঝিনুক ও সমুদ্রঝাঁঝি। হ্রদে মাছ ও চিংড়ির প্রাচুর্য ও প্রাপ্তি নির্ভর করছে সমুদ্রের সঙ্গে এর সংযোগের ওপর। বেশীর ভাগ মাছ সামুদ্রিক। দয়া ও ভারগভী নদীর থেকে মিঠা জলের মাছ চিল্কায় প্রবেশ করে তবে এরা নোনা জল সহ্য না করতে পারলে মিঠা জলে ফিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

খরসুলা ও গাঁদী পারসে ছাড়া অন্যান্য সব মাছ চিল্কার জলে সারা বৎসর পাওয়া যায়। চিল্কা থেকে পাওয়া বা সংগৃহীত মাছের মোট উৎপাদনের 30% ভাজন ও পারসে জাতীয় মাছ। পারসে ও আধভাজন সবচেয়ে লাভজনক ও সুস্বাদু মাছ। চিল্কা হ্রদের মুখে আধ-ভাজন ও পারসের দল বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ডিম ছাড়ে। পুরুষ মাছ, প্রথম বছর ও স্ত্রীমাছ দ্বিতীয় বছর বয়সে ডিম উৎপাদনের উপযুক্ত হয়। জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসে বাচ্চারা দল বেঁধে লেকের মধ্যে প্রবেশ করে ও আদর্শ পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। অনেক সময় ওদের দল বেঁধে লেকের বাইরে ফিরে যেতে দেখা যায়।

নিমচিংড়ি বা চানোস খুব বেশী পরিমাণে না পাওয়া গেলেও এদের বাৎসরিক বৃদ্ধির হার আশাপ্রদ। চানোসের বাজার দর ভাল। দ্বিতীয় বছর বয়সে এই মাছ লম্বায় 400-450 মি.মি. এবং ওজনে 1·5-2·0 কে.জি. হয়ে থাকে। গুড়-জাউলি মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এরা যেমন সুস্বাদু তেমনি দামী। এদের বাৎসরিক গড় উৎপাদনের হার হলো 280 টন। ভেটকীর স্বাদের কোন তুলনা হয় না। কেননা এর স্বাদ আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। এদের প্রাচুর্য লেকের জলে যথেষ্ট। লম্বায় 1 মি. বা তার বেশী এবং ওজনে 8 কে.জি. পর্যন্ত পাওয়া যায়। ইলিশের দল ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে লেকের উত্তর-পূর্ব কোণে যেখানে দয়া নদী হ্রদের সঙ্গে মিশেছে। অগাষ্ট-জানুয়ারী এই সময়ে ইলিশকে জলে বেশী পাওয়া যায়। দাঁতনে মাছ সাধারণতঃ সমুদ্রে ডিম ছাড়ে এবং সম্ভবত নভেম্বর-জানুয়ারী মাসে হ্রদের মুখে এদের লক্ষ্য করা গেছে। হ্রদের মুখে ও বাহির অঞ্চলে এদের পরিপক্ক ও বড় আকারে পাওয়া যায়।

চিংড়ির মধ্যে চাপড়া সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায়, প্রায় 700 টন। এর পরে বাগদার স্থান প্রায় 300 টন। কোন কোন সময়ে বড় বাগদা 300 মি.মি. / 280 গ্রা. পর্যন্ত হয়। হ্রদের মোট উৎপাদনের 30% কেবল নানা ধরনের চিংড়ির ফলন। এছাড়া চাসবে ও হোয়ে ইত্যাদির অবদান উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন প্রকার মাছ, চিংড়ি ও কাঁকড়া ইত্যাদিকে ধরার জন্যে নানা প্রকারের কৌশল, হরেক রকমের জাল, ফাঁদ ও অন্যান্য উপায়ে প্রয়োগ করা হয়।

কয়েক প্রকার কৌশলের বিবরণ নীচে দেওয়া হল। এ সকল পদ্ধতি বেশ পুরান, চমকপ্রদ ও সম্পূর্ণ দেশী প্রথা।

জানো (Jano fisheries)—অল্প জলে প্রচুর মাছকে একসঙ্গে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ বা বেখারীর বেড়া দিয়ে সম্পূর্ণরূপে চারদিকে ঘিরে ফেলা হয়। পরে ঐ জল ধীরে ধীরে কমতে থাকে। সাধারণত হ্রদের দক্ষিণ দিকে এ ধরনের মাছ ধরার কৌশল পরিলক্ষিত হয়। কয়েক শত মিটার জুড়ে সাধারণত শীতের দিনে জানুয়ারী নাগাদ এ ধরনের মাছই চোখে পড়ে। এখান থেকে জমা হওয়া মাছ ও চিংড়ি ধীরে বা অল্প অল্প করে ধরা হয় বা 1-3 মাস পর একবারেও এদেরকে ধরা-মারার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। হ্রদের মোট উৎপাদনের প্রায় 25% মাছ এই কৌশলের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। এই পদ্ধতিতে ভেটকী, ট্যাংরা, গুড়জাউলী প্রভৃতি মাছ ছাড়া চিংড়িও প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়ে।

চিল্কার জলে সাধারণত তিন প্রকারের চিংড়ি পাওয়া যায়। যেমন—(1) প্যালিমোনিড (Palaemonids), (2) পিনিড্‌ (Penaeids) এবং (3) মেটাপিনিড্‌ (Metapenaeids)। প্রতি বছর মার্চ থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত চিংড়ি ধরা হয়। চিংড়ি ধরার জন্য দু-প্রকারের বাঁশের তৈরী ফাঁদ ব্যবহৃত হয়। বড় আকারের ফাঁদের স্থানীয় নাম—'ধাউদি' (Dhaudi)। সাধারণত 'কানদারা' শ্রেণীর জেলেরা এই ফাঁদ ব্যবহার করেন। অপরদিকে ছোট ফাঁদ 'বাজা' (Baja) নামে পরিচিত এবং 'তিয়ারা' নামে অপর শ্রেণীর মৎস্যজীবীরা এই ফাঁদ ব্যবহার করেন। এছাড়া 'খাতিস' (Khatis) নামে এক ধরনের বাঁশের তৈরী ফাঁদ চিংড়ি ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি চৌক বাক্স বা প্রতিদিন সূর্যাস্তের পর হ্রদের তলদেশে মাটিতে বসানো হয় এবং পরের দিন ভোরবেলা তুলে সেখান থেকে চিংড়ি সংগ্রহ করা হয়। কখনও কখনও চিংড়ি খুব বেশী পরিমাণে ধরা পড়লে রাত্রে দু-একবার ঐ বাক্সগুলিকে খালি করে চিংড়ি সংগ্রহের পর আবার পূর্বেকার জায়গায় পেতে দেওয়া হয়। হ্রদের চিংড়ির মোট উৎপাদনের প্রায় 95% এই ধরনের ফাঁদের সাহায্যে ধরা হয়। বাকী 5% জানো ও খাদি জালের সাহায্যে ধরা হয়।

উপরে আলোচিত মাছ ও চিংড়ি ধরার কৌশল ছাড়া আরও এক ধরনের পদ্ধতিতে চিল্কাবাসী মৎস্যজীবীরা মাছ শিকার করেন। একে বলা হয়—'বাহান' (Bahan fisheries)। এই পদ্ধতিতে একসঙ্গে 4-12টি নৌকা, অবশ্য নৌকার সংখ্যা নির্ভর করে এদের প্রত্যেকের মাপের ওপর, ও জাল একত্রে বেশ কয়েকজন জেলের দ্বারা পরিচালিত হয়। 'কেউতা' ও 'খাটিয়া' শ্রেণীভুক্ত লোকেরা এ ধরনের মাছ শিকারে অংশ নেন।

হ্রদের জলে মাছ ধরার নিমিত্ত নানা প্রকারের জাল ব্যবহার হয়। যেমন—খাদি, মেনজিয়া, শাতুয়া, বোরাগা, ভিদা, নোলি, খেপলা ও টানা ইত্যাদি। এছাড়া হুক ও ছিপের সাহায্যেও মাছ ধরা হয়।

জানো, ধাউদি ও বাহান ফিসারিস ছাড়া আরও দু প্রকারের মাছ ধরার কৌশল চোখে

পড়ে। এদেরকে বলা হয় 'দিয়ান' (Dian) এবং 'উঠাপানি' (Uthapani)।

চিল্কা হ্রদ থেকে রানী ও চিল্কা কাঁকড়া নামে দু'রকমের কাঁকড়া রাত্রিবেলা খাবার সমেত ফাঁদ ও ফাঁস জাল পেতে ধরা হয়। সারারাত্রি ঐ ফাঁদ পাতা থাকে। পরের দিন ভোরে কাঁকড়া সংগ্রহ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চিল্কা হ্রদের মাছ কলকাতার বাজারে আসতে শুরু করেছিল। তারপর থেকে এই অঞ্চলে মৎস্যশিল্প ও ব্যবসায় ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে থাকে। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে বরফ-কল তৈরি হওয়াতে মাছ রপ্তানীর ব্যবসায় দ্রুত ও ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। মৎস্য ব্যবসায় সম্প্রসারিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত সরাসরি মৎস্যজীবীরা লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত, ফলে লাভের অর্থ তাদের হাতে পৌঁছতে পারে নি। মুনাফার বেশীর ভাগ পেতেন মধ্যব্যক্তি অর্থাৎ যারা নৌকা ও লোকবলে নানা জায়গা ঘুরে মাছ সংগ্রহ করে রপ্তানীকারকদের হাতে তুলে দিতেন। সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন রপ্তানীকারকেরা। চিল্কা থেকে সংগৃহীত মাছের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানীর বাজার হল— কলকাতা, খড়্গপুর, রাউরকেল্লা ও টাটানগর ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় রেলের বাতানুকূলসম্পন্ন ধীরগামী রেলগাড়ি চিল্কা থেকে অন্যত্র পাড়ি দেয়।

রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের প্রচেষ্টায় চিল্কা মৎস্যজীবীদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে 1959 সালে নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়। পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবর্তী দালালদের সংখ্যা হ্রাস করা এবং একই সঙ্গে গরীব মৎস্যজীবীদের রক্ষা করা। এদের দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য Central Fishermen Co-operative Marketing Society, Ltd. (C.F.C.M.S.)-এর গোড়াপত্তন হয়েছিল। চিল্কার চারপাশে 114টি গ্রামের 50,000-এর বেশী লোকের দেখাশুনার ভার ন্যস্ত হয়েছিল C.F.C.M.S.-এর ওপর। কেবল জলা জায়গা লীজ দেওয়া নয়, টাকা ধার দেওয়া, সস্তাদরে, বাঁশ, দড়ি, জাল ও অন্যান্য মাছ ধরার উপকরণ মৎস্যজীবীদের হাতে তুলে দেওয়াও এঁর কাজ।

চিল্কা হ্রদের মাছচাষীরা / শিকারীরা যেমন—কেউতা, নিয়ারী, গোখা, কান্দারা, তিয়ার ও নোলিয়া ইত্যাদি নামে বা শ্রেণী হিসাবে পরিচিত। এদের মধ্যে কেউতা সম্প্রদায় উচ্চমানের।

যেহেতু চিল্কা থেকে পাওয়া চিংড়ির বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ মোট মাছ উৎপাদনের 30%, এই পরিমাণ চিংড়ির ফলন আমাদের দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এক বিশিষ্ট ও অন্যতম পথ। সুতরাং কেবলমাত্র চিংড়ি নয়, অন্যান্য মাছ, কাঁকড়া ও ঝিনুক ইত্যাদি জলজ-সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ রেখে আমাদের উচিত এই সব পণ্যের উৎপাদন আরো বাড়ানো। কেননা চিল্কার সম্পদ ও ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নানা জাতের চিংড়ি ও মাছ ইত্যাদির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নোনাজলে চিংড়ি ও মাছের খামার, এই অঞ্চলে পড়ে থাকা উপকূলবর্তী এলাকায় গড়ে তোলা দরকার। লক্ষ্য রাখা দরকার যে প্রয়োজনের তাগিদে দায়হীন ভাবে যে কোন সময়ে যে কোন মাপের মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়া ও অন্যান্য গাছপালা, পশুপাখী ইত্যাদিকে যেন হত্যা বা ধ্বংস করা না হয়। এদেরকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ এবং সেই সঙ্গে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে। প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে সরকারী আইনের আশ্রয় নিয়ে একে কার্যকরী করে তোলা দরকার।

অন্যদিকে সংগৃহীত চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছ ও ঝিনুকের মাংস ইত্যাদি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকরণের মধ্যে দিয়ে দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য

স্থানে পাঠানো বা চালানের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সহ বাতানুকূল ব্যবস্থা উৎপাদন কেন্দ্রে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চিল্কাকে পলি পড়ে বুজে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন। মজে যাওয়া চিল্কার বুক, মুখ ও খালস্খালার আমূল সংস্করণে অতি সহজ উপায়ে চিংড়ি, কাঁকড়া হ্রদে এসে ভিড় বাড়াতে সুযোগ পাবে। চিল্কার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কেননা এই হ্রদ শিল্প সভ্যতার বলি হিসাবে এখনও পরিবেশ বা জল দূষিতকরণের আওতায় এসে পড়ে নি।

চিল্কার প্রাকৃতিক সম্পদ—তার ব্যবহার, অপব্যবহাররোধ ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক অবস্থান, স্থানীয় মৎস্যজীবীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে গবেষণা ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে, চিল্কা—এদেশের অমূল্য সম্পদ ও গৌরব। একে অক্ষুণ্ণ রাখা আমাদের জাতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব।

যাকে রাখো সেই রাখে

অঞ্জলি সেন*

আখের রস খেতে আমরা সকলেই ভালবাসি। কিন্তু কোনদিন ভেবেও দেখি না যে ছিব্‌ড়ে হিসাবে কতটা অমূল্য সম্পদই না আমরা হেলায় হারাচ্ছি। বিশ্বাস করতে মন চায় না, কিন্তু চল্লিশ বছর আগেই আমেরিকার বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, প্রতি বছর এইভাবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি মেট্রিক টন তথাকথিত 'আপাত মূল্যহীন' জিনিস আমরা অবহেলায় অপচয় করি, যেগুলি থেকে বহু অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব। যার ফলে, আজ আমাদের চারপাশে হয়ত এমন পঞ্চাশটি কি তারও বেশী জিনিস দেখতে পাওয়া যাবে, যেগুলির মূল উপাদান পঞ্চাশ বছর আগে আমরা এমনিভাবেই অপচয় করতাম।

প্রথমেই ধরা যাক, আখের ছিব্‌ড়েগুলির কথা। পশুর খাদ্য হিসাবে কিছুটা কাজে লাগলেও এর বেশীর ভাগ অংশটাই আগে অপচিত হত। আমাদের দেশে অবশ্য এখনও হয়ে থাকে! ওদেশে আজ এই ছিবড়েগুলি থেকেই এমন সব 'অবদ্রব সহায়ক' উদ্ধার করা গেছে যেগুলি আধুনিক ডিটারজেন্ট, শাম্পু প্রভৃতি অনেক রকমের প্রসাধন সামগ্রী তৈরির কাজেই অপরিহার্য। রোজ সকালে যে টুথপেস্টটা দিয়ে আমরা দাঁত মাজি, সেটাকে তরলীভূত রাখার জন্য 'সরবিটল' নামক যে রাসায়নিকটির প্রয়োজন, সেটিও এই আখের ছিবড়ে থেকেই পাওয়া যায়।

আমাদের রক্তেও এমনই এক জাতের 'অবদ্রব সহায়ক' আছে, যেগুলি চর্বিপ্রধান খাদ্যগুলিকে হজম করতে সাহায্য করে আর সেই জন্যেই অপুষ্ট শিশু আর অথর্ব বৃদ্ধদের দেহে এর অভাব ঘটলে, চর্বিগুলি অপাচ্য ক্যালসিয়ামে পরিণত হয়, যার ফলে হাড়গুলি সুগঠিত হতে পারে না। দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। অনুসন্ধানরত বিজ্ঞানীদের ধারণা, আখের ছিব্‌ড়ে উদ্ভূত অবদ্রব সহায়কটির দ্বারা এ রোগের প্রতিবিধান সম্ভব।

শুধু তাই নয়, আখের ছিব্‌ড়ে দিয়ে আজ এমন এক জাতের তক্তা বানানো সম্ভব হয়েছে, যা দিয়ে শীত এবং তাপ দুই-ই প্রতিহত করা যায়। আমেরিকায় আজ প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি বর্গফুটএ জাতীয় তক্তা প্রস্তুত হচ্ছে। 'থার্মো-প্লাস্টিক'ও তৈরি হচ্ছে এই আখের ছিব্‌ড়ে থেকেই, যা দিয়ে কাপ, গেলাস, গ্রামোফোন রেকর্ড এবং আরও অনেক অমূল্য জিনিসই তৈরি করা হয়। আখের ছিব্‌ড়ে উদ্ভূত রাসায়নিক সম্ভারে এমন সব নূতন রঞ্জকের উদ্ভব হচ্ছে যেগুলি শুধু যে দ্রুত শুকিয়ে যায় তাই নয়, সেইসঙ্গে দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে থাকে।

শুধু যে আখের ছিব্‌ড়েগুলিই আমরা নষ্ট করছি তা নয়! কমলা, মুসাম্বী, আনারসের খোসা-ছিবড়েগুলিও একইভাবে কম অপচয় করি না। বর্তমানে কিছুটা কমলেও, এ অপচয় এখনও সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব হয় নি। অ্যাসিড, খাদ্যপ্রাণ, চিনি, পেকটিন, মোম, তেল অনেক কিছুই এদের থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে। পেকটিনের প্রধান কাজ জীবাণুধ্বংস করা, গ্যাংগ্রীন ক্ষত নিরাময়ে এর ব্যবহার অপরিহার্য। এছাড়া রক্তরসের পরিবর্তেও এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নেবু, আনারস আর কমলালেবুর তেল আজকাল তিনশোরও বেশী জিনিসপত্রে ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানীদের কাছে খোঁজ নিলে জানতে পারা যাবে। বর্তমানে এমন সাড়ে বারশো জিনিস এই সব অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যাদি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে।

---

*সেন্ট্রাল ফুড ল্যাবরেটরী, 3, কীড স্ট্রীট, কলিকাতা-16

আড়াইশো কিলো ভুট্টা থেকে প্রায় সাত কিলো মত শিষ পাওয়া যায়। আগে এর সবটাই নষ্ট হত। এখন এটাকে প্রধানতঃ ফারফুরাল উৎপন্নের কাজে ব্যবহৃত করা হয়। এই ফারফুরাল-ই আবার নাইলনের মোজা থেকে রকেটের জ্বালানী পর্যন্ত প্রায় দুশো রকমের বিভিন্ন বস্তুর মূল উপাদান। লুব্রিকেটিং তেলের চটচটানি দূর করতেও এর ব্যবহার অপরিহার্য। অপরদিকে ভুট্টার ডাঁটা আর জই-এর খোসা থেকে প্রচুর পরিমানে সেলুলোজ পাওয়া যায়, যা দিয়ে তৈরি করা হয় ফাইবার বোর্ড আর রকমারী কাগজ।

সত্যিকথা বলতে কি, কৃষিসম্পদের যেটুকু বাজারে বিক্রী হয়, তার চেয়ে অবিক্রীত এই তথাকথিত 'জঞ্জালের' পরিমাণ অনেকাংশেই অধিক। বোঁটা, ডাঁটা, খোসা, ছিল্‌কা, বিচী, শিষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বস্তু ছাড়াও, পালক ইত্যাদি অখাদ্য প্রাণীজ অবশেষও এর অন্তর্ভুক্ত।

গমের খড়, যেগুলি আগে জঞ্জালে পরিণত হত, এখন তা থেকে কাগজ, কার্ড বোর্ড, ডিমের বাক্স, ওষুধের খোপ অনেক কিছুই তৈরি হয়। চীনা-বাদামের খোসা, ভুট্টার ডাঁটা আর আখের ছিবড়ে থেকে প্যাঁচ ঘোরানো ঢিবে ঢাকার ভেতরকার আস্তরণটাত অনেকদিনই তৈরি হত, বর্তমানে রেফ্রিজারেটারের অন্তরক হিসাবেও ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করছে। আখের মাথার খড়গুলি থেকে তৈরি হচ্ছে শিল্পজাত কোহল।

গাছ কেটে কাঠগুলি আমরা চিরদিনই কাজে লাগিয়ে এসেছি। কিন্তু তার মোটা, খসখসে ছালটা, কাঠের গুঁড়ো কিম্বা ছোট ছোট টুকরো, যেগুলি দিয়ে আর তক্তা করা যায় না, তেমন অনেক জিনিষই এতদিন কেবল জ্বালানি হিসাবেই নষ্ট করতাম, আজ দেখা যাচ্ছে কোন কোন গাছের ছাল থেকে কিছু বিশেষ ধরণের রাসায়নিক তৈরি করা সম্ভব, কাঠের গুঁড়ো থেকে বিশেষ ধরণের তেল, তাছাড়া কৃত্রিম কাঠ তৈরি করতে, কাঠের গুঁড়ো তো এক কথায় অপরিহার্য। ট্যানিন আর মোমও এদের থেকে পাওয়া যায়।

কাঁচা পেপে, কাঁচা ডুমুর কি আনারস থেকে উৎসেচকের আবিষ্কার অনেক দিনই হয়েছে। এগুলি শুধু যে মাংস নরম করতে কি ঔষধপত্রেই ব্যবহৃত হয়, তাই নয়, চামড়া ট্যানিং-এর কাজেও অতীব প্রয়োজনীয়। গম জাতীয় শস্য 'বাকহুইট'-এর পাতা থেকে 'রুটিন' নামক এক নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তচাপ রোগীদের যা অপরিহার্য।

প্রাণীজ 'জঞ্জাল' থেকেও বহু অমূল্য সম্পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছে। পালক থেকে শিল্পজাত প্রোটিন, পশুচর্বি থেকে লুব্রিক্যান্ট, আরও কত কি। বর্তমানে পৃথিবীর প্রোটিন ঘাটতি দূর করার পথেও এ এক বিরাট পদক্ষেপ। হাঙর জাতীয় বহু জলজ প্রাণীই কোনদিন আমাদের খাদ্যতালিকাভুক্ত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাদের থেকে এমন এক স্বাদগন্ধহীন গুঁড়ো তৈরি করা সম্ভব যেটা স্যুপ, টুকি বেকিং পাউডারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে সকলেই বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করবে। হিসাব করে দেখা গেছে মাত্র সাঁইত্রিশ পয়সার বিনিময়েই যে কোন ব্যক্তির সারাদিনের উপযুক্ত প্রোটিন এর থেকে পাওয়া যেতে পারে এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীর অপুষ্ট জনগণের প্রোটিনের অভাবও দূর করা সম্ভব।

ব্যারাজের অভিশাপ ও মুক্তি

শিবরাম বেরা*

সূচনা—দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রভাবে আমাদের দেশে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে বিপুল পরিমাণ বৃষ্টি ঝরে পড়ে পাহাড়ে-পর্বতে মালভূমিতে, তারই কিছু অংশ নদীর উচ্চ উপত্যকায় আড়াআড়ি বাঁধ বা ড্যাম (Dam) নির্মাণ করে ধরে রাখা হয় জলাধারে (Reservoir)। তারপর যখন গ্রীষ্ম আসে, মানুষ, গাছপালা ও সমগ্র প্রকৃতি সূর্যকিরণের দাবদাহে মেঘশূন্য আকাশের দিকে এক ফোঁটা বারি-বিন্দুর জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় "স্ফটিক জল" বলে হাহাকার করতে থাকে, তখনই সেই জলাধারে সঞ্চিত জল তাদের কাছে অমৃতের ধারার মত পৌঁছে দেওয়া হয় নদীপথ বেয়ে। কিন্তু সেই জল যাতে নদীপথ ধরে সাগরে চলে যেতে না পারে, তারই জন্য নদীর বুকে গড়ে তোলা হয় অন্য একটু নীচু বাঁধ, যাকে বলা হয় (Barrage)। এই ব্যারাজের সাহায্যে জল পৌঁছে যায় শহরে-বন্দরে, কলে-কারখানায় কিংবা সেচখাল দিয়ে খেতে-খামারে। আবার যখন বর্ষা আসে, পাহাড় থেকে বন্যা নামে, তখন ঐ ব্যারাজের স্লুইস-গেট (Sluice-gate) খুলে জলরাশিকে ছেড়ে দেওয়া হয় সাগরের পানে, এভাবে জলসম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জলাধার ও ব্যারাজ আমাদের পরম বন্ধুরূপে কাজ করে।

তথাপি প্রকৃতির উপর মানুষের ঐ হস্তক্ষেপের ফলে কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়—যার ফলে কখনও কখনও বিরাট বিপর্যয় ঘটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গেও এরূপ অভিশাপ নেমে এসেছিল 1978 সালের সেপ্টেম্বর মাসের বন্যার সময়। ময়ূরাক্ষীর তিলপাড়া ব্যারাজের উজানে বাম তীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল 10 মাইল দীর্ঘ দ্বিতীয় ময়ূরাক্ষী নদী তার পথের উপর সবকিছু নিশ্চিহ্ন করে। এছাড়া দুর্গাপুর ব্যারাজের জন্য 80টি কয়লাখনি ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। [জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও অক্টোবর 1979 সংখ্যায় লেখকের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।] ব্যারাজের যে ত্রুটির জন্য সাধারণত ঐ বিপদ ঘটে থাকে তা হল—(1) ব্যারাজের সকল স্লুইস-গেট সম্পূর্ণ খুলে দিলে যে হারে জল বেরিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে অধিক হারে বন্যার জল নেমে আসা, অর্থাৎ ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল নির্গমন ক্ষমতার অতিরিক্ত জলপ্রবাহ এবং (2) ব্যারাজের কংক্রীট ভিতের জন্য উজানে নদীবক্ষে আটকে যাওয়া বিপুল পরিমাণ পলি অর্থাৎ ব্যারাজ পণ্ডে (Barrage-Pond) জমা বিশাল চর। ঐ ত্রুটি মুক্ত করতে ব্যারাজের গঠন কৌশলের যে পরিবর্তন আবশ্যক, তা আলোচনার পূর্বে নদীখাতের একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

নদীখাতের বৈশিষ্ট্য—পাহাড়-পর্বত থেকে বর্ষার বিপুল জলরাশি নেমে এসে নদীখাত বেয়ে এগিয়ে চলে সাগরের পানে। এই খাত নদীর চলার পথের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ নেয়। উচ্চ প্রবাহে নদী গভীর কিন্তু স্বল্পবিস্তৃত খাতে তীব্র গতিতে ছুটে চলে আবার নিম্নপ্রবাহে যে স্বল্প গভীর কিন্তু বিস্তৃত খাতে মন্দ গতিতে বয়ে চলে। নদীর অববাহিকায় সামগ্রিক বৃষ্টিপাত, প্রবল বন্যা, ভূমির ঢাল, শিলার গঠন, নদীপথের সরলতা বা বক্রতা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে নদীখাতের প্রকৃতি। এই নদীখাতের তলদেশ বা নদীগর্ভ (River-bed) কখনই সমতল হয় না। সাধারণত এর মধ্যাঞ্চল

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700006.

দু'তীরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু হলেও কোথাও হয়তো ডানদিকে গভীর খাত ও বামদিকে চর, আবার কোথাও বামদিকে গভীর খাত ও ডানদিকে চর গড়ে উঠতে পারে। (বিশেষত বাঁকের কাছে)। এছাড়া কোথাও হয়তো মাঝে চর সৃষ্টি করে দু'তীরে গভীর খাতে নদী বইতে দেখা যায়। (অতি বিস্তারের জন্য)। যুগে যুগে পলি জমে নদীর দু' তীরভূমির সাথে নদীগর্ভও উঁচু হয়ে উঠতে থাকে। দু'তীরে সমান্তরাল বাঁধ (Embankment) থাকলে নদীগর্ভ দ্রুততর হারে উঁচু হয়ে ওঠে। নদীগর্ভ উঁচু হয়ে ওঠা ছাড়াও বাঁকের কাছে নদীখাত ধীরে ধীরে উত্তল অংশের দিকে সরে যায়। কিন্তু কোন একটি বিশেষ স্থানে নদীগর্ভের Profile [নদীকে আড়াআড়ি ভাবে উলম্ব তল (Vertical Plane) দ্বারা বিভক্ত করলে নদীগর্ভ যে বক্ররেখা উৎপন্ন করে, তাকে নদীগর্ভের Profile বলে।] বহু যুগ ধরে একই রকম (Similar) থাকে। অর্থাৎ যেখানে নদী ডানদিকে গভীর, সেখানে নদীগর্ভ উঁচু হলে ডানদিকটা গভীর থাকে; আবার কোথাও নদীখাত বামদিকে গভীর হলে বহু বৎসর নদী বামদিকে গভীর খাতে বয়ে চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা যখন নদীর মধ্য প্রবাহে কোন ব্যারাজ নির্মাণ করি, তখন সেখানকার নদীগর্ভের বৈশিষ্ট্যের কথা একটিবারও চিন্তা করি না।

বর্তমান ব্যারাজের গঠন—নদীর মধ্যপ্রবাহে যেখানে ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়, সেখানে প্রথমে গড়ে তোলা হয় অসংখ্য ঢালাই খুঁটি, (Pile) যেগুলি নদীগর্ভে 25-30 ফুট পর্যন্ত প্রোথিত থাকে। তারপর ঐ পাইলগুলির উপর রাখা হয় ঘরের ছাদের মত 5-7 ফুট পুরু ও কয়েক-শ' ফুট বিস্তৃত একটি কংক্রীট ভিত (Concrete foundation)। ঐ কংক্রীট ভিতের উপর 30 ফুট থেকে 60 ফুট অন্তর অন্তর অনেকগুলি থাম (Pier) গড়ে তোলা হয় এবং থামগুলির উপর দিয়ে সড়ক বা রেলপথের সেতু থাকে। দুটি থামের মধ্যবর্তী অংশে যে জল নির্গমনের দ্বার বা স্লুইস (Sluice) গড়ে ওঠে তাদের প্রত্যেকটিতে খাড়া ভাবে ওঠা-নামা করতে পারে এরূপ কপাট বা (Sluice-gate) রাখা হয়। স্লুইস গেট খুলে বা বন্ধ করে যে কোন নালা (channel) দিয়ে প্রয়োজন-মত জল বের করা যেতে পারে।

যদিও পৃথিবীর কোন নদীগর্ভই সমতল নয়, তবুও স্লুইস গেটগুলির নীচে ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি নদীগর্ভে একই অনুভূমিক তলে (Hori zontal Plane) রাখা হয়। আবার ঐ অনুভূমিক তলটি নদীগর্ভের উচ্চতম অংশের থেকে 5-7 ফুট উঁচুতে রাখা হয় যাতে স্লুইস-গেটগুলির নীচে পলি জমে আটকে না যায়। ফলে ঐ কংক্রীট ভিতটি নদীখাতের গভীরতর অংশ থেকে 10-15 ফুট উঁচু হয়ে পড়ে। এতে নদীর নিম্নাংশে জলপ্রবাহ ব্যাহত হওয়ায় একদিকে ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল নির্গমন ক্ষমতা কম হয়, অন্যদিকে ব্যারাজের উজানে নদীবক্ষে বা ব্যারাজ পণ্ডে (Barrage Pond) পলি জমে বিশাল চর সৃষ্টি হয়, চর নদী তার স্রোতের দ্বারা কেটে নিতে পারে না। শুধু তাই নয়, নদী তার গর্ভের Profile-টা নতুন করে গড়ে নিতে চায় বলে নদীর গভীর অংশটা যখন কংক্রীট ভিতের সমান উঁচু হয়ে ওঠে, তখন যেখানে নদীবক্ষে আগে চর ছিল, সেখানকার স্লুইস-গেটগুলির নিম্নাংশও জরাট হয়ে যায়। এর ফলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা ফরাক্কা ব্যারাজের ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে দুটি নিবন্ধে। (দ্রষ্টব্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর 1979 এবং বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন 1980)।

মুক্তির উপায়—এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে যেখানে ব্যারাজ গড়া হবে, সেখানকার নদীগর্ভের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে কংক্রীট ভিতটি নদীখাতের উপর ন্যূনতম বাধার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যারাজ গড়ার সময় নদীকে 30 ফুট থেকে 60 ফুট বিস্তৃত যে নালায় (channel)

বিভক্ত করা হয় থামগুলির সাহায্যে, সেই খালায় প্রত্যেকটির কংক্রীট ভিতের নিম্নাংশ একই অনুভূমিক তলে না রেখে নদীগর্ভের Profile অনুযায়ী উঁচুতে বা নীচুতে রাখতে হবে, যাতে কংক্রীট ভিতটি নদীগর্ভের কোন অংশ থেকে 4-5 ফুটের অধিক উঁচুতে না থাকে। অর্থাৎ তবে যারা বর্ষাকাল যখন সেচের জলের প্রয়োজন থাকবে না, তখন অবশ্যই ব্যারাজের সকল গেট খুলে রাখতে হবে, যাতে ব্যারাজ-পণ্ডসহ নদীখাতের বিভিন্ন অংশে অন্য ঋতুতে জমা পলি বর্ষায় প্রবল জলস্রোতে প্রতি বৎসরই ধুয়ে চলে যায়। এছাড়া কয়েক দশক পরে যদি স্বাভাবিকভাবে নদীগর্ভ

ব্যারাজের নক্সা (Model of a barrage)
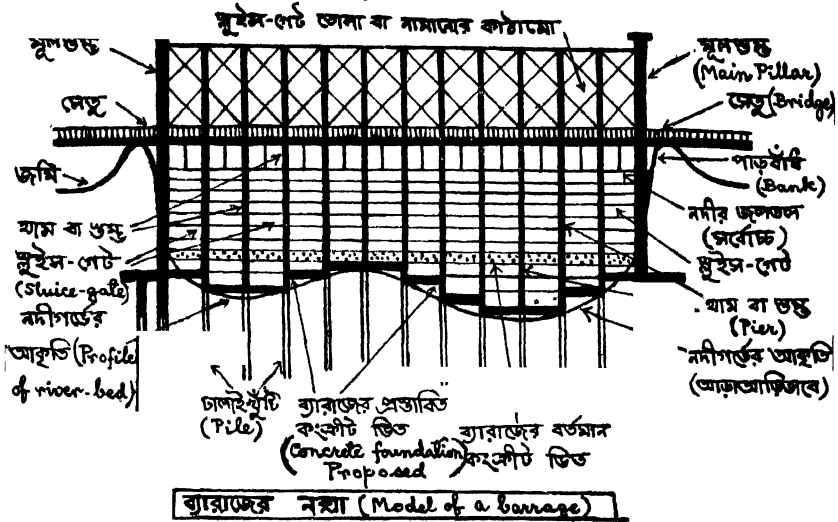
ব্যারাজের কংক্রীট ভিতটি নদীর গভীর অংশে নীচুতে এবং উচ্চতর অংশে উঁচুতে রাখতে হবে বা নদীগর্ভের প্রায় অনুরূপে গড়তে হবে। এজন্য প্রয়োজনে স্লুইস গেটগুলির উচ্চতা কম বা বেশি করতে হবে। এখানে এরূপ একটি ব্যারাজের নক্সা (Model) অঙ্কিত হল। [চিত্র দ্রষ্টব্য] চিত্রে প্রদর্শিত ব্যারাজটি নদীখাতের উপর বর্তমান ব্যারাজের চেয়ে অনেক কম বাধার সৃষ্টি করবে এবং নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ অনেকাংশে বজায় থাকতে সাহায্য করবে। এই ব্যারাজে নদীখাতের নিম্নাংশে জলপ্রবাহ বজায় থাকায় একদিকে যেমন ব্যারাজের সর্বোচ্চ জলনির্গমন ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে অন্যদিকে ব্যারাজ পণ্ডে চর সৃষ্টি হয়ে ভবিষ্যতে বিপদ ডেকে আনবে না। উঁচু হয়ে ওঠে, তবে প্রয়োজনবোধে কংক্রীট ভিতের উপর কয়েক ফুট উঁচু স্থির স্লুইস-গেট (Stop Sluice-gate) বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যেহেতু যে কোন ব্যারাজের স্লুইস-গেটগুলির নিম্নাংশ যতদূর সম্ভব নদীগর্ভে (River-bed) রাখা প্রয়োজন, সেহেতু গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের মত অতি বিস্তৃত নদী, যাদের নদীগর্ভ পরিবর্তনশীল, তাদের উপর ব্যারাজ নির্মাণ করলেও তাকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। [দ্রষ্টব্য—ফরাক্কা ব্যারাজ আজ অভিশাপ কেন? বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, মে-জুন, 1980] এছাড়া তিস্তা, কুশীর মত খরস্রোতা পাহাড়ী নদী, যারা প্রায়ই পথ পরিবর্তিত করে

থাকে, তাদের উপর ব্যারাজ নির্মাণ করলে নদীটির পথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায়।

ফরাক্কায় গঙ্গানদী মাঝে একটি চর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 44 ফুট উঁচু) সৃষ্টি করে দু'ধারে দুটি গভীর খাতে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 22 ফুট উঁচু) প্রধানত বয়ে চলত। সেখানে বর্তমান ফরাক্কা ব্যারাজের কংক্রীট ভিতের অধিকাংশে একই তলে (সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 52 ফুট উঁচু) না রেখে যদি নিবন্ধে বর্ণিত উপায়ে নদীগর্ভের অনুরূপে রাখা হত, তবে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার ভাঙন ও বর্তমান (আগস্ট, 1980) প্লাবন বহুলাংশে কম হত এবং ভবিষ্যৎ ফরাক্কা ব্যারাজ এত বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠত না।

একটি বংশলতিকার বিশ্লেষণ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

কথায় কথায় আমরা অনেক সময় বংশগত রোগ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলে থাকি। সাধারণতঃ যে রোগ বা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ প্রতি পর্যায়ে (generation) অন্ততঃ একজনের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাকে বংশগত রোগ বা বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রজনন-বিজ্ঞানীদের কাছে বংশগত রোগ বা বৈশিষ্ট্যের একই রকম রোগ বা বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে সেইসব রোগ বা বৈশিষ্ট্যকেও বংশগত বলে গ্রহণ করা হয়

বর্তমান প্রবন্ধে আমি একটি বাঙালী পরিবারের ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে চোখে ছানি পড়া রোগের (Juvenile Cataract) বংশগতি অনুধাবন করার
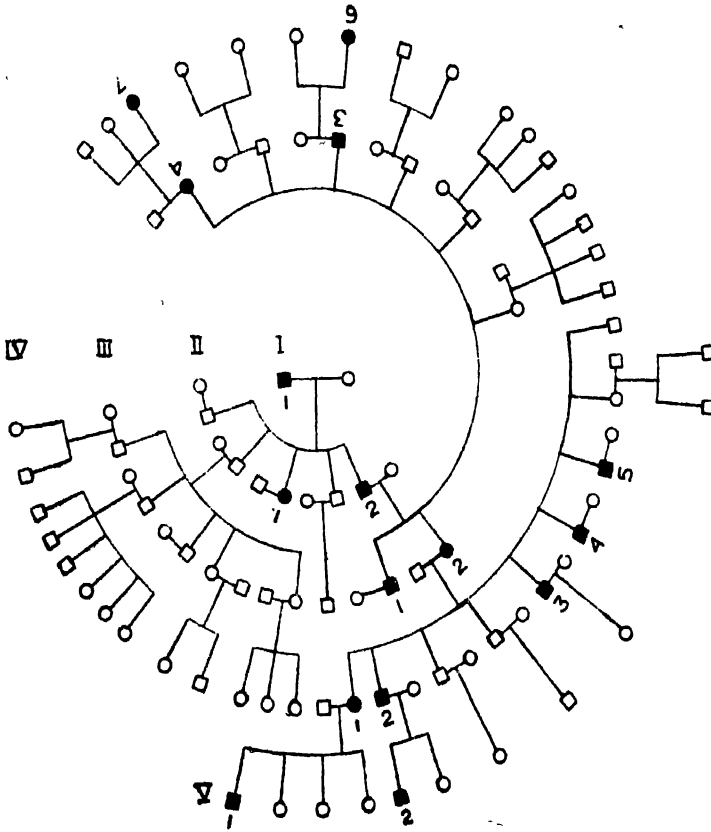
অল্প বয়সে চোখে ছানিপড়া রোগের বংশলতিকা।

সংজ্ঞা একটু ব্যাপক। প্রতি পর্যায়ে কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ কারুর মধ্যে প্রকাশ না পেলেও এক পর্যায় অন্তর যদি আবির্ভাব হয় অথবা হঠাৎ দুম করে কোন সুস্থ দম্পতির কয়েকটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে যদি চেষ্টা করেছি। এই পরিবারের কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়েদের নয় দশ বছর বয়সের মধ্যে চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হতে শুরু করে। ডাক্তারখানায় গিয়ে চোখ পরীক্ষা করে জানতে পারে যে তাদের চোখে ছানি

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

পড়েছে। তারা তখন তাদের চোখের ছানি কাটিয়ে পুরু লেন্সের চশমা ব্যবহার করে। আমি এই পরিবারের কোন কোন ব্যক্তি কোন কোন পর্যায়ে অল্প বয়সে চোখে ছানিপড়া রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, তার তথ্য সংগ্রহ করে একটি বংশলতিকা তৈরি করেছি (চিত্র)। বংশলতিকায় পুরুষ ও স্ত্রী-লোককে যথাক্রমে চতুষ্ক ও বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। কালো রঙের চতুষ্ক ও বৃত্তকে রোগাক্রান্ত এবং যাদের কোন রঙ নেই, তাদের সুস্থ ব্যক্তির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

অল্প বয়সে চোখে ছানিপড়া রোগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পিতামাতার মধ্যে একজন রোগাক্রান্ত থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করে বংশলতিকার উপরের পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হলে কোন্ ব্যক্তি থেকে রোগের বীজ সঞ্চারিত হয়েছে, তা সহজেই সনাক্ত করা যায়। পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত বংশলতিকাকে বিশ্লেষণ করলে প্রথম পর্যায়ের প্রথম ব্যক্তি I (1) থেকে রোগটি পরবর্তী পর্যায়ে যে সঞ্চারিত হয়েছে, তা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। তবে তিনি আগের পর্যায়ে কার নিকট থেকে রোগটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন, তার ইতিহাস আমার জানা নেই।

প্রথম পর্যায়ের রোগাক্রান্ত ব্যক্তির I (1) চারটি পুত্র ও একটি কন্যার মধ্যে একটি পুত্র ও কন্যার মধ্যে অল্প বয়সে চোখে ছানিপড়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল এবং বাকী তিনটি পুত্র সুস্থ ছিল। পরবর্তীকালে এই সুস্থ পুত্ররা বিবাহ করেছেন কিন্তু তাদের বংশধরদের মধ্যে ছানিপড়া রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে পুত্রটি II (2) রোগাক্রান্ত ছিলেন, তার তিন মেয়ে ও পাঁচ ছেলের মধ্যে দুই মেয়ে ও দুই ছেলের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা গেছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম রোগাক্রান্ত পুত্রের III (1) কোন সন্তান হয় নি কিন্তু প্রথম রোগাক্রান্ত কন্যার III (2) দুই মেয়ে ও সাত ছেলের মধ্যে এক মেয়ে ও চার ছেলে, দ্বিতীয় রোগাক্রান্ত পুত্রের III (3) দুই মেয়ের মধ্যে এক মেয়ে এবং দ্বিতীয় রোগাক্রান্ত কন্যার III (4) তিন সন্তানের মধ্যে এক মেয়েতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্থ পর্যায়ে প্রথম রোগাক্রান্ত কন্যার IV (1) এক ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে ছেলেটি এবং দ্বিতীয় রোগাক্রান্ত পুত্রের IV (2) এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে ছেলেটির চোখে ছানিপড়া রোগের লক্ষণ দেখা গেছে।

এই ধরণের বংশগত রোগে পুত্রকন্যা নির্বিশেষে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অর্ধেক সংখ্যক সন্তান-সন্ততি রোগাক্রান্ত হয়। আলোচ্য বংশলতিকায় প্রথম ও পঞ্চম পর্যায় ছাড়া বাকী তিনটি পর্যায়ের রোগাক্রান্ত ব্যক্তির 27টি সন্তানের মধ্যে 13টি সন্তান রোগাক্রান্ত এবং 14টি সন্তান সুস্থ। আবার 13টি রোগাক্রান্ত সন্তানের মধ্যে 6টি মেয়ে এবং বাকী 7টি ছেলে। সুতরাং রোগাক্রান্ত সন্তানের মধ্যে ছেলেমেয়ের অনুপাত সমান। পঞ্চম পর্যায়ের রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে এখনও নাবালক, তাদের সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

অল্পবয়সে ছানিপড়া রোগের বংশানুক্রমিক সূত্র অনুধাবন করলে দেখা যায় যে রোগটি প্রতি পর্যায়ে অন্ততঃ একটি সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুস্থ পুত্রকন্যাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার যেমন আশঙ্কা নেই, তেমন নেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নীরোগ ভাইবোনের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অর্ধেক সংখ্যক ছেলেমেয়ে রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মানুষের কোন বংশগত রোগের উত্তরাধিকার সূত্র জানা থাকলে, তার প্রসার প্রতিরোধ করার জন্যে প্রজননতাত্ত্বিক পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। এই কারণে বংশগত রোগের বংশগতি অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

[এই প্রবন্ধে চিত্রাঙ্কন করেছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চিত্রকর শ্রীসুধীর চক্রবর্তী।]

কয়েকটি প্রচলিত ধারণা

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্যরীতি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণের মধ্যে কতকগুলি ধারণা আছে। এই ধারণাগুলি ঠিক কিনা বা তার কার্যকারিতা কতটুকু তা কিন্তু ঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয় না। উপকার হোক না হোক, কাজে লাগুক না লাগুক—শুধু প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হয়ে সেগুলি মানা হয়। তথ্যের ভিত্তিতে সেগুলির সত্যতা নিরূপিত করবার বাসনা কারোর হয় না।

যেমন ধরুন, 8/10 মাস বা 1/2 বছরের শিশুদের জ্বর, পেটের অসুখ হলে ধরে নেওয়া হয় দাঁত ওঠার জন্য এরকম হচ্ছে। খুব জ্বর, রীতিমত উদরাময় হলেও অনেক অভিভাবক এজন্যে সহসা ঔষধ ব্যবহার করতে চান না। অথচ এর কোন তথ্যগত ভিত্তি নেই। অবশ্য একটা কথা এখানে স্বীকার্য যে শিশুদের দাঁত ওঠবার সময় সামান্য শরীর খারাপ হতে পারে তবে সেটা সাধারণই, বেশী নয়। আর একটি উদাহরণ ডাব খেলে পেট ঠাণ্ডা হয় ভেবে অনেকেই ডাব খান। বাজারে প্রচুর ডাবও বিক্রী হয়, ডাবের খোলার স্তূপের পরিমাণে পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের মাথা ধরে যায়। যাঁরা ডাব খান তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায়—ডাব খাবার দরুণ তাঁরা কোন উপকার বা স্বস্তি অনুভব করেন কিনা, তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি এবং স্পষ্টভাবে দিতে পারেন না। হ্যাঁ, ডাবের উপকারিতা আছে, উদরাময়ে অথবা বিশেষ বিশেষ রোগে ব্যবহার করা যেতে পারে। তা ভিন্ন ডাবের জলের কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা নাই। সর্দি হলে দই খাওয়া নিষেধ, সর্দি বা জরভাবে অনেকে ভয়ে টক খান না। কিন্তু সর্দিতে টক বা দই খেলে অপকার হতে তো দেখা যায় না।

শরীরের কোন জায়গায় আঘাত লাগলে ব্যথা উপশমের জন্য আহত স্থানে গরম সেঁক দেওয়ার বিধি আছে। বিধিটি ভাল। তাই কারো আঘাত লাগলে সঙ্গে সঙ্গে সেঁক দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। কিন্তু আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে সেই সময়ে সেঁক না লাগিয়ে 24 ঘণ্টা বাদে সেঁক দেওয়াই ঠিক। প্রথমাবস্থায় বরফ বা ঠাণ্ডা পটি দেওয়ার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ তাও কিছুক্ষণের জন্য দিলেই হবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। শরীরের কোথাও কেটে বা ছিঁড়ে গেলে ডেটল বা টিংচার আইওডিন লাগানো হয়। দুটিই সমান উপকারী, তবে আমার অভিজ্ঞতায় আইওডিন লাগালে জীবাণু অনুপ্রবেশ রোধ করার সঙ্গে আহত স্থানের বেদনারও উপশম হয়। হলে কি হবে অনেকেরই ধারণা আইওডিন লাগানো স্থানে জল লাগলে ক্ষতস্থান পেকে যায়। এ ধারণার বিজ্ঞান-সম্মত বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

ডিম খুবই পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু বহুজনেই গরমকালে ডিম খাওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু ডিম সব ঋতুতেই খাওয়া যায় এবং গরমকালে ডিম খেলে কোন শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নাই। ডিম খাওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধেও নানা মত আছে যেমন কাঁচা, আধ-সেদ্ধ, পোচ, অমলেট ইত্যাদি। উপকারিতা প্রায় সবগুলিতেই সমান তবে আধসেদ্ধ বা 'পোচ' করা ডিম অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য। কাঁচা ডিম না খাওয়াই ভাল। কেউ কেউ আবার ডিমের সাদা

*25/A, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-6

অংশটা ফেলে দিয়ে শুধু হলদে অংশটা খায়। সাদা অংশটাও উপকারী—ফেলার প্রয়োজন নেই। টেংরির ঝুল খুব উপকারী বলে প্রচলিত ধারণা কিন্তু টেংরির সিদ্ধ জল বিশেষ উপকারী নয়। তাতের ফেন সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়। উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহী তার তামার মত বাঁধলে বাত সারে বলে অনেকে ব্যবহার করে থাকে। সত্যি সারে কি? ন্যাবা হলে (infections hepatitrs) ন্যাবার মালা পরানো হয়। মালা ব্যবহার করে কোন ডাক্তার রোগীকে স্বাস্থ্য সময়ের মধ্যে সারতে দেখেছেন? আমি তিন দশকের অভিজ্ঞতায় এর উপকারিতার প্রমাণ পাই নি।

অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেদের চিনেবাদাম, ছোলা খেতে বারণ করা হয় কারণ ওগুলি খেলে নাকি পেটের অসুখ হয়। পরিমিতভাবে বাদাম-ছোলা খেলে পেট খারাপ হয় না বরং ওগুলি খুব মুখরোচক পুষ্টিকর খাদ্য। যদি ওগুলি খেলে কারো পেট খারাপ হয় তাহলে বুঝতে হবে যে সে প্রচ্ছন্নভাবে পেটের রোগে ভুগছে।

এরূপ অনেক ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে যেগুলি সংস্কারবশতঃ বিশ্বাস না করে যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সংশোধন করে নেওয়া উচিত।
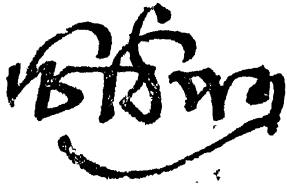
তিন বিজ্ঞানী প্রসঙ্গে

(1)

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় জুন সংখ্যায় শ্রীঅসীম চক্রবর্তীর পত্রখানি পড়লাম। শ্রীচক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন যে ব্যক্তিপূজা নয়, ব্যক্তিকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। মাত্র এই কথাটি ছাড়া শ্রীচক্রবর্তীর দীর্ঘ পত্রটির অন্য কোন অংশের মর্মোদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না, অবশ্যই আমার বুদ্ধির স্বল্পতার কারণে। সত্যি কথা, আচার্য বসু বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখেন নি, কিন্তু তার থেকে অনেক বড় কাজ করে গিয়েছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে। সেই বিজ্ঞান আন্দোলনকে বাংলার প্রতিটি গৃহপ্রান্তে পৌঁছে না দিতে পারার দায়ভাগ শ্রীচক্রবর্তীর এবং আমাদের সকলের, আচার্য বসুর নয়। বাংলায় বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনাই যদি একমাত্র নিরিখ ধরা হয়, তাহলে অধুনা অনেক বিজ্ঞান লেখকই আচার্য বসুর থেকে বেশী দায়িত্ব পালন করছেন; কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন থাকে সমাজের কতটুকু অংশের কাছে? নিরক্ষর হাসিম সেখ এবং রামা কৈবর্তরা এখনও যে সমাজের সত্তর ভাগ, বাংলাও যে তাদের কাছে গ্রীক ভাষা।

শ্রীমেঘনাদ সাহা বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা হতে পারে বলে বিশ্বাস করতেন না, এ তথ্য শ্রীচক্রবর্তী আমাদের স্মরণ করিয়েছেন। কিন্তু এ তথ্য বিজ্ঞানী হিসেবে বা সমাজের এক সচেতন সদস্য হিসেবে তাঁর মূল্যায়নে কতখানি প্রাসঙ্গিক, তা অধমের বোধগম্য হলো না। মেঘনাদ সাহার জীবনই পরিচয় দেবে বিজ্ঞানীর চারিত্রধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হয়েছিলেন কি না এবং সমাজের কল্যাণের ব্যাপারে তিনি কোন চিন্তাভাবনা করেছিলেন বা প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন কিনা।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য নিঃসন্দেহে এক জীব-বিজ্ঞানী। শ্রীচক্রবর্তীর অনুধাবনের জন্য জানাই জীববিজ্ঞানের অনেক শাখাতেই "গভীর বিশ্লেষণে"-এর প্রয়োজন হয় না। পরিচিত বিজ্ঞানী সমাজে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ইত্যাদি বিভাগ নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তেই এবংবিধ বিভাগের ইতি। বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিমাণগত তারতম্য থাকলেও চার্লস ডারউইন এবং গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম একই সঙ্গে উচ্চারণযোগ্য বিজ্ঞান মানসিকতা, নিরলস বিজ্ঞানসাধনা এবং কর্মধারার সাযুজ্যের দিক থেকে।

সুখময় ভট্টাচার্য

কলিকাতা-32

(2)

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের (জুন 1980) চিঠিপত্রে শ্রীঅসীম চক্রবর্তীর বক্তব্য (1) প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞানীরও কোন গভীর বিশ্লেষণের ক্ষমতা নেই এবং (2) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যকে জীব-বিজ্ঞানী অভিহিত করাটা একটা গর্হিত অপরাধ হয়েছে।

যখন অধিকাংশ জীব-বিজ্ঞানী শুধুমাত্র এ্যানাটমি, ট্যাক্সোনমী ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরাই বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারা ও

পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিজ্ঞানের দুটি ধারাকে জীবন্ত রাখেন—যা আজকের দিনে এথোলজী এবং একোলজী নামে সুপরিচিত জীব-বিজ্ঞানের দুটি দৃঢ় স্তম্ভ। শ্রীচক্রবর্তীর মতে পুরোণো দিনের Huber, Forel, Avebury, Fabre বা বর্তমান যুগের নোবেল পুরস্কারবিজয়ী Tinbergen, Von Frisch, Konrad Lorenz—এঁদের কারুরই বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না বা এঁদের কেউই জীব-বিজ্ঞানী নন অথবা এঁদের কেউই প্রকৃতি-বিজ্ঞানী নন।

চিন্তাশীল পর্যবেক্ষণের সাহায্যে Oecophylla-এর caste determination-এর সমস্যায় trophic theory-কে সমর্থন করে, Wheeler, Weson, Goetsch-এর সমপর্যায়ের কাজ করে এবং metamorphosis-এর মত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নূতন দিগন্তের আভাস দিয়েও গোপালবাবু-জীব-বিজ্ঞানী হতে পারলেন না।

যে দেশে, যে সমাজে জীববিজ্ঞানের উচ্চতম পাঠ্যক্রমেও Tinbergen প্রভৃতি দিকপালের কার্যাবলী স্থান পায় নি, যেখানে ছাত্রদের Tinbergen-এর Curious Naturalists বা Von Frisch বা Lorenz-এর সহজবোধ্য বইগুলিও পড়তে বলা হয় না,—সেখানে শ্রীচক্রবর্তীর উক্তি একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়।

এছাড়া শ্রীচক্রবর্তী ডারউইনের সঙ্গে গোপাল বাবুর নাম উচ্চারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আমার সেই বক্তৃতার আর এক অংশে ডারউইনের সঙ্গে পল্লী বাংলার এক অখ্যাত শিক্ষক যোগেন মাষ্টারের নামও উচ্চারণ করেছিলাম। এগুলি কেন এবং কি অর্থে বলেছিলাম, তা বাংলাভাষী পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন—অন্তত 50 জন অল্প বয়সী ছেলেমেয়েও তা বুঝেছে।

আর. এল. ব্রহ্মচারী
কলিকাতা-35

হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান

বিগত মে, 1980 সংখ্যা, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এ 'হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞান' নামক আপনার অত্যন্ত গঠনমূলক, বিজ্ঞানধর্মী ও মূল্যবান সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আপনাকে অজস্র অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আপনার স্বচ্ছ ও গভীর ধারণা দেখে আমরা মুগ্ধ। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর মতো উঁচু স্তরের বিজ্ঞান পত্রিকার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা বিজ্ঞানী-বিদগ্ধ মহলে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

হ্যানিম্যানের পর হোমিওপ্যাথিতে বিজ্ঞান-সম্মত অগ্রগতি যে বিশেষ কিছুই হয় নি, এমন কি হোমিওপ্যাথিক সমাজ গত পৌনে দু-শ' বছরে হ্যানিম্যানের সর্বাপেক্ষা পরিপক্ক ও বিজ্ঞান সম্মত অবদান অর্গানন ষষ্ঠ সংস্করণ পর্যন্তও অগ্রসর হতে পারেন নি, এটি অত্যন্ত সত্য। সেজন্য একদিকে হোমিওপ্যাথদের অধিকাংশের ভাববাদী ও সেকেলে ধ্যানধারণা, অন্যদিকে হোমিওপ্যাথি দিয়ে পুঁজি সৃষ্টির লাগামহীন প্রয়াস এবং তার ফলশ্রুতি হোমিও-প্যাথির নামে পেটেন্ট ঔষধ, টনিক, মলম, মিশ্র ঔষধ, ইনজেকশন প্রভৃতি বের করে জনগণকে বিভ্রান্ত ও শোষণ করে রমরমা ব্যবসা চলছে। অবশ্য এজন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখা হিসাবে অনুমোদন করেও হোমিওপ্যাথির বিকাশ ও অগ্রগতিতে সব দেশের, সব সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণও কম দায়ী নয়। আমাদের দেশের সরকারের ঔদাসীন্যের ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মন্তব্য যথার্থ এবং সেজন্য অভিনন্দন।

আপনার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, হোমিওপ্যাথি মতে সুপরীক্ষিত না হয়েও টেরা-মাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, স্টেপটোমাইসিন, প্রভৃতি ঔষধ হোমিওপ্যাথিতে সীমিতভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

"বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা (অ্যালোপ্যাথি) পদ্ধতি"-র সাথে, যার মূলনীতি "Contraria", হোমিওপ্যাথির, যার মূলনীতি "Similia", কিভাবে মিলন হতে পারে সে বিষয়ে একটু বিস্তারিত জানালে আমরা বাধিত হবো।

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে হোমিওপ্যাথির বিকাশ ও অগ্রগতি সাধনে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বিশিষ্ট ভূমিকা নেবে বলে অঙ্গীকার করায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সেজন্য পরিষদের সকল কর্মকর্তা-সহ আপনাকে অজস্র অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

বিনতঃ
হোমিও সমীক্ষা
সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে,
হরিমোহন চৌধুরী,
কলিকাতা-700013
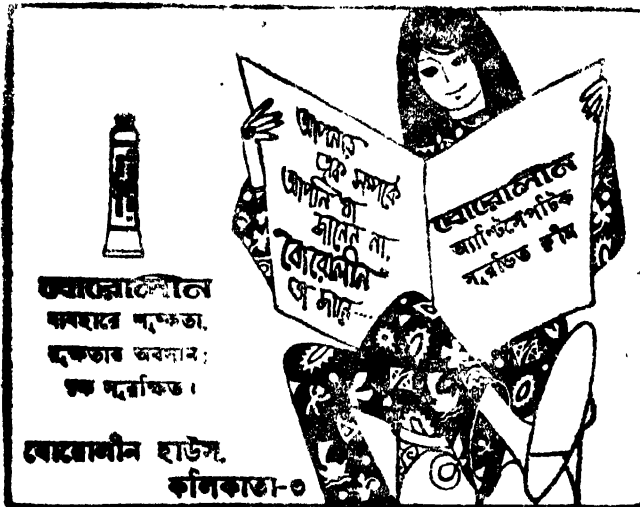
পুস্তক-পরিচয়

প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা, লেখক—প্রদীপ কুমার মজুমদার, পরিবেশক—গ্রন্থমালা, এ/12, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-7 ; প্রথম প্রকাশ—মহালয়া, 1386 ; পৃষ্ঠা সংখ্যা—346 ; মূল্য—সাধারণ সংস্করণ - পঁচিশ টাকা, শোভন সংস্করণ - তিরিশ টাকা।

চিন্তা, যুক্তি ও আলোচনা মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশকে করেছে ধাপে ধাপে উন্নত। মানুষের এই সব চারিত্রিক বৃত্তির পীড়নে নানা শাস্ত্রের ঘটেছে বিকাশ, যেগুলি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ। আবার এই সব সম্পদের মধ্যে প্রাচীনতম হল গণিতশাস্ত্র। আমরা ভারতবাসী হিসাবে গৌরববোধ করি যে, আমাদেরই পূর্বপুরুষেরা এহেন প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভাবক। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বসূরীদের ঐতিহ্য বহন করতে না পারার গ্লানি ও লজ্জাও আমাদের উপর অর্পিত।

প্রাচীন ভারতের গণিতশাস্ত্রের গৌরবময় ইতিহাসের মূল্যায়ন অনেকেই করেছেন। শ্রীপ্রদীপ কুমার মজুমদারের এই গ্রন্থ নব আঙ্গিকে ঐ গৌরবময় ইতিহাসের নব মূল্যায়ন। এই গ্রন্থের আঠারোটি অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়বস্তুকে মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(i) সংখ্যা ও গণনা, (ii) পাটিগণিত, (iii) বীজগণিত, (iv) প্রাচীন লিপির চিত্র, নির্ঘণ্ট ও তথ্যসূচী। প্রতিটি অধ্যায়ে মূল-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সমালোচকের বক্তব্য এবং নানা গবেষণা-পত্রের সারাংশের সাহায্যে যুক্তিপরম্পরায় সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে লেখক সমর্থ হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। ভারতীয় গণিতবিদ্‌রাই গণিতে প্রথম দশাঙ্ক সংখ্যার প্রচলন করেন, ভারতীয় গণিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানই আদি পুস্তক, প্রথম আর্যভটের আর্যভটীয় প্রণালীবদ্ধ প্রথম গণিত পুস্তক, গণিতপাদের লেখক প্রথম আর্যভট, আর্যভট নামে গণিতবিদ তিনজন, বর্গমূল নির্ণয়ে থিয়নের পদ্ধতি ও ভারতীয় পদ্ধতি সামঞ্জস্যহীন, শূন্য ভারতীয়দেরই আবিষ্কার, বীজগণিত নামটি প্রথম ব্যবহার করেন পৃথূদকস্বামী প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয়ের উপর মনে হয় যবনিকা পড়বে শ্রীমজুমদারের এই গ্রন্থ প্রকাশের পর। যখন সংস্কৃত শিক্ষা অবলুপ্তির পথে তখন মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ তুলে দিয়ে তার বাংলা টীকা দেওয়ায় বর্তমানের পাঠক-পাঠিকাদের সত্যকে উপলব্ধি করায় বাধাও কিছুটা অপসারিত হবে। লোকরঞ্জক পুস্তকমালায় গ্রন্থটি উন্নীত না হলেও প্রাচীন ভারতের গণিতের উপর প্রামাণ্য দলিল হিসাবে, গবেষকদের পথের দিশারী হিসাবে এবং নানা প্রাচীন বিষয়ের উপর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পুস্তকখানি এক শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নিশ্চয়ই সমাদৃত হবে।

রতনমোহন খাঁ

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

জ্যামিতিশাস্ত্রের হোমার

নন্দলাল মাইতি*

[ভৌত বিজ্ঞানে আর্কিমিডিসের অবদানের কথাই বেশী আলোচিত হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধে গণিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা সংক্ষেপে বলা হয়েছে]।

প্রাচীনকালের বিজ্ঞান সাধকদের মধ্যে আর্কিমিডিসের নাম সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর উদস্থিতি ও বলবিদ্যা বিষয়ক নীতি ও সূত্রগুলি স্কুলের বিজ্ঞান গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে। কপিকল, লিভার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ে গবেষণা তো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। ইউক্লিড জ্যামিতে সর্বকালের মানদণ্ড স্থির করে থাকলে, আর্কিমিডিসও গণিত ও বিজ্ঞানে সর্বকালের এক মানদণ্ড স্থির করে মানবজাতির অশেষ কল্যাণসাধন করে গেছেন। বিজ্ঞানে তাঁর যত কীর্তিই থাকুক না কেন, গণিতবিদ্যায় তাঁর যে মৌলিক গবেষণা তা যেন সব কিছু ম্লান করে দেয়। গণিতের দুটি শাখা, বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতে তাঁর প্রায় সমান অবদান। গণিতের নানা সমস্যা সমাধানে তাঁর বিশেষ পদ্ধতি ও প্রণালী আবিষ্কার একান্তভাবে মৌলিক ও আধুনিক। তাই গণিতের ইতিহাসকারগণ বলেন যে, বিশ্বগণিতে তিনজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদের নাম করতে হলে প্রথমেই আর্কিমিডিসের নাম করতে হবে; অপর দু-জন হলেন আইজ্যাক নিউটন ও কার্ল ফ্রেডারিক গাউস। প্রাচীনকালের এই

*ঠাকুরাণীচক পোঃ, হুগলী-জেলা, 712 613

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গণিতবিদের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানানোর জন্য যথার্থই বলা হয় "The Homer of geometry". বহুবিদ্যায় পারদর্শী হওয়া অসম্ভব ; অল্প বিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমেই বিশেষ জ্ঞানার্জন সম্ভব। আর্কিমিডিস এই সত্যটি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন বলেই যে অল্প কয়েকটি বিদ্যার অনুশীলনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তাতে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক-জ্ঞানের এমন সুষ্ঠু সমন্বয় আর দেখা যায় না।

আর্কিমিডিসের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ঐতিহাসিক জীবনীকার প্লুতার্কের কৃপায় তাঁর মৃত্যুর বিবরণ কিছু জানা যায়, তাও, সঠিক ও অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা যায় না। যাই হোক 212 খৃষ্টপূর্বাব্দে পঁচাত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় রোমন সৈন্যদের হাতে। সুতরাং তিনি 287 খৃষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সিসিলির সিরাকুজ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন জ্যোতির্বিদ ফিডিয়াস। কেউ কেউ বলেন তিনি অভিজাত পরিবারে জন্মেছিলেন, আবার কেউ কেউ বলেন ঠিক এর বিপরীত কথা।

তবে সিরাকুজের রাজা হীরণের সঙ্গে তাঁর খুব সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল এবং রোমানদের হাত থেকে সিরাকুজকে বাঁচানোর জন্য হীরণের অনুরোধে তিনি তাঁর গাণিতিক প্রতিভা কাজেও লাগিয়েছিলেন। এই সব দিক থেকে বিচার করলে তিনি সম্ভবত অভিজাত পরিবারেই জন্মেছিলেন। বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অল্পকাল পড়াশুনা করেন। এখানেই কোননের ন্যায় বিখ্যাত গণিতবিদের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কোননের গাণিতিক প্রতিভার প্রতি আর্কিমিডিসের যথেষ্ট আস্থা ছিল। দুঃখের বিষয় কোননের গণিত সংক্রান্ত পুস্তক আজ অবলুপ্ত।

গভীর মননশীল ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই সাধারণত কিছুটা অন্যমনস্ক হন। বিশ্বের বিখ্যাত দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গণিতবিদের জীবন আলোচনা করলে এমন অনেক কাহিনী জানতে পারা যায়। যেমন—থ্যালেস পথচলার সময় রাস্তারদিকে তাকিয়ে চলার পরিবর্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে চলতেন ; আর হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেন, নিউটন ডিমের পরিবর্তে ঘড়ি সিদ্ধ করতেন, আর প্যারিস ভ্রমণকালে আইনস্টাইনের হোটেলের রুম নম্বর ভুলে যাওয়া ঘটনা প্রায় সর্বজনপরিচিত। আর্কিমিডিসের জীবনেও এমন দু-একটি ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়।

রাজা হীরণের সোনার মুকুটে খাদ নির্ণয়ের ভার আর্কিমিডিসের উপর পড়েছিল। আমরা জানি না স্বর্ণকার সত্যিকার খাদ মিশিয়ে ছিল কি না, আর তা কিভাবেই নির্মীত হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের যে একটি নতুন সত্য উদ্ভাবিত হয়েছিল তা প্রায় সবার জানা। "ইউরেকা, ইউরেকা" বলে উলঙ্গ আর্কিমিডিস প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছেন এ গল্পও সকলে জানি।

তখনকার দিনে গ্রীকরা স্নানের পর অলিভ তেল মাখত। আর্কিমিডিস তেল মাখার সময় গায়ে তেলের উপর যে নানা রেখা ফুটে উঠত, তার জ্যামিতিক চিত্রে বিমুগ্ধ হয়ে পড়তেন। আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগুনের ধারে খালি গায়ে বসে অলিভ তেল অংকিত রেখাগুলির জ্যামিতিক কোন সমস্যা সমাধানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যমরাজকে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন—"আমার বৃত্তকে নষ্ট করো না"।

এবার আমরা এই জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বীর গণিতে অবদান বিষয়ে সামান্য আলোচনা করব। তাঁর গণিত বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে, Quadrature of the Parabola, On the sphere and cylinder, Measurement of a circle, The Sand-reckoner ইত্যাদি।

গ্রীক অংকপাতন পদ্ধতি ছিল বড় জটিল ও অবৈজ্ঞানিক। এতে বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করা যেত না। কিন্তু তিনি অসাধারণ প্রতিভার আলোকে তখনকার জটিলতা দূর করে নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। দশ হাজার মিলিয়ন স্টাডিয়া (10 স্টাডিয়া = 1মাইল) ব্যাসের গোলকে কত সংখ্যক বালুকণা থাকতে পারে, তার হিসাব বের করলেন,—10^{63}।

আর্কিমিডিসের দেখান যে, 10^8, 10^{16}, 10^{24} প্রভৃতি রাশিগুলি যে গুণোত্তর প্রগতি সৃষ্টি করে, তার পর পর যে কোন দুটি রাশির গুণফল পরবর্তী রাশির সমান। অর্থাৎ $10^8 \times 10^{16} = 10^{24}$। সংখ্যা তত্ত্বের এই গবেষণা থেকে সূচক-নিয়মটি জানা যায়। কারণ, m ও n দুটি অখণ্ড ধনরাশি হলে, $a^m \times a^n = a^{m+n}$। এইখানেই লগারিথিম আবিষ্কারের ইঙ্গিত নিহিত ছিল। বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারও তাঁর অমর কীর্তি।

ইউক্লিড নিঃশেষীকরণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি ক্রমিক বিভাজনের উপর নির্ভরশীল। ক্রমিক বিভাজন দ্বারা অতি ক্ষুদ্রাংশ পর্যন্ত বিভাজন সম্ভব। কিন্তু ইউক্লিডের হাতে এই পদ্ধতির পরিপূর্ণতা আসে নি। আর্কিমিডিস এই পদ্ধতি সুষ্ঠু প্রয়োগ করে পরিপূর্ণতা আনেন এবং গণিতের একটি বিশেষ পদ্ধতিরূপে স্বীকৃতি দান করেন। এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে তিনি বৃত্ত, গোলক, পরাবৃত্ত, অধিবৃত্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করেন। বিভিন্ন প্রকার আকার ও আয়তনের ঘন বস্তুর ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয়ের নানা সমস্যা বিষয়ে তাঁর গবেষণা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

আমরা জানি বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত ধ্রুবক এবং তা π দ্বারা প্রকাশ করা হয়। স্কুলের গণিতে π-এর মান $\frac{22}{7}$ ধরে অংক কষা হয়। কিন্তু π-এর মান প্রকৃতপক্ষে $\frac{22}{7}$ নয়। π একটি অতুলনীয় সংখ্যা, এর মান নিঃশেষে নির্ণয় করা যাবে না। আর্কিমিডিস সেই প্রাচীনকালে π-নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তর্লিখিত 96 সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ অংকন করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে $3\frac{1}{7}$ এবং $3\frac{10}{71}$-এর মধ্যবর্তী হচ্ছে π-এর মান।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা এই যে, আর্কিমিডিস কর্তৃক ব্যবহৃত নিঃশেষীকরণ পদ্ধতির মধ্যেই Integral Calculus জন্মরহস্য নিহিত ছিল এবং তিনি এই Calculus-এর ধারণাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন।

আর্কিমিডিস প্লেটোর কঠিন অনুশাসন থেকে গণিতকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা পেয়েছিলেন,—জ্যামিতিতে কেবলমাত্র রুলার ও কম্পাস ব্যবহার বিধিসম্মত, এটা তিনি অস্বীকার করেছিলেন। গণিত ও বিজ্ঞানে এমন অনন্যসাধারণ প্রতিভা সত্যই ক্যাজরির ভাষায়, "He is the Newton of antiquity."

মহাকালে শিবের জটা

নারায়ণ পাল*

[ভূটানের মহাকাল পাহাড়ের একটি গুহায় নাকি শিবের জটা থেকে জল পড়ছে। মানুষের এই ভ্রান্ত ধারণার যথার্থ কারণ কি তা এই নিবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

চুনাপাথরে তৈরী এই পাহাড়ে গুপ্ত প্রস্রবণ আছে যা মানুষ ওখানে গেলে দেখতে পায় না। সেই প্রস্রবণের জল (H_2O) চুনাপাথরের ($CaCO_3$) সঙ্গে বিক্রিয়া করে চুনাপাথরের অক্সাইড (CaO) আর কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) তৈরি করে। যেটুকু জল বেরুচ্ছে তা টুপ টুপ করে চুনাপাথরের অক্সাইড বেয়ে পড়ছে। এই বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হল—$CaCO_3 + H_2O = CO_2 + H_2O + CaO$ ক্যালশিয়াম অক্সাইড (CaO) তৈরি হয়ে নিচের দিকে জমা হচ্ছে, আর উপর থেকে নিচে খাড়াভাবে জমে জমে নামছে। দেখতে অনেকটা ঠিক বটের ঝুরির মত, উপর থেকে যে প্রবণটি নামছে তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'স্ট্যালাকটাইট' এবং নিচু থেকে জমে জমে যেটি উপরে উঠছে তাকে বলে 'স্ট্যালাকমাইট'। এই 'স্ট্যালাকটাইট' আর 'স্ট্যালাকমাইট' কয়েক শ' বছর ধরে জমে স্তম্ভের আকার নেয়। মহাকাল পাহাড়ে এমন প্রচুর স্তম্ভ আছে মানুষ এগুলিকেই শিবের জটা বলে ভাবে।

আরো একটা জিনিষ এখানে আছে—গুহার আরও ভেতরের দিকে। একটা 'শিবলিঙ্গ'—অর্থাৎ, তেল-সিঁদুর মাখানো একটা পাথর এই গুহায় আছে। এই শিলাখণ্ডটিকে 'শিব' ভেবে মানুষ পূজা করে। গুহা-দেবতা আলো সহ্য করতে পারে না বলে কেউ ওখানে আলো নিয়ে গেলে তা নাকি নিভে যায়। আসলে সেখানে এত বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) আছে ও অক্সিজেন এত কম যে সেখানে আলো নিয়ে গেলে তা নিভে যাবেই।

গুহা সম্পর্কে আরো একটি কথা প্রচলিত আছে। কোন পাপী মানুষ ঐ গুহায় ঢুকলে নাকি গুহার মুখ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। পাপ-পুণ্য সব হেঁয়ালী কথা। যে কোন মানুষ ভয়, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে সাহস করে ঐ গুহায় ঢুকলে দেখতে পাবে যে, গুহার মুখ মোটেই বন্ধ হয় না। এই নিবন্ধ লেখকের সে অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু, সাধারণের বিচারে এই লেখকতো পাপী (অবিশ্বাসী বলে) তাই না?

---

*পোঃ—তাহেরপুর, জেলা—নদীয়া

এলাচ

অশোককুমার নিয়োগী*

[এলাচ কি জাতীয় গাছ—এর জন্মস্থান নির্ণয়—এলাচ সাধারণতঃ কয়প্রকার—এই গাছের আকৃতি—ফুল-ফল এবং এর ব্যবহার ও উপকারিতা বলা হয়েছে।]

এলাচ আদা বা হলুদ জাতীয় একপ্রকার গাছের ফল। এর জন্মস্থান নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ভারত কিংবা তার নিকটবর্তী কোন স্থানেই এলাচের প্রথম জন্ম। ভারতবর্ষে এলাচ সুগন্ধ দ্রব্য ও ওষুধ হিসাবে সুপ্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এলাচ নানাপ্রকারের হয়; তবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা দু-প্রকার এলাচের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত; যথা—(ক) বড় এলাচ (খ) ছোট এলাচ।

(ক) বড় এলাচ: বড় এলাচের বৈজ্ঞানিক নাম 'আমোমাম সুবুলেটাম' (Amomum Subulatum Roxb)। এই গাছ সাধারণতঃ পূর্ব হিমালয়ের আর্দ্র মাটিতে জন্মায়। সেজন্যই নেপাল, সিকিম, বঙ্গদেশ প্রভৃতি পূর্ব হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে বড় এলাচের চাষ খুব ভাল হয়।

এলাচ গাছ প্রায় তিন থেকে চার ফুট লম্বা হয়। গাছের কাণ্ডে পাতা থাকে। পাতাগুলি লম্বায় এক থেকে দুই ফুট; এবং চওড়ায় প্রায় তিন থেকে চার ইঞ্চি। পাতাগুলি সবুজ বর্ণের এবং সূক্ষ্মলোমযুক্ত। এর ফুলগুলো পীতাভ সাদা এবং খুব ঘন মুকুলে সজ্জিত। এই গাছে সাধারণতঃ বর্ষার আগে ফুল ধরে এবং পরে ফল হয়; সেই ফল শরৎকালে পাকে। এই ফলগুলো অনেকটা লম্বাটে গোল ধরণের; এবং তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতিটি কক্ষে প্রায় আট থেকে দশটি কালো গোল বীজ থাকে।

বড় এলাচের বীজ কাঁকড়াবিছা আর সাপের বিষের একটি প্রতিষেধক। তাছাড়া বড় এলাচ নানারকমের পেটের রোগের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অনেক সময়ে এটা কলেরাতে পাকস্থলীর উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুখ ও দাঁতের রোগে মুখ ধোয়ার জন্য এলাচের জল ব্যবহার করলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

(খ) ছোট এলাচ:—ছোট এলাচের বৈজ্ঞানিক নাম 'ইলেটারিয়া কার্ডামোমাম (Elattaria cardamomum Moton)। এই ছোট এলাচের গাছ সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতের চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলে এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 2500 থেকে 5000 ফুল উচ্চ ভূমিতে দেখা যায়। মহীশূর, তামিলনাড়ু, কেরালা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট এলাচের চাষ অধিক পরিমাণে হয়। ভারতছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অধিক পরিমাণে ছোট এলাচের চাষ হয় না। তাই ইংল্যাণ্ড,

* 2, নরেন্দ্র স্ট্রীট, পোঃ-উত্তর পাড়া, জেলা-হুগলী

আমেরিকা, সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলো ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে ছোট এলাচ আমদানী করে। তবে আজকাল ছোট এলাচ ভারতের বাইরে যেমন বার্মা, মালয়, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে সামান্য পরিমাণে চাষ হয়।

ছোট এলাচের গাছ সাধারণতঃ পাঁচ থেকে আঠারো ফুট লম্বা হয়। এই গাছের পাতাগুলো খুব ঘন হয়, প্রায় এক থেকে তিন ফুট লম্বা হয়। এই গাছ অনেকদিন বেঁচে থাকে। ছোট এলাচের ফুলের রঙ সাদা ও ধূসর সবুজ বর্ণের হয় এবং ফুলের আকার প্রায় এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি। এই ফুলগুলো দুই থেকে চার ফুট লম্বা একটি মঞ্জরীদণ্ডের ওপর সাজানো থাকে। ছোট এলাচের ফলগুলোর আকৃতি ডিমের মত এবং দেখতে ধূসর সবুজ বা হলুদ বর্ণের হয়। ছোট এলাচের ফলটি তিনটি কক্ষবিশিষ্ট এবং প্রতিটি কক্ষে প্রায় পাঁচ থেকে সাতটি শক্ত বাদামী রঙের বীজ সাজানো থাকে। এই ফল সাধারণতঃ শীতকালে পাকে।

ছোট এলাচ সুগন্ধি পানীয় আর মদ তৈরিতে খুব ব্যবহৃত হয়। ছোট এলাচের তেল থেকে কার্ডামাম ও টোনিক স্পিরিট প্রস্তুত করা হয় তাছাড়া এলাচ পেটের রোগ দমন করে। আমাদের দেশে ছোট এলাচ রান্নার সুগন্ধি মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্য প্রাচ্যের অধিবাসীরা চা ও কফির সঙ্গে ছোট এলাচের গুঁড়া মিশিয়ে পান করেন।

রোগের উপর গানের প্রভাব

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য*

গান হিংস্র বন্য পশুকেও বশ করে। কথাগুলো বোধ হয় রূপক। সঙ্গীতে শক্তি ঠিক কতটা তাই বোঝাতেই হয়তো কথাটা বলা হয় এবং আরো শোনা যায় ভারতীয় টোড়ী রাগিনী বনের হরিণকে মুগ্ধ করে রান্না ঘরে টেনে আনতে পারে—কষ্ট করে আর তাকে শিকার করতে হয় না, কেটে রান্না করে ভোগ দিলেই চলে। হতে পারে এটাও নিছক গল্প। কিন্তু এই সংগীত বনের পশুকে বশ বা আকৃষ্ট নাই করুক—রোগের উপর এ সংগীতের কিন্তু একটা মস্ত প্রভাব আছে। সে রোগ দেহের বা মনের যারই হোক না কেন।

সঙ্গীত আর রোগের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে সঙ্গীত নানা ভাবে নানা বয়সের বহু বিচিত্র ধরণের রোগ নিরাময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে চিকিৎসকরা (ওঝা বা পুরোহিত) যে প্রচণ্ড চীৎকার করে তুক্‌তাক মন্ত্র আওড়াতেন রোগীদের রোগমুক্তির জন্যে এবং আজকের দিনেও গ্রাম-গাঁয়ে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতির মত সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যে কীর্তনের দল 'অনলে অনীলে হরি, হরি সর্বময়' বলে নগর-কীর্তন করে পাড়া পরিক্রমা করে ফেরেন, রোগীদের উপর তার শুভাশুভ প্রভাব নিয়ে গবেষণা হতে পারে।

দু'হাজার বছর আগে অর্থাৎ খৃস্টাব্দের সূচনাকালে ডেভিড বীণা বাজিয়ে বহু অসুস্থ লোককে সুস্থ করে তুলেছেন, যার কাহিনী আজও লোকমুখে শোনা যায়। মিশরেও অনুরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে। পুরোহিত রমণীরা বীণা বাজিয়ে রোগীদের রোগমুক্ত করতেন। গ্রীসের ইতিহাসে 'সঙ্গীত-থেরাপী' (সঙ্গীতের রোগনিরাময় ক্ষমতা) নিয়ে শুধু আলোচনা করা হয়েছে তাই নয়—তাকে যথেষ্ট গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে।

অ্যারিস্টেটল গানের রোগ সারাবার ক্ষমতা আছে এ শুধু বিশ্বাস করতেন তাই নয়, বলতেন, মানুষ যখন অদম্য ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয় এবং দারুণ কষ্ট পায় তখন সঙ্গীত তার মনের সেই বিষণ্ণতা দূর করে তার স্বাভাবিক জীবনকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষ সংগীতের নানা অবদান সম্পর্কে আগের থেকে আরো বেশী সচেতন হয়ে ওঠে। এখন দেশে দেশে দেহ ও মনের উপর সংগীতের প্রভাব নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। ডাঃ রিচার্ড ব্রাউন তাঁর 'রোগ আর সঙ্গীত' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'স্নায়বিক দুর্বলতা (অস্থিরতা) বা ভারসাম্য-হারান বিষণ্ণ মানুষের উপর সংগীতের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় সংগীত এসব রোগীর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে'। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন ক্রনিক অ্যাজমার (দীর্ঘকালের হাঁপানি) যন্ত্রণা নির্দিষ্ট বিরাম দিয়ে গান শুনিয়ে অনেক কমান যায়।

---

*90/1, কে. এন. সেন রোড, কলিকাতা-700042

ডাঃ বি. সি. ভিউ-ই মনের ওষুধ (সাইকো-ফিজিক) আর মনের উপর ধ্বনির (সাইকো-অ্যাকুস্টিক) নিয়ে গবেষণা করে ডকটরেট ডিগ্রী পেয়েছেন। এই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন মন্দ সংগীত কেমন করে অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এক টানা যৌন সংগীত যৌন বিকৃতি সৃষ্টি করে এবং এই মানসিক রোগ দূর করতে ঐ সব ব্যক্তিদের শেষ পর্যন্ত ওষুধ খেতে হয়। ধূমপান ও আরো বহুতর অপরাধ সৃষ্টি করে নানা ধরণের উত্তেজক আর 'শ্রুতিকটু (ঝাঁকুনি দিয়ে গাওয়া) সংগীত। এই গবেষণায় ডাঃ ভিউ-ই দেখিয়েছেন, বড় ধরণের সোরগোল বা একটানা হৈ-হট্টগোল নাড়ীর গতি বৃদ্ধি করে, স্নায়বিক বিক্ষেভ সৃষ্টি করে, ভাবাবেগে ভারসাম্য নষ্ট করে আর হজমের গোলযোগ এনে দেয়।

মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ একদল বালক নিয়ে এক পরীক্ষা চালান। এই বালক দলকে দুভাগে ভাগ করে তিনি তাদের রেখেছিলেন দুই ঘরে। ঘর দুটো এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে, বাইরের কোন শব্দ ভেতরে আসবে না এবং ভেতরের শব্দও বাইরে যাবে না। তিনি এক ঘরে টেপ করা ফট্‌ফট শব্দ বাজান, অন্য ঘরে শাস্ত্রীয় সংগীত। এরপর তিনি দু'ঘরের ছেলেদের পরীক্ষা করে দেখলেন, ফট্‌ফট্ শব্দ শোনা ছেলেরা, শাস্ত্রীয় সংগীত শোনা ছেলেদের থেকে সব বিষয়েই শতকরা পঞ্চাশটে করে বেশী ভুল করছে।

এটা ভাল ভাবেই পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোমল সংগীত মনের উৎকণ্ঠা আর হতাশার ভাব দূর করে চিত্তের একাগ্রতা আর ঔদার্য এনে দেয় এবং মন্দ প্রভাব নষ্ট করে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে যন্ত্রসংগীতের অবদানও বড় কম নয়। তাল মানুষের হৃদয় পর্যন্ত স্পর্শ করে। এক বালকের মৃগী রোগ ছিল, সে কয়েক পা হাঁটার পর তার নিজের হাত দু'খানা আর কাঁধের উপর তুলতে পারতো না।

শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত হলো তার সাহায্যকারী, ঠিক যেন ভৃত্য। সঙ্গীত শুনে শুনে সে হাঁটা-চলায় এবং ইচ্ছেমত হাত নাড়ার স্বাভাবিকতা ফিরে পেল। এমন কি সাধারণ ছেলেদের মত সে ছেলেদের দলে মিশেও গেল। এবং তার কথার জড়তা চলে গেল। সে হলো সহজ-সুন্দর।

গ্রীকরা মনের বিষণ্ণতা দূর করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীত ব্যবহার করতো। ভারতেও করুণ রাগ সঙ্গীতের একটা মস্ত স্থান আছে, যা মনের স্বাভাবিকতা এনে দিতে সাহায্য করে। সাহাজানপুরের পণ্ডিত শর্মোপাধ্যায় এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। এই শতকের গোড়ায় দিকে তিনি প্রমাণ করেছেন সরোদ বা অনুরূপ যন্ত্র মস্তিষ্কের নানা অংশে নানা রকম ছাপ ফেলে।

সম্প্রতি লাক্ষ্ণৌ-এর সংগীত মহাবিদ্যালয় এবং কলকাতার সরকার পুল (SIRCAR POOL) মানসিক হাঁসপাতালে এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এখনও হচ্ছে। সংগীত-নাটক অ্যাকাডামিও এ বিষয়ে গবেষণা সুরু করেছেন।

দিল্লীর স্টেট কেমিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বুলেটিনের 1979'র মার্চ সংখ্যায় একটা চমকপ্রদ খবর বেরিয়েছে। যুবতী সুনীতা এক দুর্ঘটনায় অচৈতন্য হয়ে হাসপাতালে যায়। কিন্তু দেখতে দেখতে এগার দিন পার হয়ে গেল, তার জ্ঞান ফিরলো না। হতাশ মা-বাবা একেবারে যেন ভেঙে

পড়লেন এবং চিকিৎসকরাও বিভ্রান্ত, তাঁরাও সঠিক কিছু ধরতে বা বলতে পারছেন না। বার দিনের দিন মা মেয়ের অতিপ্রিয় টেপরেকর্ডারটা হাতে করে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। মেয়ের শয্যার পাশে বসে আপন মনে বাজিয়ে দিলেন মেয়ের সব চেয়ে প্রিয় সঙ্গীতটা। মেয়ে ধীরে ধীরে চোখ খুললো—ফুটে উঠলো তার মুখে হাসির রেখা।

হাসপাতালের চিকিৎসকদের মতামত হলো সঙ্গীতই সুনীতার মস্তিষ্কের অচৈতন্য অবশন্নতা দূর করে তাকে সচেতন করেছে। জীবনের ক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে এনেছে।

সঙ্গীত বনের পশু-পাখীদের মুগ্ধ না করলেও মানুষকে করে। সময়ে মানুষের অবসাদ, ক্লান্তি দূর করে আর সারিয়ে দেয় বহুতর ব্যাধি।

পরিবেশ দূষিতকরণ

অলকেশ গোস্বামী*

পরিবেশ দূষিতকরণ প্রকৃতপক্ষে পরিবেশে দূষিত পদার্থের প্রাচুর্যের ফলেই সৃষ্টি হয়। প্রথমে বায়ু দূষিতকরণ বিষয়ে আসা যাক। বিবিধ শিল্পের উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে জ্বালানী-দহন প্রত্যক্ষতঃ বায়ুকে দূষিত করছে। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে নিয়মিত ভাবে বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে। এর মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড অন্যতম। প্রকৃতি তারই মধ্যে এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড অপসারণের একটা উপযোগী ও স্থায়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছে—সবুজ উদ্ভিদ জগতের মাধ্যমে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া দ্বারা। অথচ নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলে, বন কেটে লোকালয় স্থাপন করে আমরা এই স্থায়ী সমাধানের পথকে রুদ্ধ করে তুলছি। ওজন হিসেবে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে প্রায় 2×10^5 কিলোগ্রাম। ষাটের দশকে এই পরিমাণ প্রায় 14 শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাতাসে এই পরিমাণ বাড়ায় মানুষের জীবন বিপন্ন হয় এমনিতেই অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটি অসুবিধে দেখা দেবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশী পরিমাণে অবলোহিত রশ্মি শোষণ করায় পৃথিবীর স্বাভাবিক তাপমাত্রা যাবে বেড়ে—যার অনিবার্য ফল জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। বর্ধিত তাপমাত্রায় মেরু রাজ্যের তুষার গলে যাওয়াও সম্ভব।

বাতাস দূষিতকরণে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে সালফার ডাই-অক্সাইডের। ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে জানা যায় কলকাতার বাতাসে প্রতি-ঘন মিলিমিটারে সালফার ডাই-অক্সাইড আছে 32·88 মাইক্রোগ্রাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রেটব্রিটেনে বছরে প্রায় 60 লক্ষ টন সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই সালফার

*3/43 আইনস্টাইন এভিনিউ, দুর্গাপুর 5

ডাই-অক্সাইড সালফেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কারখানার জ্বালানী দহনে উৎপন্ন এই গ্যাসের প্রভাব ফুসফুস ও শ্বাসনালীর বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সামগ্রিক ভাবে উদ্ভিদ রাজ্য অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আজকাল আমরা ক্লোরোফ্লুরোমিথেন (ফ্রেয়ন) জাতীয় বিভিন্ন ক্লোরিনঘটিত রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করে থাকি। সূর্যালোকের প্রভাবে এই যৌগগুলি ভেঙে গিয়ে ওজন স্তরে আঘাত হানতে পারে। বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্রমাগত এইভাবে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার চলতে থাকলে বায়ুর ওজন স্তরের 16·5 শতাংশ অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাহলে ক্ষতিটা কি হবে? প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি ভূমিকা আছে ওই ওজন স্তরেরও। সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ধরণের তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে, যেমন অতিবেগুনী রশ্মিকে ভূপৃষ্ঠে আসতে দেয় না।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে এই স্তরের।

বিভিন্ন ধরণের হাইড্রো-কার্বন যা জ্বালানী দহনে উৎপন্ন হয়, এদের প্রভাবে মারাত্মক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। বেনজিপাইরেন নামক হাইড্রো-কার্বনের উপস্থিতিতে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

এছাড়া ধুলো, ধোঁয়া হিসেবে বহু বিষাক্ত পদার্থ পরিবেশকে যেমন করে তুলছে দূষিত, তেমনি মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে করে তুলছে বিপদসংকুল। টেট্রাইথাইল লেড, যা আজকাল পেট্রোলের সংগে মেশানো হয় বিমানের জ্বালানী হিসেবে—এর থেকে বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে সীসা মিশ্রিত হয়। এই সীসা গুঁড়ো হয়ে মাটিতে মিশে যায় বা বায়ুবাহিত হয়ে দূরান্তরে নীত হয়। এইভাবে বাহিত হয়ে খাদ্য-পানীয়ের উপরে পতিত হতে পারে এবং কোন ভাবে এই সীসা যদি দেহাভ্যন্তরে গৃহীত হয়, তবে রোগজনক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। সীসার প্রতিক্রিয়ায় মস্তিষ্কের অনুপযুক্ত গঠন, বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে। তবে মুখ্যতঃ এটি উৎসেচকের নিঃসরণে বাধা প্রদান করে।

এর পরে যে-বিষয়ে মানুষ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে সেটা হল জল দূষিতকরণ। মানুষ জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যা ভূপৃষ্ঠে আছে অতি অল্প পরিমাণে, সেই মিষ্ট বা স্বাদু জলকে অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল-বিলের জলকে যেমন ব্যবহারের অযোগ্য করে তুলছে, তেমনি লোনা জল বা সমুদ্রের জলকেও করে তুলছে প্রাণীর জীবনধারণের প্রতিকূল। মানুষ বা স্থলচর প্রাণীদের প্রয়োজন ছাড়াও সমগ্র প্রাণীজগতের একটা বিরাট অংশ যে জলে বাস করে তা আমরা প্রায় বিস্মৃত হয়ে যাই। এর মাশুল অবশ্য গুণতে হবে আমাদেরকেই। সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে দুটি বিভিন্ন উপায়ে জল দূষিত হয়। গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা ও অবহেলার ফলে যাবতীয় ময়লা ও বর্জ্য পদার্থ এই খাল-বিল-পুকুরে ফেলা হয়। জৈব বস্তুর প্রাচুর্য হেতু জীবাণু-কীটাণুর বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিস্থিতিতে জল নষ্ট হয়ে যায়—অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়। শহরাঞ্চলে কলকারখানার আবর্জনা নিয়ে বিষাক্ত জল খালপথে

পাঠানো হয় নদী বা সমুদ্রে। শুধু তাই নয়, সময় সময় এই জল হয় উত্তপ্ত—মিশ্রিত জলও তাই হয়ে পড়ে উত্তপ্ত—জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দেয়। এই সবের পরিণামে দলে দলে মাছও জলজ প্রাণী মারা পড়ে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে কতকগুলি ইওরোপীয় দেশে সমুদ্রাঞ্চলের জলে কারখানার রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জল পতিত হওয়ায় বহু মাছের অস্থি সংস্থানে বিপর্যয় ঘটেছে, বহু মাছের হাড়ের কাঠামো ভেঙে গিয়ে মাছের বংশ নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও চব্বিশপরগণায় গঙ্গার জল এবং দামোদর নদীর জল (দুর্গাপুর ও সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলের জন্য) বিশেষ ভাবে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। পুণ্যতোয়া গঙ্গা এখন স্বল্পতোয়া ক্ষীণকায়া তো বটেই তার উপরে শুধু পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে গঙ্গাতীরবর্তী কলকারখানা থেকে প্রতিদিন 20×10^4 লিটার আবর্জনা নদীতে মেশে। সমুদ্র-জল সহজে দূষিত হয় না ঠিক, তবে অল্প অল্প করে হলেও তা দূষিত হয়। 1967 সালে টরি ক্যানিওন নামে এক তৈলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার দরুণ 120000 টন তেল সমুদ্র জলের সংগে মিশ্রিত হওয়ার লক্ষাধিক প্রাণী বিনষ্ট হয়; এদের মধ্যে বহু সামুদ্রিক পাখীও ছিল।

এর পরে যে ভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তা হল তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা। বৃহত্তর ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিস্ফোরণ ও প্রয়োগ মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়ংকর। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োগ একারণে আন্তর্জাতিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সমগ্র জীবজগৎ এবং মানুষের সুস্থ জীবনধারণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া অতি সাংঘাতিক। সাময়িক এবং দীর্ঘস্থায়ী এই দুধরণের প্রভাবই পড়ে। ক্রোমোজোমের গঠনগত চরিত্র পাল্টে যাওয়াও কিছু অসম্ভব নয়—মিউটেশনও ঘটতে পারে। সাধারণ X-ray বা ঐ ধরণের কার্যকারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোকেদের ব্লাড ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া বংশাণুক্রমে পরিবাহিত হতে পারে। এছাড়া ভ্রূণের গঠনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করে—বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্মও অসম্ভব নয়। মৃত্যু ঘটাও স্বাভাবিক। হিরোসিমার পারমাণবিক বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়া এখনো চলছে। ঐ বিস্ফোরণে বহুলোকতো মারা গিয়েছিলই, সেই সঙ্গে অনেকে লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল, বহু রমণী বিকলাঙ্গ বা মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। আবহাওয়া বা জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাও বিচিত্র নয়।

পরবর্তী পর্যায়ে যা পরিবেশের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করছে এবং পরিবেশকে দূষিত করছে তা হল বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, কীটনাশকের ব্যবহার। কৃষির উৎপাদনকে নিশ্চিত করতে বা উৎপাদনকে বাড়াবার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে আজকাল। এদের ব্যবহার যে সর্বাংশে ফলপ্রদ হয়েছে তা নয়। রাসায়নিক সার ব্যবহারে উৎপাদন বাড়লেও গুণে ও মানে উৎকর্ষের পরিচয় রাখতে পারেনি। আর কীটনাশক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তো অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। আজকাল ক্ষতিকারক জীবাণু বা পেস্ট ধ্বংস করার কাজে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার হচ্ছে। আগাছা ও ছত্রাকদমন, কীটপতঙ্গ নাশের বিষয়ে ডাইঅক্সিন, ক্যালোমেল, ডি. ডি. টি, বি. এইচ. সি ইত্যাদির ব্যবহারে পেস্ট দমন হলেও উপযুক্ত

ভাবে প্রয়োগের অভাবে মারাত্মক রকম ক্ষতির সম্ভাবনা পুরোমাত্রাতে আছে। ডাইঅক্সিনের প্রভাবে বিকলাঙ্গ ভ্রূণ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে এবং ছত্রাক নাশক পদার্থগুলি পুকুর বা নদীর জলে মিশে তাকে দূষিত করে তুলতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় এইগুলির প্রয়োগে খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটতে পারে। আজকাল ডি. ডি. টি-র প্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। ডি. ডি. টি এবং ক্লোরিন যুক্ত হাইড্রোকার্বনগুলি প্রাণিদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটানোতে সক্ষম। বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ম্যালেরিয়া দমনকার্যে প্রযুক্ত ডি. ডি. টি প্রাণিদেহে মাতৃদুগ্ধে হাজির হয়েছে। ইরান, পাপুয়া, নিউগিনি প্রভৃতি স্থানে মাতৃদুগ্ধে অধিক মাত্রাতে ডি. ডি. টি. পাওয়া গেছে। শিশুদেহেও এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণভাবে যে সব প্রাণী প্রোটিনের অভাবগ্রস্ত তাদের পক্ষে এইসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হতে পারে।

সাম্প্রতিককালে অনিয়ন্ত্রিত শব্দের মাত্রাধিক আওয়াজ তাকে পরিবেশ দূষিতকরণের পর্যায়ে ফেলেছে। ক্রমান্বয়ে এইরকম পরিবেশে থাকলে নার্ভীয় ভারসাম্য ব্যাহত হওয়া বা এর ফলে অবসন্নতায় আচ্ছন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম কিংবা ক্যান্সার রোগের আক্রমণ হওয়াও অসম্ভব নয়।

আজকের দিনে পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান সংস্থাগুলি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে অগ্রণী হয়েছেন। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ রয়েছে এবং তা অবিলম্বে প্রয়োজন। কিভাবে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা যায়, তা নিয়ে পরিকল্পিত উপায় উদ্ভাবনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

মাছের ডিম থেকে পোনা চাষের জাহাজ

মাছের ডিম থেকে পোনা চাষের জন্য একটি জাহাজ সোভিয়েট রাশিয়ার আস্ত্রাখানের কাছে ভল্গা নদীতে ভাসানো হয়েছে। এই জাহাজে মাছের ডিম ফোটাবার ব্যবস্থা আছে। যে কোনো আবহাওয়ার অঞ্চলে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রতীর থেকে স্টার্জন, ট্রাউট, স্টারলেট ও সাদা স্যামনের পোনা জন্মানো হবে। জাহাজে আছে সুবৃহৎ জলাধার আর তাতে সঞ্চালিত হতে থাকে নির্ধারিত তাপমাত্রায় অক্সিজেন-সমৃদ্ধ জল। জাহাজটি যেখানে অবস্থান করে সেখানে স্থানীয়ভাবে যা পাওয়া যায় তাই হয়ে ওঠে পোনার খাদ্য। ভাসমান এই কারখানা থেকে প্রতি বছর আড়াই কোটি পোনা জলে ছাড়া যেতে পারে।

করে দেখ

বন্যার স্বয়ংক্রিয় বিপদবার্তা

অজিত চৌধুরী*

নদীতে জলস্ফীতির জন্য প্রায়ই বন্যা হয়। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কোন নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। বিপদসীমার উপর জল উঠে গেলে বাঁধ ভেঙ্গে যাবার সম্ভবনা থাকে, বাধ্য হয়ে জল ছাড়তে হয়। তাছাড়া বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে অথবা বাঁধ উপ্‌চে জল চলে আসতে পারে। কিন্তু জল কখন বিপদসীমা অতিক্রম করবে তা বারবার পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়। কিন্তু এই কাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিম্নলিখিত উপায়ে করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—

(1) একটি লম্বা তড়িৎ-কুপরিবাহী চোঙ (cylinder)।

(2) কিছু সুপরিবাহী তার।

(3) একটি সাইরেন।

(4) তড়িৎ-কুপরিবাহী ভাসমান বস্তু যার উপরে ধাতব প্লেট (যা স্বভাবতঃই তড়িৎ-সুপরিবাহী) থাকবে।

(5) সুইচ

(6) তিনটি ধাতব ইত্যাদি।

চোঙটিকে বাঁধের সঙ্গে এমনভাবে আটকাতে হবে যাতে চোঙের নিম্নপ্রান্ত বিপদসীমার নীচে থাকে। A একটি তড়িৎ-সুপরিবাহী হাল্কা বস্তু যা জলে ভাসতে পারে। এর উপরের দিকে একটি ধাতব প্লেট (C) [চিত্রে মোটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে] থাকবে। A-বস্তুটি দুটি ধারকের উপর থাকবে। A-বস্তুটি উপরে উঠতে পারবে কিন্তু নীচে নামতে পারবে না। ধারক দুটি চোঙের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। উপরের দিকে দুটি ধাতব প্লেট (D_1 এবং D_2) থাকবে, একটু ফাঁক থাকবে উভয়ের মধ্যে। চিত্রের ন্যায় মেনের একটি প্রান্ত যুক্ত হবে একটি প্লেটের সঙ্গে অপর প্রান্ত সুইচ (S), সাইরেন (B) হয়ে অপর প্লেটের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। আগে থেকে সুইচ অন করে রাখতে হবে, যদিও এই অবস্থায় সাইরেন বাজবে না কারণ D_1 এবং D_2 প্লেট দুটি যুক্ত নয়।

নদীর জল খুব নীচে থাকলে A-বস্তুটি জলের সংস্পর্শে থাকবে না (1নং চিত্র)। কিন্তু জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে এক সময় বস্তুটি ভেসে উঠবে। জলের উচ্চতার বৃদ্ধির সাথে বস্তুটিও উপরে উঠতে থাকবে (2নং চিত্র)। A-বস্তুটির জলের উপরের ভাসমান অংশের দৈর্ঘ্য এবং বিপদসীমা ও

---

*কৃষ্ণা ব্লক, রূপশ্রী পল্লী পোঃ—রাণাঘাট, (নদীয়া)

ধাতব প্লেট দুটির মধ্যেকার দূরত্ব সমান হবে। কাজেই জলের উচ্চতা যখন বিপদসীমায় পৌঁছাবে তখন A-বস্তুর উপরের ধাতব প্লেট (C), D_1 এবং D_2 ধাতব প্লেট দুটিকে স্পর্শ করবে (3নং চিত্র).। বর্তনী সম্পূর্ণ (circuit complete) হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সাইরেন বেজে উঠবে। সাইরেনের শব্দ শুনে আশেপাশের জনগণ সতর্ক হতে পারবে।
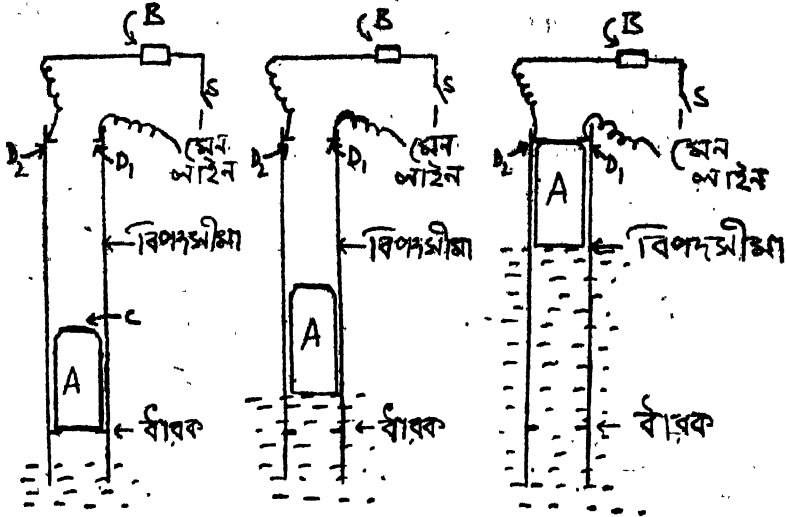
1নং চিত্র 2নং চিত্র 3নং চিত্র

চোঙটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল এই যে, এর সঙ্গে ধারক এবং ধাতব প্লেট দুটি যুক্ত রাখতে হবে। চোঙ থাকার ফলে A-বস্তুটি ভেসে যেতে পারবে না বা এলোমেলোভাবে উপরে উঠতে পারবে না; এটি সোজাসুজি উপরে উঠে এর ধাতব প্লেটের সঙ্গে D_1 এবং D_2 প্লেট দুটিকে যুক্ত করবে। চোঙটি কুপরিবাহী না হলে সুইচ অন করলেই তড়িৎ প্রবাহিত হবে, কারণ নদীর জলে বিভিন্ন লবণ দ্রবীভূত থাকায় নদীর জল তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম।

যেখানে বাঁধ নেই সেখানেও বন্যার বিপদবার্তা দেওয়া সম্ভব। সেক্ষেত্রে নদীতে একটি স্তম্ভ স্থাপন করে তার সঙ্গে সমগ্র ব্যবস্থাটি করতে হবে।

প্রশ্ন ও উত্তর

(ক)

প্রশ্ন : (1) বারমুডা ট্রায়াঙ্গল (BERMUDA TRIANGLE) সম্বন্ধে যে বিস্ময়কর রটনা আছে বিজ্ঞানের চোখে তার সঠিক বিশ্লেষণ কি ?

(2) দানিকেন সম্বন্ধে যে কাকতালীয় বর্ণনা শোনা যায় বিজ্ঞান তার প্রসঙ্গে কি বলে ?

শিবাশিস দত্ত
নৈহাটী

উত্তর : (1) বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে জাহাজ, এরোপ্লেন অদৃশ্য হওয়ার নানা ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। এ সমস্ত ঘটনার জন্যে সেখানে জাহাজ যাওয়া ও প্লেন ওড়া যে বন্ধ হয়েছে তাও নয় [দ্রঃ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, মাইক্রোপিডিয়া (1), পৃঃ 1007- 1977]।

আমেরিকার অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন [দ্রঃ এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকানা, 1977, 3য় খণ্ড, পৃঃ 605]

(2) দানিকেন সম্বন্ধে 'কাকতালীয় বর্ণনা' বলতে প্রশ্ন কর্তা কি বলতে চাইছেন জানি না ; তবে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ও গ্রহান্তরে উন্নততর জীবের আবির্ভাব সম্পর্কে দানিকেনের বক্তব্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

[উত্তর দিয়েছেন যুগলকান্তি রায়]

(খ)

প্রশ্ন : (3) "শব্দ-তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা 20 হার্জ থেকে 20,000 হার্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে মানুষ সেই শব্দ শুনতে পায়। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে 1980)"। ছোটদের বিশ্বকোষে রয়েছে যে, শব্দ সৃষ্টিকারী পদার্থটি কম সে কম সেকেণ্ডে সাতাশ বার কাঁপবে। কোন্‌টি ঠিক ? 20 থেকে 20,000 বার, না 27 থেকে 20,000 বার ?

জয় সেনগুপ্ত
হাওড়া

উত্তর : (3) শ্রাব্য শব্দ-তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে, একটি বিরাট বিস্তৃতির (range) মধ্যে রয়েছে। তার নিম্নতম এবং উচ্চতম সীমা সঠিক ভাবে নিরূপণ করা

সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই বিস্তৃতি কম বেশী পৃথক হতে পারে। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে সেকেণ্ডে 20টি কম্পনবিশিষ্ট শব্দ অনেক ব্যক্তিই স্পষ্ট ভাবে শুনতে পান। উচ্চতর সীমা মোটামুটি 20,000 হার্জ। অবশ্য বয়স বাড়ার সংগে সংগে এই সীমা কমতে থাকে। আবার এও দেখা গেছে যে প্রাণীরা যে সব শব্দ-তরংগ সৃষ্টি করে, তার কম্পন সংখ্যার বিস্তৃতি, তার দ্বারা শ্রাব্য শব্দ-তরংগের কম্পন সংখ্যার বিস্তৃতি থেকে আলাদা।

প্রশ্ন : (4) টর্চের মধ্যে ব্যাটারী সব সময় রেখে দিলে কি ব্যাটারীর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়? সে জন্যে ব্যাটারীর মুখ মাঝে মাঝে উল্টে রাখা বা টর্চ থেকে ব্যাটারী সরিয়ে রাখা দরকার?

সুজন্ত ঘোষ
বাগনান, হাওড়া

উত্তর : (4) ব্যাটারীকে টর্চের মধ্যে রাখলে, সুইচ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, সব সময়েই একটা তড়িৎ-ক্ষরণ (leakage of current or discharge) হতে থাকে, যদিও তার মাত্রা অল্প। আর্দ্রহাওয়ার (moisture) দ্বারা একটি close-circuit তৈরি হয়ে যাওয়ার ফলে এরকম হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালের সময়, যখন বাতাসে জলকণার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, ব্যাটারীর discharge-এর হার বেড়ে যায়। সুতরাং ব্যাটারীর কার্যকারিতা যাতে না কমে, সেজন্য ব্যাটারীকে শুধু টর্চের মধ্যে নয়, কোন রকম ধাতব পদার্থের মধ্যে রাখা উচিৎ নয়।

ব্যাটারীকে কার্যক্ষম রাখার জন্য, টর্চ থেকে ব্যাটারীকে সরিয়ে প্লাস্টিকের মধ্যে জড়িয়ে রাখা দরকার, এর ফলে moisture-এর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং electrolyte-এর জলীয় অংশের বাষ্পীভবন বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে ব্যাটারী dry হতে পারে না। ব্যাটারী dry হতে থাকলে electrolyte-এর composition বদলাতে থাকে এবং এর রোধ বেড়ে যায়—এর ফলে ব্যাটারীর life কমে যেতে থাকে।

[উত্তর দিয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সোম]

(গ)

প্রশ্ন : (5) মুড়ির কোন খাদ্যমূল্য আছে কি?

(6) বমি কেন হয়? কি ভাবে উপরে উঠে আসে?

(7) আঠাযুক্ত বেশী আম খেলে ফোঁড়া হয়—এ রকম কথার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?

(8) পূর্ণিমা, অমাবস্যায় সত্যিই কি বাতের কষ্ট বাড়ে? বাড়লে, কেন বাড়ে?

সিরাজুল হক
চন্দনবাগ, হুগলী

উত্তর : (5) মুড়ির খাদ্যমূল্য অবশ্যই আছে। ভাত, রুটি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় অন্যান্য খাদ্যের সমান উপকারী। পাউরুটি, বিস্কুট, মুড়ি অতি উপাদেয় জলপান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

(6) বমি কি ভাবে উপরে উঠে আসে সেটা আগে বলি। পাকস্থলীতে কোন খাদ্য গেলে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল পেশীর অনৈচ্ছিক আকুঞ্চনে এই খাদ্যদ্রব্যকে গ্রহণীর দিকে নামিয়ে দেওয়া। কিন্তু নানা কারণে ঐ আকুঞ্চন উল্টোদিকে হতে থাকে, তখন ঐ দ্রব্যগুলি গ্রাসনালীর ভিতর দিয়ে উর্ধ্বে উঠে মুখ দিয়ে বের হয়। মধ্যচ্ছদার (diaphragm) পেশী ঐ উর্ধ্বগমনে সাহায্য করে। তিন কারণে বমি হয়।

(i) ক্ষেত্রজ কারণ অর্থাৎ পাকস্থলীতে বিষাক্ত দ্রব্য, গুরুপাকখাদ্য অখাদ্য বস্তুর অবস্থিতি।

(ii) স্নায়ুতন্ত্রবাহিত রিফ্লেক্সের ফলে যথা—মস্তিষ্কের রোগ, অত্যধিক মাথার যন্ত্রণায়, অথবা পেটের মধ্যস্থিত অন্যান্য শরীর যন্ত্রের ব্যথায়।

(iii) জীবাণুঘটিত রোগের বিষক্রিয়ার ফলে যকৃত, বৃক্ক প্রভৃতির প্রদাহে।

(7) আঠাযুক্ত আম খেলে ফোঁড়া হওয়ার বৈজ্ঞানিক বা তথ্যভিত্তিক কারণ নাই।

(8) পূর্ণিমা, অমাবস্যায় বাত বাড়ে এ রকম একটা ধারণা বহুদিন প্রচলিত আছে, ব্যক্তিগত ভাবে তিন দশকের অভিজ্ঞতায় এই ধারণার নিশ্চিত তথ্য পাই নি। একাদশী, অমাবস্যার সঙ্গে ফাইলেরিয়ার প্রকোপের কিছু সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়, এই সম্বন্ধে জেনারাল প্র্যাকটিস করেন এই রকম চিকিৎসকের গবেষণার অবকাশ আছে।

[উত্তর দিয়েছেন হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

(ঘ)

প্রশ্ন : (9) সমুদ্রের জল লোনা, নদীগুলি সমুদ্রে মিশছে। তাহলে নদীর জল লোনা নয় কেন?

বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
খড়গপুর

(10) গাছ কমলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় কেন?

ধ্রুবদাস নাগ
শান্তিপুর, নদীয়া

(11) আমরা জানি বিশ্বজগতের সব কিছুই সঞ্চরণশীল। তাহলে ধ্রুবতারা আকাশের এক জায়গায় সব সময় থাকে কেন—তাকে স্থির নক্ষত্র বলা হয় কেন?

দেবাশীষ আদক
নিউ আলিপুর, কলিকাতা-53

উত্তর : (9) পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, উচ্চ উপত্যকার উপর পতিত বৃষ্টির জল নদী বেয়ে ছুটে চলে সমুদ্রের পানে। এছাড়া পর্বতের উপরের তুষারগলা জল ও হ্রদের সঞ্চিত জল

নদী দিয়ে নেমে আসে। ঐ সব জল লোনা নয় বলে নদীর জলও লোনা নয়। তবে নদী-মোহনার কাছে সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে যেখানে জোয়ার-ভাটা চলে, সেখানে সমুদ্রের জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে যায়। সেই কারণে নদীর ঐ অংশের জল (যেমন সুন্দরবন অঞ্চলের নদনদীর জল) লোনা হয়ে থাকে। অবশ্য বর্ষাকালে যখন পাহাড় থেকে বন্যা নামে, তখন ঐ নদীগুলির জলের লবণাক্ততা যথেষ্ট কমে যায়।

(10) গাছ কমলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় অনেকগুলি কারণে, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) গাছ বৃষ্টির জল তার কাণ্ড, পাতা প্রভৃতিতে ধরে রাখে এবং ঐ জল তার স্বেদগ্রন্থিগুলির সাহায্যে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়, যা বাষ্পীভূত হয়ে আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা ও আর্দ্র রাখে। (খ) মাটির নীচে সঞ্চিত জল শিকড়ের সাহায্যে টেনে নিয়ে অনুরূপভাবে বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। ফলে মাটির গভীরে অবস্থিত জল উপরে উঠে আসে। (গ) গাছ তার ডালপালা বিস্তার করে সূর্যালোককে সরাসরি মাটিতে পড়তে দেয় না। ফলে মাটি সহজে শুষ্ক ও উষ্ণ হয় না। (ঘ) গাছ তার পাতায় অবস্থিত সবুজকণাগুলির দ্বারা সূর্যালোকের সাহায্যে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) থেকে কার্বন সংগ্রহ করে। এই কাজে গাছ সূর্যালোক থেকে বিপুল শক্তি আহরণ করে। ফলে বনাঞ্চলের আবহাওয়া তপ্ত হতে পারে না। (ঙ) প্রাণীকুলের শ্বাসকার্যের ফলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়, গাছ তা আবার কার্বন ও অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে দেয়। গাছ কমলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে বলে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়। (চ) উপরের কয়েকটি কাজের দ্বারা গাছ আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা রাখে এবং গাছ তার ডালপালা ঊর্ধ্বে মেলে ধরে মেঘ থেকে বজ্রপাতে সাহায্য করে। ফলে বনাঞ্চল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

(11) নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি বিশ্ব চরাচরের সব জ্যোতিষ্কই সঞ্চরণশীল। কিন্তু নক্ষত্রগুলি বহু দূরে অবস্থিত (কয়েক আলোকবর্ষ দূরে) বলে এদের সঞ্চরণ সাধারণভাবে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বোঝা যায় না, কেবল সূক্ষ্ম পরিমাপক যন্ত্র দ্বারাই তা মাপা যায়। সেজন্য আকাশের সব নক্ষত্রের পারস্পরিক অবস্থান (relative position) একই থাকে বলে আমাদের মনে হয়। তবে আমরা যে আকাশের সব নক্ষত্রকে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সরে যেতে দেখি প্রতি 23 ঘণ্টা 56 মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তা ঘটে থাকে পৃথিবীর আহ্নিকগতির জন্য। কিন্তু ধ্রুবতারাটি পৃথিবীর অক্ষ বা কাল্পনিক মেরুদণ্ড বরাবর অবস্থান করছে [অর্থাৎ উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারাকে প্রায় মাথার উপর দেখা যায়], পৃথিবীর আহ্নিকগতির ফলে এই তারাটিকে সরে যেতে দেখা যায় না। ফলে ধ্রুবতারাকে স্থির আছে বলে মনে হয়। তবে কয়েক হাজার বৎসর পরে এটিও কিছুটা সরে যাবে এবং পৃথিবীর মেরুদণ্ডের পরিবর্তনও হতে পারে। তখন একে আর ধ্রুবতারারূপে চিহ্নিত করা যাবে না।

[উত্তর দিয়েছেন শিবরাম বেরা]

বিজ্ঞান প্রসার পরিচিতি

(1)

রাজ্য মৌমাছি পালন সম্মেলন

গত 13 ও 14ই জুলাই '80, গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের পরিচালনায় পঃ বঙ্গ রাজ্য মৌমাছি পালন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় গোবরডাঙ্গা খাঁটুরা উচ্চবিদ্যালয়ে। সম্মেলনে প্রায় 225 জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই সভাটিতে খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশনও অংশ নিয়েছিলেন।

সভায় মৌ পালন শিল্পের ব্যাপক প্রসারে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। এই শিল্পের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও প্রসার করার জন্য খাদি কমিশনকে অগ্রণী হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মৌমাছি বাক্স ও অন্যান্য মৌ সরঞ্জাম সহজে পাবার জন্য আরও প্রচুর সংখ্যক মৌ-পালনের সমবায় সমিতি গড়ে তোলার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে মৌমাছি পালনের উপর কোন গবেষণা প্রকল্প নেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানানো হয়েছে। সভায়, মৌ-পালন শিল্পের স্বার্থে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া গাছ কাটা রোধ করা ও নতুন করাতকলের লাইসেন্স না দেওয়ার জন্যে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। বর্ষায় মৌ কলোনীর জন্যে যে চিনি খাদ্য হিসেবে দিতে হয়, রেশন মূল্যে সেই চিনি মৌপালকদের দেবার জন্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে। কীটনাশক ঔষধ বিশেষভাবে মৌমাছিদের জীবন ধ্বংস করছে। এর বিরুদ্ধে কর্মপ্রয়াস গড়ে তোলার জন্যে সকলকে আহ্বান করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ তারক মোহন দাস

গরলগাছা সায়েন্স ক্লাব

27শে জুলাই, 1980 সকালে বনমহোৎসব এবং বৃক্ষরোপণের একটি অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞান ক্লাবকে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ঐদিন বিকেলে ক্লাবের পরিচালনায় একটি কর্মশিক্ষার কেন্দ্রউদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন কলকাতা বিড়লা মিউজিয়ামের লেকচারার শ্রী এম. এস. ঘোষ। সকালের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চণ্ডিতলা 2নং ব্লকের মাননীয় কৃষি আধিকারিক মহাশয়।

পরিষদ-সংবাদ

রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা

বিশ শতকের প্রণম্য পুরুষ রাজশেখর বসু স্মরণে পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত স্মারক বক্তৃতা দেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শঙ্করমোহন চক্রবর্তী 2রা অগাস্ট, 1980 তারিখে। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষা"।

প্রারম্ভে সকলকে স্বাগত জানান কর্মসচিব ডঃ রতনমোহন খাঁ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"সাহিত্যিক হিসাবে যথোচিত সম্মান না পাওয়ায় রাজশেখর বসুর মনে ছিল ক্ষোভ। বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি কি যথোচিত সম্মান পেয়েছিলেন?" ঐদিন ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন। ডঃ চক্রবর্তী প্রথমেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আদর্শ বিজ্ঞান লেখক ও স্বভাষা লেখক আচার্য রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে। এর পর আচার্য রায়ের মন্ত্রশিষ্য রাজশেখর বসুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ডঃ চক্রবর্তী উল্লিখিত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। বহু তথ্য ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে এবং বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বৃত্তিমূলক উচ্চশিক্ষার একটি তুলনামূলক সুস্পষ্ট চিত্র সভায় তুলে ধরেন। যুক্তি, তর্ক ও নানা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আলোচনাটি বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র এবং সভায় শেষে ধন্যবাদ জানান ডঃ দিবাকর মুখোপাধ্যায়।

শারদীয় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1980) বিভিন্ন প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য 4 টাকা মাত্র। এজেন্টগণ সত্বর নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট,
কলিকাতা-700 006
ফোন—55-0660

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথম ভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা: সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন: 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য 2-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 9-10, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

মূল্য : চার টাকা

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

79 খৃঃ ইটালীর ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অতি সুন্দর ও সমৃদ্ধ দুটি শহর পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম সম্পূর্ণরূপে ম্যাগমায় ঢাকা পড়ে সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব ত্রাসের সৃষ্টি করে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ওয়াশিংটনের মাউন্ট সেন্ট হেলেন্স থেকে অনুরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে বলে মনে করছেন। ছবিতে সেন্ট হেলেন্সের জ্বালামুখ থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার উঁচু ভয়াবহ ধোঁয়ার মেঘ দেখা যাচ্ছে।
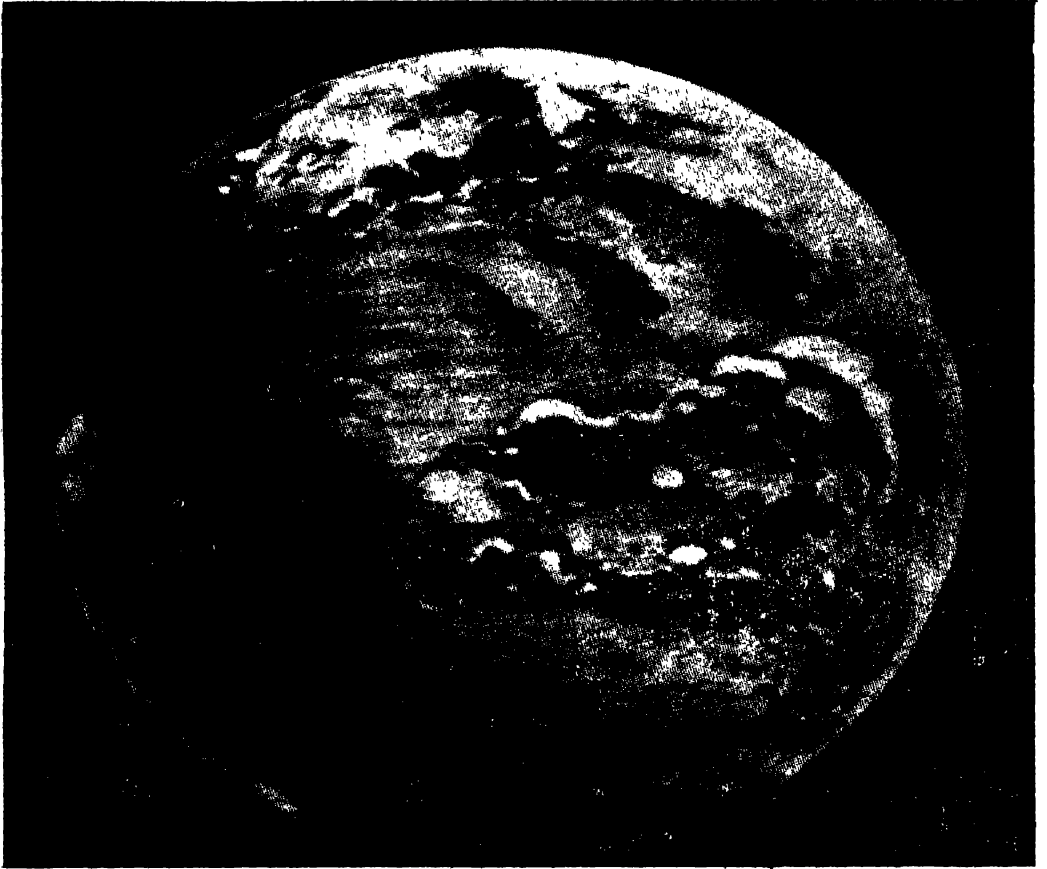
শুক্রগ্রহের এই ছবিটি পাঠিয়েছে ফ্লোরিডার কেপ কেনাভেরাল থেকে উৎক্ষিপ্ত পাইওনিয়ার মহাকাশযান 1978 সালের ডিসেম্বরে। বিশ্লেষণে জানা যায়—শুক্রের পৃষ্ঠে আছে বিরাট বিরাট আগ্নেয়গিরি, বড় বড় ফাটল, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ থেকেও বড় এরকম উচ্চ মালভূমি এবং এভারেস্টের চেয়েও উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ। পৃষ্ঠের প্রায় শতকরা 93 ভাগ মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ   সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1980   নবম-দশম সংখ্যা

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা

জয়ন্ত বসু

শারদীয় উৎসব আসন্নপ্রায়। এই উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ, কিন্তু মতিচ্ছন্ন লোকের উপর যেমন দেবতার জায়গায় অপদেবতা ভর করে, তেমনি আমাদের নীতিভ্রষ্ট সমাজে সংস্কৃতি ক্রমশ অপসংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। সৎ প্রবৃত্তির চর্চা লুপ্ত হচ্ছে, আধুনিকতার ছদ্মবেশে আসর জাঁকিয়ে বসছে এমন সব মনোবৃত্তি, যেগুলি স্পষ্টতঃ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের স্বাক্ষর। তবে প্রকৃতি কোটি কোটি বছরের সাধনায় মানুষ নামে যে আশ্চর্য জীবের সৃষ্টি করেছে, তার প্রাণশক্তি অদম্য; অজস্র ছাই-এর মধ্যে যে আগুন নিভে এসেছে বলে মনে হয়, তা একদিন প্রজ্বলিত হোমশিখার মত অবশ্যই জ্বলে উঠবে।

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য, যে দৈন্য আজ প্রকাশ পাচ্ছে, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির অবক্ষয়েরই তা এক ধরণের প্রতিফলন। স্বাধীনতার পর যত দিন যাচ্ছে, মনের দিক থেকে ততই যেন আমরা পরাধীন হয়ে পড়ছি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, সাম্প্রতিক কালে নানান কারণে ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলগুলির কদর প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে; এই বিষয়ে শহর কলকাতার ছোঁয়াচ গিয়ে পড়েছে মফস্বল শহরগুলিতেও। আমাদের সমাজের উঁচুতলার

মানুষের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত মানুষের যে ব্যবধান, তা ক্রমেই আরো বেড়ে যাচ্ছে—কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সংস্কৃতির দিক থেকেও। অথচ সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যে দরকার সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের যে আদর্শ—মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার—বর্তমান পরিস্থিতিতে তার তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। তবে আমরা জানি ভাঁটার টান চিরকাল থাকে না, আমরা বিশ্বাস রাখি আমাদের সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে। আর তাই রুক্ষ মাটিতে ফুল ফোটার মত প্রতিকূল পরিবেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে যেখানে যত প্রচেষ্টা হচ্ছে, যত আলাপ আলোচনা হচ্ছে, তাদের আমরা স্বাগত জানাই।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা সম্ভব কিনা, এ বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে। এই শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলি কী এবং কিভাবে সেগুলির সমাধান করা যায়, সেই সম্বন্ধে আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনার সূত্রপাত করবো। আমরা আশা করি, এই পত্রিকার পাঠকরা তাঁদের মতামত জানিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন, যাতে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের চর্চা চলে আসছে মাতৃভাষায়। স্বভাবতঃই সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রচলিত। প্রাচীন ভারতেও মাতৃভাষাতেই বিজ্ঞানচর্চা হত, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে ইংরেজ আমলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। তাই ক্ষেত্র হিসাবে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষায় এখনো ইংরেজি ভাষার একাধিপত্য।

আমাদের মনে হয়, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের পথে একটি মুখ্য সমস্যা ও কয়েকটি গৌণ সমস্যা রয়েছে। প্রথমে গৌণ [illegible] একদিকে

1) পাঠ্যপুস্তকের সমস্যা—আমাদের দেশের প্রকাশকরা বাংলাভাষায় উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে আগ্রহী নন, কারণ এই ধরণের বই বেশি সংখ্যায় বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কম। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে যে সচেষ্ট হয়েছেন সেজন্যে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে আমরা মনে করি, তাঁদের আরো বেশি সক্রিয় হওয়া দরকার; দরকার তাঁদের যোগাযোগের ক্ষেত্র আরো অনেকখানি বিস্তৃত করার। বিদেশী ভাষায় যে সব প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক আছে, সেগুলিকে বাংলায় অনুবাদের জন্যও তাঁরা সচেষ্ট হতে পারেন।

2) পরিপূরক পুস্তকের সমস্যা—বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার জন্যে কেবল পাঠ্যপুস্তকই যথেষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কিত বিভিন্ন পরিপূরক গ্রন্থেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই রকম বই বাংলা ভাষার বদলে ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলে তার চাহিদা অনেক বেশি। যাতে এই ধরণের বাংলা বই প্রকাশিত হয়, তার জন্যে যেমন একদিকে রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে উদ্যোগী হতে হবে, তেমনি অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে এ সব বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার।

3) পরিভাষার সমস্যা—উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের বই লিখতে হলে বহু পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এ পর্যন্ত বাংলায় যত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের কিছু কিছু সংকলিত হলেও কোন বিস্তৃত তালিকা এখনো পর্যন্ত তৈরি হয় নি। এই তালিকা তৈরি করতে হলে শুধু কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দায়িত্ব দিলেই চলবে না, তাঁদের সহকারী হিসাবে মোটামুটি শিক্ষিত বেশ কিছু লোককেও একনিষ্ঠ পরিশ্রম করতে হবে।

এর জন্যে যে সংগঠনের দরকার, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন বিজ্ঞান-পরিষদ প্রভৃতির যৌথ উদ্যোগে তা গড়ে তুলতে হবে।

তবে এই তালিকা যতদিন তৈরি না হয়, ততদিন বাংলা ভাষায় উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের বই লেখা বন্ধ করে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। আজ পর্যন্ত যে পরিভাষা সংকলিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এবং নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী প্রয়োজনমত নতুন নতুন পারিভাষিক শব্দ (বা হরফান্তরে বিদেশী পারিভাষিক শব্দ) ব্যবহার করে লেখকরা যদি বই রচনা করেন, তবে সেই সব যথেষ্ট সুপাঠ্য হতে পারে; এইভাবে পরিভাষা তৈরির পথও অনেকাংশে সুগম হবে।

4) শিক্ষাদানের সমস্যা—এখন যাঁরা উচ্চস্তরের বিজ্ঞানের শিক্ষক, তাঁরা নিজেরা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি শিখেছেন। সেজন্যে বাংলায় শিক্ষা দিতে হলে তাঁদের কিছুটা জড়তা আসতে পারে। তবে যে কোন বাঙালী শিক্ষক অনুশীলন করে এই জড়তা সহজেই কাটিয়ে ফেলতে পারেন। যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞানের বই বা প্রবন্ধাদি লেখেন, তাঁদের সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করলে এই কাজটি আরো সহজে হবে।

5) দ্রুত বর্ধমান জ্ঞানের সমস্যা—বিজ্ঞানে নবলব্ধ জ্ঞান অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজিতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয়ে এত বই, এত গবেষণা-পত্র রচিত হচ্ছে যে, সবগুলিকে বাংলায় অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ করা বাস্তব পরিস্থিতিতে অসম্ভব বলেই মনে হয়। অথচ উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত থাকা একান্তই দরকার। এজন্যে যাঁরা বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন, তাঁদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলেও অন্ততঃ স্নাতক স্তর থেকে ইংরেজি ভাষা একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে তাঁদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

বাংলায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের মুখ্য সমস্যাটি সম্বন্ধে এবার একটু আলোচনা করা যাক। পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, শিক্ষান্তে তাঁরা কোথায় কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ কোন্ ভাষায় হচ্ছে? প্রথমতঃ তাঁদের অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ব্রিটেনে গিয়ে সেখানেই স্থায়ীভাবে কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, যাঁরা দেশে থাকছেন, তাঁদের অধিকাংশই যে সব প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, সেখানেও ইংরেজি ভাষাতেই যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। যাঁরা এ দেশে বিজ্ঞানে গবেষণা করছেন, নানান কারণে দেশের মাটির সঙ্গে তাঁদের গবেষণার যোগাযোগ খুব ক্ষীণ। কাজেই মাতৃভাষায় গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করার তাঁদের কোন তাগিদ নেই; উপরন্তু ইংরেজি ভাষায় তাঁদের গবেষণার ফল প্রকাশিত হলে তবেই তা স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে। এই সব কারণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হবে বেশি। সুতরাং শিক্ষার্থী ও তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা প্রায় সকলেই যদি চান যে, বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই হোক, তাহলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাছাড়া প্রায় সকলেই চান সমাজের উপর তলার বাসিন্দা হতে। এই উপর তলার যে তথাকথিত সংস্কৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। এই মুখ্য সমস্যার সমাধান হল এমন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা,

যেখানে দেশের মাটির সঙ্গে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকবে এবং যাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করবেন, তাঁদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে যথাযোগ্য কাজ করবার সুযোগ পাবেন ও কর্মক্ষেত্রে প্রধানতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমে কাজ করবেন। বাস্তব সমস্যার দিকে চোখ বুজে থেকে যদি আমরা কেবলমাত্র আদর্শের দোহাই দিয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করি, তবে তা কখনোই সার্থক বা ফলপ্রসূ হবে না। মুখ্য সমস্যা সমাধানের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা এগুতে থাকি, তবে তার পাশাপাশি গৌণ সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা সত্যিকারের অর্থবহ হয়ে উঠবে।

পূর্ণগ্রাস এবং 'সূর্যের নাচ'

রতনলাল ব্রহ্মচারী*

পুরীতে অল্প অল্প মেঘের মধ্য দিয়ে পূর্ণগ্রাসের মুভী ফিল্‌ম্‌ তুলে ডেভেলপ করতে দিয়েছি। এই সময় একের পর এক বিচিত্র সংবাদ নানা কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল।

গ্রহণের দু-একদিন পরই জানা গেল ভারতীয় ফিল্‌ম্‌স্‌ ডিভিসনের ডিরেক্টর একটি বিবৃতি দিয়েছেন,—তাঁদের ফটোতে ধরা পড়েছে কোণার্কে সূর্য নাকি পূর্ণগ্রাসের সময় অতি দ্রুত কেঁপেছে। কোণার্কের প্রাচীন দেবদেউলে একটা কিংবদন্তী নাকি প্রচলিত ছিল যে এখানে তপনদেবের বিশেষ একটি নৃত্যভঙ্গিমা প্রকাশ পায়। ফিল্‌ম্‌স্‌ ডিভিসনের বক্তব্য তাই কোন কোন মহলে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করল।

এরপর 27.2.80 তে স্টেটস্‌ম্যান ছাপলেন একটি খবর—Strange sight at Puri on February 16, বিরাট একটি ফটো দিয়ে কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের ডিরেক্টর একটি বিবৃতি দিলেন —পূর্ণগ্রাসের সময় সূর্যের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ছটামণ্ডলের ব্যাপ্তি একেবারেই ছিল না। এবছর সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্র খুবই প্রবল এবং ছটামণ্ডলের এ ধরণের চেহারা হতেই পারে না। তাই এর সম্ভাব্য কারণ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা করে ডিরেক্টর মহোদয় একটি থিয়োরী দিলেন। কিন্তু তিনি কতগুলি ফটো তুলেছিলেন এবং তার কটাতে ঐ ধরণের ছটামণ্ডল দেখা যায়, তার কোন উল্লেখ ঐ দীর্ঘ বিবৃতিতে ছিল না। তাঁকে একখানা চিঠি লিখে এ সম্বন্ধে আরও তথ্যাদি জানতে চাইলাম, কোন জবাব পেলাম না।

1.3.80-তে স্টেটস্‌ম্যান ছাপলেন আর একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদ। British Astronomical Association-এর বিজ্ঞানী Mills নাকি বলেছেন 25,000 বছরে পৃথিবী একবার করে কেঁপে ওঠে, এ বছর তাই হয়েছে এবং এজন্যই হয়তো কোণার্কে সূর্যকে কাঁপতে দেখা গেছে। স্টেটস্‌ম্যান থেকে উদ্ধৃতি: This perhpas explains why the sun appeared to dance from the sun temple of Konarak. Even 35 mm colour photographs of the different phases of the eclipse bear eloquent testimony to the wobbling or "dancing" of the Sun. In reality it was the earth that wobbled.

Wobbling বা precession সম্বন্ধে আমরা যা জানি তা মোটেই এ রকম নয়। তবে কি একটা সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কার হল?

এর মধ্যে আমার ফিল্‌ম্‌ এসে গেল। বোঝা গেল প্রথম কয়েক সেকেণ্ড মেঘের স্তর এত ঘন ছিল

*ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলিকাতা-35

যে ফিল্মে কিছুই অলৌকিক-অস্বাভাবিক দেখা গেল সেই বহু প্রার্থিত ছটামণ্ডল এবং শেষ পর্যন্ত "হীরের আংটি"। ছটামণ্ডলের বিরাট ব্যাপ্তি যা খালি চোখে বোঝা গিয়েছিল, তা ফিল্মে অনুপস্থিত—কারণ তার বাইরের দিকটার উজ্জ্বলতা অনেক কম, 25 ASA Kodachrome 40 তে তা ধরা পড়বে না। কিন্তু ছটামণ্ডলের চেহারা দেখলাম কখনও সবদিকে সমভাবে ব্যাপ্ত, কখনও বা অসমান, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সেটা বিড়লা প্লানেটরিয়ামের ডিরেক্টরের তোলা সেই ফটোটির মত।

এর কারণ কি? মেঘের উপস্থিতি বা তপনদেবের তথা পৃথিবীর কোন নৃত্যছন্দ? তখন India To-day পত্রিকায় ফিল্মের ভিডিওনের ছবি ছাপা হয়েছে। দেখা গেল সূর্যের এক অদ্ভুত রূপ যা নিশ্চিতই ক্যামেরা কেঁপে যাওয়ার ফল। ঐ পত্রিকার পরের সংখ্যায় ভারতের এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীও এ কথাই বলেছেন।

কিন্তু Robert Mills এর সেই বিবৃতি? শেষ পর্যন্ত কোথাও কোন সমাধান না পেয়ে তাঁর কাছেই চিঠি লিখলাম। তাঁর উত্তরে তিনি জানালেন I was quite disturbed when I read it, just as I was about to set off on my return to the U.K. and could not rebut the article. The journalist made quite an unjustified sensation out of my talk. (He) gave the impression that at some particular *instant* during 25,000 years, an impressive wobble occurs.

অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যকে একেবারেই বিকৃত করে একটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা।

অতএব বলা যায়, সূর্য নাচে নি, পৃথিবী কেঁপে ওঠে নি এবং ছটামণ্ডল চারদিকে সমভাবেই ব্যাপ্ত ছিল।

সস্তার জ্বালানী

তপেন রায়*
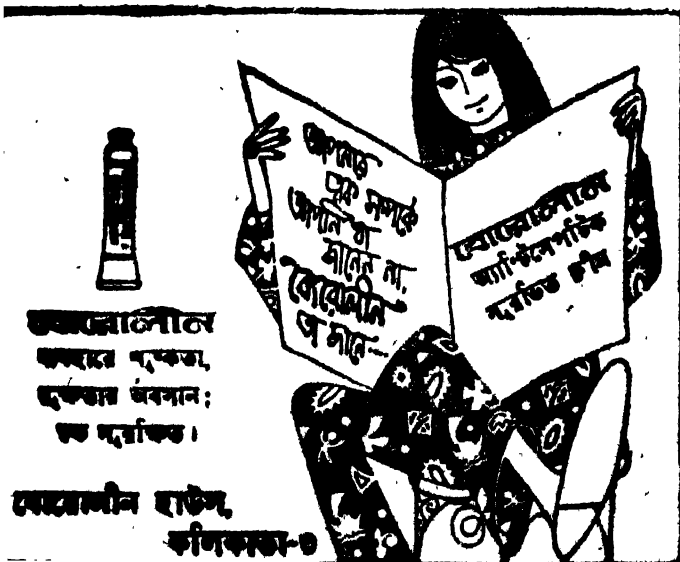
জ্বালানী সংকটের কথা আজ আর নতুন করে কাউকে বলতে হবে না। এরই মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা ভাবে উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলছে, এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে। চেষ্টা চলছে সৌর শক্তিকে কাজে লাগাবার, পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের, পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়া কাজে লাগানোর ইত্যাদির। এগুলি এক ধরণের বড় পরিকল্পনা। এ ছাড়াও আর এক ধরণের পরিকল্পনার কথা ভাবা হচ্ছে যা এক ধরণের রূপান্তর—জ্বালানীর রূপান্তর উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক আমাদের দেশের কথা। আপততঃ আমাদের আছে কয়লা, কিন্তু পেট্রোল জাতীয় সম্ভার খুবই কম। কয়লা জ্বালিয়ে এখনও বেশ কিছু দিন আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব। কিন্তু গাড়ী অর্থাৎ মটর গাড়ী, ট্রাক, বাস ইত্যাদি চলতে চাই পেট্রোল, অথবা ডিজেল বা কেরোসিন। এখন পেট্রোল পাওয়া যায় কি করে? কয়লা থেকে পেট্রোল জাতীয় পদার্থ তৈরি করা যায়—ফিশার ট্রপ্‌শ্‌ রিঅ্যাকশন। জার্মানীতে যুদ্ধের সময় ওরা এভাবে পেট্রোল তৈরি করত। তবে কি, ব্যাপারটা আমাদের এখানে এখনও ঠিক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে করা দুরূহ। এ ছাড়া একটা অন্য উপায়ও আছে। সত্যি কথা বলতে কি গত মহাযুদ্ধের সময় কলকাতাতে, হ্যাঁ, এই কলকাতায় অনেক মিলিটারী মটর গাড়ী চলত কয়লায়, পেট্রোলে নয়—এ আমার নিজের চোখে দেখা। অবিশ্যি কয়লা মানে কাঠকয়লা, আর ঐ কার্বন-এর রূপান্তর ঘটিয়ে পেট্রোলের বদলে ব্যবহার করা হত। সেই সম্বন্ধেই বলছি।

আসল নীতিটা হল অপর্যাপ্ত হাওয়া বা অক্সিজেন দিয়ে কয়লাকে জ্বালালে C ও O রাসায়নিক মিশ্রণে CO_2 না হয়ে হবে CO

$$2C+O_2=2CO$$
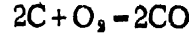
আমরা উনুনে যখন কয়লা জ্বালাই তখন প্রচুর হাওয়া থাকে বলে CO_2 তৈরি হয়

$$C+O_2=CO_2$$
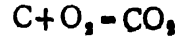
যদি অপর্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়া দিয়ে কয়লা জ্বালিয়ে আমরা CO তৈরি করি এবং পরে যদি ঐ CO পরিমাণ মত হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে মটর গাড়ীর ইন্‌জিনের ভেতর চালিয়ে দিতে পারি তবে পেট্রোলের বদলে এই জ্বালানী ইন্‌জিন চালাতে সক্ষম হবে। ইন্‌জিন চলাকালীন সিলিণ্ডারের ভেতর পিস্টন ওঠা-নামা করতে থাকে, ফলে নামবার সময়ে ইন্‌জিনের কারবুরেটার থেকে ঐ সিলিণ্ডার পেট্রোল ও হাওয়া শুষে নেয়। আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক মত কারবুরেটার থেকে সিলিণ্ডার শুষে নেবে CO ও হাওয়া (O)। সুতরাং ঐ CO এবং হাওয়ার গ্যাসমিশ্রণ আমাদের ঠেলতে হবে না ইন্‌জিনের ভেতর, ইন্‌জিন নিজেই টেনে নেবে। মূল বক্তব্য পেট্রোলের বদলে CO গ্যাস কাজ করছে। এই CO গ্যাসটা তৈরি করা হত একটা বাক্সে, আর সেই বাক্সটা বসানো থাকবে গাড়ীর একদম পেছনে বাম্পার-এর ওপর। ঐ বাক্সের মাথা থেকে একটা পাইপ চলে আসত কারবুরেটার অবধি। বাক্সের তলায় থাকত ফুটো যার মুখ করা যেত ছোট বড়, খুশীমত একটা কল ঘুরিয়ে। তাতে বাক্সের ভেতর কম-বেশী হাওয়া ঢুকতে পারত।

ইন্‌জিন চলাকালীন যে শোষণ তা আসলে বাক্সের নীচের ঐ ফুটোর ভেতর দিয়ে হাওয়া

*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

টানত। দুটোর মুখ ছোট করে অপর্যাপ্ত হাওয়া বাক্সে ঢুকছে। এখন কথা হচ্ছে, বাক্সের ভেতর আছেটা কি? বাক্সে থাকত কাঠকয়লা—জলন্ত কাঠকয়লা। বাক্সের ভেতর অপর্যাপ্ত অক্সিজেন এবং জলন্ত কয়লা আছে সুতরাং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হল CO কার্বন মনক্সাইড। এই CO সঠিক কারবুরেটারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় (সিলিণ্ডারের টানের চোটে) আবার পরিমাণ মত হাওয়ার সঙ্গে মিশে সিলিণ্ডারের ভেতর ঢুকত। ফলে ইন্‌জিন ক্রমাগত চলতেই থাকত।

কতকগুলো কথা মনে রাখতে হবে। যেমন, বাক্সটা চারদিক আঁটাসেঁটা। বাক্সর ভেতর হাওয়া ঢুকছে বলে, বাক্সর ভেতর থেকে যে গ্যাস বেরোচ্ছে তাহল $CO+N_2$ (মূলতঃ)। শুরু করার সময়ে বাক্সর ভেতর কয়লাটাকে ধরাতে হবে উনুন ধরানোর মত। অবিশ্যি তার জন্যে বেশ উন্নত ধরণের সুবন্দোবস্ত থাকত। ইন্‌জিনকেও চালানোর সময়ে প্রথমে একটু পেট্রোল নিতে হত। কয়লা পুড়ে পুড়ে যে ছাই হত তাও নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকত। আমি এখানে যা বললাম সেটা মূল বক্তব্য। আসলে এর ভেতর আরও অনেক খুঁটিনাটি আছে।

যে গ্যাস দিয়ে ইন্‌জিন চালানোর কথা বললাম তার নাম প্রডিউসার গ্যাস। কিন্তু যদি জলন্ত কয়লার ভেতর স্টীম পাঠানো যায় তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হবে,

$C+H_2O=CO+H_2$ অর্থাৎ কার্বন মনক্সাইড ও হাইড্রোজেন। মজাটা এই—এর ভেতর কোনও নাইট্রোজেন নেই। CO এবং H_2 দুটোই জ্বালানী কিন্তু N_2 নিষ্ক্রিয়। এই $CO+H_2$ মিশ্রণের নাম ওয়াটার গ্যাস। এতে ইন্‌জিন দারুন চলবে। কিন্তু। কিন্তু ব্যাপারটা এই যে খানিকক্ষণ স্টীম চলার পর জলন্ত কয়লা ঝিমিয়ে আসবে ও পরে নিভে যাবে। সেজন্য করা হয়, খানিকক্ষণ পুরো হাওয়া দিয়ে কয়লাটাকে গনগনে করে তবে স্টীম চালানো হয়। আবার যেই ঝিমিয়ে এলো তখন আবার হাওয়া দিয়ে লাল টক্‌টকে করে ফেলা। ঠিক এই প্রক্রিয়া গাড়ীর পক্ষে অনুপযোগী। এজন্য কখনও কখন প্রডিউসার গ্যাস তৈরির সময়ে সামান্য স্টীমও চালানো হয় এবং সেজন্য হাওয়ার ঢোকাটাকেও পরিমিত করতে হয়। তাতে CO, N_2 ও কিছু পরিমাণ H_2 মিশ্রণ তৈরি হয়। এই গ্যাসকে সেমিওয়াটার গ্যাস বলে।

নীচে মিশ্রণের পরিমাণ দেওয়া হল,

	H_2	CH_4	CO	CO_2	N_2
প্রডিউসার গ্যাস—	5	2	29		62%
ওয়াটার গ্যাস—	49	$\frac{1}{2}$	42		$4\frac{1}{2}$%
সেমিওয়াটার গ্যাস—	14	3	27		52%

কার্বন অক্সিজেন কিংবা কার্বন স্টীম-এর রাসায়নিক মিশ্রণের সময় উদ্ভূত তাপের পরিমাণ নীচে দেওয়া হল।

$$C+\tfrac{1}{2}O_2 = CO+29000\ \text{Cal.}$$
$$C+O_2 = CO_2+96960\ \text{Cal.}$$
$$C+H_2O = CO+H_2-29000\ \text{Cal}$$
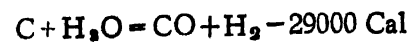
ইউরোপে ও বৃটেনে এককালে বহু জায়গায় প্রডিউসার গ্যাস চালিত ইন্‌জিন ব্যবহৃত হত। লণ্ডন গ্যাস অ্যাণ্ড লাইট কোম্পানী এককালে ওয়াটার গ্যাস বিরাট বিরাট সিলিণ্ডারে সঞ্চয় করে তা সারা সহরে সরবরাহ করত। অবিশ্যি গ্যাসটাতে ওরা একটু ক্রুড অয়েল মেশাত যাতে গ্যাস জ্বালালে আলো হয়, কারণ ওরা আলোর জন্যই গ্যাস সাপ্লাই করত। লণ্ডন গ্যাস কোম্পানী কিন্তু কয়লা থেকেই ওয়াটার গ্যাস তৈরি করত। কাঠকয়লা থেকে নয়। আমরা আজ কলকাতায় কেন যে ওয়াটার গ্যাস বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করছি না। পাওয়ার কাট্ হলেও জেনারেটার চালানো কত সহজ হত,

আর কত কম খরচা পড়ত, আর কত কম মেহনতে হতো।

খরচের দিক থেকে চিন্তা করলে প্রডিউসার গ্যাস দিয়ে ইনজিন চালাতে খরচ খুবই কম, মানে পেট্রোল দিয়ে চালানোর তুলনায়। সেদিক থেকে প্রডিউসার গ্যাস কিংবা ওয়াটার গ্যাস সস্তার জ্বালানী। প্রডিউসার গ্যাস চালিত ইনজিনের একটা চিত্র এই সঙ্গে দেওয়া হল পাঠকদের সুবিধার্থে।

দিয়ে আমাদের কত উপকারী। গ্রামের ও শহরের লোকের কত কাজে যে আসে তা বলে শেষ করা যায় না। দামের দিক থেকেও এগুলো সস্তা হওয়া উচিত।

একটু যত্ন নিয়ে তৈরি করলে শুধু স্টীম ইনজিনের অংশটা তৈরি এমন কিছু একটা হাতীঘোড়া নয়। যেটা তৈরি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে সেটা হল বয়লার। কয়লাই হবে জ্বালানী। ডিজেল,
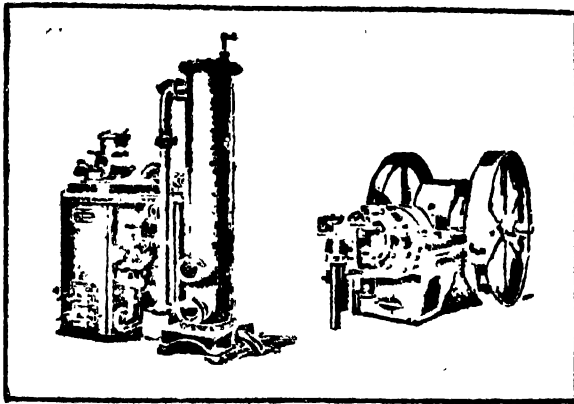
প্রডিউসার গ্যাস চালিত ইনজিন

আগেকার দিনে এমন কি চল্লিশের দশকেও কলকাতায় রাস্তা তৈরির কাজে যে রোড-রোলার ব্যবহৃত হত সেগুলো চলত কয়লা জ্বালিয়ে। ছোট স্টীম ইনজিন। আজকের দিনে যখন পেট্রোল, ডিজেল এসব জ্বালানীর সঙ্কট তখন কয়লা চালিত স্টীম ইনজিন—বিশেষ করে ঐ ধরণের ছোট ছোট স্টীম ইনজিন আমাদের স্বস্তির দূত। প্রফেসর ব্ল্যাকেট, চল্লিশের দশকে ভারতবর্ষে এসে এখানকার উন্নতিকল্পের বিষয়, বিশেষ করে গ্রামীণ উন্নতির পর্যালোচনা করেন। প্রফেসর পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি ভারত থেকে ইংলণ্ডে গিয়ে এদেশের জন্য ছোট ছোট স্টীম ইনজিন ম্যানুফ্যাকচার করিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সে সব কেনে নি। প্রফেসর সমর মিত্র, প্রাক্তন ইলেক্‌ট্রনিকস ডিভিসনের প্রধান, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে সরেজমিনে তা দেখে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই আমার এসব শোনা। $\frac{1}{4}$ হর্সপাওয়ার, 1, 2, 3, 5 হর্সপাওয়ার স্টীম ইনজিন আজকের

পেট্রোলের ওপর থেকে মোহ কাটাতে হবে আর কয়লাকে করতে হবে আপন, তবেই না জ্বালানী হবে সস্তা। বয়লার খুব ভাল করতে পারলে স্টীম টারবাইন ইনজিনও চালানো যায়। থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে তো ঐ ভাবেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তবে যন্ত্রপাতি সবই বিদেশী।

যেখানে গ্যাসটারবাইন ব্যবহার হচ্ছে বিদ্যুৎ তৈরির কাজে, সেখানে আমরা পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহার করছি ডিজেল। আমার মতে ডিজেল ব্যবহার বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। ব্যবহার হওয়া উচিৎ গ্যাস অর্থাৎ প্রপেন, বিউটেন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াটারগ্যাস খুবই উপযোগী।

পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের বর্তমানে কয়লাই বিপদের বন্ধু ও কয়লাই উন্নতির সোপান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লার বহু রকম ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে। পারে বেকারত্ব এবং দ্রব্যমূল্য কমাতে। জ্বালানী হিসাবে কয়লার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার না করা মানে—"বিদেশের কুকুর ধরি দেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

একটি বৃক্ষের মূল্য পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকা

তারকমোহন দাস*

'মূল্য' কথাটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। কোন বস্তুর সঠিক মূল্য নির্ধারণ করবার কোন উপযুক্ত পদ্ধতি আমরা আজও আবিষ্কার করতে সমর্থ হই নি। অনেক সময় বস্তুটির চাহিদা ও যোগান (Demand and supply) অথবা তার উৎপাদন ব্যয় ও উপকারিতার কথা (Cost and benefit) চিন্তা করে একটা মূল্য স্থির করা হয়, কিন্তু তার মধ্যেও অনেক মারাত্মক ভুল ও গোঁজামিল থেকে যায়। বহু ক্ষেত্রে অনেক 'উপকারিতার' কথা আমরা চিন্তাই করি না। প্রাকৃতিক সম্পদগুলির ক্ষেত্রে এটা বেশী দেখা যায়। আমরা যখন এক জোড়া বলদের মূল্য স্থির করি তখন তার কাছ থেকে কি 'উপকার' পাওয়া যাবে, কতটা শক্তি পাওয়া যাবে তার ওপর নির্ভর করে একটা মূল্য স্থির করি। কিন্তু যখন একটি বৃক্ষের মূল্য স্থির করি তখন কেবল তার কাঠের ওজন, কাঠের মান ও ফলের পরিমাণের কথাই ভাবি, ঐ বৃক্ষের কাছ থেকে কাঠ ও ফলফুল ছাড়া আমরা আরও যে সব নানারকম 'সামাজিক উপকার' (social service) পাচ্ছি তার মূল্য কিন্তু আদৌ হিসাব করি না।

এই প্রবন্ধের লেখক এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা যেমনই বিস্ময়কর তেমনিই অর্থবহ। বৃক্ষকে ওজন হিসাবে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 'ছোট বৃক্ষ'—যার ওজন, কাণ্ড, ডাল-পালা, শিকড়, ফল-ফুল, পাতা সব নিয়ে পাঁচ মেট্রিক টনের মধ্যে থাকে; 'মাঝারি বৃক্ষ'—পাঁচ থেকে পঞ্চাশ মেট্রিক টনের মধ্যে এবং 'বড় বৃক্ষ' পঞ্চাশ মেট্রিক টনের বেশী হয়ে থাকে। জিমনোস্পার্ম জাতীয় বৃক্ষের ওজন সাধারণতঃ খুব বেশী হয়, সবচেয়ে বিরাট ওজনের গাছ এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে তা ঐ জিমনোস্পার্ম জাতীয়—যার ওজন 6167 টন,—একটি মোটামুটি সমুদ্রগামী জাহাজের থেকেও ভারী। পৃথিবীর দীর্ঘতম বৃক্ষটির উচ্চতা 364 ফুট, এটিও জিমনোস্পার্ম শ্রেণীর কোস্ট রেড-উড্ (Coast Red Wood,—Squoia sempervivens)।

একটি মাঝারি সাইজের বৃক্ষ যার ওজন পঞ্চাশ মেট্রিক টন তা যদি আমাদের পরিবেশের মধ্যে পঞ্চাশ বছর ধরে বেঁচে থাকে, তাহলে তার কাছ থেকে আমরা যে সব 'সামাজিক উপকার' লাভ করব,—যেমন অক্সিজেনের যোগান, প্রোটিন উৎপাদন, মাটির ক্ষয়রোধ, আবহাওয়ার তাপ ও আর্দ্রতা রক্ষা, বায়ুর উপাদানগুলির সমতা রক্ষা ও দূষণ নিবারণ ইত্যাদি—এইগুলির বর্তমান বাজার দর,—খুব কম করে হিসাব করলেও দাঁড়াবে 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা। এর মধ্যে কাঠের মূল্য ধরা হয় নি, কাঠের মূল্য যোগ করলে আরও পাঁচ হাজার টাকার মত বাড়বে (এটা গড়পড়তা মূল্য)। এই পাঁচ হাজার টাকা মূল্যেই সাধারণতঃ ঐ বৃক্ষ বাজারে বিক্রী হয়ে যায়,—যা লেখকের হিসাব মত বৃক্ষের প্রকৃত মূল্যের শতকরা 0·3 ভাগ মাত্র, অর্থাৎ বৃক্ষের শতকরা 99·7 ভাগ মূল্য সম্পর্কে আমাদের সমাজ ও জনসাধারণ সম্পূর্ণ অচেতন, তার কোন মূল্যই আমরা ধরি না।

লেখক কি পদ্ধতি অবলম্বন করে একটি মাঝারি বৃক্ষের প্রকৃত মূল্য স্থির করেছেন, তার বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

অক্সিজেন উৎপাদন—বৃক্ষের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় যখন গ্লুকোজের একটি অণুর সংশ্লেষ ঘটে তখন ছয়টি অক্সিজেন অণু উৎপন্ন হয়। বৃক্ষের শ্বসনকার্যে কিছুটা অক্সিজেন ব্যয় হয়, কিন্তু ব্যয়ের

*লাইফ সায়েন্স সেন্টার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 35, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-700 019

পরিমাণ উৎপাদনের থেকে অনেক কম, সুতরাং অতিরিক্ত অক্সিজেন বাতাসে যোগ হয়। একটি 50 টন ওজনের মাঝারি আকারের গাছ প্রতি বছর অন্ততঃ এক টন অক্সিজেন (প্রজাতি ও পরিবেশের বা নির্ভরশীল) উৎপন্ন করে। বর্তমানে প্রতি কেজি পাঁচ টাকা হিসাবে এক টন অক্সিজেনের বাজার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। এই গাছটিকে যদি পঞ্চাশ বছর বাঁচিয়ে রাখা যায় তবে তার উৎপাদিত অক্সিজেনের মূল্য দাঁড়ায় দু-লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমরা প্রতিদিন শ্বসন এবং কাঠ, কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের দহনের মাধ্যমে প্রচুর অক্সিজেন ব্যয় করে থাকি কিন্তু কোনদিন তা পূরণ করি না, পূরণের কথা চিন্তাও করি না, আমাদের অগোচরেই উদ্ভিদ এটা পূরণ করে থাকে। উদ্ভিদের মূল্য নিরূপণের সময় তার দেহজাত এই অক্সিজেনের মূল্য অবশ্যই গণনা করা প্রয়োজন।

প্রোটিন রূপান্তর সাধন—একটি 50 টন ওজনের গাছের পাতা খেয়ে দুটি ছাগলছানা অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। এক বছরের মধ্যে দুটি ছাগলছানার ওজন বাড়বে অন্ততঃ 25 কে.জি। 16 টাকা হিসাবে মাংসের কে.জি ধরলে 25 কে.জি মাংসের মূল্য চারশো টাকা, সুতরাং, পঞ্চাশ বছরে মোট প্রাণীর প্রোটিন পাই কুড়ি হাজার টাকা।

ভূমিক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বজায় রাখা—একটি মাঝারি আকারের বৃক্ষ মাটির গভীরে মূলের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অন্ততঃ 30′×30′= 900 বর্গ ফুট মাটির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকে ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করে। কাটিতে ফল, ফুল, পাতা ঝরে মাটির জৈব সারের পরিমাণ বাড়ায়। ক্ষয়িত মাটিকে নদীর গভীর অথবা বাঁধের মধ্যে জমতে দেয় না, নদী ও বাঁধের জলধারণের ক্ষমতা নষ্ট হয় না, এতে বন্যা নিবারিত হয়। বৃক্ষের এই স্বাভাবিক কাজ যদি আমরা কৃত্রিম উপায়ে জন মজুর লাগিয়ে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করে করতে যাই তাহলে 900 বর্গফুট জমির উর্বরতা রক্ষা ও ভূমিক্ষয় নিবারণের জন্য বছরে অন্ততঃ খরচ হবে পাঁচ হাজার টাকা এবং পঞ্চাশ বছরে দু-লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।

জলের পুনরাবর্তন (Recycling), বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ— উদ্ভিদেহে এক গ্রাম মাত্র শুষ্ক ওজন (Dryweight) যখন বাড়ে তখন 300 থেকে 1000 গ্রাম জল বাষ্পের আকারে পাতা থেকে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়। এর ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়, বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা বাড়ে, মেঘ ও বৃষ্টি হয়। বৃক্ষের এই প্রস্বেদন (Transpiration) ক্রিয়ার সাহায্যে জলের পুনরাবর্তন দ্রুত হয় এবং পরিমাণও বেশী হয়, কেননা মাটির নীচের স্তরের জল বাতাসে গিয়ে মেশে। বৃক্ষের এই স্বাভাবিক ভূমিকাটি আমরা নিজেদের হাতে যদি তুলে নেই তাহলে ইলেট্রিক পাম্পের সাহায্যে ভূগর্ভের সঞ্চিত জল তুলে বায়ুমণ্ডলে মিশিয়ে দিতে বিরাট ব্যয় হবে। ইলেকট্রিক লাইন ও পাম্প বসানোর মূলধনী খাতে বিরাট ব্যয়ের কথা বাদ দিলেও প্রতি বছর শুধু শক্তি (Energy) ও তদারকী খাতে ব্যয় হবে বৃক্ষপিছু অন্ততঃ ছয় হাজার টাকা এবং পঞ্চাশ বছরে তিন লক্ষ টাকা।

পাখি এবং অন্যান্য জীবের আশ্রয়স্থল— একটি মাঝারি আকারের বৃক্ষের ওপর গড়ে দশজোড়া পাখি, ছয় জোড়া কাঠবেড়ালী, অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, মৌমাছি এবং ছোট ছোট অপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন মস্, ছত্রাক, লাইকেন এবং সপুষ্পক অর্কিড আশ্রয় পায়। এই সব আশ্রিত উদ্ভিদ ও প্রাণী নানা ভাবে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে,— যেমন পাখিরা শস্যক্ষেত্রের ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ দমন করে থাকে, মৌমাছিরা মধু তৈরি করে এবং পরাগ সংযোগে সাহায্য করে। এই সব পাখি, কাঠবিড়ালী, কীট-পতঙ্গ, মৌমাছি ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদকে যদি বৃক্ষের পরিবর্তে কৃত্রিম আশ্রয়স্থল তৈরি করে নিয়মিত ভাবে লালনপালন করতে হত, তাহলে মূলধনী খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যয়ের হিসাব বাদ দিলেও শুধু

তদারকীর জন্য বছরে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হত, এবং পঞ্চাশ বছরে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হত।

বাতাসের দূষণ নিয়ন্ত্রণ—বৃক্ষের অসংখ্য পাতার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্রের সাহায্যে আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর গ্যাসীয় পদার্থ যেমন সালফার, কার্বন ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডকে শোষণ করে বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখে। এছাড়া বাতাসে ভেসে বেড়ানো বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা, ভুষোকালি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর অতি সূক্ষ্ম অংশ, অ্যাসবেসটস প্রভৃতি পদার্থ পাতার গায়ে আটকে রাখে, পাতার দু-পিঠেই তা জমা হয়, তার ফলে বাতাস পরিচ্ছন্ন হয়। পৃথিবীর বাতাসকে ব্যাপকহারে পরিশুদ্ধ করবার মত কোন ব্যবস্থা আমরা আজও করতে পারি নি। বৃক্ষের পরিবর্তে গ্রামে বা শহরের মধ্যে স্থাপন করা যেতে পারে এমন কোন দূষণ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রও আমাদের হাতে নেই। ঐ যন্ত্রের উদ্ভাবন, উৎপাদন এবং স্থাপনের একটা ব্যয়ও আছে। তাছাড়া সারা বছর সেটা চালাবার জন্য শক্তি ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। শক্তির ব্যবহার মানেই পরিবেশ দূষণ, অর্থাৎ যন্ত্রটি চালাবার সময়ও বেশ কিছুটা দূষণের সৃষ্টি হবে। সারা বছর যন্ত্রটি চালাবার জন্য শুধু শক্তি ও শিক্ষিত কর্মীর পেছনে ব্যয় হবে অন্ততঃ দশ হাজার টাকা (বৃক্ষ পিছু) এবং পঞ্চাশ বছরে তা পাঁচ লক্ষ টাকায় গিয়ে দাঁড়াবে।

ফুল, ফল, এবং কাঠের মূল্য বাদ দিয়ে একটি পঞ্চাশ টন ওজনের বৃক্ষ থেকে পঞ্চাশ বছরের জীবনকালে যে কাজ পাওয়া যায় তার মূল্য হচ্ছে—

1.	অক্সিজেন উৎপাদন—	2,50,000 টাকা
2.	প্রোটিন রূপান্তর সাধন—	20,000 „
3.	ভূমিক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বজায় রাখা	2,50,000 „
4.	জলের পুনরাবর্তন, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ—	3,00,000 „
5.	পাখি এবং অন্যান্য জীবের আশ্রয়স্থল—	2,50,000 „
6.	বাতাসের দূষণ নিয়ন্ত্রণ	5 00,000 „
	মোট	15,70,000 টাকা

(পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকা)

আমরা যখন কোন বৃক্ষের মূল্য স্থির করি তখন এই পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকার মত যে কাজ বা সারভিস (Service) তার কাছ থেকে পাই সেটা হিসাবের মধ্যেই গণ্য করি না,—তার বদলে বৃক্ষের প্রতি আমাদের মনে যে-মূল্যবোধ থাকা উচিত ছিল তা কোনদিন সৃষ্টিই হয় নি। এই পনের লক্ষ সত্তর হাজার সংখ্যাটি খুব বিরাট মনে হতে পারে, কেননা এই টাকায় আজ 12 কেজি খাঁটি সোনা কেনা যায় (প্রতি 10 গ্রাম সোনা 1,300 টাকা হিসাবে) অথবা একটি বিরাট প্রাসাদের মালিক হওয়া যায়,—কিন্তু সম্ভাব্য সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন করে এই মূল্য স্থির করা হয়েছে এবং একটি মাঝারি আকারের বৃক্ষের এটাই সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মূল্য,—কেননা, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বৃক্ষের পরিবর্তে ইলেকট্রিক পাম্প সেট ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের কৃত্রিম যন্ত্র কেনার মূলধনী খরচ এই হিসাবের মধ্যে গণ্য করা হয় নি, কেবলমাত্র ঐ যন্ত্রগুলি চালাবার খরচটাই ধরা হয়েছে, তা ছাড়া একটি বৃক্ষের আয়ুকাল সাধারণতঃ 100 থেকে 200 বছর কিংবা তার থেকেও বেশী হয়ে থাকে,—এখানে একটি বৃক্ষের মাত্র 50 বছর জীবনকালের সারভিসের হিসাবই ধরা হয়েছে, সুতরাং একটা বড় রকম মারজিন (Margin) এখানে রাখা হয়েছে কারেকশন ফ্যাক্টার (Correction factor) হিসাবে, তাই একটি মাঝারি আকারের 50 টন ওজনের বৃক্ষের প্রকৃত মূল্য পনের লক্ষ সত্তর হাজার টাকার কম কিছুতেই হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের জানা দরকার ঐ বৃক্ষের কাছ থেকে যে সমস্ত সারভিস বা উপকার পাওয়া যায় তা কোনক্রমেই ঐ বৃক্ষের মালিকের একার ভোগের সম্পত্তি নয়, তা স্থানীয় প্রতিটি মানুষ ও পশু-পাখির ভোগের বিষয়, বৃক্ষের মালিকের দখলে থাকে মাত্র ফুল-ফল ও কাঠ যার মূল্য বৃক্ষের প্রকৃত মূল্যের শতকরা 0 3 ভাগ মাত্র। সুতরাং একটি গাছকে যখন বিনষ্ট করা হয় তখন যে ক্ষতি হয় তার প্রায় সমস্তটাই স্থানীয় জনসাধারণকে সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হয় এবং শ্রম ও অর্থের সাহায্যে ঐ ক্ষতি সহজে পূরণ হয় না, কেননা একটি বৃক্ষকে বড় করে তুলতে বহু সময় ব্যয় হয় এবং যতদিন না একটি বৃক্ষ সেখানে বড় হয়ে উঠছে ঐ ক্ষতি সমানে চলতেই থাকে।

অন্তর্বিবাহ কি ক্ষতিকারক ?

অরুণকুমার রায়চৌধুরী*

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে অর্থাৎ উভয়েরই তিন-চার পর্যায়ের আগে অন্ততঃ একজন সাধারণ (common) পূর্বপুরুষ থাকে, তাহলে তাদের বিবাহকে অন্তর্বিবাহ বা আত্মীয় বিবাহ বলে। কাজিন (Cousin) ও মামা-ভাগ্নী বিবাহ অন্তর্বিবাহের অন্তর্ভুক্ত। কাজিন দুই প্রকার—সমান্তরাল কাজিন (parallel cousin) এবং বিষম কাজিন (cross cousin)। দুই ভাই অথবা দুই বোনের ছেলেমেয়েদের বিবাহকে সমান্তরাল কাজিন বিবাহ এবং ভাইয়ের ছেলে ও বোনের মেয়ে অথবা বোনের ছেলে ও ভাইয়ের মেয়ের বিবাহকে কাজিন বিবাহ বলে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে কাজিন ও মামা-ভাগ্নীর বিবাহ প্রচলিত। এই অন্তর্বিবাহের প্রকৃতি হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ভিন্ন। হিন্দুরা সাধারণতঃ বিষম কাজিন অর্থাৎ মামাতো ও পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে। তবে পিসতুতো বোন অপেক্ষা মামাতো বোনকে পাত্রী হিসাবে বেশী নির্বাচিত করে। কখনও মা-র সৎ-ভাইয়ের মেয়ে অথবা বাবার সৎ-বোনের মেয়ের সঙ্গেও বিবাহ দেখা যায়। মুসলমানরা সমান্তরাল ও বিষম কাজিন অর্থাৎ জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতো ও পিসতুতো বোনকে বিবাহ করে। হিন্দু সমাজে অনেক সময় মামারা তাদের বড় বোনের মেয়েকে বিবাহ করে কিন্তু মুসলমান সমাজে মামা-ভাগ্নীর বিবাহ বিশেষ প্রচলিত নেই।

অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরীতে হিন্দুদের মধ্যে যে অন্তর্বিবাহ প্রচলন আছে তার প্রকৃতি ও শতকরা হার প্রায় একই রকম। এই সব প্রদেশে সমগ্র বিবাহের 30-35 শতাংশ আত্মীয়দের মধ্যে ঘটে, তার মধ্যে 5-10 শতাংশ মামা-ভাগ্নীর সঙ্গে এবং বাকী অংশ মামাতো ও পিসতুতো বোনের সঙ্গে। শিক্ষার প্রসারে ও খৃস্টান ধর্মের প্রভাবে কেরালায় হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান সমাজে অন্তর্বিবাহের হার কম।

অন্তর্বিবাহের নানা কারণ উল্লেখ করা হয়। জমি বা সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়ে ছোট ছোট অংশে যাতে না পরিণত হয়, তার জন্যে পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। বিবাহে পণের পরিমাণ কমানো অথবা না-দেওয়ার জন্যে পাত্রীর পিতা-মাতা অনেক সময় আত্মীয় বিবাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে শাশুড়ী ও পুত্রবধূদের মধ্যে যে কলহ সাধারণতঃ দেখা যায়, তা আত্মীয় বিবাহে হ্রাস পায়। যদি কোন ব্যক্তি তার মামাতো বোনকে বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক থাকার ফলে তাদের ঝগড়াঝাটি হওয়ার সম্ভবনা কম। মামা-ভাগ্নীর বিবাহে শাশুড়ী ও পুত্রবধূ পরস্পরে দিদিমা ও নাতনীর সম্পর্কে আবদ্ধ।

তাত্ত্বিক বিচারে অনাত্মীয় বিবাহ অপেক্ষা আত্মীয় বিবাহে উৎপাদিত সন্তান-সন্ততিতে বংশগত রোগ বা বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ পূর্বপুরুষের মধ্যে যদি কোন বংশগত রোগ বা বিকৃতির প্রচ্ছন্ন জিন (recessive gene) থাকে, তা বংশ-পরম্পরায় তাদের উভয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের তখন রোগের 'বাহক' (carrier) বলে গণ্য করা হয়। দুই বাহকের

---

*বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-700009

মিললে কোন সন্তানের মধ্যে যদি দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের সমন্বয় ঘটে, তাহলে তার মধ্যে রোগের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়তার সম্পর্ক যতই ক্ষীণ হতে থাকবে অর্থাৎ রক্তের বিচারে তারা যতই দূর সম্পর্কের আত্মীয় হবেন, একই বংশগত রোগের দুটি প্রচ্ছন্ন জিন তাদের সন্তানের মধ্যে আসার সম্ভাবনা ততই হ্রাস পাবে। খুব বিরল বংশগত রোগ বা বিকৃতির লক্ষণ কোন ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা গেলে, অনেক সময় বাজী ধরে বলা যেতে পারে যে তাদের পিতামাতাদের মধ্যে নিশ্চয় রক্তের সম্পর্ক আছে। যদি কোন বংশগত রোগে প্রতি দশ লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে একজন ভোগেন, তাহলে ঐ রোগের প্রচ্ছন্ন জিন প্রতি পাঁচশো ব্যক্তির মধ্যে একজন অলক্ষে বহন করে থাকেন। বহির্বিবাহে বা অনাত্মীয় বিবাহে একই রোগের দুই বাহকের মিলন হয় না বললেই চলে। ফলে তাদের সন্তানে বংশগত রোগ বা বিকৃতি খুব কম দেখা যায়।

কোন ছোট গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে যদি বিবাহ করে থাকে, তাহলে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য বেশীমাত্রায় দেখা যায়। আমেরিকার 'হোপি' (Hopi) নামে রেড ইণ্ডিয়ান উপজাতি আছে। তাদের মধ্যে ধবল বা অ্যালবিনো (albino) সন্তানের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। অ্যালবিনো বৈশিষ্ট্যের দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের সমন্বয় কোন সন্তানে ঘটলে, তার গায়ের রং হাল্কা গোলাপী, চোখের রং ফ্যাকাশে লাল (pink) এবং চুলের রং সাদা হয়। অতীতে হয়তো গোষ্ঠীর কোন এক অথবা কয়েক ব্যক্তি অ্যালবিনো বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন জিন অলক্ষে বহন করছিলেন। গোষ্ঠীর অন্তর্বিবাহের ফলে ঐ জিন বেশ কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রচ্ছন্ন জিনের দুই বাহকের বিবাহ ঘটলে, তাদের চারজন সন্তানের মধ্যে একজন অ্যালবিনো হয়ে জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে হোপি উপজাতির মধ্যে অ্যালবিনো সন্তানের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। Retinitis pigmentosa নামে একপ্রকার বংশগত রাতকানা রোগ আছে। ভারতবর্ষের উদয়পুরে মুসলমানদের এক গোষ্ঠীতে (দাউদী বোরা) আত্মীয় বিবাহে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে এই রাতকানা রোগ বেশী সংখ্যায় দেখা গেছে।

অন্তর্বিবাহের ফলে বংশগত রোগের প্রকৃত বৃদ্ধি যা ঘটে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ফেনিলকেটোনুরিয়া (Phenylketonuria) নামে একটি বংশগত মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ আছে। এই রোগটি সাধারণ জনসমাজে প্রতি দশহাজার একজন শিশুর মধ্যে দেখা যায়। জনসমাজের ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে যদি কাজিনকে (cousin) বিবাহ করে, তাহলে ফেনিলকেটোনুরিয়া রোগটি বেড়ে প্রতি দশ হাজারে একজনের পরিবর্তে সাতজনের মধ্যে দেখা যাবে। আর যদি সব বিবাহ মামা-ভাগ্নীর মধ্যে ঘটে, তাহলে রোগের হার বেড়ে প্রতি দশ হাজারে তেরোজনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

প্রতি সুস্থ ব্যক্তি কমপক্ষে পাঁচ-ছয়টি ক্ষতিকারক প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে থাকেন। তার প্রমাণ হচ্ছে যে তারা অনাত্মীয় বিবাহ করলেও কোন কোন সময়ে তাদের রোগগ্রস্ত সন্তান হতে দেখা যায়। যে কোন সুস্থ দম্পতির তিন থেকে চার শতাংশ সম্ভাবনা থাকে তাদের যে কোন সন্তান রোগগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবার। প্রশ্ন হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রী যদি পরস্পর কাজিন (cousin) হন, তাহলে তাদের সন্তান রোগগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনা উপরিউক্ত সম্ভাবনা থেকে কত বেশী হবে। হিসেব করে দেখা গেছে যে কাজিন বিবাহে রোগগ্রস্ত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ছয় থেকে আট শতাংশ।

যে বংশে কোন ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন জিনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগ বা বিকৃতি দেখা যায়, সেই বংশের ছেলেমেয়েরা যদি অন্তর্বিবাহে আবদ্ধ হন, তাহলে ঐ রোগের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশী থাকে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো। প্রতিক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে বংশগত

রোগের হার প্রতি দশ হাজারে একজন হিসাবে ধরা হয়েছে। সুস্থ, বাহক এবং রোগগ্রস্ত ছেলেমেয়ের প্রতীক চিহ্ন যথাক্রমে O ও O, O ও O এবং O ও O ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি পাত্রের (A) দাদু (C) অথবা দিদিমা রোগগ্রস্ত এবং পাত্র তার মামাতো বোনকে (B) বিবাহ করতে ইচ্ছুক, সেক্ষেত্রে তার সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/১৬ (চিত্র-1)। এখন A ও B উভয়ে যদি কোন সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তাদের প্রথম সন্তানে রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪০০।

যেক্ষেত্রে পাত্রের (A) বাবা (C) রোগগ্রস্ত এবং পাত্র যদি তার মামাতো বোনকে (B) বিবাহ করে, সেক্ষেত্রে তার সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/১০০ (চিত্র-2)। B-কে বিবাহ না করে কোন সুস্থ অনাত্মীয়-কে বিবাহ করলেও A-র প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা একই রকম হবে। A-র বাবার সঙ্গে B-র কোন রক্তের সম্পর্ক না থাকায়, রোগের প্রচ্ছন্ন জিন B-র মধ্যে থাকার সম্ভাবনা কম। এক্ষেত্রে B যদি সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তার প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রতি দশ হাজারে একজন। ঐ একই হারে রোগের প্রকাশ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়।

পাত্রের (A) বাবার পরিবর্তে মা (C) যদি রোগগ্রস্ত থাকেন এবং পাত্র যদি তার মামাতো বোনকে (B) বিবাহ করে, তাহলে তার সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/১২ (চিত্র-3)। এখনও A ও B উভয়ে যদি সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে ১/৩০০ ও ১/৪০০।

পাত্র-পাত্রীর মামা, মাসী, কাকা, জ্যেঠা ও পিসী রোগগ্রস্ত হলে, তাদের অন্তর্বিবাহে সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কত তা সহজে নির্ণয় করা যায়। যদি কোন পাত্রের (A) মামা (C) বা মাসী (D) রোগগ্রস্ত এবং পাত্র তার সুস্থ অন্য এক মামার মেয়েকে (B) বিবাহ করে, তাহলে তার সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪৮ (চিত্র-4)। এখন A ও B উভয়ে যদি সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করেন, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪০০।

পাত্রের (A) ভাই (C) অথবা বোন (D) যেক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত, সেক্ষেত্রে পাত্র যদি তার সুস্থ মামাতো বোনকে (B) বিবাহ করে, তাহলে তার সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/২৪ (চিত্র-5)। A ও B যদি সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করেন, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে ১/৩০০ ও ১/৪০০।

অনুরূপ ভাবে দেখানো যেতে পারে যে পাত্রের (A) ভাই বোনের পরিবর্তে পাত্রীর (B) কোন ভাই বা বোন রোগগ্রস্ত থাকলে, তাদের রোগগ্রস্ত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা একই রকম অর্থাৎ ১/২৪। কিন্তু A ও B উভয়ে সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করলে, তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে ১/৪০০ ও ১/৩০০।

এখন যদি জ্যেঠা, কাকা, মামা, মাসী বা পিসীর কোন ছেলে মেয়ে রোগগ্রস্ত থাকে, সেক্ষেত্রে কাজিন (cousin) বিবাহে সন্তানের রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কি রকম, তা নির্ণয় করা যেতে পারে। A-র মাসতুতো ভাই (C) রোগগ্রস্ত। A যদি তার মামাতো বোনকে (B) বিবাহ করে, তাহলে তাদের রোগগ্রস্ত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪৮ (চিত্র-6)। যদি A ও B উভয়ে সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪০০।

মামা-ভাগ্নীর বিবাহে পাত্রের (A) বাবা (C) অথবা মা অর্থাৎ পাত্রীর (B) দাদু অথবা দিদিমা যদি রোগগ্রস্ত হন, তাহলে তাদের সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১/৪ (চিত্র-7)। A ও B উভয়ে যদি সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাদের
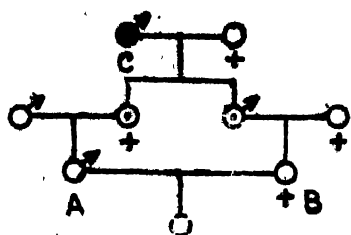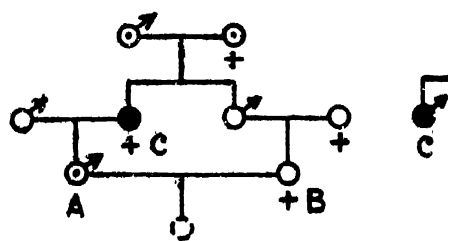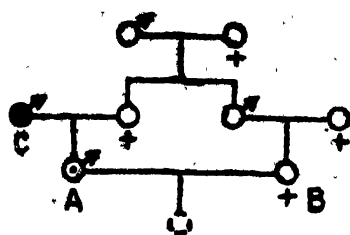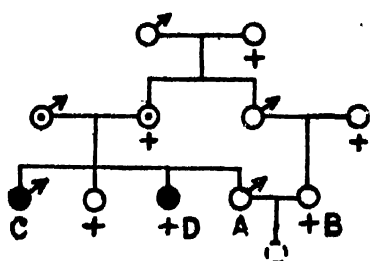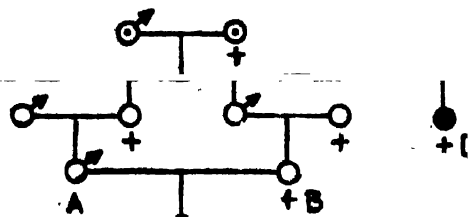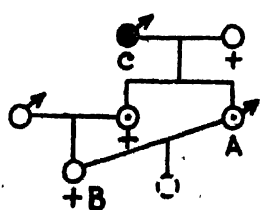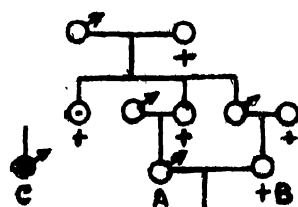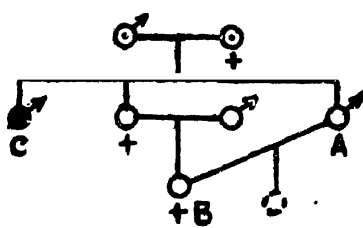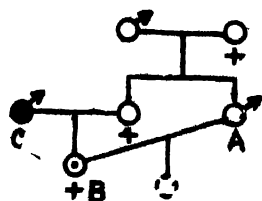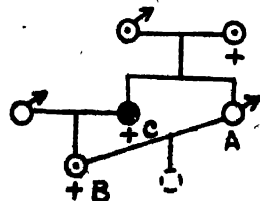
1নং থেকে 10নং পর্যন্ত চিত্র

প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{200}$ ও $\frac{1}{800}$।

যদি পাত্রের (A) কোন ভাই (C) অথবা বোন রোগগ্রস্ত এবং পাত্র তার কোন সুস্থ বোনের মেয়েকে (B) বিবাহ করে, তাহলে তাদের সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{14}$ (চিত্র-8)। যদি A ও B সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{200}$ ও $\frac{1}{800}$।

মামা-ভাগ্নীর বিবাহে পাত্রীর (B) মা (C) অর্থাৎ পাত্রের (A) বোন যদি রোগগ্রস্ত থাকেন, তাহলে তাদের সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$ (চিত্র-9)। যদি A ও B সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{400}$ ও $\frac{1}{200}$।

এখন পাত্রীর (B) মা-র পরিবর্তে বাবা (C) অর্থাৎ (A) ভগ্নীপতি (C) যদি রোগগ্রস্ত হন, সেক্ষেত্রে A ও B-র প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{200}$ (চিত্র-10)। যদি A ও B উভয়ে সুস্থ অনাত্মীয়কে বিবাহ করে, তাহলে তাদের প্রথম সন্তান রোগগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাক্রমে $\frac{1}{10080}$ ও $\frac{1}{200}$

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে যেসব বংশে কোন ব্যক্তির বংশগত রোগগ্রস্ত হওয়ার কোন ইতিহাস নেই, সেই বংশের ছেলেমেয়েদের অন্তর্বিবাহে রোগগ্রস্ত সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা এমন কিছু বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু কোন বংশে একজনের যদি বংশগত রোগ বা বিকৃতি থাকে, সেই বংশের উত্তরপুরুষদের অন্তর্বিবাহে তাদের সন্তান সন্ততিদের মধ্যে ঐ রোগ বা বিকৃতি প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এই সব বংশের ছেলেমেয়েদের বহির্বিবাহে বা অনাত্মীয় বিবাহে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। [কৃতজ্ঞতা স্বীকার—এই প্রবন্ধের চিত্রাঙ্কন করেছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের চিত্রকর শ্রীসুধীন চক্রবর্তী—লেখক।]

মনুষ্যখাদ্যের ক্রমবিবর্তন

শ্রীকুমার রায়*

কথায় বলে "ছাগলে কিনা খায়"। কিন্তু শুধু পাগলছাগলই নয়, যে মানুষ বিগত প্রায় দশলক্ষ বছর নিজেদের Homo Sapiens বা "জ্ঞানী মানুষ" বলে দাবী করে আসছে তাদের খাদ্যতালিকাও কম বৈচিত্র্যময় নয়। সাপ ব্যাঙ থেকে শুরু করে উটের চোখ, চকলেট আবৃত পিঁপড়ে, উকুন ভাজা ইত্যাদি খাদ্যাখাদ্য সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষরাই খায় এবং অনেক সময় বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই। তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে খানাটা আপরুচি হলেও শরীরের পুষ্টি, অর্থাৎ বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ, এবং শক্তি উৎপাদনের জন্যই উদ্ভিদ অথবা মনুষ্যাদি প্রাণীদের খাদ্য প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ যেমন নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে, প্রাণীদের সে উপায় নেই, তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রাণীজগতে যারা নিরামিষাশী বলে পরিচিত তারা তৃণ, গাছের ফল পাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে আবার সময় বিশেষে নিজেরাই আমিষভোজীদের খাদ্যে পরিণত হয়।

অনন্ত সৌরশক্তি এবং মাটির অজৈব পুষ্টিভাণ্ডার থেকে সবুজ গাছের ডাল পাতা নিজের দেহে যথাক্রমে শক্তি ও পুষ্টি সঞ্চয়ের ক্ষমতা রাখে। তৃণভোজী প্রাণীরা সবুজ ঘাস, পাতা ইত্যাদি খাদ্য মারফৎ সেই শক্তি ও পুষ্টি সংগ্রহ করে। আমিষভোজীরা আবার তৃণভোজী প্রাণীদের খেয়ে ওই অত্যাবশ্যক বস্তু দুটি সংগ্রহ করছে। কালক্রমে মাটির বিয়োজক জীবাণুরা জীবদেহাবশেষে সঞ্চিত শক্তি নিঃশেষিত
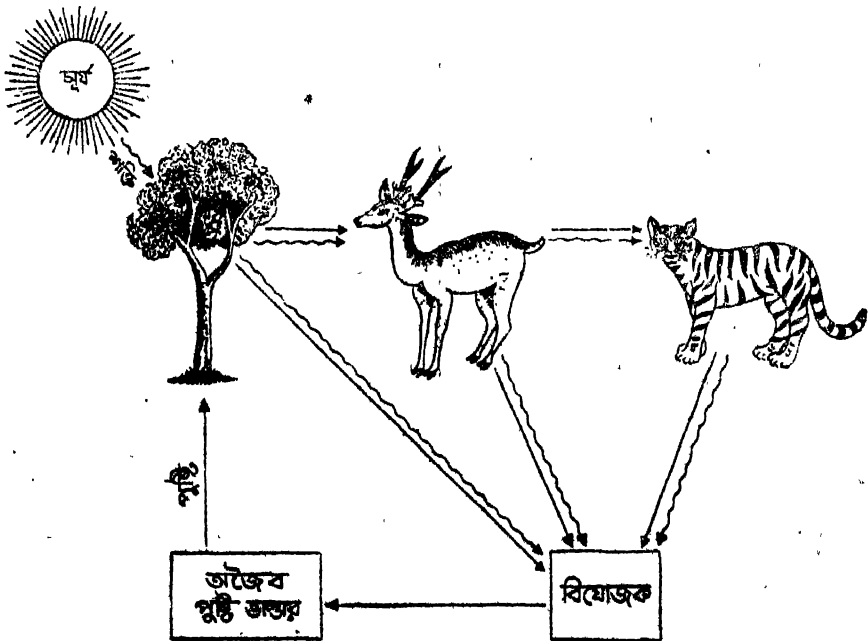
পরিবেশ চক্র (Ecocycle)। সরলরেখার দ্বারা পুষ্টি ও ঊর্মিত রেখার দ্বারা শক্তি সঞ্চরণ দেখানো হয়েছে। লক্ষণীয়, সূর্য থেকে আহৃত শক্তি মাটির বিয়োজক জীবাণুর মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেলে পৌষ্টিক উপাদান মাটিতে ফিরে যায়।

*BF118, সল্টলেক সিটি, কলিকাতা-700064

করে পৌষ্টিক উপাদানগুলি আবার মাটির অজৈব পুষ্টিভাণ্ডারে ফিরিয়ে দেয়। (From dust thou come to dust returneth।) লক্ষণীয়, এই "পরিবেশ চক্রে"র (Eco Cycle) প্রভাবে মাটির পুষ্টিভাণ্ডার অক্ষয় থাকছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে যদি না মানুষ নিয়োজিত আণবিক বিক্রিয়া কীট-নাশক ওষুধ ইত্যাদির প্রভাবে ওই শৃঙ্খল ছিন্ন হয়

জ্বালানি ছাড়া তাপশক্তি তৈরি হতে পারে না। জীবদেহের জ্বালানি হল শর্করা। বস্তুত শর্করা মানেই শক্তি কারণ গাছের সবুজ ক্লোরফিল ফাঁদ পেতে সূর্যের শক্তিকে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলের সাহায্যে শর্করায় পরিণত করতে পারে। একমাত্র উদ্ভিদরাই এই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অধিকারী, যেহেতু একমাত্র উদ্ভিদের সবুজ অংশে ক্লোরোফিল থাকে। আবার প্রয়োজন মত জারণ দ্বারা শর্করা বিশ্লেষিত হয়ে সেই পুঞ্জিভূত শক্তি জীবদেহে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং বলা যায়

'প্রধান নিরামিষ খাদ্যই প্রাণীদের শর্করা তথা শক্তির প্রধান প্রত্যক্ষ উৎস

শরীরের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের জন্য কিন্তু প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও অবশ্য প্রয়োজন কারণ প্রোটিনই জীবকোষের প্রধান উপাদান। আবার আমিষ-খাদ্যই প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের প্রধান উৎস। যদিও আপৎকালে প্রাণীশরীরে Neoglucogenesis প্রক্রিয়ায় কদাচিৎ প্রোটিন থেকেও শর্করা তৈরি হয়, সাধারণ অবস্থায় কিন্তু
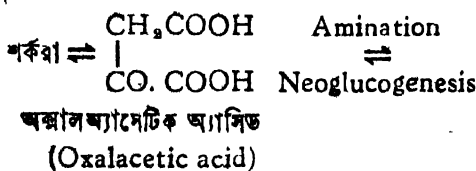
আমিষ খাদ্যে উৎকৃষ্ট প্রোটিন ও Glycogen রূপে শরীরগ্রাহ্য কার্বোহাইড্রেট দুটিই পাওয়া যায়।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব মানুষই সর্বভোজী (omnivorous) কারণ তারা প্রোটিনপ্রধান আমিষ খাদ্য এবং শর্করাপ্রধান নিরামিষ খাদ্য দুটিই গ্রহণ করে। অবশ্য খাদ্যে এই দুটি উপাদানের অনুপাত দেশ, কাল, পাত্র অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। এমন কি বুদ্ধ, মহাবীর, গান্ধী প্রভাবান্বিত কিছু প্রাচ্য দেশীয়ের তথাকথিত নিরামিষ আহারেও দুধ বা দুগ্ধজাত বস্তু থাকতে বাধা নেই। মানুষের আকৃতির যেমন একটা বিবর্তন ইতিহাস আছে তেমনি খাদ্যব্যবস্থারও ক্রমবিবর্তন লক্ষণীয় এবং আকৃতির বিবর্তনের মত এ ব্যাপারে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ভূমিকা প্রধান। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্যব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এটি প্রধানত (1) প্রাকৃতিক, (2) অর্থনৈতিক, (3) সাংস্কৃতিক এবং (4) ধর্মীয় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে আবার প্রাকৃতিক আর অর্থনৈতিক কারণ দুটিই মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, আনুমানিক 25° থেকে 50° উঃ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী ভূভাগের জলবায়ু গম চাষের উপযোগী, তাই রাশিয়া, ইউরোপ উত্তর আমেরিকা এবং ভারতের পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য হল গম। আবার বিষুবরেখা থেকে আরম্ভ করে 25° উত্তর অক্ষাংশের

$$\text{শর্করা} \rightleftharpoons \begin{array}{c} CH_2COOH \\ | \\ CO.COOH \end{array} \underset{\text{Neoglucogenesis}}{\overset{\text{Amination}}{\rightleftharpoons}} \begin{array}{c} CH_2COOH \\ | \\ CH(NH_2)COOH \end{array} \rightleftharpoons \text{প্রোটিন}$$

অক্সালঅ্যাসেটিক অ্যাসিড (Oxalacetic acid) — অ্যাসপারটিক অ্যাসিড (Aspartic Acid)
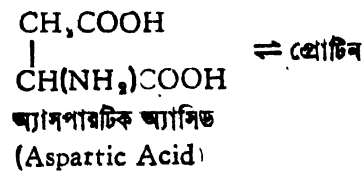
প্রাণীরা খাদ্য থেকেই এই অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান দুটি পৃথকভাবে সংগ্রহ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নিরামিষ খাদ্যে শরীরগ্রাহ্য শর্করা থাকলেও প্রোটিন যা থাকে সেটি নিকৃষ্ট মানের অথচ মাংসের মত

মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, মাটিও ধান চাষের উপযোগী। তাই দেখা যায় জাপান, চীন, দূরপ্রাচ্য, ভারত, গায়ানা এবং মধ্য আমেরিকার কিছু অধিবাসীর খাদ্যে ধানের প্রাধান্য। ইতালীতে

আবার নরম গম হয় না, সেখানে ডুরাম (Durum) নামে একজাতীয় শক্ত গম উৎপন্ন হয়, যার থেকে স্পেগটি (Spaghetti) বা ম্যাকরনি (Macoroni) তৈরি হয়। এতো গেল খাদ্যশস্যের ওপর ভৌগোলিক প্রভাব। এখন আপনি পাউরুটি খাবেন না কেক্ পেস্ট্রি খাবেন না রুটি, রুমালি, তন্দুরী না লুচি পরোটা পুরি খাবেন না ধান থেকে তৈরী মুড়ি, খই, চিড়ে ভাত অথবা ইড্‌লি খাওয়া পছন্দ করবেন তা নির্ভর করছে আপনার রুচি অর্থাৎ সংস্কৃতি এবং "রেস্ত" অর্থাৎ অর্থ নৈতিক স্থায়িত্বের ওপর।

মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ওপর অর্থনৈতিক প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিকেরা বলেন কোন দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ হল সে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও জনসংখ্যার অনুপাত। এখন উৎপাদন বলতে কেবল কৃষিজাত দ্রব্যই নয়, শিল্পজাত দ্রব্যও বোঝায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ভারত কৃষি-প্রধান দেশ এবং এককালে ভারতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হত তাতে ভারতবাসীদের খাদ্যে পরিমাণগত বা গুণগত ঘাট্‌তি ছিল না। তারপর অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এখন বেশীর ভাগ

তালিকা—1

বিভিন্ন দেশবাসীর খাদ্যতালিকার দৈনিক গড়

	শস্য	রবিশস্য	চিনি	ফল	মাছমাংস	ডিম	দুধ
জাপান	14·2 আউন্স	3·1 আউন্স	1·2 আউন্স	1·5 আউন্স	2·2 আউন্স	0·3 আউন্স	1·2 আউন্স
ভারত	12·6 "	2·8	1·4	1·2	0·4	0·3	4·0
আফ্রিকার							
আদিবাসী উলগো	37·0 "				2·2	0·3	8·9
দঃ আফ্রিকা	14·7 "	0·3	3·9	3·2	4·7	0·3	7·0
অস্ট্রেলিয়া	8·9 "	0·4	5·3	7·0	11·3	1·0	14·0
বৃঃ দ্বীপপুঞ্জ	11·1 "		3·6	5·4	7·4	1·4	16·0
আঃ যুক্তরাষ্ট্র	6·7 "	0·7	4·6	7·9	8·3	2·0	19·0

তা ছাড়াও লক্ষণীয়, নদীমাতৃক দেশ (যেমন চীন, বাঙলা ইঃ) বা সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশগুলিতে যেমন জাপান, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বর্মা ইঃ) প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তাই ওই সব দেশবাসীর আমিষ খাদ্য বলতে মাছই প্রধান। আবার উত্তর অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মধ্য প্রাচ্য, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্যের চেয়ে পশুপালনে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। তাই তাদের খাদ্যে মাংস বা ডিমের প্রাধান্য। এস্কিমোরা শীত-প্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা। সেখানে খাদ্য বলতে শীলমাছ বা বল্গা হরিণের মাংস সহজলভ্য। খাদ্য হিসাবে শীল মাছের চর্বি বরফের দেশের অধিবাসীদের শরীরে অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ তাপ সৃষ্টি করে।

ভারতীয়ের চারবেলা পেটভরা খাবার (four squire meals!) জোটাই দুষ্কর। আবার বৃঃ দ্বীপপুঞ্জ মোটামুটি উষর দেশ হলেও শিল্পে অগ্রসর তাই তারা প্রচুর খাদ্য আমদানী করতে পারে। একই কারণে জাপান ছাড়া অন্য প্রাচ্যদেশবাসীদের খাদ্যে নিরামিষের অনুপাত বেশী কারণ এসব দেশে পশুপালন পদ্ধতি উন্নত নয় অথচ অন্য দেশ থেকে আমিষখাদ্য আমদানীও ব্যয়সাপেক্ষ (তালিকা-1)।

মানুষের বিভিন্ন খাদ্যরুচিরও আংশিক কারণ ভৌগোলিক। দেখা গেছে গরম দেশের লোকের মশলা দেওয়া খাদ্য বেশী পছন্দ কারণ কেবল জিভের স্বাদ নয়, মশলা সংরক্ষণিক রসায়ন (preservative)-এর কাজও করে। ঠাণ্ডা দেশে

খাদ্য সংরক্ষণ সহজ তাই ওই সব দেশের অধিবাসীরা খুব কম মশলা ব্যবহার করে। তারপর লক্ষ্য করা যাক ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে অলিভ উৎপন্ন হয় প্রচুর সুতরাং গ্রীস, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের রান্নায় অলিভ তেলের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। একই কারণে উত্তর ভারতের লোকেরা সরষের তেলে রান্না করে আবার দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা নারকেল তেল পছন্দ করে বেশী। কালক্রমে অবশ্য এসব অভ্যাস তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। তাছাড়া সংস্কৃতি নির্ভর করে ভাবের আদান-প্রদানের ওপর। মধ্য প্রাচ্যের মুসলমানেরা ভারত অধিকার করে দু-দেশের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। তাদের রাজত্বের ঘাঁটি ছিল উত্তর ভারত। সুতরাং খুবই উত্তর ভারতের রান্নায় মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির ছাপ যতটা পড়েছে, দক্ষিণ ভারতে ততটা নয়। ঔপনিবেশিকরা এসেও আমাদের খাদ্যরুচি অনেক পাল্টে দিয়েছে। তাদেরই প্রভাবে আমাদের খাদ্যতালিকায় আলু, পাউরুটি, কেক, পেস্ট্রি আইসক্রীম যুক্ত হয়েছে। প্রয়োজনবোধেও খাদ্যাভ্যাসের ওপর অনেক সাংস্কৃতিক বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। যেমন বিজয়াদশমীর দিন থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত আমাদের ইলিশ মাছ খাওয়া বারণ এবং সাহেবরা ওই সময়টাতে স্যামন মাছ খেতে বিরত থাকে কারণ ওই সব মাছ বছরের ওই সময়টা নদী মোহনায় ডিম পাড়তে আসে।

মানুষের খাদ্যের ওপর আর এক পরিবেশ গভীর প্রভাব বিস্তার করে, সেটি হল তাদের "ধর্ম"। যদিও ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রাকে নানা ভাবে প্রভাবান্বিত করে কিন্তু ধর্মের সংজ্ঞা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। বস্তুতঃ ধর্ম ও সংস্কারের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। আর্যরা ছিল যাযাবর জাতি এবং তারা পার্থিব ধন বলতে বুঝত গো-সম্পদ। আর্য সভ্যতার আদি পর্বে তারা কৃষিজাত বস্তুর চেয়েও খাদ্যের ব্যাপারে গোরু এবং অন্য গৃহপালিত পশুর মাংসের ওপর খুবই নির্ভর করত বেশী। তারপর মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করল। ভারতের উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকায় যারা বসতি করল তাদের বলা হত বৈদিক আর্য এবং এরাই হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক। এরাও প্রথম প্রথম গোমাংস খেত এবং বৈদিক যুগে গোমাংস যে অতি পবিত্র বলে গণ্য হত তার প্রমাণও পাওয়া যায়। অতিথি নারায়ণকে বেদে গোঘ্ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যখন তারা এখানে চাষআবাদ শুরু করল তখন দুগ্ধবতী গাভীদের বাদ দিয়ে বলদদের চাষের কাজে লাগাতে আরম্ভ করল সুতরাং হিন্দুধর্ম অনুশাসন দিল গাভীতো নয়ই এমনকি কোনরূপ গোমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আর্যদের কেলটিক (Celtic), নর্ডিক (Nordic) প্রভৃতি শাখা উদ্ভূত বর্তমান জাতিরা নির্বিচারে গোমাংস খায়। সুতরাং হিন্দুদের গোমাংস বর্জন ধর্ম বলা যায়, না সংস্কার, এ প্রশ্নের মীমাংসা আপনারাই করুন।

খাদ্য সম্বন্ধে ধর্মের অনুশাসন আবার কিছুটা নির্ভর করত স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে। যেমন ইসলাম ধর্ম প্রথমে সেমাটিক জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়। এরা বাস করত ভূমধ্য সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী ভূখণ্ডে যেখানে ফিতাকৃমিজাতীয় পরজীবীদের খুবই উৎপাত। এরা শূকর শরীর থেকে মানুষের শরীরে আশ্রয় করে নানা রোগের সৃষ্টি করে। তাই মুসলমান ধর্মে শূকর মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ অনুমান যে অলীক নয় তার প্রমাণ একই ভৌগোলিক স্থানে উদ্ভূত ইহুদি ধর্মে বা গ্রীসে শূকর মাংস নিষিদ্ধ। আবার দেখা যায় ওই এলাকা থেকে অনেক দূরে, স্কটল্যাণ্ডের কয়েক স্থানেও শূকর মাংস খাওয়া হয় না। সেক্ষেত্রে এটি ধর্মের বিধান নয়, সংস্কার মাত্র এবং সংস্কারটি এসেছে ভাবের আদানপ্রদান মারফৎ। প্রথম দিকে আর্যাবর্তের হিন্দুদের ওই স্বাস্থ্যসমস্যা ছিল না তাই তারা বরাহ বা শূকর মাংস খেত। পরে অবশ্য বর্ণ হিন্দুদের

মধ্যেও শূকর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এক্ষেত্রে ধর্ম সংস্কারের রূপ নিয়েছে।

ধর্মের অনুশাসন যে সব সময় জাতীয় স্বাস্থ্যের অনুগামী নয় তার উদাহরণ স্বরূপ আমরা তথাকথিত নিরামিষআহারীদের কথা বলতে পারি। অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও অনেক প্রাচ্য দেশবাসী কেবল ধর্মীয় বিধানের জন্য মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। সম্পূর্ণ আমিষ বর্জিত খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল না খারাপ এ নিয়ে ইতিপূর্বে প্রচুর তর্কের অবতারণা হয়েছে, কিন্তু শেষ হয় নি। জীব বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা আর একবার পর্যালোচনা করা যাক।
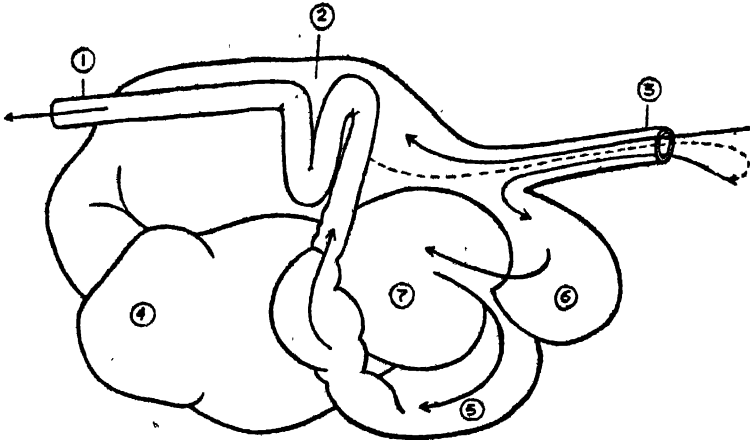
ইত্যাদি আমিষ খাদ্যের অভ্যাস এরা ত্যাগ করতে পারেনি। প্রায় 15 লক্ষ বছর আগে শুরু প্লাওসিন (Pliocine) যুগে অস্ট্রেলোপিথেকাস নামে মহাকপিদের এক গোষ্ঠী গাছ ছেড়ে বরাবরের জন্য মাটিতে বাস করতে শুরু করল। বর্তমান মানুষের এই বিবর্তনিক পূর্বপুরুষেরা দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বা চলতে আরম্ভ করল এবং এদের খাদ্য ব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। ওই সময় বিষুবীয় জঙ্গলের বিস্তৃতি কমে আসছে, ফল, পাতাও দুর্লভ হয়ে পড়ছে। সুতরাং আমাদের দ্বিপদী ভূচারী পূর্বপুরুষেরা নিরামিষ খাদ্যের পরিবর্তে আমিষ খাদ্যের ওপরই বেশী নির্ভর করতে শুরু করল। অবশ্য প্রশ্ন

রোমন্থকারী তৃণভোজীর পাকস্থলী—1-ক্ষুদ্রান্ত্র 2-রুমেন, 3-অন্ননালী, 4-রুমেন, 5-অ্যাবোমেসাম, 6-রেটিকুলাম, 7-ওমেসাম।

শ্রেণীবিভাগে যে বানরবর্গে মানুষের অবস্থান, আজ থেকে 7-8 কোটি বছর আগে আবির্ভাব লগ্নে তারা ছিল পতঙ্গভুক। সুতরাং বলা যায় সেই সময় তারা ছিল আমিষভোজী। কালক্রমে তারা যখন বানরে উদ্বর্তিত হল তখন ফল, পাতাও তাদের খাদ্যতালিকায় যুক্ত হল। সুতরাং বানরদের আপাতদৃষ্টিতে নিরামিষাশী মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তারা উভভোজী। বিবর্তনের ইতিহাসে বানরের পর গোরিলা, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি মহাকপিদের আবির্ভাব। গাছের ফল, মূল, পাতা ইত্যাদি নিরামিষ খাদ্য বেশী পছন্দ করলেও পোকামাকড়, পাখির ডিম

করা যেতে পারে ফল পাতার না হয় আকাল পড়েছিল কিন্তু জমির ওপর বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে তৃণের অভাব হওয়ার তো কথা নয়, তাহলে অস্ট্রেলোপিথেকাসরা হঠাৎ ঘাস ছেড়ে কাঁচা মাংস ইত্যাদি আমিষ খাদ্যের দিকে ঝুঁকল কেন? প্রশ্নটি এতই প্রাসঙ্গিক যে উত্তরের জন্য পরিপাকতন্ত্রের শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

তৃণজাতীয় খাদ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তার বেশীর ভাগ অংশই সেলুলোজ (Cellulose)। এটি এমন একজাতীয় কার্বোহাইড্রেট যাকে লালার টায়ালিন (Ptyalin) অ্যাম্লেজের অ্যামাইলেজ

(Amylase) বা অন্ন্রের শর্করা পরিপাককারী এনজাইমগুলি ভেঙে শরীরগ্রাহ্য monosaccharide-এ পরিণত করতে পারে না। অথচ রোমন্থনকারী তৃণভোজীদের পাকস্থলী এই কাজের জন্যই যেন সৃষ্ট। এরা প্রথমে ঘাস, পাতা না চিবিয়েই গিলে ফেলে। পরে অবসরমত সেগুলি পুনরুদ্গীরণ করে জাবর কাটতে থাকে। তারপর এই খাদ্য আবার পাকস্থলীর রুমেন (Rumen) কুঠুরীতে ফিরে যায় এবং তখন এটি ভাঁটিখানার কাজ করে অর্থাৎ এখানকার বিয়োজক জীবাণু দ্বারা cellulose পরিপাক হয়। মনুষ্যাদি বানরবর্গের পাকস্থলী রোমন্থনকারী প্রাণীদের মত অত জটিল নয় সুতরাং তারা ঘাস খেয়ে হজম করতে পারবে কি করে? অন্ততঃ ব্যাখ্যাটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও এরকম একটা অনুমান করা যেত পারে

যাই হোক, আমাদের আদিমতম পূর্বপুরুষেরা প্রয়োজনের তাগিদে রীতিমত শিকারী মাংসাশী প্রাণীতে পরিবর্তিত হল এবং এর ফলে তাদের পুরো খাদ্যব্যবস্থাই গেল বদলে। বানরবর্গের অন্যান্য সদস্যদের খাদ্য সহজলভ্য এবং প্রচুর হলেও শিকারী অস্ট্রেলোপিথেকাসদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করতে হত (Thou shall earn bread with sweat of thy brow!) শিকার ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যায় না বলে তাদের মধ্যে ক্ষুধা ও শিকারস্পৃহা দুটি মানসিকতা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, কিছু খাদ্য সঞ্চয়ের এবং স্বগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে খাদ্য বণ্টনের প্রয়োজনও দেখা দিল এবং বানরদের মত যখন তখন খাবার অভ্যাসটিও ছাড়তে হল। বাঘ, সিংহ, এমন কি গৃহপালিত কুকুরদের মত শিকারী প্রাণীর খাবার সময়ের ব্যবধান খুব বেশী, এরা একবারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ উপবাসী থাকতে পারে। বর্তমান মানুষ এ ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোক দিনে 4 বার খায়।

আদিম মানুষের খাদ্যব্যবস্থা শীঘ্র আর এক বিপ্লবের সম্মুখীন হল। মানুষ কি করে আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকলেও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আজ থেকে প্রায় 4 লক্ষ বছর আগে মানুষ মাংস অগ্নিপক্ব করে খেত। অগ্নিপক্ব করলে মাংস সহজে ভোজ্য হয় এবং স্টার্চ (starch) জাতীয় খাদ্য সহজে পাচ্য হয় কিন্তু মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষখাদ্য মাত্রাতিরিক্ত অগ্নিপক্ব করলে দুষ্পাচ্য হয়ে ওঠে এবং তার খাদ্যগুণ নষ্ট হয়। তবু মানুষ ব্যাপকভাবে অগ্নিপক্ব মাংস খেতে শুরু করল, কারণ শিকারী প্রাণী হলেও তার চর্বণ ক্ষমতা অন্যান্য শিকারী প্রাণীর চেয়ে দুর্বল। সুতরাং জীব বিবর্তনের দৃষ্টিকোণে মানুষ মাংসাশী প্রাণী। নিরামিষ খাদ্যের ওপর সে নির্ভর করতে শিখেছিল আরও পরে। আর এক বিরাট আবিষ্কারের দৌলতে।

আদিম মানুষের খাদ্যব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটে গেল চাষ পদ্ধতির আবিষ্কারে। আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে পূর্বগোলার্ধের মধ্য প্রাচ্যেই মানুষ সম্ভবত প্রথম আবাদ শুরু করে। প্রথমে অবশ্য প্রকৃতির খেয়ালেই বুনো গম ও বুনো ঘাসের সংমিশ্রণে অধিক ফলনশীল এমার (Emmer) গম তৈরি হয়েছিল। পরে কৃত্রিম নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে মানুষ এমার ও অন্য একরকম ঘাসের সংমিশ্রণে রুটির গম তৈরি করতে শিখেছিল। ক্রমে চাষ পদ্ধতির আরও উন্নতি হল, গম ছাড়াও মানুষ ধান, যব ইত্যাদি খাদ্যশস্যের চাষ শুরু করল। শুধু তাই নয়, 5 হাজার বছর আগেও যে তারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করতে জানত, হরপ্পার শস্যাগার থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রমশ মানুষ শিকার ছেড়ে চাষআবাদকেই তাদের প্রধান উপজীবিকা করে তুলল। ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভাষায় বর্বর মানুষ সভ্যতার পথে পা বাড়াল। বস্তুত অনেকে মনে করেন "আর্য" কথার বুৎপত্তিগত অর্থই হল যারা চাষ করে। যাই হোক, চাষ করতে

শিখেছিল বলেই আজ কেউ কেউ "বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ভোজনের" ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে।

মানুষ ক্রমশ খাদ্যের জন্য পশুপালন শিখলেও পশুদের সঙ্গে তাদের শিকার শিকারী সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। আজও কেউ কেউ দোনলা বন্দুক নিয়ে পাখি শিকার করতে যায়, বা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েন বা কোন দুঃসাহসী Big Game-এর সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু সেটা নেশার ব্যাপার, পেশা নয়। এ শিকারে উত্তেজনা থাকলেও উদ্দীপনা নেই। চাষ পদ্ধতির আবিষ্কার মানুষের পুরো সমাজ ব্যবস্থাই পাল্টে দিয়েছে।

আমরা এতক্ষণ খাদ্যের একটা দিক নিয়েই আলোচনা করলাম—পুষ্টি ও শক্তি সঞ্চারের দিক। খাদ্যের অন্য দিক আছে, এর স্বাদ, বর্ণ ও গন্ধ। স্বাদের ব্যাপারটা মূলতঃ জিহ্বার বিলাসিতা হলেও প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভ (Pavlov) প্রমাণ করেছেন যে লোভনীয় খাদ্য সহজপাচ্য। বর্তমান মানুষের খাদ্যে কষায়, তিক্ত, অম্ল, ঝাল ইত্যাদি স্বাদ থাকলেও প্রধান স্বাদ বলতে মিষ্টি ও নোনতাই বোঝায়, তাই বাজারে মিষ্টি অথবা নোনতা খাবারের দোকান ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে মিষ্টির স্বাদ পেয়েছি আমাদের বানর পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে অথচ মূলতঃ মাংসাশী প্রাণীর নোনতা স্বাদের ওপরেও আমাদের আসক্তি থেকে গেছে। এই দুটি বিবর্তনিক স্বাদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে কথা ছিল না, অধুনা আমরা খাবারে টক, ঝাল এবং লোভনীয় গন্ধ ও বর্ণের জন্য নানারকম ঝিল্লিপ্রদাহ-কারী মশলা ও রঙ মিশিয়ে খাদ্যকে বিষবৎ করে তুলছি। এই সব ক্ষতিকর মশলার ওপর আমাদের এতই আসক্তি যে, কথিত আছে প্রাচ্যদেশ থেকে এগুলি আমদানির জন্য গিয়েছে East India Company-র সূত্রপাত হয়েছিল এবং এই কোম্পানীর পরবর্তী কার্যকলাপ কারোর অজানা নয়।

মোটামুটি এই হল মানুষের খাদ্যব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস কিন্তু মানুষের খাদ্যব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি? এ ব্যাপারে পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজ দ্বিধাবিভক্ত। Club of Rome প্রভৃতি সংস্থার নৈরাশ্যবাদী পণ্ডিত সমাজের অভিমত হল জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রাক্তন হার অপরিবর্তিত থাকলে বিংশ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়াবে 650 কোটি এবং তখনও যদি আমরা হেক্টর প্রতি খাদ্য শস্য উৎপাদনের হার বাড়াতে না পারি তবে ওই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদন করতে গেলে 26 কোটি হেক্টেরর চাষযোগ্য ভূমি দরকার। কিন্তু মানুষের বসবাস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য জমি রেখে চাষের জমি আর কতটা বাড়ানো যায়। সুতরাং মনুষ্য প্রজাতিকে খাদ্যঘাটতিজনিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে হলে অতি শীঘ্র বিজ্ঞানীদের হয় (1) জনসংখ্যা কম করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং / অথবা (2) হেক্টের প্রতি খাদ্য-শস্য উৎপাদনের হার বাড়াতে হবে এবং/অথবা (3) স্থূল ভাবে-এর ক্যাপ্টেন নিমোর অনুকরণে বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে এবং/অথবা (4) বহির্বিশ্বে বসবাসের বন্দোবস্ত করতে হবে। সৌভাগ্যের বিষয় পৃথিবীর আশাবাদী বিজ্ঞানী দল, নিউটন, আইনস্টাইন, নর্মান বোরলগের উত্তরসূরীরা সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত তাঁরাও মনে করেন "সম্ভবপরের জন্য প্রস্তুত থাকার নামই সভ্যতা।"

বাংলার নদনদীর কথা

শিবরাম বেরা*

বাংলার নদনদী—আমাদের এই বাংলা নদীমাতৃক দেশ। এ দেশের শস্যশ্যামল প্রান্তরের অধিকাংশ নদনদীবাহিত পলি জমে উঠে এসেছে সুনীল সাগর থেকে। তারপর ঐ সব নদী আমাদের জল দিয়েছে, অন্ন দিয়েছে, সম্পদ দিয়েছে। তাই নদীকে নিয়ে আমাদের কত গান, কত কথা কত গাথা। নদীর জল আমাদের কাছে পূণ্য সলিলা, সর্বপাপহরা। নদীপথ বেয়ে আমাদের দূর দূরান্তরে পাড়ি, সমুদ্রযাত্রা এবং কৃষ্টি, বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রসার। এই নদী যেমন দিয়েছে অনেক, তেমনি আবার কখনও সর্বনাশা প্লাবন ডেকে এনে সবকিছু ধ্বংস করেছে। তবু এই নদনদীই আমাদের প্রাণশক্তির অন্যতম উৎস।

যে নদীটিকে আমাদের বঙ্গভূমি তথা আর্যাবর্তের প্রাণধারা বলা চলে, তা হল গঙ্গা-পদ্মা। হিমালয় পর্বতমালা ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী প্রায় 3 লক্ষ বর্গমাইল ভূভাগে যে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ে, তা এই গঙ্গা-পদ্মা দিয়েই বয়ে আসে। এছাড়া হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত-চীন থেকে এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল থেকে আরও 3 লক্ষ বর্গমাইল এলাকার জল ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত গঙ্গা-পদ্মাতেই এসে পড়ে। এরপর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলেছে ঐ গঙ্গার শাখা ভাগীরথী-হুগলী। এই ভাগীরথী দূর অতীতে গঙ্গার প্রধান ধারা ছিল বলে অনুমান করা হয়। বিহারের ছোটনাগপুরের মালভূমি থেকে যে সকল নদী ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমতীরে এসে পড়েছে, তারা হল যথাক্রমে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতী-হলদী। পূর্বদিক থেকে গঙ্গার শাখানদী জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার একাংশ চূর্ণী এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীতে। এছাড়া মাথাভাঙার অন্য শাখা ইছামতী-কালিন্দী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানায় কাছাকাছি বয়ে চলেছে। উত্তরবঙ্গের প্রধান নদীগুলির মধ্যে আছে পদ্মার উপনদী কালিন্দী, মহানন্দা, আত্রেয়ী ও করতোয়া এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী তিস্তা, ধরলা, তোর্ষা ও সংকোশ।

এখানে মনে রাখা দরকার আজ ভারত ও বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হলেও পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ একই নদনদীর দান। তাই বাংলদেশের নদনদীর সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন হবে নিবন্ধটিতে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ছাড়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদী হল মেঘনা, যমুনা ও ধলেশ্বরী। এছাড়া আছে পদ্মার অজস্র শাখানদী যাদের মধ্যে কুমার, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, ও ভুবনেশ্বর প্রধান। আর এককালে কুশী নদীও এই বাংলার মধ্যাঞ্চল দিয়ে বয়ে চলত (1নং চিত্র)।

বাংলার সমভূমি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য—উত্তরে তুষারাবৃত হিমালয়, দক্ষিণে উর্মিমুখর বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে রাঙামাটির মালভূমি আর পূর্বে আসামের পার্বত্যভূমির মধ্যবর্তী প্রায় 60 হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই সমভূমি নদনদীর পলিরাশি দ্বারা গঠিত। এই ভূভাগ দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল থেকে অতি ধীরে ধীরে প্রধানত উত্তরে উঁচু হয়ে গেছে। সমভূমিটির মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির কাছাকাছি আর দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলে মাইল প্রতি ঢাল 3 ইঞ্চির কম। বাংলার এই সমভূমির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, মাইল প্রতি ঢাল অত্যন্ত কম থাকায় এটি প্রায় অনুভূমিক (nearly horizontal)
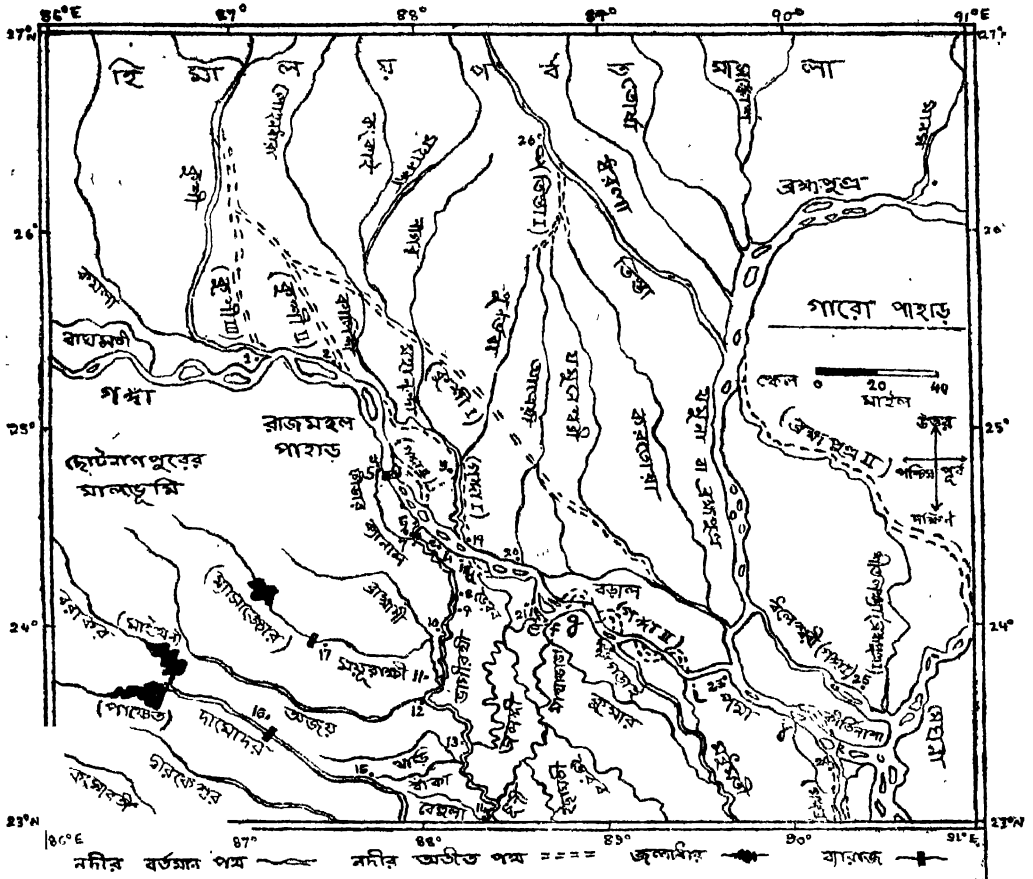
*পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা-700006.

1নং চিত্র—বাংলার সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর বর্তমান ও অতীত পথ

[কুশী I—চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কুশী নদী, কুশী II—পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কুশী নদী, কুশী III—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রেনেলের মানচিত্রে কুশী নদী। (1764 সাল থেকে 1777 সাল পর্যন্ত মেজর রেনেল পূর্বভারতের নদীনদীর সার্ভে করেন এবং রেনেলের মানচিত্রই প্রথম প্রামাণিক মানচিত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়।) গঙ্গা I—পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত গঙ্গা নদী, গঙ্গা II—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মেজর রেনেলের মানচিত্রে গঙ্গানদীর পথ। তিস্তা I—1787 সাল পর্যন্ত কয়েকটি শাখায় বিভক্ত তিস্তানদী। ব্রহ্মপুত্র I—সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র ; ব্রহ্মপুত্র II—অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র। খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা—দামোদরের অতীত পথ। Reference :—1."The changing face of Bengal" by Dr. Radhakamal Mukherjee, C. U. Publication 2. ' Rivers of the Bengal delta" by S. C. Mazumder, Calcutta University Publication and (3) বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব, 1ম খণ্ড) ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, পঃ বঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি]

চিত্রে বিভিন্ন স্থানের নাম ; 1—কুর্শেলা, 2—মণিহারী, 3—গৌড়, 4—দয়ারামপুর 5—ফরাক্কা, 6—সামসেরগঞ্জ, 7—জঙ্গীপুর, 8—মুর্শিদাবাদ, 9—কাশিমবাজার, 10—কর্ণসুবর্ণ, 11—কংকাগ্রাম, 12—কাটোয়া, 13—নবদ্বীপ, 14—ত্রিবেণী, 15—বর্ধমান, 16—দুর্গাপুর, 17—তিলপাড়া, 18—লালগোলা, 19—গোদাগাড়ি, 20—রাজসাহী, 21—জলাঙ্গী, 22—কুষ্টিয়া, 23—গোয়ালন্দ, 24—শিবচর, 25—ঢাকা, 26—জলপাইগুড়ি।

হয়ে ওঠে। ফলে প্রায় দক্ষিণমুখী ঢালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নদীগুলি পরস্পরকে ছেদ করে বিভিন্ন দিকে [যথা দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম] শুধু যে বয়ে যেতে পারে তাই নয়, এই সমভূমি অতি নরম পলির দ্বারা গঠিত হওয়ায় নদী সহজেই হানা পথ কেটে নিতে পারে। সেই কারণে নদী যেমন অজস্র শাখানদী ছড়িয়ে দিতে পারে, তেমন নদী ও সঞ্চারিত না হয়, তবে সেই শাখানদীটি দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। এভাবে গত কয়েক শতাব্দীতে ভাগীরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙা প্রভৃতি গঙ্গার শাখানদীগুলি যেমন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে গড়াই-মধুমতী ও পদ্মার কীর্তিনাশা খাত নতুন করে গড়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার, মূলনদীতে একটি বাঁকের মাধ্যমে নদীজলের

চিত্র ২ — সমভূমি অঞ্চলে নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম আর মৃত্যু।
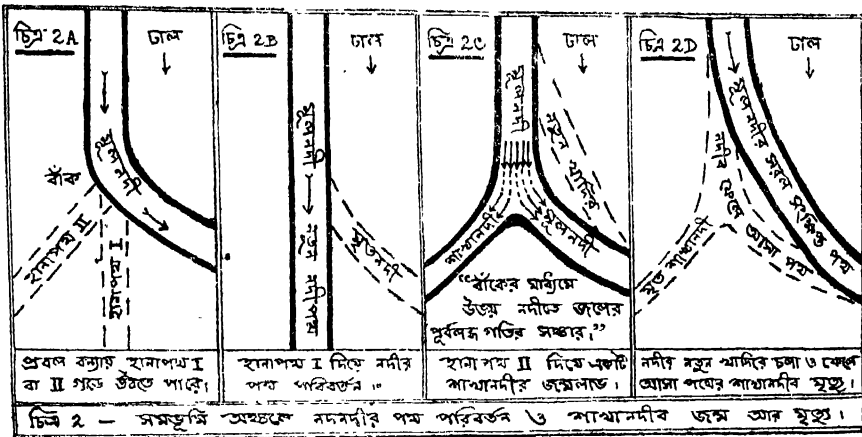
শাখানদীগুলি সহজেই তাদের খাত পরিবর্তিত করতে পারে। এ কারণে নিয়তই নদনদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম-মৃত্যু চলে এই সমভূমিতে। এখানে মাইল প্রতি ঢাল 6 ইঞ্চির কম থাকায় ঢাল নদীর জলে নতুন গতি সঞ্চার করে না বললেই চলে। তাই নদী তার উচ্চ ও মধ্যপ্রবাহে [অর্থাৎ পার্বত্য ও আধা-পার্বত্য অঞ্চল থেকে] যে তীব্র গতি নিয়ে ছুটে আসে, সেই অর্জিত গতিই (inertia of flow) নদীর চলার সবচেয়ে বড় পাথেয় দাঁড়ায়। সেজন্য ঢাল ও গতিমুখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ও প্রায় সরল পথ সৃষ্টি করে নদী জলের উচ্চ ও মধ্য প্রবাহের অর্জিত গতিকে বজায় রাখাই নদীর নিম্নপ্রবাহ গড়ে তোলার উপায়। [দ্রষ্টব্য-পরিকল্পিত নদীসংস্কারই বন্যানিয়ন্ত্রণের সঠিক পথ, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী, 1979] এছাড়া উচ্চ ও মধ্য প্রবাহে জলের লব্ধগতি যদি কোন শাখানদীতে পূর্বলব্ধ গতি নিম্নাংশে উভয় ধারায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে এবং উৎস অঞ্চলে বাঁকটি সরল হলে একটি ধারা প্রবল হয়ে ওঠে ও অন্য ধারাটি মিলিয়ে যায় (2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

নদীর পথ পরিবর্তন ও শাখানদীর জন্ম-মৃত্যুর উদাহরণ—(1) দূর অতীতে গঙ্গানদী মালদহ জেলায় কালিন্দী-মহানন্দার পথে বয়ে যেত এবং গৌড় শহরের দক্ষিণে পদ্মা ও ভাগীরথীতে দ্বিধা বিভক্ত হত। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী যখন মালদহ জেলার বর্তমান পাগলা নদীপথে [1নং চিত্রে গঙ্গা II] ছুটে চলত, তখনও সুতীর কাছে অবস্থিত 'b' বাঁকের মাধ্যমে গঙ্গাজলের পূর্বলব্ধ গতি পদ্মা ও ভাগীরথী উভয় পথে বজায় থাকায় দুটি নদীই সাবলীলভাবে বয়ে যেত। পরবর্তীকালে গঙ্গা ফরাক্কার কাছে 'a' বাঁক থেকে 'b' পর্যন্ত একটি নতুন পথ বা খাদির গড়ে তোলে [চিত্র-1]। ঐ

পথ পদ্মা-পথের সঙ্গে সরল থাকায় গঙ্গার জলের পূর্বলব্ধ গতি শুধু পদ্মার পথে ছুটে চলে এবং সেই থেকে স্বভাবে উৎপন্ন ভাগীরথী গঙ্গাজলের গতি না পাওয়ায় দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। এখন ভাগীরথীর পথকে সরল করে যদি তার উৎস বর্তমান ধুলিয়ান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে যেখানে গঙ্গায় ভাঙন চলছে, সেখানে সরিয়ে নেওয়া যায়; তবে গঙ্গার জলের যে দক্ষিণমুখী তীব্র গতি ওখানে ভাঙন সৃষ্টি করছে, তা ভাগীরথীর সরল পথকে গভীর করবে। এতে ভাগীরথীর পুনরুজ্জীবন হবে, আবার গঙ্গার ভাঙন রোধও হবে। [দ্রষ্টব্য—হুগলী নদীর পুনরুজ্জীবন কি অসম্ভব ? জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল 1980]

(2) অষ্টাদশ শতাব্দীর মেজর রেনেলের মানচিত্রে [Major Rennell, Memoir of a map of Hindoostan, London, 1783] দেখা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় লালগোলার কাছে গঙ্গানদী দুটি খাদিরে বয়ে চলেছে। দক্ষিণের খাদিরের 'd' বাঁকটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে একটি নদ নাম তার ভৈরব [চিত্র-1]। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গানদী প্রধানত দক্ষিণের খাদিরে প্রবাহিত হত বলে ভৈরব সে যুগে এক বিশাল নদ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে গঙ্গানদী পথের সরলতার জন্য উত্তরের খাদিরে মূল প্রবাহ বইয়ে দেয় এবং ভৈরব নদও মৃত্যুপথযাত্রী হয়।

(3) অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গানদী রাজসাহী থেকে দক্ষিণমুখী পথে প্রায় 20 মাইল চলার পর হঠাৎ জলাঙ্গীর কাছ থেকে উত্তর-পূর্বমুখী হয়েছিল আর গঙ্গার ঐ বাঁক 'e' থেকে উৎপন্ন হয়েছিল ভাগীরথীর প্রধান উপনদী জলঙ্গী। রেনেলের মানচিত্রে দেখা যায় ঐ অঞ্চলে গঙ্গানদী দ্বিতীয় একটি খাদির গড়ে তুলেছে, যার 'f' বাঁক থেকে নতুন করে গড়ে উঠেছে মাথাভাঙা—কুমার ইছামতী ও চূর্ণী শাখানদ [চিত্র-1]। বর্তমানে গঙ্গানদী সেখানে তৃতীয় একটি খাদির গড়ে নিয়েছে এবং পথের সরলতার জন্য তার মূলধারা তৃতীয় খাদিরের পথে ছুটে চলেছে। ফলে পূর্বোক্ত যে খাদির দুটিতে গঙ্গার অস্তিত্ব প্রায় নেই, সেই খাদির দুটি থেকে উৎপন্ন শাখানদী জলঙ্গী ও মাথাভাঙা বাঁচবে কেমন করে ?

(4) মেজর রেনেলের মানচিত্রে পদ্মাপথের অনেকগুলি বাঁকের মধ্যে একটি বাঁক কুষ্টিয়ার কাছে অবস্থিত। ঐ বাঁক 'h' থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মার একটি হানাপথ গড়ে ওঠে, যার নাম গড়াই (চিত্র-1)। সেই হানাপথ নিম্নাংশে মধুমতীর সঙ্গে যুক্ত হয় এবং মাত্র 10 বৎসরের মধ্যে (1820-1830 খৃস্টাব্দ) গড়াই-মধুমতী একটি বিশাল নদীতে রূপান্তরিত হয়। পদ্মার পথে 'h' বাঁকটি আজও আছে বলে গড়াই মধুমতী সাবলীলভাবে বয়ে চলেছে।

(5) রেনেলের সময়ে তিস্তানদ উত্তরবঙ্গে পূর্ণর্ভবা, আত্রেয়ী আর করতোয়ার পথে বয়ে যেত—তাই নদীটির নাম ত্রিস্রোতা বা তিস্তা। 1787 সালের কথা। হিমালয়ের কোলে অঝোর ধারায় বৃষ্টি, ফলে প্রবল বন্যা নেমে এল তিস্তার বুকে। জলপাইগুড়ি শহরের কাছে একটি হানাপথ কেটে নিল তিস্তা, ছুটে চলল দূর অতীতে ফেলে আসা দক্ষিণপূর্বমুখী পথে। ঐ পথটি উপরের পাহাড়ী নদীপথের সঙ্গে প্রায় সরল থাকায় 3-4 বৎসরের মধ্যেই তিস্তার শুরু হল নতুন পথে চলা। পিছনে ফেলে আসা ত্রিধারা এক একটি ছোট নদীরূপে আজও বয়ে চলেছে [চিত্র-1]।

(6) ঐ 1787 সালের বর্ষাতেই তিস্তার সঙ্গে সংযোগ ঘটে ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদী দুটির। তিস্তার হঠাৎ নেমে আসা প্রবল বন্যাগুলি যতই যমুনার খাতকে বড় করে তোলে, ব্রহ্মপুত্রের জলধারা ততই তার পূর্বপথ মেঘনাকে পরিত্যাগ করে যমুনার পথে এগিয়ে চলে। ফলে যে যমুনা নদীতে রেনেলের সময়ে 1 বা 2 লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ বয়ে যেত, সেই 100 মাইল দীর্ঘপথে মাত্র 37 বৎসরে

[1787-1824 খৃস্টাব্দ] 20 থেকে 25 লক্ষ কিউসেকের ধারাগুলি ছুটে চলল, এভাবে তিস্তার সাহায্যে যমুনার মাধ্যমে মিলন ঘটল ভারতের বিশাল দুটি নদনদীর —ব্রহ্মপুত্র আর পদ্মা [চিত্র-1]।

(7) রেনেলের সময়ে নিম্নাংশে পদ্মা ও মেঘনা নদী দুটি প্রায় সমান্তরাল দক্ষিণমুখী পথে সাগরের দিকে বয়ে যেত আর একটি ছোট নদী কালীগঙ্গা বিক্রমপুরের কাছে তাদের সংযুক্ত করত। পরবর্তীকালে পদ্মার একটি বাঁক 'j' থেকে একটি ছোট হানাপথ কালীগঙ্গার উৎপত্তি স্থল 'k' অঞ্চলে পতিত হয় [চিত্র-1]। পথের সরলতার জন্য পদ্মার জলধারার পূর্বলব্ধ পূর্বমুখী তীব্র গতি কালীগঙ্গার পথে ছুটে চলে। অনন্তর 1794 খৃস্টাব্দের এক প্রবল বন্যার পদ্মা কালীগঙ্গার পথ ধরে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের বিখ্যাত মন্দির ও প্রাসাদ এবং পরবর্তীকালে রাজা রাজবল্লভের প্রাসাদ ধ্বংস করে নিজ ললাটে "কীর্তিনাশা পদ্মা" নাম অঙ্কিত করে। মাত্র 24 বৎসরে [1794-1818 খৃস্টাব্দ] পদ্মার মূল প্রবাহ মেঘনার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরানো পথটি ভুবনেশ্বর খাত নামে পদ্মার অতীত স্মৃতিরূপে পড়ে আছে। এটাই পদ্মা-মেঘনা মিলনের ইতিকথা।

(8) গত কয়েক শতাব্দীতে দামোদর তার পথকে বারবার পরিবর্তিত করেছে—সেই ফেলে আসা খাতগুলি হল খাড়ি, বাঁকা, বেহুলা, কানা দামোদর ইত্যাদি। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বেগোর হানা দিয়ে মুণ্ডেশ্বরী খালের সঙ্গে সংযোগ ঘটে দামোদরের। শক্তিগড় থেকে বেগোর হানা পর্যন্ত নদীজলের পূর্বলব্ধ গতিপথের সরলতার জন্য মুণ্ডেশ্বরীর পথে ছুটে চলেছে বলে দামোদরের শতকরা 80 ভাগ জলই আজ ঐ পথে রূপনারায়ণে পতিত হচ্ছে। [দ্রষ্টব্য দামোদর আজও দুঃখের নদ কেন জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মার্চ ও এপ্রিল, 1979]

(9) বিংশ শতাব্দীর প্রথমে মেদিনীপুর জেলায় জলসেচের সুবিধার জন্য কংসাবতী থেকে একটি খাল কেটে সংযোগ করা হয় শিলাবতীর সঙ্গে। কিন্তু কংসাবতীর পথ ঐ খালের সঙ্গে প্রায় সরল থাকায় কংসাবতীর শতকরা 60 ভাগ জলই আজ শিলাবতীর মধ্য দিয়ে রূপনারায়ণে পতিত হয়। এভাবে এই বিংশ শতাব্দীতে আমাদের শত বাধা সত্ত্বেও গড়ে উঠছে দুটি নদী মুণ্ডেশ্বরী ও কংসাবতী।

(10) কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে কুশী নদী বিহার থেকে বাংলার মধ্যভাগ দিয়ে বয়ে চলত, সে বারবার হানাপথ কেটেছে এবং নদীজলের পূর্বলব্ধ গতির জন্য সে তার পথকে বারবার পরিবর্তিত করে আজ শুধু বিহারের নদীরূপে গড়ে উঠেছে।

সবশেষে বলব, নদীবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি উপলব্ধি করে নদীর অতীত ও বর্তমান পথ সকল সম্যক বিশ্লেষণ করে আমাদের নদীপরিকল্পনাগুলি রচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। না হলে আমরা শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে যে সব পরিকল্পনা [যথা ফরাক্কা ব্যারাজ প্রকল্প, ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা সংযোগ প্রকল্প, গঙ্গা-কাবেরী গ্রাণ্ড ক্যানাল, ন্যাশনাল ওয়াটার গ্রিড (National water grid) ইত্যাদি] রূপায়িত করব, সে উদ্দেশ্যগুলি তো সাধিত হবে না, পরন্তু তা ভবিষ্যতে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও সহস্র জীবন ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠবে। [দ্রষ্টব্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অক্টোবর, 1979 এবং বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী, মে-জুন ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1980 সংখ্যায় লেখকের নিবন্ধগুলি]

সর্বনাশা পলি

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়*

বন্যা কিম্বা ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হঠাৎই আসে। তার আকস্মিকতায়, তার ক্ষতিকর শক্তিতে বিমূঢ় মানুষ ধাতস্থ হবার আগেই সেই প্রলয়ের অবসান। যেমন চক্ষের নিমেষে তার আগমন তেমনই দ্রুত তার প্রস্থান। কিন্তু প্রতিদিন আমাদের চোখের অগোচরে এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে চলেছে যা বন্যার মতই বিধ্বংসী, ভূমিকম্পর মতই ভয়ঙ্কর। তার ঘটার গতি অতি ধীর তাই তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে বহু বছর লেগে যায়। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ের নাম পলি—যার আবরণে বহু প্রসিদ্ধ জনপদ বিলুপ্ত হয়েছে, নদীর স্রোত হয়েছে রুদ্ধ, সভ্যতার বিকাশ হয়েছে স্তিমিত।

সামান্য মাটির একটি কণা হল পলি, তবে স্থানচ্যুত হলে তার অবস্থা অনেকটা আগাছার মত। উদ্ভিদবিজ্ঞানী যেমন বলবেন যে উদ্ভিদ নিজের জায়গায় নেই তাই হল আগাছা। পলি সম্বন্ধেও অনেকটা সেকথাই প্রযোজ্য। পাহাড়ের গা থেকে ভেঙে আসা পাথরের টুকরো খরস্রোতা পাহাড়ী ঝর্ণার জলের তোড়ে নাচতে নাচতে যখন সমতলে এসে পৌঁছয় ততক্ষণে ক্রমাগত ঘর্ষণ যখন আর ঠোকাঠুকিতে সেই টুকরো পরিণত হয়েছে মিহি বালির দানায়। অবশ্য পাথর বা মাটির স্থানচ্যুতি যে কেবল নদীর উৎস থেকে হচ্ছে তা নয়—তার গতিপথের দুই কূল থেকেও হচ্ছে। কিছু মাটি এমনিই বৃষ্টির জলের সঙ্গে চুইয়ে এসে পড়ে, কিছু নদীর স্রোতের ধাক্কায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে জলে পড়ে যায়। যতক্ষণ ঐ মাটি বা পলির ওজন বহন করে নিয়ে যাবার মত শক্তি প্রবহমান জলধারায় থাকে ততক্ষণ সেই মাটি জমতে পায় না। কিন্তু ক্রমে নদী যত বেগ হারিয়ে ফেলতে থাকে—সমতলে এসে ঢাল কমে যায় তখনই সেই জলের সঙ্গে বাহিত পলির কণা চেপে বসে যায়, নদীর গর্ভ মাটিতে অগভীর হয়। গ্রীষ্মকালে জলের বুকে জেগে ওঠে চর। নদীর এইরূপের সঙ্গে আমরা ভালরকমই পরিচিত।

উত্তর ভারতের নদীগুলি পলিবাহী। দক্ষিণে কিন্তু এ সমস্যা নেই। সেজন্য দক্ষিণ ভারতের নদীতে বাঁধ দিয়ে যেসব জলাধার নির্মাণ করা হয়েছে তাদের পলি পড়ার সমস্যা একেবারেই নেই। অথচ দামোদরের জলাধারগুলিতেই পলি পড়া এক বিরাট সমস্যা। আর প্রযুক্তিবিদদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জও বটে। সেজন্যই নদীবিজ্ঞানের একটা অংশ হল পলির গতি ও প্রকৃতি নিয়ে অনুসন্ধান। অবশ্যই পলি কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে পলিবিশারদরা এসব নিয়ে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছন তার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নদী-প্রকল্প, বন্যার যে একটা কারণ অত্যধিক পলিতে নদীখাত বুজে আসা এটা সকলেই জানেন। কিন্তু এই সমস্যার উৎস আসলে ঘটনাস্থল থেকে বহু শত মাইল দূরে। পাহাড়ে নির্বিচার জঙ্গলকাটার ফলে ভূমিক্ষয় হয়—সেই ভূমিক্ষয়ের সঙ্গে নদীর অববাহিকায় বন্যার ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এগুলি আজকাল বিজ্ঞানীরা অনেক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর জেনেছেন। নদীবিজ্ঞান বা হাই-ড্রলিক স্টাডি বিষয়টির বয়স তাই নবীন।

অথচ বহু প্রাচীনকালেও সভ্য মানুষ প্রবহমান

*A-1, পুষ্পনীড়, 164/78, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-700045

জলধারার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানত না যে তা নয়। প্রাচীন মিশরীয় ও রোমকরা নদীর জলকে আটকে সেচকাজে ব্যবহারে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। বিরাট বিরাট জলাধার সে যুগেও করা হত. তবে পলিজমার ব্যাপারটি সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই মনে হয়। অথবা বুঝতে পারলেও তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার মত কৌশল হয়ত তাদের জানা ছিল না। তা না হলে একসময়কার সমৃদ্ধ মেসোপটেমিয়া যেখানে এক কোটি একর চাষযোগ্য জমিতে বাস করত তিন কোটি মানুষ আজ এই অবস্থায় পৌঁছত না। কেবলমাত্র পলি পড়ে জলাধারগুলি মজে যাওয়াতে মেসোপটেমিয়ার এই দুর্দশা। আজ সেখানে কৃষিযোগ্য ভূমি পঞ্চাশ লক্ষ একর মাত্র।

নদীবাহিত পলি যেমন মাটিকে উর্বর করে তেমনি সর্বনাশও করে কম নয়। আর একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ সিন্ধুনদের তীরের মহেঞ্জোদাড়ো। প্রতি-বার সিন্ধুনদে বন্যা হয়ে শহরকে পলিতে আবৃত করেছে। পরে সেই গভীর পলি আস্তরণের ওপর গড়ে উঠেছে অন্য একটি শহর। জানা যায় গত পাঁচ হাজার বছরে সিন্ধুনদের উপত্যকা পঞ্চাশ ফুট উঁচু হয়েছে। তাহলেই বোঝা যাবে কি পরিমাণ পলি এই নদী বহন করে।

তবে অত দূরে যাবার প্রয়োজন কি? পলিবাহী নদীর বিচিত্র আচরণের কথা আলোচনা করতে গেলে গঙ্গা তুলনারহিত। গঙ্গার মূল প্রবাহ বহুকাল আগেই চলে গেছে পদ্মায়। ভাগীরথীর হুগলীর দুরবস্থা আমরা ভালভাবেই জানি কারণ এই নদীর জীবনমরণের সঙ্গে কলকাতা শহর ও বন্দরের ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা। পুরাতাত্ত্বিকরা মনে করেন ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীটি ভৌগোলিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। ভগীরথ নামে বঙ্গদেশের এক রাজা সম্ভবত তখনি বুজে আসা ভাগীরথীতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। আবার কারো কারো মতে ভাগীরথ গঙ্গা থেকে একটি খাল কেটে দক্ষিণে নিয়ে এসেছিলেন—রাজমহল পাহাড়ের কাছ থেকে পূর্বমুখী গঙ্গার স্রোতকে এই ভাবে জোর করে দক্ষিণমুখী করা হয়।

যাই হোক এটা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। তবে একথা ঠিক যে গতিপথের পরিবর্তন, প্রবাহের বাড়া-কমা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য গঙ্গা নদী ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট গবেষণার খোরাক জোগাচ্ছে। গঙ্গা আর তার উপনদীগুলির জলস্রোতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত নগরীর উত্থান-পতনের কাহিনী। ঘর্ঘরার তীরে অযোধ্যা, ভাগীরথীর তীরে গৌড়, গঙ্গার তীরে হস্তিনাপুর—ইতিহাসে এইরকম কত বিখ্যাত শহরের কথা পাওয়া যায় যেগুলি ক্রমে তাদের প্রাধান্য হারিয়েছে। আরো সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। 1810 সালে চন্দননগরের গঙ্গার উপর ইংরেজ আর ফরাসীদের মধ্যে নৌ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নিযুক্ত জাহাজগুলির গভীরতা ছিল কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট। বহরমপুর পর্যন্ত গঙ্গা ভালভাবেই জলপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে—এমনকি আলীবর্দী খাঁয়ের সময় পর্যন্ত। 1913 সালের পর থেকে হুগলীর এত অবনতি যে বর্ষার তিন মাস বাদ দিলে মূল প্রবাহ থেকে জল আসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

পলি পড়ে পড়ে হুগলীর খাতের মধ্যে এখন জাহাজ চলাচলের জন্য মাত্র 250 থেকে 350 ফুট চওড়া একটি পথ অবশিষ্ট আছে। শুধু ড্রেজিং করে নদী গর্ভ গভীর করা সম্ভব নয়। প্রবল জলপ্রবাহে পলি ধুয়ে দেওয়া হল সব থেকে ভাল সমাধান।

হুগলীর অবনতি নিয়ে অনেক দিন থেকেই চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে—বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। পাললিক নদীর চরিত্র নিয়ে তেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা যত দিন করা হয় নি ততদিন এ বিষয়ে কার্যকর কোন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া যায় নি।

স্বাধীনতার পর নদীবিজ্ঞান নিয়ে কাজ আরম্ভ

হল পুরোদমে। পুণার কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে মডেল নিয়ে পরীক্ষা চলল। হুগলীকে ভাল করে বোঝবার জন্য 1942 সালে কলকাতা পোর্ট কমিশনারের হাইড্রলিক স্টাডি বিভাগ খোলা হল। ভাগীরথী থেকে যে পলি এসে হুগলীতে জমা হচ্ছে সেটা কি ভাবে আসছে, কেমন ভাবে আসছে, কত দিন জমছে ইত্যাদি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন এঁরা। নদীগর্ভে কি কি শক্তি কাজ করছে, বিভিন্ন স্টেশনে পলির নমুনা পরীক্ষা করে তেজস্ক্রিয়তার সাহায্য নিয়ে তাঁরা নানা আধুনিক পদ্ধতিতে পলি সমস্যার মোকাবিলার জন্য একটা পরিকল্পনা বের করলেন। 1964 সালেই হাইড্রলিক স্টাডি বিভাগ বলেছিলেন হুগলীর নাব্যতা কমে আসছে বলেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার কোন কারণ ঘটে নি। এই নদীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা এর যথেষ্টই আছে।

পলি, তুচ্ছ এক দানা মাটি আজ আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে অস্তিত্ব রাখার প্রশ্ন। মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তির লড়াই আবহমান কালের। দেখা যাক অপ্রতিহত পলিপ্রবাহের গতি অবশেষে আমাদের অবস্থা এককালের সপ্তগ্রামের মত করে তুলতে পারে কি না।

মাটি

কমল চক্রবর্তী*

মাটির ওপরেই আমরা থাকি, মাটিতে ঘর বানাই রাস্তা বানাই, চাষের কাজ করি অর্থাৎ মাটির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিবিড়। মাটির সম্পর্ক এত নিবিড় হলেও তার সম্পর্কে অনেক জানার আছে। কোন লোক ব্যবহারে সরল, সাদাসিদে হলে আমরা বলি মাটির মানুষ, কিন্তু মাটি মোটেই সহজ সরল নয়, রসায়নের চোখে সে এক জটিল সিলিকেটের সমষ্টি। সিলিকেট হল এমন একটি যৌগপদার্থ যাতে সিলিকা নামক মৌলিক পদার্থটি বর্তমান। সাধারণের চোখে অবশ্য মাটি মানে দাঁড়ায় ধুলো, বালি, কাদা প্রভৃতি।

মাটির সৃষ্টি

মাটির সৃষ্টি শিলা থেকে। এই শিলার ওপর প্রকৃতি তার প্রভাব বিস্তার করে অর্থাৎ শিলার ওপর তাপ, বৃষ্টি, বায়ু, জল ও জীবাণুর ক্রিয়া চলে এবং এর ফলে শিলা মাটিতে পরিণত হয়। যদিও শিলা থেকে মাটির সৃষ্টি তবু শিলা আর মাটি এক জিনিস নয়। শিলাকে গুঁড়ো করলেই মাটি পাওয়া যাবে না। শিলার গুঁড়ো আর মাটি গুণের দিক দিয়ে আলাদা। মাটি জল টানতে পারে আবার জল ধরেও রাখতে পারে ; জলকে ধরে রাখবে বলে চাষের কাজে মাটির প্রয়োজন খুব বেশী। শিলায় জল ধরে রাখার ক্ষমতা খুব কম আর তাই শিলার ওপর চাষবাসের কাজ প্রায় হয় না বললেই চলে। এগুণ ছাড়া রাসায়নিক গঠনেও শিলা ও মাটির মধ্যে পার্থক্য আছে। মাটিতে সিলিকার পরিমাণ শিলার থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। কিন্তু বিভিন্ন ধাতুর যৌগ শিলাতে বেশী পরিমাণে থাকে। মাটি ও শিলা দুয়েতেই সিলিকেট আছে। কিন্তু মাটির সিলিকেটের কেলাস দ্বিমাত্রিক আর শিলার সিলিকেটের কেলাস ত্রিমাত্রিক। শিলা মাটিতে পরিণত হতে বহু বছর সময় লাগে কারণ এই পরিবর্তন হয় খুব ধীরে ধীরে। দু-এক মিলিমিটার মাটির একটি স্তর, যা আমাদের জুতোর তলায় লেগে থাকতে পারে, তৈরি হতে কয়েক'শ বছরও লেগে যায়।

রকমারী মাটি

মাটির মধ্যে যে সিলিকেটগুলি থাকে প্রাকৃতিক উপায়ে আর্দ্রবিশ্লেষের ফলে তার ক্ষারীয় ও আম্লিক উপাদানগুলি আলাদা হয়ে যায়। মাটির মধ্যে যে সব খনিজ থাকে (যেমন, ইলাইট, মন্টমরিলোনাইট, বাইডেলাইট প্রভৃতি) তাদের ওপর আর্দ্র বিশ্লেষ ও জারণ-বিজারণ কাজ চলতে থাকে। মাটিতে যে-সব উদ্ভিদ থাকে তারা মরে গিয়ে পচতে সুরু করে। এর ওপর মাটির জীবাণুগুলি কাজ করে। এইভাবে পচার ফলে ও জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও বিভিন্ন রকম জৈব অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়।

মাটিতে যে-সব অজৈব পদার্থ থাকে তারা বিভিন্ন মাপের কণা দিয়ে তৈরী। এই কণার মাপের ওপর কাদা, পলি, বালি প্রভৃতিকে আলাদা করে দেখা হয়। কাদা অংশই সবচেয়ে কাজের। কাদার সঙ্গে পলি ও বালি বিভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকলে কাদার বৈশিষ্ট্যও আলাদা হয়ে যায়। মৃৎশিল্পে পলির ভাগই বেশী থাকে, সেখানে কাদা বা বালির ভাগ কম রাখা হয়। আবার পেট্রোলিয়াম বের করার কাজে কাদা মাটির প্রয়োজন হয় বেশী। কাগজশিল্পে,

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700009

ইট তৈরিতে, জীবাণু ধ্বংসের কাজে বিভিন্ন গুণের মাটি লাগে।

সাধারণভাবে মাটিকে আমরা বিভিন্নভাগে ভাগ করে থাকি, যেমন, পলি মাটি, দোআঁশ মাটি, বেলে মাটি, এঁটেল মাটি, কাদা মাটি প্রভৃতি। নদীর জলে বয়ে আসা মাটিকে পলি মাটি বলে (Allunial soil)। দোআঁশ মাটিতে বালির পরিমাণ প্রায় সমান সমান থাকে। বেলে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশী থাকে, এ ধরণের মাটিতে চাষবাসের কাজ ভাল হয় না। এঁটেল মাটিতে বালির ভাগ কম থাকে। কাদা মাটিতেও বালির ভাগ কম। এই মাটিতে জল জমে থাকে। এই মাটি ধান ও পাট চাষের উপযোগী।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধি

ভারতে লোকসংখ্যা যে-হারে বেড়ে চলেছে তাতে বেশী পরিমাণে ফসল ফলাতে না পারলে খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী থাকতে হবে। তাই অধিক খাদ্য উৎপাদনের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। জমির উর্বরতার ওপর এই উৎপাদন নির্ভর করে। জমিতে যদি হিউমাস জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে তবে সে জমি উর্বর হয়। জমি অনুর্বর হলে জমিতে সার দিতে হয়। বিভিন্ন অজৈব লবণ এর জন্য জমিতে দিতে হয়। এছাড়া জৈব সারও প্রয়োগ করতে হয়। জৈব পদার্থের পরিমাণ মাটিতে কম হলে সে মাটি অনুর্বর হয় তাই সে ধরণের জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করা একান্ত দরকার। জৈব পদার্থ মাটির জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ভেঙে যায় এবং তার থেকে উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থ যেমন পাতা, শিকড়, কাণ্ড এবং প্রাণিজ পদার্থ যেমন জীবজন্তুর মলমূত্র ও দেহাবশেষ মাটিতে মিশে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হিউমাস নামে জৈব পদার্থে পরিণত হয়।

জমির উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে মাটির প্রকৃতির ওপর। অর্থাৎ কোন মাটিতে যদি অম্লের পরিমাণ বা ক্ষারের পরিমাণ বেশী হয় তবে উৎপাদন শক্তি খুব কমে যায়। যে মাটিতে অম্লের পরিমাণ বেশী সেখানে চুনাপাথর, ডলোমাইট, পোড়াচুন, বেসিক স্লাগ প্রভৃতি প্রয়োগ করা হয় এবং যে জমিতে ক্ষারের ভাগ বেশী সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে জিপ্‌সাম প্রয়োগ করা হয়। ক্ষারধর্মী জমিতে বার্লি ও সারবীটের ফলন ভাল হয় কিন্তু অম্লধর্মী জমিতে আলু, সয়াবীন, বীন, তামাক প্রভৃতির ফলন ভাল হয়।

মাটির গুণাগুণ জেনে গোবর সার, ফসফেট ও নাইট্রোজেনঘটিত সার জমিতে দিতে হয়। ভাল ফসলের জন্য জমিতে সার প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে জলের সরবরাহের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এর জন্য আমাদের বেশীর ভাগ সময় বৃষ্টির ওপরই নির্ভর করতে হয়। জমি সর্বাধিক যে পরিমাণ জল ধরে রাখতে পারে, তাকে জমির জল ধারণক্ষমতা (Field Capacity) বলে। সুতরাং জমিতে জলের পরিমাণও একটা নির্দিষ্ট মাপে দিতে হবে অর্থাৎ অতিরিক্ত জল বের করার ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যথায় উৎপাদন কমে যাবে। জমিতে জল জমে থাকলে মাটির বহুপ্রকার জৈব অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং তার ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টিলাভে ব্যর্থ হয়। জল জমা থাকলে বায়ু চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। এই সব কারণে অতিরিক্ত জলকে অবশ্যই বের করে দেওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে যদিও মাটির উর্বরতা শক্তি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, তবুও ভারতের জমির উৎপাদন শক্তি খুব কম। গত 1951-52 সালে যেখানে প্রতি হেক্টর জমিতে চাল ও গমের ফলন ছিল যথাক্রমে 7·1 এবং 6·5 কুইন্টাল সেখানে 20 বছর বাদে অর্থাৎ 1971-72 সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে 11·4 এবং 13·8 কুইন্টাল। মাটির উর্বরতাশক্তি যাচাই করার জন্য ভারতের সর্বত্র মৃত্তিকা পরীক্ষাগার দরকার। কিন্তু এই পরীক্ষাগারের সংখ্যা এদেশে খুবই কম।

মাটি নিয়ে এত কথা বলার পর কেউ যদি বলেন,

বিজ্ঞান তো কত অসাধ্য সাধন করেছে, তাই মাটিকে বাদ দিয়ে কি চাষ করা সম্ভব নয়? বিজ্ঞানের উত্তর, মাটি ছাড়াও চাষ সম্ভব। অর্থাৎ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল, বায়ু, আলো সার প্রভৃতি পেলেই গাছ বেড়ে উঠতে পারে। কোন পাত্রে এ সবের ব্যবস্থা করে গাছকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। তবে ব্যাপক চাষ মাটিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। মাটিকে বাদ দিয়ে চাষ করতে গেলে খরচের পরিমাণও বেড়ে যায়। তবে সব উপাদান মানুষের হাতে থাকলে তাকে প্রকৃতির খেয়ালিপনার ওপর বেশী নির্ভর করতে হবে না। কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সরবরাহ করতে পারলে পৃথিবীর যে কোন জায়গাতেই মানুষ শস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে। আগামী দিনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভেবে উৎপাদনকে বিজ্ঞানভিত্তিক করতে আমাদের এখনই সচেষ্ট হওয়া দরকার।

[মাটি নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে লোমোনোসভ, ডকুশেভ, কোনোনোভা, স্প্রিংগার, জ্যাকসন, জেনী, পাইপার, হফম্যান, স্কিনার ও এস. ইউ. খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

মাছের উপর তাপমাত্রার প্রভাব

অজিতকুমার মেদ্দা*

[মাছের প্রোটিনের পরিমাণ ও বংশবৃদ্ধি পরিবেশের তাপমাত্রার উপর কতটা নির্ভর করে সে সম্পর্কে লেখকের গবেষণার কিছু কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি পরিবেশের তাপমাত্রার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কোষের প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া বা বিপাকক্রিয়ার হার তাপমাত্রার উপর অনেকটাই নির্ভর করে। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা তাদের নিজেদের দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা অর্জন করে একটা বড় শারীরবৃত্তীয় সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে। কিন্তু মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীর সেই দক্ষতা নেই। পরিবেশের তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাছের দেহের তাপমাত্রার অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। সীমিত মাত্রার মধ্যে পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলে মাছের দেহের বিপাকপদ্ধতিগুলি ত্বরান্বিত হয় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে বিপাকক্রিয়া ধীর গতিতে চলতে থাকে। সুতরাং, তাপমাত্রার প্রভাবে শরীরের কোষের মধ্যে এক বিপাকীয় নিয়ন্ত্রণ বা অভিযোজন দেখা যায়।

বিভিন্ন তাপমাত্রায় মিঠাজলের বিভিন্ন মাছের বিপাকায় প্রতিক্রিয়া এক নয়। ল্যাটা মাছকে 15°C এবং 25°C তাপমাত্রায় রেখে দেখা গেছে, যে মাছগুলিকে 15°C তাপমাত্রায় রাখা হয়েছিল তাদের পেশীর প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি, কিন্তু লিভার বা যকৃতের প্রোটিনের পরিমাণ কম। দুটি অঙ্গের এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে দেহের বিপাকে এদের ভূমিকা এক নয়। অপেক্ষাকৃত শীতল পরিবেশের মধ্যে (15°C) দেহের বিপাক-হার হ্রাসের ফলে সম্ভবত প্রোটিনের ক্ষয় বা অপচিতি (catabolism) অপেক্ষাকৃত অল্প হয় এবং প্রোটিনের উপচিতি (anabolism) অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। সেই কারণে হয়তো পেশীতে প্রোটিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু যকৃত দেহের সামগ্রিক বিপাকে এক অপরিহার্য যন্ত্র। যকৃতের কাজ অসংখ্য। বহুপ্রকার প্রোটিন ও এনজাইম যকৃতে সংশ্লেষিত হয়। যেহেতু প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি তাপমাত্রার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় সেহেতু যকৃতের প্রোটিন সংশ্লেষণকারী যন্ত্রাণুগুলি সম্ভবত শীতল অবস্থার মধ্যে ঠিক ততটা উদ্দীপনা পায় না যতটা তারা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ তাপমাত্রায় (25°C) উদ্দীপিত হয়ে থাকে। এর থেকে মনে হয়, 15°C তাপমাত্রায় যকৃতে প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাসের কারণ এটাই।

শিঙিমাছের মধ্যে তাপমাত্রার প্রভাবে বিপাকীয় পরিবর্তন, অর্থাৎ তাপমাত্রা-অভিযোজন ল্যাটা মাছ থেকে ভিন্ন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল থেকে বলা যায়, 25°–30°C তাপমাত্রা শিঙিমাছের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। এদের পেশী, যকৃত ও ডিম্বাশয়ের প্রোটিনের পরিমাণ তাপমাত্রা 15°C থেকে 25°C এবং 25°C থেকে 30°C পর্যন্ত বাড়ালে ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ; কিন্তু লিভারের ওজন 15°C তাপমাত্রায় বেশি থাকে। ডিম্বাশয়ের ওজন

* বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা-9

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়। গ্রীষ্মকালীন (জুন-জুলাই) শিঙি মাছ অপেক্ষা শীতকালীন (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) শিঙি মাছের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাধারণত মাছের জনন ঋতু বর্ষাকাল, এ সময়েই এদের বংশবৃদ্ধি হয়। বর্ষাকালে স্ত্রী-মাছের যকৃত ও ডিম্বাশয়ের ওজন এবং এই যন্ত্রগুলির প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে। শীতকালের (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) মাছকে 30°C তাপমাত্রায় মাসাধিককাল রেখে দেখা গেছে, জনন ঋতুতে (বর্ষাকালে) প্রকৃতির মধ্যে মাছের যকৃত এবং ডিম্বাশয়ে যে পরিবর্তন ঘটে ঠিক সেরূপ পরিবর্তন ল্যাবরেটারির মাছের মধ্যে উপরিউক্ত তাপমাত্রায় ঘটে থাকে। এই পরিবর্তন-গুলির মধ্যে শুধু যন্ত্রের (organ) ওজন এবং প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, ডিম্বাশয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ডিমের সংখ্যাও বেশি হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রীষ্মকালীন (জুন-জুলাই শিঙিমাছের যকৃত ও ডিম্বাশয়ের ওজন ও প্রোটিনের পরিমাণ শীতকালীন (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) মাছ অপেক্ষা বেশি। এছাড়া গ্রীষ্মকালীন মাছের ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিমের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। পূর্ণতা-প্রাপ্ত ডিম শীতকালীন মাছের ডিম্বাশয়ে প্রায় দেখা যায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রীষ্ম/বর্ষাকালের মাছের মধ্যে কিংবা ল্যাবোরেটারীতে শীতকালের মাছকে 30°C তাপমাত্রায় রাখলে ডিম্বাশয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের উপরিউক্ত পরিবর্তনগুলি কেন ঘটছে? এথেকে ধারণা করা যায় যে, মাছের ডিমের বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাপ্তিতে যকৃতের কিছু অবদান আছে। জানা গেছে, যে সমস্ত প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিমের পূর্ণ-বৃদ্ধিতে যকৃতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভাইটেলোজেনিন (vitellogenin) নামে একপ্রকার প্রোটিন যকৃতে তৈরি হয়। এই ভাইটেলোজেনিন ডিমের দুটি কুসুম বা ('ইওক') প্রোটিন (yolk proteins), যথা—ফসভাইটিন (phosvitin) ও লাইপোভাই-টেলিন (lipovitellin)-এ রূপান্তরিত হয়। যকৃত থেকে কুসুম (বা 'ইওক') প্রোটিন ক্ষরিত এবং রক্ত বাহিত হয়ে ডিম্বাশয়ে আসে এবং ডিমের পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। এই প্রোটিনের অভাবে ডিমের পূর্ণ-বৃদ্ধি হয় না। এখন স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যকৃতের মধ্যে ভাইটেলোজেনিন নামে 'ইওক' প্রোটিন প্রিকারসার (yolk protein precursor) অর্থাৎ দুটি কুসুম প্রোটিনের পূর্ববর্তী প্রোটিন সংশ্লেষণে পরিবেশের তাপমাত্রার প্রভাব খুবই উল্লেখযোগ্য। ইস্ট্রোজেন (estrogen) নামে স্ত্রী-যৌন হর্মোনের যকৃতে ভাইটেলোজেনিন সংশ্লেষিত হয়। ইস্ট্রোজেনের ক্রিয়া 25°–30°C তাপমাত্রার মধ্যেই দেখা যায়, 15°C তাপমাত্রায় যকৃতে ইস্ট্রোজেনের প্রভাব দেখা যায় না। তাপমাত্রা, হর্মোন প্রভৃতির দ্বারা মাছের শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রগুলির শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ জানলে মাছের দেহের বৃদ্ধি এবং মাছের বংশবৃদ্ধি কিভাবে বাড়বে তা আমরা জানতে পারব।

সৌরশক্তি

অরুণকুমার ঘোষ*

[সূর্য থেকে পৃথিবী কতখানি শক্তি আহরণ করে এবং খুব সহজে কীভাবে আমরা সেই শক্তি কাজে লাগাতে পারি—তদ্বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

সূর্যই যে তাবৎ পার্থিব শক্তির উৎস এই কথাটা বহুকাল ধরে স্কুলপাঠ্য পুস্তকে লেখা থাকলেও ব্যাপারটা এতদিন পর্যন্ত কেতাবী আলোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল। সম্প্রতি খনিজ তেলের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধিতে সারা দুনিয়ার অর্থনীতি টলমল করে উঠতে আমাদের টনক নড়েছে এবং সহসা আমরা কথাটার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করেছি।

একথা পুনরাবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না যে খনিজ তেল বা কয়লা ও—এক কথায় ফসিল জ্বালানি—প্রকৃতপক্ষে সঞ্চিত সৌরশক্তি। সূর্য না থাকলে তো পৃথিবীতে গাছপালা বা প্রাণের উদ্ভব হত না। আর অতি প্রাচীনকালে গাছপালা বা প্রাণীর অস্তিত্ব না থাকলে ফসিল জ্বালানিরই বা উৎপত্তি হত কী করে?

তিন-শ' বছর আগে মহাবিজ্ঞানী আইজাক নিউটন ঝাড়লণ্ঠনের প্রিজ্‌মের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন সূর্যরশ্মি আসলে সাতটি বর্ণ বা রঙীন আলোর সমন্বয়ে গঠিত। অবশ্য ঈশ্বরের প্রেরিত আলোক যে বিভাজ্য সেই কথা বলা বা প্রমাণ করায় ক্রুদ্ধ ঈশ্বরের ব্যাপারীরা তাঁকে কম হেনস্তা করে নি। এবং ধর্মভীরু নিউটনের সেজন্য বৃদ্ধবয়সে অনুতাপ হয়েছিল।
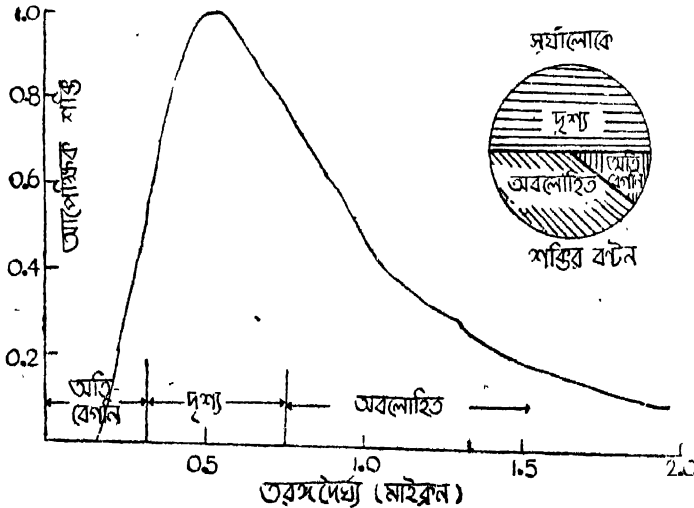
চিত্র 1: সৌর বর্ণালীতে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বনাম আপেক্ষিক শক্তি। বৃত্তের সাহায্যে সূর্যালোকের অতিবেগনি, দৃশ্য ও অবলোহিত রশ্মির মধ্যে শক্তির বণ্টন দেখানো হয়েছে। 1 মাইক্রন =1/1000 মিলিমিটার।

*কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া-741235

কিন্তু বিজ্ঞান তারপর থেমে থাকে নি। নিউটনোত্তর বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন শুধু সূর্যরশ্মি নয়, স্বাভাবিকভাবে নির্গত সব রশ্মিই বিভিন্ন দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সমবায়ে গঠিত। সূর্যরশ্মিতে কী ধরণের দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের সমাবেশ এবং তাদের আপেক্ষিক শক্তি কত ছবিতে (চিত্র-1) দেখানো হয়েছে। সৌরবর্ণালীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শক্তি দৃশ্য আলো, চল্লিশ ভাগ অবলোহিত এবং বাকি দশভাগ অতি-বেগনি রশ্মির মধ্যে বণ্টিত।

সূর্যরশ্মির সহায়তায় প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে সালোকসংশ্লেষ নামক একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে। এই বিক্রিয়া বন্ধ হলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে যে শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে তার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ পৃথিবীতে আসছে। আর পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যে পরিমাণ সৌরশক্তি আসছে তার এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ব্যয়িত হচ্ছে সালোকসংশ্লেষের কাজে (সারণি দ্রষ্টব্য)।

প্রতি সেকেণ্ডে	মেগাওয়াট শক্তি
সূর্য থেকে নির্গত হয়	380,000,000,000,000,000,000
পৃথিবীতে পৌঁছায়	173,000,000,000
পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত হয়	58,000,000,000
বায়ুমণ্ডল, মাটি ও জলে শোষিত হয়	86,000,000,000
সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগে	40,000,000

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সূর্যের যে বিকিরণ এসে পৌঁছচ্ছে, সৌরবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে তার পরিমাণ মাপছেন। মাপজোখ করে দেখা গেছে গড়ে মিনিটে প্রতি বর্গসেন্টিমিটার পরিমিত জায়গায় প্রায় 1·94 ক্যালরি শক্তি এসে পৌঁছচ্ছে। বিদ্যুৎ শক্তির হিসেবে এর পরিমাণ প্রতি বর্গমিটারে 1·36 কিলোওয়াট। এই শক্তির শতকরা একশ ভাগ, অর্থাৎ সবটাই যদি বিদ্যুৎ শক্তিকে রূপান্তরিত করা সম্ভব হত তবে ভারতের সমপরিমাণ স্থানে কয়েক মিনিটে যতখানি সৌরশক্তি এসে পৌঁছায় তাতে সারা ভারতের সারা বছরের বিদ্যুতের চাহিদা মিটে যেত।

অবশ্য এই শক্তির সবটা ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় না। একটা বড় অংশ বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়, বেশ কিছুটা প্রতিফলিতও হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে যতটা পৌঁছায় তার দৈনিক গড় 4·42 কিলোওয়াট প্রতি বর্গমিটারে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রায় এক বর্গকিলোমিটার জায়গায় যে-পরিমাণ সৌরকিরণ পৌঁছায় তার শতকরা দশভাগ বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারলে কলকাতার বিদ্যুৎ-চাহিদা পুরোপুরি মেটানো যেত!

শতকরা দশভাগ রূপান্তরকরণের কথা বললাম এইজন্য যে, এখনও পর্যন্ত যত রকম কলের সাহায্যে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা গেছে, তার কোনটিরই দক্ষতা শতকরা 10-এর বেশি নয়। অবশ্য, গবেষণা চলছে এবং কেউ কেউ শতকরা 20র বেশি দক্ষতাসম্পন্ন কলের আবিষ্কার দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ, গাছপালা যে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তার দক্ষতা কত? —মাত্র শতকরা 1 ভাগ! দেখা গেছে সৌরশক্তি থেকে তাপশক্তি উৎপাদনের দক্ষতাই সবচেয়ে বেশি—প্রায় শতকরা 60 ভাগ। এবং এই রূপান্তরকরণের পদ্ধতিও খুব সোজা, খরচও তেমন বেশি নয়। আমরা এখন সেই সব পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

সৌরশক্তির রূপান্তর করতে হলে প্রথমে বেশ খানিকটা জায়গার ওপর পতিত সৌর-বিকিরণ সংগ্রহ

করতে হবে। যার সাহায্যে সেই কাজটা করা হয়, তাকে বলা যায় সৌরশক্তি সংগ্রাহক, বা অল্পকথায়, সংগ্রাহক। সমতলাকৃতি হতে পারে, অথবা অবতল আয়নার আকারের হতে পারে।

সমতলাকৃতি সংগ্রাহক সাধারণতঃ কাচের ঢাকনা দেওয়া বাক্সের আকারে হয়। বাক্সটা কুপরিবাহী বস্তু, যথা কাঠ, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদির তৈরী হয়। কাচের ওপর যতটা বিকিরণ পড়ে তার
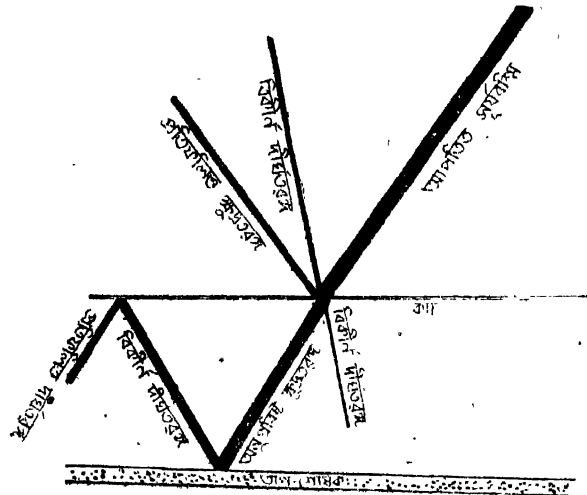
চিত্র 2: কাচের ঢাকনা দেওয়া সমতল সংগ্রাহকের উপর আপাতিত সূর্যরশ্মির বিভাজন। অনুপাত বোঝাতে দাগ সরু-মোটা করা হয়েছে।
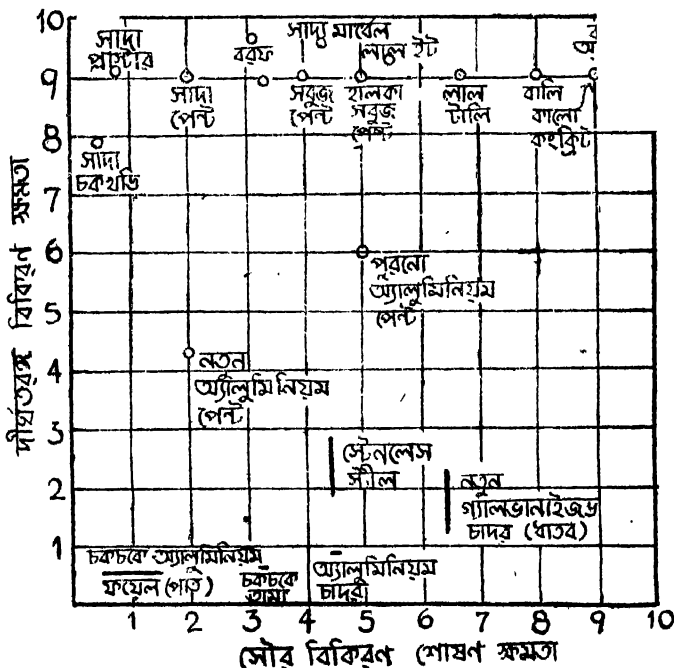
চিত্র 3: বিভিন্ন বস্তুর সৌরবিকিরণ শোষণ-ক্ষমতা বনাম তাপবিকিরণ ক্ষমতা।

প্রায় শতকরা আশি ভাগ ভিতরে যায়, আট ভাগ প্রতিফলিত হয়। কাচটা গরম হয়ে অল্পক্ষণ পরে দীর্ঘতরঙ্গ (তাপতরঙ্গ) বিকিরণ করতে থাকে। এর ফলে প্রায় শতকরা 8 ভাগ বিকিরণ বাইরে এবং 4 ভাগ বাক্সের ভিতরের দিকে যায়। বাক্সের ভিতরে প্রবিষ্ট শতকরা 80 ভাগ ক্ষুদ্রতরঙ্গ তাপশোষকে শোষিত হয় (চিত্র 2)

পুরণো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বাক্সের ভিতরে শোষিত ক্ষুদ্রতরঙ্গের অধিকাংশই দীর্ঘতরঙ্গের আকারে বিকীর্ণ হয় এবং কাচের তলে তা বারবার 'পূর্ণ প্রতিফলিত' হতে থাকে ফলে বাক্সের ভিতরের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেড়ে যায় একই কারণে বন্ধ-শার্সি মোটরগাড়ির ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা থেকে বেশি হয়
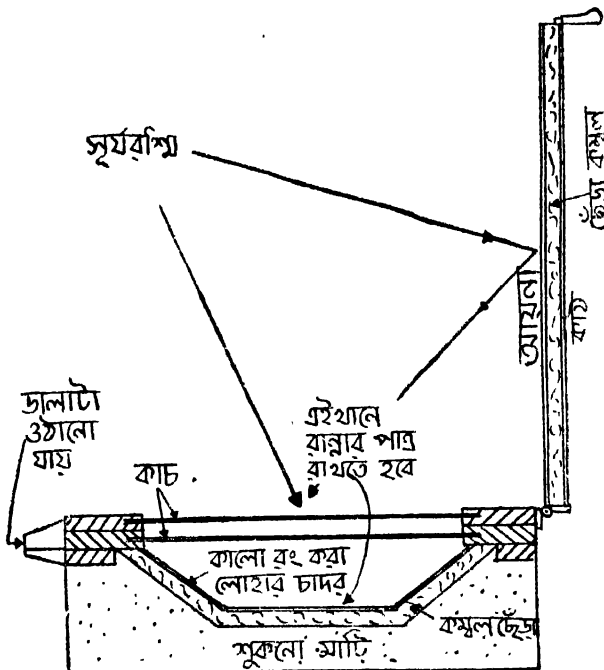
চিত্র 4: সমতল সংগ্রাহক-বিশিষ্ট সৌরচুল্লী।

সাধারণতঃ বলা হয়, ভাল তাপশোষক ভাল বিকিরকও বটে। অঙ্কের ভাষায়, তাপশোষণ গুণাঙ্ক, α ও বিকিরণ গুণাঙ্ক ϵ হলে, $\alpha/\epsilon=1$। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্য। শোষিত তরঙ্গ ও বিকীর্ণ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য এক হলেই কথাটার সত্যতা বজায় থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ সৌরবিকিরণ শোষণ করার ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রতরঙ্গ শোষিত হচ্ছে এবং দীর্ঘতরঙ্গ বিকীর্ণ হচ্ছে। তাই উপযুক্ত বস্তু ও রঙের সমন্বয়ে α/ϵ অনুপাত 20 পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র 3)।

সমতলাকৃতি সংগ্রাহকের সাহায্যে রান্না করার জন্য সৌরচুল্লী বানানো যেতে পারে। বাক্সের ওপর একটা সমতল আয়না লাগিয়ে প্রতিফলিত সূর্যকিরণ যোগ করলে তাপমাত্রা আরো বাড়ে (চিত্র 4)।

ধান সিদ্ধ করে সাধারণতঃ বাঁধানো সিমেন্টের মেঝেয় শুকানো হয়। তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সৌরচুল্লীতে শুকানো যেতে পারে। সে সব চুল্লীর অবশ্য প্রতিফলক আয়নার দরকার নেই। কাঠের বাক্সের উপর তির্যকভাবে কাচের ঢাকনা লাগালেই চলে (চিত্র 5)। শুধু ধান কেন, নানারকমের

শস্যাদি, খাদ্যদ্রব্য, এমনকি ভিজে জামাকাপড় শুকানোর জন্যও এই ধরণের চুল্লী ব্যবহার অনেক সুবিধা।

স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগারে পাতিত জলের খুব প্রয়োজন। ডাক্তারখানায়, ওষুধের দোকানে বা মোটরগাড়ির ব্যাটারিতেও পাতিত জল হামেশা লাগে। সমতলাকৃতি সংগ্রাহক ব্যবহার করে কীভাবে সৌরশক্তির সহায়তায় জল পাতন করা যায়,

চিত্র 5: শস্যাদি শুকানোর জন্য সৌরচুল্লী
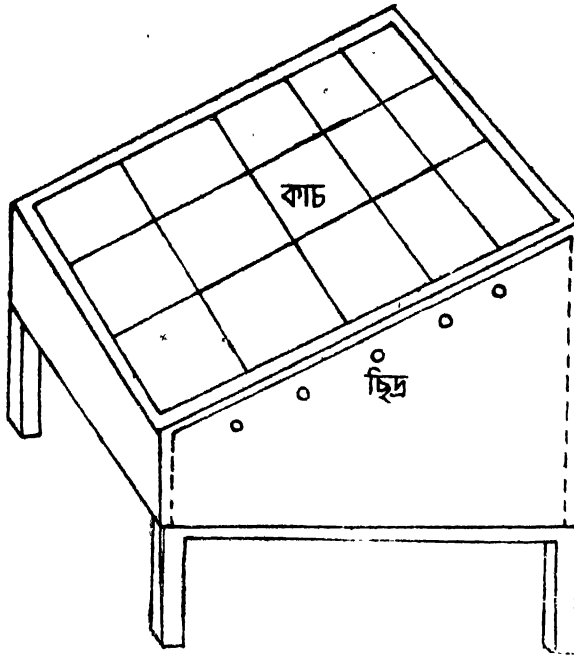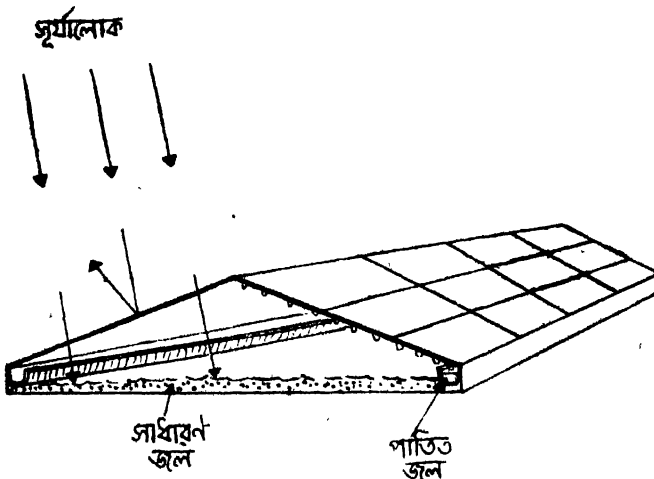
চিত্র 6: সৌর পাতন-যন্ত্র

তা চিত্র 6-এ দেখানো হয়েছে। সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায়, যেখানে মিষ্টি পানীয় জলের অভাব, সেখানে এই ধরনের সৌর-পাতন পদ্ধতিতে লবণাক্ত সমুদ্রের জল থেকে পেয় জল তৈরি করা যেতে পারে।

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাড়িতে গরমজলের জল গরম করার সৌর-ব্যবস্থা আজকাল মার্কিনদেশে বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

অবতল প্রতিফলকের সাহায্যে সূর্যলোক সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করলে তাপমাত্রা অবশ্য আরো বেশী হয় (চিত্র 8)।

এসব হল সৌরশক্তির ঘরোয়া ব্যবহারের কথা।
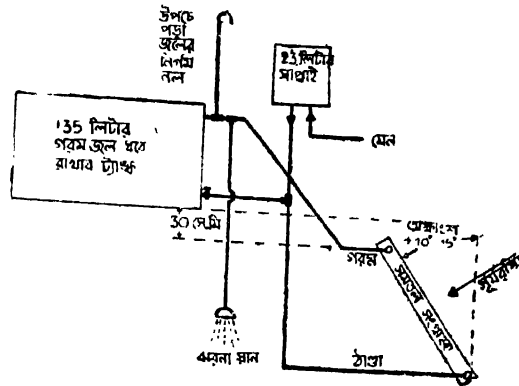
চিত্র 7 : সৌরশক্তির সাহায্যে জল গরম করার ব্যবস্থা
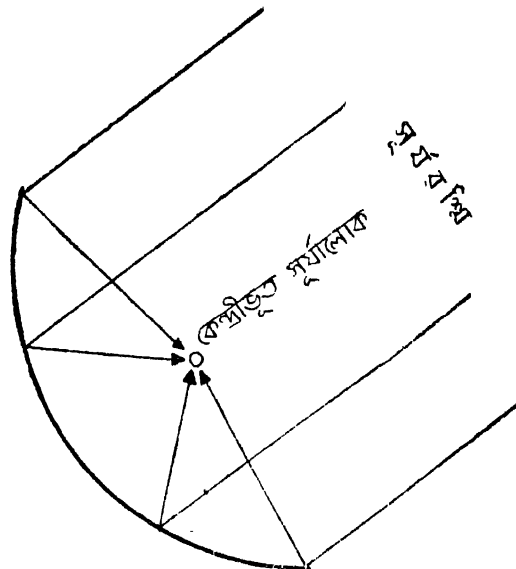
চিত্র 8 : অবতল সংগ্রাহক সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত করে।

বিশেষ দরকার হয় না। শীতপ্রধান দেশে বাড়ির ছাদে সমতলাকৃতি সংগ্রাহক লাগিয়ে জল গরম করা যায়। চিত্র 7এ যেমন দেখানো হয়েছে, সে ধরনের সৌরশক্তির সাহায্যে কী করে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায় এবং কালক্রমে তা ফসিল-জ্বালানি-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদকের স্থান নিতে পারে তদ্বিষয়ে প্রায় সারা দুনিয়ায় গবেষণা চলছে।

হঠযোগের বিজ্ঞান

আশিস সিংহ

[হঠযোগের উৎপত্তির ইতিহাস এবং হঠযোগীদের শারীরবৃত্তীয় ধারণা প্রসঙ্গে লেখকের গবেষণার ফসল এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে।]

হঠযোগের উৎপত্তি

আজকাল সারা বিশ্বে যোগব্যায়ামের কদর বেড়েছে। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের একটি অংশ আসন এবং প্রাণায়াম অনুশীলনের দ্বারা শরীর ও মন সুস্থ রেখে দীর্ঘায়ু হওয়ার চেষ্টা শুরু করেছেন। এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। নানা দেশে নানা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে এই উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরাও এই সব ব্যায়াম কিভাবে শরীর ও মনকে প্রার্থিত সুস্থতা দেয় সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এই ব্যায়ামগুলি কিন্তু যোগশাস্ত্রের মত প্রাচীন নয়। যোগদর্শন অতি প্রাচীন। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের দ্বাদশ অধ্যায়ে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধ ধ্যানে বসবার আগে অরাড় মুনির কাছে সাংখ্য যোগ এবং তন্ত্র বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। কঠোপনিষদেও যোগের উল্লেখ পাচ্ছি শেষ শ্লোকে (2।3।18)। যোগ ও তন্ত্র সংক্রান্ত নানান চিন্তা যা ভারতীয় সংস্কৃতির নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই সব নিদর্শন থেকে তা বোঝা যায়।

যোগ বিষয়ে এই সব ছড়িয়ে থাকা চিন্তাগুলিকে একত্র করে সর্বপ্রথম যিনি মালা গাঁথলেন তাঁর নাম মহর্ষি পতঞ্জলি। তিনি খৃস্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকের লোক। সেই সময়ের এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর গ্রন্থের নাম "যোগসূত্রম্"। যোগদর্শনের এই আদি গ্রন্থটিতে পতঞ্জলি যোগের আটটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি। সঠিক সমাধি স্তরে পৌঁছলে তবেই সত্যের সঙ্গে তাঁর যোগ হয়, আর সমাধিতে পৌঁছতে হলে তাঁকে আগের সাতটি অঙ্গ বা স্তর পেরিয়ে আসতে হবে—এই ছিল পতঞ্জলির মূল কথা। এইজন্য পতঞ্জলির কথিত যোগকে অষ্টাঙ্গ যোগ নামেও অভিহিত করা হয়।

স্তরবিন্যাসে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান আসন ও প্রাণায়ামের জন্য নির্দিষ্ট করলেও পতঞ্জলি কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত এত রকমের যোগব্যায়ামের উল্লেখ করেন নি তাঁর গ্রন্থের কোথাও। আসলে যোগ-ব্যায়ামের কোন বিবরণই পাওয়া যায় না 'যোগসূত্রে"। এই ব্যায়ামগুলি যোগের অন্যতম শাখা হঠযোগের অন্তর্গত। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক অভাব বোধ থেকে এই হঠযোগের আবির্ভাব হয়েছিল অনেক পরবর্তী কালে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীন যুগের শেষ

দিকে, খৃস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ, একটি দুর্যোগের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায় তখন ক্রমে হীনযান এবং মহাযান শাখায় ভাগ হতে চলেছে। লড়াইটি ছিল তত্ত্ব এবং আচার তথা প্রক্রিয়ার মধ্যে। হীনযানীরা ছিল তত্ত্বপ্রধান এবং মহাযানীরা আচারপ্রধান। বুদ্ধ স্বয়ং তাঁর ধর্মীয় মতে তত্ত্ব ও আচারের মিলন ঘটানোর দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। অরাড় মুনির কাছে সাংখ্য এবং যোগের সঙ্গে তন্ত্রশিক্ষায় তাঁর এই প্রবণতার পরিচয় মেলে। সেই মিলনপ্রয়াস কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। আর সেইজন্যই বৌদ্ধ সম্প্রদায়টি শেষ পর্যন্ত ভেসে যায় তত্ত্ব ও প্রক্রিয়ার পুরাতন ভেদরেখা বরাবর।

এই ভাঙনের ফল হয়েছিল খুবই ব্যাপক। সাধনপদ্ধতি নিয়ে সাধকেরা দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। ফলে সেই সময় থেকেই জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি মতকে মিলিয়ে তত্ত্ব ও প্রক্রিয়ার একটি নতুন সাম্যবিন্দু খোঁজবার আকুতি জাগতে থাকে। এই আকুতি একটি বিকশিত মতাদর্শে রূপ নেয় নাথসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে—যে-ঘটনার দিনক্ষণকে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আগে স্থাপন করবার মত তথ্যাদি এখনও আমাদের হাতে নেই।

নাথ সম্প্রদায়ের আদি নাথ (প্রথম গুরু) হলেন শিব স্বয়ং, মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গোরক্ষনাথ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরু। ধ্রুপদী যোগদর্শনের সাধন-পদ্ধতির অষ্টাঙ্গ কাঠামোটিকে সামনে রেখে তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদির সংযোগে সেই কাঠামোতে তাঁরা প্রাণসঞ্চার করলেন। গোরক্ষনাথ রচিত "গোরক্ষ-সংহিতা"য় আমরা তার পরিচয় পেতে পারি।

ধ্রুপদী যোগসাহিত্য অনুসারে আটাঙ্গ যোগের (প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধি) শেষ চারিটি অঙ্গ বাস্তব মাপকাঠির আয়ত্তের বাইরের ব্যাপার। ফলে মহর্ষি পতঞ্জলির প্রায় হাজার বছর পরে এই অঙ্গ চারটি ক্রমে তাদের তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছিল। গোরক্ষনাথ তাঁর গ্রন্থে বললেন: "দ্বাদশবার প্রাণায়াম করলে একবার প্রত্যাহার, দ্বাদশবার প্রত্যাহারে একবার ধারণা, দ্বাদশবার ধারণায় একবার ধ্যান এবং দ্বাদশবার ধ্যানে একবার সমাধি হয়।" অর্থাৎ মোট 20736 বার প্রাণায়ামে হয় একবার সমাধি। প্রায় একদিনে একবার সমাধি হতে পারে—এমন ভাবেই গোরক্ষনাথ এই হিসাব করেছিলেন। এইভাবে অষ্টাঙ্গযোগের যে-চারটি অঙ্গ কালদোষে কেবল কথার কথা হয়ে পড়েছিল সেগুলিকে পুনরায় বোধগম্যভাবে আচরণীয় করে তুললেন নাথ গুরুরা।

তারপর তারা ধ্রুপদী যোগের লক্ষ্য সত্যের সঙ্গে যোগের বিমূর্ত ধারণাকে বাদ দিয়ে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণাটিকে গ্রহণ করলেন। বললেন, দেহের মধ্যেই পুরুষ বা প্রকৃতি (বা স্ত্রী শক্তি) বিদ্যমান। যে-সব দৈহিক কাজ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা হল প্রকৃতির এখতিয়ারভুক্ত। যোগের উদ্দেশ্য পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ঘটানো যাতে সমস্ত দেহ ও মনের ওপরেই পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষ প্রকৃতির এই মিলন ঘটলে তবেই সাধক সমাধি লাভ করেন।

এইভাবে তান্ত্রিক প্রক্রিয়াদির সঙ্গে যোগের উদ্দেশ্যকে মিলিয়ে নাথগুরুরা যে-সাধন পদ্ধতির উদ্ভব করলেন তাই পরে হঠযোগ নামে পরিচিত হল। "হঠযোগের" শব্দার্থ এখনও নিশ্চিতভাবে স্থির হয়নি। আধুনিক কালে যাঁরা এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথম দিকের আলোচকেরা ভেবেছিলেন "হঠ" শব্দে বুঝি অবিমৃষ্যকারিতার ব্যঞ্জনা আছে। পরবর্তীকালে অনেকে মনে করেন, "হ"-এর অর্থ শুক্র এবং "ঠ"-এর অর্থ রজঃ; অর্থাৎ "হঠ" শব্দটি পুরুষ প্রকৃতির মিলনের একটি সাঙ্কেতিক পরিচয়। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত অর্থই অনুমানভিত্তিক। তবে হঠযোগ যেহেতু প্রধানত: তন্ত্র ও যোগের মেলবন্ধন, "হঠ" শব্দটি তাই তন্ত্রবাচী হওয়াই

সমীচীন। "হঠ" শব্দের সঙ্গে তন্ত্রের সম্পর্ক কোন্ পথে সে-রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অবশ্য আরও গবেষণার প্রয়োজন।

হঠযোগ নামটি আমরা প্রথমে পাই স্বাত্মারাম স্বামী রচিত "হঠযোগ প্রদীপিকা" গ্রন্থে। স্বাত্মারাম স্বামীও সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীরই লোক। কারণ "হঠযোগ প্রদীপিকা"য় তিনি স্বীকার করেছেন যে এই সাধন পদ্ধতি তিনি মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথের কাছে শিক্ষা করেছেন। এই বিচারে হঠযোগের আদি গ্রন্থ হিসাবে "গোরক্ষসংহিতা"কে মেনে নিতে হয়। এই দুটি গ্রন্থ ছাড়া হঠযোগের অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির মধ্যে পড়ে "ঘেরণ্ড সংহিতা", "শিবসংহিতা" এবং "পবন বিজয় স্বরোদয়"। এদের রচনাকাল সপ্তম দশক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়

হঠযোগীর শারীরবৃত্ত

প্রাণায়াম বা শ্বাসব্যায়াম সমূহের আবিষ্কার যোগীদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি অনবদ্য পরিচয় দান করে। শ্বাসক্রিয়া প্রধানতঃ অনৈচ্ছিক অর্থাৎ এ আমাদের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। সেইজন্যই ঘুমানোর সময়েও আমাদের শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থায় ইচ্ছার দ্বারা শ্বাসকে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। অর্থাৎ শ্বাসক্রিয়ায় সচেতন নিয়ন্ত্রণ ও অনৈচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের একটি স্বাভাবিক মিলন ঘটেছে বলা যায়। যোগী মনীষীরা তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রয়োগে এই স্বাভাবিক সুবিধাটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

আর তারপরেই তাঁরা নিশ্চয়ই অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলেন, শ্বাসব্যায়াম সমূহের দ্বারা শ্বাসক্রিয়ার ওপরে সচেতন কর্তৃত্ব বিস্তার করতে গিয়ে তাঁরা ক্রমে দেহের সমস্ত অনৈচ্ছিক কাজকর্মের ওপরেই সচেতন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে উঠছেন। তখন তাঁরা এর কারণ চিন্তা করতে শুরু করলেন এবং সেই প্রচেষ্টায় তাঁরা এমন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জন করলেন, যা আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেও সবিশেষ প্রশংসনীয়

প্রথমতঃ তাঁরা চুরাশিটি আসন এবং সাত রকমের প্রাণায়াম আবিষ্কার করলেন যা তাঁদের তাঁদের আগে যোগীদের জানা ছিল না। তত্ত্ব এবং প্রক্রিয়ার মিলন ঘটানোর চেষ্টায় তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া উভয়েই উপকৃত হল।

দ্বিতীয়তঃ, হঠযোগীরা শরীরে চেতনার অবস্থান সম্পর্কে বৈদিক এবং আয়ুর্বেদীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। বৈদিক এবং আয়ুর্বেদিক মতে চেতনা হল "চিৎ" বা "চিত্ত" হৃৎপিণ্ডের কাজ। হঠযোগীরা কিন্তু মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডীয় অক্ষকে নির্দিষ্ট করলেন চেতনার আধার হিসাবে। তৃতীয়তঃ হঠযোগীদের একটি অংশ নাসাপথে শ্বাসবায়ু প্রবাহের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতে গিয়ে একটি অভিনব জৈব স্পন্দন আবিষ্কার করলেন। তাঁরা দেখলেন, শ্বাসবায়ু সাধারণতঃ মানুষের উভয় নাসাপথ দিয়ে একযোগে বয় না, নির্দিষ্ট সময় পর পর শ্বাসপ্রবাহের নাসাপথ পরিবর্তিত হয়। আমি যতদূর জানি, দেহের দক্ষিণ ও বামভাগের মধ্যে কোন দেহকর্মের পর্যায়ক্রমিক স্পন্দনের এটি প্রথম আবিষ্কৃত নিদর্শন। লক্ষণীয় যে, গোরক্ষনাথ এই জৈব স্পন্দনটির বিষয়ে অবহিত ছিলেন না; কারণ "গোরক্ষসংহিতা"য় উভয় নাসা দিয়ে একযোগে শ্বাসপ্রবাহের ইঙ্গিত আছে। "হঠযোগ প্রদীপিকা" এবং "ঘেরণ্ডসংহিতা"ও এ-বিষয়ে নীরব। "শিবসংহিতায়" এই স্পন্দনটির একবার উল্লেখমাত্র দেখা যায়, পরে "পবনবিজয় স্বরোদয়" গ্রন্থে পাওয়া যায় এর বিস্তৃত বিবরণ। চতুর্থতঃ আরও পরবর্তীকালে তাঁরা একটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে স্বাভাবিক শ্বাসস্পন্দনকে বদলে দেওয়া যায়। যেমন ধড়ের বামপাশে বা বাম বগলের তলায় চাপ দিলে বাম নাসা বন্ধ হয় এবং ডান নাসা খুলে যায়।

তেমনি ডান পাশে বা ডান বগলের তলায় চাপ দিলে ডান নাসা বন্ধ হয় এবং খুলে যায় বাম নাসা। আর পক্ষান্তরঃ, এই সমস্ত পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণাদির ভিত্তিতে তাঁরা একটি শারীরবৃত্তীয় তত্ত্বের জন্ম দিলেন। তত্ত্বটি সংক্ষেপে নিচে বিবৃত হলো।

শরীরে একটি পুরুষশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি বর্তমান আছে, সমস্ত শারীরিক কাজকর্মের তারাই নিয়ন্তা। কুণ্ডলিনীনামক স্ত্রীশক্তিটির স্বাভাবিক অবস্থান মেরুদণ্ডের নিচে গুহ্যদ্বার এবং লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী মূলাধার নামক চক্রের মধ্যে ; আর পুরুষের স্বাভাবিক অবস্থান মস্তকশীর্ষে সহস্রার নামক চক্রে। সুষুম্না নামক একটি নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মূলাধারকে সহস্রার চক্রের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই দুই চক্রের মাঝখানে সুষুম্নার পথে আছে আরও পাঁচটি চক্র : স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। প্রত্যেক চক্রে বহু নাড়ী একত্র এমন ভাবে অবস্থান করে যে চক্রগুলি নানাসংখ্যক দলবিশিষ্ট পদ্মের রূপ নেয়। মূলাধার থেকে নির্গত আর দুটি প্রধান নাড়ী, ইড়া ও পিঙ্গলা, সুষুম্নার দু-পাশ দিয়ে মধ্যবর্তী চক্রগুলিকে বেষ্টন করে আঁকাবাঁকা পথে আজ্ঞা চক্র পর্যন্ত প্রসারিত। তারপরে আজ্ঞা চক্র ত্যাগ করে ইড়া ও পিঙ্গলা যথাক্রমে বাম ও দক্ষিণ নাসাপথে প্রবাহিত হয়। ইড়া হল স্ত্রী নাড়ী আর পিঙ্গলা হল পুরুষ।

স্বাভাবিক অবস্থা শারীরিক কাজকর্ম পর্যায়ক্রমে পুরুষ ও স্ত্রীশক্তির প্রভাবাধীন হয়। যখন পুরুষ শক্তির প্রাধান্য, তখন শ্বাস বয় পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় আর স্ত্রীশক্তির প্রাধান্যের সময়ে বয় ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসায়। প্রাণায়াম ব্যায়ামের দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীশক্তির এই স্বাভাবিক ক্রিয়াপর্যায়কে সঠিক যখন ইচ্ছার প্রভাবধীন করতে চেষ্টা করেন তখন মূলাধারস্থিত সুপ্ত কুণ্ডলিনী জেগে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সুষুম্নাপথে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। শেষে সব কয়টি চক্র অতিক্রম করে কুণ্ডলিনী পৌঁছায় সহস্রারে এবং পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়। তখনই হয় সমাধি।

হঠযোগীয় ধারণার বৈজ্ঞানিক যাচাই

হঠযোগীয় শারীরবৃত্তের এই দাবীগুলির অনেকগুলিকেই আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমি যাচাই করে দেখেছি। শ্বাসবায়ু যে উভয় নাসার মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রবাহিত হয় সে-তথ্য আধুনিক শারীরবৃত্তে এবং পাশ্চাত্যে অজানা থাকলেও আমাদের দেশের বহুলোকই তা জানেন। কতক্ষণ শ্বাস এক নাকে বইবে তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন, তবে একই ব্যক্তির উভয় নাসার ক্ষেত্রে এক। খুব সামান্য কারণে—যেমন বসতে বসতে উঠে দাঁড়ালে বা চলতে সুরু করলে, মেজাজের তারতম্য ঘটলে অথবা আহার গ্রহণ বা মলত্যাগ করলে—শ্বাসবায়ুর নাসা বদল ঘটতে পারে, কিন্তু তাহলেও এটা প্রমাণ করা গেছে যে, এই জৈব স্পন্দনটি অর্থাৎ শ্বাসনাসের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের কারণ নিহিত আছে দেহের গভীরে, কেবল বাইরের কারণে শ্বাসনাসার বদল ঘটে না। শরীরের মধ্যে কোথাও যেন একটি "ঘড়ি" আছে, সেই ঘড়িটিই দেহের ভালমন্দ বিচার করে স্থির করে দিচ্ছে কখন কোন্ নাসার শ্বাস বইবে। পরীক্ষার সময়ে দেখেছি, বগলের তলায় বা ধড়ের পাশে চাপ দিলে শ্বাসনাসার বদল হয় ঠিকই, কিন্তু দেহের ভিতরের "ঘড়ি"টি অনেক সময়েই আবার এই বদল ঘটতে দেয় না। দেহের সেই সময়কার অবস্থা বিবেচনা করে যদি "ঘড়ি" বোঝে যে শ্বাসনাসার বদল ঘটালে দেহের পক্ষে ভাল হবে না তবে ধড়ের পাশে বা বগলের তলায় দীর্ঘসময় ধরে চাপ দিলেও সেই চাপে শ্বাসনাসার বদল হয় না।

এই "ঘড়ি"র অবস্থান দেহের মধ্যে কোথায় তারও একটা হদিশ পাওয়া গেছে। দেখা গেল, শ্বাসনাসার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এমন আরও কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার বদল ঘটে, যাদের সঙ্গে শ্বাসক্রিয়ার কোন স্পষ্ট যোগ চোখে পড়ে না। যেমন, লালার

ক্ষারত্ব। দেখা যাচ্ছে, ইড়া নাড়ী তথা বাম নাসায় শ্বাস প্রবাহের সময়ে লালায় ক্ষারত্ব অনেক বেশী থাকে, আর পিঙ্গলা নাড়ী তথা দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-প্রবাহের সময়ে যায় কমে। তাছাড়া, আহার গ্রহণ বা মলত্যাগকালে শ্বাস অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে দক্ষিণ নাসায়, প্রগাঢ় ঘুমের সময়েও তাই; কিন্তু ঘুম থেকে জাগরণের সময় শ্বাস বাম নাসায় থাকাই প্রশস্ত, দক্ষিণ নাসায় থাকলে ঘুম যেন যেতেই চায় না।

এই পর্যবেক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় দেহের স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কাজের সঙ্গে শ্বাসনাসা বদলের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। যে-সব শারীরিক কাজ ইচ্ছা ব্যতিরেকেই ঘটে থাকে—যেমন ক্ষুধা, মলবেগ, তৃষ্ণা, মূত্রবেগ, হৃৎস্পন্দন, পরিপাক, শ্বাসক্রিয়া, দেহের তাপমাত্রার নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা প্রভৃতি —তারা স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দুটি বিভাগ—সিম্প্যাথেটিক ও পারাসিম্প্যাথেটিক - এই দুই বিভাগের মধ্যে একটি বিরোধী সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, সিম্প্যাথেটিকের প্রভাবে হৃৎস্পন্দন বা লালায় ক্ষারত্ব বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্যারাসিমপ্যাথেটিকের প্রভাবে যায় কমে।

এই পরস্পর বিরোধী বিভাগ দুটির টানাপোড়েনের দ্বারা স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র শরীরের আভ্যন্তর যন্ত্রাদির কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, এবং ভিতরের পরিবেশটিকে সব সময় এক রকম রাখে। অর্থাৎ, বাইরে যখন লু বইছে, স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র তখনও শরীরের ভিতরের তাপমাত্রার বদল হতে দেয় না, আবার বাইরে শীতের বাতাস যখন খটখটে শুকনো, তখনও শরীরের ভিতরের পরিবেশ জলে পূর্ণ। এর ফলে দেহযন্ত্রগুলি সব সময় কাজ করবার একটি উপযুক্ত পরিবেশ পায় এবং এই জন্যই শীত-গ্রীষ্ম সব সময়েই তারা সমান দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যেতে পারে। এ না হলে মানুষ বা অন্যান্য উচ্চস্তরের প্রাণীদেরও শীত এলে সাপ, ব্যাঙের মত শীতঘুমের ব্যবস্থা করতে হত, সব রকমের পরিবেশে তাদের বেঁচে থাকবার ক্ষমতাই যেত কমে।

স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কাজের ফলে শরীরের ভিতরের পরিবেশের এই যে সর্বদা একভাবে থাকা সাদা কথায় এরই নাম স্বাস্থ্য। ঐ পরিবেশ যদি কখনও বদলে যায় তাহলেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। যেমন, স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কর্মবৈকল্যের ফলে কখনও যদি দেহের তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাপমাত্রা তখন বেড়ে যেতে থাকে এবং আমাদের জ্বর হয়। (জ্বর নানা কারণে হতে পারে, এনিয়ে পরবর্তী কোন প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব।) স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দেহের ভিতরের পরিবেশকে সর্বদা এক রাখবার এই যে ক্ষমতা শারীরবৃত্ত বা শরীরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

পরীক্ষার দ্বারা এখন পর্যন্ত যা বোঝা গেছে তাতে দেখা যায় যখন বামনাসায় বা ইড়া নাড়ীতে শ্বাস শরীরে তখন সিমপ্যাথেটিক প্রাধান্যের চিহ্ন ফুটে ওঠে, আর দক্ষিণ নাসায় বা পিঙ্গলা নাড়ীতে শ্বাস-প্রবাহের সময়ে দেখা যায় প্যারাসিমপ্যাথেটিক প্রাধান্যের চিহ্ন। এর অর্থ, শরীরের ভিতরের পরিবেশকে সবদা এক রাখে যে স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্র তার দুটি বিভাগ শরীরের কাজকর্মের ওপর পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করে; এবং শ্বাসবায়ুর পর্যায়ক্রমিক নাসাপরিবর্তন হল স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের ঐ স্পন্দনেরই একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রই তাহলে দেহের ভিতরের ঐ "ঘড়ি"র কাজ করে এবং ইড়া, পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ী বলতে হঠযোগীরা স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কাজেরই বিভিন্ন অবস্থাকে বুঝিয়ে-ছিলেন।

চক্রসমূহের মধ্যে অন্ততঃ তিনটির অবস্থান নিরূপণে হঠযোগীরা অসামান্য বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেই তিনটি চক্র হল মূলাধার, আজ্ঞা এবং সহস্রার। প্রকৃতির অধিষ্ঠান মূলাধার চক্রটি যেখানে কল্পিত হয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানমতে তার কাছ থেকেই নির্গত হয়েছে শরীরের নিচের দিকের প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভ-

গুচ্ছ। আবার, পুরুষ বা চেতনার অধিষ্ঠান সহস্রার চক্রের অবস্থান নিরূপিত হয়েছে মস্তকশীর্ষে, আধুনিক বিজ্ঞানমতে যেখানে গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাল কর্টেক্স অবস্থিত। আমার প্রথম দিকে ধারণা হয়েছিল হঠযোগীরা এই চক্র দুটির অবস্থান নিরূপণ করেছিলেন হয়তো বা দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের দেখে। দুর্ঘটনার ফলে মস্তকশীর্ষে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অচেতন হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ-দেখে হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন, চেতনার অধিষ্ঠান মস্তকশীর্ষে। আবার দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ডের নিচের দিকে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মলমূত্রনিষ্কাশন প্রভৃতি অনৈচ্ছিক কাজ ব্যাহত হতে পারে। এই দেখে হঠযোগীরা হয়তো স্থির করেছিলেন প্রকৃতির অধিষ্ঠান মেরুদণ্ডের তলায় কোন স্থানে। কিন্তু আজ্ঞা চক্রের অবস্থান নিরূপণকে এমন অগভীরভাবে ব্যাখ্যা করা কোনমতেই সম্ভব নয়। ইড়া এবং পিঙ্গলা নাড়ীর দ্বারা দেহের অনৈচ্ছিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের উচ্চতম সীমা এই আজ্ঞা চক্র। বিস্ময়ের কথা হল, আধুনিক বিজ্ঞানও এই আজ্ঞা চক্রের সমতলে মস্তিষ্ক-মেরুদণ্ডীয় অক্ষে অবস্থিত হাইপো-থ্যালামাসকে স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের উচ্চতম নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করেছে। স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে হঠযোগীদের স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে এমন নির্ভুলভাবে অনৈচ্ছিক নিয়ন্ত্রণের উচ্চতম কেন্দ্রের অবস্থান নিরূপণ কখনই সম্ভব হত না।

হঠযোগীদের সমস্ত দাবীর বিজ্ঞানভিত্তি আজও বোঝা যায় নি। যেটুকু বোঝা গেছে তার ভিত্তিতে "বিজ্ঞান" শব্দটিকে আধুনিক অর্থে ধরে নিয়েই বলা যায় হঠযোগীরা আমাদের দেশের আদি শরীর-বিজ্ঞানী বা শারীরবৃত্তবিদ (Physiologist)। তাঁদের পদ্ধতিতে একদিকে যেমন নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাত্ত্বিক চিন্তার দিকটিকেও তাঁরা অবহেলা করেন নি। নাথগুরু দের আবিষ্কৃত পথ শরীরবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে শুভ হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

এ-প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, ভারতীয় রসায়ন-শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতিও ঘটে এই সময়ে। রস বা পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র সম্বন্ধীয় বিস্ময়জনক গবেষণায় সমৃদ্ধ এ-যুগের ভারতীয় রসায়ন। ওদিকে এই সময়েই ঘটেছিল আর্যভট থেকে ভাস্করাচার্য প্রমুখ গণিতবিদ্ তথা পদার্থবিজ্ঞানীদের আবির্ভাব।

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বৈদিক ঋষিদের থেকে শুরু করে মহাবীর, বুদ্ধ, নাথগুরু প্রমুখ প্রাচীন ভারতের যে-সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বিদ্যা ও অবিদ্যা তথা তত্ত্ব ও প্রক্রিয়ার সাম্যবিন্দুটি খুঁজে পাওয়ার জন্য বারংবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের ধারাবাহিক প্রয়াসের ফলে বৌদ্ধধর্মের পতনের অব্যবহিত পরেই ভারতে একটি বিজ্ঞানের যুগ আবির্ভূত হয়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল এদেশে ইংরেজ আগমনের প্রায় হাজার বছর এবং পাশ্চাত্য রেনেশাঁসের প্রায় সাত শত বছর আগে।

দুঃখের বিষয়, বিদেশী শাসনের আমলে ভারতের নিজস্ব বিজ্ঞানের এই ধারাটি ক্রমে শুকিয়ে আসে। মুসলমান শাসনের সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পড়ে ইসলাম দর্শন ও হাকিমী চিকিৎসার ভাগে। ফলে জনসাধারণও আকৃষ্ট হয় সেইদিকে। তাই হঠযোগের চর্চা সীমিত হয়ে পড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে। তবে এই সময় সাংস্কৃতিক মিলনও ঘটেছিল হঠযোগী এবং সুফী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে তার ফলে

সুফীরা বহু যোগাচারকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে এই সময়েই হঠযোগের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কব্জী স্পর্শ করে নাড়ী দেখার বিদ্যাটি খুবই উন্নতি লাভ করে।

কিন্তু ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে চিত্রটি আমূল বদলে যায়। ঔপনিবেশিক স্বার্থের খাতিরে ইংরেজ শাসকেরা পরিকল্পিতভাবে আমাদের ঐতিহ্যবিমুখ করে তুলতে চেষ্টা করেছিল—এ তথ্য আজ সকলের জানা। এইভাবে বিদেশী শাসনের আমলে আমরা আমাদের নিজস্ব বিজ্ঞানের ঐতিহ্য থেকে ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। যদি বলি, শিক্ষা-অধিকর্তাদের নানান পশ্চিমী কলাকৌশল সত্বেও আধুনিক বিজ্ঞান এই জন্যেই আমাদের ভূমি স্পর্শ করতে পারছে না, তাহলে কি ভুল বলা হবে?

"*** পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তাহা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশি ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।"

"*** অথচ জাপানী ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তাছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল। য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।" যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলা ভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।"

"*** বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্য কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স তার উপরে দেশে যে সকল বিজ্ঞান বিশারদ আছেন তাঁরা জগদবিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই ***।

রবীন্দ্রনাথ

(শিক্ষার বাহন—পৌষ 1322 বঙ্গাব্দ)

আকাশবাণী ও বিজ্ঞান

অমিত চক্রবর্তী*

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছিলেন। বললাম, "কিছু বলবেন?" "আচ্ছা এটাই কি বিজ্ঞান বিভাগ?"—ভদ্রলোকের সকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা। বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কি দরকার বলুন।"

"দরকার মানে—," ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে ব্যাগ খুললেন, বার করলেন একটা কাগজ। কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এটা একটু পড়ে নিয়ে রেডিওতে যদি বলে দ্যান তো লোকের বড় উপকার হয়। হুগলী জেলায় আমার বাড়ী, ডাকে যদি হারিয়ে যায় সেই ভয়েই নিজে হাতেই আপনাকে দিতে এসেছি এটা।"

কাগজটা পড়া শুরু করার আগে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার লেখার বিষয়টা কি?"

ভদ্রলোক বললেন, "আজ্ঞে এতে কাঠের ঘুণ-পোকার উপর কিছু খবরাখবর আছে। আমি বনবিভাগে চাকরী করতাম, কিছু দিন আগে অবসর নিয়েছি। ঘুণপোকার রকমফের, কিভাবে ঘুণপোকা কাঠের ক্ষতি করে, কি করে এদের হাত থেকে কাঠকে রক্ষা করা যায় তা আমার নিজের পড়াশুনা ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছি।"

আমি লেখাটা পড়ছিলাম। ভদ্রলোক বলে চলেছিলেন, "লেখাটা খুব ভাল কিছু হয় নি, আমি বলতেও ভাল পারি না। আসলে আমি নিজে রেডিওতে বলবো বলে আসি নি। আপনি একটু ব্যাপারটা নিজের মত করে আপনাদের বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে বলে দেবেন, ঘুণপোকার ব্যাপারগুলো জানলে লোকের উপকার হবে।"………

টেবিলের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন ভদ্রমহিলা' ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছলেন। বললাম, "কি ব্যাপার বলুন তো?"

ভদ্রমহিলা বললেন, "না মানে, আসলে আমি আপনাদের বিজ্ঞানের প্রোগ্রামে অংশ নিতে চাই।"

বললাম, খুব ভাল কথা, কিন্তু আমরা তো পপুলার সায়েন্স মানে জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। আপনি কি বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখেন টেখেন?'

ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "না তা ঠিক লিখি না, তবে স্কুলে পড়াই তো—লাইফ সায়েন্সের বিষয়ের উপর বলতে পারবো।"

বললাম, "রেডিওতে তো বিজ্ঞানের বিষয়গুলি নিয়ে নানাধরণের অনুষ্ঠান হয়, যেমন কথিকা, আলোচনা, ফিচার—তা কি ধরনের অনুষ্ঠানে আপনি অংশ নিতে চান?"

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না। আবার প্রশ্ন করলাম, "আমাদের বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি শোনেন টোনেন তো?"

ভদ্রমহিলা লাজুক স্বরে বলে উঠলেন, "না ঠিক শোনা হয়ে উঠে না। আচ্ছা কবে কবে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান প্রচার করেন আপনারা?"

এরপর প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে এবং ইতিমধ্যে ভদ্রমহিলা রোগ সম্বন্ধীয় একটা বেতার আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। মুখ্যতঃ ভদ্রমহিলার ভাষার জড়তার জন্যই (যা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঠিক করা যায় নি) অনুষ্ঠানটা ভালভাবে উৎরায় নি। যাই-হোক অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার পর আবার একদিন এলেন উনি। ভদ্রতার খাতিরেই বললাম, "প্রোগ্রাম শুনে আপনার বন্ধুবান্ধবের প্রতিক্রিয়া কি রকম দেখলেন?"

---

* বিজ্ঞান বিভাগ, আকাশবাণী, কলকাতা-700 001

ভদ্রমহিলা বিরক্ত মুখে বললেন, "আপনাদের রেডিওর বিজ্ঞানের প্রোগ্রাম বোধ হয়—বিশেষ কেউ শোনেটোনে না। কতলোককে বলেছিলাম, দেখলাম অধিকাংশই ভুলে গেছে শুনতে। অথচ যদি আপনাদের রেডিওর নাটকে অভিনয় করতাম দেখতেন, আমাকে আর জনে জনে গিয়ে বলতে হতো না, উলটে তারাই হৈ হৈ করতো! তাছাড়া এখনতো কলকাতায় আবার টি. ভি. এসেছে, রেডিও আর শুনবে কখন ?"

ভদ্রমহিলা একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, "আমাকে এবার টেলিভিশনে একটা ব্যবস্থা করে দিন না। আপনাদের তো সব জানাশুনো।"

সবিনয়ে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। ভদ্রমহিলা এবার অনুনয়ের সুরে বললেন, "তাহলে অন্ততঃ জুন-জুলাই মাসে প্রোগ্রামটা রেডিওতে আরেকবার বাজাবার ব্যবস্থা করুন, তখন আমি বি. টি ট্রেনিংএ থাকবো—পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেতে সুবিধে হবে আমার।"...

সকালবেলা খবরের কাগজটা খুলেই আকাঙ্খিত খবরটা বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছে দেখলাম। ভারতের প্রথম নিজস্ব রকেট S.L.V, ও আমাদের তৃতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ রোহিণীকে পৌছে দিয়েছে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স বিভাগের মহাকাশ বিজ্ঞানের এক সুপরিচিত অধ্যাপককে ফোনে ধরলাম।

"স্যার, রোহিণীর উপর একটা অনুষ্ঠান আজ প্রচার করা হবে—এ সম্পর্কে আপনাদের দু-একজনের একটা সাক্ষাৎকার নেব।"

অধ্যাপক বললেন, "রোহিণীর উপর প্রোগ্রাম—তার মানে রোহিণীর কারিগরী দিকটা নিয়ে বলতে হবে তো ?"

বললাম, "আজ্ঞে না, ঠিক তা নয়। আসলে আমরাতো রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ—এ সবের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার মাথায় যেসব প্রশ্নগুলি আসছে সেগুলিই আপনাকে করবো, যেমন ধরুন—কেন আমাদের বিজ্ঞানীরা এর আগে একাধিকবার রকেট ছোড়ায় বিফল হয়েছেন ? সাধারণ ভারতীয়ের কাছে বর্তমান সাফল্যের গুরুত্ব কতটা ? রোহিণী কি শুধুই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলবে না কি বিশেষ কোন কাজের জন্য ওকে পাঠানো হয়েছে ? রকেটের যে বিভিন্ন স্তরগুলির কথা কাগজে লিখেছে বা রকেটে যে বিশেষ কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে..." অধ্যাপক মাঝপথেই আমার কথা থামিয়ে দিলেন, বললেন, "ঠিক আছে, তুমি চলে এসো।"

আকাশবাণী থেকে প্রচারিত বিভিন্ন বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে কারা অংশগ্রহণ করেন তার একটা আন্দাজ দেবার জন্য ঘটনা তিনটের উল্লেখ করলাম। একটা কথা অবশ্য প্রথমেই পরিষ্কার করে বলা দরকার—বেতারে প্রচারিত বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানের বিষয়গুলি স্থির করা হয় প্রধানতঃ দুটো জিনিষের ভিত্তিতে। প্রথমতঃ, সাম্প্রতিক কোনো বিজ্ঞান সম্পর্কীয় ঘটনা বা খবর—যেমন ক্যানসার গবেষণায় নতুন কোনো সাফল্য বা পরিবেশ-দূষণ থেকে মানসিক অসুস্থতার নতুন খবর—যার সাথে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরও জীবনের যোগ রয়েছে—এমন কোনো খবরকে কেন্দ্র করে কথিকা বা আলোচনার আয়োজন করা হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, শ্রোতাদের পাঠানো নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাস্য কোনো বিষয় নিয়েও নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যাওয়া হয়। শ্রোতাদের প্রশ্নগুলি সাধারণতঃ কি ধরনের হয় সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার গোড়ার কথাটা আলোচনার শুরুতে সেরে নেওয়াটাই সাধারণ রীতি এবং সেই রীতি অনুসরণ করেই আজ বেতারের বিজ্ঞান-অনুষ্ঠান বলতে যা বুঝি, তার জন্মের সময়কার চেহারাটা দেখে নেওয়া দরকার। 'জন্মের সময়কার'—কথাটা অবশ্য এখানে

খাটছে না কারণ আকাশবাণী থেকে কবে প্রথম কোনো বিজ্ঞান বিষয়ের প্রচার শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা প্রায় অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানের নিয়মিত অনুষ্ঠান বলতে যা বোঝায় তা শুরু হয় প্রায় বছর পনেরো আগে—প্রথম সেই পাক্ষিক অনুষ্ঠানের নাম "বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা", এতে বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রচার করা হতো। এছাড়া মাঝে মাঝে বিশেষ কথিকারও আয়োজন করা হতো—অবশ্য সংখ্যাগত দিক থেকে তা ছিল নিতান্তই অকিঞ্চিৎ।

বছর চারেক হলো অবস্থাটার পরিবর্তন হয়েছে। বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যমটির আরো অনেক বেশী কার্যকরী ভূমিকা নেওয়া দরকার—সরকারী মহলে তা অনুভূত হয় গত দশকের মাঝামাঝি এবং তারই ফলস্বরূপ কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম আর আমেদাবাদ—আকাশবাণীর এইসব আঞ্চলিক কেন্দ্র-গুলিতে স্বতন্ত্র বিজ্ঞান-বিভাগের জন্ম হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানের সংখ্যসীমা ব্যাপকভাবে বাড়ানো হয়, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতা যেমন মহিলা, শিশু—এদের উপযোগী বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানগুলিকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তুলতে কথিকা বা আলোচনা ছাড়াও নতুন কোনো আঙ্গিকে শ্রোতাদের কাছে তা উপস্থাপনা করা যায় কিনা তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়। বর্তমানে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে প্রচারিত হচ্ছে ঘণ্টা তিনেকের মত বিজ্ঞান-বিষয়ক অনুষ্ঠান, যার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান-পত্রিকা, সাপ্তাহিক বিজ্ঞান সংবাদ, বিজ্ঞান-ফিচার বা রূপক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক নাটক ইত্যাদি।

এখন ঠিক এই মুহূর্তে অনেকের মনে যে দুটো প্রশ্ন দেখা দেবে তা হলো—এক,—বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়োজনটা কোথায়?

আর দুই—বিজ্ঞান প্রচারে বেতার মাধ্যম কতটা উপযোগী?

যাঁরা বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আছেন, যাঁরা বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় কিছু বিশেষজ্ঞ আর পুঁথি-পত্রের মধ্যে আটকে না রেখে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিজ্ঞান চেতনাকে সাধারণ মানুষের চরিত্রে যুক্ত করতে আগ্রহী, তাঁরা যে কেউ প্রথম প্রশ্নের উত্তর লিখতে পাতার পর পাতা ভরিয়ে ফেলতে পারেন। তাঁরা যা বলবেন তার সংক্ষিপ্ত সহজ রূপটা দেবার চেষ্টা করি। ধরুন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, এই যে আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলিতে টেলিভিসন এসেছে, আমরা আমাদের নিজেদের প্রযুক্তির সাহায্যেই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি, মহাকাশে রকেট ছুঁড়েছি, আমাদের নিজেদের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে পাক খাচ্ছে—আমাদের দেশের কারিগরী অগ্রগতির এই সব খবর শুনে আপনার গর্ব হয় না? আপনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন, "নিশ্চয়ই।" এরপর যে প্রশ্নটা আপনাকে করবো তাতে আপনি অবশ্য বিব্রত বোধ করবেন কারণ প্রশ্নটার যথাযথ উত্তর আপনার জানা নেই। আমি জিজ্ঞাসা করবো, "আচ্ছা বলুন তো, এই যে আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি-বিদদের এত সব সাফল্য—এসবের কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে?" সাধারণ মানুষ বলতে অবশ্য আমি বোঝাচ্ছি আমাদের সমগ্র জনসংখ্যার সেই সিংহভাগটাকে যাঁরা থাকেন গ্রাম ভারতে—বিজলীবাতি যেখানে আজও পৌঁছোয় নি, যোগাযোগের ব্যবস্থা অত্যন্ত সীমিত, যাঁরা টেলিভিসন দেখেন নি, খবরের কাগজও পান না, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রায় কিছুই পৌঁছোয় না যাঁদের কাছে, বিজ্ঞান এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে কম করেও শ'খানেক বছর আগে পড়ে আছেন যাঁরা। আপনি হয়তো বলবেন, "কেন, কৃষি বিজ্ঞানে বিভিন্ন গবেষণার সুফলতা গ্রামের সাধারণ মানুষেই ভোগ করছেন। রাসায়নিক সার

জমিতে দিয়ে ফলন বেড়েছে অনেকগুণ, রাসায়নিক কীটনাশক জমির ফসলকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করছে।” আচ্ছা সত্যিই রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ওষুধ আমাদের উপকার করছে তো? নাকি, জমির ফসল ফলাবার নিজস্ব শক্তিকে নষ্ট করে, পরিবেশকে দূষিত করে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অপূরণীয় ক্ষতি করছে? আসলে জমিতে সার দিলে ফসল ভাল হয়—এই বৈজ্ঞানিক সত্যটি সাধারণ মানুষের অনেক আগেও জানা ছিল এবং এটা শিখিয়ে ছিল তাঁদের সনাতন বিজ্ঞান—যার উদ্ভব হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বলাবাহুল্য সাধারণ মানুষের জীবনে এমন বহু সমস্যা এসেছে যার উত্তর সনাতন বিজ্ঞানের কাছে মেলে নি আর দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাধারণ মানুষ আর বিজ্ঞানীদের মধ্যে যোগসূত্রের অভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের কাছেও এসব সমস্যায় অধিকাংশই এসে পৌঁছোয় নি। সেজন্যই মানুষের তৈরী মহাকাশযান যখন সৌর জগতের সীমানা ছাড়িয়ে দূর মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে, মানুষের তৈরী যন্ত্র যখন সমুদ্রের গভীর থেকে সম্পদ আহরণ করে আনছে, মুষ্টিমের শহুরে কিছু মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য বিজ্ঞানীরা যখন নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন তখনও গ্রাম ভারতের সাধারণ মানুষ রয়ে গেছেন অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের অন্তরালে, গরুর গাড়ীর স্পিড বাড়ে নি, জ্বালানী সমস্যার সুরাহা হয়নি, মাটির বাড়ীরও গত একশো বছরে কোনো পরিবর্তন হয় নি। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার তাগিদটা কোথায়, আশা করি এ থেকে পরিষ্কার।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হবে সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করে তোলার জন্যই এবং সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সচেতন হলে তাঁদের পক্ষে যেমন অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বেড়াজাল কেটে সত্যের পথে বেড়িয়ে আসা সম্ভব, ঠিক তেমনই তাদের সনাতন সমস্যাগুলির দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি দিতে তাঁরা বাধ্য করতে পারেন একমাত্র তখনই। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। বিজ্ঞানীদের কারো কারো ধারণা—এখন প্রতি বছর যে হারে পানীয় জলের চাহিদা বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে জলের দুর্ভিক্ষ হওয়াটা আদৌ অসম্ভব নয়। এটা সুনিশ্চিত যে যতদিন না সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে এ সমস্যা মোকাবিলায় বড়সড় কোনো প্রচেষ্টা শুরু করা সম্ভব হবে না এবং তা না হলে আগামী দিনের সেই সমস্যাটা আজকের বিদ্যুৎ সংকটের চেয়েও ভয়াবহ আকার নেবে না—কে বলতে পারে।

সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান সচেতনতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো একটা দিক আছে। ধরুন, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা যে আজ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে বলছেন, বনজঙ্গল গাছপালাসহ তাবৎ প্রাণীজগৎকে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের খাতিরে বাঁচিয়ে রাখতে বলছেন—বিজ্ঞান সচেতন মন তৈরি না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষে কি এইসব সাবধানবাণীর যাথার্থ্য উপলব্ধি করা সম্ভব? আর সাধারণ মানুষ যদি এর সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি না করেন, তবে শুধু আইন করে কি আর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখা যাবে?

তাহলে প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল, “বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে কেন?” —তার একটা মোটামুটি সদুত্তর পাওয়া গেল। এবার আসছে দ্বিতীয় প্রশ্নটা—“বিজ্ঞান প্রচারে বেতার মাধ্যম কতটা উপযোগী?” হ্যাঁ এটা ঠিক, বিজ্ঞান প্রচারে রেডিওর তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে টেলিভিসন, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপত্রিকা। টেলিভিশনে যেহেতু কোনো কিছু শোনানোর সাথে সাথে তা দেখানোর সুযোগ আছে, সুতরাং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই মাধ্যমটি রেডিওর চেয়ে অনেক বেশী উপযোগী (মুশকিলটা অবশ্য অন্য জায়গায়)। বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোয়

দেশের বড় শহরগুলির মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ ছাড়া দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে টেলিভিসনের পক্ষে পৌঁছোন সম্ভব হচ্ছে না। এবারে আসি সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার দিকটায়। রেডিও ও টেলিভিসনের তুলনায় অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় সুবিধে অনেক বেশী। বেতার,দূরদর্শনের সমস্ত অনুষ্ঠানই তাৎক্ষণিক—অর্থাৎ প্রয়োজন হলেও ফিরে শোনা বা দেখার কোনো সুযোগ নেই, পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। পড়তে পড়তে কোনো জায়গা বুঝতে অসুবিধে হলে, বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পড়ে সেটা বোঝার চেষ্টা করা যায়—সাধারণ লোকের কাছে বিজ্ঞান প্রচারে যা একান্তই দরকারী। কিন্তু প্রশ্ন হোল—গ্রাম ভারতে ক'জনের কাছে পত্রপত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায় এবং পৌঁছোলেও তা পড়তে পারেন ক'জন? একেবারে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পশ্চিমবাংলায় শতকরা 70 জনেরও বেশী মানুষ নিরক্ষর। সাক্ষর যাঁরা তাঁদেরও যে একটা বড় অংশ পড়াশুনোর চর্চার অভাবে অক্ষর জ্ঞান হারিয়ে বসে আছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাকী থাকলো সেই রেডিও। কিছু কিছু শহরাঞ্চলে টেলিভিশনের জন্য রেডিওর জনপ্রিয়তা খানিকটা কমে গেলেও গ্রাম মফঃস্বল মিলিয়ে সারা ভারতে গণমাধ্যম হিসেবে এখনও রেডিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেজন্যই গান নাটকের মত বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিজ্ঞান কৃষি এবং বয়স্ক শিক্ষার মত বিষয়গুলিকে বেতারে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানের বিষয় নির্বাচন এবং সেই বিষয়টিকে শ্রোতাদের উপযোগী ভাষায় তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া—এই দুটো ব্যাপারই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগেই বলেছি, শ্রোতারা আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগের দপ্তরে নিয়মিত যে চিঠিপত্র পাঠান, যার সংখ্যা প্রতিমাসে পড়ে 300-র মত, সেগুলি থেকে কি কি বিষয়ের উপর অনুষ্ঠান করা দরকার তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক কথিকা বা আলোচনায় যাতে যথাসম্ভব কম টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার করা হয়, বিষয়টা বোঝাতে শ্রোতাদের কাছে সহজগ্রাহ্য উদাহরণ যাতে বেশী করে দেওয়া হয় এবং সহজ কথ্য ভাষায় যাতে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয় সে ব্যাপারেও নজর দিতে হয় খুব বেশী করে। বলে রাখা দরকার, আপাততঃ এই ভাষার ব্যাপারেই অসুবিধেগুলো সবচেয়ে বেশী।

বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলির শ্রোতা কারা? স্বভাবতঃই ছাত্রছাত্রীরাই সবচেয়ে বেশী এই অনুষ্ঠান শোনেন, যদিও রেডিওর নিজস্ব সমীক্ষা থেকে জানা গেছে—সব বয়সের শ্রোতাই বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানে আগ্রহী; খবর এবং নাটক বাদ দিলে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানের শ্রোতার সংখ্যাই নাকি সবচেয়ে বেশি। আর শ্রোতারা যে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানগুলি শোনেন, তার প্রমাণ তাদের নিয়মিত পাঠানো প্রশ্নগুলি যার দু-চারটে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

"আঙুল মটকালে শব্দ হয় কেন?"

"মাঝ আকাশে চন্দ্র সূর্যকে ছোট দেখায় কেন?"

"জলে আঙুল ডুবিয়ে রাখলে আঙুলের চামড়া কুঁচকিয়ে যায় কেন?"

"কুয়াশায় আমের মুকুল ঝরে যায় কেন?"

"সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করছে কেন?"

আসলে সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়মিত ভাবে ওঁদের কাছে পৌঁছানো দরকার এবং এর জন্য বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। সত্যি বলতে, আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে এই যোগসূত্রটাকেই দৃঢ় করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে আর একটা জিনিষ বলার আছে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ব্যাপারে

সায়েন্স ফিকসন বা বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না। প্রখ্যাত সায়েন্স ফিকসন লেখক আর্থার সি ক্লার্কের মতে—"সায়েন্স ফিকসন থেকে অনেক সময় অনেক তথ্য জানা যায় বটে, কিন্তু সায়েন্স ফিকসান যতটা শেখায় তার চাইতে পাঠককে অনেক বেশী অনুপ্রাণিত করে এবং সায়েন্স ফিকসনের মূল উপকারিতা হোল এই অনুপ্রেরণারই যোগান দেওয়া। জুলে ভার্ন আর এইচ জি. ওয়েলস্ এর গল্প উপন্যাস পড়ে যে কতশত তরুণ তরুণীদের সামনে বিশ্বের বিস্ময় ভেসে উঠেছে এবং কত যুবক যুবতী বিজ্ঞানকেই জীবিকা করে নিয়েছে তার হিসেব কে রাখে? পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী তাঁদের জীবনে স্বনামধন্য এই কাহিনী-কারদের প্রভাব স্বীকার করেছেন। ঠিকমতো সমীক্ষা করলে দেখা যাবে কাঁচা বয়েসীদের বৈজ্ঞানিক জীবিকা গ্রহণের মূলে বৃহত্তম ভূমিকা রয়েছে সায়েন্স ফিকসনের।"—এই কথাগুলি মনে রেখে আকাশ-বাণীর বিজ্ঞানের অনুষ্ঠানগুলিতে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানের গল্পগুজ অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক নাটিক প্রচারের ব্যবস্থা হয়ে আসছে এবং এগুলি যে শ্রোতাদের কাছে যথেষ্ট পছন্দসই তার প্রমাণ মিলছে বহু চিঠিপত্রের মধ্যে।

বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে আকাশবাণীর ভবিষ্যৎ একটা পরিকল্পনার কথা বলে বর্তমান প্রসঙ্গের ইতি টানবো। এটা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন—কলকাতায় বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু বিজ্ঞান-ক্লাব এই রাজ্যের মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রয়াসে নানা ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞান-আন্দোলনকে জোরদার করতে এইসব বিভিন্ন প্রচেষ্টাগুলিকে কিভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং সে ব্যাপারে আকাশবাণী কি ভূমিকা নিতে পারে সে ব্যাপারটাই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা হচ্ছে এখন।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

রাজশেখরের বিজ্ঞান সাধনা

রতনমোহন খাঁ

রাজশেখর ও পরশুরাম একই ব্যক্তি। পরশুরাম নাম ছদ্মনাম। এ নাম তিনি নিয়েছিলেন কঠোর কুঠার হস্তে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করার জন্য নয়, তবে তাঁর লেখনী শাণিত কুঠারের মত আঘাত হেনেছে অন্যায়, অবিচার ও অসত্যের উপর নির্মমভাবে শ্লেষ বিদ্রূপাত্মক রসরচনার মধ্য দিয়ে। ব্যক্তিগত জীবনে রাজশেখর ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর, স্বল্পভাষী, নিয়মনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ। এহেন গম্ভীর ও অন্তর্মুখী মানুষটি পরিণত বয়সে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেই সকলের মন জয় করে নিলেন তাঁর সাবলীল, তেজোপুঞ্জ, রসোত্তীর্ণ রচনায়। যদিও পাঠক সমাজ তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিকে সাদরে করেছে গ্রহণ, সমালোচকের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনা বলে পেয়েছে ছাড়পত্র তবুও সাহিত্যিক হিসাবে তিনি স্বীকৃতি পান জীবনসায়াহ্নে। এ নিয়ে তাঁর অন্তরে ছিল কিছুটা অভিমান ও ক্ষোভ, যার আভাষ মেলে 1960 সালের 10ই জানুয়ারী সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনার উত্তরে। "আপনারা এতজন মানী কৃতী গুণী এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমাকে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। আমার বিশেষ আনন্দের কারণ, যে সব বন্ধুদের মাঝে মাঝে পৃথক পৃথক দেখিছি, আজ তাঁদের একত্র দেখছি। আমার একটা মজ্জাগত লজ্জা আছে, বয়স আশি হলেও তা যায় নি। একটু আধটু প্রশংসা যদি দূরে থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তাহলে অবশ্য খুশীই হই। কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টির মতন ঘনীভূত প্রশস্তি মাথার উপর পড়ে তবে আতঙ্কিত হই, মনে হয় ধরিত্রী ফেটে গিয়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিন।

ভাগ্যক্রমে আমি কালা, আপনাদের অনেক কথাই শুনতে পাইনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছি তাতেই আমার জরাগ্রস্ত কান লাল হয়েছে। ···যেমন বিশেষ বিশেষ বিদ্যা না শিখলে উকিল, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ইত্যাদি হওয়া যায় না তেমনি স্বদেশের আর কিছু কিছু বিদেশের সাহিত্যে ভাল রকম জ্ঞান না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না, তবে লেখক হওয়া যায় বটে। বাংলা আর বিদেশী সাহিত্যে আমার জ্ঞান অতি অল্প, সে কারণে আমি সাহিত্যিক নই। আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরাণী। অভিধান তৈরি আর পরিভাষা বানান ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরাণীর কাজ। হাল্কা বিষয় নিয়ে কিছু কিছু লিখেছি বটে, কেউ কেউ মন্দ বললেও অনেকের তা পছন্দ হয়েছে, কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় যাকে 'সৃজনধর্মী সাহিত্য' বলা হয় তার মধ্যে আমার লঘু রচনার স্থান নাই। শিশু সাহিত্যের মতন পরশুরামের লেখাও খাপছাড়া আর বিপাঙক্তেয় হয়ে আছে।" (কথা সাহিত্য, কার্তিক, ১৩৬৮) সাহিত্যিকের সম্মান নিয়ে রাজশেখরের মনে ক্ষোভ থাকাটা স্বাভাবিক। জানিনা বিজ্ঞানী হিসাবে যথোচিত সম্মান না পাওয়ার কোন ক্ষোভ তাঁর মনে ছিল কি না ?

যাঁর জীবনের প্রথম দিকটি কেটেছে বাংলার বাইরে, যিনি বাল্যকালে বাংলায় কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না, তাঁর পরিণত বয়সে সাহিত্য ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে হঠাৎ আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা হলেও, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ঘটেছে ছেলেবেলাতেই। এ সম্বন্ধে তাঁর দাদা শশিশেখর বসু লিখেছেন —"মা যখন তার হাতে খেলনা দিতেন, টিনের এঞ্জিন, রবারের বাঁশি, স্প্রিং-এর লাটু, এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজশেখর লোহা, পাথর ও হাতুড়ি দিয়া ভেঙে দেখতো ভেতরে কি আছে, কেন বাজে ? —কেন ঘোরে ?"

সায়েন্স পাশ করার আগেই ল্যাবরেটারী হল, দুই আলমারী অ্যাসিড, ক্লোরেট অব পটাশ, কোবাল্ট, ফ্লোরাইড ইত্যাদি। বোমা তৈরি করে ফাটাতো, কাগজের ব্যারোমিটার দেওয়ালে এঁটে বলতো বৃষ্টি হবে কিনা, আমাদের কাশি হলে কফ-মিকশ্চার প্রেসক্রিপশন লিখতো, কবিরাজি কেতাব আমি এনে দিতাম তাই পড়তো। টেম্পল মেডিক্যাল স্কুলে শখ করে মড়াও চিরতো।"

1900 সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে রসায়নে এম. এ. পাশ করার পর পরবৎসর রিপন কলেজ থেকে বি. এল. ডিগ্রী নিয়ে রাজশেখর আইনব্যবসায়ে নামেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করে নবসৃষ্টির চিন্তায় যাঁর মন মগ্ন, সে কি পারে আইনজীবী হতে ? তাই বিজ্ঞানভিত্তিক কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রবীণ চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর দ্বারস্থ হলেন। ভাদুড়ী মহাশয়ের সহায়তায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন 1903 সালে। পর বৎসরই হন ঐ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী। মনের সঙ্গে হল কাজের মিল। বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর গৌরব হিসাবে দেখা দিল তাঁর পরিচালনায় ও সাধনায়। গবেষণা ও পড়াশুনা চলল বেঙ্গল কেমিক্যালে ও বাড়ীতে। বাড়ীতেও ছিল একটি ছোট গবেষণাগার। এইসব গবেষণার ফসল তাঁরই তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল কেমিক্যালে উৎপন্ন নানা সাবান, গন্ধদ্রব্য, কালি প্রভৃতি। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে এইসব পণ্য ছিল গুণে ও মানে সমতুল। বিশেষ করে সেন্ট তৈরীতে রাজশেখর ফাঁকিওলাজি ও

রসায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। 1933 সালের 1লা জানুয়ারী বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজারী পদ থেকে অব্যাহতি নিলেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ সংস্থার কারিগরী উপদেষ্টা ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের টেকনিক্যাল লাইব্রেরীতে কারিগরীবিদ্যার উপর বহু মূল্যবান বই সংরক্ষিত ছিল। ঐসব বই পড়তেন রাজশেখর বসু ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত। শ্রীদাশগুপ্ত 1925 সালে ঐ প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দেন। এর পর থেকে রাজশেখরই প্রতিষ্ঠানের কারিগরী বিষয়ে শেষ কথা বলতেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যেত।

ছোটখাট জিনিষ থেকে বড় বড় জিনিষ পর্যন্ত "নিজে কর" এই মনোভাব শুধু পোষণ করতেন না তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে গেছেন। নিজের হাতের তৈরী কালিতে লিখতেন, খাগের কলম (নিজের মত করে নিয়ে) ব্যবহার করতেন, কোন উপহার দিবার প্রয়োজন হলে একটা কিছু বানিয়ে উপহার দিতেন। ঘড়ি থেকে বাড়ীর ছোটখাট জিনিষপত্র নিজেই মেরামত ও পরিষ্কার করতেন। যষ্টিমধুর 1367 সালের বৈশাখ সংখ্যাতে কুমারেশ ঘোষের লেখা থেকে জানা যায়—যোগেশ বসুর অনুরোধে গ্রামে কুয়ো থেকে জল তোলার কলের নক্সা যেমন বাস্তবসম্মত তেমন অর্থকরী। হবিও ছিল অনেক। নানা রঙের রুদ্রাক্ষ দিয়ে ছোটদের গণনা শেখাবার জন্য চীনাদের অনুকরণে খেলনা, ছোট কাঠের নিক্তি (যাতে সূক্ষ্মভাবে ওজন করা যায়), এরকম অনেক জিনিষ তৈরি করে বেশ আনন্দ পেতেন।

তাঁর হাতে সরস চরিত্র সৃষ্টিই হত না, ছবি আঁকাও হত নিখুঁত ভাবে। দেশীয় গাছ-গাছড়া ও ধাতু দিয়ে তাঁর নিজে হাতে তৈরি রঙে ছবিগুলি হয়ে উঠত প্রাণবন্ত। তাঁর বইএর প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবিগুলি যতীন্দ্রনাথ সেনের আঁকা হলেও তাঁরাই কল্পনাপ্রসূত। প্রেমচন্দ্র গল্পের ছবিগুলি তাঁর নিজেরাই আঁকা। মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন তখন রাজশেখরকে জানালেন—সম্ভব হলে দেশী ধাতুর রঙ দিয়ে তিনি ছবি আঁকতে চান। রাজশেখর দেশী উজ্জ্বল ধাতুর রঙ খুঁজে খুঁজে কবিকে পাঠিয়ে দিলেন—তা ব্যবহার হল। সেই সময় ভারতের খনিজের প্রতি রাজশেখরের দৃষ্টি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়।" [যষ্টিমধু, বৈশাখ, 1367, পৃঃ 24] ফটোগ্রাফিতেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

বাংলা টাইপে ছাপাখানায় তাঁর দান চিরস্মরণীয়। সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা লাইনো টাইপের উদ্ভাবক হলেও রাজশেখরের সহায়তা ছাড়া এ-কাজ সম্ভব হত কিনা বলা শক্ত। যুক্তাক্ষরের জট ছাড়িয়ে সহজ হরফ রাজশেখরই তৈরি করেন। বাংলা লাইনো টাইপে সম্পূর্ণ মুদ্রিত প্রথম বই হনুমানের স্বপ্ন (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

শব্দবিজ্ঞানী হিসাবে রাজশেখরের কীর্তি চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন—"ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গোড়াপত্তন করিয়াছেন এবং বাঙালীর ঢিলেঢালা এলোমেলো প্রকৃতিতে একটা বাঁধন আনিয়া দিয়াছেন। অথচ এই বাঁধনে কষ্ট নাই, অপমান নাই। চলন্তিকা মারফৎ আমরা অজ্ঞাতসারেই ভাষার শৃঙ্খলা শিখিতেছি। সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের ইহা একটি বিপুল কীর্তি।" [কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, 1360

পৃঃ 636-637] 1934 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা সমিতির সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু, ঐ সমিতির সিদ্ধান্তগুলি চলন্তিকা অভিধানে লিপিবদ্ধ আছে। 1947 সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিভাষা কমিটি গঠন করেন, তারও সভাপতি ছিলেন রাজশেখর বসু।

মনোসমীক্ষণ ও মনোবিদ্যার প্রতি তাঁর যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল। ইণ্ডিয়ান সাইকো অ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন প্রথম থেকেই। এই সোসাইটির তত্ত্বাবধানে মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল স্থাপনের জন্য 1938 সালে তিনি তিলজলায় বেদিয়াডাঙ্গা রোডে একখণ্ড জমি ও বাড়ী সমিতিকে দান করেন। বর্তমানে এটি লুম্বিনী পার্ক নামে পরিচিত।

রাসায়নিক, যন্ত্রবিজ্ঞানী, শব্দবিজ্ঞানী ও সাহিত্যকর্মী রাজশেখরের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যথেষ্ট তত্ত্বগত ব্যুৎপত্তিও ছিল। এ বিষয়ে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার উৎকেন্দ্র সমিতি বিষয়ে লেখা থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। "একদিন রাজশেখর বসু আপেক্ষিকবাদ বুঝাইতে বসিলেন। আধুনিক Field Theory ছাড়িয়া দিলে Theory of relativityর মত জটিল তত্ত্ব বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে আর দুটি নাই। তিনি এই সুকঠিন তত্ত্বটিকে এমন সরল করিয়া সহজবুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন যে, আজ ভাবি যদি তাহা তখন লিখিয়া রাখিতাম তাহা হইলে একটি প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিত।" [কথাসাহিত্য, শ্রাবণ, 1360, পৃঃ 618-624]

রাজশেখর বসু রচিত কুটিরশিল্প ও ভারতের খনিজ (বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ) পুস্তক দুটি ভারতের শিল্প, খনিজ ও বৈজ্ঞানিক তথ্যে সমৃদ্ধ। কুটিরশিল্প পুস্তকে লেখকের দূরদৃষ্টির সুচিন্তিত অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকের শিল্প নির্বাচন প্রবন্ধ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া হল "এমন শিল্প বেছে নিতে হবে যাতে দরিদ্রের ক্ষতি না হয় অথবা যা নূতন। বুদ্ধিমান লোকে যদি বর্তমান শিল্পী বা কারিগরদের মতলব দিয়ে তাঁদের দ্বারা নূতন ভাল জিনিষ তৈরী করান এবং তা বেচবার সুব্যবস্থা করে নিজে লাভ করেন, তবে তাতে কারও জীবিকার হানি হয় না। যদি কুটিরজাত পণ্য বড় কারখানার যন্ত্রজাত পণ্যের প্রতিযোগী হয় তাতেও অনিষ্ট হয় না, বরং সমাজের পক্ষে তা বাঞ্ছনীয়।" ভারতের খনিজ পুস্তকখানি তৎকালীন ভারতের খনিজ দ্রব্যের একটি তথ্যবহুল সমীক্ষা। ভারতের শিল্প প্রসারে, খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে এই পুস্তকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। লঘুগুরু ও বিচিন্তায় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও বিজ্ঞানের অপপ্রচার সম্বন্ধে বক্তব্য যেমন সুস্পষ্ট তেমনি আবার ঐগুলি বিজ্ঞান-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বিজ্ঞানী কে? এর উত্তর 'বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি' প্রবন্ধের উপসংহারটুকুই যথেষ্ট। যিনি বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক তিনি ধীরভাবে ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিহার করে সত্যের সন্ধান করেন, প্রবাদকে প্রলাপ মনে করেন না, প্রচুর প্রমাণ না পেলে কোনও নূতন সিদ্ধান্ত মানেন না, অন্য বিজ্ঞানীর ভিন্ন মত থাকলে অসহিষ্ণু হন না এবং সুপ্রচলিত মত ও অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকেন না, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই বিনা দ্বিধায় মত বদলাতে পারেন।"

জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানান। বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মধারাকে সচল রাখার জন্য এবং পরিষদের কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য পরিষদ তহবিলে তিনি 6000 টাকা দান করেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে তিনি নিজেও উদ্যোগী ছিলেন। এ সম্বন্ধে 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান' প্রবন্ধে তাঁর মত অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রাজশেখরের বিরাট বৈজ্ঞানিক উদ্যোগকে তাঁর বিজ্ঞান সচেতনতাকে শ্রদ্ধা জানাতে কবিগুরু শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞান গবেষণাগারের নামকরণ করেন 'রাজশেখর বিজ্ঞান সদন'। বর্তমানে গবেষণাগারটি কারও নামে উৎসর্গীকৃত নয়।

রাজশেখর বসু ছিলেন রাসায়নিক, যন্ত্রবিজ্ঞানী, শব্দবিজ্ঞানী, আভিধানিক, সাহিত্যের ভাষ্যকার, শিল্পী, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিক। একের মধ্যে এত গুণের এত প্রতিভার সমন্বয় কি করে সম্ভব হল—এ এক পরম বিস্ময়। কর্মবিমুখ বাঙালী জাতির সামনে তিনি এক আদর্শ পুরুষ। আজ তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিজ্ঞানী রাজশেখরকে, রাজশেখরের বিজ্ঞান সাধনাকে প্রণতি জানাই, তাঁর কর্মময় জীবন আমাদের নানা কাজে উদ্দীপ্ত করুক এই কামনা করি।

অন্যচোখে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যু

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়*

নাগিনীর বিষজ্বালে করয়ে কাকুতি।
অঙ্গুলি ছাইয়া বিষ ধরিলেক ছাতি ॥
চক্ষু ওষ্ঠ ধরিলেক নাহি বোলচাল।
লড়বড় করে গলা মুখে পড়ে লাল ॥
নিদ্রিত হইল চক্ষু তনু জরজর।
কপাট লাগিল দন্ত করে কড়মড় ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র ধরিল জীবন নাহি আর।
উত্তরশিয়রী পড়ে চান্দর কুমার ॥

(মনসামঙ্গল—বিজয় গুপ্ত)

পুজোমণ্ডপের উঁচু বেদীটায় সাদা ফটফটে চাদরের ওপর কথকঠাকুর পদ্মাপুরাণখানা মেলে রেখে সুর করে করে পড়ছেন। মণ্ডপ জুড়ে ভক্তদের ভীড়। তন্গতচিত্তে ভাবে বিহ্বল হয়ে পাঠ শুনেছেন পাঁচ গাঁয়ের লোক। কালী নাগের চোরাগোপ্তা ছোবল, লখিন্দরের মরণ, বেহুলার বিলাপ, ভেলায় মড়া ভাসিয়ে নেতা ধোপানীর ঘাট, দেবসভায় বেহুলার নাচগানে মনোরঞ্জন, লখিন্দরের পুনর্জীবন লাভ, মনসার পুজো প্রচলন—সব প্রাণভরে শোনা হলে একত্রে ধ্বনি উঠল—জয় মা মনসা, জয় মা বিষহরি।

কেউ ভাবের ঘোরে গুম, কারুর চোখে জল. কেমন এক আচ্ছন্নতার বাতাসে পাঠের আসর ভেঙেও ভাঙে না। ঠিক তখনই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো একজন, মণ্ডপের একেবারে পেছনদিকে মোটা শাল-থামটায় হেলান দিয়ে হাঁটুমুড়ে বসেছিল সে লোকটা। 'ঠাকুর মশায়, আমার মনে এক প্রশ্ন এসেছিল। বলি ?

'হ্যাঁ হ্যাঁ বলবে বৈকি ! সংকোচ কিসের ? বলে ফেলো।'

'আচ্ছা ঠাকুর মশায়, লখিন্দর ঠিক ঠিক মরলো কিসে ?

'কেন, কালী নাগ মানে কালনাগিনীর দংশনে ! শুনলে কি তাহলে এতক্ষণ বসে ?'

'হ্যাঁ তা তো শুনলুম। কিন্তু কালনাগিনী সাপের তো বিষ প্রায় নেই-ই, ক্ষীণবিষ সাপ ওটা। ওর কামড়ে লোক তো কখনো মরে না। লখিন্দর মরে কি করে ?'

এতক্ষণে কিসের ধাক্কা লেগে যেন সবার ঘোরটা কাটলো, শতেক জোড়া চোখ এক জায়গায় আছড়ে পড়ে। কে গা এমন বেআদবের মত প্রশ্ন তুলছে।' ও, তুমি, তাই বল।'

* বি ডি 494, সল্টলেক, কলিকাতা-700064

হ্যাঁ। এইবার চেনা গেল। লোকটিকে আমি আপনি, সবাই চিনি। সে ওই নিন্দুক। রবিঠাকুরের 'তোতাকাহিনী'র নিন্দুককে নিশ্চয়ই মনে আছে, যে রাজামশাইকে সময় মত সাহস করে বলেছিল, 'মহারাজ পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?' সে-ই এতদিন পরে এসেছে পাঠ শুনতে। স্বভাব মাফিক গা-ঢাকা দিয়েই ছিল। এবার কি যেন মাথায় এসেছে! তবে হ্যাঁ, দশজনে যতই নিন্দে-মন্দ করুক, গঞ্জনা দিক, নিন্দুকের কথাগুলো কিন্তু মন থেকে কেউ-ই ফেলতে পারে না। রাজামশাই-ও পারেন নি। তাই সবাই কেমন বিরক্ত মুখে কিন্তু উদগ্রীব মনে চেয়ে থাকে নিন্দুকের দিকে।

কথক ঠাকুর গলা ঝেড়ে বললেন, 'বাপু হে, ঠাকুর দেবতা নিয়ে বেশী প্রশ্ন মনে ঠাঁই দিও না। তবু তুললে যখন, বলি—কালনাগিনীর তেমন বিষ এখন না থাকলেও পূর্বে ছিল। সতীসাধ্বী বেহুলার অভিশাপেই তো তার বিষের দর্প ভাঙলো, বেহুলা মাথা ঠুকে ঠুকে শাপ দিয়েছিলো কালীনাগকে—যে তার বৈধব্যের কারণ। তাই তো বেশ কিছু কালনাগিনীর গায়ে বেহুলার সিঁদুরের ছোপ, দেখনি?'

'তা দেখেছি, কিন্তু কালনাগিনী সাপের আগে তীব্র বিষ ছিল এখন নেই, এমন কথা তো কোন বিজ্ঞানের পুঁথিপত্রে দেখিনি। তাছাড়া কালনাগিনীর মুখের সামনে কোন বিষদাঁত নেই; পাশ-চোয়ালের দাঁতের সারিতে, ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাক্সিলারি টিথ, তার পেছনের দিকে ছোট দুটো বিষদাঁত থাকলেও ওগুলো খুব কাজের নয় মোটেই, জুত করে কামড়ে ধরে বিষ ঢালা তাই ওর কম্ম নয়। তাই বলছিলাম লখিন্দর মনে হয় সাপের ছোবলে মরে নি আদৌ।'

জনতা কিছুটা ঘাবড়েছে। গুঞ্জন উঠল এধার ওধার থেকে। কথকঠাকুরের বেদীর পাশ থেকে একজন গলা তুলে বলে, 'ব্যাটার সাহস দ্যাখো। আহাম্মক কোথাকার! আবার ইংরিজি কপচাচ্ছে।' ঠাকুরমশাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'কিন্তু তালে প্রাণটা গেল কি করে বল? লখিন্দর তার বাসরে মরেছিলো বটেই তো, না কি গো?' নিন্দুক বিনীত কণ্ঠে বলে, 'যদি অভয় দেন তো আমার ধারণাটা কেবল বলতে পারি। সত্যি-মিথ্যে বিচার আপনাদের।'

'তা বেশ তো। বল না!'

'লোহার তৈরী ছোট্ট একটা ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে লখিন্দর। উৎকণ্ঠা ভয় আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে, চোখ বুজে পড়ে আছে মড়ার মত। বন্ধ দরজার কাছে শিরদাঁড়া সোজা করে করজোড়ে কাঠ হয়ে বসে আছে বেহুলা, তার মনের অবস্থা বুঝতেই পারা যায়। গোটা ঘরটায় জানলা ঘুলঘুলি কিছু রাখেনি চাঁদ সদাগর, মনসার ছুঁচকেও ঢুকতে দেবে না সে। তবে তার অজান্তে রয়ে গেছে দেয়ালের গায়ে এক সূক্ষ্ম ছ্যাঁদা। বাতাস চলাচলের রাস্তা বলতে ওইটুকুই। ঘরে জিনিস-পত্র বলতে কিছু নেই, আলো-পাখা নেই, কেবল মাঝখানটায় পিলসুজে এক লম্ফ জ্বলছে, ম্লান আলো ছড়াচ্ছে কেমন বিষন্নতার।

ওইটুকু একরত্তি ঘর। দুটো উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত মানুষ ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে। কিন্তু ভেন্টিলেশনের যা অবস্থা! তার মধ্যে লম্ফর তেল পুড়ে তৈরী হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড। বেরোনর সুবিধা না পেয়ে ভারী কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নীচে মেঝের কাছে জমছে ধীরে ধীরে। শুয়ে

থাকা লখিন্দরের অল্প অল্প শ্বাসকষ্ট হলেও বোধভাষ্যি নেই তার। এক পল দু'পল যায়। এই বুঝি এলো মনসার চর লখিন্দরের প্রাণপাখী ছিনিয়ে নিতে। লখিন্দর তো মনসার কোপের কথা জানে, জানে জেদী মনসা তার বাবার প্রতি কী ভীষণ ক্রুদ্ধ আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। আজ আর ছাড়ান নেই তার। এই বুঝি এলো শমন। সমস্ত আশা-ভরসা হারিয়ে প্রায় আধমরা হয়ে আছে লখিন্দর। তিলমাত্র জোর নেই শরীরে, প্রতিরোধ উবে গ্যাছে সব।

সে এক ভয়ংকর প্রতীক্ষা। মৃত্যু ঘোরে আশেপাশে। সামনে সতীসাধ্বী স্ত্রী বেহুলার সজাগ ইন্দ্রিয়গুলিও ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। সময় গড়ায়। ক্রমে কুপির তেল কমে শিখা ছোট হয়ে আসে। তেলের জোগান কম তাই অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে এবার কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হয় বিষাক্ত গ্যাস। হবেই, স্বাভাবিক দহনে একটা কার্বন আর দুটো অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটা কার্বন ডাইঅক্সাইড অণু হয়। কিন্তু জ্বালানী কম হলে অসম্পূর্ণ দহনে দুটো কার্বন দুটো অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে দুটো কার্বন মনোক্সাইড অণু হয়। এই বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসও বেরোতে পারে না ঘর থেকে। ফলে বেচারি লখিন্দরের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস গিয়ে জমা হয় ফুসফুসে। ক্ষীণ প্রাণশক্তিতে একেকবার সে শ্বাস নেয় আর ফুসফুসের কার্বনমনোক্সাইড রক্তে মিশে রক্তে কার্বক্সি-হিমগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে থাকে।

এতে রক্ত সংবহন আর শ্বাসক্রিয়া বিপজ্জনকভাবে আক্রান্ত হয়, কিন্তু লখিন্দরের প্রতিরোধের সামান্যতম শক্তি নেই। এমনকি বেহুলাকে ডাকার মত জোরও সে পায় না। শরীরের কোন অংশের ওপরেই আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই লখিন্দরের, সে বুঝলো মৃত্যু তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। ক্রমশঃ নাড়ির গতি কমতে কমতে একসময় নিঃশব্দে থেমে যায় হৃদস্পন্দন।

এর মধ্যেই কাঠ হয়ে বসেছিল বেহুলা। মন-প্রাণ এক করে দেবতার পায়ে ঢেলে দিয়ে জগৎ সংসার ভুলে গিয়েছিল সে। ঘরের বিষাক্ত বাতাস তাকেও ছাড়েনি। তারও রক্তে কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া শুরু হয়। আধা-অবসন্ন সেও ছিল, কিন্তু মৃত্যুভয় তাকে অতটা অকেজো অথর্ব করে দেয় নি। তাই শ্বাসকষ্ট হতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায় বেহুলা। কুপিটা নিভে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘর। কোথাও কিছু দেখা যায় না। একি? শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন? দম বন্ধ হয়ে আসছে! উদ্‌ভ্রান্তের মত, হাতড়ে হাতড়ে দরজাটা পায়। শেষ শক্তিতে লোহার দরজার হুড়কো খুলেই বাইরে আছড়ে পড়ে বেহুলা, আর তক্ষনি জ্ঞান হারায়।

বাইরে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়ালো চাঁদ, সনকা, আরও সব আত্মীয় পরিজন আচমকা হতভম্ব হয়ে থাকে দু-দণ্ড। তারপর ঝড়ের গতিতে ভেতরে ঢোকে চাঁদ। মৃত লখিন্দরের নিথর নিস্পন্দ শরীর পড়ে আছে, চোখের মণি বড় হয়ে গেছে, গোটা দেহ ফ্যাকাসে যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলে pallor. এতো নির্ঘাৎ সাপের কামড় আর কি হবে! চাঁদ সদাগর চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশি কানি; তুই আমার ছেলেটাকে খেলিই তাহলে!'

নিন্দুক থামলো। মণ্ডপ জুড়ে পিন-ফেলা নীরবতা। রুদ্ধশ্বাসে সবাই শুনছিল লখিন্দরের নতুন কাহিনী। কিছু সময় যেতে ঘোর কাটলো। কিন্তু নিন্দুক কই? সে কখন ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে।

সার্কাসে কতগুলো ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার আর জন্তু-জানোয়ার আছে? এরকম ধরণের প্রশ্নে লোকটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, বাইরে যেরকম রঙচঙে পোস্টার টাঙানো ছিল, সার্কাসের তাঁবুর চেহারা দেখলে মনে হয় না যে ঐসব জিনিস এই সার্কাসে থাকতে পারে। তাই সে একটু ধাঁধার আশ্রয় নিয়ে বলল, এই সার্কাসে ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ার মিলে এক-শ'টা পা আর ছত্রিশটা মাথা আছে। এছাড়া আফ্রিকার বন্য জন্তুজানোয়ার নিয়ে একটা চিড়িয়াখানা আছে। জন্তুজানোয়ারদের মোট সংখ্যা কত—তা ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু, তাদের কুড়িটা মাথা আর ছাপান্নটা পা আছে।

দেবু খুড়ো ব্যাপারটা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা আর পায়ের হিসেব গুণে অঙ্ক কষতে বসলেন। কত ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার আর জন্তুজানোয়ার আছে? একটু চিন্তা করে কি বলা যেতে পারে, ঐ বৃদ্ধ কি বলেছিলেন? এরকম ধরণের ধাঁধার সঙ্গে আমাদের

2নং চিত্র

দেশীয় ধাঁধার সাধারণতঃ মিল নেই। তবে ছবিটা (চিত্র নং-2) ভাল করে দেখলে খানিকটা উত্তর আমরা পেতে পারি। ঘোড়া আর ঘোড়সওয়ারের এক-শ'টা পা আর ছত্রিশটা মাথা থেকে কার সংখ্যা কত লেখার শেষে দুনম্বর উত্তরে দেওয়া হলো। এখন চিঁড়িয়াখানা প্রসঙ্গে সার্কাসের লোকটা বলেছে ছাপান্নটা পা আর কুঁড়িটা মাথা আছে। ছবিতে বিভিন্ন খাঁচায় বিভিন্ন নম্বর দেওয়া আছে, যার থেকে আমরা বুঝতে পারি সেই খাঁচায় কতগুলো পাখী বা জন্তু আছে। একদম ওপরের খাঁচার

'3' থেকে বোঝা যায় সেই খাঁচায় তিনটে পাখী আছে আর ছবির বিভিন্ন জায়গায় যেসব পাখী আছে, তাদের সবাইকে একসঙ্গে করে আমরা মোট সাতটা পাখী পাই। বাকি খাঁচায় '2' থাকার অর্থ ঐসব খাঁচায় দুটো করে জন্তু আছে আর বাইরের হাতি, ঘোড়া, জিরাফ, জেব্রাদের একত্র করে আমরা দশটা জন্তু পাই। কিন্তু আরও তিনটে মাথা আর দুটো পায়ের হিসেব যে পাওয়া যাচ্ছে না। দুটো পায়ে তিনটি মাথা লাগাতে হবে—এটা খুবই গোলমেলে কথা। সেই আশ্চর্য জিনিসটা দেখবার জন্যে কি দেবু খুড়ো সার্কাসের ভেতরে ঢুকবেন? সে আর আমরা কি করে বলবো? খুড়ো যা কিপ্‌টে। তবে কৌতূহল দমন করতে না পেরে খুড়ো শেষ পর্যন্ত সার্কাসে ঢোকেন এবং মাথা ও পায়ের হিসেব মিলিয়ে দেখেন ঠিকই। কি করে তা সম্ভব হল। তিন নম্বর উত্তরে দেওয়া আছে।

* * * *

ঘড়ি যেমন সবাইকে ঠিক সময় বলে দিয়ে বিভিন্ন কাজকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে সাহায্য করে, আবার কখনও বিকল হয়ে গেলে এমন সব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে যা ভাবতেও অবাক লাগে। লয়েড একদিন সকালে দেখলেন তাঁর দুটো ঘড়ির একটা ঘড়ি প্রত্যেক ঘণ্টায় একমিনিট করে এগিয়ে যায় আর একটা ঘড়ি প্রত্যেক ঘণ্টায় দুমিনিট করে পিছিয়ে যায়। এরকম কাণ্ড-কারখানা দেখে লয়েড একদিন দুটো ঘড়িকে একসংগে চালু করলেন। হঠাৎ যখন তাঁর খেয়াল হল, তখন দেখলেন একটা ঘড়ি অপর ঘড়ির থেকে একঘণ্টা এগিয়ে গেছে। অমনি এটাকে ধাঁধার ভাষায় বলতে হয়, ঘড়ি দুটো কতক্ষণ চলেছিল? এটা অবশ্য খুবই সোজা একটা অঙ্কের ব্যাপার তবে হিসাবটা না মেলাতে পারলে চারনম্বর উত্তরটা দেখ।

* * * *

আমরা প্রায় প্রত্যেকেই স্কুলের সঙ্গে অতি ছোটবেলা থেকে পরিচিত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল কি প্রত্যেক স্কুলে কিছু বোকা ছেলে থাকবেই থাকবে। যাদের শত বোঝানোর চেষ্টা করলেও, তারা কিছুই বুঝতে পারে না। স্যাম লয়েড এরকম ধরণের তিনটে ছেলেকে মাথায় বোকার টুপি পরিয়ে দিয়ে একটা টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। ধরা যাক ছেলে তিনটিকে যথাক্রমে ক, খ ও গ দিয়ে চিহ্নিত করা হল। 'ক'-এর গায়ে একটা সংখ্যা '3' 'খ'-এর গায়ে একটা সংখ্যা '1' আর 'গ'-এর গায়ে একটা সংখ্যা '6' লাগিয়ে দেওয়া হল (চিত্র-3)। ক, খ, গ-কে এমন ভাবে পাশাপাশি সাজাতে হবে যাতে তারা এমন এক তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা তৈরি করবে যাকে অতি সহজেই 7 দিয়ে ভাগ করা যায়। এদের বিভিন্ন ভাবে আগে পরে করে, গায়ের নম্বরগুলোকেও উপর নীচে ঘুরিয়ে যেভাবে খুশি ধাঁধার সমাধানের জন্য সাজাতে পারা যায়। সংখ্যাটি কি হতে পারে। সেটা কি কিছু অনুমান করা যাচ্ছে? ধাঁধার প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটা লুকিয়ে বসে রয়েছে। গায়ের নম্বরগুলোকে দরকারমত উপর নীচ ঘুরিয়ে নেওয়া যাবে—এই কথাটার গুরুত্ব আছে। সংখ্যাটা বার করতে না পারলে পাঁচনম্বর উত্তর দেখো।

এইভাবে স্যাম লয়েডের প্রত্যেক ধাঁধা, বৈচিত্র্যে অননুকরণীয় আর সবসময় স্ব-মহিমায় ভাস্বর। কথায় আছে 'পৃথিবীটাই গোলোক ধাঁধা'—আর আমরা এই ধাঁধাময় পৃথিবীতে থেকে

ধাঁধার সঙ্গে পরিচিত হয় না, সেও কি কখনো সম্ভব? জীবনের সোপান পথে বিভিন্ন সময়ে ধাঁধিয়ে গিয়েও ধাঁধার মধ্যে থেকে যে এক বিশেষ রস আস্বাদন করা যায়, প্রাজ্ঞ রসিক মাত্রই অনুভব করেন। খিটখিটে মেজাজের বেরসিকদের জীবনের অনেক খটখটানিও ধাঁধার রসে সরস হয়ে উঠে। তবু "অরসিকেষু রসস্য মা নিবেদনম্"—এই কথাটাও থাকবে—যতক্ষণ সেই হতভাগ্য ব্যক্তিরা ধাঁধার গোলকধাঁধার একবারও হাবুডুবু না খান। স্যাম লয়েড কতকাল আগে মারা গেছেন। তবু কামনা করি স্যাম লয়েডরা দীর্ঘজীবী হউন।

3নং চিত্র

একনম্বর উত্তর : দোকানদার দাম ঠিকই নিয়েছিল। একটা সিল্কের স্কেটীর দাম পাঁচ টাকা, আর একটা পশমী কাপড়ের দাম চার টাকা।

দু-নম্বর উত্তর : চৌদ্দটা ঘোড়া, আর বাইশজন ঘোড়সওয়ার।

তিননম্বর উত্তর : সেই সার্কাসের বিশেষ একটা আকর্ষণ ছিল সাপের খেলা। একটা লোক দুটো সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। এবার তা হলে দুটো পা আর তিনটে মাথার হিসাব মিলে গেল। এই ধাঁধায় না পড়লে খুড়ো কি আর পয়সা খরচা করতো?

চারনম্বর উত্তর : একটা ঘড়ি-ঘণ্টায় দু-মিনিট ফাস্ট যায় আর অপরটা ঘণ্টায় এক-মিনিট স্লো যায়। তা হলো প্রতি ঘণ্টায় দু-জনের তফাৎ বাড়ে তিন মিনিট করে। সুতরাং এক ঘণ্টা বা 60 মিনিট তফাৎ হতে সময় লেগেছে কুড়ি ঘণ্টা।

পাঁচনম্বর উত্তর : সংখ্যাটা হচ্ছে 931 (6-কে ঘুরিয়ে নিতে হয়েছে)। এরকম ধাঁধা অবশ্য আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের কোন সংখ্যাকে উলটিয়ে আর এক সংখ্যা করা যায় না।

কয়লার ইতিকথা
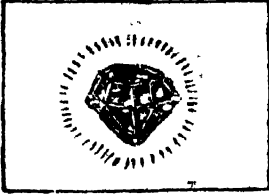
দীপঙ্কর খাঁ*

কথায় বলে 'কালো হীরে'

সেই কালো হীরে বা কয়লার প্রয়োজন হীরের থেকেও বেশী, অন্তত: দৈনন্দিন জীবনে।

প্রায় 250-310 মিলিয়ন বছর আগে ফার্ন জাতীয় বৃক্ষ নানা দুর্যোগে মাটির তলায় চাপা পড়ে,

এই সব প্রস্তরীভূত উদ্ভিদের উপর চাপ ও তাপ যোগে চলে রাসায়নিক ক্রিয়া, তৈরি হয় শিশু কয়লা পিট,

অনেক সময় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী নদীর স্রোত
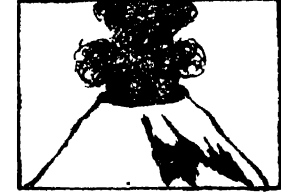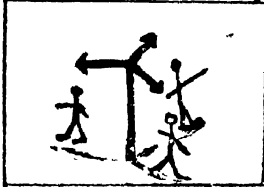
আবার অনেক সময় আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতই হয়েছে এর কারণ।

কয়লার শ্রেণীবিভাগে নানা জনের নানা মত,

ভারতীয় কোল গ্রেডিং বোর্ডের মতে কয়লা চার রকমের — মনোনীত এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর।

ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায়।

*10, গ্যালিফ স্ট্রীট, ব্লক-6, ফ্ল্যাট নং-71, কলিকাতা-3
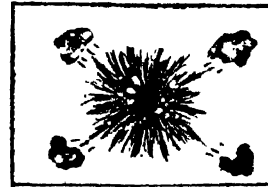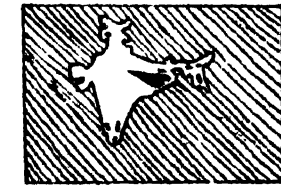
কয়লা ব্যবহার করা হয় নানা কাজে যেমন- জ্বালানি হিসাবে,
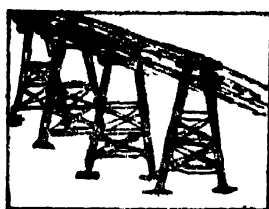
তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে,
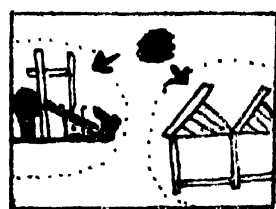
বিজ্ঞানাগারে ও কারখানায় বিজারক হিসাবে,

ইস্পাত তৈরির জন্যও কয়লার প্রয়োজন।

কয়লা থেকে বহু উপজাত বস্তুও পাওয়া যায়, যেমন- কোল গ্যাস,

আলকাতরা,
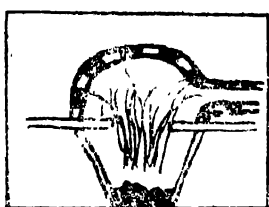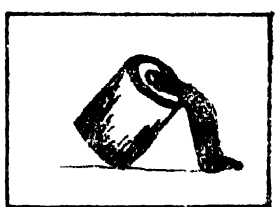
গন্ধক (খনি থেকে কখনও কখনও পাওয়া যায়)
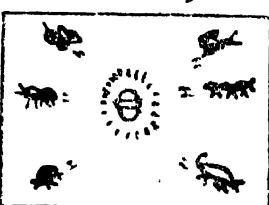
ন্যাপ্‌থালিন,
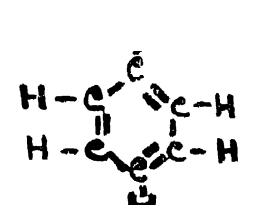
বেঞ্জোল, টলুইন প্রভৃতি।

আবার এইসব রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরি হয়- বিস্ফোরক,
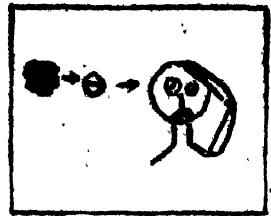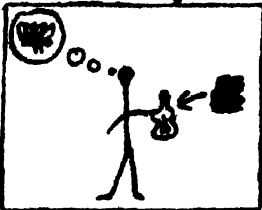
রং ও রং তৈরির উপকরণ,

ওষুধ, যেমন- অ্যাসপিরিন,

কৃত্রিম পারফিউম বা সুগন্ধি দ্রব্য, এমনকি সাবানও,

স্যাকারিনের মত কৃত্রিম খাদ্য দ্রব্য,
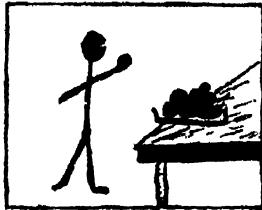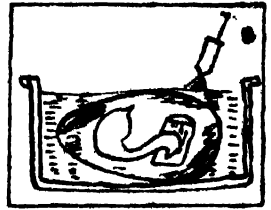
এবং ফরম্যালডিহাইড, যার সাহায্যে হাঁস- মুরগীর ডিমকে পচনের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যের শক্তি- সংকটের অন্যতম সমাধান ওয়াটার গ্যাস, যারও পশ্চাতে রয়েছে কয়লার অবদান।
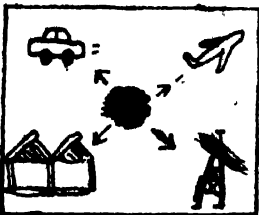
প্রয়োজনের তাগিদে এবং উপযুক্ত শাসনের অভাবে পৃথিবী থেকে একদিন এই কালোমানিকের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে,

কিন্তু সেই চরম দুর্গতির পূর্ব পর্যন্ত মানবসভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতিতে কয়লার ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

করে দেখ

তড়িৎপ্রবাহ—চৌম্বক বলরেখা

বিজয় দাস*

তড়িৎ পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ পরিবহনের চারিপাশে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এই চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার দিক এবং জলের পক্ষে তড়িৎপ্রবাহের দিক ও মা'নর সম্পর্ক মোটামুটি পরিষ্কার ভাবেই পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের জানা আছে। তড়িৎপ্রবাহ এবং চৌম্বক বলরেখার দিকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্লেমিং এবং ম্যাক্সওয়েল অঙ্গুষ্ঠ সূত্র এবং কর্ক স্ক্রু সূত্রের অবতারণা করেন। চৌম্বক বলরেখার সংজ্ঞা থেকে আমরা পাই "যদি একটি চৌম্বক উত্তর মেরুকে (free north pole) মুক্ত অবস্থায় একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের রাখা হয় তবে সে চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বল অনুভব করবে এবং মুক্ত মেরুটি প্রযুক্ত বলের পথ
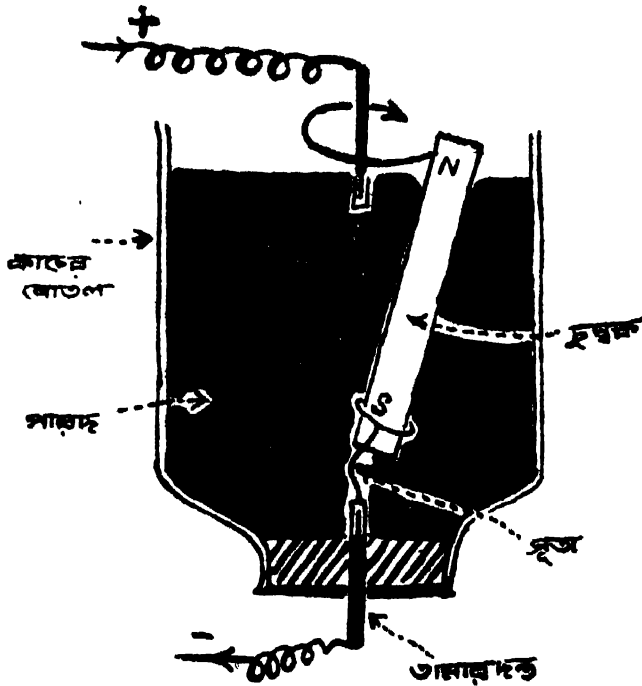
অনুসরণ করে চলতে থাকবে।" কিন্তু বস্তুত পক্ষে চৌম্বক বলরেখার দিককে এমন ভাবে পরীক্ষাগারে দেখানো ততটা সহজ নয়। মুক্ত উত্তর মেরু সত্যিই একটি অলীক কল্পনা। প্রকৃতিতে

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলকাতা-700009

চৌম্বকের উত্তর মেরুকে এমনি ভাবে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না, এবং মুক্ত উত্তর মেরুর পরিক্রমার দ্বারা--চৌম্বক বলরেখা যথাযথ চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু এখন যে পরীক্ষাটির কথা বলবো তাতে ঠিক মুক্ত মেরু না হলেও মুক্ত মেরুর কাছাকাছি অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে বলরেখাকে দেখানো অনেকটা সম্ভব।

এবার পরীক্ষাটির কথায় আসি। ছবি অনুসারে একটি মোটা কাচের বোতল নেই, যার নীচের দিকটা কেটে ফেলা হয়েছে। এবার বোতলটিকে উল্টে বসিয়ে দেই, আর বোতলের নীচের ছিপির মধ্য দিয়ে একটি এবং উপর থেকে আর একটি মোটা তামার পরিবাহীকে বসাই। এই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যেন অন্ততঃ 10 অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হতে পারে। এবার একটি ছোট চোঙাকৃতি (cylindrical) চুম্বক দক্ষিণ মেরুর দিকে একটি শক্ত সুতা দিয়ে বেঁধে নীচের তামার পরিবাহীর সঙ্গে বেঁধে দেই, ফলে উত্তর-মেরু কাচের দেয়ালের গা থেকে পড়ে থাকবে। এবার একটি পাত্রে কিছুটা পারদ নিয়ে আস্তে আস্তে ঢালি। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে চুম্বক দণ্ডটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। যত পারদ বেশী ঢালা হবে চুম্বকটিও ততো পারদের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে থাকবে। চুম্বকটি যখন পরিবাহী দণ্ডের সঙ্গে মোটামুটি একটা কোণ করে দাঁড়াবে তখন পারদ ঢালা বন্ধ করে দেই। এবার উপরের এবং নীচের পরিবাহী দণ্ড দুটিকে তড়িৎ কোষের ধনাত্মক (+ive) এবং ঋণাত্মক (−ive) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করলে দেখা যাবে যে চুম্বকের উত্তর মেরুটি পরিবাহীর চারপাশে ঘুরতে আরম্ভ করেছে এবং একটি বিশেষ পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে তড়িৎ প্রবাহের দ্বারা উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার দিককে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করছে।

এই পরীক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে—এখানে পারদ ব্যবহার করা হল কেন এবং চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে এমন ভাবে বেঁধেই বা রাখা হল কেন?- এ প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে পাট কাটি বা ময়ূরের পাখনার ছোট খণ্ড জলে ভাসার সম্পর্কে দু-একটা কথা বলি। মাছ ধরা সম্পর্কে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ময়ূরের পাখনা বা পাটকাঠির অংশের একপ্রান্ত যখন সুতোর সঙ্গে বেঁধে জলে ফেলা হয় তখন পাখনাটি জলের তলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে ভাসতে থাকে, কিন্তু সুতোর নীচে এক টুকরা সিসা ঝুলিয়ে দিলে ঐ পাখনা জলের তলের সঙ্গে একটা কোণ করে ভাসে এবং সুতোর নীচের সীসার ওজন মত বাড়ানো হয় পাখনাটি ততো ধীরে ধীরে সোজা হতে থাকে। এখন একটা লোহার চুম্বককে যদি এমনি ভাবে একটি বিশেষ কোণ করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয় তবে পাত্রের মধ্যে জল নিলে তা আদৌ সম্ভব হবে না। তাই চুম্বক থেকে আরও বেশী ঘনত্ব যুক্ত মাধ্যমেই নেওয়া হল, যার ঊর্ধ্বমুখী চাপ চুম্বককে সাধারণ অবস্থায় তার উপরের তলে ভাসিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। তারপর চুম্বকে এক প্রান্তে আরও অধিক ঘনত্ব যুক্ত বস্তু ঝুলিয়ে দিলে বা ঐ প্রান্তকে নীচে বেঁধে রাখলে চুম্বক এমনি একটি কোণ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। পারদ ঢালা সম্পর্কেও কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা পারদ খুব কম হলে চুম্বক কাচের দেয়ালের গা ঘেসে পড়ে থাকবে, আবার পারদ বেশী হলে চুম্বক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, এই দুই অবস্থাতেই পরীক্ষাটি করা যাবে না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি এই প্রসঙ্গটি স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের থেকে উচ্চতর গবেষকদের কাছেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পরীক্ষাটি প্রথম করেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে। তাঁর এই পরীক্ষাটি F. Cajori's History of Physics-এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে বহুদিন যাবৎ এই পরীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

পরিষদ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে আগামী 12ই এবং 13ই নভেম্বর (1980) 'সত্যেন্দ্র ভবনে' (পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700006) নিম্নোক্ত বিষয়ে সেমিনার ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

সেমিনারের বিষয়: হোমিওপ্যাথি, সমাজ ও বিজ্ঞান

সময়: বেলা 4টা

উক্ত তারিখেই সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হবে ও অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার এবং মডেল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হবে।

[প্রদর্শনী বেলা 3টা থেকে রাত্রি 7টা পর্যন্ত খোলা থাকবে, আলোচনার শেষে বিজ্ঞান-চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।]

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

নূতন উত্তোলক পাম্প

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়*

কোন নীচু জলাশয় বা জলপূর্ণ স্থান থেকে বেশ কিছুটা উঁচুতে সরাসরি জল তুলতে গেলে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে উত্তোলক পাম্প বা লিফট্ পাম্প (lift pump) বলা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রধানত বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে এই পাম্পের পিস্টনকে গতিশীল করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হাতের সাহায্যেও পিস্টনকে গতিশীল করা হয়। উপরিউক্ত যে কোন ক্ষেত্রেই উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় সাধারণ মানুষ খুব কম সময়ই এই পাম্প ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানে এই পাম্পের ব্যবহার ক্রমশঃই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে যে সকল চাষের জমির পাশ দিয়ে খাল বা নদী প্রবাহিত হয় সেই সকল জমিতে সেচের কাজে এই পাম্প খুবই উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করছে।

এই পাম্পের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে এই পাম্প তৈরির একটি সহজ ও সুলভ পদ্ধতির কথা একটি মডেলের সাহায্যে এখানে আলোচনা করা হল।

আলোচ্য পদ্ধতিতে একটি পাম্পের মডেল তৈরি করতে হলে প্রথমে যে যে জিনিষের প্রয়োজন হবে সেগুলির তালিকা নীচে দেওয়া হল—

(i) লোহার পাইপ—1টি ($1\frac{1}{2}'$ বা $2'$)

(ii) ভাল টিনের পাত—1টি ($1\frac{1}{2}' \times 1'$)

(iii) পাইপটির গায়ে এঁটে থাকে এরূপ একটি লোহার বেড়ি।

(iv) তিনটি এক মাপের লোহার শিক—প্রতিটি $1'$ বা $1\frac{1}{2}'$ হওয়া চাই।

(v) চামড়ার ওয়াশার—3টি।

(vi) ছোট স্ক্রু ও নাট—3টি করে এবং টিনের ওয়াশার—6টি।

(vii) সরু লোহার চেন বা টন সুতো—কমপক্ষে 4 ফুটের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(viii) একটি জলপূর্ণ পাত্র।

$1\frac{1}{2}' \times 1'$ মাপের টিনের পাতটি দ্বারা প্রথমে একটি $3'' \times 2'' \times 2''$ মাপের ট্রে তৈরি করা হল। যার একপাশে একটি জল নির্গমনের পথ থাকবে। অতঃপর ট্রের মাঝখানে একটি গর্ত করে লোহার পাইপটি এমনভাবে প্রবেশ করানো হল যাতে পাইপের এক-চতুর্থাংশ ট্রের উপরদিকে এবং তিন-চতুর্থাংশ নীচের দিকে থাকে। পাইপ ও ট্রের সংযোগস্থল রাং ঝাল দ্বারা সুদৃঢ় করে নিতে হবে।

* হাটখোলা, চালকেপাড়া, চন্দননগর-712136

এক্ষেত্রে বাড়ীতে যে কলের পাইপ ব্যবহৃত হয় সেই পাইপ লাগালেই চলবে। অতঃপর লোহার বেড়িটি পাইপের মধ্যস্থলে লাগিয়ে তিনটি লোহার শিককে বেড়ির তিনদিকে চিত্রের মত লাগানো হল। এগুলো পায়ার কাজ করবে। এবার ঐ 4 ফুটের চেন বা টন সুতোর তিন জায়গায় চামড়ার ওয়াশারগুলো লাগিয়ে চেন বা সুতোর এক প্রান্ত পাইপের মধ্যে দিয়ে অপর প্রান্তের সঙ্গে যোগ করতে হবে। চেন বা সুতোটা পিস্টনের এবং চামড়ার ওয়াশারগুলো ভাল্‌ভের কাজ করবে।
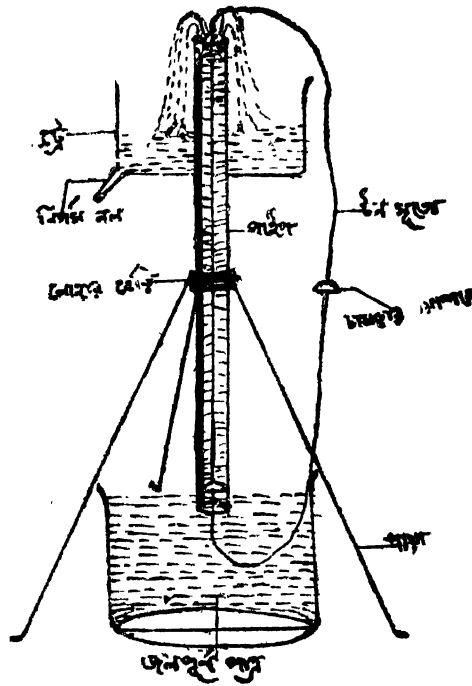
এখন পাইপের মধ্যে দিয়ে চামড়ার ওয়াশার ও চেন বা সুতো লাগানো একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। প্রথমে ওয়াশার ও পরে যথাক্রমে সুতো ও চেন লাগানোর পদ্ধতি আলোচনা করা হল।

প্রতিটি চামড়ার ওয়াশারের দুদিকে দুটি টিনের ওয়াশার লাগিয়ে একটি স্ক্রু ওয়াশারের গর্ত দিয়ে প্রবেশ করানো হল এবং অপরদিকে একটি নাট লাগানো হল। এবার টন সুতোকে দু ভাঁজ করে এর এক প্রান্ত পাইপের মধ্যে একদিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অপর দিক দিয়ে বের করা হল। অতঃপর সুতোটাকে এমন তিন ভাগে ভাগ করা হল যে ঐ তিন জায়গায় ওয়াশারগুলো লাগিয়ে যখন সুতো টানা হবে তখন একটা ওয়াশার পাইপের উপর মুখে থাকলে অন্য ওয়াশার পাইপের নীচের মুখে থাকবে, অর্থাৎ কখনোই পাইপের মধ্যে অবস্থানকারী ওয়াশারের সংখ্যা দুই-এর কম হবে না।

যদি ওয়াশারের সঙ্গে চেন লাগানো হয় তবে এইভাবে চেনটাকে পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে তিন ভাগে ভাগ করতে হবে এবং চেনের সঙ্গে নবুকে রাংঝাল করে আটতে হবে।

উল্লিখিত সমস্ত কাজ হয়ে গেলে একটা জলপূর্ণ পাত্র পাইপের তলায় রাখতে হবে। যার মধ্যে পাইপটা কিছুটা ডুবে থাকবে। অতঃপর চেন বা টন সুতো ধরে টানতে শুরু করলে যখন একটা ওয়াশার নীচের মুখ দিয়ে পাইপে ঢুকবে তখন কিছুটা জল পাইপে প্রবেশ করবে। চেন বা সুতো টানা অব্যাহত থাকলে যখন ঐ ওয়াশারটি উপর মুখ দিয়ে বেরোবে তখন কিছুটা জল নির্গত হয়ে ট্রেতে জমা হবে। ঠিক একই সময়ে অপর একটা ওয়াশার আবার কিছুটা জল সমেত পাইপের নীচের মুখ দিয়ে প্রবেশ করবে। এইভাবে সমস্ত জল উপরের ট্রেতে গিয়ে জমা হবে ও নির্গম নল দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে চলে যাবে।

এই ধরণের পাম্পকে দৈনন্দিন কাজের উপযোগী করে তুলতে পারলে এর প্রচুর চাহিদা হতে পারে। বিশেষত পাহাড়ী এলাকায় নীচু জায়গা থেকে উঁচু জায়গায় জল স্থানান্তরিত করতে, গ্রামাঞ্চলে পুকুর, খাল, নদী বা কুয়ো সংলগ্ন জমিতে সেচের কাজে এবং আরও নানা ধরণের কাজে এর ব্যবহার করা যেতে পারে।
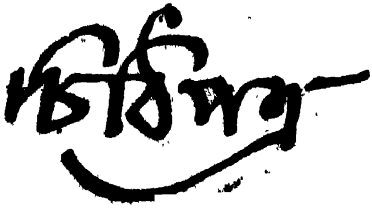
"অপবিজ্ঞান" প্রসঙ্গে

জুলাই, 1980 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র শ্রীশংকর বর্ধণের 'অপবিজ্ঞান' শীর্ষক সম্পাদকীয়র প্রতি আপনাদের এবং পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অপবিজ্ঞানের উদাহরণ উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Kirlian Photography' এবং Phantom Leaf Effect গবেষণার কথা টেনে এনেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য এরকম :

(1) Kirlian Photography এক ধরণের Electric Discharge Photography যা 1939 সালে রুশ গবেষক S. D, Kirlian প্রথমে উদ্ভাবন করেন, যদিও তৎপূর্বেই বহু বৈজ্ঞানিক বহু দেশে এই প্রকার গবেষণা চালান। বর্তমানেও বিশ্বের অনেক দেশের অনেক বৈজ্ঞানিকই এই প্রকার গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে Dr. Omura [Yoshiaki Omura. MD, Sc D, FACA, 800 Riverside Drive. New York Ny—10032, Physician and College Professor ; Chairman, IKRA International Standards Committee] (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোচ্য সংখ্যার 'আকুপাংচারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত) এই গবেষণার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। সম্প্রতি পদার্থ বৈজ্ঞানিক শ্রদ্ধেয় শ্রী শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন ("Sunday"; 7th Sept, 1980) যে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু Kirlian-এর চেয়ে 30 বৎসর পূর্বেই এই Phenomenon সংক্রান্ত গবেষণা করেছিলেন এবং একটি পাতার চিত্র সাধারণ আলোর সাহায্য ছাড়াই তুলেছিলেন (এই ব্যাপারে Proceedings of the Royal Society ; 1902 এ Communications by J. Chunder Bose দ্রষ্টব্য)।

"Sunday", 7th September '80 সংখ্যাতে প্রকাশিত I.I.T Madras-এর অধ্যাপক R. Sri-Nivasan-এর পত্রটিও উল্লেখযোগ্য। এই পত্রে তিনি দাবী করেছেন যে যদিও যাদবপুরের তিন বিজ্ঞানী Phantom Leaf Photography তুলতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু তার পূর্বেই 1976 সালে Madras I.I T-তে Prof. Y.T. Thatachari এবং শ্রীমতী D. Pushpa ভারতবর্ষে প্রথম Phantom Leaf Photo তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের গবেষণা সম্পূর্ণ করেন নি। অধ্যাপক Thatachari এই ব্যাপারে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে Current Science, Vol 45 (6), 1976 PP 207—210, তাঁর তোলা Phantom Leaf Photograph প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তাঁরা যদিও এই প্রকার ছবি তুলেছেন কিন্তু একই প্রকার ছবি পাওয়ার পৌনঃপুনিকতা তাঁদের ক্ষেত্রে খুবই কম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বিজ্ঞানী শতকরা 80টি ক্ষেত্রেই এই প্রকারের চিত্রগ্রহণ করতে বর্তমানে সক্ষম হয়েছেন।

(2) উদ্ভিদের পাতার Kirlian Photographyর সময় কদাচিৎ একধরণের অপ্রত্যাশিত ছবি পাওয়া যায়, যাকে পাশ্চাত্য গবেষকেরা নাম দিয়েছেন Phantom Leaf Effect বা Cut Leaf

Effect. রুশবিজ্ঞানী Adamemko সর্বপ্রথম এই প্রকার Phantom Leaf Photo তুলতে সক্ষম হন। পরে Dr. Thelma Moss এবং তাঁর সহযোগীরা USA-তেও এই প্রকার ছবি তুলতে সক্ষম হন। Phantom বাস্তব থাকা মানেই ব্যাপারটা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় নয়।

(3) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র কেজরীওয়াল এবং শ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কয়েক বছর ধরে এই ব্যাপারে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল Phantom Leaf Effect-এর বিজ্ঞান সম্মত Explanation (ব্যাখ্যা) দেওয়া, কোন ধরণের অপবিজ্ঞানকে উৎসাহিত করা নয়।

(4) গবেষণার মূল লক্ষ্যে পৌঁছানর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, গবেষকত্রয় Phantom Leaf Effect পাবার Objective Conditionsগুলি Identify করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রথমতঃ দুটি প্রবন্ধে Institute of Engineers-এর Journal (EL-3) এ December, 1979 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই গবেষকেরা দুইটি প্রবন্ধে International Kirlian Research Association-এর Fourth Annual Conferenceএ পাঠ করেন।

(5) উল্লিখিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এসেছে ভারত সরকারের Department of Science and Technology থেকে। কোন বিদেশী অর্থানুকূল্য এই গবেষণায় একেবারেই জড়িত নেই।

(6) বিদেশী অর্থানুকূল্যে তিন বিজ্ঞানী আমেরিকায় চলে গেছেন কথাটি তাই অসত্য। প্রথমোক্ত দু-জন বিজ্ঞানী আমেরিকায় গিয়েছেন আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে যোগদান করতে এবং তাঁদের গবেষণার ফল অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বিনিময় করতে। এঁর মধ্যে একজন বিজ্ঞানী পেয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্য এবং অপর জনকে ব্যয় করতে হয়েছে নিজস্ব পারিশ্রমিক।

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী বর্মণের সম্পাদকীয়টির উল্লিখিত অংশ লেখকের কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে হয়। পত্রলেখক নিঃসন্দেহ যে, শ্রী বর্মণ অধিক তথ্য জানার জন্য উপরিউক্ত বিজ্ঞানীত্রয়ের সঙ্গে কোনভাবে যোগাযোগ করেন নি। যাদবপুরের বিজ্ঞানীত্রয়ের সততা ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। আশা করি, এই বিজ্ঞানীত্রয়ের এবং এদেশের বিজ্ঞান চর্চাকারীদের কাছে শ্রীবর্মণ মার্জনা ভিক্ষা করে এবং সম্পাদকমণ্ডলী এই পত্রটি প্রকাশ করে, তাঁদের কর্তব্য সাধন করবেন।

ইতি—

তপনকুমার ঘোষাল
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দুঃখ প্রকাশ

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার জুলাই, 1980 সংখ্যার সম্পাদকীয়তে পরিবেশনের ত্রুটির জন্য উপরিউক্ত বিষয়ে কতিপয় সংস্থা ও ব্যক্তিবিশেষের ক্ষোভের ও মনোবেদনার কারণ হয়েছে। কোন সংস্থাকে হেয় বা ব্যক্তিবিশেষকে কটাক্ষ করা আমাদের উদ্দেশ্য বা নীতি নয়। অসাবধানতাবশতঃ এই ঘটনা ঘটায় সম্পাদকমণ্ডলী দুঃখিত। সাধারণ পত্রিকায় ঐ সংবাদের পরিবেশন ভঙ্গীটিকেই অপবিজ্ঞানবলা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।

পূজোয় চাই নতুন জুতো

টোনি ১০
সাইজ ৪-৬, ৭-১০
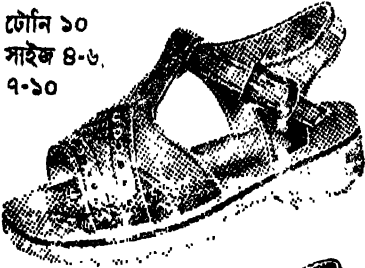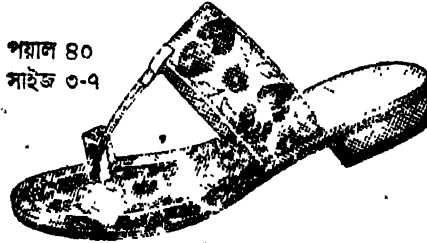
স্পোর্টি ১৯
সাইজ ৫-৮
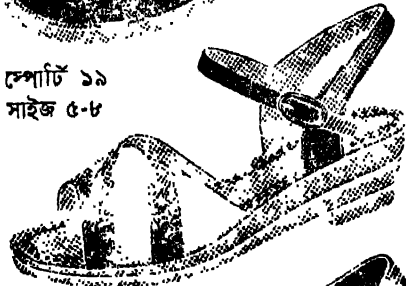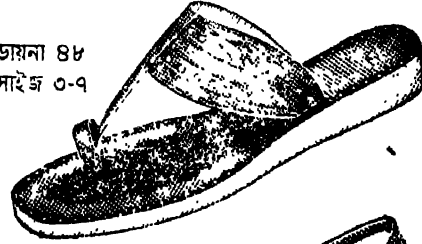
অ্যালভো ২৩
সাইজ ৩-৭

এস্কোয়ার ৫০
সাইজ ৬-১০

মোকাসিনো ১৩
সাইজ ৬-১০

Bata

International chemistry at work

ACCI uses international resources to serve national priorities...

Agriculture, Industry, Defence and Medicine.

With pesticides like Gramoxone and BHC. With Alkathene brand of polyethylene. With rubber chemicals. With life saving drugs. And with a wide range of paints, for protecting national assets.

Advanced technology for basic needs.

The Alkali and Chemical Corporation of India Limited

(R)

'Alkathene' and Gramoxone' are the registered trade marks of Imperial Chemical Industries Limited UK
The Alkali and Chemical Corporation of India Limited are the registered users of 'Alkathene' and licensed users of 'Gramoxone'.

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এসসি (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি, কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। বিগত বন্যায়ও কিছু পুস্তক ও পত্রিকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা :

'সত্যেন্দ্র ভবন'

P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700006

ফোন : 55-0660

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সংখ্যা 11, নভেম্বর, 1980

কার্যালয়
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
সত্যেন্দ্র ভবন
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদপট—বিশ্বনাথ মিত্র

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ নভেম্বর, 1980 একাদশ সংখ্যা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

রাজপথ

রতনমোহন খাঁ

রাজপথ রাজার পথ, না রাজধানীর পথ, না প্রশস্ত পথ, এ তর্ক পণ্ডিতদের জন্য তোলা থাক। আমরা আমাদের রাজধানী কলকাতার পথের কথাই বলছি। এ পথ জনপথ। প্রত্যহ হাজার হাজার মানুষের ও শত শত যানবাহনের চলাচলে কলকাতার বহুপথ কোলাহলমুখরিত। কেন এত পথ? সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে দেখা দেয় যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি। তৈরি হয় ছোট বড় সড়ক, আসে দিনের পর দিন উন্নত যানবাহন। সে ইতিহাস অন্যত্র আলোচ্য। প্রশ্ন ওঠে, সড়ক ও যানবাহন কি যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট? এর উত্তর নিশ্চয়ই নেতিবাচক।

উন্নতির জন্য চাই সড়কের সংরক্ষণ, চাই জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কালোপযোগী যান, চাই সুষ্ঠু প্রশাসন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার রাজপথের চিত্র: (i) বহু রাস্তার দু-পাশে এমন কি মাঝেও জমে থাকে আবর্জনার পাহাড়, দুর্গন্ধ আর রোগজীবাণুতে আবহাওয়া হয় দূষিত। (অনেকে হয়ত বলতে পারেন এতে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ছে), (ii) যেখানেই নিত্য জনসমাগম, সেখানেই ফুটপাথ হয়ে যায় জবর দখল ফেরীওয়ালা নামক এক অদ্ভুত জীবের মায়া; (iii) ছন্নছাড়া ছিন্নমূল হাজার হাজার স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে রাস্তে পাতে ফুটপাতে ঘরকন্না, মানবজীবন করে তোলে সার্থক; (iv) ভোরের অন্ধকারে ফুটপাথে, রাস্তায় ঐ সব নরনারীর প্রাকৃতিক নিয়মে হয়ে ওঠে অসংযমীর অবস্থা; (v) প্রশাসন ও মেরামতী সংস্থার মায়াজালে রাস্তায় রাস্তায় তৈরি হয় ছোটখাটো ডোবার মিনিফর্ম। বিদেশী পর্যটক বা সড়ক বিশেষজ্ঞ এবং দেশের সাচ্চা নাগরিক হতাশায় বলে ওঠে—হায় এই কি রাজপথ?

এবার বলি যানবাহন সম্বন্ধে: কলিকাতা পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল শহর। উন্নত সড়ক এবং আধুনিক যান ভারতের যে কোন শহরের থেকে এখানে প্রয়োজন বেশি। কিন্তু, হায় মহাভারতের যুগের যানবাহন থেকে বিশ শতকের নানা যানের কি সহাবস্থান এই মহানগরীর পথে। কবিগুরুর ভাষায় বলতে হয়, "মেলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।" বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কি আদর্শ নমুনা। ঠেলা, রিক্সা, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, লরি, ভ্যান, মোটর, বাস, সাইকেল, ট্রাম, কাকেও এ মহানগরী করে না বিমুখ। প্রতিটি মহানগরী কালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুতগামী যান প্রচলনে ব্যস্ত। আর আমরা ট্রামের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি মহাসমারোহে, ট্রাম চালু রাখার ব্যবস্থাকে করছি আরো পাকাপোক্ত। ভারতের অন্যান্য শহর থেকে ভাঙাচোরা যত ট্রাম সংগ্রহ করে রাজপথের করছি শোভাবর্ধন। জানি না কোন্ উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত এই যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তবুও সুদিনের আশায় পথ চেয়ে রই। ভাবী কালের মানুষ মহানগরীর-রাজপথকে সত্যই রাজপথ করে গড়ে তুলবে এই আশাই রাখি।

র‍্যামি

নারায়ণ বসু*

[সুতো কাটা যায় এমন সব উদ্ভিজ্জ আঁশের মধ্যে র‍্যামি আঁশ সবচাইতে শক্ত ও মিহি। সেই র‍্যামির পরিচয়, চাষপদ্ধতি, ব্যবহার এবং ভারতবর্ষে এর চাষ বাড়াবার সম্ভাবনা বিষয়ে প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে।]

যে সব উদ্ভিজ্জ আঁশ দিয়ে সুতো কাটা যায় সেগুলির মধ্যে র‍্যামি আঁশ সবচাইতে শক্ত এবং মিহি। এই আঁশ কার্পাসের চেয়ে আটগুণ, ফ্ল্যাক্সের চেয়ে চারগুণ এবং হেম্পের চাইতে তিনগুণ বেশী শক্ত। সিল্কের চাইতেও এটি সাতগুণ বেশী শক্ত এবং এ-দিয়ে সিল্কের মতই সুন্দর, শক্ত ও মোলায়েম সুতো তৈরি করা যায়। র‍্যামির এক একটি আঁশ অন্যান্য উদ্ভিজ্জ আঁশের চাইতে অনেক লম্বা, প্রায় 10 থেকে 18 সে. মি.। কার্পাসের আঁশ সেই তুলনায় মাত্র এক থেকে ছয় সে. মি. লম্বা। জলে ভিজলে এই আঁশ আরও বেশী শক্ত হয়। এ-সব কারণে র‍্যামি আঁশকে ইস্পাতের তারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে উন্নতমানের কাপড় তৈরিতে কার্পাস এবং বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম আঁশের বিকল্প হিসেবে র‍্যামি আঁশ ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে পেট্রোলিয়ামজাত কৃত্রিম আঁশের দাম যখন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে দেশে র‍্যামির উৎপাদন খুবই নগণ্য এবং চাহিদার একটা বিরাট অংশ পূরণ করা হয় আমদানি করা আঁশ দিয়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যামির চাষ বাড়াবার প্রয়োজন।

র‍্যামি পরিচিতি

র‍্যামি একটি সুপ্রাচীন উদ্ভিজ্জ আঁশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রাচ্য দেশে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। কালিদাসের কাব্যে এবং রামায়ণে যে ঘাস-কাপড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা এই র‍্যামি আঁশেই তৈরী। প্রাচীনকালে জাপানে এই আঁশ থেকে যে কাপড় তৈরি হতো তাকে বলা হতো "একিগো যোফু" এবং "সাৎসুমো যোফু"। 1300 খ্রীস্টাব্দে চীনে কার্পাস চাষ শুরু হয়, তারও অনেক আগে থেকে সেখানে র‍্যামির চাষ হতো। সেখানে এটি "চীনা ঘাস" নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবতঃ, যোগাযোগের অসুবিধা থাকার জন্য র‍্যামি চাষ অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত য়ুরোপ, আফ্রিকা বা আমেরিকার দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

*পাট উন্নয়ন নির্দেশালয়, নিজাম প্যালেস, কলিকাতা-700020

অবে, খ্রীস্টপূর্ব 900 শতাব্দীর নেস্টারের বিবরণীতে, রাশিয়ার ভল্গা নদীতে চলাচলকারী জলযানের পাল যে র‍্যামি সুতো দিয়ে তৈরি হতো, তার উল্লেখ রয়েছে।

1660 খ্রীস্টাব্দে জর্জ, ই, রুম্‌ফিস নামে একজন ওলন্দাজ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে র‍্যামি গাছটিকে প্রথম দেখেন এবং তার নাম দেন র‍্যামিধাম মেজাস। র‍্যামি নামটি সম্ভবত: এসেছে গাছটির মালয়েশীয় এবং স্প্যানিশ নাম 'রামি' থেকে। ওলন্দাজেরা গাছটিকে বলে "রামে"। ভারতবর্ষে আসামে এটি 'রিহা' নামে পরিচিত। গাছটির অন্যান্য ভারতীয় নাম 'কামকুরা', কারখুনডা, কানচুর, পুহা অথবা পুইরা। চীনদেশে এটি চীনাঘাস এবং আমেরিকায় প্রাচ্যের 'লিনেন ঘাস' নামে পরিচিত।

উদ্ভিদ জগতে বিছুটি জাতীয় আর্টিকেসী গোত্রের এই গাছটির প্রথম বর্ণনা দেন কার্ল লিনিয়াস 1737 খৃস্টাব্দে চীনদেশ থেকে পাওয়া একটি নমুনা গাছের উপর ভিত্তি করে এবং তার বৈজ্ঞানিক নাম দেন আর্টিকা নিভিয়া। নিকোলাস যোসেফাস্ জ্যাকুইন (1727-1817) সর্বপ্রথম আর্টিকেসি গোত্রের বোহেমেরিয়া গণটিকে বিধিবদ্ধ করেন। জজ রুডলফ্ বোহেমার নামে একজন জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী যিনি য়ুরোপের বিছুটি জাতীয় উদ্ভিদের আঁশ থেকে কাপড় তৈরির ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরই নাম অনুসারে এই বোহেমেরিয়া গণ। 1826 সালে গৌড়িচাঁদ লিপিয়ানের আর্টিকা নিভিয়া প্রজাতিটির নাম বদলে দিলেন বোহেমেরিয়া নিভিয়া। ভ্যাভিলভ (1951) মনে করেন, এটি মধ্য এবং পশ্চিম চীনের একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রজাতি এবং সেখানে এই ধরণের গাছ বুনো অবস্থায় প্রচুর পাওয়া যায়। জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও এই প্রজাতিটি বন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। বোহেমেরিয়া গণের 100-রও বেশী প্রজাতি রয়েছে, এর মধ্যে জাপানেই পাওয়া যায় 40টির মত প্রজাতি। এই গণের প্রায় ডজনখানেক প্রজাতি থেকে আঁশ পাবার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, বোহেমেরিয়া নিভিয়া প্রজাতিটিই আঁশ উৎপাদনের দিক থেকে সবচাইতে উপযোগী। এর কাণ্ড থেকেই পাওয়া যায় র‍্যামি আঁশ। এর পাতার নীচের দিকে সাদা লোমে আবৃত বলে এই প্রজাতিটিকে অনেকে 'সাদা র‍্যামি'ও বলে। বোহেমেরিয়া ইউটিলিস নামে র‍্যামির যে আর একটি প্রজাতির কথা বলা হয়, তা আসলে বোহেমেরিয়া নিভিয়ারই একটি জাত টেনা সিসিমা নামে পরিচিত। এই জাতটির পাতার নীচের দিকটা সবুজ বলে একে 'সবুজ র‍্যামি'ও বলে।

ভারতবর্ষে ডঃ বুকানন হ্যামিলটন 1808 সালে আসামের গোয়ালপাড়া থেকে সর্বপ্রথম র‍্যামি গাছ আবিষ্কার করেন। অবশ্য আরও আগে, 1803 সালে উইলিয়াম রক্সবারো সুমাত্রা থেকে এই গাছের কিছু রাইজোম নিয়ে এসে শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানে লাগিয়েছিলেন। পরে তিনি রংপুরে (বাংলাদেশ) থেকেও এই ধরণের কিছু গাছ সংগ্রহ করে তাঁদের আর্টিকা টেনা সিসিমা বলে সনাক্ত করেন। পরবর্তীকালে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা একে বোহেমেরিয়া নিভিয়া নামেই পরিচিত করেছেন।

র‍্যামি বহু বর্ষজীবী ফসল। এক একটি র‍্যামির আবাদ ছয় থেকে আট বছর ভাল ফলন দেয়—এরপর ফলন কমে আসে, নূতন আবাদ গড়ে তুলতে হয়। র‍্যামির রাইজোম বা ভূনিম্নস্থ কাণ্ড থেকে অনেকগুলি ছোট বড় ছড়ির মত শাখা উঠে আসে (চিত্র-ক)। এই ছড়িগুলি থেকেই পাওয়া যায় র‍্যামি আঁশ। এই ছড়িগুলি এক একটি গাছে একটি ঝাড় তৈরি করে। ঝাড়ের ছড়িগুলি এক থেকে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা এবং গোড়ার দিকে এক থেকে আড়াই সেন্টিমিটার মোটা হয়। পুরোনো ছড়ি কেটে নেবার পর রাইজোম থেকে আবার নূতন ছড়ি গজায়। এইভাবে একই ঝাড় থেকে বছরে দুই, তিন বা কোন কোন ক্ষেত্রে

চারটি ফসলও পাওয়া যায়। র‍্যামির রাইজোম দেখতে খয়েরী এবং তা আনুভূমিক ভাবে অনেক দূর চলে যায় এবং তা থেকে নূতন নূতন কুঁড়ি গজায় (চিত্র-খ) এবং মাটির উপরে নূতন ঝাড় তৈরি করে। এই রাইজোমের টুকরো কেটে দিয়েই নূতন আবাদ গড়ে তোলা হয়। এর মূল

চিত্র-ক—র‍্যামি গাছ। 1-ছড়ি, 2-মূল, 3-পুষ্পমঞ্জরী

চিত্র-খ—র‍্যামির ভূনিম্নস্থ কাণ্ড বা রাইজোম। 1-কুঁড়ি।

মাটির ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। র‍্যামির পাতা হৃৎপিণ্ডাকার এবং উজ্জ্বল সবুজ, ধারগুলি মিহিভাবে খাঁজ কাটা। পাতার অক্ষ থেকে থোকায় থোকায় পুষ্পমঞ্জরী বেরিয়ে আসে (চিত্র-ক)। তাতে স্ত্রী এবং পুরুষ ফুল আলাদা জন্মায়, যদিও একই গাছে। তামাকের বীজের মতই র‍্যামি বীজ ছোট ছোট ও কাল রংয়ের দেখতে। বীজ থেকে র‍্যামির আবাদ গড়ে তোলা হয় না, কারণ, তা থেকে চারা তৈরি করাও শক্ত, আর এ থেকে যে ঝাড়ের সৃষ্টি হয় তা সমান আকারের এবং সম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না।

বোহেমেরিয়া নিভিয়ার অনেক জাত রয়েছে। বিভিন্ন জাতের মধ্যে গাছের উচ্চতা, এক একটি ঝাড়ের ছড়ির সংখ্যা এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই অর্থকরী ফসলটি উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে গবেষণা সবার আগে শু হয়েছিল জাপানে 1912 সালে এবং উচ্চ উৎপাদ শীল জাতের বেশির ভাগই পাওয়া গেছে সে দে থেকে। মিয়াজাকি-110 এবং মিয়াজাকি-11 প্রভৃতি জাপানী জাতগুলি ফরমোজা এবং জাপা থেকে পাওয়া জাতের সংকর। আমেরিকা ফ্লোরিডা অঞ্চলে র‍্যামির আবাদে এই জাতগুলি

বেশী ব্যবহার হয়। র‍্যামি আবাদে অগ্রণী দেশ ব্রাজিলে জাপানী 'মুরাকামি' জাতটি প্রধান। 'দাইকেই সেইসিন' নামে আরেকটি জাপানী জাত ফিলিপাইনসের র‍্যামি আবাদে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে র‍্যামির উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে পরিকল্পিতভাবে গবেষণা শুরু হয়েছে ষাটের দশকের প্রথম থেকে। আসামের কামরূপ জেলার সরভোগে কেন্দ্রীয় র‍্যামি গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকগণ ইতিমধ্যে কয়েকটি উচ্চ ফলনশীল জাতের সন্ধান পেয়েছেন। এগুলি হলো—আর 1452, আর 1449 এবং আর 1412। এদের উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি হেক্টরে বছরে 14 থেকে 17 কুইন্টল।

চাষ পদ্ধতি

র‍্যামির জন্য চাই জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উঁচু, কম অম্লভাবাপন্ন দোআঁশ জমি, উষ্ণ স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া এবং বছরে 260 সেন্টিমিটারের মত সমভাবে বৃষ্টিপাত ও ভাল পরিচর্যা। জমিতে জল নিকাশের ব্যবস্থা অতি অবশ্যই থাকতে হবে আর খুব বেশী ঠাণ্ডা র‍্যামি ফসলের বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকারক। প্রাক-বর্ষার বর্ষণের সাথে সাথে এপ্রিল-মে মাস র‍্যামি লাগাবার উপযুক্ত সময়। জুন মাস পর্যন্ত র‍্যামি লাগানো যাবে। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে র‍্যামির রাইজোম সংগ্রহ করা দরকার। সরভোগের কেন্দ্রীয় র‍্যামি গবেষণাগার থেকে রাইজোম সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এক বছর বয়সের এক হেক্টার র‍্যামি আবাদ থেকে যে রাইজোম পাওয়া যাবে তা দিয়ে 10 হেক্টার নূতন আবাদ গড়ে তোলা সম্ভব। সাধারণভাবে, এক হেক্টর র‍্যামি আবাদের জন্য 10 থেকে 15 সে. মি. লম্বা চার কুইন্টল রাইজোমের প্রয়োজন হয়।

জমিতে রাইজোম বসাবার আগে লাঙল ও মই দিয়ে জমি খুব ভাল ভাবে তৈরি ও আগাছা পরিষ্কার করা দরকার। র‍্যামির উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য চাই প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। তাই জমি তৈরির সময়ে হেক্টর প্রতি দুই টন চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। জমিতে অম্লতার পরিমাণ বেশী হলে এই হার আরও বাড়বে। জমি চাষ দেওয়া হয়ে গেলে, জমিতে 60 সে.মি. দূরে দূরে 30 সে.মি. চওড়া ও 20 সে.মি. গভীর নালা কেটে সেগুলি গোবর সার, পচা জৈব পদার্থ/কচুরীপানা ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। কচুরীপানা দিতে হলে নালাগুলি 60 সে.মি. গভীর করা দরকার। যাহোক, এভাবে নালা ভর্তি করে মাসখানেক ফেলে রেখে দু-একটা বর্ষণের পর বা প্রয়োজনে হাল্কা সেচ দিয়ে নালাগুলির মাঝ বরাবর চাকা বিদা চালিয়ে চার/পাঁচ সে.মি. গভীর খাত করে তাতে 30 সে.মি. দূরে দূরে সমান্তরালভাবে রাইজোম বসিয়ে মাটি চাপা দিতে হবে। সাধারণ ভাবে, একটি আবাদ থেকে আট বছর ফলন পাওয়া যাবে। নবম বছর র‍্যামি তুলে, জমি পরিষ্কার করে তাতে কোন দানা শস্য বা সবুজ সারের চাষ করে দশম বছরে আবার নূতন করে র‍্যামি আবাদ গড়ে তোলা যাবে।

যেহেতু র‍্যামি বহুবর্ষজীবী ফসল, বিভিন্ন বছরেও বিভিন্ন সময়ে এর সদা পরিচর্যার প্রয়োজন। প্রথম বছরে মে-জুনে রাইজোম বসাবার দিন পনেরো পরেইতা থেকে গাছ বেরিয়ে আসে। জুলাই মাসে আগাছা বেছে ফেলে হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাশ সার 20 : 10 : 10 হারে প্রয়োগ করতে হবে। এরপর প্রথম বছরের অন্যান্য মাস-গুলিতে জমি আগাছা মুক্ত রাখাই মুখ্য কাজ।

বছর, এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ঝাড়ের পুরোনো ছাড়িগুলি ছোট ছোট করে কেটেদিয়ে গোড়ায় মাটি চাপা দিয়ে হেক্টর প্রতি 30 : 15 : 15 হারে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ সার চাপান দিতে হয়। এরপর বেরোয় নূতন ছড়ি। জুন মাসের মাঝামাঝি প্রায় 50 দিন বয়সের ছড়িগুলি প্রথম আঁশ পাবার জন্য কাটার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। জুলাই এর শেষ ভাগে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে, যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও

চতুর্থবার আঁশের জন্য ছড়ি কাটা যাবে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ছড়ি কেটে নেবার পর আগাছা বাদ দিয়ে প্রতিবার 30 : 15 : 15 হারে নাইট্রোজেন ফসফেট এবং পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। চতুর্থ বারের পর সার প্রয়োগ হবে না। অষ্টম বছর পর্যন্ত প্রতি বছর দ্বিতীয় বছরের মতই পরিচর্যা করা এবং ফসল কাটা যাবে।

পাট বা মেস্তার মতো কাণ্ডজ আঁশ হলেও সেগুলির মত র‍্যামির ছড়ি পচিয়ে আঁশ পাওয়া যায় না। সবুজ ছড়ি থেকে হয় কায়িকভাবে নতুবা মেশিনের সাহায্যে ছাল ছাড়িয়ে আঁশ বের করতে হয়। চীন দেশে এমন কি আমাদের দেশেও আসাম বা মেঘালয়ের অনেক অঞ্চলে হাত দিয়ে র‍্যামি আঁশ ছাড়ানো হয়। এভাবে একজন লোক দিনে পাঁচ-ছয় কেজির মত আঁশ ছাড়াতে পারে। বড় আকারের আবাদের পক্ষে এ পদ্ধতি লাভজনক নয়। আজকাল র‍্যামি আঁশ ছাড়াবার অনেক মেশিন বেরিয়েছে, সেগুলি ফ্রান্স, জাপান অথবা আমেরিকা থেকে আমদানি করা যাবে। আমাদের দেশেও আজকাল র‍্যামি আঁশ ছাড়াবার ছোট ছোট মেসিন তৈরি হচ্ছে, তা দিয়ে একদিনে আটঘণ্টায় 500 বর্গমিটার আবাদ থেকে পাওয়া ছড়ি থেকে আঁশ নিষ্কাশন করা সম্ভব। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে বছরে হেক্টর প্রতি 14 থেকে 17 কুইন্টল পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে।

ছাল থেকে আঁশ ছাড়াবার পর কাঁচা অবস্থায় তাতে শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ আঠালো পদার্থ থাকে। সেই আঁশের রং খয়েরী ও শুকোবার পর তা শক্ত হয়ে ওঠে। আঠাযুক্ত আঁশ থেকে সুতো কাটা যায় না, তাই সুতো কাটার আগে র‍্যামি আঁশ আঠামুক্ত করা দরকার। জীবাণু প্রয়োগ করে অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আঠা দূর করা হয়। বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কস্টিক ক্ষারের জলীয় দ্রবণে 100° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আঠাযুক্ত আঁশ ফুটিয়ে আঠা দূর করার পদ্ধতিতে ভাল ফল পাওয়া গেছে। তারপর বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে তরল হাইপোক্লোরাইট বা হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দ্রবণ দিয়ে সেই আঁশ প্রয়োজনে সাদা করে নেওয়া যাবে। আঠাহীন এই আঁশ দুধের মতো সাদা।

ব্যবহার

বস্ত্রশিল্পে উন্নত মানের কাপড় তৈরির জন্য র‍্যামি আঁশ ব্যবহার হয়। লিগনিনমুক্ত র‍্যামি আঁশ কৃত্রিম তন্তু শিল্পে সেলুলোজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এই আঁশ কার্পাস, রেয়ন, উল প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়েও উচুমানের কাপড় তৈরি করা যায়। আজকাল র‍্যামি আঁশকে কার্পাস তুলোর মত করে একই কার্পাস মেশিনে সুতো তৈরি করে কাপড় বোনা যায়। আমাদের দেশে উঁচু মানের কার্পাসের অভাব রয়েছে, সেই অভাব র‍্যামি চাষ বাড়িয়ে পূরণ করা সম্ভব। জলের পাইপ, টাউয়েল, টেবিলের ঢাকনা, অ্যাপ্রোন, পর্দার কাপড়, কার্পেট বোনার কাপড়, জলযানের পাল, ক্যানভাস, মাছ ধরার জাল, দড়ি, কাছি ইত্যাদি যেগুলি জলের সংস্পর্শে থাকে বা আসে তা তৈরি করার জন্য র‍্যামি আঁশের ব্যবহার হয়। পেট্রোলিয়াম জাত কৃত্রিম তন্তুর অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অনিয়মিত সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলির বিকল্প হিসেবে র‍্যামির সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

শুধু আঁশই নয় র‍্যামি গাছের অন্যান্য অংশেরও লাভজনক ব্যবহার রয়েছে। এর প্রোটিনসমৃদ্ধ পাতা গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আঁশ ছাড়িয়ে নেবার পর যে কাঠি পড়ে থাকে তা মণ্ড করে বোর্ড তৈরি করা যায়। র‍্যামি আঁশের ফেঁসো কাগজ শিল্পে উঁচুমানের কাগজ তৈরিতে ব্যবহার হতে পারে।

র‍্যামি বিদেশে ও ভারতবর্ষে

1970 সালের এক হিসেব অনুযায়ী চীনদেশ ছাড়া সারা বিশ্বে র‍্যামির উৎপাদন 30,050 হেক্টর

আবাদ থেকে 34,000 মেট্রিক টন। এর মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ উৎপাদন ব্রাজিল এবং ফিলিপাইনস থেকে। চীনদেশের হাল আমলের র‍্যামি আঁশ উৎপাদনের কোন পরিসংখ্যান নেই। 1930 সালের আগের এক হিসেব অনুযায়ী সেখানকার উৎপাদনের পরিমাণ এক লক্ষ মেট্রিক টন। এর শতকরা 80 ভাগই দেশের চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়। ব্রাজিল এবং জাপানের বেশ কিছু কাপড়ের মিল র‍্যামি আঁশের প্রধান ব্যবহারকারী। অন্যান্য ব্যবহারকারী দেশ হলো—ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়া।

চীনের ইংয়াসি নদীর তীর ধরে হুনান, কিয়াংসী, হুপেই এবং সেঝোয়ান প্রদেশে প্রচুর র‍্যামির চাষ হয়। প্রাচ্যের ফরমোসা, জাপান, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইনসে র‍্যামির আবাদ রয়েছে। আফ্রিকার আলজেরিয়া, বেলজিয়াম কংগো, মিশর, কেনিয়া এবং লিবিয়াতেও র‍্যামি চাষ হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে য়ুরোপের হল্যাণ্ডে র‍্যামি আসার পর ক্রমে এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে ফ্রান্স, ইতালী এবং স্পেনে। আমেরিকায় র‍্যামি চাষ শুরু হয় 1853 সালে। বর্তমানে ফ্লোরিডা এভার গ্লেডের উর্বর ভূমিতে প্রচুর র‍্যামির আবাদ দেখতে পাওয়া যাবে। এছাড়া মেক্সিকো, কিউবা, ব্রাজিল, গুয়াতেমালা, এল সালভাডোর, কলম্বিয়া এবং আর্জেনটিনাতে তো র‍্যামির আবাদ রয়েইছে। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে র‍্যামি নিয়ে নূতন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে পৃথিবী জুড়ে। শুরু হয়েছে এর উন্নত চাষ পদ্ধতির উপর গবেষণা, গাছ থেকে আঁশ নিষ্কাশনের সহজ উপায় বের করার প্রচেষ্টা এবং এর আঁশের উপর নির্ভর শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে গবেষণা।

ভারতবর্ষের আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, মণিপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল র‍্যামি আবাদ গড়ে তোলার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী। এ সব জায়গায় পরিত্যক্ত জমিতে অযত্নে বেড়ে ওঠা র‍্যামি গাছের আঁশও কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামের লোকেরা সংগ্রহ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাদ্রাজ (বর্তমান তামিলনাড়ু), বিহার এবং আসামের কিছু কিছু জায়গায় কয়েকটি য়ুরোপীয় সংস্থা র‍্যামির আবাদ শুরু করেছিল বটে, কিন্তু ভুল চাষ পদ্ধতির জন্য এবং আঁশ নিষ্কাশনের কোন মেসিন না থাকার জন্য সেই সময় র‍্যামি চাষ বেশী এগোতে পারে নি। ভারতবর্ষে র‍্যামি চাষ নিয়ে আবার ভাবনা চিন্তা শুরু হয় 1944 সালের পর থেকে। 1946 সালে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ বাংলা এবং আসামে পরীক্ষামূলকভাবে র‍্যামি আবাদ করার সুপারিশ করে। তারও বেশ কয়েক বছর পর 1960 সালে কেন্দ্রীয় পাট সমিতির উদ্যোগে চাষ পদ্ধতি নিয়ে এখানে গবেষণা চলছে এবং ইতিমধ্যেই এর গবেষণা-লব্ধ ফলে উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সংস্থা র‍্যামি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ব্যারাকপুর পাট কৃষি গবেষণাগারে হাল আমলে র‍্যামি আঁশ নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত মেসিনও তৈরি হয়েছে। সুতরাং দেশে বড় আকারের র‍্যামি আবাদ গড়ে তোলার জন্য উন্নত পদ্ধতিতে চাষের এবং অন্যান্য কারিগরী জ্ঞানের অভাব নেই। বর্তমানে, দেশে প্রায় 900 হেক্টর জমিতে র‍্যামির আবাদ রয়েছে। এই আবাদ আরো বাড়াতে হবে।

তবে, র‍্যামি বহুবর্ষজীবী ফসল এবং প্রথমদিকে এর জন্য বেশী টাকা লগ্নী করতে হয়। ফলে সাধারণ চাষীরা হয়তো এককভাবে এই চাষে উৎসাহিত হবেন না। তাই বড় বড় সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে বিশেষ করে, উত্তর পূর্বাঞ্চলের চাবাগানগুলির অনাবাদি উদ্বৃত্ত জমিতে এর আবাদ অতি সহজেই গড়ে তোলা যাবে। সরকারী মালিকানায় বন-বিভাগের জমিতেও এর আবাদ শুরু করা যাবে। এ ছাড়া সমবায়ের মাধ্যমে ছোট চাষীদের র‍্যামি চাষে উৎসাহিত করে, তা থেকে পাওয়া আঁশ দিয়ে কুটির শিল্প গড়ে তোলা যাবে। বর্তমানে দেশে র‍্যামি আঁশের উৎপাদন খুবই অল্প বলে-এর কোন বিপণন ব্যবস্থা নেই। র‍্যামি আবাদ শুরু করার সাথে সাথে একটি সুষ্ঠ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও প্রয়োজন।

পাখীর ডিম

সৌমেনকুমার মৈত্র*

[শুধু খাদ্য হিসাবে প্রিয় নয়, পাখীর ডিম আমাদের কাছে আকর্ষণীয় তার বহিরাকৃতির বৈচিত্র্য ও অন্তর্গঠনে সূক্ষ্ম নিপুণ ছাপের জন্যেও। একটা আদর্শ ভ্রূণ সম্পন্ন পাখীর ডিম তিনটে মুখ্য উপাদানে তৈরী। যার মধ্যে কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত রঙীন অর্ধঘন কুসুমকে ঘিরে থাকে অপেক্ষাকৃত তরল ডিমের শ্বেতাংশ বা অ্যালবুমেন, আর একেবারে বাইরে থাকে শক্ত ডিমের খোলা। ডিমের কুসুম স্নেহজাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন সমৃদ্ধ হলেও ডিমের শ্বেতাংশে মূলতঃ প্রোটিন জাতীয় বস্তুর পরিমাণই বেশী। খাদ্যগুণ বিচার করলে ডিম প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি ছাড়াও জৈব শক্তির বেশ উপযোগী উৎস। ব্যবহারিক দিক থেকে বিভিন্ন শিল্পকর্মে ডিমের প্রচলন খুব অকিঞ্চিৎকর নয়। সব কিছু বিচার করলে মানবিক কল্যাণে ডিমের উৎপাদনের বিষয়টা বিশেষভাবে চিন্তা করার দাবী রাখে।]

সভ্যতার সুরু থেকে যে সব বস্তু শক্তি, স্বাদ আর পুষ্টির গুণে আমাদের খাদ্যতালিকায় বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে তার মধ্যে পাখীর ডিম অন্যতম। সহজলভ্য হওয়ার সুবাদে মুরগী ও হাঁসের ডিমই আমাদের খাওয়ার টেবিল জুড়ে থাকলেও বিভিন্ন ভৌগোলিক এলাকার বিভিন্ন জাতি উপজাতির মধ্যে খাদ্য হিসাবে অন্যান্য পাখীর ডিমের ব্যবহার খুব একটা কম নয়। বস্তুতঃ খাদ্যগুণ ছাড়াও পাখীর ডিমের প্রতি আমাদের বাড়তি আকর্ষণের একটা বড় কারণ এর আকৃতি, আয়তন ও গঠন বৈচিত্র্য। আর সব কিছু ছেড়ে যদি গবেষণাগারের কথা ভাবি, তবে ভ্রূণতত্ত্ব বা একক কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর বৃদ্ধির কৌশল জানার জন্য পরীক্ষিত বস্তু হিসাবে পাখীর ডিমের ব্যবহারের তুলনা মেলা ভার।

আমরা জানি বৈষম্য প্রকৃতিরই নিয়ম। পাখীর ডিম এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। শুধু ওজন আর আয়তনের কথা ভাবলেই অবাক হতে হয়। প্রায় দেড় কিলোগ্রাম ওজনের একটা উটপাখীর ডিমের সাথে 'হামিংবার্ড'-এর মাত্র আধগ্রাম বা 500 মিলিগ্রাম ওজনের ডিমের তুলনা করলেই এই বৈষম্যের ব্যাপ্তিটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। নিঃসন্দেহে এই ডিমের ওজনের সাথে জড়িয়ে আছে পাখীর নিজের ওজন আর আয়তনের কথা, তবে আপেক্ষিকতার বিচারে দেখা যায় বেশী আয়তন ও ওজনের পাখীরাই তুলনামূলকভাবে ছোট ডিম পাড়ে। মজার কথা, যে সব প্রজাতির পাখীদের ওজন দেখা গেছে 2 থেকে 180 গ্রাম তাদের ডিমের ওজন প্রায় তাদের দেহের ওজনের 1/9 ভাগ, অথচ 20 থেকে 90 কিলোগ্রাম ওজনের পাখীর ক্ষেত্রে ঐই অনুপাত মাত্র 1/55। এক্ষেত্রে নিউজিল্যাণ্ডের কিইউ পাখীর ডিম নিতান্তই ব্যতিক্রমের উদাহরণ, কারণ এই পূর্ণাঙ্গ পাখীর ওজন 2 কিলোগ্রামের মত হলেও এর একটা ডিমের ওজনই হচ্ছে প্রায় 500 গ্রাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে একটা

*প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 35, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-

নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখীর ডিমের আকৃতি, আয়তন ও ওজন মোটামুটি এক রকম হলেও এর অনেকটাই নির্ভর করে পাখীর বংশগতি, বয়স, খাদ্য, আর তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ওপর।

পাখীর ডিমের রঙের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে আসে এক রঙের ধবধবে সাদা, ধূসর, অথবা নীলচে সাদা রঙের ডিমের কথা। কিন্তু এর বাইরেও বিচিত্র রঙের ডিম দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন পাখীর মধ্যে! বিশেষ করে যে কোন একটা রঙের ওপর অন্য রঙের বিচিত্র ছাপ বিশিষ্ট ডিমের সংখ্যা প্রচুর, যাদের সাধারণভাবে শ্রেণীবিভাগ খুব সহজসাধ্য নয়। তবু শুধু বর্ণ-বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে সমস্ত পাখীদের ডিমকে খুব কম করে হলেও পঞ্চাশভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ডিমের বর্ণবৈচিত্র্যের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ডিমের রঙের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সেই পাখীর খাবারের গুণের প্রশ্ন, যার ফলে কোন কোন সময় একই পাখীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রঙের ডিম পাড়া কিছুই বিচিত্র নয়।

বাইরের বিবরণ ছেড়ে এবার আসা যাক পাখীর ডিমের অন্তর্গঠনের কথায়। একথা আমাদের অজানা নয় যে এই পৃথিবীতে যে কোন প্রাণীরই অস্তিত্ব নির্ভর করে তার বংশরক্ষার সাফল্যের ওপর। এই বংশরক্ষায় স্ত্রী ও পুরুষের অবদান সমান হলেও প্রকৃতির নির্বাচনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্বই বেশী ভাবী প্রজন্মের আগমনের পথকে নির্বিঘ্ন করার। পাখীদের মধ্যে বেশীর ভাগ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মত একেবারে পূর্ণাঙ্গ শিশু জন্ম দেওয়ার প্রচলন নেই, তারা প্রসব করে শুক্রাণু নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট ভ্রূণসম্পন্ন ডিম। অবশ্য শুক্রাণুর অভাবে অনেক সময়ই স্ত্রী পাখীদের অনিষিক্ত ডিম পাড়তেও দেখা যায়, কিন্তু, বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সব ডিম থেকে কোন বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। স্বাভাবিকভাবে ভ্রূণসম্পন্ন ডিম প্রসব হওয়ার পর স্ত্রী বা পুরুষ, কোন কোন সময় উভয় পাখীর যৌথ দেহের উষ্ণতায় লালন করার মাধ্যমে (যাকে প্রচলিত কথায় ডিমে তা দেওয়া বলে), একটা সময়ের ব্যবধানে সেই ডিম ফুটে বেরিয়ে আসে পূর্ণাঙ্গ ছোট্ট পাখীর ছানা। প্রসবোত্তর এই তা দেওয়াকালীন সময়ে ডিমের ভেতর চলে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ, যার মাধ্যমে একটা ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি হয় পূর্ণাঙ্গ পাখীর। বলা বাহুল্য এই সময়ে বাইরে থেকে কোন রকম খাদ্যবস্তু সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে না, অথচ এই বৃদ্ধিকালীন সময়ে প্রয়োজন হয় প্রচুর জৈবশক্তি আর সমস্ত রকমের পুষ্টির। রীতিমত আশ্চর্য হওয়ার কথা এই ডিমের ভেতর ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সময়ে (যা নাকি কোন পাখীর ক্ষেত্রে দু-সপ্তাহের কম হলেও কোন কোন পাখীর ক্ষেত্রে দু-মাসেরও বেশী)। প্রয়োজনীয় সব রকম জিনিষই সঞ্চিত থাকে ডিমের ভেতরের উপাদানের মধ্যে। সেই দিক থেকে বিচার করলে পাখীর ডিমের গঠন-কৌশলের মধ্যে প্রয়োজনীয় বস্তুর সুসমঞ্জস বিন্যাসের যে সূক্ষ্ম কারিগরি লক্ষ্য করা যায় তা রীতিমত বিস্ময়কর।

সামগ্রিক ভাবে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় একটা পাখীর ডিমের গভীরে ভ্রূণ বা ডিম্বাণুর সন্নিহিত অংশে থাকে এক রঙীন অর্ধঘন পদার্থ—যাকে বলা হয় কুসুম। এই কুসুমকে ঘিরে থাকে প্রতিস্থাপনীয়, আঘাত রক্ষাকারী, অপেক্ষাকৃত তরল থকথকে 'অ্যালবুমেন' বা শ্বেতাংশের স্তর, আর একেবারে বাইরে থাকে আভ্যন্তরীণ অর্ধচ্ছেদা পর্দাবিশিষ্ট শক্ত খোলা। ডিমের এই তিন উপাদানের আনুপাতিক আয়তনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হলেও এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির ডিমে এই উপাদানগুলির আনুপাতিক অংশ বেশ কিছুটা কম বেশী হতে পারে। মোটামুটি ভাবে দেখা গেছে যে সব পাখীদের ডিম থেকে স্বাবলম্বী শাবকের জন্ম হয় (যেমন—উটপাখী,

এম্যু, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি) তাদের ডিমে অ্যালবুমেন, কুসুম ও খোলার শতকরা অংশ যথাক্রমে 52·9, 35·2 ও 11·9, কিন্তু যে সব পাখীদের ডিম থেকে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বাচ্চা জন্মায় (যেমন ঈগল, ঘুঘু, পায়রা, হামিংবার্ড, প্রভৃতি) তাদের ডিমে এই অনুপাত যথাক্রমে 73·2, 19·8 ও 7·0। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রথমোক্ত পাখীদের ডিমে কুসুম ও খোলার আয়তন শেষোক্ত পাখীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। পাখীদের অভিযোজনের সাথে তাল রেখে ডিমের উপাদানের এই আনুপাতিক পরিবর্তনকে খুবই অর্থবহ মনে হয়, কারণ একথা অস্বীকার করার নয় যে সব পাখীর ডিম থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাখীর জন্ম হয় তাদের বৃদ্ধিকালীন সময়ে ডিমের ভেতর পুষ্টি ও শক্তির উৎস স্বরূপ বস্তুর (যা মূলতঃ থাকে ডিমের কুসুমে) প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশী।

এইবার ডিমের এই তিন মুখ্য উপাদানগুলিকে একটু আলাদা করে আলোচনা করা যাক। প্রথমে আসি কুসুমের কথায়। কুসুম ডিমের অত্যন্ত জরুরী উপাদান, কারণ এরই মধ্যে জমা থাকে বর্ধিষ্ণু ভ্রূণের বেশীরভাগ পুষ্টি আর শক্তির বস্তু। পাতলা, নমনীয় উজ্জ্বল আবরণে বদ্ধ ডিমের মধ্যস্থলে অবস্থিত গোলাকার এই কুসুম সাধারণত হলদে বা লালচে হলুদ রঙের হয়ে থাকে, আর এই রঙের প্রকৃতি নির্ভর করে পাখীর সবুজ খাবারের ওপর। প্রায় 47·5% জল থাকলেও রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ডিমের কুসুম যথেষ্টভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থ (প্রায় 33·0%) ও প্রোটিন (প্রায় 17·4%) সমৃদ্ধ। কুসুমে শর্করার পরিমাণ খুবই কম (0·2%), সেই তুলনায় কিছু বেশী থাকে অজৈব লবণ (প্রায় 1·1%), আর বিভিন্ন ভিটামিন সমেত অন্যান্ত জিনিষ মিলিয়ে থাকে কুসুমের প্রায় 0·8 শতাংশ উপাদান। কুসুমের মধ্যে যে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও প্রোটিন থাকে তার বেশীর ভাগই থাকে ফসফরাসের যৌগ হিসাবে, যাদের বলা হয় যথাক্রমে ফসফোলিপিড ও ফসফোপ্রোটিন। ফসফরাস ছাড়া কুসুমের ভেতর অন্যান্য যে সব অজৈব বস্তু আছে তার মধ্যে সালফার, পটাসিয়াম ও সোডিয়াম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভিটামিনের দিক থেকেও ডিমের কুসুম বেশ সমৃদ্ধ, কারণ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ই' ছাড়াও কুসুমে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে 'এ', 'কে', ও কম করেও আট রকমের 'বি-গ্রুপ'-এর ভিটামিন। সাম্প্রতিক কালে অল্প পরিমাণে হলেও বিভিন্ন রকমের 'এনজাইম' বা উৎসেচক রসের সন্ধান মিলেছে ডিমের কুসুমের মধ্যে যার ভেতর প্রোটিন-বিশ্লেষী উৎসেচক রসই বেশী।

কুসুম ছেড়ে এবার আসি ডিম-শ্বেতাংশ বা অ্যালবুমেনের রাসায়নিক উপাদানের কথায়। জলের পরিমাণ খুব বেশী (প্রায় 80%) থাকায় কুসুমের তুলনায় ডিমের শ্বেতাংশ খুবই তরল। ডিমের এই অংশে যে সব ঘন বস্তু পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রায় 92% প্রোটিন, আর বাকী অংশের মোটামুটি অর্ধেক ভাগ হচ্ছে শর্করা আর অর্ধেক অজৈব লবণ। সাধারণভাবে প্রায় আট রকমের বিভিন্ন অজৈব বস্তু এই ডিম শ্বেতাংশে পাওয়া গেলেও এর মধ্যে বেশী পরিমাণে থাকে সালফার, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড।

এক নজরে ডিমের খোলার উপাদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর প্রায় 99 শতাংশই হচ্ছে ঘন বস্তু, যার মধ্যে মাত্র 2 শতাংশ হচ্ছে জৈব বস্তু (মুখ্যত প্রোটিন) আর বাকীটুকু ক্যালসিয়াম কার্বনেটসম্পন্ন অজৈব বস্তু। ডিমের খোলাকে বাইরে থেকে নিরেট মনে হলেও এর ভেতর থাকে প্রচুর সূক্ষ্ম ছিদ্র (এক বর্গ সেন্টিমিটার এলাকায় প্রায় একশো থেকে তিনশো), যে গুলি সাধারণত এক ধরণের সালফার সম্পন্ন প্রোটিন দ্বারা ভর্তি থাকে। ডিমের উপাদান নিয়ে আলোচনার শেষে একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে, সব না হলেও বেশ কিছু উপাদানের হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে পাখীর ডিম উৎপাদনের হার এবং পাখীর খাদ্যের মান ও পরিমাণের ওপর। সুতরাং পাখীর ডিমের পুষ্টি গুণ যে সেই পাখীর নিজস্ব

পুষ্টিগুণ সূচক সে সম্বন্ধে কোন পৃথক মন্তব্যের দাবী রাখে না।

ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলাটা পাখীর কাছে সহজাত বংশরক্ষার প্রবৃত্তি, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন অপেক্ষা করে থাকে না ততদিন, আমরা পাখীর ডিমকেই বেশী ভালবাসি তার থেকে ফুটে বেরোন নতুন বাচ্চার চেয়ে কারণ মুখ্যতঃ একটাই সেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে খাদ্যতালিকায় যে ডিমকে আমরা স্থান দিই তা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয় মুরগীর, নয় হাঁসের, আর এই ডিমের সাথে তুলনা করলে দুধ ছাড়া সারা পৃথীতে অন্য কোন প্রাণিজ খাদ্যের এত ব্যাপক ব্যবহার নেই। সব পরিস্থিতিতে সমান না হলেও শারীরিক চাহিদা ও অবস্থার কথা বিচার করে সাধারণভাবে বলা যায় ডিম সহজপাচ্য ও শরীরে সহজগ্রাহ্য। ডিমের খাদ্য হিসাবে জনপ্রিয়তার আর যে যে কারণ আছে তার মধ্যে শুধু অনায়াস আহরণই নয় এর খাদ্যগুণ ও সহজসাধ্য রন্ধন পদ্ধতিও অন্যতম কারণ। খাদ্যগুণ বিচার করলে দেখা যায় আমাদের খাদ্যে অপরিহার্য প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও শর্করার মধ্যে প্রথম দুটি বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ডিমে। আমরা জানি প্রোটিন জাতীয় বস্তুর কার্যকরী একক হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড। আমাদের শরীরে খুব কম করেও কুড়ি ধরণের অ্যামাইনো অ্যাসিডের প্রয়োজন থকেলেও এর মধ্যে দশটি আবশ্যিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে যেগুলি শরীরের ভেতর সংশ্লেষিত হয় না। আমার কথা এই আবশ্যিক অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি ডিমের ভেতর শুধু আছে তাই নয়, একজন 70 কিলোগ্রাম ওজনের মানুষের শরীরে দৈনিক প্রয়োজন যতটা তার সবটাই পাওয়া যেতে পারে মাত্র একটা মুরগীর ডিম থেকে। ডিমের প্রোটিনের আর এক অনবদ্যতা লুকিয়ে আছে এর কুসুমের মধ্যে। ডিমের কুসুমের প্রোটিন অত্যন্ত ফসফরাস সমৃদ্ধ—যা বেশী পরিমাণে শুধু দুধেই পাওয়া যায়। এই গুণের জন্য ডিমের কুসুম বাড়তি পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে দুর্বল ব্যক্তিদের, এমন কি ছ-মাস বয়সের শিশুদের জন্যও সহজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডিমের কুসুমে প্রোটিন ছাড়া প্রচুর পরিমাণে থাকে স্নেহ জাতীয় পদার্থ,—যার উপযোগিতা শারীরিক শক্তি উৎপাদনে অসামান্য। এটুকু জেনে নেওয়া ভাল যে, যেখানে এক গ্রাম যত স্নেহ জাতীয় পদার্থের বিপাকে উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ থাকে প্রায় 9·5 ক্যালরি সেখানে সমপরিমাণ প্রোটিন ও শর্করা থেকে শক্তি পাওয়া যায় মাত্র 4·0 ক্যালরির মত। এর থেকে স্পষ্টতই ধারণা করে নেওয়া যায় ডিমের কুসুমের দুই-তৃতীয়াংশই যখন স্নেহ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী, তখন শরীরে বাড়তি শক্তি জোগাতে ডিমের কুসুমের উপযোগিতা কতটা। সাধারণভাবে শরীরে শক্তির প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে দেখলে একজন বয়স্ক ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর পক্ষে অপ্রতুল হলেও মাত্র একটা ডিম থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা এক বছরের কম বয়সের শিশুদের দৈনিক প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট।

প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ ছাড়া ডিমে এমন অনেক ধাতু আছে (যেমন—সালফার, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, প্রভৃতি) যেগুলি আমাদের শারীরিক প্রয়োজনের তুলনায় বেশ বেশী মাত্রায় পাওয়া যায় একটা ডিম থেকেই। ক্যালসিয়ামই শুধু একটা প্রয়োজনীয় ধাতু যাকে ডিম থেকে পাওয়া যায় খুবই কম। তুলনামূলক গবেষণায় দেখা যায় যে যদিও দুধ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, শর্করা ও ভিটামিন 'সি' তে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, তবু বিশেষ করে শরীরে শক্তি জোগাতে এবং প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন 'এ', থাইমিন, রাইবোফ্লেভিন, খাদ্য লোহা, ও ভিটামিন 'ডি'র উপাদানের দিক থেকে একটা মুরগীর ডিম প্রায় আট আউন্স গরুর দুধের সমান। সুতরাং সব কিছু খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় ডিমের খাদ্যগুণ দুধ, মাংস, অথবা

উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের থেকে কোন অংশে কমত নয়ই, বরং কোন কোন ভাবে বেশীই।

পাখীর ডিমের খাদ্যগুণ যাচাই করার ফাঁকে আমরা যদি একটুখানি চোখ বুলিয়ে নিই রান্নার সাথে ডিমের কার্যকরী গুণাবলী বজায় থাকার সম্পর্কের ওপর, বিষয়টা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেখা গেছে অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক পাচক রসের সাহায্যে ডিম খুব সহজেই হজম হয়ে যায়, কিন্তু ডিমের হজম হওয়া অনেকটা নির্ভর করে সেই ডিমকে কেমনভাবে রান্না করা হয়েছিল তার ওপর। আমরা যতটুকু জানি কম সেদ্ধ ডিম বা ডিমের পোচ অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি হজম হয় ডিমভাজা, ডেভিল, বা অতিরিক্ত সেদ্ধ ডিমের তুলনায়। একেবারে কাঁচা ডিম হজম করা সহজ হলেও এর অন্য কোন সহযোগী খাদ্য না থাকলে ডিম উদ্ভূত নানারকম শারীরিক উপসর্গের আবির্ভাব হতে দেখা যায় কারণ, রান্নার সময় তাপের সংস্পর্শে এসে ডিমের শ্বেতাংশের অনেক ক্ষতিকারক জিনিষ নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ডিম প্রাণিজ প্রোটিনের এক বিরাট উৎস হলেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করে এর রান্নার তাপমাত্রার ওপর, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে বেশী তাপে ভাজা ডিমে যেখানে শতকরা নয় থেকে দশ ভাগ নষ্ট হয়ে যায় তখন সেদ্ধ ডিমে এই প্রোটিন প্রায় সবটাই থাকে অটুট। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের শারীরিক উপযোগিতার কথা বিচার করলে অল্প সেদ্ধ ডিমই বেশী উপকারী।

এ কথা সত্যি, যে মোট উৎপাদিত হাঁস-মুরগীর ডিমের শতকরা প্রায় 85 ভাগই সরাসরি চলে যায় খাওয়ার টেবিলে, কিন্তু সাধারণ খাদ্য ছাড়াও পাখীর ডিমের অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যার মধ্যে কেক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য ও আইসক্রিম শিল্পে ডিমের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ওষুধ উৎপাদনে ও উৎপাদিত ওষুধ প্রয়োগে ডিমের শ্বেতাংশের ব্যবহার বহুদিন থেকেই প্রচলিত। এ ছাড়াও বহু পাখীর ডিম আছে যাদের খাদ্য হিসাবে চলন নেই কিন্তু বহুলাংশে কাজে লাগে বিভিন্ন শিল্প কর্মে,—যার মধ্যে চামড়ার ট্যানিং, রঙ উৎপাদন, প্রসাধন সামগ্রীর উৎপাদন ও সার তৈরির শিল্প বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। পাখীর ডিমের শ্বেতাংশের জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বহু গৃহপালিত জন্তুর কৃত্রিম প্রজননে শুক্র বাহক হিসাবে এবং বহু গবেষণাগারে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির কৃত্রিম মাধ্যম হিসাবে এর ব্যবহার খুবই প্রচলিত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ডিমের অবদানের কথা স্বীকার করেই মোট উৎপাদনের কমকরেও শতকরা পাঁচ ভাগ ডিমকে কৃত্রিম উপায়ে নতুন বাচ্চা ফোটানোতে কাজে লাগানো হয় শুধু ডিম উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য নয়, পাখীর মাংস সরবরাহকেও অক্ষুন্ন রাখার তাগিদে। সুতরাং এ কথা স্বীকার করে নিতে নিশ্চয় কারোর মনে দ্বিধা নেই যে আমাদের জীবনে পাখীর ডিমের উপযোগিতা বহুমুখী।

পাখীর ডিম নিয়ে আলোচনার উপসংহারের প্রান্তে এসে এই কথা বার বারই মনে আসছে যে—ডিম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত তথ্য কি শুধুই পুঁথিগত হয়ে থাকবে, আমাদের মত অনুন্নত দেশে যেখানে পুষ্টিজনিত অভাব খুবই প্রকট সেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞান, ব্যবহারিক কৌশল, আর স্বল্প অর্থ বিনিয়োগে কি ডিমের উৎপাদনের মাত্রা বাড়িয়ে এগিয়ে আসা যায় না পুষ্টিজনিত অভাব পূরণের সহজ লক্ষ্যের দিকে। নিতান্তই হতাশার কথা যতটা অনুপ্রেরণা, রসদ ও সুযোগ পেলে আমাদের দেশে সহজেই প্রচুর হাঁস, মুরগীর পালনের কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারতো তার বেশ কিছুটাই এখনও পড়ে আছে অবহেলার অন্ধকারে, কিন্তু এখনও যদি একই সাথে প্রাণিবিদ্, কৃষিবিদ্ ও আগ্রহী ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে ছোট ছোট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে এই 'সোনার খনি'র দিকে নজর দেওয়া যায় তবে একেবারে একটা সোনার ডিম না পেলেও সব ডিম থেকে মোট পাওয়াটুকুর হিসাব করলে তার দাম কিন্তু সোনা থেকে খুব একটা কম হবে না।

শূন্যজীবনে একটি প্রতিশ্রুতি

আশিস দাশ*

মা-বা-আপনাকে দাতা কর্ণ বা রাজা হরিশ্চন্দ্র হতে হবে না অথবা দেবতাবৃন্দের হিতের জন্ম দধীচির মত তনুত্যাগও কর:তে হবে না। শুধু "অন্ধ জনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ—তুমি করুণামৃত সিন্ধু করো করুণা কণা দান"। হ্যাঁ, আপনার করুণার মাত্র একটি কণা দান করলেই আপনার মানবজীবন সার্থক। স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ধন-দৌলত, মান কিছুই দান করতে হবে না, যা হবে তা শুধু একান্ত আপনার নিজ শরীরের অতিরিক্ত অথবা পরিত্যজ্য কিছু বস্তুর ব্যাপার। কিন্তু ঐ পরিত্যজ্য বস্তু দানেই আমাদের মনে কত দ্বিধা—দ্বন্দ্ব, কত শংকা-সংকীর্ণতা, কত কৃপণতা। ধরিত্রীর বুকে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাঁটলে বোঝা যায়, প্রকৃতির বিপুল ঐশ্বর্যের বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অভাব, স্বার্থান্বেষী মানুষের অনায়াসে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে সৃষ্টি করেছে কত কুসংস্কার, আর অন্ধ বিশ্বাস। সেই সংকীর্ণ মনের গোষ্ঠীস্বার্থের বেড়াজালে শত শত যুগ পরেও আমরা আবদ্ধ। কুসংস্কার, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ধর্মান্ধতা, বর্ণবৈষম্য ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট—সংকীর্ণতা আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে বার বার নিষ্পেষিত করেছেও করছে। তাইতো আজ আমাদের চারপাশে সামাজিক অবক্ষয়ের এত ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু কোথায় সেই দুঃসাহসিক সামাজিক বিপ্লব যা কিনা শত শত অন্ধকে, অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আনতে পারে? মৃত্যুপথযাত্রীকে অপারেশন থিয়েটার থেকে সবুজ সুন্দর পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে দিতে পারে? বন্ধ্যা নারীর হতাশ জীবনে মাতৃত্বের সুযোগ দিয়ে তার কোল ভরিয়ে দিতে পারে? মানুষকে ভালবেসে আর্তজনের দুঃখ দূর করার ব্রতে যে বিপ্লবীমন সহজেই নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে? মৃত্যুতো জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি, তখন দেহটিকে কৃমিকীটের ভোগে না লাগিয়ে বা পুড়িয়ে পঞ্চভূতে বিলীন না করে একটি পঙ্গু জীবনের পঙ্গুত্ব মোচনের জন্য সেই মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ দানের মানসিকতা ব্যাপকভাবে কি গড়ে তুলতে পারি না? হৃদপিণ্ড, মূত্রযন্ত্র (কিডনী), অস্থি ও তার বিভিন্ন অংশ, চোখের কর্নিয়া প্রভৃতি এখন এক দেহ থেকে নিয়ে অন্য দেহে সংস্থাপন করা যায়। শুধুমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় দুটি দান করে দুটি অন্ধকে আলোর জগতে রঙের জগতে ফিরিয়ে আনতে পারি। শরীরের রক্তের চাপের আধিক্য না ঘটিয়ে কোন প্রিয়তমকে তার প্রিয়তমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারি, গর্ভবতী নারীর মূত্র নর্দমায় ফেলে নষ্ট না করে বন্ধ্যার কোল ভরে দিতে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু যা পারি তা করি না কেন? কারণ যুগ যুগ সঞ্চিত কু-সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, আর যথার্থ মানবিক চেতনা নিয়ে প্রকৃত বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার অভাব।

অনেকেই বিশ্বাস করেন মৃত্যুর পর চক্ষু দান করলে, সামনের জন্মে চক্ষু ছাড়াই জন্মাতে হবে। সাধারণ সুস্থ, সবল যুবক রক্তদান করলে দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়বে। রক্তগ্রহীতারও আবার চিন্তা হয়, কার রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো হলো কোনো মহাপুরুষের, না কোনো কাপুরুষের? গর্ভবতী নারীর শাশুড়ি ঠাকুরন চিন্তা করেন বৌমার মূত্র দান করলে, ভাবী সন্তানের কোনো ক্ষতি হতে পারে? এহেন মানসিকতাই বৃহত্তর জনজীবনে সুষ্ঠু বিজ্ঞান

*1বি, মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা-700004

চেতনায় অভাব ঘটিয়ে সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত করে পঙ্গু করে তুলছে। আমাদের এখন উচিত বিবেককে অন্ধ বিশ্বাসের কালো মেঘ থেকে সরিয়ে যথার্থ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করা।

চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তের অভাবের কথা আজ বোধ হয় সর্বজন-বিদিত। এর অভাবে কত শত শিশুর জীবনদীপ অকালে নির্বাপিত হচ্ছে, জীবন সংকট অনিবার্য জেনেও প্রতিদিন বহু জরুরী অস্ত্রোপচারের কাজ স্থগিত রাখতে হচ্ছে, কত ব্লাড ক্যান্সারের রোগী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে? কত স্বামী তাদের প্রিয়তমাকে হারাচ্ছে? শুধু পশ্চিমবঙ্গেই রক্তের গড় চাহিদা প্রতি বছরে কমপক্ষে 1, 20,000 বোতল, কিন্তু আমরা সংগ্রহ করতে পারি মোটে প্রায় 55,000 বোতল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকেরও কম। কিন্তু মানুষের রক্তের প্রয়োজনে কেবল মানুষেরই রক্ত কার্যকরী। যদিও সম্প্রতি জাপানে একদল চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, মানুষের প্রয়োজনে কৃত্রিম রক্ত আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেছেন তবে ঐ কৃত্রিম রক্ত পরীক্ষাগারের আতুড় ঘর থেকে আমাদের হাঁসপাতালের আঙিনায় আজও পৌঁছায় নি। এখনো আমাদের অপেক্ষা করতে হয় Donate Blood (অপরের দেওয়া রক্তের) এর উপর। সেইজন্যেই ব্লাড ব্যাংকের চারদিকে ঘুর ঘুর করে কিছু পেশাদারী রুগ্ন, অসহায়, অনাহার-ক্লিষ্ট দরিদ্র মানুষ—যারা কয়েকটা টাকার বিনিময়ে দিয়ে আসে তাদের তরতাজা রক্ত। সেই লাল রক্ত কালো টাকায় কিনতে হয় মুমূর্ষু রোগীর পরিবার বর্গকে। এটাও বন্ধ করা যায় যদি স্বেচ্ছায় আমরা এগিয়ে আসি রক্ত দান করতে। এখন প্রশ্ন, কারা রক্ত দান করতে পারে?

1) 18 বছরের উপরে এবং 55 বছরের নীচে যে কোনো সুস্থ সবল মানুষ প্রতি তিনমাস অন্তর 250 সিসি পরিমাণ রক্ত দান করতে পারেন।

2) আমাদের শরীরে সঞ্চালিত রক্তের পরিমাণ 5000-6000 মিমি, ঐ থেকে 250 সিসি রক্ত দান করলে যে সাময়িক ক্ষতি হয় তা 4-6 সপ্তাহের মধ্যেই পূরণ হয়ে যায়।

3) আমাদের শরীরের প্রায় 50 সিসি রক্ত প্রতিদিনই প্রাকৃতিক নিয়মে নষ্ট হয়ে যায়।

4) রক্ত দান করতে 10 মিনিটের বেশী সময় লাগে না।

5) 15 মিনিট বিশ্রাম নিয়ে হালকা জলখাবার খেয়ে রক্ত দাতা আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারেন।

6) লোহিত কণিকার জীবন-চক্র শরীরের স্থায়ী হয় মাত্র 80-120 দিন। তারপরে শরীর নিজেই তাদের ধ্বংস করে ফেলে এবং সমপরিমাণ নতুন রক্ত বানিয়ে নেয় প্রতিদিনই। প্রাকৃতিক নিয়মে এই প্রতিদিনের ধ্বংস করে ফেলা রক্তের পরিমাণই হচ্ছে ঐ 50 সিসি। সুতরাং 250 সিসি রক্ত দিতে কারও ভয় পাবার কোন কারণ নেই।

একইভাবে আমরা অন্ধজনে আলো দিতে পারি। বিশ্বের অন্ধত্বের মধ্যে একটা বৃহৎ অংশ কর্নিয়াজনিত অর্থাৎ চোখের মণির উপরের স্বচ্ছ আবরণটি (কর্নিয়া) কোনো রোগে হঠাৎ অস্বচ্ছ হয়ে যাবার কারণে অন্ধ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাহায্যে এখন তাদের আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সমস্যা ঐ একই জায়গায়। সেই স্বচ্ছ স্বাভাবিক কর্নিয়াটিকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা যায়না এখনও, তাই কৃত্রিমভাবে কর্নিয়া সংযোজনের আসল সমস্যা, যথেষ্ট সংখ্যক কর্নিয়ার অভাব। মানুষের চোখকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, ক্যামেরার লেন্সের উপরে যেমন একটা আবরণী বা 'কভার' থাকে মানুষের চোখেও ঐরকম লেন্স আছে আর সেই লেন্সের সামনে একটা স্বচ্ছ আবরণ থাকে তাকেই কর্নিয়া বলে—ঐ কালোমণির বাইরের স্বচ্ছ আবরণটি। স্বচ্ছ কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে আলোক রশ্মি লেন্সে প্রবেশ করে দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ করে। সেই স্বচ্ছ পর্দা বা আবরণটি যদি কোনো কারণে অস্বচ্ছ

হয়ে যায় যেমন হঠাৎ কোন আঘাত লেগে বা অন্য কারণে কর্নিয়াতে ঘায়ের সৃষ্টি হলে, অথবা অপুষ্টি-জনিত কারণে (বিশেষ করে ভিটামিন-'এ'-র মারাত্মক অভাব হলে ঐ কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে যায়, মানুষ অন্ধ হয়ে পড়ে। ঐ অন্ধত্ব দূরীভূত করা যায় অন্য মানুষের স্বচ্ছ কর্নিয়া সংস্থাপনের দ্বারা। তাকে বলে কর্নিয়া গ্রাফটিং—অস্বচ্ছ কর্নিয়াটি তুলে ফেলে অপরের দেওয়া একটি স্বচ্ছ কর্নিয়া সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়। মানুষের মৃত্যুর অব্যবহিতপরেই এই কর্নিয়া সংগ্রহ করে চক্ষু ব্যাংকে জমা রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ চক্ষু ব্যাংক, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ চক্ষু ব্যাংক এবং সদ্য স্থাপিত 6 নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটে, ইণ্টার ন্যাশনাল আই ব্যাংক। চক্ষু দানে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত ব্যাংকগুলির যে কোন একটিতে জীবিত অবস্থায় তাঁদের চক্ষু দানের সংকল্পের কথা অঙ্গীকার করে গেলে—ইচ্ছুক ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত ব্যাংকে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আসেন, তাঁরা অস্ত্রোপচার দ্বারা ব্যক্তির চক্ষু দুটি তুলে নিয়ে সেখানে কৃত্রিম চক্ষু লাগিয়ে দেন যাতে মৃত ব্যক্তিকেও কোনরূপ অস্বাভাবিক না দেখায়। পরে যাঁর প্রয়োজন তাঁর চোখে অপারেশন করে চক্ষু ব্যাঙ্ক থেকে কর্নিয়া নিয়ে সংস্থাপন করে ঐ অন্ধব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। ভাবুন কত মহান এই দান। তারপর নারীর বন্ধ্যাত্বের বহু কারণের মধ্যে তার ডিম্বস্ফোটন বা ওভিউলেশনের অভাব একটি নিঃসন্দেহে বড় কারণ। আমাদের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকর্মে শরীরমধ্যস্থ কতকগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (এণ্ডোক্রিন গ্ল্যাণ্ড) থেকে নিঃসৃত নানা রকম হরমোনের পৃথক পৃথক ভূমিকা থাকে। এই হরমোন-গুলির মধ্যে মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত পিটুইটারী গ্রন্থির গোনাডোট্রফিক হরমোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই হরমোনের প্রভাবেই পুরুষ এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ, তাঁদের দৈহিক ও মানসিক ভারসাম্য বজায় এবং শারীরবৃত্তীয় অন্যান্য ক্রিয়া সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই হরমোনকে প্রধানত দুটি ভাগ ভাগ করা হয়েছে। (1) ফলিকল স্টিমিউলেটিং হরমোন (FSH) এবং (2) লিউটিনাইজিং হরমোন (LH)। এদের প্রভাবে নারীর ডিম্বাশয় (ওভারী) থেকে নিঃসৃত হয় ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন এবং পুরুষের শুক্রগ্রন্থি বা অণ্ডকোষ থেকে নিঃসৃত হয় টেস্টোস্টেরন নামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে উপযুক্ত পরিমাণে লিউটিনাইজিং হরমোন (LH) নিঃসৃত না হলে ডিম্বস্ফোটন বা ওভিউলেশনে বিপত্তি ঘটে। এই বিপত্তি দূরীকরণে লিউটিনাইজিং হরমোনের সমান সক্রিয় আর একটি হরমোনের সন্ধান পাওয়া গেছে। যার নাম হিউম্যান কোরিয়োনিক গোনাডোট্রফিন, সংক্ষেপে এইচ. সি. জি. (HCG)। এই হরমোনটি স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় গর্ভবতী নারীর গর্ভাশয়ে (ইউটেরাস-এ) ভ্রূণসংলগ্ন ফুল বা প্লাসেণ্টা থেকে। আর প্রসবের সঙ্গে নিঃসৃত হয়ে তা বাইরে চলে যায় ও নষ্ট হয়। কৃত্রিম উপায়ে এই হরমোন তৈরি এখনও সম্ভব হয়নি। মেয়েরা অন্তঃসত্ত্বা হবার প্রথম ষোল সপ্তাহ এই হরমোনটি বেশী পরিমানে নিঃসৃত হয়, প্রতি লিটার প্রস্রাবে পাঁচ থেকে সাত মিলিগ্রামের মতন। তারপরে এর পরিমাণ কমতে থাকে। লিউটিনাইজিং (LH) হরমোনের অভাবে যে মেয়েদের সন্তান সম্ভাবনা থাকে না, এইচ. সি. জি-হরমোন প্রয়োগে তাঁদের সেই দোষ দূরীভূত হয়। আবার পুরুষদের শুক্রহীনতা দূরীকরণেও এই হরমোনের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। ভারতবর্ষে এই প্রথম কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গানগরে "অরগ্যানন" নামেও ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা এই জৈব রাসায়নিক এইচ. সি. জি. হরমোন নিয়ে ওষুধ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু এদের অসুবিধা দেখা দিয়েছে কাঁচা মালের অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর স্বেচ্ছা দানকৃত মূত্রের। গর্ভবতী নারীর মূত্র থেকে বন্ধ্যাত্ব মোচনের সূত্র পাওয়ায় বিশ্বের বন্ধ্যা নারী সমাজ মাতৃত্বের সন্ধানে আকুল হয়ে উঠেছেন।

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাতে হলে বিদেশ থেকে আমদানীকৃত ইনজেকশনের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে ঐ চিকিৎসা সাধারণের সাধ্যের অতীত। কিন্তু মাতৃত্বের আকাংখা শুধু কি ধনী সম্প্রদায়ের জন্য? আমাদের উচিত তুক-তাকের কথা ভুলে গিয়ে মাতৃত্বের প্রয়োজনে মায়েদেরই এগিয়ে আসা। অন্ধ বিশ্বাসের স্রোতে বিজ্ঞানের বিকাশকে ব্যাহত করে কী লাভ?

এছাড়া ঐ এইচ. সি. জি. হরমোনের আরও একটা বিশেষ মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে, মেয়েদের নিয়মিত মাসিক হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন কিনা—তা' এই হরমোন দিয়ে অতি সহজে অল্প খরচে কোন ডাক্তারের সাহায্য ছাড়াই পরীক্ষা করা যায়।—যাকে বলে প্রেগন্যান্সি টেস্ট, আজকের সমাজে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব অসীম। সুতরাং এই কাজেও এইচ, সি, জি-র ব্যাপক প্রয়োগ হবে, ফলে অনাকাঙ্খিত সন্তানের প্রাদুর্ভাব থেকে সহজে দেশ ও সমাজকে বাঁচান যাবে। তাই ধনী গরীব সমস্ত পরিবারের গর্ভবতী মায়েরা যাতে সময়মত তাঁদের মূত্রটুকু দান করে সারাদেশ ও সমাজের বিরাট উপকার করতে পারেন তার জন্য সমবেত প্রচেষ্টা দরকার।

লাল রক্ত কালো টাকায় কেনা বন্ধ করতে হলে, অন্ধদের ভিক্ষাবৃত্তির দিকে ঠেলে না দিয়ে আলোর জগতে ফিরিয়ে আনতে হলে, বন্ধ্যা মায়ের কোল ভরে দিতে হলে, চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রদের প্রয়োজনে মৃত দেহের অভাব দূর করতে হলে, এতটুকু ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার না করেও আমরা পারি না কি অন্ধ বিশ্বাসের পাথরগুলি সরিয়ে শরীরের অতিরিক্ত, পরিত্যক্ত অথবা পরিতজ্য দ্রব্যগুলি দান করে পরহিত ব্রতে ব্রতী হতে? রক্তের, কর্নিয়ার, কিডনির, হৃৎপিণ্ড, টিস্যু, অস্থি প্রভৃতি দানের জন্য এবং ডাক্তারী শিক্ষায় জন্য মৃতদেহের অভাবের মোকাবিলায় কি কার্য্যোপযোগী আইন প্রণয়ন প্রয়োজন? জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আইনকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে না ধরে আসুন আমরা সবাই এগিয়ে এসে উচ্চারণ করি "এস এস শূন্যজীবনে, মিটাও আশ সব তিয়াস অমৃত প্লাবনে।"

শক্তির ঘাট্‌তি পূরণে বায়োগ্যাস প্লান্ট

দেবপ্রসাদ ঘোষদস্তিদার*

বিশ্বের জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে শক্তির সমস্যাও ততটা প্রকট আকার ধারণ করছে। তবুও বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেমে নেই কিন্তু সমস্যা যেন ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশের মত ভারতবর্ষেও শক্তির যোগান প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। এর প্রধান কারণ অবশ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার। 1971 সালের গণনায় দেখা যায় ভারতের জনসংখ্যা 54 কোটি এবং 1961 থেকে 1971 সালে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই হার যদি বজায় থাকে তবে বিশেষজ্ঞদের মতে 2001 সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 110 কোটিতে। এই বিপুল সংখ্যক জনগণের উপযুক্তভাবে পরিচর্যার জন্য কৃষি ও শিল্পের প্রসার অনস্বীকার্য। কিন্তু তার জন্য সর্বপ্রথমে দরকার শক্তির যোগান বৃদ্ধি করা। আমাদের দেশে শক্তির মূল উৎস কয়লা এবং জলবিদ্যুৎ। তাপ-বিদ্যুতের জন্য প্রচুর কয়লার প্রয়োজন। সৌর শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্যও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। তবে পল্লীঅঞ্চলে এখনও শক্তির মূল উৎস কেরোসিন, কয়লা, ঘুঁটে এবং জ্বালানী কাঠ। ভারতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক গ্রাম আছে এবং মোট জনসংখ্যার 70 ভাগ গ্রামের বাসিন্দা। তাই পল্লীবাসীদের দৈনন্দিন জীবনধারণের (রান্না, আলো চাষবাস) জন্য যে শক্তির যোগান দরকার তা সমাধানের জন্য বায়োগ্যাস প্লান্টের ভূমিকা কতটা কার্যকরী তাই নিয়ে আলোচনা করা হবে।

1966 সালের এক সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতে প্রায় 23 কোটি গোমাহিষাদি আছে, তার মধ্যে 17 কোটি 60 লক্ষ গরু, 5 কোটি 1 লক্ষ মোষ এবং বাকী 30 লক্ষ অন্যান্য। প্রত্যিটি জন্তু থেকে গড়ে প্রতিদিন 2 কে.জি শুষ্ক গোবর বা 10 কে.জি ভিজে গোবর পাওয়া যায় অর্থাৎ বছরে প্রায় 17 কোটি টন শুষ্ক গোবর উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন গোবরের সবটাই যদি বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় তবে এর থেকে বছরে যে পরিমাণ শক্তি মিথেন গ্যাস হিসাবে সংগৃহীত হবে তা প্রায় 10 কোটি টন প্রতিস্থাপনযোগ্য কয়লার সমতুল্য। পল্লীবাসীরা গোবরকে জ্বালানী ও কম্পোস্ট সার রূপেই মুখ্যতঃ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে ব্যবহার করলে উপরিউক্ত দুই পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী বাড়তি সুবিধা আদায় করা সম্ভব। কম্পোস্ট সারে সাধারণতঃ শতকরা 0.75-100 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। গোবর গ্যাস প্লান্ট থেকে জ্বালানী গ্যাস ছাড়াও সার হিসাবে ব্যবহারযোগ্য যে স্লাজ পাওয়া যায় তাতে প্রায় শতকরা 2.0—2.2 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।

[পরবর্তী পৃষ্ঠায় টেবলে 5 জনের একটি পরিবারের জন্য জ্বালানী ও সারের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে উল্লিখিত তিন পদ্ধতিতে গোবর ব্যবহারের একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হল।]

কিরিট এস্. পারিখের—"সেকেণ্ড ইণ্ডিয়া স্টাডিজ—এনার্জী" থেকে জানা যায় 5 জনের একটি পরিবারের জন্য 60 ঘন ফুট গ্যাস উৎপাদন, ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বায়োগ্যাস প্লান্ট যথেষ্ট। পরবর্তী পৃষ্ঠায় তুলনামূলক চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে 10 কেজি শুষ্ক গোবর থেকে 64 ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হয়। সুতরাং 5 জনের পরিবারের জন্য আলো, রান্না প্রভৃতি কাজের জন্য আর বাড়তি শক্তি ক্রয়

*পেষ্টিসাইড রিসার্চ ল্যাবরেটারী, পোঃ + জেলা—মেদিনীপুর

বিষয়	বায়োগ্যাস প্লান্ট	জ্বালানী	কমপোস্ট সার
[ক] ইনভেস্টমেন্ট প্লান্ট	2,000 টাকা		
[খ] পরিচালনার খরচ	50 "		
[গ] সংগৃহীত গোবর (শুকনো) কেজি/দিন	10	10	10
[ঘ] উৎপন্ন গ্যাস-ঘনফুট/দিন	64		
[ঙ] উৎপন্ন গ্যাস থেকে সংগৃহীত শক্তি/বছর (গ্যাসের কার্যকরী দহন ক্ষমতা শতকরা 60 ভাগ)	1910×10^3 কিলোক্যালরি	—	
[চ] ঘুঁটে থেকে সংগৃহীত শক্তি/বছর (ঘুঁটের কার্যকরী দহন ক্ষমতা শতকরা 11 ভাগ)		$1·20 \times 10^3$ কিলো ক্যালরি	—
[ছ] সংগৃহীত সারের পরিমাণ			
নাইট্রোজেন/বছর	52·6 কেজি		29·9 কেজি
টাকা/বছর (4·50টা/কেজি) নাইট্রোজেন	236·00	—	134·00
[জ] জ্বালানীর জন্য ক্রয় করা দরকার			
কেরোসিন—কেজি/বছর	—	25	25
ঘুঁটে—টাকা/বছর	—	90	285

বিঃ দ্রঃ 1 কেজি শুকনো গোবর থেকে 6·4 ঘনফুট গ্যাস এবং 0·72 কেজি শুষ্ক সার (যাতে 2% নাইট্রোজেন থাকে) পাওয়া যায়।

1 কেজি শুষ্ক গোবর থেকে 0·5 কেজি কমপোস্ট (যাতে 1·0—1·5% নাইট্রোজেন থাকে) পাওয়া যায়।

করার প্রয়োজন তো থাকেই না উপরন্তু 236·00টাকা মূল্যের জৈব সার উৎপন্ন হয়। কিন্তু গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করলে বছরে আরও 25 কেজি কেরোসিন ও 90 টাকার মত ঘুঁটে ক্রয় করা দরকার। গোবর শুধুমাত্র কমপোস্ট সার রূপে ব্যবহার করলে বছরে 25 কে.জি কেরোসিন এবং ঘুঁটে পুরোটাই ক্রয় করা দরকার। শুধু তাই নয়—10 কেজি শুষ্ক গোবর থেকে কমপোস্টের মাধ্যমে যে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় তার পরিমাণও বায়োগ্যাস প্লান্ট থেকে সংগৃহীত সারের নাইট্রোজেনের তুলনায় বেশ কম।

কিরিট এস্ পারিখের আর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়—ভারতে মোট 1 কোটি 20 লক্ষ পরিবারের (প্রতি পরিবারের লোকসংখ্যা গড়ে 7·5 জন) গড়ে 5টি করে গোবর নিঃসরণকারী বয়স্ক জীব আছে। সুতরাং ইচ্ছে করলে এই 1 কোটি 20 লক্ষ পরিবারই নিজস্ব বায়োগ্যাস প্লান্ট বসাতে পারেন এবং তা থেকে 9 কোটি লোক উপকৃত হতে পারেন। সাধারণতঃ একটি মাঝারি বয়সের গরু/মোষ থেকে প্রতিদিন গড়ে গোবর পাওয়া যায়—মোষ—14 কেজি, গরু—10 কেজি, বাছুর—4 কেজি করে। একটি 60 ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন প্লান্টের জন্য প্রতিদিন গড়ে 45 কেজি ভিজে গোবর দরকার। অতএব যে পরিবারের 4-5টি গরু/মোষ

আছে তারা ইচ্ছে করলেই একটি 60 ঘনফুটের গ্যাস প্লান্ট বসাতে পারেন।

এখন এমন হওয়াটা স্বাভাবিক যে প্রত্যেক বাড়ীতেই হয়তো 4-5টি গরু/মোষ নেই। সে ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বা যৌথ উদ্যোগে গ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে। প্রত্যেক বাড়ী থেকে গোবর সংগ্রহ করে এনে একটি কেন্দ্রে জমা করা এবং সেখান থেকে কমিউনিটি প্লান্টে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো। ফ্যামিলি সাইজ প্লান্টের তুলনায় কমিউনিটি প্লান্টের অন্যান্য সুবিধাও অনেক গুণ বেশী। একটি 5000 ঘনফুট ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্লান্টের মূল্য প্রায় 40,000 টাকা। এই প্লান্ট থেকে প্রতিদিন গড়ে 4500 ঘন ফুট গ্যাস উৎপন্ন করা সম্ভব—তবে তার জন্য প্রতিদিন ৫80 কেজি শুষ্ক গোবরের সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি গ্রামে 2-3টি উল্লিখিত সাইজের প্লান্ট বসান যেতে পারে। উৎপন্ন গ্যাস 1500 পি. এস. আই সিলিণ্ডারে সঞ্চয় করতে হবে। এরূপ একটি সিলিণ্ডারের গ্যাস ধারণ ক্ষমতা 600 ঘনফুট। এরূপ একটি গ্যাসপূর্ণ সিলিণ্ডারে একটি পরিবারের 10 দিন ভালভাবেই চলে যায়। 4500 ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন করার জন্য ফ্যামিলি সাইজ প্লান্ট (60 ঘনফুট) প্রায় 70টি বসান দরকার। এই 70টি প্লান্টের খরচ একটি কমিউনিটি প্লান্টের খরচের তিন ভাগের 1ভাগ বেশী। অর্থনৈতিক সুবিধা ছাড়াও কমিউনিটি প্লান্টের আর একটা বড় সুবিধা হল—এতে সব ধরণের জন্তুর মল ব্যবহার করা সম্ভব যা ফ্যামিলি সাইজ প্লান্টের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

হিসাব করে দেখা গেছে বায়োগ্যাস প্লান্টের মাধ্যমে পল্লীবাসীদের রান্না, আলো, সেচের কাজ প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় মোট শক্তির শতকরা 75 ভাগ পূরণ করা সম্ভব।

সরকারী প্রচেষ্টায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সংস্থার মাধ্যমে, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে গ্রামে আরও বেশী সংখ্যায় বায়োগ্যাস প্লান্ট বসানোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

কিরিট এস্. পারিখ "বেনিফিট কস্ট অ্যানালিসিস অব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ইন ইণ্ডিয়া", 1962।

আশ্চর্য ভারসাম্য

অভিজিৎ লাহিড়ী*

মনে করুন আপনাকে অনেকগুলি ইট দিয়ে বলা হলো একটার উপর আরেকটা, তার উপর আরেকটা এইভাবে সাজাতে। ইটগুলিকে যদি ঠিক একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়, অর্থাৎ কোন ইটের ধার যদি তার তলার ইট থেকে পাশে বেরিয়ে না থাকে (1 নং চিত্র) তবে তো যত খুশী ইট সাজিয়ে স্তম্ভটিকে যথেচ্ছ পরিমাণ উঁচু করা যাবে (অবশ্য এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে প্রতিটি ইটের ভারবহণ ক্ষমতা এত বেশী যে যত খুসী ইট চাপালেও নিচের ইটগুলি ভাঙবে না)। কিন্তু আপনাকে যদি বলা হয় যে প্রতিটি ইটের ধার তার তলার ইট থেকে একপাশে (ধরা যাক ডান দিকে) একটু বার করে রেখে একটা হেলানো স্তম্ভ তৈরি করতে (2 নং চিত্র) তবে সেই স্তম্ভের শীর্ষদেশ তার পাদদেশ থেকে সর্বোচ্চ কতটা পরিমাণ ডান দিকে সরে থাকতে পারে? সর্বোচ্চ কত সংখ্যক ইট এভাবে পরপর সাজানো যাবে? মনে করা যাক, প্রতিটি ইটের দৈর্ঘ্য 20 সে. মি.। এখন, প্রতিটি ইটকে যদি তার ঠিক ঠিক নিচের ইট থেকে 1 মি.মি করে ডান দিকে সরিয়ে বসানো হয় তবে একটু হিসাব করলেই দেখা যাবে যে মোট 201 খানা ইট এইভাবে সাজানো যাবে, আর সবচেয়ে উপরের ইটটা সবচেয়ে নিচের ইট থেকে 20 সে. মি. ডান দিকে সরে থাকবে। এই স্তম্ভের উপর আর একটা ইট (202 তম) 1 মি.মি. ডান দিকে সরিয়ে বসালেই উপরের 201টা ইটের ভারকেন্দ্র সবচেয়ে নিচের ইটের ডানদিকের প্রান্ত থেকেই বাইরে বেরিয়ে যাবে। যার ফলে পুরো স্তম্ভটাই ভারসাম্য হারিয়ে ধ্বসে পড়বে। যদি ইটগুলিকে 1 মি. মি. এর বদলে মাত্র 0·5 মি. মি. করে সরিয়ে বসানো হয় তবে স্তম্ভে মোট 401 খানা ইট বসানো যাবে। তবে এক্ষেত্রেও সবচেয়ে উপরের ইটটা সবচেয়ে নিচের ইট থেকে ঐ 20 সে. মি.ই
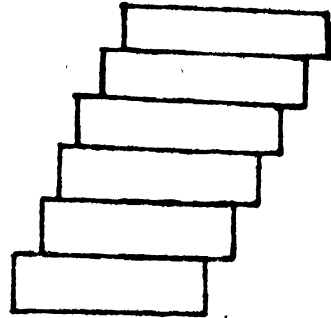
1নং চিত্র

2নং চিত্র

*বিদ্যাসাগর, সান্ধ্য কলেজ

ডানদিকে সরে থাকবে। পর পর দুটি ইটের অবস্থানের পার্থক্য যতই কমানো হোক না কেন (0.5 মি. মি.-এর বদলে 0.1 মি. মি., 0.01 মি মি বা তার চেয়েও যত খুশী কম) ঐ একই পার্থক্য বজায় রেখে ইটগুলিকে সাজিয়ে গেলে স্তম্ভের উচ্চতা (অর্থাৎ ইটের সংখ্যা) বাড়ানো যেতে পারে বটে কিন্তু সবচেয়ে উপরের আর সবচেয়ে নিচের ইটের অবস্থানের পার্থক্য কখনই 20 সে.মি.-এর বেশী করা যাবে না।

আমাদের উপরের আলোচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হলে ধরে নিতে হবে যে প্রতিটি ইটকে তার ঠিক উপরের ইটের তুলনায় একটু বাঁ দিকে সরিয়ে ঢোকানো হচ্ছে। ইটগুলির দৈর্ঘ্য বরাবর একটা অনুভূমিক রেখাকে x-অক্ষ বলা যাক। সবচেয়ে উপরের ইটের মধ্য বিন্দুকে এই অক্ষের মূলবিন্দু (অর্থাৎ স্থানাঙ্ক শূন্য) ধরা হলো। এই অক্ষের বাঁ দিক বরাবর নিচের ইটগুলির স্থানাঙ্ক মাপা হবে (3 নং চিত্র)।
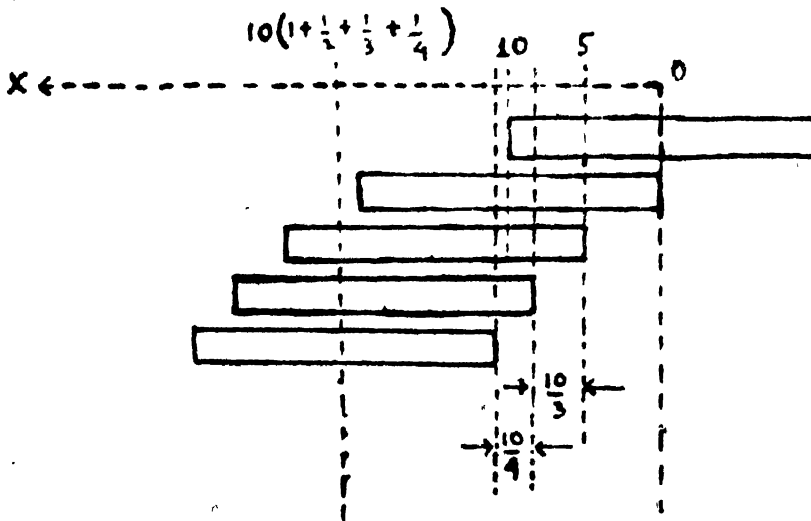
3নং চিত্র

এবারে যদি বলি, ইটগুলিকে সাজাবার এমন একটা বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে যাতে ইটের সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়ে সবচেয়ে নিচের ইট থেকে ডান দিক বরাবর সবচেয়ে উপরের ইটের দূরত্ব যথেচ্ছ পরিমাণ বাড়ানো যাবে, তবে খুবই আশ্চর্য লাগে না কি? ব্যাপারটা সত্যিই চমকপ্রদ, এবং কিভাবে এটা সম্ভব তা বুঝতে হলে গণিতের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পদ্ধতিটি বুঝতে হলে, একটার উপর আরেকটা ইট বসিয়ে স্তম্ভ বানানো হচ্ছে, এভাবে না ভেবে, বরং কল্পনা করে নেওয়া ভাল যে একটার নিচে আরেকটা ইট ঢুকিয়ে, তার নিচে আবার আর একটা ঢুকিয়ে স্তম্ভটির উচ্চতা বাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রথম ইটের মধ্য বিন্দু (মনে রাখতে হবে, এই ইটটি কিন্তু স্তম্ভের সবচেয়ে উপরে থাকবে) মূলবিন্দুতে (স্থানাঙ্ক শূন্য) বসানো হলো। এবারে তার নিচের ইটটিকে এমনভাবে বসানো হলো যাতে তার ডান দিকের প্রান্তটি উপরের ইটটার ঠিক মধ্যবিন্দু বরাবর (অর্থাৎ শূন্য স্থানাঙ্কে) বসে। এতে করে উপরের ইটের ভারকেন্দ্র নিচের ইটের ডান প্রান্তের উপর অবস্থিত হলো, ও এর ফলে ভারসাম্য বজায় থাকলে। x-অক্ষের বাঁ দিক বরাবর নিচের ইটের মধ্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক হলো 10 সে.মি.। কিন্তু দুটি ইটের মিলিত ভারকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হলো $\frac{10}{2}$ অর্থাৎ 5 সে.মি.। এখন তৃতীয় ইটকে এই দুটি ইটের নিচে এমন ভাবে বসানো

হলো যাতে তার ডান প্রান্তের স্থানাঙ্ক হয় ঐ 5 সে.মি.। এর ফলে উপরের দুটি ইটের মিলিত ভারকেন্দ্র নিচের ইটের ডান প্রান্তের উপর অবস্থিত হওয়ায় ভারসাম্য বজায় রইল। এবারে, এই তিনটি ইটের মিলিত ভারকেন্দ্রের অবস্থান কোথায়? ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের নিয়ম অনুযায়ী, তৃতীয় ইটটি যোগ করার ফলে নতুন ভারকেন্দ্র আগেকার ভারকেন্দ্র থেকে $\frac{10}{3}$ অর্থাৎ প্রায় 3·33 সে. মি বাঁ দিকে সরবে। তার মানে, তিনটি ইটের মিলিত ভারকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হলো $10\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)$ সে.মি। এবার চতুর্থ ইটকে এই তিনটির তলায় এমনভাবে বসানো হলো যাতে তার ডান প্রান্তটি ঠিক এই ভারকেন্দ্রের নিচে থাকে। এতে করে আগের মতই ভারসাম্য বজায় রইল। কিন্তু চারটি ইটের মিলিত ভারকেন্দ্র আগেকার ভারকেন্দ্র থেকে $\frac{10}{4}$ সে. মি বাঁ-দিকে সরে গেল। অর্থাৎ নতুন ভারকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হলো $10\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$ সে.মি। এইভাবে সাজিয়ে গেলে N সংখ্যক ইট সাজানোর পর সবগুলির মিলিত ভারকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হবে

$$10\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots\cdots+\frac{1}{N}\right) \text{সে মি.।}$$

আর সবচেয়ে উপরের ইটের কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে নিচের ইটের কেন্দ্র x-অক্ষ বরাবর সরে থাকবে

$$10\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{N}\right) \text{সে.মি.}$$

লক্ষ্য করুন, ইটগুলি এমন ভাবে ঢোকানো হচ্ছে যাতে প্রতি ধাপেই ভারসাম্য বজায় থাকে। অর্থাৎ ইটের সংখ্যা যত খুশী বাড়ানো যাবে। এবার দেখা যাক N বাড়ালে x-অক্ষ বরাবর স্তম্ভটির বিস্তার কিভাবে বাড়ছে। গোড়ায় যে পদ্ধতির উল্লেখ করেছিলাম সেভাবে সাজালে এই বিস্তার কখনই 20 সে.মি. এর বেশী হবে না। নতুন পদ্ধতিতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিস্তারের পরিমাণ

$$10\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{N}\right)$$

সে. মি.।

এখন,

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{N}+\cdots$$

এই শ্রেণী বা 'সিরিজ'টি একটি অভিসারী শ্রেণী। অর্থাৎ N-এর মান বাড়িয়ে

$$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots\cdots+\frac{1}{N}\right)$$

এই রাশিটিকে যথেচ্ছ পরিমাণ বাড়ানো যায়। তার মানে, অসীম সংখ্যক ইট এইভাবে বসালে x-অক্ষ বরাবর স্তম্ভটি অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আশ্চর্যের বিষয় এই, যে এভাবে বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পুরো স্তম্ভটির ভারসাম্য নষ্ট হবে না।

প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও ব্যাপারটির মধ্যে কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই নেই। স্তম্ভের বিস্তারের সঙ্গে ইটের সংখ্যার (বা স্তম্ভের উচ্চতার) সম্পর্কটি নির্ণয় করলে এটা আরো ভালো বোঝা যায়। মনে করি প্রতিটি ইটের উচ্চতা 5 cm। তাহলে x-অক্ষ বরাবর স্তম্ভের বিস্তার x সে.মি হতে হলে স্তম্ভের উচ্চতা হবে

$$h \sim 5e^{\frac{x}{10}} \left(\text{যখন } x \text{ খুব বেশী}\right)।$$

দেখা যাচ্ছে, বিস্তার বাড়ালে উচ্চতা বাড়বে তার চেয়ে বহু বহুগুণ বেশী হারে। অর্থাৎ বিস্তার বাড়লেও উল্লম্ব রেখা থেকে স্তম্ভের গড় কৌণিক বিচ্যুতি বাড়ছে না, বরং কমে যাচ্ছে। x-এর মান যখন খুব বেশী তখন একেবারে নিচের দিকে স্তম্ভটি উল্লম্ব রেখা থেকে এতই ধীরে ডান দিকে সরবে যে সেই স্তম্ভের বেশী ভাগ অংশই অবস্থিত থাকবে একেবারে নিচের ইটটির ডান প্রান্তের ভিতরে। তার বাইরে অবস্থিত অংশটি সবসময়েই থাকবে স্তম্ভের মোট দৈর্ঘ্যের অনুপাতে খুবই কম। এর ফলে দুটি অংশ মিলিয়ে ভারকেন্দ্র কখনই নিচের ইটের ডান প্রান্তের বাইরে যাবে না।

টেবিলের একধারে অনেকগুলি বইকে এভাবে সাজিয়ে এই আশ্চর্য ভারসাম্য পরখ করে দেখা যেতে পারে।

সূত্র : আমেরিকান জার্নাল অফ ফিজিক্স

(ক) সংখ্যা 27 (1959) পৃঃ 121,

(খ) সংখ্যা 41 (1973) পৃঃ 715।

কচুরিপানার উপকারিতা

পরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য*

এতাবৎকাল পর্যন্তই কচুরিপানাকে লোকে ক্ষতিকর পদার্থ বলেই জানতেন। কেননা কচুরিপানা নদী, খাল, ডোবা ইত্যাদি সবকিছুকে এমন করে ভর্তি করে রাখে যে নৌকা চলাচলে অথবা অন্য পরিবহন ব্যবস্থাতে বিঘ্নই ঘটিয়ে থাকে। তাছাড়া এরা নদীর বা খালের আশেপাশের চাষের জমিতেও উঠে যায় বলে ফসলের ক্ষতিও অশেষ ঘটিয়ে থাকে। জলাভূমিগুলিকে অকেজো করে রাখে। কচুরিপানার জন্যে জলের অনেক সূত্র থেকে জলের ব্যবহার করাও অসুবিধা।

যদিও আমেরিকাতেই তার প্রথম আবির্ভাব, আজ কিন্তু কচুরিপানা এমন দেশ নেই যে দেখা যায় না। পৃথিবীর সর্বদেশেই এটি বর্তমান। তবে উষ্ণমণ্ডল অঞ্চলেই কচুরিপানা গজায় বেশী। এর উৎপাদনের জন্যে জমিকে বানানোও দরকার হয় না। সারও লাগে না—আপনা থেকেই বেড়ে বেড়ে যায়। কচুরিপানার উপস্থিতিতে জলা ভূমিগুলিতে মশামাছির উপদ্রবও থাকে। তাই এটি নানাভাবে ক্ষতিকারক বলে একে ধ্বংস করার বিষয়েও অনেকে চিন্তা করেন। কিন্তু কচুরিপানা নিজের থেকেই এত বাড়ে যে তাকে মূলোৎপাটন করা খুবই শক্ত। এখন অন্যভাবে সকলেই চিন্তা করেন। সেটি হলো এই যে একে অন্য কাজে লাগিয়ে দেওয়া। তাতে অর্থকরীর দিকটাও শক্তিশালী হতে পারছে। কচুরিপানা থেকে এখন সার, বায়োগ্যাস, পশুর খাওয়া, চিনি ইত্যাদি তৈরি করে নেওয়া হয়। কচুরিপানা বিষাক্তজলকে বিশুদ্ধও করতে পারে।

কচুরিপানা থেকে সার

কচুরিপানাকে ইংরাজীতে বলা হয় ওয়াটার হায়াসিন্থ (water hyacinth)। এর বৈজ্ঞানিক নাম আইকরনিয়া ক্রাসিপেস (Eichornia crassipes)। এতে আছে কার্বন; নাইট্রোজেন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি শতকরা হিসেবে কার্বনের পরিমাণ 3·5, নাইট্রোজেন 1·6, সোডিয়াম 0·6, পটাশিয়াম 3·8, ক্যালসিয়াম 1·7, ম্যাগনেসিয়াম 0·6, ফসফরাস 0·6। কচুরিপানায় প্রোটিন জাতীয় পদার্থও বর্তমান থাকে। শুষ্ক কচুরিপানায় 15·7 থেকে 23·5 শতাংশ প্রোটিন আছে।

এই সব প্রধান প্রধান উপাদানগুলি কচুরিপানায় আছে বলে এদেরকে সার তৈরির কাজে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। কচুরিপানায় প্রোটিনের পরিমাণই বিশেষ আকর্ষণীয়। সাধারাণ ঘাসে প্রোটিন খুব কম থাকে—6 থেকে 8 শতাংশ। কিন্তু সার তৈরি করতে হলে কিছুটা অসুবিধাও আছে। কচুরিপানায় অত্যধিক জল থাকায় ভাল সার শুধু কচুরিপানা দিয়েই হয় না। কচুরিপানার সঙ্গে দৈনন্দিন আমাদের খাদ্যের যে অংশটা অপচয় হয় অথবা কৃষির অবশিষ্টাংশ যা থাকে তা মিশিয়ে নিলেই অসুবিধাটা দূর হয়ে যায়। কচুরিপানার সঙ্গে বিভিন্ন গারবেজ (garbage), ছাঁই ইত্যাদি মিশিয়ে নিয়ে যা পাওয়া যায় তাকেই সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কচুরিপানা থেকে যে সার মিলে সেই সার অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল, কারণ কচুরিপানায় লিগ্‌নিন (lignin) কম থাকে আর সে কারণেই অতি সহজে কচুরিপানা ভেঙে সারে পরিণতও হয়। আবার পুষ্টিকর পদার্থ বর্তমান থাকাতেও, এটি একটি ভাল সার।

*আগরপাড়া নর্থ ষ্টেশন রোড, 24-পরগণা

বায়োগ্যাস প্রভৃতি

কচুরিপানা থেকে বায়োগ্যাস প্রভৃতিও সম্ভব। আর এটাই বেন খুব ভাল কারণ এই জলজ উদ্ভিজের অভাব ভারতে নেই যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এই জলজ উদ্ভিদকে প্রাথমিক পরীক্ষায় শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষমও হয়েছেন। ইতিমধ্যেই এঁরা জানিয়েছেন অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়া (anaerobic bacteria) দিয়ে কচুরিপানা থেকে বায়োগ্যাস পাওয়া যাচ্ছে। কচুরিপানার সূত্রটি অন্য সূত্র থেকে অধিক লাভজনক এই কারণে যে কচুরিপানার বেলার তার জলকে অপসারণ করার দরকার হয়না কেননা এই ফারমেনটেশন পদ্ধতির জন্তেই যে জল দরকার কচুরিপানা তা নিজেই যুগিয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষা অনুসারে কচুরিপানা থেকে যে বায়োগ্যাস পাওয়া যায় তাতে মিথেনের পরিমাণ 70 শতাংশ আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 30 শতাংশ। এক কিলোগ্রাম কচুরিপানা থেকে প্রায় 370 লিটার বায়োগ্যাস হতে পারছে।

গবাদি পশুর খাদ্য

কচুরিপানা গরুকে খাওয়ানো হয়। এটা আগেও হতো। কিন্তু এখন কচুরিপানাকে সরাসরি না খাইয়ে, কচুরিপানার সঙ্গে খর বা খর জাতীয় বিবিধ অবশিষ্টাংশ মিশিয়ে নিয়েই খাওয়ানো হয়। শুধু কচুরিপানা খাওয়ালে গরুর দুধে জলীয় অংশ বেড়ে যায়। আর তার থেকে যে মাখন তুলে নেওয়া হয় তার স্বাদ এবং গন্ধ, কচুরিপানা খায় না তেমন গরুর দুধ থেকে যে মাখন হয় তার থেকে পৃথক। ভারত, চীন, ইটালি প্রভৃতি দেশগুলিতে কচুরিপানার সঙ্গে অন্য পুষ্টিকর পদার্থ মিশিয়ে পশুদের খাবার তৈরি করা হয়।

কচুরিপানায় খনিজ পদার্থ যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম আয়রন ইত্যাদির পরিমাণ সাধারণ খাবারের থেকে বেশী। সোডিয়ামের পরিমাণ না হলেও 10 গুণ কি তারও বেশী। পটাশিয়ামের পরিমাণও 3 থেকে 6 গুণ বেশী আবার আয়রনের পরিমাণও 4 থেকে 20 গুণ। এটাই এখন সমস্যা। কি ভাবে এদের পরিমাণ একটা সীমিত মাত্রায় আনা যায় তা নিয়েই বিদেশে গবেষণা চলছে।

কচুরিপানা থেকে চিনি

কচুরিপানা থেকে চিনিও মিলে। সেলুলোস (cellulose) জাতীয় পদার্থ থেকে চিনি পেতে হলে আগে সেলুলোসকে অ্যাসিড দিয়ে ভেঙে ফেলা হতো। সাধারণতঃ সালফিউরিক অ্যাসিডই ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিড দিয়ে না ভেঙে এখন এনজাইম দিয়ে ভাঙা হয়। এই পদ্ধতির একটা বিশেষ সুবিধে হলো এই যে তাতে চার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আর বেশী পরিমাণেই চিনিও পাওয়া যায়। মোট কথা সেলুলোস জাতীয় পদার্থ সকলের চিনিতে রূপান্তর করা—তা যে পদ্ধতিতেই হউক, অ্যাসিড দিয়ে অথবা এনজাইম দিয়ে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই।

সেলুলোস থেকে যে চিনি মিলে তারও আবার অ্যালকোহলে রূপান্তর সম্ভব। চিনি থেকে অ্যালকোহল ফারমেনটেশন (fermentation) পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। অ্যালকোহলও একটি জ্বালানি। কচুরিপানার ব্যবহার যে চিনির যোগান দিচ্ছে তা নয়, জ্বালানিরও যোগান হবে। কচুরিপানার ব্যবহার এই কারণেই এখন বেড়ে গেছে।

পরিবেশ দূষণ দূরীকরণ

আজ বিশুদ্ধ জলের অভাব লেগেই আছে। কলকারখানার আবর্জনা ইত্যাদি জলে আস্তানা নিয়ে জলকে দূষিত করে তুলেছে। তারপর পারমাণবিক বিস্ফোরণ ইত্যাদি থেকে নানাবিধ রেডিও আইসোটোপ যেমন বায়ুতে আস্তানা নিচ্ছে আবার জলেও আস্তানা নিয়ে থাকে।

কচুরিপানা কিয়দংশে দূষিত জলকে বিষমুক্ত করতে সাহায্যও করে। কচুরিপানার শেকড়ের সঙ্গে যে ঝোপ লেগে আছে সেটাই বিষাক্ত পদার্থ দূরীকরণে সাহায্য করছে। ভারী ধাতু যেমন ক্যাডমিয়াম, নিকেল, পারকারী জলের ক্ষতি কতভাবে যে করে তার হিসেব নেই। মানুষ সে জল খেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। এই সব ধাতু সকলকে জল থেকে সরিয়ে নিতে কচুরিপানা সাহায্য করে থাকে। জলে অনেক সময় ক্যানসার ঘটাতে পারে তেমন পদার্থও থাকে। কচুরিপানা তাদের অপসারণেও সাহায্য করছে অনেক দুর্গন্ধ জাতীয় পদার্থও আছে কিন্তু কচুরিপানার উপস্থিতিতে সেই গন্ধও অনেকাংশে উপশমিত হয়। আরেকটা সুবিধা হলো এই যে এই ভাবে যে সব ধাতু কচুরিপানা সংগ্রহ করে থাকে, কচুরিপানার শেকড় থেকে পরে এদেরকেও উদ্ধার করা সম্ভব।

মন্তব্য

যেখানে নিত্যদ্রব্যসামগ্রীর যোগানে ঘাটতি আছে সেখানে তাদের যোগানের প্রশ্নও জড়িত। স্বদেশজাত এমন অনেক অবশিষ্টাংশ অথবা যা কাজে লাগে না বলে জানা হয়েছিল তাদের সদ্ব্যবহার সেই সমস্যার কিছু সুরাহা করতে পারে। এখন যা দরকার তেমন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ। ভারতে তার অভাব আছে। দরকার পরে বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। এই দিকটায় আর অবহেলা না করাই সমীচীন।

মানুষের বুদ্ধি—মানুষের ভাষা

শ্রীকুমার রায়*

বিশাল প্রাণী-জগতে বুদ্ধিমান জীব বলতে কি একমাত্র মানুষকেই বোঝায়? নেতিবাচক উত্তরটা "হোমো সেপিয়ান্স" বা জ্ঞানী মানুষের মনপূত না হলেও এমন অনেক প্রাণী আছে যারা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। বুদ্ধি বলতে বোঝায় শেখার ক্ষমতা এবং শিক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা বা নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করার ব্যুৎপত্তি। জীববিবর্তনে যত উন্নত পর্যায়ের নতুন নতুন প্রাণী প্রজাতির আবির্ভাব হয়েছে, তাদের মস্তিষ্কের আয়তনও ততই বেড়েছে এবং বুদ্ধিও হয়েছে প্রখরতর। প্রাণী-জগতের দুই প্রান্তীয় সদস্যের তুলনা করে বলা যায় একটা এককোষী অ্যামিবাও আক্রান্ত হলে পশ্চাদপসরণ করে, ব্রিটিশ সৈন্য যেমন ডানকার্কে করেছিল। কিন্তু মানুষের সঙ্গে অ্যামিবার তফাৎ এই যে ডানকার্কের পশ্চাদপসরণ ছিল রণকৌশল আর অ্যামিবারা স্বেচ্ছায় ভেবেচিন্তে পালায় না, নিতান্ত বাঁচার তাগিদে, জৈবিক অনুপ্রেরণায় তারা আক্রমণকারীর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। এটা তাদের জন্মগত প্রবণতা বা instinct। এ প্রতিক্রিয়া শিক্ষাসাপেক্ষ নয় সুতরাং এ জাতীয় ক্রিয়াকলাপকে বুদ্ধির অভিব্যক্তি বলা যায় না। এমন কি সন্ধিপদ পর্বের পিঁপড়ে, মৌমাছিদের বিস্ময়কর সমাজ ব্যবস্থাও বুদ্ধিভিত্তিক নয়, অন্তত: মানুষের মত তাদের "চুক্তিবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা" নেই।

জীববিজ্ঞানীরা বলেন অঙ্গুরীমাল পর্ব থেকে প্রাণীদেহে পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যেই প্রথম বুদ্ধির বিকাশ খুঁজে পেয়েছেন। মানুষের, অন্য কোন প্রাণীর বুদ্ধির পরিমাপ করা নিক্তির ওজনে সম্ভব নয়। তবু মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধির একটা মোটামুটি আন্দাজে উপায় হিসাবে 1904 খ্রীস্টাব্দে বিনেট ও সিমন্ড (Binet and Simand) সাধারণ মেধাসম্পন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মনসংযোগ, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি প্রায় 30 রকম মেধার পরীক্ষা করে কোন বয়সের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কতটা বুদ্ধির আশা করা যায় তার পরিমাপ করলেন। এর নাম দেওয়া হল মানসিক বয়স। আজও এই মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের শতকরা অনুপাত জেনে আমরা ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধির আন্দাজ পেয়ে থাকি। এই অনুপাতকে বলা হয় ইনটেলিজেন্স কোশিয়েন্ট (Intelligence Quoti nt বা সংক্ষেপে I.Q. অধুনা অংশু বুদ্ধির পরিমাপ করতে Stanford Binettest বা Weschler Test করা হচ্ছে)। আজকাল মনুষ্যেতর প্রাণীর ওপরেও এই সব পরীক্ষা করে গবেষকরা দেখতে পাচ্ছেন প্রাণী জগতে মানুষ ছাড়াও বুদ্ধিমান প্রাণী অনেক আছে। স্তন্যপায়ী ডলফিনদের (Dolphin) I.Q. কুকুর এবং শিম্পাঞ্জীর মাঝামাঝি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে বন্দীদশায় মানুষের সান্নিধ্যে, এমনকি বন্য পরিবেশেও শিম্পাঞ্জী, গোরিলা ইত্যাদি মহাকপি শাবকদের শেখার বা অনুকরণ করার ক্ষমতা অসাধারণ। পেনি প্যাটারসন পালিত স্ত্রী গোরিলা কোকোর (Koko) I.Q. 80-90 মধ্যে অর্থাৎ প্রায় একজন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে পর্যন্ত মহাকপি গোষ্ঠীতে শিম্পাঞ্জীদেরই সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করা হত কিন্তু ডাঃ আর্নেষ্ট ল্যাং (Dr. Ernst Long) আমাদের সে ধারণা পাল্টে দিয়েছেন, গোরিলাও কম বুদ্ধিমান নয়।

*BF 118, সল্ট লেক সিটি, কলিকাতা-64

তবু বুদ্ধিবৃত্তিতে মানুষ অতুলনীয়. প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র সেই জ্ঞানী (Sapiens) আখ্যা পাবার যোগ্য। কিন্তু আমাদের মনে স্বতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে জীব বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেশতো ধীরে সুস্থে, ধাপে ধাপে প্রাণী প্রজাতিদের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটছিল, তবে মহাকপি থেকে মানুষে উদ্বর্তনের সময় নবতম প্রজাতির বুদ্ধিটা একলাফে একেবারে নিউটন-আইনস্টাইন মার্কা হয়ে পড়ল কি করে? ডেসমণ্ড মরিস (Desmand Morris) এর এক বিবর্তনিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন।

প্রাণী-জগতে অনেক সময় দেখা যায় যে, শৈশব কালের কিছু বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও প্রাণীদের প্রজননক্ষম বয়সের পরেও থেকে যায়। জীববিজ্ঞানীরা ব্যাপারটাকে নিওটেনি (Neoteny) আখ্যা দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় অ্যাক্সোলটল (Axolotl) নামে একরকম উভচর কখনও কখনও শৈশবের লার্ভা রূপ নিয়েই প্রজননক্ষম হয়ে ওঠে। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যটি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হবার সম্ভাবনা। ওই বৈশিষ্ট্যটি ভবিষ্যৎ পরিবেশের অনুপন্থী হলে ক্রমশ ওই বৈশিষ্ট্য যুক্ত একটা নতুন প্রজাতিই সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। মহাকপি-শাবকদের শিক্ষা প্রবণতা মনুষ্যশিশুর চেয়ে বেশী সুতরাং বুদ্ধিও বেশী। কারণ জন্মের সময়েই তার মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় পরিপূর্ণ এবং তারা প্রজননক্ষম বয়সে পৌছবার 6-7 বছর আগেই বুদ্ধির ব্যাপারে পরিপক্ক হয়ে পড়ে। মহাকপিরা যখন মানুষে উদ্বর্তিত হল তখন মানুষ মহাকপি শাবকের উন্নত মানের শিক্ষা প্রবণতা বা বুদ্ধিটাও পেয়ে গেল নিও-টেনি সূত্রে। আবির্ভাব লগ্নে মানুষ শরীরের দিক থেকে ছিল অত্যন্ত অক্ষম প্রাণী, নতুন পরিবেশে তার বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার ছিল ওই বুদ্ধি সুতরাং ওটি তাঁদের প্রজাতিগত গুণ হয়ে দাঁড়াল।

মানুষের প্রজাতিগত প্রখর বুদ্ধির আর এক ব্যাখ্যা এই যে শিক্ষার জন্য দীক্ষার দরকার অর্থাৎ গুরু প্রয়োজন। সে গুরু বিশ্ব প্রপঞ্চের যা কিছু বা যে কেউই হতে পারে এক শর্তে। সেটি হল গুরুকে শিক্ষা দিতে হবে শিষ্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে। তার পর অবশ্য শিষ্য তার বুদ্ধি অনুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে শিক্ষা-গুলি উপলব্ধি, মনন ও নিদিধ্যাসন করবে।, মানুষের অতুলনীয় বুদ্ধির কারণ তার ধীশক্তি এবং স্বপ্রজাতির গুরুর বহুমুখী, নিপুণ প্রকাশ ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে পরস্পরের ক্রমোন্নতি ঘটিয়েছে, ইংরাজিতে থাকে বলা হয় Feed Back Mechanism

বুদ্ধির মত ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও কেবল মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনেক প্রাণীই খাদ্য, আত্মরক্ষা, প্রজনন প্রভৃতি জৈবিক ব্যাপারে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে, কেউ বিচিত্র গন্ধ দিয়ে, কেউ বিশিষ্ট শব্দ করে, কেউ বা আবার বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গী করে। যেমন বাঘ, সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদদের গায়ের বোটকা গন্ধ ফেরুমন (Ferumon) নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থজাত এবং এর সূক্ষ্ম তারতম্য দিয়ে এরা স্ব স্ব এলাকা চিহ্নিত করে। আবার মনের ভাব প্রকাশ করতে মৌমাছিরা এতই পারদর্শী যে, তাদের নিজস্ব ভাষা আছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। তারা যখন চাকে ফেরে ফুল থেকে মধুর সঙ্গে কিছু পরাগও আনে, পরাগের গন্ধ থেকে অন্যান্য মৌমাছিও বুঝতে পারে কোন্ জাতীয় ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মধু আহরণ-কারী মৌমাছিটি চক্রাকারে উড়লে বোঝা যায় মধুর উৎস অনতিদূরে কিন্তু '8' অক্ষরের মত করে উড়তে থাকলে বুঝতে হবে মধু আছে দূরে। এই ভাবে উড়তে উড়তে সে আবার বোঁ করে একদিকে ছুটে গিয়ে দিক দিশারীর কাজটাও করে দেয়। ওড়ার গতিবেগ এবং লাঙুল কম্পনের হার থেকে চাক থেকে ফুলের দূরত্বটাও নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া সম্ভব। নৃত্যভঙ্গী করে ময়ূর, স্ত্রীউটপাখি বা স্ত্রীমাকড়সা প্রজননার্থে বিপরীত লিঙ্গের স্বপ্রজাতিকে যে আহ্বান জানায় এ খবরটা অনেক রস-সাহিত্যের রসদ জুগিয়েছে। প্রাণীদের ভাব আদান-প্রদানের এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

অনুভূতির প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়াগুলি জন্মগত প্রবণতা (Instinct), শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioned Reflex) না বুদ্ধির অভিব্যক্তি তা সাধারণ উপায়ে বোঝা শক্ত। কার্ল ফ্রিস্ক (Karl Van frisch) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা এ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মানুষ জীব শ্রেষ্ঠ। তাই তার সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপ্তি বহু বিষয়ে এবং পদ্ধতিও উন্নত। এ ব্যাপারে তারা গন্ধ বা বর্ণের ওপর নির্ভর করে না বললেই চলে। মানুষ অন্য প্রাণীদের চেয়ে সূক্ষ্মতর অঙ্গভঙ্গী করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় হাসির বক্তিমা অন্য প্রাণীদের মধ্যে নেই। অধুনা শিম্পাঞ্জী, গোরিলাদের sign language দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখান হচ্ছে। এ ব্যাপারে উল্লেখ যোগ্য সাফল্য দাবী করেন পেনি প্যাটারসন। তিনি কোকো-কে American sign language (Ameslan) দিয়ে 350-টির বেশী কথা প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু অর্থবহ শব্দ বা কথ্য ভাষা এবং লিখন পদ্ধতি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা মানুষ ছাড়া আর অন্য প্রাণীর নেই। এর মধ্যে আবার কথ্য ভাষার আবেদন সর্বজনীন। তাই সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন।

বিবর্তনের ইতিহাসে মানুষ কবে থেকে এবং কি ভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল তা আমরা জানি না, তবে আপত অর্থহীন শব্দ করে যে প্রাণীরা কোটি কোটি বছর ধরে নিজেদের প্রকাশ করে আসছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্ষার দাদুরীর ডাক, প্রজনন সময়ে গাভীর সরব আবেদন ইত্যাদি শব্দগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন হলেও তাদের স্বপ্রজাতির কাছে যে সেগুলি বিশেষ অর্থবহ তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। প্রাণী-জগতে এরকম উদাহরণ আরও আছে। যেমন বেলুগা (Beluga) নামে একরকম তিমি মাছ শব্দ করে নিজেদের মধ্যে নিপুণ ভাবে ভাব আদান-প্রদান করতে পারে। জর্জ শেলার (George schaller) লক্ষ্য করেছেন বন্য পরিবেশে গোরিলারা ক্রোধ, বিরক্ত ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করতে প্রায় 20 রকম বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত এক মার্জারের "ম্যাও" ডাকের মধ্যে পুরো মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সন্ধান পেলেও সাধারণ ব্যক্তির কাছে কিন্তু ওই শব্দগুলির কোন অর্থ হয় না।

মানুষও আপাত অর্থহীন শব্দ করে অনেক সময় মনোভাব ব্যক্ত করে তবে কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য হল ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর বিবৃতি। এখানে বস্তু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আজ থেকে 15 লক্ষ বছর আগে মহাকপি শিকারী অস্ট্রেলোপিথেকাসে বিবর্তিত হয়ে নতুন পরিবেশে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল এবং তার প্রয়োজনও ছিল। ফলে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী বিভিন্ন শব্দ সমন্বয়ে নিজেদের ব্যক্ত করতে শুরু করে। কিন্তু সব কথ্য ভাষারই মূল হল ধ্বনি দিয়ে বস্তু পরিচয় বা semantis (অধুনা অবশ্য ধ্বনির সঙ্গে বস্তু বিচ্ছিন্ন করে নানা রকম ভাষা সৃষ্টির পরীক্ষা চলছে।) কিন্তু ধ্বনির সঙ্গে বস্তুর বিধৃতি কি করে শুরু হয়েছিল ?

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী জাড্ (Judd) বলেন হঠাৎ মানব গোষ্ঠীর কোন একজন বস্তু বিশেষকে দেখিয়ে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিল, তার পর থেকে সেই গোষ্ঠীর আর পাঁচজন ওই বস্তুটিকে ওই নামেই অভিহিত করতে শিখে ফেলল। ছোটবেলায় যাঁরা টারজনের চলচ্চিত্র দেখেছেন তাঁরা পরিস্থিতিটা তাড়াতাড়ি কল্পনা করতে পারবেন। টারজন মানুষ হয়েও আশৈশব জঙ্গলে কাটিয়েছে পশু-পক্ষীদের সান্নিধ্যে। একদিন জেন নামে এক মহিলার সঙ্গে ঘটনাচক্রে তার দেখা হয়ে গেল। টারজনের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য জেন তাকে ইংরাজী কথ্য ভাষা শেখাতে শুরু করে প্রথম পাঠ দিল—নিজেকে দেখিয়ে বলল "I am Jane" এবং টারজেনকে দেখিয়ে বলল "You are Tarjan" তার

আগে যে টারজন নিজের ভাব ব্যক্ত করতে পারত না তা নয়। সে তার বিখ্যাত শব্দ করে জাবো, চিতন ইত্যাদির কাছে মনের ভাব প্রকাশ করত কিন্তু জেনের কাছে শিক্ষা পেয়ে সে বলতে শুরু করল "I Tarjan—You Jane"। কিন্তু জেন যদি মানুষ টারজন ছাড়া অন্য যে কোন জন্তুকে কথ্য ভাষা
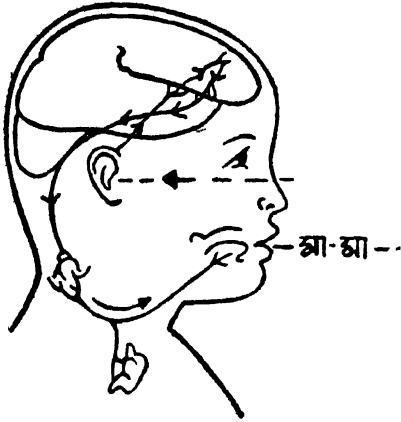
1 (ক) নং চিত্র

শেখাবার চেস্টা করতেন তা হলে সফল হতেন কি না সন্দেহ। কিথ ও ক্যাথি হেজ (Keith and Cathy Hayes) ভিকি নামে এক শিম্পাঞ্জীকে কথা শেখাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নি।

তাদের 'পাখি পড়া' করে অনুকরণ করতে শিখিয়েছে। (2) কথা বলাটা তাদের শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ উত্তেজক, যেমন কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা ক্ষুধার তাড়না ইত্যাদি ঘটনা, যার সঙ্গে তাদের কথা বলাকে যুক্ত করা হয়েছে, মাত্র সে-গুলির প্রভাবেই তারা কথা বলে। অতীতের কোন ঘটনা তাদের মুখর করতে পারে না। (3) উচ্চারিত শব্দগুলি তাদের কাছে অর্থহীন ধ্বনি সমষ্টি মাত্র।

প্রাণী জগতে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে কেন? সে অতুলনীয় বুদ্ধিমান জীব বলে? উত্তরটা বোধ হয় ঠিক নয় কারণ যে কোন শিশু, তার I. Q. যাই হোক না কেন, একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যেই কথা বলতে শিখে ফেলে। নোয়াম চোমাস্কি (Noam Chomoski), লেনবার্গ (E. H. LENNEBERG) প্রমুখ গবেষকরা বলেন কথা বলার ক্ষমতাটা মানুষ পেয়েছিল জীনের (Gene)-এর পরিব্যক্তির ফলে তার পর বংশগতি সূত্র অনুযায়ী সেটা তাদের প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন ব্যাপারটার আর একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক।

একমাত্র মানব শিশুই 3-4 মাস বয়স থেকে এক একটা শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে বক্ বক্ করতে
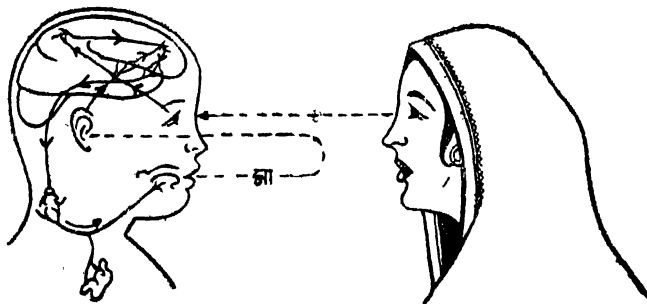
1 (খ) নং চিত্র

টিয়া, তোতা, ময়না, ক্যানারী প্রভৃতি পাখী অনেক সময় আশ্চর্যজনক ভাবে মানুষের কথার অনুকরণ করতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই মানুষের কথা বলার সঙ্গে তাদের তফাৎ বোঝা যাবে। (1) যে কটি কথা তারা বলতে পারে সেগুলি মানুষই

পারে (Babble)। তার এই অর্থহীন 'বক্‌বকানি'ই কথা বলতে শেখার প্রথম পদক্ষেপ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জন্মলগ্নেই সে "ওঁয়া" উচ্চারণ করেছিল, সুতরাং তার পক্ষে আর একবার 'মা' উচ্চারণ এমন আর কি শক্ত কাজ? অন্য জন্তরাও

করতে পারে কিন্তু একমাত্র মানব শিশুর ক্ষেত্রেই প্রথম উচ্চারিত 'মা' শব্দটি তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে তার মন প্রাণ আকুল করে তোলে অর্থাৎ কান দিয়ে সে উচ্চারিত 'মা' শব্দটি শুনল (শ্রবণ), তার মস্তিষ্কে কথাটা পৌঁছল (মনন) এবং মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোবে (frontal lobe) তার তাৎপর্য ধরা পড়ল (নিদিধ্যাসন)। এখন শব্দটি আনন্দদায়ক উত্তেজকের কাজ করে তার মস্তিষ্কের "ব্রোকা স্থান"কে আবার সেটি উচ্চারণ করতে নির্দেশ দিল। শিশু "মাম্ মাম্ মাম্" করে বক্ বক্ করতে আরম্ভ করল। এই বক্ বকানি চক্রের (Babbling cycle) কোথাও ছেদ হলে, শিশু ভবিষ্যতে কথা বলতে শিখবে না। তাই দেখা যায় বধির শিশুরা সাধারণত মূক হয় বা শুনতে পেলেও নিদিধ্যাসন করতে পারে না বলে তারা কথা বলতে পারে না।

মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের অভিমত, বক্ বকানির পরের পর্যায়ে শিশুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (সাধারণত দর্শন ইন্দ্রিয়) এক একটা বস্তু এক একটা শব্দের সঙ্গে বিধৃত হতে শুরু করে। যেমন সে "মাম্-মাম্" করছে আর তার চোখের সামনে ক্রমাগত এক নারীর মুখ ভেসে উঠছে বা সেই নারীর স্নেহ স্পর্শ পাচ্ছে। ক্রমশ তার "মাম্" শব্দটি সেই নারীর সঙ্গে মিশে তিনি হয়ে যাবেন 'মা' বা 'mamma" বা "আম্মা"। থর্নডাইক বলেন এই বস্তু-পরিচয়ের একটিই মাত্র শর্ত। শব্দ। শব্দ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দুটিই শিশুর কাছে আনন্দদায়ক হওয়া চাই। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় অনেক মাতৃহীন শিশু দাসি অথবা দিদিমাকে মা বলে ডাকে বা শিশু যদি চারপাশে শোনে যে সেই স্নেহময়ী নারীকে আশপাশের সবাই দিদি বলছে তবে সে হয়ত মাকেও দিদি বলে ডাকতে শুরু করবে।

উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক এবং ভাষা-তাত্ত্বিক হামবোল্ড (Baran Van Humboldt) বলেছিলেন বাঙময় বলেই মানুষ মানুষ। তারপর থেকে এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে। কাদা ছোঁড়াছুড়িও কম হয় নি। যেহেতু নোয়াম চমস্কি হামবোল্ডের মতবাদের গোঁড়া সমর্থক, তাই হারবার্ট টেরেস (Herbert Terrace) উঠে পড়ে লাগলেন শিম্পাঞ্জীদের কথ্য ভাষা শিক্ষা দিতে এমন কি তিনি শ্লেষ ভরে তাঁর শিম্পাঞ্জীর নামই রেখে ফেললেন "নিম শিম্পাস্কি"। কথ্য ভাষা শেখাতে অপারগ হয়ে গবেষকরা ওয়াশো (Washoe) সারা (Sarah), কোকো (Koko) প্রভৃতি মহা-কপিদের সাংকেতিক ভাষা শেখাবারও চেষ্টা করেছে। তবু চণ্ডীদাসের পদ আজও অম্লান—"সবার উপরে মানুষ সত্য"।

কিশোর বিজ্ঞানীর আসর

সব প্রাণীই আরাম চায়

সাধনানন্দ মণ্ডল*

শুধু যে মানুষই আরাম চায় তা নয়, প্রত্যেক প্রাণীই আরাম চায়। মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী—আর তাই সে জানে সবচেয়ে আরামদায়ক উপায়গুলির কথা—মাথা খাটিয়ে আরাম করার নিত্যনতুন পদ্ধতি বের করতে তার জুড়ি নেই। এই ঘুমের ব্যাপারটাই ধরা যাক। সামর্থ্যে কুলোলে মানুষ তার নিজের জন্য কত রকমের আরামদায়ক বিছানা বানিয়ে নেয় সে কথা তো সকলের জানা। কিন্তু এত বুদ্ধি অন্যান্য প্রাণীদের নেই। কিন্তু তা বলে আরাম না করার মতো নির্বোধ কেউই নয়। যেমন এই বিড়ালগুলি। খড়গাদা ছাড়া বাবুদের ঘুমিয়ে সোয়াস্তি নেই। এরা আবার এত আরাম-প্রিয় যে সুযোগ পেলেই আমাদের বিছানায় গা এলিয়ে দেয়—যারা বাড়ীতে বেড়াল পোষে তারা বেড়ালদের এই শয্যাপ্রীতির কথা নিশ্চয়ই জানে। পোষা বেড়াল বা কুকুর বা অন্যান্য কিছু প্রাণীর কপালে আরাম করার উপায়গুলি বেশ ভালই জুটে যায় মানুষের কৃপায়। কিন্তু সব বেড়াল বা কুকুর বা প্রাণীরা তো আর মানুষের কৃপা পায়না। সুতরাং সেই সব বেচারাদের পরিবেশের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। প্রকৃতির মারফত হাতের কাছে তারা যা পায় তাই দিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়—আরামের যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হয় তাই দিয়েই। ঘুম, শীতঘুম গরমের দিনে ছায়ায় শুয়ে থাকা এগুলি প্রাণীদের আরাম করার সাধারণ পদ্ধতি। এই সব করার

*প্রোফেসরস লেন, শ্রীরূপা রোড, কাঁথি, মেদিনীপুর

আগে প্রাণীরা অনেকে তাদের স্বভাবসিদ্ধ কিছু কিছু কাজ আগেভাগে সেরে নেয়। তার ফলে শরীর এবং মনে তৃপ্তি আসে আর তখন আরামটা বেশ উপভোগ্য হয়। যেমন জিভ দিয়ে গায়ের লোম এবং চামড়া চাটা, চঞ্চু দিয়ে গা চুলকোনো বা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এলোমেলো পালকগুলিকে ঠিকঠাক করা। প্রাণীদের মধ্যে এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া আরও নানাভাবে প্রাণীরা আরাম পেতে চেষ্টা করে। যেমন কোন শক্ত অমসৃণ বস্তুর সংগে গা ঘসে, গা চুলকে, হাইতুলে, রোদ পোহিয়ে, কাদা বা ধুলোবালিতে গড়াগড়ি দিয়ে, স্নান প্রভৃতি করে।

স্তন্যপায়ীরা গা চাটে যাতে তাদের গায়ের লোম এলোমেলো না হয়ে যায় এবং পরিষ্কার থাকে যাতে পরজীবী তাদেরকে আক্রমণ না করতে পারে। গা চাটবার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রকম। কুকুররা বিশেষতঃ মদ্দা কুকুর তাদের সামনের দুপায়ের থাবা এবং যৌনাঙ্গ বিশেষ করে লিঙ্গ চাটে, কৃন্তক দাঁত দিয়ে লোমের গোড়াগুলি কামড়ায়, পেছনের পায়ের নখর দিয়ে গা চুলকোয়। বেড়ালরা শুধু চেটে চেটে তাদের গায়ের লোম পরিষ্কার রাখে, খরগোস জাতীয় প্রাণীরা তাদের কানদুটোকে বিশেষ ভাবে চাটে। এদের ত্বক থেকে একধরনের তৈল জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয় যেটা বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ সৃষ্টিকারী পরজীবীদের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে সমর্থ। খরগোস জাতীয় প্রাণীরা এই তৈলজাতীয় পদার্থটিকে মাঝে মাঝে চেটে চেটে গা থেকে সরিয়ে ফেলে কারণ এই পদার্থটি সূর্যের আলোতে এদের চামড়ায় এক ধরনের জ্বালাধরা অনুভূতির সৃষ্টি করে। কিছু কিছু স্তন্যপায়ীর বিশেষ ধরনের নখর এবং দাঁত থাকে। সেগুলি এদের চিরুণীর কাজ করে। এগুলির সাহায্যে এইসব প্রাণী তাদের চামড়া থেকে পরজীবীদের বেছে ফেলতে পারে। গায়ের মরা চামড়াও এদের সাহায্যে এরা তুলে ফেলতে সক্ষম হয়। আর মাঝে মাঝে এই রকমের নখর এবং দাঁত দিয়ে লোমগুলিকে আঁচড়ানোর ফলে সেগুলি সুবিন্যস্ত থাকে, জটপাকিয়ে যায় না। অনেক স্তন্যপায়ীরা তাদের বাচ্চাদের গা পরিষ্কার করে দেয়। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা, উট ইত্যাদি প্রাণীদেরকে প্রায়ই দেখা যায় তারা তাদের বাচ্চাদের গায়ের লোম চেটে চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। গরু, মোষ, ঘোড়া, গাধার ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই চোখে পড়ে। আর এই জিনিষটা খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায় বাঁদরদের মধ্যে। বিভিন্ন জাতীয় বাঁদরদের মধ্যে এই রকম পরস্পরের গা পরিষ্কার করাটা একটা সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায় একটা বাঁদর অন্য আর একটা বাঁদরের গা আঙ্গুল দিয়ে চুলকিয়ে দিচ্ছে, উকুন বা ওই জাতীয় পরজীবীদেরকে বেছে দিচ্ছে বা লোমের গোড়ায় জমে থাকা ঘামের শুকনো বিন্দুকে তুলে ফেলছে। এই ধরনের কাজের ফলে শরীর পরিষ্কার তো হচ্ছেই তাছাড়া এক ধরনের তৃপ্তি এবং আনন্দলাভও করা যাচ্ছে—সেই সঙ্গে এর মাধ্যমে একটা সামাজিক সম্পর্কও গড়ে উঠছে। বেশ কিছু জাতের বাঁদর দাঁতেরও যত্ন নিতে জানে—মানুষের মত তারাও দাঁত মাজে। বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে তারা তাদের কৃন্তক দাঁতে জমে থাকা ময়লা চেঁচে তুলে ফেলে, দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবারের টুকরো বা কণাকে বের করে। শিম্পাঞ্জীরা তো পরস্পরের দাঁত পরিষ্কার করে দেয়। আমরা যেমন দাঁতন বা ব্রাশ ব্যবহার করি এরাও ঠিক তেমনি ছোট ডাল ভেঙ্গে নিয়ে পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে দাঁতন বানিয়ে নেয়। কখনও কখনও শিম্পাঞ্জীরা আঙ্গুল দিয়েও দাঁত মাজে। কীট-পতঙ্গের মধ্যেও শরীর পরিষ্কার

করার রেওয়াজ আছে—এটাই তাদের আরাম। যেমন প্রায়ই দেখা যায় মাছিরা তাদের সামনের পা জোড়া একসঙ্গে ঘষছে—এতে তাদের পায়ে জমে থাকা ময়লা সাফ হয়ে যায়। মাছিরা এই পাজোড়াকে আবার শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে খুব সাবধানে শরীরের অন্যান্য অংশের ময়লাও ঘষে ঘষে তুলে ফেলে—এত কায়দা আর এত সাবধনতার দরকার অবশ্যই আছে—কারণ পাতলা ডানা, চোখ এবং অ্যানটেনাগুলির যথাসম্ভব যত্ন মাছিকে নিতেই হবে।

পাখীরা তাদের ডানার প্রতি খুবই যত্নবান। শরীরের অন্যান্য অংশের পালকের দিকেও তাদের নজর কমতি কিছু নেই। এরা এদের চঞ্চু দিয়ে খুঁটে খুঁটে ডানার এবং শরীরের অন্যান্য অংশের পালক পরিস্কার করে, এলোমেলো পালককে ঠিকঠাক করে সাজিয়ে নেয়। পালকের যত্ন নেওয়াটাকে পাখীর ক্ষেত্রে প্রসাধনও বলা যেতে পারে, কারণ এই কাজ করার পর পাখীদেরকে কী সুন্দর দেখায়—সাজগোজ করার পর মানুষকে দেখতে যেমন সুন্দর লাগে সেই রকম। পাখীরা তাদের চঞ্চুর আগা দিয়ে পালকের গোড়াগুলি খোঁচায়, পালকের ফাঁকে ফাঁকে মোলায়েম ভাবে চঞ্চুকে চালায়, যার ফলে পালকের নানা অংশে জমে থাকা ময়লা, পরজীবী এবং নানা ধরনের বর্জ্যদ্রব্য শরীর থেকে ঝরে যায়। এ ছাড়া এলোমেলো হয়ে যাওয়া পালকগুলিকে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় পরিপাটি করে। এভাবে পালক খোঁটার সময় পাখীরা তাদের লালা গ্রন্থি এবং পুচ্ছের তলায় অবস্থিত এক ধরণের তৈলজাতীয় পদার্থ পালকে মাখিয়ে নেয়। তার ফলে পালকগুলি জলমুক্ত থাকে—পালক জলমুক্ত থাকলেই পাখীর সুবিধে ; কারণ তাতে পালকগুলি শুকনো থাকবে, ওড়ার সুবিধে তো হবেই, তাছাড়া স্যাঁত-সাঁতে পালকে পরীর খারাপ হবার যে সম্ভাবনা থাকে তার থেকেয় রেহাই পাবে পাখীরা। বক, সারস, টিয়া এবং যে সব পাখীরা ছায়াপ্রধান ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে অভ্যস্ত তাদের পালকে একধরনের সূক্ষ্ম গুঁড়ো গুঁড়ো পাউডারের মত পদার্থ ছড়ানোর ব্যবস্থা থাকে। এই পদার্থটি বক, সারস, মাছরাঙা এবং অন্যান্য মৎসভুক্ পাখীর জন্য খুবই জরুরী। এই ধরনের পাখীদের পালকে মাছের গায়ের আঠালো পিচ্ছিল পদার্থটা লেগে যাবার সম্ভবনা খুবই বেশী আর এই পাউডার জাতীয় পদার্থ ডানার এবং শরীরের অন্যান্য অংশের পালকে লাগিয়ে সেই সব আঠালো পিচ্ছিল ময়লাকে সহজেই এরা ঝেড়ে মুছে ফেলতে পারে। চুলকাটার পর আমরা যেমন ঘাড়ে গলায় পাউডার দিয়ে চুলের টুকরো টুকরো অংশকে ঝেড়ে ফেলি, এও যেন অনেকটা ঠিক সেই রকম।

মানুষ তার গা চুলকোয় জ্বালা ধরা বা ওই রকমের কোন অস্বস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য। চুলকোলে তার তৃপ্তি হয়, আরাম হয়। অন্যান্য স্তন্যপায়ী এবং পাখীরাও গা চুলকোয়। পাখীদের ক্ষেত্রে এটি খুবই সাধারণ ব্যাপার। দেখা যায় পাখীরা প্রায়ই মাথা চুলকোয় ; মাথাই হচ্ছে পাখীর শরীরের একমাত্র অঙ্গ যেখানে সরাসরি তার ঠোঁট পেঁাছায় না। যখন পাখী সোজাসুজি মাথা চুলকোতে চায় তখন সে তার পাকে সরাসরি ডানার নীচ থেকে মাথায় তুলে আনে আর যখন সে এভাবে চুলকোতে চায় না তখন সে তার পাকে ডানার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে অথবা ডানা এবং শরীরের মধ্যবর্তী অংশ থেকে বাঁকিয়ে মাথার কাছে এনে চুলকোয়। অবশ্য বেশীর ভাগ পাখীই পাকে মাথা চুলকোবার সময় সোজাসুজি মাথায় তুলে আনে—এটাই তার পক্ষে বেশী সুবিধাজনক। চুলকোবার ধরণটা আবার

পাখীরা প্রজাতি এবং পরিবার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং কিছু সংখ্যক পক্ষীবিজ্ঞানী দাবী করেন যে তাঁরা মাথা চুলকোবার এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে বিভিন্ন পক্ষীপ্রজাতির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যান্য প্রাণীরা চুলকোবার কাজে অনেক সময় তাদের নখর এবং পেছনের পাগুলিকে ব্যবহার করে, বিশেষতঃ মাথা এবং কখনও কখনও বুকের দু-পাশ এবং পিঠের কিছু অংশ চুলকোবার সময়, যেমন কুকুররা চুলকোয়। মাথা এবং দেহের বেশীর ভাগ অংশ চুলকোবার জন্য ছোট স্তন্যপায়ীরা প্রায় সবসময়ই পেছনের পা-দুটিকে কাজে লাগায়। বড় বড় স্তন্যপায়ীরা চুলকোবার জন্য গাছের গুড়ি, পাথর বা উইঢিপিতে গা ঘষে।

হাই তোলার সময় আমাদের ফুসফুস বাতাসে পূর্ণ হয় এবং অবসাদ দূর হয়। ফুসফুস থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে চলে যায়। তখন অক্সিজেনযুক্ত রক্তকে হৃৎপিণ্ড পাম্প দিয়ে শরীরের বিভিন্ন পেশীতে পাঠিয়ে দেয়, তার ফলে পেশীদের অবসাদ কিছুটা লাঘব হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় রক্ত-প্রবাহের হার কমে যায়, রক্তের মধ্যে কার্বন-ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে রক্ত কিছুটা ভারী হয় এবং তার ফলে রক্ত সংবহনের হার কমে যায়। ঘুমভাঙ্গার পর সকালে যখন আমরা হাই তুলি তখন শরীরে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। উত্তেজিত হলে বা শত্রুর সামনে পড়লে বা খাদ্যবস্তু সামনে দেখলে মাছেরাও হাই তোলে। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যখনই শারীরবৃত্তীয় কাজে দ্রুতগতি আনার দরকার হচ্ছে তখনই হাই তোলার প্রয়োজন হচ্ছে। হাইতোলার ফলে পেশীগুলি সত্বর শক্তি পাওয়ার জন্য উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ঘুম পাবার আগেও আমরা হাই তুলি অনেক সময়। এর কারণটাও সেই একই। ঘুম পাওয়ার অর্থই হল পেশীগুলি অবসন্ন হয়ে আসছে—তারা বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু কোন কারণে হয়তো আমরা তখনই ঘুমোতে চাইছি না বা পারছি না। তখন হাই তুলে পেশীগুলিতে বেশী পরিমাণে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত করিয়ে আমরা তাদের চাঙ্গা করে তুলতে চাই। প্রাণী-জগতে অবশ্য আর এক ধরনের হাইতোলা দেখা যায়। যেমন জলহস্তীর হাইতোলা। যখন এই প্রাণীটি তার বিশাল মুখগহ্বর হাঁ করে তখন বুঝতে হবে যে সে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

স্নান করাটা পাখীর জীবনের সঙ্গে যেভাবে জড়িত তেমনটা অন্যান্য আর কোন প্রাণীর জীবনের সঙ্গে নয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছু কিছু সাপ জলে গা ডুবিয়ে শুয়ে থাকে, সম্ভবতঃ শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য বা প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে দেহকে রক্ষা করার জন্যই। দেখা যায় কিছু কিছু গৃহপালিত কুকুরও জলের ভেতর নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এইসব প্রাণীর ক্ষেত্রে স্নান করাটা জরুরী নয়। তবে হাতীর স্নান করাটা একটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জলচর পাখীরা ভেসে বেড়াতে বেড়াতে মাঝে মাঝে মাথা এবং গলা জলে ডুবিয়ে দেয়। তারপর মাথা তুলে পিঠের ওপর দিয়ে সর্বাঙ্গে জল ছড়িয়ে দেয়। তারা ডানা দুটিকে মেলে দিয়ে জলের ঝাপটা দেয় আর তার ফলে জল ছিটিয়ে পড়ে সারা পিঠের ওপর। প্রায়ই দেখা যায় ডানাদুটিকে পাখীরা একই সঙ্গে ঝাপটায় না—একটার পর অন্যটাকে ঝাপটায়। কখনও দেখা যায় জলচর পাখীরা জলে ডুব দিয়ে ভুস্ করে উঠে পড়ছে। পাখীদের স্নান করাটা বেশ দেখার ব্যাপার। ডানার ঝট্পটানি, বার কয়েক ডুব দেওয়া, সারা গায়ে জল ছেটানো সব মিলিয়ে ব্যাপারটা বেশ দর্শনীয়। স্থলচর পাখীরা স্নান

সারে সাধারণতঃ অগভীর জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারা লেজটাকে জলের ওপর তুলে ধরে মাথা আর গলাটাকে জলে ডুবিয়ে দেয়, তারপরে লেজ এবং শরীরের পেছনের অংশটাকে ডুবিয়ে দেয় জলে, মাথাটাকে জলের ওপর তুলে ধরে। বার কয়েক এরকম করার পর পাখীরা তাদের সর্বাঙ্গের পালকগুলিকে ফুলিয়ে নেয় আর ডানাদুটিকে মেলে দিয়ে খুব জোরে জোরে জলের ওপর ঝাপ্‌টা দেয়। জল ছিটিয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। স্নান করার ফলে শরীরে বেশ স্বস্তি আসে, মনে আসে আনন্দ। আমরা তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে যে যেমন পারি গুন্‌ গুন্‌ করে গান করি যাকে রসিক জনে নাম দিয়েছে—"বাথরুম সঙ্গীত"। পাখীদের বেলাতেও ঠিক তাই। স্নানের সময় দেখা যাবে তারাও আনন্দে চিৎকার করেছে জলছিটিয়ে। পুকুরে প্রায়ই দেখা যায় জলছিটিয়ে হাঁসরা চিৎকার করছে প্যাঁক প্যাঁক করে প্রায়ই চোখে পড়ে ফিঙে, চাতক, শালিক পাখী স্নানের আনন্দে কলরব করতে করতে স্নান সেরে ফর্‌ ফর্‌ করে উড়ে চলে যাচ্ছে। যদিও পাখীরা স্নান করার সময় এইভাবে ডুবদেওয়া, ডানা ঝাপ্‌টানো প্রভৃতি কাজগুলোকে দ্রুত এবং জোরে জোরে করে তবুও তারা খুব সতর্ক হয়েই এসব কাজ করে, তাদের কড়া নজর আছে পাছে ডানা এবং পালকের ক্ষতি হয়ে যায়। এই ভাবে জলছিটিয়ে ডানা ঝাপ্‌টিয়ে স্নান করার কারণ অবশ্যই রয়েছে। এর ফলে পালকগুলি খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। তার ফলে ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে গ্রন্থি থেকে তৈলাক্ত পদার্থ এবং পাউডার জাতীয় পদার্থ পালকে মাখিয়ে নেওয়াটা সহজ এবং সুন্দর ভাবে হতে পারে। স্নানের পর এবার পালক শুকোবার পালা। জলচর পাখীরা ডানাগুলি মেলে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে পালকের জলবিন্দুকে ঝেড়ে ফেলে। স্থলচর পাখীরা স্নান সেরে জল থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসে। চঞ্চু দিয়ে পালকের মধ্যে জমে থাকা জল টেনে বের করে দেয়। তারপর সারাদেহে ঝাঁকুনি দিয়ে বাকী জল ঝেড়ে ফেলবার কাজ। কিছু কিছু পাখী আছে যারা শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে জলে স্নান করে না। ধুলোতে স্নান করে। ধুলোর মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাটির কণা এবং বালি। এদের সাহায্যে এই সব পাখী তাদের পালকের ময়লা ঝেড়ে মুছে সাফ করে ফেলে। ধুলোয় স্নান করে মুরগী, ভরতপাখী, চড়ুই পাখী, বাস্টার্ড, হর্নবিল ইত্যাদি পাখী। এরা প্রথমে শুকনো মাটিতে ঠোঁট এবং পায়ের নখ দিয়ে ক্রমাগত আঁচড় কেটে ধুলো বার করে। তারপর সারাদেহের পালকগুলিকে ফুলিয়ে নেয়। আর ডানা দিয়ে ঝাপ্‌টা দিয়ে দিয়ে সর্বাঙ্গে ধুলো ছড়িয়ে দেয়। ধুলো মেখে স্নান করার তাৎপর্য কী সে সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা গেছে। তৃপ্তি ছাড়া অন্যান্য উপকারের মধ্যে সম্ভবতঃ এটাই হতে পারে যে এভাবে ধুলো মেখে স্নান করার ফলে চামড়া এবং পালকগুলি পরজীবীর হাত থেকে রক্ষা পায়। অনেক প্রাণী আবার ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। এর তাৎপর্য যদিও জানা যায়নি তবু ঘোড়া, গাধা, জেব্রা এবং গৃহপালিত কুকুরের মধ্যে এই আভাস দেখা যায়। সারা শরীরে এবং পায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে জোরে এই সব প্রাণী ধুলোতে গড়াগড়ি দেয়। তবে ধুলোর মধ্যেও থাকতে পারে অনেক পরজীবী। এভাবে ধুলো মাখার ফলে তাদের হাত থেকে এইসব প্রাণীর কিভাবে অব্যাহতি পায় তা আজও জানা নেই। জলে স্নান করা বা ধুলোতে গড়াগড়ি দেওয়া এ দুটির কোনোটাতেই সরীসৃপ এবং উভচররা অভ্যস্ত নয়। তার কারণ হল এই সব প্রাণী কিছুদিন

অন্তর অন্তর তাদের খোলস পাল্টায়। অর্থাৎ এদের দেহ থেকে পুরানো চামড়া খসে গিয়ে নতুন চামড়া গজায়।

রোদ পোহানোটাও প্রাণী-জগতে আরাম করার একটা পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এনিয়ে প্রাণীদের আচরণ সম্পর্কিত গবেষণা এ পর্যন্ত খুব কমই হয়েছে। উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন কোলাব্যাঙ এবং সোনাব্যাঙ গায়ের চামড়া শুকিয়ে গেলে বিপদ হতে পারে, সেজন্য এরা কখনও কখনও রোদ পোহায়। কিন্তু সরীসৃপেরা রোদ পোহানোতে অভ্যস্ত। যেমন সাপরা রোদ পোহায়। স্ত্রীসাপের জন্য তো সূর্যের উত্তাপ এবং আলো খুবই জরুরী, বিশেষতঃ তার প্রজনন-সময়ের আগে এবং অন্ততঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে। সূর্যের আলো এবং উত্তাপের সহায়তায় স্ত্রীসাপের ডিম্বাশয় স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ডিম্বাণুগুলিকে পরিপক্ক হতে সাহায্য করে। গিরগিটি এবং টিকটিকি জাতীয় প্রাণীরা প্রায় সকলেই রোদ পোহানোতে দারুণ অভ্যস্ত। শীতকালের নদীর চরায়, খালের ধারে সুন্দরবনের কুমীররা চার পা ছড়িয়ে রোদ পোহায়। শীতের দিনে চিড়িয়াখানায় গেলেও দেখা যাবে কুমীররা কেমন সারাদিন ধরে রোদ পোহাচ্ছে। এরা সারা শরীরে রোদ লাগাতে ভালোবাসে। আর স্তন্যপায়ীদের রোদ পোহানো তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এটা এদের কাছে আনন্দদায়ক ব্যাপার তো বটেই।

স্নান করার নানা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক স্তন্যপায়ী কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে বা সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে বসে সময় কাটাতে ভালবাসে। এর কারণ হল গায়ের চামড়ায় কাদার আস্তরণ থাকলে কীট-পতঙ্গ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় সবচেয়ে ভালভাবে। তাছাড়া অনেক পরজীবীরা এইসব প্রাণীর দেহ থেকে কাদার সাথে সরে যায়। প্রায়ই দেখা যায় শুয়োররা, মোষরা খানাডোবার কাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রয়েছে। গণ্ডাররাও কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেতে ভালবাসে। দেখা গেছে যাদের গায়ের চামড়া পুরু সাধারণতঃ তারাই এইভাবে কাদার মধ্যে গড়াগড়ি খেতে পছন্দ করে। নিশ্চয়ই এতে এদের তৃপ্তি এবং আনন্দ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক প্রাণীরই আরাম করার জন্য নিজস্ব একটা উপায় রয়েছে। অবশ্যই এই উপায়গুলি এইসব প্রাণীর আকৃতি, প্রকৃতি এবং যে পরিবেশে এরা থাকতে অভ্যস্ত সেই পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এরা স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বংশপরম্পরায় পেয়ে আসছে। স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে গেলে আরাম চাই বৈকি। তবে বেশী আরাম নিশ্চয়ই "হারাম হ্যায়" অন্তত: মানুষের ক্ষেত্রে তো বটেই।

অজৈব লবণ চিকিৎসা

গিরিশঙ্কর দাস*

জীব শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রয়োজনীয় পুষ্টির উপাদানগুলি রক্তই পৌঁছে দেয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে সেই রক্ত জল, জৈব পদার্থ এবং অজৈব লবণে গঠিত।

জৈব পদার্থ বলতে আমরা বুঝি চিনি, চর্বি ও প্রোটিন। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত চিনি ও চর্বি। প্রোটিনে আছে—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও তদুপরি নাইট্রোজেন ও সালফার। অজৈব লবণের মধ্যে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি ছাড়া অল্প পরিমাণে লোহা, তামা, দস্তা, আয়োডিন, কোবাল্ট ইত্যাদি আরো কিছু উপাদান আছে যাকে লেশ-মৌল (Trace Element) বলা হয়। এই সব অজৈব লবণ বিভিন্ন জৈব ও অজৈব বস্তুর সঙ্গে যৌগ আকারে উপস্থিত থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে এই সব অজৈব লবণের পরিমাণ যদিও জৈব-বস্তুর পরিমাণের তুলনায় অনেক কম তবুও তাদের ভূমিকা শরীর গঠনে বা রক্ষায় অপরিসীম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের সময় থেকে ইউরোপ, আমেরিকার কোন কোন বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক ঘোষণা করেন যে—মানবদেহ যে সকল উপাদানে গঠিত সেই সব উপাদানই মানবদেহের রোগ নিরাময়ে সক্ষম। এই ধরণের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মন্তব্যকে একত্রে গ্রথিত করে একটি সুসংবদ্ধ রচনা রোম নগরীর অধ্যাপক মলেস্কট (Prof. Moleschott) তাঁর 'জীবন বৃত্ত' (Kreislauf des Lebens) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। সেই গবেষণামূলক রচনাই ডাঃ শুসলারকে উদ্দীপ্ত করে তোলে—মানবশরীরে ক্রিয়াশীল অজৈব লবণ সমূহ দ্বারা রোগ নিরাময়ের এক সহজ প্রাকৃতিক-নিয়মানুসারী পদ্ধতি আবিষ্কারে।

এখানে প্রসঙ্গত ডাঃ শুসলারের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা যাক। 1821 খৃঃ 21শে আগস্ট জার্মানীর অন্তর্গত অল্ডেনবার্গ শহরে ডাঃ উইলহেম হেনরিক শুসলার জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। ভাষাতত্ত্বে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি ফরাসী, স্প্যানিস, ইতালীয়, ইংরাজী ছাড়া ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। জানা যায়, ভাষাতত্ত্ব চর্চার প্রয়োজনে তিনি সংস্কৃত ভাষারও অনুশীলন করেছিলেন।

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যার সাথে তিনি হোমিওপ্যাথির চর্চা করেন ও 1857 খৃঃ চিকিৎসার সরকারী ছাড়পত্র অর্জন করেন। অল্ডেনবার্গ শহরে দীর্ঘ 17 বছর তিনি সুনামের সাথে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করেন। ঐ সময়ে অর্থাৎ 1872 খৃঃ নাগাদ অধ্যাপক মলেস্কট-এর রচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি কেবলমাত্র বারোটি অজৈব লবণের সাহায্যে যাবতীয় রোগ

*'স্ট্যাডিজ', 22, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-700009

নিরাময়ে প্রবৃত্ত হন। 1873 খৃঃ মার্চ মাসে এই নব আবিষ্কৃত পদ্ধতির কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার 4/5 মাস পরে লিপজিগের ডাঃ লারবাচার ডাঃ শুসলারের ঘোষণাকে অস্বীকার করে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠান। তখন শুসলার পুনরায় 'সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা পদ্ধতি' (Abridged System of Therapeutics) শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে তাঁর গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁর রচনার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন ডাঃ লুটিশ্। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ডাঃ শুসলারের সমর্থনে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, গবেষক ও লেখক কন্স্টেনটাইন হেরিং এবিষয়ে একটা ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। এইভাবে বহু বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে কালক্রমে শুসলারের মতবাদ ও চিকিৎসাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠালাভ করে।

1898 খৃ অবিবাহিত অবস্থায়, সাতাত্তর বছর বয়সে এই মহান ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। তাঁর গুণগ্রাহী অনুরাগদের রচনায় জানাযায় নির্লোভ এই পুরুষের সত্যে অবিচল নিষ্ঠা থাকায় কোন কোন সময়ে তাঁর স্পষ্টবাদিতা কঠোর ভাষণে পরিণত হত।

জীবদেহ, আমরা জানি, অজস্র জীবকোষদ্বারা গঠিত। শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জীবকোষ বর্তমান। রক্ত এই সব জীবকোষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বহন করে আনে। জীবকোষগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদানগুলি গ্রহণ করে বাকী অংশ বর্জন করে। আমরা যা আহার করি তার মধ্যে থেকেই শরীররক্ষার সর্বপ্রকার উপাদান রক্তের মাধ্যমে গ্রহণ করে জীবকোষ। জীবকোষের এই গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রাকৃতিক নিয়মে হয়।

এই প্রক্রিয়া যদি কোন কারণে বিঘ্নিত হয় অথবা যদি কোন কারণে অপ্রয়োজনীয় বা বিষাক্ত কোন রক্তবাহিত বস্তু গ্রহণে জীবকোষ বাধ্য হয় তবে অনিবার্যভাবে শারীরযন্ত্রের বিঘ্ন ঘটে জীবদেহে তাপ, বেদনা বা অন্য বহুপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় যদি জীবদেহের জীবনীশক্তি স্বক্ষমতায় (auto mechanisum) সেই বিকৃতির নিরসন ঘটাতে পারে তবে জীবদেহে রাসায়নিক ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বোক্ত লক্ষণ সমূহ দূর হয়।

আবার যদি জীবদেহ স্বক্ষমতায় এই সামঞ্জস্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করতে পারে তবে জীবদেহ অন্ধ জৈবিক তাড়নায় তার পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাহায্যে ঐ সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হয়। এই অন্ধ প্রচেষ্টা আমরা মনুষ্যেতর প্রাণী-জগতে প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি। আর মানুষের ক্ষেত্রে এখানেই আসে সচেতন প্রচেষ্টায় ঔষধ সংগ্রহের ভূমিকা।

এখানে বলা দরকার রক্তের উপাদান বা বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপাদানরূপে জীবশরীরে বিভিন্ন অজৈব লবণের যৌগের উপস্থিতি ও পরিমাণ বহু পূর্বেই জানা ছিল। কিন্তু ডাঃ শুসলারের চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে রোগনিরাময়ের জন্য এই জ্ঞান ইতিপূর্বে কাজে লাগানো যায় নি। যাই হোক এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে যে বারোটি যৌগ ব্যবহার হয় তাদের মধ্যে পাঁচটি ফসফেট, দুটি ক্লোরাইড, তিনটি সালফেট একটি ফ্লুওরাইড এবং সিলিকা। এই বারোটি লবণের নাম, ব্যবহার ও অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় চার্ট আকারে নীচে দেওয়া হল—

	অজৈব লবণের নাম	মূলত শরীরের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বর্তমান	সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ব্যবহার
1.	ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা। Cal. Fluor. CaF_2	দাঁত, অস্থি, স্থিতিস্থাপক তন্তুচয় ইত্যাদি	স্থিতিস্থাপক তন্তুর শৈথিল্য বা কাঠিন্য হৃদপিণ্ডের বৃদ্ধি, যে কোন কঠিন স্ফীতি, দাঁত ও হাড়ের পীড়া।
2.	ক্যালকেরিয়া ফস Cal, Phos. $Ca_3(PO_4)_2$	দাঁত, অস্থি, রক্ত, অন্তপালিক পদার্থ ইত্যাদি	সর্বাঙ্গীন শরীর ব্যবস্থায়। ডাঃ এফ, ডব্লু, পাওয়েল বলেন—চুন যেমন ভূমিকে মধুময় করে এই লবণ তেমন সমগ্র মানবতন্ত্রকে মধুময় করে।
3.	ক্যালকেরিয়া সালফ্। Cal Sulph. $Ca\ SO_4$	চুল, চামড়া, পিত্তরস ইত্যাদি	উদরাময়, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়ের পীড়া সংযোজক তন্তু। পুঁজ উৎপাদন ও নিবৃত্তিতে কার্যকরী।
4.	পটাসিয়াম ফস। Kali Phos. $K_2\ HPO_4$	রক্ত, মস্তিষ্ক, নার্ভ ও পেশী সমূহ	স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও পুষ্টি, হৃদপিণ্ড ও মানসিক বিভিন্ন রোগে অবশ্য প্রয়োজন।
5.	পটাসিয়াম সালফ্। Kali Sulph. $K\ SO_4$	উপাস্থি, মূত্র, চামড়া, পাকস্থলীর রস ইত্যাদি	যে কোন চর্মপীড়া। উচ্চতাপ, ঘর্মহীনতা। বিপাকীয় বিকৃতি—
6.	পটাশিয়াম, ক্লোরাইড Kali mur K Cl.	রক্ত, মস্তিষ্ক, পেশী, লালা, পাচকরস ইত্যাদি	উদরাময়, চর্মরোগ, কোমল স্ফীতি, সর্দি, বাত, পিত্তাল্পতা।
7.	সোডিয়াম ফস। Nat. Phos. $Na_2\ HPO_4,\ 12H_2O$	পাচকরস, রক্ত, পেশী মস্তিষ্ক, নার্ভ ইত্যাদি	অম্বল, বাত, উদরাময়, ক্রিমি বা চর্মরোগে ব্যবহার্য
8.	সোডিয়াম সালফ্। Nat. Sulph. $Na_2SO_4,\ 10H_2O$	পিত্তরস, উপাস্থি, ঘাম মূত্র ইত্যাদি	যকৃত ও বৃক্কের যে কোন রোগ। বসন্ত ও কলেরার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। পিত্তাধিক্য।

অজৈব লবণের নাম	মূলত শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বর্তমান	সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ব্যবহার
9. সোডিয়াম ক্লোরাইড। Nat. mur. Na Cl.	শরীরের যাবতীয় কঠিন ও তরল বস্তুতে বর্তমান।	রক্তাল্পতা ও অপুষ্টিতে অমৃততুল্য। শরীরের যে কোন তরল ও কঠিন বস্তুর বিকৃতিতে—
10. ম্যাগনেশিয়া ফস্। mag Phos. $Mg\ HPO_4$, $7H_2O$	মস্তিষ্ক, নার্ভ, পেশী হাড়, দাঁত ইত্যাদি	আক্ষেপিক বেদনা, হিক্কা, উদরাময়, নার্ভ ও পেশীর পীড়ায়।
11. আয়রন বা ফেরাম ফস Ferr Phos. $Fe_2(PO_4)_2$	রক্ত, পাচকরস, মূত্র	জ্বর, রক্তস্রাব, বাত, আন্ত্রিক পীড়া ইত্যাদি
12. সিলিকা বা সাইলিসিয়া Silicia SiO_2	চামড়া, নখ, চুল, সংযোগকারী তন্তু ইত্যাদি	নখ, চুল, ফোঁড়া কার্বাংকল্, বাত পক্ষাঘাত ইত্যাদি

ওপরের চার্ট অনুসারে এই বারোটি অজৈব লবণ দেহস্থ জৈব পদার্থের সাথে উপযুক্ত অনুপাতে মিশে দেহের বিভিন্ন কোষ সমূহের প্রস্তুতির ও রক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করে। যেমন কালি মিউরের সাহায্য ছাড়া মস্তিষ্ক কোষ বা পেশীকোষ তৈরি সম্ভব নয়। শরীরের প্রতিটি কোষেই নেট্রাম মিউরের অপরিসীম প্রভাব। ফেরাম ফস-এর উপস্থিতি ছাড়া রক্তকণিকা গঠিত হতে পারে না। হাড়, দাঁত, রক্তে ক্যালকেরিয়া ফস অবশ্য প্রয়োজন। আবার চামড়া, চুল, নখ ইত্যাদিতে সাইলিসিয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য।

এইসব অজৈব-লবণ আমরা স্বভাবতঃ খাদ্য পানীয়ের সাথে আত্মস্থ করি। আবার আমাদের আহার্য বস্তু রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌছে পেশী, মাংস, হাড় মজ্জা, চামড়া, চুল, নখ ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং এই ভাবেই শরীরের রাসায়নিক ভারসাম্য রক্ষা হয়।

কিন্তু এই রাসায়নিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার কারণ সাধারণতঃ হয় আহার্যের স্বল্পতা অথবা অনুপযুক্ত আহার্য গ্রহণ। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাহ্যিক কারণও এই ভারসাম্যের হানি ঘটাতে পারে। বিজ্ঞানের নামে আজ মানুষ বিভিন্ন ভাবে তার পরিবেশ যথেচ্ছ কলুষিত করছে।

এই পরিবেশ কলুষণের ফলে অনিবার্যরূপে কলুষিত হয়ে পড়ছে তার খাদ্যসামগ্রী। বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফল স্বরূপ যে কোষ বিকৃতি ঘটছে তাতে শরীরস্থ অজৈব লবণের ভারসাম্যও বিপন্ন হয়ে পড়ছে। স্বভাবতই তখন ভারসাম্যহীন অজৈব লবণগুলির সাথে সম্পর্কিত জৈব পদার্থগুলিও অকার্যকরী হয়ে পড়ে এবং কোন না কোন সময়ে শরীরের পক্ষে অহিতকর হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় এক বা একাধিক শক্তিকৃত (Potentised) অজৈব লবণ যদি রক্তপ্রবাহের সাথে জীবকোষে পেঁাছে দেয়া যায়, তবে দেখা গেছে, পুনরায় দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

অজৈব-লবণ চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা বর্তমান ; যেমন—(1) অজৈব-লবণ চিকিৎসা আসলে অভাব পূরণ পদ্ধতি মাত্র। (2) এই পদ্ধতিতে রোগ নিরাময় হয় না, কেবল সাময়িক উপশম হয়। (3) এই চিকিৎসা পদ্ধতি আসলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্গত। সাধারণত যারা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী তারাই এসব মন্তব্য করেন। অ্যালোপ্যাথরা অবশ্য এ ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। এই মন্তব্যগুলি আলোচনার যোগ্য।

(1) কেবলমাত্র অভাব পূরণ পদ্ধতি হলে এই চিকিৎসায় প্রথমেই জানা প্রয়োজন অভাবের পরিমাণ কতখানি এবং সেই পরিমাণ লবণই শরীরে প্রয়োগ করা বিধেয়। কিন্তু সেই পরিমাণ নির্ধারণ করে ঔষধের প্রয়োগ এ চিকিৎসায় হয় না। তাছাড়া পরিমাণটাই যদি এক্ষেত্রে মূল কথা হত তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ প্রয়োগ অবশ্যই জটিলতা বৃদ্ধির সহায়ক হত। কিন্তু সাধারণত পরিমাণের হেরফের এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে কোন জটিলতা সৃষ্টি করে না।

পূর্ব আলোচনায় বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় অজৈব লবণের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার জীবকোষ সমূহে যখন বিকৃতি ঘটে তখন জীবনীশক্তি স্বক্ষমতায় সেই বিকৃতিকে কোন কোন ক্ষেত্রে রোধ করতে পারে। কিন্তু অভাব পূরণের প্রয়োজনটাই যদি মুখ্য হত তাহলে প্রয়োজনীয় ঘাটতি লবণটুকু না পাওয়া পর্যন্ত বিকৃতি রোধের ক্ষমতা জীবকোষ কি করে পায় ? সুতরাং জীবকোষের এই উদ্দীপনের ব্যাপারটাই মুখ্য—গৌণ ব্যাপার হল উদ্দীপনের সহায়তার জন্য অজৈব লবণের ব্যবহার। আসল কথা হল প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অজৈব লবণ সূক্ষ্ম মাত্রায় যোগান পাওয়ায় দেহস্থ কোষসমূহ একবার যখন সতেজ হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তারা পরবর্তীকালে আহার্য বা পানীয় দ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় লবণসমূহ নিষ্কাশিত করার ক্ষমতা পুনঃঅর্জন করে।

(2) অজৈব-লবণ চিকিৎসার চর্চা যে সব চিকিৎসক করেছেন তাঁদের কেসহিস্ট্রী পর্যালোচনা কালেই বোঝা যাবে—সাধারণ রোগ ত বটেই বহু চিররোগের (Chronic Disease) রোগীও এই পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হয়ে নিরাময় হয়েছেন। বিদেশে ডাঃ উইলিয়াম বোরিক, ডাঃ ডিউই, ডাঃ ক্যারে বা ডাঃ এডওয়ার্ড পিয়েরী, কলকাতায় ডাঃ সামন্ত ও ডাঃ বিজয় বসু বা ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস বা ম্যাঙ্গালোরে ডাঃ ফাদার মুলার এঁদের নথিভুক্ত কেসহিস্ট্রীকে অবিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। যদি কখনো কেউ ব্যর্থ হয়ে থাকেন, বুঝতে হবে তার জন্য দায়ী এই পদ্ধতি নয় দায়ী তার ব্যক্তিগত অক্ষমতা।

(3) ডাঃ শুসলারের বহু পূর্বে মহাত্মা হ্যানিমান একাধিক অজৈব লবণ নিজ দেহেই পরীক্ষা করে "Like cures Like" হোমিওপ্যাথির এই সুবর্ণ সূত্রের Golden Rule ভিত্তিতে রোগ নিরাময় করেছেন। এ প্রসঙ্গে ডাঃ শুসলার সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞাসা করেন "হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত বহু ঔষধ অ্যালোপ্যাথরা তাঁর বহু পূর্বেই ব্যবহার করেছেন, সেক্ষেত্রে ঐসব ঔষধের ব্যবহারে কি হোমিওপ্যাথিক নয়?" তিনি বলেন "কোন্ ঔষধের ব্যবহার হল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল কোন্ তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সেই ঔষধ ব্যবহৃত হল। এর থেকে নির্ণীত হত কোন্ চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার হল। সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত দুটি চিকিৎসা ব্যবস্থা কি করে একটি অপরটির অন্তর্গত হয় তা বোঝা যায় না"।

হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র "Similia Similibus Curentur"-এর ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন জৈব, উদ্ভিজ্জ, খনিজ বা বিষজাতীয় বিচিত্র (Heterogenious) বস্তু জীবদেহে প্রয়োগ করে রোগ নিরাময় করা হয়। অন্যদিকে অজৈব-লবণ চিকিৎসার মূল ভিত্তি জীবদেহের অন্তর্গত সমধর্মী (Homogenious) ক্রিয়াশীল লবণ সমূহের সাহায্যে শারীর রসায়নের সমতা রক্ষা করা বা জীবকোষের বিকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। মহাত্মা হানিম্যানকে যদি সর্বপ্রথম যুক্তিনির্ভর চিকিৎসাশাস্ত্রী হিসাবে বরণ করতে হয় তাহলে মহাত্মা শুসলারকেও সর্বপ্রথম কোষ-প্রযুক্তিবিদ বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

প্রসঙ্গত আরো একটা কথা লেখা প্রয়োজন, ইদানীংকালে বিদেশে ডাঃ ভনডারগজ এবং ডাঃ পাওয়েল অজৈব লবণ চিকিৎসার ওপর একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁরা ডাঃ শুসলারের বারোটি লবণ ছাড়া একাধিক লবণ (খনিজ ও লেশ-মৌল) ব্যবহারের পক্ষপাতী। ভনডারগজ 82টি এবং পাওয়েল 30টি অতিরিক্ত লবণ ব্যবহারের কথা বলেন। কিন্তু আমাদের স্বনামধন্য ডাঃ ইউ, এম, সামন্ত, যিনি আজীবন চিকিৎসাক্ষেত্রে অজৈব লবণের চর্চা করে গেছেন তাঁর মতে বারোটি অজৈব লবণের সাহায্যেই যাবতীয় নিরাময়যোগ্য রোগের চিকিৎসা সম্ভব। অবশ্য ডাঃ শুসলার শেষ জীবনে এগারোটি লবণ ব্যবহার করতেন। ক্যালকেরিয়া সালফের পরিবর্তে নেট্রাম ফস ও সাইলিশিয়া ব্যবহারেই প্রার্থিত ফল পাওয়া যায় বলে তিনি ঘোষণা করেন—যদিও তাঁর অনুগামীরা ক্যালকেরিয়া সালফের আশ্চর্য রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার জন্য ঐ লবণটিকে পরিত্যাগ করেন নি। বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের সীমিত জ্ঞানও বলে যে ডাঃ শুসলার নির্ধারিত বারোটি লবণের ব্যবহারই শতকরা নিরানব্বইটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

মাত্র বারোটি ঔষধের ক্রিয়া ক্ষমতা জানা থাকলে সাধারণ শিক্ষিত মানুষ শারীরতত্ত্বের গভীর জ্ঞান ছাড়াও এই চিকিৎসা পদ্ধতির চর্চা করতে পারেন। খুবই দুঃখের কথা অজৈব লবণ চিকিৎসা আজও আমাদের দেশে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ গ্রামগঞ্জ তো দুরস্থান, শহর, বা শহরতলীর নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে আজও চিকিৎসার আশা প্রায় মরীচিকার মত। গ্রামের জন্য শিক্ষিত চিকিৎসকের অভাবে সরকার কখনও 'খালি পা ডাক্তার' কখনও 'হাফ ডাক্তার' তৈরির প্রকল্প হাতে নিচ্ছেন। কিন্তু যদি তারা 'অজৈব লবণ চিকিৎসা' পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ মাধ্যমিক শিক্ষিত যুবকদের দু-বছরের শিক্ষাক্রমে শিক্ষিত করে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন মনে হয় তাতে অধিক সুফল পাওয়া যেত।

1981 সালের ক্যালেণ্ডার

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত*

3	4	0
6	0	3
6	2	5
2	5	1

উপরে যে ছকটি কাটা হল সেটির মধ্যে রয়েছে বারোটি খোপ। বারোটি খোপের মধ্যে রয়েছে বারোটি সংখ্যা। এগুলি 1981 সালের প্রত্যেক মাসের সংখ্যা। সংখ্যাগুলি এমনভাবে লেখা যে 1981 সালের কোন মাসের কোন তারিখ মনে করলে সেই তারিখটি কি বার তা জানা সম্ভব। মনে কর, তুমি ফেব্রুয়ারী মাসের তের তারিখ কি বার তা বের করবে। তখন ছকটির প্রথম স্তম্ভের দ্বিতীয় খোপ-এর সংখ্যা ছয়-এর সঙ্গে তের যোগ কর। তারপর যোগফলটিকে সাত দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে পাঁচ। তখন তুমি এক তারিখ সোমবার ধরে গুণতে শুরু করে পাঁচ পর্যন্ত আসবে। পাঁচ পর্যন্ত আসার পরে দেখা যাবে দিনটি ছিল শুক্রবার। আবার কোন মাসের কোন তারিখের সঙ্গে খোপের মধ্যে লেখা সেই মাসের সংখ্যা যোগ করে সেই যোগফলকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যদি কোন অবশিষ্ট সংখ্যা না থাকে তাহলে সেটি রবিবার। যেমন মনে কর, নভেম্বর মাসের নয় তারিখ। তারিখটির সঙ্গে ছকে লেখা নভেম্বর মাসের সংখ্যা পাঁচ যোগ কর। যোগফলকে সাত দিয়ে ভাগ করলে আর কোন অবশিষ্ট থাকছে না। তখন সেটি রবিবার।

*মধ্যমগ্রাম, 24 পরগণা

প্রশ্ন ও উত্তর

(ক)

প্রশ্ন : (1) কাঁচা হলুদ খাওয়া এবং হলুদ বাটা গায়ে মাখা কি শরীরের পক্ষে ভাল ?

(2) কাঁচা পাউরুটি খেলে কি শরীরের কোন ক্ষতি হয় ?

রবীন্দ্রনাথ দাস
বহিলাপাড়া, বর্ধমান

(3) মরণের আগে ও পরে মানুষের ওজনের কোন পার্থক্য হয় কি ?

তারকচন্দ্র দে
সোদপুর

(4) নিয়মিত হাঁসের ডিম খেলে নাকি বাত হয়, কথাটি কি ঠিক ?

পতিতপাবন প্রামাণিক
রামপুরহাট, বীরভূম

(5) প্রত্যহ টি. ভি. দেখলে কি চোখের ক্ষতি হয় ?

চম্প সাউ
জঙ্গীপাড়া, হুগলী

উত্তর : (1) হরিদ্রা অথবা হলুদের ব্যবহার প্রাক আর্য যুগ থেকে চলে আসছে। বেদে হলুদের উপকারিতা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। শুক্ল যজুর্বেদে হলুদকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে : তোমার শরীরে যে অগ্নিতুল্য কান্তি রয়েছে সেই কান্তি আমাদিগকে দাও।
আয়ুর্বেদে হলুদের নানা উপকারিতার উল্লেখ আছে। কাঁচা হলুদ কৃমি, যকৃতের দোষ, শীতপিত্ত (আমবাত), ফাইলেরিয়া প্রভৃতি অনেক রোগের উপশমের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। কাঁচা হলুদ ত্বকে লেপন করার বিধি আছে চর্মরোগের জন্য। এই সব কারণেই হলুদের ব্যবহার সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। বিধিবদ্ধভাবে এর উপকারিতা সম্বন্ধে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে কিনা জানা নেই। কাঁচা হলুদ পরিমাণ মত খেলে কোন অপকারের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং ব্যবহারে ক্ষতি কি? একই যুক্তিতে গায়েও মাখা চলতে পারে, নানা সামাজিক কাজেও আমাদের হলুদ ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে নিবারক হিসাবে শিশুদের তেল হলুদ ও গৃহপালিত পশুদেরও হলুদ মাখান হয়। হলুদ মাখলে রং-এর ঔজ্জ্বল্য বাড়ে বলে, তার আর এক নাম বর্ণ বিধায়িনী।

(2) কাঁচা পাউরুটি খেলে শরীরের কোন ক্ষতির কারণ নাই। সেঁকে খেলে হজম হবার সুবিধা। পাউরুটি খোলা প্যাকেটের মধ্যে রেখে বিক্রী হয়। তাতে ধুলা ময়লা লেগে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে বইকি?

(3) মরণের আগে ও পরে দেহের ওজনের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস-বৃদ্ধি হবার কারণ নাই।

(4) ডিম খাবার সঙ্গে বাত হবার কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই।

(5) যে কোন উজ্জ্বল বস্তুর দিকে ক্রমাগত তাকালে চোখের ক্ষতি হতে পারে। টেলিভিশনের পর্দার ঔজ্জ্বল্য সিনেমার পর্দা থেকে তিনগুণ বেশী। সেইজন্য ঘরে আলো জ্বালা থাকলে চোখের ক্ষতি কম হয়। অন্ধকার ঘরে মোটেই দেখা উচিত নয়।

[উত্তর দিয়েছেন হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

(খ)

প্রশ্ন : (6) পটাসিয়াম সায়ানাইড নাকি জিভে ঠেকালেই মানুষ মারা যায়—কথাটি কি সত্যি? শরীরে এর বিষক্রিয়ার হার কিরূপ?

(7) পটাসিয়াম সায়ানাইডের স্বাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে একজন নাকি মুখে নিয়ে এর স্বাদ লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন 'S'। পুরোটা লেখার আগেই নাকি তিনি মারা যান। কথাটা কি সত্যি?

মিতা বোস
কলিকাতা

উত্তর : (6) পটাসিয়াম সায়ানাইড জিভে ঠেকালেই মানুষ মারা যায় না। এটি জিভে ঠেকানর পর ক্রমশঃ তাতে শোষিত হয় এবং যখন রক্তের সংস্পর্শে আসে, তার অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ মারা যায়। পটাসিয়াম সায়ানাইড শরীরে খুব দ্রুত কাজ করে (যা অনেক বিষই তত দ্রুত পারে না) কারণ এটি দ্রবীভূত হয়ে আয়নে পরিণত হয় এবং এই আয়নে পরিণতিটা অল্প মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে এবং উৎপন্ন সায়ানাইড আয়ন রক্তের লোহার সঙ্গে মিশে একটি জটিল যোগ গঠন করে এবং ফলে শরীরের রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পলকের মধ্যেই মানুষ মারা যায়।

(7) এটি একটি গল্প বলে শোনা যায়। জিভে ঠেকালে এটি জ্বালার উদ্রেক করে এবং ক্ষার জিভে লাগলে যেমন লাগে এও অনেকটা সেইরকম লাগে।

[উত্তর দিয়েছেন কমল চক্রবর্তী
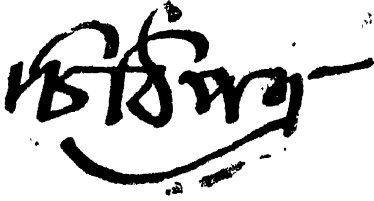
গোপালচন্দ্র ও যোগেন মাস্টার প্রসঙ্গে

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" বা যে কোন পত্রিকার মানোন্নয়নের জন্য কেবল লেখক বা সম্পাদক মণ্ডলীর সতর্কতাই যথেষ্ট হতে পারে না, পাঠকদের সতর্কতাও প্রয়োজন। শ্রীঅসীম চক্রবর্তী এগিয়ে এসেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কিছু মতপার্থক্য আছে। ডারুইনও ছিলেন মূলতঃ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, এবং অবশ্যই, প্রথম শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসাবেই তাঁর সেই অবদান যা এক সময়ে জীববিজ্ঞানকে নিশ্চলতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল জীববিজ্ঞানী হিসাবে। আজ আমাদের দেশের গ্রামে শহরে অনেক বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে প্রকৃতিবিজ্ঞান চর্চা প্রসার লাভ করছে। এটি ভাল লক্ষণ নিঃসন্দেহে। এমন খুবই প্রয়োজন, গোপালচন্দ্র এবং যোগেন মাস্টারকে সামনে আনা এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত সম্মানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সে কাজে অধ্যাপক ব্রহ্মচারীর প্রয়াসকে অভিনন্দিত করি।

আশিস সিংহ

প্রাণীসমাজে বন্ধুত্ব

জুলাই 1980 সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনীলাঞ্জন ভট্টাচার্যের 'প্রাণীসমাজে বন্ধুত্ব, প্রবন্ধটি পড়ে কয়েকটি প্রশ্ন মনে এল। শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন বাংলাদেশীয়রা দর্শন অনুভূতির থেকে ঘ্রাণশক্তিকে বেশী বিশ্বাস করে। প্রকৃতিবিদ পি ম্যাণ্ডেইকলের একটি পরীক্ষা থেকে তিনি তার উদাহরণও দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটি অতি সরলীকৃত মনে হয়। কুকুর ও বিড়াল পরস্পরের স্বাভাবিক শত্রু। কিন্তু একই বাড়ীতে এদের মিলেমিশে থাকতে দেখা যায়। এরা সকলেই যে আশৈশব একত্র প্রতিপালিত হয়েছে তা নয়। হাঁস, মুরগী ইত্যাদি কুকুরের স্বাভাবিক খাদ্য। অথচ গৃহপালিত এই সব পাখীদের পাহারা দেয় কুকুর। কখনও আক্রমণ করতে দেখা যায় না। একবার একটি কুকুরকে দেখি একটি হুলো বিড়ালকে তাড়িয়ে কয়েকটি বিড়ালশাবকের প্রাণ রক্ষা করতে। আর একবার একটি বিড়ালশাবককে দেখি কুকুর-শাবকের সঙ্গে কুকুরীর দুধ পান করতে। যাঁদের বাড়ীতে এই ঘটনাগুলি ঘটে তাঁরা কেউই প্রকৃতিবিদ নন। কৃত্রিম উপায়ে কুকুরের ঘ্রাণশক্তিকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও তাঁরা কেউ করেননি। কি ভাবে এই ঘটনা সম্ভব হয় তা নিয়ে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন বোধ হয়। মানুষের পালিত প্রাণীরা সম্ভবতঃ নিজেদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করে মানুষের ইচ্ছানুসারে। কিন্তু ঠিক কি ভাবে তারা প্রভাবিত হয় বা কোন্ ইন্দ্রিয়ের উপর বেশী নির্ভর করে তা নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন আছে।

শুভ্রা দত্ত

কলকাতা—19

এসপেরান্তো প্রসঙ্গে

উপরিউক্ত শিরোনামায় জুলাই, 1980 সংখ্যায় "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়

[তার পরিপ্রেক্ষিতে বহু আগ্রহী পাঠক এই ভাষা শেখার উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। তাই জানান যাচ্ছে যে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এসপেরান্ত শেখার বই হল :

এসপেরান্ত সহজ পাঠ—লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

বিনয় পল্লী-731235, শান্তিনিকেতন

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এই ভাষা শেখার বই বা অন্যান্য দরকার Universala Esperanto Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, B J Ratterdam 3015, Nederland থেকেও পাওয়া যেতে পারে।

কলকাতায় Hinduja Esperanto Asocio 102/1 সি, কড়েয়া রোড, কলকাতা-17, UEA-র সহযোগিতায়, এই ভাষার প্রচারে প্রয়াসী। এই সংস্থা 1.11.80 থেকে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে, (ক্রীক রো) সান্ধ্য ক্লাস চালু করবে বলে জানা গেছে।

কলকাতার অপর একটি সংগঠন Youth Puppet Theatre—India ভাষাটিকে সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগের জন্য অত্যন্ত সক্রিয় ভাবে কাজ করছে।

শ্যামসুন্দর পাল
হাওড়া—711101

পরিষদ-সংবাদ

12 ও 13ই নভেম্বর, 1980 সত্যেন্দ্র ভবনে পরিষদের উদ্যোগে 'হোমিওপ্যাথি, সমাজ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে একটি আলোচনা সভা ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে অমূল্যধন দেব স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং মডেল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রাক্তন এম. পি. শ্রীবীরেন রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সভাপতি শ্রী রায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। কর্মসচিব শ্রীরতনমোহন খাঁ সংক্ষেপে অনুষ্ঠান পরিচিতি দেন এবং এই আয়োজনে নানাভাবে সাহায্য করার জন্যে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজের শারীরবৃত্ত বিভাগ, সিটি কলেজের শারীরবৃত্ত বিভাগ, বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম ও বহু ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানান নানাভাবে সাহায্য করার জন্য। সভাপতি শ্রী রায় পরিষদে প্রতি বৎসর আধুনিক বিজ্ঞানের উপর আলোচনা ও আলোচ্য বিষয় পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্য যাবতীয় খরচের (প্রায় আড়াই হাজার টাকা) স্থায়ী ব্যবস্থা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এ ছাড়াও পরিষদের গঠনমূলক কাজে তিনি নানাভাবে সাহায্যের আশ্বাস দেন। প্রদর্শনী ছোট হলেও জনসাধারণের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়। 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলন' প্রকাশিত হওয়ায় পরিষদের সভ্যগণ ও শ্রোতারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। দু-দিনের আলোচনা সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী মহেন্দ্র সিং সূর্যপদ দে, এ. কে. মণ্ডল, প্রভাতকুমার গুপ্ত, শম্ভুনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশিস সিংহ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, সত্যব্রত সিংহ, হরিমোহন চৌধুরী। এঁরা সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথি ও বিজ্ঞানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য কোন স্বীকৃত বিজ্ঞান সংস্থার এটিই প্রথম পদক্ষেপ বলে তাঁরা জানান। এদিক থেকে বিজ্ঞান পরিষদকে ভারতে পথিকৃৎ হিসাবে অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে সভার শেষে ধন্যবাদ জানান শ্রী সুকুমার গুপ্ত এবং দ্বিতীয় দিনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রী গুণধর বর্মন।

ভ্রমসংশোধন—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (শারদীয়) 1980 সংখ্যায় 426 পৃষ্ঠায় 2য় কলামে 7ম লাইনে 'সঠিক', 428 পৃষ্ঠায় 1ম কলামের 4র্থ লাইনে 'স্বাস্থ্যবান' এবং 15শ লাইনে 'সপ্তম দশক'-এর স্থলে হবে যথাক্রমে 'সাধক' 'স্বাস্থ্যারাম' ও সপ্তম শতাব্দী'।

সম্পাদনা সচিব—রতনমোহন খাঁ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার:বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষান্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ 'ডাকযোগে' পাঠানো হয়; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয়; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে। টাকা চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।

কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদনা সচিব, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.

প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।

প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদনা সচিব
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রকাশক, পাঠক এবং লেখকদের প্রতি নিবেদন

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের পুণ্য নামাঙ্কিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ তার সূচনা থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার আয়োজন এবং প্রয়োজনকে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাগারটি 1977 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পাঠাগারে নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে বি. এস্‌সি. (পাশ ও অনার্সক্রম), এম. এসসি., কারিগরী ও মেডিক্যাল প্রভৃতি ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ আছে। সীমিত অর্থে এই পাঠাগারকে আজো পরিকল্পনামত যথার্থ উপযোগী করে তোলা যায় নি। এই উদ্দেশ্যে, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের কাছে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি—দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কথা চিন্তা করে তাঁরা নমুনাকপি, লেখককপি, বা দান হিসাবে নানা পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রদান করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করুন। অব্যবহৃত পুরনো পুস্তকও সাদরে গৃহীত হবে।

ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিজ্ঞান ছাড়া,—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য ও বিজ্ঞান তৃষ্ণাকে জাগরিত করে তুলে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রসারিত করাও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পেই—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ গ্রন্থাগার। বহু বিজ্ঞানপিপাসু পাঠক নিয়মিত গ্রন্থাগারে আসেন। গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকা সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত নগণ্য। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগটিকে সুসজ্জিত ও প্রামাণ্য বিজ্ঞান গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে—জনসাধারণ, প্রকাশক, পাঠক ও লেখকদের, অর্থ ও পুস্তক মারফৎ সাহায্য পাঠাতে আমরা একান্তভাবে আবেদন করি।

পুস্তকাদি ও সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা

'সত্যেন্দ্র ভবন'
P-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-700 006
ফোন : 55-0660

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর, 1980
দ্বাদশ সংখ্যা

কার্যালয়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-700 006

ফোন : 55-0660

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদ : ডঃ মেঘনাদ সাহা ব্যবহৃত ভ্যাকুয়াম ফারনেস

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রতিষ্ঠাতা : আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

"বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেশ্য।"

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত কিছু কর্মসূচী

স্থান: সত্যেন্দ্র ভবন

4ঠা ফেব্রুয়ারী বুধবার, বিকেল 5টায়

আচার্য বসুর তিরোধান দিবস উদযাপন

সভাপতি: অধ্যাপক গৌরদাস মুখোপাধ্যায়

প্রধান অতিথি: শ্রীবীরেন রায়

আচার্য বসু স্মারক বক্তৃতা

বক্তা: অধ্যাপক পরিমলকান্তি ঘোষ

বিষয়: সাইবারনেটিক্স্

বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা

14ই ফেব্রুয়ারী শনিবার, বিকেল 5টায়

বিষয়: রাসায়নিক মডেল তৈরি

বক্তা: ডঃ জগবন্ধু হালদার

28শে ফেব্রুয়ারী শনিবার, বিকেল 5টায়

বিষয়: দৈনন্দিন জীবনে শ্রমপ্রযুক্তিবিদ্যা

বক্তা: ডঃ রবীন্দ্রনাথ সেন

14ই মার্চ শনিবার, বিকেল 5টায়

বিষয় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিবেশ সমস্যা

বক্তা: শ্রীসমরজিৎ কর

28শে মার্চ শনিবার, বিকেল 5টায়

বিষয়: মডেল তৈরি

বক্তা: ডঃ শ্যামসুন্দর দে

উৎসাহী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণকে উপরিউক্ত কর্মসূচীতে যোগদান করবার জন্য অনুরোধ জানাই।

কর্মসচিব

29শে জানুয়ারী, 1981

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

মুক্তার জন্মকথা

হীরক দাশ*

মুক্তা কি জিনিষ তা হয়তো আর বলতে হবে না কারণ মুক্তা আমাদের সকলেরই চেনা। আমাদের কাছে মুক্তার বেশ মূল্য, কানের সোনার দুলে, গলার হারে বা আংটিতে মুক্তা বসিয়ে অলংকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। অনেক কাল থেকে মুক্তা মানুষের পরিচিত রত্ন।

আগের কালের মানুষের মুক্তার জন্ম সম্পর্কে অনেক হাস্যকর ধারণা ছিল। এ সম্পর্কে তারা বিশেষ কিছু জানতো না। কেউ কেউ মনে করতো, শিশিরবিন্দু থেকেই নাকি মুক্তার জন্ম। আবার আরব দেশের লোকেরা বলতো, ঝিনুক খুব ভোরবেলা জলের উপর ভেসে উঠে শিশিরবিন্দু খায়। সেই সময় ঝিনুকের দেহের উপর সূর্যের আলো পড়ে এবং এই সূর্যের আলো আর বাতাসের প্রভাবে ঝিনুকের দেহের মধ্যেকার শিশিরবিন্দু আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে গিয়ে মুক্তা রূপে জন্ম নেয়। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুক্তার জন্ম নিয়ে মানুষের মধ্যে এই রকমের অনেক আজগুবি ধারণা চালু ছিল। কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষভাগে এক ফরাসী বিজ্ঞানী, নাম লিনে, অনেক গবেষণার পর মুক্তার জন্ম সম্পর্কে সঠিক কথা প্রথম বলেছিলেন। তাঁর মতে, ঝিনুকের খোলার মধ্যে যদি কোন 'উত্তেজক বস্তু' অর্থাৎ একটি বালুকণা, কাঠের গুঁড়োর একটু দানা বা ছোট্ট একটি পাথর কুচি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা বহুদিন পরে মুক্তায় পরিণত হবে। কথাটি ঠিক। এখনও এইভাবে মুক্তার জন্ম হয় সমুদ্রের তলায় এবং কৃত্রিম মুক্তারে চাষ এই একই ভাবেই করা হয়। যে-বিশেষ ধরনের ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তার নাম শুক্তি।

ঝিনুক সমুদ্রের তলায় জলের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়ায়, সে সময়ে কখনো কখনো বালুকণা বা পাথরকুচির ক্ষুদ্র কণা হঠাৎ ঢুকে পড়ে ঝিনুকের শাঁসালো শরীরের মধ্যে। যেই না এভাবে ভেতরে আসা অমনি ঝিনুকের ভেতরকার পাতলা মসৃণ পদার্থ নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তরল পদার্থের স্তরের প্রলেপ দিয়ে, ওই বালুকণাটিকে ঢেকে ফেলে। না ঢেকে ফেলা অবধি বালুকণাটি ঝিনুকের নরম শরীরের মধ্যে থেকে কচ্‌কচ্‌ করে এবং তাতে ঝিনুক অনেক অসুবিধে ভোগ করে। স্তরটা হয় পেঁয়াজের মত—একটার পর একটা। ব্যাস, এইভাবে কয়েক বছর থাকতে থাকতে ঐ স্তরীভূত বস্তুটির তরল প্রলেপ কঠিন হয়ে জন্ম দেয় আসল মুক্তার।

এই প্রাকৃতিক মুক্তা খুবই বিরল। কয়েক হাজার ঝিনুকের থেকে মাত্র কয়েকটি মুক্তা পাওয়া যায়, তাও খুব কম পরিমাণে। এই ভাবে মুক্তা সংগ্রহ করে বিশ্বের বিপুল চাহিদা মেটানো যায় না। তাই অনেক বেশী করে মুক্তা পাওয়ার জন্য মানুষ মুক্তার চাষ করতে আরম্ভ করেছে। এখন সারা পৃথিবীতে এই কৃত্রিম মুক্তার চাষ চলছে। কৃত্রিম মুক্তার জন্ম হয় প্রায় প্রাকৃতিক মুক্তার জন্মের মতনই।

---

*30/10 গোলবপুর রোড, পোঃ ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-700031

বাইরে থেকে কৃত্রিম ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া বালুকণা ভেতরে আসা মাত্র শুক্তি উজ্জ্বল তরল পদার্থের প্রলেপ দিয়ে বালুকণাটিকে স্তরে স্তরে ঘিরে ফেলে এবং এইভাবে কয়েক বছর থাকতে থাকতে শুক্তির মধ্যে জন্ম নেয় কৃত্রিম মুক্তা।

কৃত্রিম মুক্তার প্রথম চাষ করেন চীন দেশের এক ভদ্রলোক, নাম ই-জিন-ইয়াং। তবে এঁর চাষের মুক্তা খুব একটা উজ্জ্বল হয় নি। প্রথম উৎকৃষ্ট এবং উজ্জ্বল কৃত্রিম মুক্তার চষের কৃতিত্ব দেখালেন কো কি চি মিকিমাটো নামে এক জাপানী ভদ্রলোক। উনি মুক্তার চাষ করেন এগো উপসাগরে এবং হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে তার মুক্তা চাষের কারবারে। মেয়েরাও ডুবুরির কাজ করে। কিভাবে কৃত্রিম মুক্তার চাষ হয় তা এবার বলা যাক।

প্রথমে এগো উপসাগরে একজাতীয় শুক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয় অগভীর জলে। এই অগভীর জলে শুক্তিরা সমুদ্রের আগাছা, শিলা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে। জুলাই-অগাস্ট মাস নাগাদ ডুবুরিরা অগভীর জলে, যেখানে শুক্তিদের ডিম পাড়ার আশা আছে, সেই সব জায়গায় পাথরের টুকরো ফেলে দেয়। পরে শুক্তিদের ডিমগুলি আশ্রয় নেয় সেই পাথরগুলির উপর। দু-তিন বছর পর শিশু শুক্তিগুলি বড় হয়ে উঠলে তখন তাদের তুলে এনে অভিজ্ঞ শ্রমিকেরা খুব সাবধানে তাদের শরীরের মধ্যে বালুকণা বা খুব ছোট পাথরকুচি ঢুকিয়ে দিয়ে আবার তাদের রেখে আসে গভীর জলে। তারপর প্রায় চার বছর পর ওই শুক্তিগুলির মধ্যে মুক্তার জন্ম হয়। তবে সবকটির মধ্যে যে মুক্তা জন্মায় তা নয়। ডুবুরিরা গিয়ে আবার এই শক্তিগুলিকে সংগ্রহ করে আনে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলে এই কাজ। সমুদ্রের নীচে পৌঁছে ষাট থেকে আশি সেকেণ্ড পর্যন্ত ডুবুরীরা থাকতে পারে এবং ওইটুকু সময়ের মধ্যে একজন দক্ষ ডুবুরী দশ বারোটা শুক্তি তুলে আনতে পারে। কিন্তু এতসব কাণ্ড করেও শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একশোটি শুক্তির মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়টি মুক্তা বাজারে চড়া দামে বিক্রী করার মত আর বাকীগুলি নিম্নমানের। তবে একশোটি শুক্তি থেকে ভালোমন্দ প্রায় চল্লিশ থেকে ষাটটি মুক্তা পাওয়া যায়।

খাদ্যোপযোগী মাশরুম

অশোককুমার দাশ*

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার মানুষের নিকট 'মাশরুম' (MUSHROOM) বহুদিন থেকেই একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে পরিচিত। খাদ্যোপযোগী 'মাশরুম' সম্বন্ধে নানা গল্প বিভিন্ন বইতে পাওয়া যায়। ইজিপ্টের রাজা মাশরুমের নাম দিয়েছিলেন 'ফুড অফ গড্' (Food of God) এবং তারপর থেকেই সেখানকার জনগণ মাশরুমের পুজা আরম্ভ করেন। তখন সাধারণ মানুষ 'মাশরুম' স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারতো না। জুলিয়াস্ সিজারের সময় সামরিক বাহিনীর প্রধানরাই কেবলমাত্র মাশরুম খাওয়ার অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে 'মাশরুম' নিয়ে নানা কুসংস্কার জনমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রাশিয়া, সেন্ট্রাল আমেরিকা, মেক্সিকো, চীন ও সাইবেরিয়াতে 'মাশরুম' সম্বন্ধে নানা ধর্মবিধির প্রচলন ছিল।

আজ থেকে প্রায় 300 বছর আগে ফ্রান্সে (1631—1715) সম্ভবতঃ প্রথম মাশরুমের চাষ আরম্ভ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914) পরে খাদ্যশস্যের অভাব পূরণের জন্য মাশরুম চাষের উপর আরও বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে আমেরিকা, তাইওয়ান, জাপান, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে 'মাশরুম' চাষের প্রচেষ্টা শুরু হয়। খাদ্যোপযোগী মাশরুমের চাষ ইদানীংকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে যে সমস্ত 'মাশরুম' চাষ করা হচ্ছে সেগুলি হল ভলভারিয়েল্লা· ভলভেসিয়া (Volvariella volvacea) বা পোয়াল ছাতা, অ্যাগারিকাস্ বাইসপোরাস্ (Agaricus bisporus) ও প্লিয়োরটাস (Pleurotus Spp.)। এছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে ডঃ রবীন্দ্রপ্রসাদ পুরকায়স্থ বর্তমানে ক্যালোসাইবি ইণ্ডিকা (calocybe indica) নামক একটি নতুন খাদ্যোপযোগী মাশরুমের চাষও করছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে পোয়াল ছাতার চাষ অনেকদিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে এবং বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর চাষ চলছে। সু-টিং চ্যাং (1977)-এর মতে প্রায় 200 বছর আগে চীনে পোয়াল ছাতার চাষ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। ভারতবর্ষে 1921 সালে এস, আর, বোস প্রথম 'মাশরুম' শিল্পের সম্ভাবনার কথা বলেন। পরবর্তীকালে থোমাস্ এট-অল (1943) কইম্বাটোরে পোয়াল ছাতা চাষের সাফল্যের মধ্য দিয়ে 'মাশরুম' শিল্পের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এর চাষ শুরু হয়। পোয়াল ছাতা খুব কম খরচে এবং অল্প পরিশ্রমে চাষ করা হয়। এটি চাষ করার জন্য কোন রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র ধানের খড়, ছোলার গুঁড়ো এবং মাশরুম বীজ বা স্পন্ এই চাষের জন্য দরকার। পশ্চিমবঙ্গে এপ্রিল মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত

*অঙ্গবন্ধু, সোনারপুর, 24 পরগণা।

এই চাষ করা যায়। সাধারণতঃ বছরে 7 বার এই মাশরুম ফলানো সম্ভব। একটি ফলনের সময়কাল তিন সপ্তাহ থেকে একমাস।

মাশরুমে প্রোটিনের পরিমাণ অন্যান্য যে কোন শাক-সবজির তুলনায় বেশী। যদিও এতে প্রোটিনের পরিমাণ মাংস, ডিম ও মাছের তুলনায় কম থাকে। খাদ্যোপযোগী এবং চাষ উপযোগী মাশরুমগুলির মধ্যে পোয়াল ছাতা (ভলভারিয়েল্লা ভলভেসিয়া), অ্যাগারিকাস বাইসপোরাস এবং প্লিয়োরটাসে প্রতি 100 গ্রাম টাটকা ওজনে যথাক্রমে 3·37 গ্রাম, 3·94 গ্রাম এবং 2·78 গ্রাম প্রোটিন আছে। 'মাশরুম' প্রোটিনের 90% মানুষ পরিপাক করতে পারে। দুগ্ধজাত পনিরের তুলনায় মাশরুমের খাদ্যগুণ 60% বেশী। মাশরুম প্রোটিন বিশ্লেষণ করলে 23 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড (Amino acid) পাওয়া যায়। মাশরুম প্রোটিন এবং মাংস প্রোটিনে থ্রিওনাইন (Threonine) ও ভ্যালাইন (Valine) সমপরিমাণে থাকে। মাংস প্রোটিনের তুলনায় মাশরুম প্রোটিনে হিস্টিডিন (Histidine), আইসোলিউসিন (Isoleucine), লিউসিন (Leucine) এবং ফিনাইলঅ্যালানিন (Pheylanine) কম পরিমাণে থাকে। দুটি অ্যামাইনো-অ্যাসিড—লাইসিন (Lysine) ও মিথাওনিন (Methionine) খুব কম পরিমাণে থাকে, মাশরুম প্রোটিনে। সম্পূর্ণ প্রোটিনের 20% অ্যামাইনো অ্যাসিড মাশরুমে মুক্ত অবস্থায় থাকে। এদের মধ্যে গ্লুটামিক অ্যাসিডের (Glutamic acid) পরিমাণ বেশী।

মাশরুমে ভিটামিন বি এবং ডি বেশী পরিমাণে থাকে। ভিটামিন-এ বেশীর ভাগ মাশরুমে পাওয়া যায় না বা খুব কম থাকে। প্রতি 100 গ্রাম টাটকা পোয়াল ছাতাতে 0·14 মিলিগ্রাম থায়ামিন (Thiamine), 0·61 মিলিগ্রাম রিবোফ্লাভিন (Riboflavin), 2·4 মিলিগ্রাম নায়াসিন (Niacin) এবং 18 মিলিগ্রাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (Ascorbic acid) পাওয়া যায়। এছাড়া এতে ফলিক অ্যাসিডও (Folic acid) থাকে। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে মাশরুমে টোকোফেরল (Tocopherols) নামক যৌগ পাওয়া যায়, যার প্রকৃতি শস্যের এবং লেটুস (Lettuce) পাতার টোকোফেরলের ন্যায়। এটি ভিটামিনের উৎস নামে পরিচিত। অন্যান্য শাক-সবজির তুলনায় মাশরুমে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে লবণ জাতীয় পদার্থ আছে। এতে লোহ, তামা, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস পাওয়া যায়। মাশরুমে এই সমস্ত উপাদান থাকার জন্য, বিভিন্ন রোগ যেমন—অ্যানিমিয়া (Anaemia), স্কারভি (Scurvy), পেলাগ্রা (Pellagra), দন্তক্ষত (Dental Caries) নিরাময়ের জন্য রোগীরা মাশরুমকে তাদের খাদ্য তালিকাভুক্ত করতে পারেন। টাটকা মাশরুমে 0·20—7·6% ফ্যাট থাকে। লেসিথিন (Lecithin) ও অন্যান্য স্টেরল জাতীয় পদার্থও (Sterols) এতে পাওয়া যায়। মাশরুমে ট্রিপসিন (Trypsin) নামক এনজাইম (Enzyme) থাকে, মাশরুমে 17 রকমের কার্বোহাইড্রেট থাকে। প্রধান কার্বহাইড্রেট উপাদান হল ম্যানিটল (Manitol) গ্লাইকোজেন (Glycogen) এবং হেমি-সেলুলোজ (Hemicellulose)।

যেহেতু আমাদের দেশের 80% মানুষ নিরামিষ আহারী এবং 90% মানুষ দারিদ্র্য-সীমার নীচে বসবাস করছে, তাই মাশরুম এদের শরীরের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উপাদান সরবরাহ ক্ষেত্রে

বেশ সাহায্যকারী হতে পারে। মাশরুমের নিত্যনূতন, উন্নত চাষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অধিক মাশরুম ফলানোর দ্বারা প্রোটিন অপুষ্টির সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকাল বিভিন্ন হোটেলে মাশরুম তরকারীর প্রচলন হয়েছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে 'মাশরুম'কে খাদ্যতালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। মাশরুম দিয়ে বিভিন্ন রকমের তরকারী যেমন—সুপ, চিপস, অমলেট, পাকোড়া, রোল, ফ্রাই, পরটা, স্টু, পাই, পুরি, স্যান্ডউইচ প্রভৃতি রান্না করা যায়। এ ব্যাপারে উল্লেখ করা যেতে পারে, খাদ্যোপযোগী মাশরুমের উপর সোলান, বইম্বাটোর এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্লান্ট প্যাথোলজি ল্যাবরেটরিতে (Plant Pathology Laboratory) গবেষণা চলছে। ক্রমবর্ধমান ও ব্যাপক হারে মাশরুম চাষের মধ্য দিয়ে মাশরুম শিল্পের বিকাশ ঘটবে, যা ভারতের কৃষিতে একটা নতুন যুগের সূচনা করবে। প্রোটিন অপুষ্টিজনিত রোগে এদেশের মানুষ যেখানে ভুগছে—সেখানে বিজ্ঞানীরা এক সহজলভ্য অধিক প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যের সন্ধান দিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে এ ব্যাপারে কাজে লাগিয়ে জনকল্যাণের পথে এগিয়ে এসেছেন শুনে যে কোন মানুষ নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।

"যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদের উক্তি কেবল সুশিক্ষিত দিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সে-সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র

(বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, বৈশাখ, 1279 বঙ্গাব্দ)

শ্রবণী

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়*

[কবি বলেছেন 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি।' শোনার ব্যাপারটা অবাক করার মত ঘটনাই বটে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণের স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু অদ্বিতীয় তার রচনা-কৌশল। কর্ণের রহস্যের অন্ত নেই। শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিফলন কিভাবে মস্তিষ্কের কোষে সংঘটিত হয় তার সবটা আজও জানা যায় নি। কানের ভিতর কিভাবে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করে নানা রঙের ছবি ফুটিয়ে তোলে তারই কাহিনী এই শ্রবণী।]

পণ্ডিতমশাই স্কুলে শব্দরূপ শেখাবার সময় বলেছিলেন, শব্দই ব্রহ্ম এবং তিনি সতত কর্ণছিদ্রপথে প্রবেশ করেন। কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সে বিষয়ে মতান্তরের কোন কারণ নেই। প্রভাতে পাঁড়েজির রামা হৈ, কাকের কা কা রব, কোকিলের কুহুতান, মাইকের রেশমী শাড়ী ও ত্রিশূলধারী, সহধর্মিণীর নাসিকাধ্বনি, নবীন গুরুদের গুরু গুরু হুঙ্কার, 'এয়ার হর্ন" এর টঙ্কার এবং আরও হাজারো রকমের শব্দ যখন দলবদ্ধ হয়ে আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে তখন আমাদের শব্দব্রহ্মের অসীম মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয়। জন্মের পর থেকে একেবারে অন্তিমকালে তারকব্রহ্ম নাম শোনা পর্যন্ত কত কোটি শব্দ যে আমাদের কানে প্রবেশ করে তা নিয়ে আজও কোন শব্দকল্পদ্রুম রচিত হয় নি। তবে এটা ঠিক যে যত শব্দ আমাদের কণ্ঠ থেকে বেরোয়, শ্রবণ করি তার চেয়ে অনেক বেশী।

শ্রবণযন্ত্র কর্ণের জন্ম ও কর্ম সম্বন্ধে যে বিস্তৃত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে একটি বৃহৎ কর্ণপর্ব রচিত হতে পারে। মানবকর্ণ বহিঃ, মধ্য ও অন্ত—এই তিনটি মহলে বিভক্ত; এর অন্তরমহল প্রথমে নির্মিত হয় এবং তারপরে মাঝের মহল ও বাহিরমহল বা সদর দেউড়ি। মাছ থেকে মানুষ সকলেরই কান আছে। কর্ণপত্র, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে কানের বহিরঙ্গ। মাসীর কান নামে পরিচিত যে অংশটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগের ভুবন কামড়ে দিয়েছিল, সেটি কর্ণপত্র। অনড় অটল এই কানের পাতাটি মানুষের বেলায় শব্দতরঙ্গ গ্রহণে কিছুটা সাহায্য করে মাত্র, যদিও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। নাসিকাকুঞ্চন ও চোখ টেপায় বেলায় মানুষের দক্ষতা বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতি কর্ণ আন্দোলিত করার ক্ষমতা মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। মধ্যকর্ণে আছে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তিনটি ক্ষুদ্রাকার অস্থি—হাতুড়ী বা ম্যালিয়াস্, নেহাই বা ইনকাস এবং রেকাবী বা স্টেপিস। এই তিনটি অস্থির মালা যাতে যথাস্থানে থাকে সেজন্য রয়েছে সন্ধিবন্ধনী। কর্ণপটহের সঙ্গে লেগে আছে হাতুড়ী এবং অন্তঃপুরে

*সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা-700 009

প্রবেশদ্বারে রয়েছে 1·2 মিলিগ্রাম ওজনের রেকাবী যার মাথায় আছে একটি গোলাকার চাক্‌তি বা ফুটপ্লেট। চোখের পর্দা বেশীর ভাগ লোকের না থাকলেও কানের পর্দা সকলেরই আছে এবং এটি প্রভুর বিশিষ্ট, যতই তিনি কানপাতলা লোক হোন না কেন। বায়ুভর্তি মধ্যকর্ণ গহ্বরের সঙ্গে গলাবিলের সংযুক্তি ঘটানো হয়েছে শ্রুতিনালী বা ইউসটেসিয়ান টিউবের মাধ্যমে। যার প্রধান কাজ হল কর্ণপটহের উভয় পার্শ্বের বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করা। বোমা পট্‌কার যুগে এই শ্রুতিনালীর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে কারণ এটা না থাকলে পর্দাফাই হয়ে যাবে।

কানের অন্দরমহল বা অন্তঃকর্ণ দুটি অংশে বিভক্ত; উপরে ইউটেকুলাম ও নীচে স্যাকুলাস এবং এদের যুক্ত করেছে স্যাকুলো-ইউট্রিকুলার নালিকা। ইউট্রিকুলাস থলির সঙ্গে যুক্ত আছে পরস্পরের সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত একটি অনুভূমিক ও দুটি উল্লম্ব অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালিকা এবং প্রত্যেকটি নালিকার উভয়প্রান্তভাগ ঈষদ্‌স্ফীত যাদের বলা হয়েছে অ্যাসাপিউলা। অন্তঃকর্ণের অর্ধচন্দ্রাকৃতি নালিকাত্রয় ও ইউট্রিকুলাস শ্রবণে কোন প্রকার সাহায্য না করলেও দেহের সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। মাথা হেলিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক কিংবা অনৈতিক শলাপরামর্শ করার সময় অনুভূমিক খালের জলে যেমন ঢেউ উঠে তেমনি পথচলতি উঠতি নায়িকাকে দেখার জন্য ঘাড় ঘোরালে অ্যাসাপিউলার ক্রিষ্টা সুষুম্নাশীর্ষে 'মেসেজ' পাঠিয়ে পৃষ্ঠদেশ, হাত-পা ও চোখের পেশী ঘুরিয়ে শরীরটাকে সুসম রাখে। অন্তঃকর্ণের এই উপপ্রকোষ্ঠ যেহেতু দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে সেজন্য সহসা কর্ণে সশব্দে চপেটাঘাত 'ব্যালান্স রিসেপ্টর' বিগড়ে দেয় এবং মাথা ঘুরতে থাকে। শব্দ শোনাই কানের প্রধানতম কাজ বলে অনেকেই নানান কথা শুনিয়েছেন কিন্তু কর্মবিশারদগণ বলেছেন দেহের ভারসাম্য রক্ষা করাই ছিল আদিযুগের কর্ণের পবিত্র কর্তব্য। জৈব বিবর্তনের ইতিবৃত্তে সেরকম কথাই লেখা আছে। আদিমতম মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কান দিয়ে শুনতে হয়, এমন কথা কোনদিন কানেও শোনেনি।

শোনার ব্যাপারটা অন্তঃকর্ণের নিম্নপ্রকোষ্ঠ স্যাকিউলাসের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এই স্যাকুইলাস থেকে উদ্গত হয়েছে শম্বুকী নল বা ককলিয়া। একটি কেন্দ্রীয় অস্থির চারিদিকে শম্বুকের খোলার ন্যায় পৌনে তিনপাক ঘোরানো সমান্তরাল তিনটি ক্ষুদ্র নালিকা দিয়ে গঠিত এই শম্বুকী নল এক আজব যন্ত্র। কুশলী যন্ত্রবিদ প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। প্রকৃতির মতই দুর্জ্ঞেয় এবং রহস্যাবৃত এর প্রক্রিয়াগত কলাকৌশল। এণ্ডোলিম্ফ পূর্ণ মাঝের নালিকা 'স্ক্যালাসিডিয়া' এবং ককলিয়া নালিকার উপরে ও নীচে রয়েছে যথাক্রমে পেরিলিম্ফপূর্ণ ভেস্টিবুলার ও টিমপ্যানিক নালিকা। এই নালিকাত্রয় পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম পর্দাদ্বারা। ডিম্বাকার ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত ভেস্টিবুলার নালিকা মাঝের ককলিয়া নালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন রেইসনার পর্দা দ্বারা এবং মাঝের নালিকা ও গোলাকার ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত টিম্‌প্যানিক নালিকার মধ্যে রয়েছে ব্যাসিলার পর্দা বা 'ব্যাসিলার মেমব্রেন'। ককলিয়া নালিকার রসের মধ্যে নিমজ্জিত প্রায় 15500 কোষ দ্বারা গঠিত 'অর্গান অব কর্টির' হাতে আছে শ্রবণের চাবিকাঠি। ব্যাসিলার আবরণীর উপর কোষরাশি পাঁচটি সারিতে সজ্জিত থাকে যাদের মধ্যে আছে ধারক শেষ এবং 'সিলিয়া' বা কোষযুক্ত সংবেদক কোষ।

প্রতিটি কেশ কোষের শতাধিক সূক্ষ্ম সিলিয়া বা কোষাঙ্গজাল সংপৃক্ত হয়ে থাকে ব্যাসিলার মেমব্রেনের সমান্তরাল 'টেক্টোরিয়াল মেমব্রেন' নামে আর একটি তন্তুময় পর্দার তলদেশে এবং প্রতিটি কোষের গোড়ায় রয়েছে শ্রুতিনার্ভের শাখা। অন্তঃকরণের কানাগলির মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে বিজ্ঞানীরা হঠাৎই এই তন্তুময় 'ব্যাসিলার মেমব্রেন' আবিষ্কার করেন। প্রায় 30 মিলিমিটার দীর্ঘ এই পর্দাটি 40 থেকে 500 মাইক্রন দীর্ঘ 24000 সুরবাদন তন্তু দ্বারা গঠিত প্রকৃতির সৃষ্টি রহস্যের এক অপরূপ নিদর্শন। এটি যদি না থাকতো তবে কাক ও কোকিলের স্বর, মেয়ে ও মদ্দর গলা একইরকম শোনাতো। ভেস্টিবুলার নালিকা ও টিমপ্যানিক নালিকা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছে ককলিয়ার নালিকার ডগায় অবস্থিত 'হেলিকোট্রিমা' নামে একটি ছোট্ট ছিদ্রের মাধ্যমে।

রমণীর কাঁকনের কনকন কিংবা মস্তানের পাইপ-গান-শব্দ যেখান থেকেই জন্ম নিক না কেন, তাকে তরঙ্গাকারে কানের গর্ত দিয়ে ঢুকে কর্ণপটে ঘা মারতে হবে। কম্পমান কর্ণপটহ সেই শব্দতরঙ্গ হাতুড়ী, নেহাই ও রেকাবী মারফৎ সঞ্চালিত করবে মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুলার নালিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত ডিম্বাকার জানালায় বা ফেনেস্ট্রা ওভ্যালিসে। পেরিলিম্ফ পূর্ণ ভেস্টিবুলার খালের জলে ঢেউ উঠবে। কিন্তু সে তরঙ্গ সরাসরি টিমপ্যানিক নালীতে আসতে পারবে না কারণ হেলিকোট্রিমা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কাজেই 'রেইসনার মেমব্রেন' আন্দোলিত হবে এবং ককলিয়ার নালিকার এণ্ডোলিস এবং 'ব্যাসিলার মেমব্রেন'-এর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কাঁপন লাগবে। ককলিয়া খালের জলে ভাসমান ব্যাসিলার পর্দায় শব্দতরঙ্গ আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে পেরিলিম্ফ-পূর্ণ টিমপ্যানিক খালের জলেও ঢেউ উঠবে এবং শব্দতরঙ্গের চাপ বৃত্তাকার বাতায়নের পর্দায় আছড়ে পড়বে। নির্দিষ্ট কম্পনাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ তিনটি নালিকার জলে একই রকম তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং দুটি জানালা যৌথভাবে চাপের সমতা বজায় রাখে। ককলিয়া নালিকার এণ্ডোলিম্ফে আলোড়নের ফলে ব্যাসিলার পর্দার কেশ-কোষের সূক্ষ্ম সিলিয়া বা কেশগুচ্ছ 'টেকটোরিয়াল' পর্দার তলদেশে সুরসুরি দেয়; তার ফলে সুরবাদনতন্তুর ঝঙ্কার বহুগুণে বর্ধিত হয়। অত্যন্ত সংবেদনশীল 'অর্গান অবকর্টি'র কেশকোষের উদ্দীপনা শ্রুতিস্নায়ু শাখাসমূহের মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। কিছু একটা শোনার জন্য পর্দা, হাড়, জানালা, খাল প্রভৃতি দিয়ে কানের গঠনটা প্রকৃতিদেবী এমন প্যাঁচালো করেছেন কেন—সেটা দুর্জ্ঞের রহস্য বলে মনে হলেও শব্দ-বিজ্ঞানীরা কিন্তু এর অসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। শব্দতরঙ্গ কোন কঠিন বস্তুতে প্রতিহত হলে বেশীর ভাগ শব্দশক্তি প্রতিফলিত হয়। কর্ণপটহে শব্দতরঙ্গ প্রতিনিয়ত আঘাত করছে এবং এই শব্দের শক্তি যাতে হ্রাস না পায় তার ব্যবস্থা প্রকৃতি করে রেখেছে মধ্যকর্ণের মধ্যে। রেকাবীটা শব্দতরঙ্গের দীর্ঘতল কম্পন বিস্তারগুলিকে, শক্তিশালী ক্ষুদ্র কম্পন বিস্তারে রূপান্তরিত করে। 'হাইড্রলিক প্রেস' যেমন একটি পিস্টনের উপর পতিত চাপকে দ্বিতীয় আর অপেক্ষাকৃত ছোট পিস্টনে কেন্দ্রীভূত করে, তাকে বিবর্ধিত করে তেমনি রেকাবীর 'ফুটপ্লেট' ও হাইড্রলিক প্রেস' সূত্রানুযায়ী কানের পর্দায় উপর পতিত শব্দের দুর্বল চাপকে 22গুণ বর্ধিত করে ডিম্বাকার জানালা মারফত ভেস্টিবুলার খালের জলে ঢেউ তোলে এবং পর্যায়ক্রমে মাঝে ও নীচের খালের

জলেও সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। কর্ণপটহের উপর শব্দতরঙ্গ যে শক্তিতে আঘাত করে, মধ্যকর্ণ তার প্রায় সবটাই অন্তরকর্ণে প্রেরণ করে, শব্দশক্তির প্রতিফলন ঘটতে দেয় না। রেকাবী যদি না থাকতো তবে অনেক শব্দকেই কর্ণবিদারী বলে মনে হত না সত্যি কিন্তু বেদনার্ত রোগীর ক্ষীণ-স্বর এখনও যেটুকু সিস্টারদের কানে যায়, তাও তখন পৌঁছতো না।

ছোটবড় নানান মাপের সমান্তরালভাবে সজ্জিত সুরবাদন তন্ত্রী দিয়ে গড়া 'ব্যাসিলার মেমব্রেন' শব্দের কম্পাঙ্ক, তীক্ষ্ণ ও তীব্রতা মোটামুটি বিশ্লেষণ করতে পারে। কিন্তু চুলচেরা বিচারপর্ব সম্পন্ন হয় সেরিব্রাল কর্টেক্সে, কেমন ভাবে হয় তাও আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। কক্লিয়া নালিকার 'ব্যাসিলার মেমব্রেন'-এর বিস্তার সর্বত্র সমান নয়। কক্লিয়ার ডগায় এই ব্যাসিলার পর্দা সবচেয়ে প্রশস্ত এবং নমনীয়, কিন্তু গোড়ার দিকে অপেক্ষাকৃত সরু ও শক্ত। ব্যাসিলার পর্দার আকৃতিগত পার্থক্য স্বন তীক্ষ্ণতা নির্ধারণ করে। শব্দতরঙ্গের সম্পর্ক বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য শব্দের তীক্ষ্ণতা নিরূপণ করে। উচ্চকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ চড়া সুরের জনক এবং নিম্নকম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ খাদসুর সৃষ্টি করে। ব্যাসিলার পর্দার কম্পনের হার নির্ভর করে স্বনতীক্ষ্ণতা বা শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কক্লিয়ার বিভিন্ন অংশের সংবেদনশীল কোষ বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গে সাড়া দেয়। কক্লিয়ার অগ্রভাগে ব্যাসিলার পর্দার কোষগুলি খাদসুর (মানুষের বেলায় 6·5 হার্জ) এবং গোড়ার দিকে কোষগুলি চড়া সুরের (মানুষের বেলায় 16000 হার্জ) পরশ অনুভব করতে পারে। মধ্যকর্ণের অস্থির মারফৎ প্রেরিত শব্দতরঙ্গ ব্যাসিলার পর্দার উপর দিয়ে কতদূর যাবে তা নির্ভর করে কম্পাঙ্কের উপর। উচ্চকম্পনাঙ্কের তরঙ্গ স্বল্প পথ অতিক্রম করতে পারে কিন্তু নিম্নকম্পাঙ্কের তরঙ্গ আরও বেশীদূর যেতে পারে। একটুকু কথা শুনি যে একটুকু ছোঁয়া (কর্ণপটহে) লাগে তা কক্লিয়ার ডগায় চলে যায়। হিসাব করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ ব্যাসিলার পর্দাকে এক সেণ্টিমিটারের দশ শত কোটি ভাগেও কম্পিত করতে পারে। শব্দের তীব্রতা সম্বন্ধেও কান খুব সজাগ। দীর্ঘ বিস্তারের শব্দতরঙ্গ বা উচ্চতর ব্যাসিলার পর্দাকে গভীরভাবে আঘাত করে এবং তার ফলে শ্রুতিস্নায়ুতন্তুগুলি অধিকতর উত্তেজিত হয়।

কক্লিয়ার কেশ-কোষের সংবেদন কিভাবে শ্রুতি নার্ভে পরিবাহিত হয় তাও রহস্যাবৃত। এ নিয়ে অনেক তত্ত্ব রচিত হয়েছে যা তথ্য দিয়ে সমর্থন করা দুরূহ। সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় যখন কোন শব্দ কানে ঢুকছে না, তখন কোষের কঠিন কোষগুলি 'টেকটোরিয়াল মেমব্রেন'কে আলতোভাবে স্পর্শ করে থাকে এবং শব্দতরঙ্গের ধাক্কায় টিমপ্যানিক খালের জল-তরঙ্গ যখন ব্যাসিলার পর্দাকে নিচ থেকে উপর দিকে ধাক্কা মারে তখন টেকটোরিয়াল পর্দার উপর একটা ঘর্ষণ শক্তি বা 'সিয়ারিং ফোর্স'-এর চাপ পড়ে। সম্ভবত কেশকোষের বা 'সিলিয়া'র মধ্যবর্তী দণ্ড বা 'রড' এই চাপকে বর্ধিত করে এবং তার ফলে টেকটোরিয়াল পর্দা ও ব্যাসিলার পর্দা সমান্তরালভাবে পরস্পরের বিপরীত দিকে সরে যায়। উপদেশ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া যায় কিনা সেটা বলতে পারেন যাঁরা ঘন ঘন উপদেশ

নেন, তবে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে শব্দ যে কান দিয়ে ঢোকে মস্তিষ্কের বিপরীত পার্শ্বের শ্রবণ কেন্দ্রে তা অধিকতর উদ্দীপনা সঞ্চার করে। উইলডার পেনফিল্ড ও তাঁর সহযোগীরা মন্ট্রিল নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে মস্তিষ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তেজনা সঞ্চার করলে রোগী মনে করে বাম দিক থেকে শব্দ আসছে এবং বাম দিকে উদ্দীপন দক্ষিণ পার্শ্বে শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় দুটি কানই একই সময় শব্দ শোনে যদিও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ডান দিকে শব্দ সৃষ্টি হলে বাম কানের থেকে ডান কানে শব্দ 0·0005 সেকেন্ড আগে পৌঁছায়। বাম দিক থেকে 'কাঁঠালের আঠা' ও ডান দিক থেকে 'কি দারুণ দেখতে' যখন তরঙ্গাকারে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কের বিপরীত পার্শ্বের শ্রুতিকেন্দ্রে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করে তখন বেচারা শ্রোতাদের এক নিদারুণ অবস্থায় পড়তে হয়। অর্থাৎ ডান ও বাঁ কানের 'কর্টিসাহেবের অর্গান'-এর সঙ্গে যুক্ত শ্রুতিস্নায়ুগুলির বেশীর ভাগ নার্ভ পরস্পরকে অতিক্রম করে মস্তিষ্কের বাম ও ডান সেরিব্রাল কর্টেক্সে উপনীত হয়। কেশ-কোষের সংবেদন শ্রুতি নার্ভ কেমন করে গ্রহণ করে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে ব্যাসিলার পর্দা শব্দের বলশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে (সবরকম শক্তির রূপান্তর হয়) এবং সেই বিদ্যুৎ ত্বরিত গতিতে কর্টেক্সে হাজির হয়।

কবি বলেছেন, 'আমি কান পেতে রই'।' শুধু কবি নন, আমরা সবাই বাতাসে ভাসমান শব্দতরঙ্গ ধরার জন্য কানের ফাঁদ পেতে রেখেছি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কান না পেতেও শোনা যায় এবং তা সম্ভব করোটি ও অস্থির সাহায্যে। কানের গর্তে তুলো দিয়ে তাম্বুলচর্বণ কিংবা অধরচুম্বন করলে চোয়াল ও করোটির কম্পন মধ্যকর্ণকে 'বাইপাস' করে অন্তঃকর্ণে মধুর গুঞ্জরণ সৃষ্টি করবে।

প্রকৃতি কিন্তু মানুষের শ্রবণক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। মোটামুটি 20 থেকে 20000 কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ আমাদের শ্রুতিগ্রাহ্য যদিও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক মানবেতর বাসিন্দা শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ সৃজন ও গ্রহণ করতে পারে। কত অশ্রুত ধ্বনিতরঙ্গে ভুবন ভেসে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের তাতে কর্ণপাত করার উপায় নেই। মানুষের শুভকামনায় প্রকৃতি এটা করেছেন। বিশ কম্পাঙ্কের নিচে ক্ষীণ শব্দতরঙ্গ মানুষের শ্রবণকেন্দ্রে যদি সাড়া জাগাতো তবে মহাসঙ্কট সৃষ্টি হত। দেহের পেশীসঙ্কোচন ও প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে করোটির কম্পন বায়ুতে ভাসমান শব্দতরঙ্গের সঙ্গে মিশে মানুষকে শব্দোন্মাদ করে দিত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর নিঃসীম শূন্যতা বিরাজ করছে বলেই মহাজাগতিক শব্দতরঙ্গ ভেসে আসতে পারছে না এই ধরাধামে, না হলে আমরা সবাই 'বিশ্বশ্রবা' মুনি হতাম। মহাবিশ্বের মহাকাশের যে সংগীত কবি শুনেছেন তা ধ্যানে, কানে নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, শৈশবকালে মানবশিশু আক্ষরিক অর্থে উচ্চৈঃশ্রবা, কারণ সে 40000 কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করতে পারে যদিও জন্মের অব্যবহিত পরে শ্রবণক্ষমতা অনেক কম থাকে। ভ্রূণজীবনের শেষ পর্যায়ে মাতৃগর্ভের ঈষদুষ্ণ মৃদু লবণাক্ত জলে মধুর অন্ধকারে শায়িত মানব শিশুও শুনতে পায় যেমন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যু নাকি পেয়েছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনার ক্ষমতাও কমে যায় এবং এটা হয় কর্ণপটহের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পাওয়ার জন্য। যে পর্দার যৌবনকালে 1 সেন্টিমিটারের

1/10000000000 অংশ অথবা ক্ষুদ্রতম পরমাণু হাইড্রোজেনের 1000 ভাগক্ষুদ্র কম্পন সৃজনের ক্ষমতা থাকে, বার্ধক্যে জরার শাসনে সে পর্দা শব্দতরংগ গ্রহণে ভয় পায়। হিসেব করে দেখা গেছে যে চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে ছয়মাস অন্তর উচ্চ কম্পাংক সীমা থেকে প্রতি সেকেণ্ডে 80 কম্পাঙ্ক শব্দতরংগ ধরার ক্ষমতা কান হারিয়ে ফেলে। ই. এন. টি. স্পেশালিস্ট না হয়েও দিদিমা একে বলতো 'কানের মাথা খাওয়া' যখন একটা জিনিষ আনতে বললে, দাদু অন্য একটা নিয়ে আসতো।

মানুষের কানের গঠন অত্যন্ত জটিল হলেও শোনার ব্যাপারে কিন্তু অনেক প্রাণী মানুষকে পরাজিত করেছে। বাদুড়, শুশুক প্রভৃতি প্রাণীরা শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ বা 'আলট্রাসোনিক সাউন্ড' গ্রহণে সক্ষম। প্রাণীজগতের বেশীর ভাগ প্রাণী অবশ্য মূক ও বধির। জৈব প্রয়োজনেই প্রাণীদের মধ্যে শব্দসৃষ্টি ও শব্দগ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গের উৎপত্তি একই সময়ে হয়েছে। পতঙ্গ, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীদের বেলায় প্রকৃতিদেবী যে ফরমুলায় এ সমস্যার সমাধান করেছেন, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জন্য সম্পূর্ণ নূতন পন্থা গ্রহণ করেছেন। শ্রবণের একটা মূল কাঠামোকে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত করেছে, মাছ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীগোষ্ঠীর ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে। মাছের কোন মধ্য ও বহিঃকর্ণ না থাকলেও অন্তঃকর্ণ মারফৎ সে শুনতে পায় যদিও দেহের ভারসাম্য বজায় রাখা এর প্রধান কাজ। অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীদের মত মাছের কানে অবশ্য ককলিয়া নেই যার সাহায্যে বায়ুতাড়িত শব্দতরঙ্গ ধরা যায়। হাঙ্গর প্রভৃতি কোমলাস্থিবিশিষ্ট মাছ 400 থেকে 600 কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ এবং কঠিনাস্থিবিশিষ্ট মাছ 16 থেকে 13000 কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ অনুভব করতে পারে। সাধারণতঃ অত্যন্ত নিম্নকম্পাঙ্কের তরঙ্গ 16 থেকে 100 চক্র প্রতি সেকেণ্ডে অনুভূত হয় গাত্রচর্ম অথবা পার্শ্বীয় রেখার স্নায়ুকোষ দ্বারা এবং মাছের পট্কা ও 'ওবেরিয়ান অশিকিলস' শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণে প্রেরণে সাহায্য করে।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বিবর্তন নাটকের কয়েকটা অংক হয়ে যাবার পর বায়ুতাড়িত শব্দতরঙ্গ গ্রহণে সক্ষম কর্ণের আবির্ভাব হল এবং সঙ্গে সঙ্গে কেল্লামাত। কর্ণের এই অদ্ভুত অভিনয়ের পিছনে রয়েছে স্বরযন্ত্র নামক প্রম্পটারের বিশেষ অবদান। স্বরতন্ত্রীর উপর দেহের পক্ষে ক্ষতিকর বর্জনীয় নিশ্বাস বায়ুর সংঘাতে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। অন্তঃনাসারন্ধ্র, ফুসফুস ও শ্বাসনালী এই তিনটি সম্পদের অধিকারী উভচর প্রাণীসৃষ্টি হল ডিভোনিয়ান যুগে মীনগোষ্ঠী থেকে। প্রথম উভচরের অস্ফুট কণ্ঠস্বর সেদিন বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল সেদিন বিশ্বে কি আনন্দ, কি হর্ষ। কানের গঠন উভচরদের খুব উন্নত নয় যদিও সবেমাত্র মধ্যকর্ণের আবির্ভাব হয়েছে। উভচর থেকে সৃষ্ট সরীসৃপদের কান উভচরদের মতই অপুষ্ট যদিও তারা শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করেছে। সাপের টিম্প্যানাস বা কর্ণপট এবং শ্রুতিনালী না থাকলেও শব্দের কম্পন অনুভব করতে পারে, যখন মৃত্তিকাবাহিত শব্দ তরঙ্গ চোয়ালের অস্থি 'কোয়াড্রেটের' সাহায্যে অন্তঃকর্ণে প্রেরিত হয়। সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানী ওয়েভার ও ভারনন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রতি সেকেণ্ডে 100 থেকে 500 কম্পাঙ্কের বায়ুবাহিত শব্দতরঙ্গও সাপ কান দিয়ে শুনতে পায়। বহিঃকর্ণ না থাকলেও পাখির কান স্তন্যপায়ীদের মতই উন্নত এবং শব্দতরঙ্গ বিশ্লেষণে পারদর্শী যদিও সরীসৃপদের দুটি পৃথক গোষ্ঠী থেকে পাখি ও

স্তন্যপায়ীদের সৃষ্টি হয়েছে। জাতিজনিগত কোন নিবিড় সম্পর্ক না থাকলেও এই দুটি ভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠীতে একই অঙ্গের একই গঠনভঙ্গী সমান্তরাল বিবর্তনের একটি সুন্দর নিদর্শন। পাখির কানও মানুষের মত শব্দের সুর বা 'টোন' বিশ্লেষণ করতে পারে ব্যাসিলার পর্দার সাহায্যে।

বিভিন্ন প্রাণীর কণ্ঠস্বরে বিজ্ঞানীরা অর্থপূর্ণ সংকেত বা 'কোড'-এর সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু অর্থবহ ছন্দোবদ্ধ বর্ণের মালা দিয়ে তৈরি বাক্য যা মনের ভাব প্রকাশ করে তা কেবলমাত্র মানুষেরই নিজস্ব সম্পদ। মানবসভ্যতার আদিপর্বে অর্থবহ শব্দ বা বাক্যদ্বারা ভাবপ্রকাশ (sound system) পরবর্তীকালে 'ভিস্যুয়াল সিস্টেম' (visual system)-এ রূপান্তরিত হয়। শ্রুতিনির্ভর জ্ঞানরাশি লিপির বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হবার পরেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গতি সঞ্চারিত হল। অন্যপ্রাণীর কথা থাক, মানুষের পিতামহসদৃশ শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং প্রভৃতি উচ্চতর প্রাইমেটরা স্বরতন্ত্রী, জিহ্বা, তালু, ওষ্ঠ ও দন্ত থাকা সত্ত্বেও অর্থবহ শব্দ বা বাক্য উচ্চারণে ব্যর্থ হল কেন সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে করোটির গঠন, মুখগহ্বরের আকার, চোয়ালের গঠন ও করোটির সংগে সংযুক্তি এবং সর্বোপরি মস্তিষ্কের মেধাকেন্দ্রের অস্ফুট বিকাশের জন্যই এটা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে মানুষের বাকশক্তির সংগে কানের একটা নিবিড় সম্পর্ক প্রমাণিত হয়েছে। কেবলমাত্র মানুষের কানই দ্রুত সঞ্চারী শব্দপ্রবাহ বিশ্লেষণে সক্ষম এবং এ কারণেই মানুষ কথা বলতে শিখেছে এবং পরে বাচাল শিরোমণি উপাধি লাভ করেছে।

কত কথা আমরা শুনি, তার বেশীর ভাগই কয়েকদিনের মধ্যে ভুলে মেরে দিই। ভোলে বাবা পার লাগায়। কিন্তু কোন কোন কথা স্মৃতিপিসীর বর্মবাক্সে চিরকালের মত বন্দী হয়ে থাকে। কতকাল আগে এক সন্ধ্যাবেলায় লুকোচুরি খেলার সময় কানে মাকড়ি পরা গৌরী নামে সেই কিশোরী মেয়েটি সেদিন আমার কানে কানে বলেছিল 'তোমায় খু-উ-ব ভালবাসি' সেদিন আমার কানের সুরবাদন ব্যাসিলার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কোমলগান্ধারে যে ঝঙ্কার উঠেছিল, তা জীবনের অপরাহ্ন বেলায় আজও সমানে বেজে চলেছে। পৃথিবীকে তাই আজও ভালবাসি। বিভিন্ন শব্দতরঙ্গ মনের তারে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি সঞ্চার করে। মেঘের গুরু গুরু গর্জন বা গাণ্ডীব ধনুর টঙ্কার যেমন পৌরুষের প্রতীক তেমনি পাহাড়ী ঝর্ণার উচ্ছল জলধারা যেন আদিবাসী রমণীর কলতান। সেরিব্রাল কর্টেক্সের পর্দায় বিভিন্ন ধ্বনিতরঙ্গে নানারঙের ছবি কিভাবে ফুটে ওঠে তা বিজ্ঞানীদের গভীর গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে। কান থাকলেই কিন্তু শোনা যায় না। কান তো শোনে না, শোনে মন। কানের ভিতর দিয়া মরমে না পশিলে ব্যর্থ শ্রবণ ইন্দ্রিয়। 'ন মেধয়া ন বহুনাঃ শ্রুতেন' অক্ষরে অক্ষরে সত্য এই ঋষি বাক্য। মানুষও প্রাণীদের অনেক আচরণই শব্দনিয়ন্ত্রিত এবং এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু কিভাবে 'কর্টেক্স' অন্যান্য কেন্দ্রে 'মেসেজ' পাঠায় এবং আচরণবিধি নিয়ন্ত্রিত করে তার চাবিকাঠি আজও

বিজ্ঞানীরা খুঁজে চলেছেন। 'বাসনায় আগুন দে' শুনে লালাবাবু ঘর-সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কেন তার উত্তর নার্ভতত্ত্ববিশারদগণ দিতে পারবেন না। এটা শব্দাতীত আর একজনের ডাক। মানবমনের চেতনার এই দ্যোতনা মানুষকে দিয়েছে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে মহিমময় করেছে। জীবজগত বৈধ শব্দসৃষ্টি ও গ্রহণে যথেষ্ট পারদর্শী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে হারিয়ে দিয়েছে কিন্তু এর সবটাই অত্যন্ত স্থূল, যান্ত্রিক এবং জীবনের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জীবনাতীত আর একজনের আকুল আহ্বান মানুষের কানই শুনতে পায়, তবে তার জন্য কর্ণকে উৎকর্ণ করতে হবে। বধিরতাও কোন কোন সময় বিধাতার আশীর্বাদ হতে পারে যদি হৃদয়ে অধীরতা জাগে তাঁকে পাবার জন্য যেমন আমরা দেখেছি মহীয়সী মহিলা হেলেন কেলারের জীবনে। সে ভাগ্য সবার হয় না। সামান্য এই দুটো 'কানে বেলা যায় পরবাসী ফিরে আয়' শুনে বুকের মাঝখানটায় যখন ভারী ভারী মনে হয়, গলার কাছে একটু নোনতা লাগে, তখন প্রকৃতিকে প্রণাম জানিয়ে বলি সার্থক আমার শ্রবণ।

স্যাম লয়েডের ধাঁধা

সুশান্ত রায়*

জীবনে সমস্যা অনিবার্য। আর সেই সমস্যার মূলগত কথা ভাবতে গিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক কিম্বা বিজ্ঞানী। তবে সমস্যার ভেতর দিয়ে সমস্যা সমাধানের প্রয়াসে একটা বিশেষ আনন্দও আছে—যার অন্যতম পথিকৃৎ স্যাম লয়েড।

ছোটবেলা থেকেই অনুসন্ধিৎসু মন ধাঁধা ভালবাসে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার ধাঁধার জগতে তেমনি এক অবিস্মরণীয় নাম স্যাম লয়েড। যিনি জীবনের পঞ্চাশটা বছর নতুন নতুন ধাঁধা আবিষ্কার করে হয়েছিলেন—"ধাঁধার রাজা"—তিনি আজ বিস্মিত প্রায়।

1841 সালের ফিলাডেলফিয়ার এক অবস্থাপন্ন ঘরে স্যাম লয়েডের জন্ম। যখন তাঁর বয়স তিন বছর, তখন তাঁর বাবা নিউ ইয়র্কে বদলি হয়ে যান। সেখানেই স্যাম লয়েড একটা সাধারণ স্কুলে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনো করেন। তবে দাবার প্রতি তাঁর এমন প্রচণ্ড অনুরাগ ছিল যে, একবার দাবা নিয়ে বসলে নিজেদের মধ্যে সমস্ত কাজ ভুলে যেতেন। ফলে দাবাই হয়ে ওঠে তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাই স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজে আর পড়া হল না। সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ভেবেছিলেন যদি তিনি কলেজে পড়তে যেতেন তাহলে তিনি এক মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার অথবা বিরাট গণিতবিদ হতে পারতেন।

আমেরিকাতে 1835 সাল থেকেই দাবা একটা বিশেষ প্রচলিত খেলা হয়ে পড়েছিল। সংবাদপত্রে ও বিভিন্ন সামাজিক পত্র-পত্রিকায় দাবা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হত। স্যাম লয়েডের বয়েস যখন চৌদ্দ বছর, তখন তাঁর একটি দাবা-বিষয়ক প্রবন্ধ নিউইয়র্কের একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে স্যাম লয়েড দাবায় এত পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, বিশ্বের দাবার জগতে একটা আলোচিত নাম হল এই স্যাম লয়েড। ষোল বছর বয়সে, সেই সময়কার এক নামকরা দাবার পত্রিকা "দাবার মাসিক" তাঁর এক বিতর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তিনি বহু পত্রিকায় দাবা কলমের সম্পাদনা বহুকাল ধরে করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বনামে, ছদ্মনামে বহু প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

1877-1878 সালে "সায়েন্টিফিক আমেরিকান" দাবা-বিষয়ক একটা সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করত। স্যাম লয়েড এখানে যে সব প্রবন্ধগুলো লিখেছিলেন, সেগুলো একসঙ্গে করে "চেজ স্ট্র্যাটেজি" নাম দিয়ে একটা বই প্রকাশ করেন।

লয়েড আঠারো বছর বয়সে দাবার উপর যে সব সমস্যামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেগুলো পরে বহুবার বহু বইতে একাধিকবার প্রকাশিত হয়। লয়েড কি শুধু দাবা নিয়েই

701, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-700034

ভাবতেন। না, তিনি বহু গাণিতিক মজাদার ধাঁধারও আবিষ্কর্তা ছিলেন। তাঁর ধাঁধার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—আমরা সচরাচর যেসব জিনিস দেখতে পাই, তারই মধ্যে এসব ধাঁধার উপস্থিতি। লয়েডের যে ধাঁধাটি প্রথম ব্যবসায়িক সাফল্য তাঁর জীবনে নিয়ে আসে, তার নাম হল পি. টি. বার-নামের গাধার চাতুরী।" এই ধাঁধাটি তরুণ লয়েডকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দশহাজার ডলার রোজগার করতে সাহায্য করে।

আমেরিকার ধাঁধার জগতে, আমরা দু-জন স্যাম লয়েডকে দেখতে পাই। তাঁরা হলেন বাবা আর ছেলে। বাবার মৃত্যুর পর ছেলে স্যাম লয়েড জুনিয়ার নাম নিয়ে বাবার কাজকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। 1911 সালে স্যাম লয়েড সিনিয়ারের মৃত্যুর তিন বছর পর 1914 সালে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ "সাইক্লোপিডিয়া অব পাজলস" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রায় পাঁচ হাজার ধাঁধা স্থান পেয়েছে।

ছোটদের কাছে ধাঁধাকে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায়, তা নিয়ে স্যাম লয়েডের চিন্তার অন্ত ছিল না। তাই বেশীর ভাগ ধাঁধাই ছোটদের কথা চিন্তা করেই তৈরি করতেন। স্যাম লয়েড আমাদের কাছে যেহেতু বিদেশী, তাই তাঁর ধাঁধার চরিত্রের নায়ক-নায়িকারাও অনুরূপ বিদেশী। কিন্তু আমরা এই লেখায় তাঁর সেই নায়ক-নায়িকার নামগুলো আমাদের নিজেদের দেশের মতই করে নিচ্ছি।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে, ছোট্ট মেয়ে খুকুর মনে হল—সে একটা সিল্কের লেস বুনবে। এর জন্যে কয়েকটা সিল্কের সুতোর ফেটী কেনা দরকার। খুকু মার কাছে তেত্রিশ টাকা নিয়ে দোকানে চলে গেল। খুকু দোকানদারকে বলল "আমাকে তিনটে সিল্কের সুতোর ফেটী আর চারটে ছোট মিহি পশমী কাপড় দিন। বলুন কত দাম হল?" দোকানদার হিসেব করে বলল একত্রিশ টাকা। খুকুও একত্রিশ টাকা দিলে, তারপরে তার খেয়াল হল, তিনটে সিল্কের সুতোর ফেটী দিয়ে সব কাজ হবে না, চারটে দরকার। তখন দোকানদারকে ডেকে বললে "না না আমার চারটে সিল্কের সুতোর ফেটী আর তিনটে মিহি পশমী কাপড় চাই।"

খানিক পর দোকানদার মালগুলো প্যাকেট করে এনে বলল, আরো এক টাকা লাগবে। শুনেই খুকু একটু রেগে গেল। কারণ মালের পরিমাণ সেই সাতটাই আছে, কিন্তু তবুও একটা টাকা বেড়ে যাওয়াতে লজেন্সের পয়সাতো কমে গেল? তা আর কি করা যাবে। একটা টাকা দোকানদারকে দিয়ে খুকু চলে গেল। এখন দোকানদার কি সিল্কের ফেটী এবং ঐ পশমী কাপড়ের দাম ঠিক নিয়েছিল? আর প্রত্যেকটার দাম কত করে, তা কি এ থেকে বলা যেতে পারে। অবশ্য বলাটা খুব একটা শক্তকর ব্যাপার নয়। কারণ এ রকম ধরণের ধাঁধা আমাদের দেশে মিষ্টির দোকানে মিষ্টি কেনা নিয়ে খুবই প্রচলিত আছে। খুকুর উত্তরটা এই লেখার শেষে আছে। একনম্বর উত্তর।

* * * *

নকুলের মেসের খবর কার আর অজানা? যারা বাড়ীতে থাকেন, তাঁরা কি করে জানবেন কিন্তু যাঁরা মেসে থাকেন পূব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে পৌষ মাসে পৌষপার্বণের দিনে নকুলের মেসের

নাম সবার মুখে মুখেই শোনা যায়। এই দিনে নকুলবাবু এক বিশাল পিঠে-উৎসবের আয়োজন করেছিলেন ও অন্যান্য মেসের লোকদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

নকুলবাবু তাঁর পাচক হরিহরকে ডেকে মাংস, ফল প্রভৃতির পুর দিয়ে এক বিশাল পিঠে তৈরি করতে বললেন। প্রত্যেকে তা খেয়ে যেন তারিফ করে। তবে পিঠে হবে মোটে একটি।

হরিহর সেই বিশাল পিঠে তৈরি করে নিয়ে এলে নকুলবাবু বললেন, "দেখো হরিহর, আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে, তাতে এই পিঠেটাকে ছয় বারের বেশী কাটতে পারবে না অর্থাৎ ছয়বারের বেশী ছুরি চালাতে পারবে না। কিন্তু ঐ একটা পিঠে থেকেই এখানে যতজন নিমন্ত্রিত অতিথি আছেন, তাঁদের সবাইকে দিতে হবে। আর যদি না পার, তাহলে তোমার আর···কথা শেষ করার আগেই হরিহর বুঝতে পেরে গেছে, যেভাবেই হোক ভাগ তাকে করতেই হবে—তা না হলে চাকরী থাকবে না। সেই সময় ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষপার্বণের' একটা পরিচিত লাইন মনে পড়ে গেল, চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলির ভাগি'। সত্যিই তাই। এ হেন অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত। হরিহরকে সাহায্য করা, না চুপ করে বসে দেখা হরিহর কি করে? আমাদের ভাবনা-চিন্তা করার সময় না দিয়েই হরিহর পিঠেটাকে ছয়বার কেটে বাইশটা ভাগে ভাগ করল। কারণ, ঐ অনুষ্ঠানে বাইশজন নিমন্ত্রিত
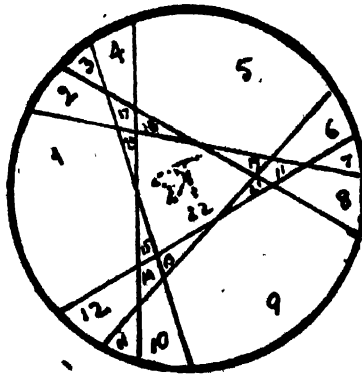
1নং চিত্র

অতিথি এসেছিলেন। ব্যাপারটা খুব একটা সোজা নয়। কিন্তু হরিহর কিভাবে এই অসাধ্য সাধন করল তা শেষের ছবিতে [1নং চিত্র] দেখানো হয়েছে। ছবির মধ্যখানটাতে 'প' লিখে দেওয়া হয়েছে, পিঠেটাকে বোঝানোর জন্যে।

* * * *

এই কয়দিন আগে চৈতীমেলায় হৈ হৈ করে সার্কাসের তাঁবু বসল। সবাই আসছে, দেখছে—ভিড়ও বেশ হচ্ছে। কিন্তু সেখানে দেবু খুড়োকে দেখে প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। কিপটে খুড়ো সহজে পয়সা খরচ করে সার্কাস দেখার পাত্র নন। সার্কাসটা কত বড়, কি কি জন্তু-জানোয়ার আছে, কি কি খেলা আছে না জেনে টিকিট তিনি কাটবেন না। বাইরে বড় বড় রংবীন পোস্টার দেখে, সার্কাসের গেটে যে লোকটা বসেছিল, তাকে জিগ্যেস করলেন, ''আচ্ছা, এই

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষ　　ডিসেম্বর, 1980　　দ্বাদশ সংখ্যা

আমাদের কথা

জন্মলগ্নের আহ্বান

বিভূতি মজুমদার

মাত্র তিন শত বছর আগেও আইজাক নিউটনকে তাঁর বিখ্যাত গবেষণাগুলি ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করতে হয়েছিল। কারণ তখন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাকে বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী বলে মনে করা হতো না। একটা ভাষার একটি বিশেষ চরিত্র বিকাশের পক্ষে তিন শত বছর খুব একটা বেশি নয়। সে তুলনায় বাংলা ভাষার বিকাশ অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিই বিস্ময়কর। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অবদান এক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা সর্বাগ্রে বাংলাভাষায় প্রকাশ করে এবং তাঁর আবিষ্কার বাঙালী বিদ্বজ্জনের সমক্ষে প্রমাণ করেও নিষ্ঠুর উপেক্ষাই শুধু পেয়েছিলেন; শেষে ইংরেজিভাষার সাহায্যে প্রকাশ করে বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পরই তাঁকে এদেশে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়েছিল। এই অবস্থা থেকে আমরা কতটা এগিয়েছি সে পর্যালোচনা বিশেষজ্ঞদের।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সারা জীবনটাই স্বাধীন শিল্প বিকাশের জন্য 'গবেষণা ও প্রচার' এই উভয়বিধ সংগ্রামেরই ইতিহাস। বাংলাভাষায় পরিভাষা তৈরি করতে করতেই এঁদের পথ চলতে হয়েছে। বাংলাভাষাকে বিজ্ঞান চর্চার উপযোগী করার সংগ্রাম প্রায় এক শতাব্দীর। আজকে বাংলাভাষায় কঠিনতম গবেষণা প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। ভাষার এই চরিত্র বিকাশের পক্ষে এক শতাব্দীর এই অগ্রগতি বিস্ময়কর তো বটেই।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মত এত বিপুল ভরবেগ নিয়ে আর কোন সংস্থা বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেনি। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর আচার্যত্ব এখানেই যে তৎকালীন বিজ্ঞানজগতের বাংলাভাষী প্রায় সব কয়জন দিকপাল ও সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ তপস্বীদের তিনি সংগঠিত করেছিলেন এবং এক বিপুল কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত করতে পেরেছিলেন। এতগুলি প্রতিভাধরের সমন্বয়ে বিজ্ঞান পরিষদ যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব ছিল সর্বব্যাপী। প্রথম দিককার ধাক্কায় বাংলা পরিভাষার শতাব্দীর

বিবর্তন এক প্রচন্ড উল্লম্ফনে প্রস্ফুটিত হয়ে বাংলাভাষাকে বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশের বাহন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। অবশ্য আজও সর্বজনস্বীকৃত পরিভাষার অভাব বিদ্যমানই শুধু নয়, নিত্য নূতন আবিষ্কারের সাথে সাথে এই অভাব ক্রমবর্ধমানও। পরিভাষা হলো ভোজনশালায় হাতা খুন্তির মত, যার অভাবে ভোজ্যবস্তু পাত্রের বদলে মাটিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েই যায়। পরিভাষার সমস্যা আপাতত এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

এটা খুবই সত্যি কথা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ জন্মলগ্ন থেকেই সাক্ষর মানুষের মধ্যে একটা সত্যিকার তাগিদ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এটা এই কারণেই যে তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এবং তখনও আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান নি এমন উদীয়মান তরুণ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান পরিষদকে তাঁদের নিজেদের সংস্থা হিসেবে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন।

1948 সালের 25শে জানুয়ারী রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীরাজশেখর বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন উৎসবে প্রায় চারি শত বিজ্ঞান অনুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ

> "......পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনের সমস্যাগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও সমাধান করা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ব্রতী হবে প্রধানতঃ এই কার্যে। কিন্তু সর্বোচ্চশ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের জন্য প্রয়োজন হবে প্রবন্ধ, পরিক্রমা, গবেষণা বাংলাভাষায় প্রকাশ করা।......"

এ ঘোষণার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। সাড়াও পাওয়া গিয়েছিল আশাতীত। বস্তুতঃ গবেষণা ও প্রচার এই উভয় কার্যক্রম নিয়ে পরিষদের যাত্রা শুরু। পত্রিকার লক্ষ্য ছিল শুধু জ্ঞানের প্রচারণাই নয়, জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও পরিণত হওয়া। পত্রিকার প্রায় লক্ষ ছাপার অক্ষরের মধ্যে পাঁচ দশ হাজার অক্ষরও যদি মৌলিক গবেষণা বহন করে, তাহলে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা তাঁদের জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবেও একে পূর্ণতা দিতে পারেন। আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেন তরুণদের মধ্যেও। "কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর/আসর" নামকরণের মধ্যেও এই লক্ষ্য অন্তর্লীন। এখানে কিশোরেরা শুধু ছাত্র নয়, পর্যবেক্ষক ও গবেষকও। বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে আগ্রহ সৃজন, কিশোর ও তরুণ গবেষকদের আত্মপ্রকাশের ও আত্মবিকাশের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি, এক কথায় সমাজ জীবনে একটি সার্বিক অনুসন্ধিৎসা সৃজনের বীজ রয়েছে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তথা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ধমনীর মধ্যে। পরিষদের প্রথম কর্মসচিব শ্রীসুবোধ নাথ বাগচী মহাশয় প্রথম সাধারণ অধিবেশনে আবেদন করেছিলেন ঃ

> "......আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পষ্টই অনুভব করছি যে জনগণ উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজে নামবার আশায়। তাই আমাদের অনুরোধ বাংলাদেশের সমস্ত মনীষী, জ্ঞানীগুণীরা যেন এগিয়ে এসে পরিষদের কর্মভার হাতে তুলে নেন। জনসাধারণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে পরিষদের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে তার জন্য সচেষ্ট থাকেন।......"

এই ঘোষণা ও আবেদনের তীব্রতা তাঁরা শুধুতো বাক্যজালেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরঞ্চ গোটা শিক্ষিত সমাজের দার্শনিক নির্লিপ্ততার একেবারে গোড়া ধরে ঝাকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলেন। বন্যার মত দুর্বার বেগে নিজেরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজকের যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে সেই প্রেরণা ও উদ্যম কতটা বেগে বহমান তার বিচারক ইতিহাস। তবে প্রতিষ্ঠার তেত্রিশ বছর পরেও আজও জন্মলগ্নের সেই আবেদন সমান আর্তি নিয়ে দ্বারে দ্বারে নাড়া দিয়ে ফিরছে। সে আবেদনে আরও ছিল ঃ

> "……আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে এবং পরিষদকে সুষ্ঠুভাবে গড়তে হলে প্রয়োজন হবে পরিষদের নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ও কারখানা। এগুলো চালাতে হলে প্রয়োজন হবে বহুবিধ কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞের সাহায্য। …আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রচুর অর্থের।……"

যখন এই কথা বলা হয়েছিল তখন পরিষদের নিজস্ব আস্তানা ছিল না। পরবর্তী সময়ে পরিষদের নিজস্ব চার-তল বিশিষ্ট অট্টালিকা হয়েছে। কিন্তু সেই বাড়ীটিকে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার কাজ শুরু করার আগেই আচার্য বসুকে চলে যেতে হলো। বিজ্ঞানের যাঁরা সাধক, পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী তাঁদেরই ওপর প্রকৃত উত্তরসুরীর দায়িত্ব বর্তেছে। আমাদের বিশ্বাস, সহস্র কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের অপরিমেয় শক্তি ও সামর্থের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিনিয়োগেও আচার্য বসুর স্বপ্ন বহুলাংশে সফল হতে পারবে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান পরিষদের মধ্যে আবার বেঁচে উঠবেন এবং সমাজের গর্ভে ভাবীকালের আচার্যদের ভ্রূণ সৃষ্টির পরিবেশ গড়ে উঠবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর, 1980
দ্বাদশ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রমবৃদ্ধি : লাভ না ক্ষতি ?

আজকের দিনে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয় খুব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে, তাদের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের সঞ্চিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড অন্যতম। খনিজ জ্বালানী, কাঠ প্রভৃতি পুড়িয়ে তাপশক্তি আহরণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জীবদেহে শর্করা জাতীয় খাদ্য ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি তৈরির সময় উদ্ভূত কার্বন-ডাই অক্সাইড (যা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে) স্বতঃই বায়ুমণ্ডলে এসে জমছে। ভূগোলকে শক্তির চাহিদা মেটাবার তাগিদে যতরকম বিকল্প পদ্ধতি-ই উদ্ভাবিত হোক না কেন, তাদের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। তাই সুদূর ভবিষ্যতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আধিক্য কি অবস্থার সৃষ্টি করবে—তা নিশ্চিত ভাবে বলা সম্ভব নয়! বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে আজ বেশ চিন্তিত।

বিজ্ঞানীদের সনাতনী ধারণা অনুযায়ী এই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বায়ুমণ্ডলে থেকে যায়; বাকি অংশ বায়োস্ফিয়ারের নানা পদ্ধতি ও সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া এবং সমুদ্রের জলে শোষিত হয়ে যায়। তবে, এ ব্যাপারে বায়োস্ফিয়ারের ভূমিকা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা দ্বিমত পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন, বনজঙ্গল সাফ করে ফেলা এবং জমিজমাকে নানাভাবে ব্যবহারের ফলে বায়োস্ফিয়ার এখন আর ততটা শোষক হিসাবে কাজ করতে অসমর্থ। ফলে বায়োস্ফিয়ারের সঞ্চিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে উদ্ভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে বিষিয়ে তুলবে এবং প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎকে একটা শোচনীয় অবস্থায় নিয়ে যাবে! কেউবা আবার মনে করেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যত দিন যাবে, বায়োস্ফিয়ারের ভূমিকাও বদলে গিয়ে হয়তো আদৌ কোন ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি করবে না। সাম্প্রতিককালে ভূগোলকের কার্বন-চক্র জানবার প্রয়াসে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সেখানে জারিত এবং বিজারিত কার্বনের অবস্থিতি ধরা পড়েছে এবং তা থেকে জানা গেছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইডের বেশ ভাল অংশই সমুদ্র শোষণ করে নেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের তুলনায় বায়ুমণ্ডলে এখন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা পনের ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা—এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পরিমাণ দ্বিগুণে গিয়ে পৌঁছবে এবং তখন ভূপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা এখনকার গড় তাপমাত্রার চেয়ে অন্তত 3°C বৃদ্ধি পাবে। এই বৃদ্ধি আবার অক্ষাংশ বরাবর একই থাকবে না। তবে সাধারণত উচ্চ অক্ষাংশে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তাঁদের মত।

পৃথিবীর কয়েকটি অংশের আবহবিজ্ঞানী ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড আধিক্যের সুফল ও কুফল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। এঁদের কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড কোন কোন অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত ঘটাবে। তাছাড়া ভূপৃষ্ঠের কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি অন্য অঞ্চলও থাকবে যেখানে তাপমাত্রা গড়

তাপমাত্রার চেয়ে বেশ কম হবে। উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ, শ্বাসপ্রশ্বাস, জলগ্রহণ, নাইট্রোজেন বন্ধন প্রভৃতি ক্রিয়া অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে আরও ভাল ভাবে সংঘটিত হওয়ার সপক্ষে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন। তাঁরা আরও জানান—জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘ আবার মেঘ থেকে জল—এই জলচক্রটি যথেষ্ট প্রভাবিত হবে।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ঠিক কতটা জায়গা বরফে ঢাকা, মোট কি পরিমাণ বরফ আছে, শীতে এবং গ্রীষ্মে ঐ বরফের পরিমাণ কত—তা জানা নেই। ভূগোলকের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরুপ্রদেশের বরফ গলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। ঐ জলতলের বৃদ্ধি কিভাবে ঘটবে এবং তা কতটা সমতল-ভূমিকে প্লাবিত করবে সেটাই বড় চিন্তা। স্থির সিদ্ধান্ত এখনও হয় নি। জাতিসংঘও এনিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রমবৃদ্ধি লাভ না ক্ষতি—এনিয়ে সঠিকভাবে জানবার জন্য তাঁরা সম্প্রতি একটি 'কার্বন-ডাই-অক্সাইড' কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তাহলে, পরবর্তী-কালে তাঁদের গবেষণালব্ধ ফল জানবার জন্য এখন অপেক্ষা করা যাক।

শ্যামসুন্দর দে

ফোটন

আলো বা তদ্‌জাতীয় বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে যে শক্তি নিহিত থাকে, তাকে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি বলে। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় শক্তি যখন কোন বস্তু কর্তৃক শোষিত হয় তখন দেখা যায়, শোষিত শক্তির পরিমাণ $h\nu$ এর কোন না কোন পূর্ণসংখ্যার গুণিতক। ν হলো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের কম্পাঙ্ক এবং h, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। এই ঘটনা স্মরণ রেখে ভাবতে পারা যায় যে, বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্র আসলে বহু সংখ্যক শক্তি কণার সমবায়। এক একটি শক্তিকণায় শক্তির পরিমাণ $h\nu$। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন কম্পাঙ্ক থাকলে, সেই ভিন্ন ভিন্ন কম্পাঙ্কের শক্তিকণা $h\nu_1, h\nu_2, h\nu_3, \cdots\cdots$ প্রভৃতির সমবায়ে ঐ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রটি গড়ে উঠে। বিশিষ্ট কোন কম্পাঙ্কের শক্তি কণা, $h\nu$, কে ঐ কম্পাঙ্কের "ফোটন" বলা হয়।

শক্তিকণা বা ফোটন কোন না কোন কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের সঙ্গে জড়িত; সুতরাং স্থির ফোটন-এর কল্পনা অবাস্তব। বস্তুকণার গতি না থাকলে তাকে স্থির বস্তুকণা বলা হয় কিন্তু স্থির শক্তিকণা বা ফোটনের কোন অস্তিত্বই নেই। সেজন্য বলা হয়, স্থির ফোটনের ভর শূন্য। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে শক্তি স্থানান্তরিত হয় একটি নির্দিষ্ট গতিবেগে। ঐ ক্ষেত্রে সমস্ত শক্তি যেহেতু ফোটনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত, অতএব বলতে পারা যায় যে, ফোটনগুলির গতিবেগ ঐ ক্ষেত্রে শক্তি-স্থানান্তরের গতিবেগের সমান। সুতরাং ফোটনের যে ভর কল্পনা করা হয় তা পুরোপুরি ঐ ফোটনটির গতিশক্তিরই নামান্তর। অবশ্য বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে বা অনুরূপ তরঙ্গ ক্ষেত্রে শক্তি-স্থানান্তরিত হয় কতকগুলি তরঙ্গ-সমষ্টির সঙ্ঘ-গতিবেগে (group velocity)। সুতরাং একটি ফোটনকে অন্য কম্পাঙ্কের ফোটনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখলে, তার গতিবেগ বলে কিছুর কল্পনা করা যায় না।

এই সব মনে রেখে বলা যায়, শক্তিকণা বা ফোটন এর সঙ্গে বস্তুকণার বেশ কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রকে শক্তিকণা বা ফোটনের সমবায় বলে কল্পনা করার সময় এই সব কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন।

ময়েসবওয়ার ক্রিয়া

সত্যেন্দ্রনাথ দাস*

আলোচ্য প্রবন্ধে নিউক্লীয় গামারশ্মি অনুনাদ (nuclear gamma resonance) বা ময়েসবওয়ার ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গামাক্ষয় থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে আসল বক্তব্যকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে গিয়ে যতটা সম্ভব পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে ময়েসবওয়ার ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা ও যেসব বিষয়ে এই ক্রিয়ার বহুল প্রয়োগ আছে তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সভ্যতার উষাকাল থেকে মানুষের মনে নানা রকমের জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে। কখনও সে উত্তর খুঁজে পেয়েছে, কখনও পায় নি। কিন্তু তার অনুসন্ধিৎসু মন কখনও থেমে যায় নি। কারণ কৌতূহল এমন জিনিস, যা কোন নিষেধ মানে না। ঠিক একারণেই আজকের মানুষ বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার যাতায়াত এবং নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহে সে ব্যস্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে একজন বিজ্ঞানীর গবেষণা-লব্ধ তথ্যের অবতারণা করা হবে, যা সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞানের অনেক শাখায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। জার্মান দেশীয় বিজ্ঞানী আর. এল. ময়েসবওয়ার উনিশ শ' সাতান্ন খৃস্টাব্দে গামা বিকিরণ সংক্রান্ত পারমাণবিক অনুনাদের ক্ষেত্রে এক নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং পরে তার যথাযথ ব্যাখ্যাও তিনি দেন—যা এখন ময়েসবওয়ার-ক্রিয়া নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর গামাক্ষয় সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা দরকার। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তেজস্ক্রিয় পরমাণু কেন্দ্রীনের বিভিন্ন শক্তিস্তর আছে। এই শক্তির বাহক হিসাবে কাজ করে ফোটন নামক এক ধরণের কণা। এই কণার শক্তি হলো $h\nu$, h = প্লাঙ্কের ধ্রুবক এবং ν = ফোটনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফোটনের শক্তি সর্বদা একটি অখণ্ড সংখ্যার গুণিতক। কেন্দ্রীনের উচ্চশক্তি স্তর থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশক্তি স্তরে বা সর্বনিম্নশক্তি স্তরে (ground state) নেমে আসা বা তার ঠিক উল্টোটা হওয়ার সময় শক্তির নির্গমন (emission) ও অধিগ্রহণ বা শোষণ (absorption) হয় (চিত্র)। চিত্রে E_e ও E_g যথাক্রমে একটি কেন্দ্রীনের উত্তেজিত শক্তিস্তর (excited level) ও সর্বনিম্ন শক্তিস্তর। এক্ষণে E_e থেকে E_g-তে আসতে হলে যে শক্তির ফোটন নির্গত হবে তা হলো $(E_e - E_g)$।

অনুরূপভাবে যদি একই ধরনের কেন্দ্রীনের E_g থেকে E_e আসার প্রশ্ন উঠে তবে যে শক্তির ফোটন শোষিত হবে, তা হলো $(E_e - E_g)$। যদি কোন পরমাণু কেন্দ্রীনের E_e থেকে আগত গামারশ্মিকে কাজে লাগিয়ে অনুরূপ অন্য একটি পরমাণু কেন্দ্রীনকে E_g থেকে E_e-তে পৌঁছে দেওয়া যায়, তাহলে বলা হবে, গামারশ্মি সংক্রান্ত পরমাণুর অনুনাদ হয়েছে। এ ধারণা অবশ্য অনুনাদের সনাতনী

*পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

(classical) ধারণাকেই অনুসরণ করে। উনিশ-শ' সাতান্ন খৃস্টাব্দের পূর্বে এরূপ অনুনাদ প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা যে একেবারেই হয় নি তা নয়। কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধা দেখা দেওয়াতে সত্যিকারের অনুনাদ প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায়—পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে যখন কোন নির্দিষ্ট শক্তির ফোটন নির্গত হয় তখন সে পিছনের দিকে একটা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসে। ফলে যে শক্তিতে ফোটন বের হবার কথা ছিল তার চেয়ে কম শক্তি নিয়ে তা বেরুচ্ছে। আবার এই ফোটন যখন অনুরূপ কোন পরমাণু-কেন্দ্রাণে শোষিত হয়, তখনও ঐ প্রক্রিয়ায় কিছুটা শক্তি হারায়। তাহলে নির্গমন ও শোষণ এই দুয়ের মধ্যে ফোটন কণা দু-বার শক্তি হারায়। বোঝাই যাচ্ছে, এর ফলে অনুনাদ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। কারণ শক্তি হারানো মানে ν পরিবর্তিত হওয়া। একে বলে 'রিকয়েল এনার্জি-লস' (recoil energy loss)।

দ্বিতীয় কারণকে বলে 'ডপ্লার বিস্তৃতি' (Doppler broadening)। একথা জানা গেছে যে, তাপমাত্রার দরুণ পদার্থের ভেতরে একপ্রকার তাপীয় উত্তেজনার (thermal excitation) সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনার জন্য তেজস্ক্রিয় পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে নির্গত ফোটন একটি গতিবেগে বের হয়, যা অনুরূপ আর একটি পরমাণু কেন্দ্রীনে শোষিত হয়। অর্থাৎ ফোটনের উৎস (source) ও শোষকের (absorber) মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতিবেগ বর্তায়। যদি E_γ শক্তির ফোটন V_o গতিবেগে শোষকের দিকে লম্বভাবে ধাবিত হয়, তাহলে ফোটনের শক্তির পরিবর্তন হবে $\left(\frac{V_o}{c}\right)E_\gamma$, c হলো আলোর গতিবেগ। যেহেতু এক্ষেত্রেও গামারশ্মির শক্তি অর্থাৎ $h\nu$ পরিবর্তিত হচ্ছে, অতএব অনুনাদ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না।

মোসবাওয়ার বললেন, যে পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে গামারশ্মি নির্গত হচ্ছে তাকে কোন ধাতব কেলাসের (metallic crystal) ল্যাটিসে (lattice) শক্ত করে বেঁধে দিতে পারলেই সব ঝামেলার অবসান হবে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, পশ্চাদ্গমনের শক্তি (recoil energy) $R=\frac{E_\gamma^2}{2mc^2}$ (i)

E_γ ফোটনের শক্তি, c আলোর গতিবেগ এবং m হলো পরমাণু কেন্দ্রীনের ভর। এখন যেহেতু তেজস্ক্রিয় পরমাণুকে ক্রিস্ট্যাল ল্যাটিসের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কাজেই ভরবেগের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন রকমের সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে।

1) তেজস্ক্রিয় পরমাণু একাই পশ্চাদ্ভরবেগ (recoil momentum) গ্রহণ করে ল্যাটিসের মধ্যে সাম্যাবস্থা থেকে সরে দাঁড়াতে পারে;

2) ক্রিস্ট্যাল ল্যাটিস সামগ্রিক ভাবে পশ্চাদ্-ভরবেগ গ্রহণ করতে পারে, যাতে ল্যাটিসের সব পরমাণু সরে যেতে পারে; কিন্তু ল্যাটিসের আকৃতি অবিকৃত থাকবে।

3) ল্যাটিস পশ্চাদ্ভরবেগ গ্রহণ করে 'ল্যাটিস-কম্পন' সৃষ্টি করতে পারে।

এখন ল্যাটিসের কোন একটি পরমাণুকে ল্যাটিসের মধ্যেই অন্যত্র সরাতে শক্তির দরকার 10 ইলেকট্রন ভোল্ট। কিন্তু পশ্চাদ্গমনের শক্তি মাত্র 10^{-2} ইলেকট্রন ভোল্ট। সুতরাং এক নম্বর সম্ভাবনাকে বাদ দিতে পারা যায়। আবার ল্যাটিস পশ্চাদ্ভরবেগ গ্রহণ করে 'ল্যাটিস কম্পন' সৃষ্টি করতে সমর্থ নয় বলে প্রমাণ করা যায়। সুতরাং একমাত্র সম্ভাবনা রইল যে, কেলাস ল্যাটিস সামগ্রিক ভাবে পশ্চাদ্ভরবেগ গ্রহণ করবে অর্থাৎ কেলাস ভরই (M) পশ্চাদ্ভরবেগ অনুভব করবে। (1) নম্বর সমীকরণে R এর স্থলে $\frac{1}{2}MV^2$ বসালে V এর মান অনেক ছোট হয়ে যাবে, যেহেতু $M=m\times10^{21}$ (কেলাসের আকৃতি এক ঘন সেন্টি-মিটার ধরে)। যদিও সমগ্র কেলাসে পশ্চাদ্ভরবেগ গ্রহণ করে, তবু খুব কম পরিমাণ গতিবেগ কেলাসে

প্রকাশিত হয়। এত কম যে একে শূন্য বলে ধরা যেতে পারে। ফলে পশ্চাদ্গমনশূন্য (recoilless) ফোটন নির্গমন সম্ভব হয়ে ওঠে।

এবার শক্তির নিত্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করা যাক। এক্ষেত্রেও আগের মত তিনটি সম্ভাবনার কথা ভাবা যেতে পারে :

1) একক ভাবে একটি পরমাণু পশ্চাদ্গমনের শক্তি গ্রহণ করতে পারে ;

2) সমগ্র কেলাস পশ্চাদ্গমনের শক্তি গ্রহণ করতে পারে ;

3) এই শক্তি ল্যাটিস কম্পন সৃষ্টিতে ব্যয়িত হতে পারে।

প্রথম সম্ভাবনার কথা আগের মত এবারেও বাদ দিতে পারা যায়। যদিও কেলাস পশ্চাদ্-ভরবেগ গ্রহণ করে, তবুও খুব কম শক্তিই গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং পশ্চাদগমনের শক্তি ল্যাটিস কম্পন সৃষ্টিতে ব্যয়িত হতে পারে।

আইনস্টাইনের মতে কেলাস ল্যাটিসেরও কম্পন শক্তিস্তর আছে। নিম্নতম শক্তিস্তর থেকে উত্তেজিত শক্তিস্তরে উন্নীত হতে হলে যে শক্তি গ্রহণ করা দরকার, তা হলো $\frac{h}{2\pi}\Omega$, Ω হলো উত্তেজিত অবস্থায় পরমাণুর কৌণিক কম্পাঙ্ক (angular frequency of the atom in the excited state)। এখন পশ্চাদ্-গমনের শক্তি লাভ করে কেলাস ল্যাটিস আগের মত নিম্নতম শক্তিস্তরে থাকবে এটাও যেমন সম্ভব, ঠিক তেমনি উত্তেজিত শক্তিস্তরে উন্নীত হবার সম্ভাবনাও আছে। ধরা যাক, ফোটন নির্গমনের পূর্বে ও পরে ল্যাটিসের একই শক্তিস্তরে থাকার সম্ভাবনা f_0, আর উত্তেজিত শক্তিস্তরে থাকার সম্ভাবনা f_1। যেহেতু এ দুটির সম্ভাবনা ছাড়া অন্য কিছু সম্ভাবনা নেই, সুতরাং $f_0+f_1=1$, শক্তির বিচারে (energetically)

$f_0 \times o + f_1 \times \frac{h}{2\pi}\Omega = R$, $R=$ পশ্চাদ্গমনের শক্তি (recoil energy)।

$$\therefore \quad f_1 = \frac{2\pi R}{h\Omega}$$

$$\text{তাহলে } f_0 = 1 - \frac{2\pi R}{h\Omega} \qquad \text{(ii)}$$

কঠিন অবস্থার পদার্থবিদ্যায় (solid state physics) আছে যে, $\frac{h}{2\pi}\Omega = K\theta_E$

K হলো বোল্‌জ্‌ম্যান ধ্রুবক ও θ_E হলো আইনস্টাইন-তাপমাত্রা। সুতরাং ফোটন নির্গমনের পূর্বে ও পরে কেলাস ল্যাটিস একই শক্তিস্তরে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করছে R ও $K\theta_E$-এর উপর। $K\theta_E$ আবার ল্যাটিসের বন্ধনশক্তির (lattice binding energy) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাহলে বন্ধনশক্তি যত বেশি হবে f_0 তত বড় হবে। f_0-কে মস্যেসবওয়ার ভগ্নাংশ (Mössbauer fraction) বলা হয়। পরমাণু কেন্দ্রীনের E_e থেকে E_g-তে অবস্থা পরিবর্তনের সময় পশ্চাদ্গমনশূন্য ফোটন নির্গমন-এর ঘটনাকে পরমাণু কেন্দ্রীনের শূন্য ফোনন অবস্থান্তর (zero phonon transition) বলে। ফোনন হলো কেলাসে কম্পন শক্তির বাহক। এই তো গেল পশ্চাদ্গমনের শক্তির কথা। এবারে আসা যাক ডপ্‌লার বিস্তৃতি প্রসঙ্গে। এবারেও মস্যেসবওয়ার বললেন, গামারশ্মির উৎস ও শোষককে নিম্ন-তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে ডপ্‌লার বিস্তৃতির দরুন সৃষ্ট অসুবিধাটি দূর হয়ে যাবে।

ব্যবহারিক দিক থেকে মস্যেসবওয়ার ক্রিয়ার সীমানা কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত তা মস্যেসবওয়ার ভগ্নাংশের গাণিতিক অভিব্যক্তির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে দেখান যায়, মস্যেসবওয়ার ভগ্নাংশ, f_0

$$f_0 = e^{-\frac{4\pi^2}{\lambda^2}\langle x^2 \rangle}$$

এখানে λ হলো গামারশ্মির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য, $\langle x^2 \rangle$ = কম্পন সংক্রান্ত বিস্তারের বর্গের গড় (mean sq. vibrational amplitude)।

λ বড় হলে অর্থাৎ শক্তি কম হলে f_0 বেড়ে যায়, অন্যথায় কমে যায়। দেখা গেছে, E_γ 150 কিলোইলেকট্রন ভোল্টের বেশি হলে f_0-এর গ্রহণযোগ্য কোন মান থাকে না। আবার হাইজেনবার্গ-এর অনিশ্চয়তা সূত্রানুযায়ী—

$\Delta E.\Delta t \sim \frac{h}{2\pi}$, ΔE, ও Δt শক্তি ও সময়ের অনিশ্চয়তা।

$$\therefore \quad \Delta E = \frac{h}{2\pi\Delta t} = \frac{h}{2\pi t}, \Delta t = \tau =$$

আয়ুষ্কাল (life time)

তাহলে আয়ুষ্কালের উপর নির্ভর করে শক্তিস্তরকে খুব স্পষ্ট হতে হবে (well defined level)। আবার পূর্বেই বলা হয়েছে, উৎস ও শোষক একই রকমের পরমাণু হতে হবে। উপরিউক্ত শর্তাবলী পূরণ না হলে মসবাওয়ার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।

প্রথমে যদিও 'নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যায়' (nuclear physics) সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে গামারশ্মি সংক্রান্ত পারমাণবিক অনুনাদ পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, এমন কি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ছড়িয়ে পড়ে। কঠিন অবস্থায় পদার্থবিদ্যা, অজৈব রসায়ন, জীবনবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান ও ধাতুবিজ্ঞানে এই অনুনাদের বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। কে জানে, ভবিষ্যতে এর গতি কোন্ দিকে মোড় নেবে। অণু থেকে পরমাণু, পরমাণু থেকে মৌলিক কণায় মানুষের বুদ্ধি ও সৌন্দর্যচেতনা সত্য ও সুন্দরের খোঁজে ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু তার শেষ কোথায়?

বিজ্ঞানের ইতিহাস

পলিমার আবিষ্কারের কথা

অলোককুমার ভট্টাচার্য*

আজকের যুগে পলিমার বা যাকে সাধারণভাবে প্লাস্টিক বলা হয়, সেই সব পদার্থের দৈনন্দিন ব্যবহার সকলেরই জানা। প্রকৃতিতে পাওয়া পলিমারের সাথে মানুষের পরিচয় বহুদিনের। বিংশ শতাব্দীর বহু কৃত্রিম পলিমার বা প্লাস্টিকের ব্যবহার আজ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। প্লাস্টিকের তৈরী কিছু না কিছু জিনিষ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে আছে। এদের আবিষ্কার আধুনিক যুগের বিজ্ঞানচিন্তার এক সুপরিকল্পিত প্রতিফলন। এদের মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কারও আছে; কিন্তু শিল্প উৎপাদনে সাফল্য গবেষণালব্ধ ফলের ভিত্তিতেই। এই রকম কয়েকটা ব্যবহৃত পলিমারের আবিষ্কারের কথা আলোচনা করা হলো।

দৈনন্দিন জীবনে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের অবদান অশেষ। এর মধ্যে পলিমার (polymer) বা প্লাস্টিকজাতীয় পদার্থের অবদান বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। প্রস্তর যুগ থেকে ধীরে ধীরে তাম্র, ব্রোঞ্জ এবং লৌহ যুগ পেরিয়ে এখন পলিমার যুগে আসা গেছে বলা যায়। এই যুগ প্রধানত কৃত্রিম পদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও কৃত্রিম পলিমারের ব্যবহার ছিল খুবই কম। কিন্তু আজ ব্যাপারটা বিপরীত। সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে নানান

*ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আবিষ্কারের ভিত্তিতে আজকের এই পলিমার যুগ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাকৃতিক পলিমার, যেমন—কাঠ, তুলো এবং নানা ধরণের আঠা বা নির্যাসের ব্যবহার বহু দিন ধরে মানুষের জানা ছিল, যদিও তখন তাদের রাসায়নিক গঠন জানা ছিল না। আধুনিক পলিমার যুগের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে। 1920 খৃস্টাব্দ পর্যন্ত উদ্ভাবিত রাসায়নিক ও ভৌত পদ্ধতির সুচিন্তিত প্রয়োগে পরবর্তীকালে বিভিন্ন মনোমার (monomer) অর্থাৎ পলিমারের মূল অণু এবং পলিমার ও বিভিন্ন অনুঘটকের উদ্ভাবন হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পলিমারের আবিষ্কারের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সেলুলোজিকস্ (cellulosics)—সেলুলোজ থেকে প্লাস্টিক তৈরির জনক হিসাবে জার্মান বিজ্ঞানী শোয়েনবাইনের (C. F. Schonbein) নাম প্রথমে মনে আসে। তিনি 1846 খৃস্টাব্দে প্রথম সেলুলোজকে নাইট্রেশন করতে সমর্থ হন। 1856 খৃস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী পার্কস (A. Parkes) প্রথম সেলুলোজ নাইট্রেট তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করেন। 1872 খৃস্টাব্দে এই পদ্ধতি শিল্পগত সাফল্য লাভ করে।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট 1895 খৃস্টাব্দে প্রথম তৈরি করেন সুৎসেনবারজার (P. Schutzenberger)। শিল্পে এর সাফল্য আনেন ক্রশ (C. F. Cross) এবং বিভান (E. J. Bevan)। 1903 খৃস্টাব্দে সালফিউরিক অ্যাসিডকে অনুঘটক রূপে ব্যবহার করে সেলুলোজ অ্যাসিটেটকে প্লাস্টিক রূপ দেন আইখেনগ্রুন (A. Eichengrun)। মাইলস (G. W. Miles) 1903 খৃস্টাব্দে লঘু সলফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে সেলুলোজ অ্যাসিটেটকে আর্দ্র বিশ্লেষিত (hydrolyse) করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

ফেনোলিক রেজিন (phenolic resin)—1872 খৃস্টাব্দে বেয়ার (A. Bayer) প্রথম ফেনল (phenol) ও ফরমালডিহাইড (formaldehyde)—এই দুই পদার্থের বিক্রিয়ায় এক বিশেষ আঠালো পদার্থ তৈরি করেন। 1899 খৃস্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্মিথ (A. Smith) প্রথম ফেনল ফরমালডিহাইড রেজিন তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করেন। মার্কিন বিজ্ঞানী বেকেল্যাণ্ড (L. H. Backeland) প্রথম এটিকে চাপ ও তাপের প্রভাবে শিল্পে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। 1910 খৃস্টাব্দে মার্কিন দেশে জেনারেল ব্যাকেলাইট কোম্পানী স্থাপিত হয়। 1934 খৃস্টাব্দে ছাঁচে ফেলা যায় এমন ফেনলিক পলিমার (cast phenolic) আবিষ্কৃত হয় এবং আরও অনেক নতুন ব্যবহার এই পলিমারকে খুবই জনপ্রিয় করে তোলে।

ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রেজিন (urea formaldehyde resin)—হাল্কা রঙের ফেনলিক রেজিন তৈরি করতে না পেরে বিজ্ঞানীরা 1897 খৃস্টাব্দে এই রেজিন তৈরির কাজ শুরু করেন। 1918 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী জন (John) প্রথম এই রেজিন তৈরি করেন। 1921 খৃস্টাব্দে মিতাশ (Mittasch) এবং রাউসটেলার (Rausteller) বিভিন্ন জৈব ও অম্লের ব্যবহারে এই রেজিনকে ঘন করেন। 1921 খৃস্টাব্দে পোলাক (Pollak) এই রেজিন তৈরির জন্য বিভিন্ন ক্ষারীয় পদার্থের ব্যবহার শুরু করেন। 1923 খৃস্টাব্দে তিনিই প্রথম মোল্ডিং পাউডার (moulding powder) তৈরি করেন, যার নাম দেওয়া হয় পোলোপাস (pollopas)।

ভিনাইল রেজিন (vinyl resin)—1872 খৃস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী বউমান (E. Bauman) বদ্ধ কাচের নলে রাখা ভিনাইল ক্লোরাইডকে সূর্যের আলোর প্রভাবে এক সাদা পাউডারে পরিণত করেন। 1912 খৃস্টাব্দে রুশ বিজ্ঞানী অস্ট্রমিসলেনস্কি (I. Ostromislensky) প্রথম ভিনাইল ক্লোরাইডকে পলিমারে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হন। 1927 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্টাউডিনজার (H.P. Staundinger) ভিনাইল অ্যাসিটেটের পলিমার তৈরি করেন। 1928 খৃস্টাব্দে ভিনাইল ক্লোরাইড

এবং ভিনাইল অ্যাসিটেটের যুগ্ম পলিমার (co-polymer) আবিষ্কার হয়। আমেরিকা ও জার্মানীতে ভিনাইল ক্লোরাইডের শিল্প উৎপাদন 1933 খৃস্টাব্দে শুরু হয়।

পলিস্টাইরিন (polystyrene)—1839 খৃস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী সাইমন (E. Simon) স্টাইরিন পাতনের সময় জমে যাওয়া লক্ষ্য করেন। তিনি এটাকে স্টাইরিন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়াঘটিত রূপান্তর মনে করে নাম দেন স্টাইরল অক্সাইড। 1845 খৃস্টাব্দে ব্লিথ (Blyth) ও হফম্যান (Hoffman) সাইমনের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেন। 1866 খৃস্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী বার্টুলো (P. E. M. Berthelot) স্টাইরিনকে দ্রবীভূত অবস্থায় অনুঘটকের সাহায্যে পলিমারে রূপান্তরিত করেন। স্টাউডিনজার প্রথম তাপের সাহায্যে এই পলিমার তৈরি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, এবং তিনিই প্রথম এর পলিস্টাইরিন নাম দেন। 1930 খৃস্টাব্দে জার্মানীর ফার্বেন কোম্পানী প্রথম এই পলিমারের শিল্প উৎপাদন শুরু করে। এর পর মার্কিন কোম্পানী ডাউ কেমিক্যাল আরও সহজ পদ্ধতিতে এর শিল্প উৎপাদন শুরু করে।

পলিথিলিন (polyethylene)—1932 খৃস্টাব্দে I. C. I. কোম্পানীর দুই বিজ্ঞানী ফসেট (F. W. Fawcett) ও গিবসন্ (R. O. Gibson) উচ্চ চাপে ইথিলিন গ্যাসের সঙ্গে বিভিন্ন পদার্থের বিক্রিয়ার পরীক্ষা শুরু করেন। 1933 খৃস্টাব্দে তাঁরা বেনজালডিহাইডের উপস্থিতিতে 170°C তাপমাত্রায় এবং 1000~2000 বায়ুচাপে ইথিলিন গ্যাসের বিক্রিয়ায় আশাতীতভাবে এক মোমজাতীয় পদার্থ বিক্রিয়ার পাত্রে দেখতে পান। পরীক্ষায় জানা যায় এটা ইথিলিনের পলিমার। আরও জানা যায়, এই বিক্রিয়ায় অক্সিজেন অনুঘটকের কাজ করেছে। ঐ কোম্পানীতে পলিথিলিনের শিল্প উৎপাদন শুরু হয় 1939 খৃস্টাব্দে।

অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট পলিথিনের (high density polyethylene) উৎপাদন 1953 খৃস্টাব্দে শুরু হয়। এই পলিমার তৈরিতে জার্মান বিজ্ঞানী জিগ্লারের (K. Ziegler) অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই প্রথম জৈব-ধাতু যৌগ (organometallic compound) অনুঘটকের সাহায্যে কম চাপে ও সাধারণ তাপে এই পলিমার তৈরি করেন। 1950 দশকের মাঝামাঝি আমেরিকার ফিলিপস পেট্রোলিয়াম এবং স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী যথাক্রমে ক্রোমিয়াম অক্সাইড ও মলিবডেনা-অ্যালুমিনা অনুঘটকের সাহায্যে কম চাপে ও সাধারণ তাপে এই পলিমার তৈরি করেন। 1950 দশকের মাঝামাঝি এই দুই কোম্পানী অধিক ঘনত্ববিশিষ্ট পলিথিনের উৎপাদন শুরু করে।

পলিপ্রপিলিন (polypropelene)—1954 খৃস্টাব্দে ইতালির বিজ্ঞানী নাট্টা (G. Natta) ও তাঁর সহকারীরা প্রথম জিগ্লারের ন্যায় অনুঘটকের ব্যবহার করে এই পলিমার তৈরি করেন। 1947 খৃস্টাব্দে ইতালির মনটিকাটিনি কোম্পানী শিল্প উৎপাদন প্রথম শুরু করে।

রোহম (O. Rohm) অ্যাক্রাইলিক জাতীয় বিভিন্ন পলিমার তৈরির পদ্ধতি 1901 খৃস্টাব্দে প্রকাশ করেন। তিনি এবং হাস (A. G. Haas) 1927 খৃস্টাব্দে এর শিল্প উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ছাঁচে ফেলা যায় এমন মিথাইল মিথাক্রাইলেট পলিমার প্রথম তৈরি করেন I. C. I. কোম্পানীর দু-জন বিজ্ঞানী—হিল (R. Hill) এবং ক্রফোর্ড (J. C. W. Crawford)। এই কোম্পানী পারপেক্স (perpex) নাম দিয়ে এই পলিমারের শিল্প উৎপাদন শুরু করে 1934 খৃস্টাব্দে। এই পলিমার এখন কাচের বদলি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সুইডেনের বিজ্ঞানী বার্জিলিয়াস (J. J. Berzelius) টারটারিক অম্ল ও গ্লিসারিনের বিক্রিয়ায় পলিএস্টার ধরনের পলিমার তৈরি করেন। 1920 দশকের শেষ ভাগে এই বিষয়ে ক্যারোথার্স (W. H. Carothers) ও ফিবলের

(Kienle) গবেষণা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 1927 খৃস্টাব্দে কিনলে পলি-এস্টারের সঙ্গে ফ্যাটি অ্যাসিড মিশিয়ে এই পলিমারকে আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। ইংরাজ বিজ্ঞানী হুইনফিল্ড (J. R. Whinfield) ও ডিকসন (J. T. Dickson) 1939-41 খৃস্টাব্দে ইথিলিন গ্লাইকল ও টেরেপথেলিক অম্লের বিক্রিয়ায় পলিথিলিন টেরেপথেলেট নামে এক পলিমার তৈরি করেন। I C.I কোম্পানী 1943 খৃস্টাব্দে টেরিলিন নামে ও ডুপন্ট কোম্পানী 1954 খৃস্টাব্দে ডেক্রন নামে এই পলিমারের শিল্প উৎপাদন শুরু করে।

বিজ্ঞানী কিপিং (F. S. Keeping) বহুদিনের গবেষণায় (1899-1944) সিলিকোন নামক পলিমার উদ্ভাবনের সার্থক রূপ দেন। 1940 খৃস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী হাইড (J. F. Hyde) একাই এ বিষয়ে গবেষণায় সাফল্য লাভ করেন। আমেরিকার ডাউ কর্নিং কোম্পানী 1943 খৃস্টাব্দে প্রথম এই পলিমারের শিল্প উৎপাদন শুরু করে।

মার্কিন বিজ্ঞানী কারোথার্স 1935 খৃস্টাব্দে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিনের বিক্রিয়ায় এক নতুন পলিমার তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করেন। 1937 খৃস্টাব্দে তিনি বিখ্যাত পলিঅ্যামাইড নাইলন-6, তৈরি করেন। ডুপন্ট কোম্পানী 1938 খৃস্টাব্দে এই পলিমারের শিল্প উৎপাদন শুরু করে। 1962 খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনি আরও তিন রকমের পলিঅ্যামাইড আবিষ্কার করেন। তা নাইলন-6, নাইলন 6, 10 এবং নাইলন 11 নামে পরিচিত।

1938 খৃস্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী প্ল্যানকেট (R. J. Plunkett) হঠাৎ পলিটেট্রাফ্লোরোইথিলিন (polytetrafluroethylene)—এই পলিমারটি আবিষ্কার করেন। একদিন তিনি দেখেন টেট্রাফ্লোরোইথিলিন গ্যাস ভর্তি সিলিণ্ডার থেকে কোন গ্যাস বের হচ্ছে না। এই আশ্চর্য ব্যাপার পরীক্ষার জন্য সিলিণ্ডার কেটে তার ভেতরে পাওয়া এক সাদা পাউডার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এটা এক ধরনের পলিমার, যা পলিটেট্রাফ্লোরোইথিলিন বলে প্রমাণিত হয়। 1941 খৃস্টাব্দে এই পলিমার তৈরির পদ্ধতি পেটেন্ট করা হয়। 1947 খৃস্টাব্দে I. C. I. এবং 1950 খৃস্টাব্দে ডুপন্ট কোম্পানী এর শিল্প উৎপাদন শুরু করে।

কার্বোনিক অ্যাসিড দিয়ে 1898 খৃস্টাব্দে এক ধরণের পলিমার তৈরির কাজ শুরু করেন আইনহর্ন (A. Einhorn)। কিন্তু এবিষয়ে সুপরিকল্পিত গবেষণা 1956 খৃস্টাব্দে কারোথার্স (Carothers) ও তাঁর সহকারীরা শুরু করেন। সাইক্লো-এলিফেটিক ডায়ল এবং ডাইফিনাইল কার্বোনেট—এই দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটিয়ে কারোথার্স এক পলিমার তৈরি করেন। পিটারসন (Peterson) আরও উন্নত পদ্ধতিতে ফিল্ম ও ফাইবার বা তন্তু তৈরি করেন। 1956-1957 খৃস্টাব্দে কোডাক (E Kodak) বিভিন্ন ধরনের উচ্চ তাপ প্রতিরোধক পলিকার্বোনেট তৈরি করতে সমর্থ হন।

1933 খৃস্টাব্দে এপক্সি রেজিন নামক এক পলিমার তৈরির পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবন করেন জার্মান বিজ্ঞানী সেলাক (Schlack)। 1940 দশকের মধ্যভাগে মার্কিন বিজ্ঞানী সুয়ের্ন (Swern) প্রথম অসংপৃক্ত (unsaturated) প্রাকৃতিক তেলকে এপক্সাইড পদার্থে রূপান্তরিত করেন। বিসফেনল-A এবং এপিক্লোরোহাইড্রিন—এই দুই পদার্থের রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটিয়ে আধুনিক এপক্সি রেজিন তৈরি করা হয়। 1936 খৃস্টাব্দে কাস্টান (R H. Castan) এই রেজিনের সঙ্গে থালিক অ্যানহাইড্রাইডের (phthalic anhydride) বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক রূপান্তরিত পলিমার (modified polymer) তৈরি করেন, যাকে অনেক সহজে ছাঁচে ফেলা যায়।

জার্মান বিজ্ঞানী বেয়ার (O. Bayer) ডাই-আইসোসায়ানেট জাতীয় পদার্থের সঙ্গে গ্লাইকলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে পলিইউরিথেন নামক পলিমার প্রথম তৈরি করেন এবং এই পলিমার দিয়ে ফোম (foam), আঠা (adhesive) এবং প্রলেপ (surface coating)

জাতীয় পদার্থ তৈরির প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তিনি 1950 খৃস্টাব্দে নমনীয় ফোম (flexible foam) তৈরিতে এই পলিমারের ব্যবহার শুরু করেন। 1958 খৃস্টাব্দে এক বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে পলিইউরিথেন ফোম তৈরির পদ্ধতি খুবই সহজ হয়ে যায়। এই পলিমার দিয়ে তৈরী নরম বালিশ ও তোষক এখন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

সুনীলকুমার সিংহ*
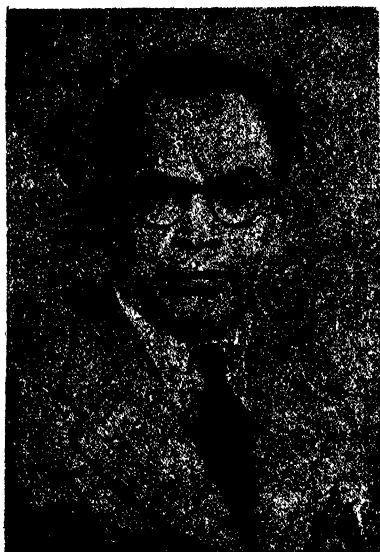
জন্ম মৃত্যু
6 অক্টোবর, 1893 16 ফেব্রুয়ারী, 1956

"I shall remember with great pleasure the inspiration that I received from reading Professor Meghnad Saha's fundamental contributions to the theory of gas ionisation."

—Enrico Fermi

"I vividly remember the immense impression produced by his first and celebrated work on the intensities of absorption lines in stellar spectra as explained in terms of the statistical equilibrium of different states of ionization"

—Max Born

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ভারতবর্ষের জনমানস এবং জনজীবনকে আধুনিকীকরণের কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। তাঁর বহুমুখী ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার বিশদ বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। খুব সংক্ষেপে তাঁর বিশেষ কতকগুলি কাজের উল্লেখ এবং আলোচনা করা হবে।

যে কাজের জন্য তিনি বিশ্ব-নন্দিত, এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে জন্য তিনি একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, তা হলো উত্তপ্ত পারমাণবিক গ্যাসে পরমাণুর ইলেকট্রন-মোক্ষণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের দ্বারা। কেন্দ্রীনের সবচেয়ে কাছের ইলেকট্রনগুলি বেশ শক্ত করে বাঁধা কেন্দ্রীনের সঙ্গে, কিন্তু দূরের ইলেকট্রনগুলির বাঁধন অপেক্ষাকৃত অনেক আলগা। পরমাণু যদি

*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-700 009

বাইরে থেকে কোন ভাবে শক্তি শোষণ করে, তবে সেই শোষিত শক্তির ফলে প্রথমে আল্‌গা-বাঁধনের ইলেকট্রনগুলি, এবং পরে শক্ত-বাঁধনের ইলেকট্রন-গুলিও পরমাণু কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় পরমাণুটি আয়নিত হয়েছে বলা হয়। যেমন, পরমাণু M, শক্তি U শোষিত করে, আয়নিত পরমাণু M^+ ও একটি ইলেকট্রনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনাকে সমীকরণের আকারে লেখা যায়

$$M+U=M^{+}+e \quad \cdots \text{ (ক)}$$
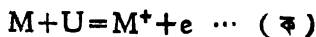
পরমাণুর উপর উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-বিভব দ্বারা উপরিউক্ত ঘটনা ঘটানো যেতে পারে। কিম্বা পরমাণু কর্তৃক কোন প্রকারের আলোক শোষণের দ্বারাও এটা সম্ভব হতে পারে। শোষিত আলোক কণিকার শক্তি যথেষ্ট হলে ইলেকট্রন পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু পারমাণবিক গ্যাসকে উত্তপ্ত করে কি উপরিউক্ত বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব? পারমাণবিক গ্যাসকে উত্তপ্ত করার অর্থ হলো, ধারকপাত্রের দেয়ালের সঙ্গে এবং পরমাণুদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়িয়ে তোলা। এর ফলেও, পরমাণুগুলি উচ্চতর শক্তিস্তরে উঠে ইলেকট্রন মোক্ষণ করতে পারে। উত্তপ্ত পারমাণবিক গ্যাসে পরমাণুর ইলেকট্রন-মোক্ষণের সম্ভাব্যতা যদিও সহজেই অনুমান করা যায়, বিভিন্ন তাপমাত্রায় এবং পারমাণবিক গ্যাসে বিভিন্ন চাপে পরমাণু-সমষ্টির কত শতাংশ আয়নিত হবে তার সঠিক হিসাব দেওয়া কিন্তু বেশ শক্ত ব্যাপার। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা এই ঘটনাকে একটি পরিসংখ্যানিক (statistical) সাম্য-অবস্থা বলে কল্পনা করলেন। অর্থাৎ, পরমাণুর আয়নে রূপান্তর এবং আয়নটি আবার (ইলেকট্রন গ্রহণ করে) পরমাণুতে রূপান্তরিত হওয়া—এই দুটি বিক্রিয়াই এমনভাবে উত্তপ্ত গ্যাসে সংঘটিত হচ্ছে যাতে একটি সাম্য-অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। সমীকরণের আকারে এখন লেখা দরকার,

$$M \rightleftharpoons M^{+}+e-U \qquad \text{(খ)}$$

সমান (=) চিহ্নের পরিবর্তে দু-দিকে তীরচিহ্নিত (⇌) সমান চিহ্নটি বিশেষ লক্ষণীয়। এই রকম সাম্য অবস্থায়, ইলেকট্রনগুলিকেও একটি আদর্শ গ্যাস হিসাবে ধরে নিয়ে তৎকালীন প্রচলিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার তত্ত্বগুলি অনুসরণ করে অধ্যাপক সাহা নিম্নলিখিত বিখ্যাত সমীকরণের প্রস্তাব দেন।

$$\ln \frac{p_{M^+}p_e}{p_M} \quad \frac{U}{RT} \quad -\ln T +$$

$$\ln \frac{(2\pi m_e)^{\frac{3}{2}} k^{\frac{5}{2}}}{h^3} + \ln \left\{ 2.\frac{Fe(M^+)}{Fe(M)} \right\} \cdots \text{(গ)}$$

উপরিউক্ত সমীকরণে, p = আংশিক চাপ, R = গ্যাস ধ্রুবক, T = তাপমাত্রা, m_e = ইলেকট্রনের ভর, k = বোল্‌ট্‌জমানের ধ্রুবক এবং Fe(M = পরমাণু M এর ইলেকট্রনজনিত পার্টিশান ফাংশান। এই সমীকরণটিই "সাহা-সমীকরণ" নামে বিখ্যাত।

উত্তপ্ত গ্যাসে পরমাণুর ইলেকট্রন মোক্ষণ যে একটি পরিসাংখ্যানিক সাম্য-অবস্থায় আছে, এবং বিচ্ছিন্ন ইলেকট্রনগুলিকে যে একটি আদর্শ গ্যাস হিসাবে ধরা যায়, এই দুটি চিন্তাধারার মধ্যেই নিহিত আছে মেঘনাদ সাহার প্রতিভার স্বাক্ষর। (খ) ও (গ) সমীকরণের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পরীক্ষাগারে উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে, এমন চুল্লি তাঁর নির্দেশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে তৈরি করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন ধাতব পদার্থকে উত্তপ্ত করে গ্যাসে পরিণত করা হয় এবং চুল্লিতে থাকে অত্যন্ত নিম্নমানের চাপ। উপযুক্ত তড়িৎ-বিভব ব্যবহার করে ইচ্ছামত ঋণাত্মক বা ধনাত্মক আয়নগুলিকে চুল্লির ভিতরেই ধাতব গ্রাহক পাত্রে নিয়ে আসা যায়, এবং চুল্লির বাইরে সুবেদী গ্যালভ্যানো-মিটারের সাহায্যে গ্রাহকপাত্রে সংগৃহীত বিদ্যুৎস্রোত মাপা হয়। এইরূপ একটি বায়ুহীন চুল্লি বা ভ্যাকুয়াম ফারনেসের আলোকচিত্র পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটে দেখানো হয়েছে। এটি ব্যবহার করেই অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও তাঁর সহকর্মীরা উত্তপ্ত গ্যাসে পরমাণুর তড়িৎ-মোক্ষণের তত্ত্বটি প্রমাণ করেন।

নক্ষত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণে সাহার উপরিবর্ণিত তাপীয় আয়নতত্ত্ব যুগান্তর এনেছিল। পরমাণুর আলোক শোষণ এবং আলোক বিকিরণের সঠিক নিয়মগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়। তার ফলে, কোন বস্তুর আলোক বর্ণালীর বিশ্লেষণ করেই বস্তুটির অণু-পরমাণুর পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যে সব বস্তু হাতের কাছে, তাদের অণু-পরমাণুর পরিচয় পরীক্ষাগারে বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষ করে রাসায়নিক পদ্ধতিতে, জানানো যায়। কিন্তু যেসব বস্তু অনেক অনেক দূরে, তাদের ক্ষেত্রে ঐ বস্তুগুলির বিকীর্ণ তেজের বর্ণালী-বিশ্লেষণই একমাত্র ভরসা। তাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে নক্ষত্রের বর্ণালী-বিশ্লেষণের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সূর্যের ফটোস্ফিয়ার থেকে নির্গত আলো সূর্যের বায়ুমণ্ডলের (reversing layer ও chromosphere) মধ্য দিয়ে আসবার সময় সেখানকার পরমাণুদ্বারা শোষিত হয়, এবং পৃথিবীতে আসা সূর্যালোকের বর্ণালীতে সূর্যের বায়ুমণ্ডলের পারমাণবিক শোষণের জন্য কতকগুলি কম্পাঙ্কের আলো দেখা যায় না, এদের বলা হয় ফ্রনহফার লাইন। এথেকে সূর্যের বায়ুমণ্ডলে কি কি পরমাণু আছে এবং তাদের অবস্থাই বা কি রকম—তার খবর পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সূর্যের ফ্রনহফার বর্ণালীতে সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম পরমাণুর কোন হদিস পাওয়া যায় না। তবে কি সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম সূর্যের বায়ুমণ্ডলে নেই? সূর্যের বায়ুমণ্ডলে চাপ খুব কম হওয়ার কথা, এবং এই চাপ ও তাপে সাহা-সমীকরণের সাহায্যে দেখানো যায় যে, সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম সম্পূর্ণই আয়নিত হয়ে যাবে। সুতরাং সাধারণ সিজিয়াম ও রুবিডিয়াম পরমাণুর কম্পাঙ্কে কোন ফ্রনহফার লাইন সূর্যালোকের বর্ণালীতে পাওয়া যাবে না। তার পরিবর্তে আয়নিত সিজিয়াম ও রুবিডিয়ামের ফ্রনহফার লাইন দেখা যাবে অতি বেগুনী কম্পাঙ্কে, কিন্তু তাও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবী থেকে তাদের কোন হদিশ পাওয়া যাবে না। তবে সূর্যদেহে যে 'স্পট' দেখা যায়, সেখানকার তাপমাত্রা অনেক কম হওয়ায় স্পট-বর্ণালীতে সিজিয়াম ও রুবিডিয়ামের ফ্রনহফার লাইন পাওয়ার কথা যদি অবশ্য সূর্যদেহে সিজিয়াম ও রুবিডিয়ামের অস্তিত্ব থাকে। বিদেশের বিখ্যাত কতকগুলি মান-মন্দিরে সূর্যের স্পট-বর্ণালীতে সত্য সত্যই রুবিডিয়ামের ফ্রনহফার লাইন দেখতে পাওয়া যায়। সিজিয়ামের খুব ক্ষীণ ফ্রনহফার লাইনও স্পট বর্ণালীতে দেখা যায়। এইভাবে সাহার তত্ত্ব প্রয়োগ করে সূর্যদেহে পৃথিবীর সব মৌলপদার্থের অস্তিত্ব এবং তাদের স্বাভাবিক তুলনামূলক পরিমাণও নির্ণয় করা হয়েছে। নক্ষত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট অগ্রগতি। পরবর্তীকালে, সাহার মূল তত্ত্বটি ঠিক রেখে পৃথিবীর নানান দেশের বিজ্ঞানীরা (গ) সমীকরণের বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন এবং সূর্যদেহের আরও খুঁটিনাটি, দূর দূরান্তের নক্ষত্রদের তাপমাত্রা, তাদের শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি কাজে সাহার তাপীয়-আয়ন তত্ত্ব নতুন নতুন অধ্যায় সংযোজন করে চলেছে।

তাপীয়-আয়ন তত্ত্ব ছাড়াও অধ্যাপক সাহা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের প্রভাব, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রতিফলন, আলোর চাপ, তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রে পীড়ন ও তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্রিয়া সম্পর্কে উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্র ও আকাশ সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলের শেষ ছিল না। সেই আদিকাল থেকে মানুষের পরম বিস্ময় এই আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো, তাপ, শব্দ। অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক সত্তা এই পরম বিস্ময়ের মধ্যে বিবিদ্ধ ভাবে সমাহিত ছিল—একথা জানা যায় তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুগুলির কথা ভাবলেই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও গ্রহ-পঞ্জী সংস্কারের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা শুধু একজন আন্ত-

সমাহিত বৈজ্ঞানিক গবেষকই ছিলেন না, দরদী শিক্ষক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষা সূচী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানেও পাঠ্যক্রম নিয়ে তিনি অনেক সময় কাটিয়েছেন। বহুসংখ্যক মেধাবী ছাত্রের শিক্ষক এবং অনুপ্রেরণা দাতা হিসাবে তিনি গৌরবের অধিকারী। কলকাতায় পদার্থ বিজ্ঞানের 'পালিত অধ্যাপক' হিসাবে যোগদানের পর তিনি তাঁর পূর্বতন পালিত-অধ্যাপক সি. ভি. রামনের যন্ত্রপাতি ও গবেষণার দায়িত্ব রামনের সহযোগী এবং তাঁর একজন প্রিয় ছাত্রের উপর ন্যস্ত করেন; এবং নিজে পালিত' পরীক্ষাগারে পারমাণবিক কেন্দ্রীনের গবেষণা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানটির জন্ম।

সাইক্রোস্কোপ তৈরি করার কাজে তিনি যে সংগঠকের ভূমিকা নেন, তা স্মরণযোগ্য। এখানে এই দুটি যন্ত্রের আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে। এর জন্য তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সাহায্য পেয়েছিলেন প্রভূত পরিমাণে। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে তড়িতাহিত বস্তুকণাকে প্রচণ্ড বেগে গতিশীল করবার ব্যবস্থা থাকে। এইভাবে আল্‌ফা-কণিকা বা প্রোটনকে বা অনুরূপ বস্তুকণাকে সাইক্লোট্রন যন্ত্রে গতিশীল করে অন্য পরমাণুর উপর নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে পরমাণু কেন্দ্রীনের নানাপ্রকার বিক্রিয়া পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করা যায়। আজকাল বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেও পরমাণু কেন্দ্রীনের বিভাজন ঘটিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি সুবিধাজনক পদ্ধতি এইভাবে
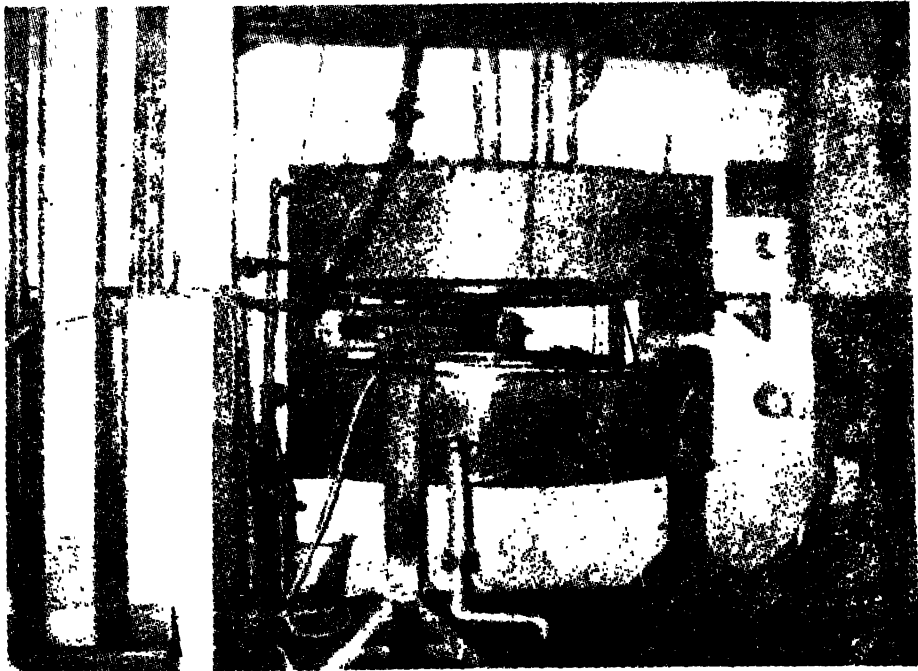
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় তৈরী সাইক্লোট্রন

বিজ্ঞান সংগঠক হিসাবেও তিনি তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সাইক্লোট্রন যন্ত্র এবং ইলেকট্রন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া মেডিক্যাল, কৃষিগবেষণা এবং রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ সাইক্লোট্রনের মত ত্বরণ-যন্ত্রে উৎপাদন করা যায়।

মেঘনাদ সাহা ও তাঁর সহকর্মীদের নির্মিত ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এই সাইক্লোট্রন ভারতবর্ষে-তৈরী প্রথম কণা-ত্বরণ যন্ত্র। এই প্রকার যন্ত্রের উপযোগিতার কথা ভেবে পরবর্তীকালে কলকাতার উপকণ্ঠে লবণ হ্রদে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে আরও একটি সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে, বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের উপযোগিতা বিচারে মেঘনাদ সাহার দূরদৃষ্টি লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, যদিও আজকাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন পরীক্ষাগারে বেশ কয়েকটি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখতে পাওয়া যাবে, ভারতবর্ষে প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নির্মিত হয় ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠানে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার তত্ত্বাবধানে। ক্ষুদ্র বস্তুকে কয়েক লক্ষ গুণ বড় করে দেখতে পাওয়া যায় ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে। এই যন্ত্র দিয়ে জীববিদ্যা এবং 'সলিড্ স্টেট' পদার্থবিদ্যার বহু সূক্ষ্ম কাজ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের আরও অনেক আধুনিক শাখার গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও তৈরি করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবদ্দশাতেই। তাঁর মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় "সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স"। এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সাংগঠনিক কাজের একটি বিশিষ্ট নমুনা।

ভারতবর্ষের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থাগুলির (যেমন, ইণ্ডিয়ান স্থাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমী, সি. এস. আই. আর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) প্রতিষ্ঠা ও পরবর্তী সম্প্রসারণে অধ্যাপক সাহার অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স এবং সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট—এই প্রতিষ্ঠান দুটিও অধ্যাপক সাহা পরিপুষ্ট করেছিলেন।

1932 খৃস্টাব্দে উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার সময় থেকেই অধ্যাপক সাহা নদী উপত্যকাগুলিতে বন্যা-নিরোধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনার ব্যাপারে
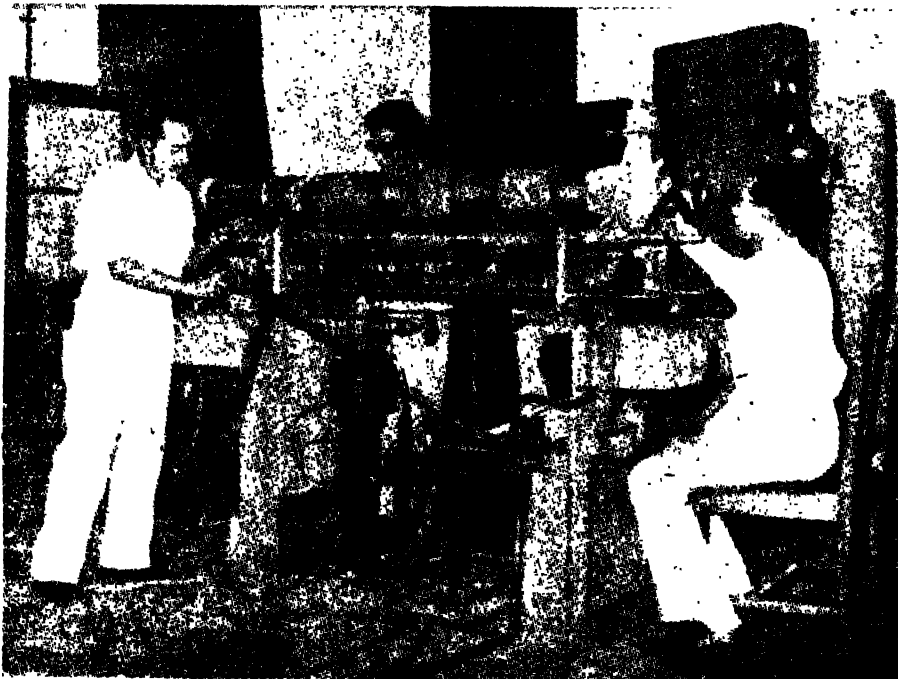
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায় তৈরী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ

জড়িয়ে পড়েন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখের সঙ্গে নদী পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কমিটির সদস্য হিসেবে তাঁর অভিমত ও উপদেশ ভারত সরকার অনেকাংশে মেনে নেন। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারত সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় বিজ্ঞান-সংবাদ সংস্থা"র মুখপত্র "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" এ নদী-উপত্যকার এবং ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-সংস্থা গঠনের ব্যাপারে নানান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি ভারতীয় লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সেখানে ভারত বিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার নানান দিক নিয়ে বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন।

অনেকের কৌতূহল হবে, এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিটির বাল্যকাল ও কৈশোর কিভাবে কেটেছিল! জীবনের গোড়ার দিকে তিনি একটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনই কাটিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশের) ঢাকা শহরের কাছে শেওড়াতলি গ্রামে 1893 খৃস্টাব্দে 6ই অক্টোবর মেঘনাদ সাহার জন্ম হয় একটি সাধারণ স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে। পরে, মাষ্টার মশাইদের উৎসাহে, আত্মীয় বন্ধুদের আনুকূল্যে বালক মেঘনাদ কৈশোরে উন্নীত হন। পড়াশুনায় তিনি সেরা ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন অতি অল্পবয়সেই। কলকাতায় এসে কলেজে সহপাঠি হিসাবে পান সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখকে এবং শিক্ষকরূপে পান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে। গণিতশাস্ত্রে কলেজী শিক্ষা শেষ করে যুবক মেঘনাদ ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে লিপ্ত হন। দেশে এবং বিদেশে একটি কর্মমুখর জীবনযাপন কালে অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে 1956 খৃস্টাব্দের 16ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জীবনের অবসান ঘটে।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা 'ট্র্যাডিশান-পন্থী'দের রূঢ়ভাবে বিরোধিতা করেছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায়, বিশ্বের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ পরিবর্তিত হচ্ছে, বিবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতির এইরকম একটি অংশ হলো মানুষ। এই অবস্থায় প্রকৃতির অন্য অংশ কিছু সংখ্যক মানুষের মনে যেভাবে প্রতিভাত হয়, তাই-ই হলো বিজ্ঞান। অন্যভাবে প্রতিভাত হওয়ার দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা-যায়—কার্য-কারণ সম্পর্ককে ব্যক্তি নিরপেক্ষ পরীক্ষার দ্বারা পরিশোধিত করে দেখবার যে মানসিকতা সেটা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে পরিপুষ্ট নয়। এই পার্থক্যই বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তিদের পৃথক করে। এটাও দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকরা স্বভাবতই অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করছে। এই বিরোধিতার মাধ্যমেই বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে আরও গভীরে।

খাদ্যে ভেজাল

প্রবীরকুমার গুপ্ত*

এই প্রবন্ধে এদেশের ব্যাপক খাদ্য ভেজালের পরিস্থিতি, পরিণাম ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শরীরের স্বাভাবিক জৈবক্রিয়া বজায় রাখার জন্য যা খাওয়া হয় তাকে খাদ্য বলে। খাদ্যের কাজ হলো শরীরের পুষ্টি। নির্দিষ্ট খাদ্যের স্বাভাবিক গুণাগুণ যদি কোন ভাবে পরিবর্তন করা হয় তবে সেই খাদ্যকে ভেজাল বলা হয়। যদি চালে কাঁকড়, গমে কীটনাশক পদার্থ, আটাতে চকের গুঁড়ো, গোলমরিচে পেঁপের বিচি, হলুদে বিষাক্ত হলুদে রঙ, দুধে জল, ছানায় কাগজের মণ্ড, ঘিতে বনস্পতি মেশানো থাকে তবে সেই খাদ্য ভেজাল। লবঙ্গ, এলাচ ও মসলা থেকে সুগন্ধি বার করে নিলে সেই খাদ্যও ভেজাল। এ দেশে যে সব পদার্থ ভেজাল হিসেবে খাদ্যে থাকে সেগুলি বিষাক্ত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন সরষের তেলে শেয়ালকাঁটার তেলের ভেজাল বিষাক্ত। আবার মধুতে ঝোলাগুড়ের ভেজাল বিষাক্ত নয়।

ভেজাল কেন দেওয়া হয়? এর কারণ অধিক মুনাফার লোভ। অসাধু ব্যবসায়ীর কাছে অতি সহজ উপায়ে বেশি লাভ করার একমাত্র পথ হলো ভেজাল দেওয়া। এক লিটার দুধ বিক্রি করে যা লাভ হবে তাতে জল মেশালে কম খরচে অনেক বেশি লাভ হয়। পচা মাছকে বরফে রেখে শক্ত করে লাল রঙ বা রক্ত লাগিয়ে টাট্‌কা বলে বিক্রি করলে ব্যবসায়ীর লাভের অঙ্কটা বিরাট হয়।

ভেজাল খাদ্য শরীরে কি ক্ষতি করে? খাদ্যে যে সব ভেজাল থাকে তার মধ্যে অনেক স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ থাকে। খাদ্যের সঙ্গে শরীরে ঢুকে সেগুলি ভ্রূণের ক্ষতি করে—বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সরাসরি ক্ষতিসাধন আর প্রজননে ক্ষতিসাধন যা বংশ পরম্পরায় চলে। এই সব ক্ষতিতে পাকস্থলী, অন্ত্র, যকৃৎ, বৃক্ক, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির ক্রিয়াকলাপ অস্বাভাবিক হয়, ক্যানসার রোগ কিংবা মানসিক ও শারীরিক বিকৃতি দেখা দেয়। এছাড়া গর্ভাবস্থায় শিশুর জনন বিকৃতিতে মানসিক রোগগ্রস্ত বা বিকলাঙ্গ শিশু অথবা মৃত শিশুর জন্ম হয়। খাদ্যে বিষাক্ত ভেজাল পদার্থের পরিমাণ বেশি হলে শরীরে বিষক্রিয়া তীব্র হয়, অসুস্থতা তাড়াতাড়ি হয় ও মৃত্যু হতে পারে। আবার অল্প পরিমাণ এই ভেজাল বহুদিন ধরে শরীরে ঢুকলে রোগের উপসর্গ কয়েক বছর পর দেখা দেয় অথবা জীবদ্দশায় ক্ষতি না হলেও পরবর্তী সন্তান সেই ক্ষতির শিকার হতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধের শরীরে এই বিষক্রিয়া সবচেয়ে বেশি হয় কেননা তাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। তাছাড়া যারা অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার (যা এ দেশে সবচেয়ে বেশি) তাদের শরীরেও ভেজালের বিষক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। তাই ভেজালের বিষক্রিয়ায় শুধুমাত্র আজকের দিনের মানুষরাই বিপন্ন নয়, বিপন্ন আগামী দিনের বংশধরও।

আজ ভেজালের পরিস্থিতি কি? সরকারের শিল্পবিষয়ক বিষবিজ্ঞান কেন্দ্রের দীর্ঘ বারো বছরের (1960-72) সমীক্ষায় দেখা যায় দেশের বারো আনা খাদ্যই ভেজাল। 1979 সালে কলকাতার পৌর স্বাস্থ্যবিভাগ খাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছে শতকরা 40 ভাগ রঙিন টফি-লজেন্স, শতকরা 24 ভাগ তেল-বনস্পতি, শতকরা 22 ভাগ চা ও শতকরা 20 ভাগ মসলা ভেজাল। এ হলো কয়েকটা উদাহরণ। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে খাদ্যে ভেজালের বিষক্রিয়ায় মারা যাবার ঘটনা চোখে পড়ে। ঐ পর্যন্তই। কিন্তু তারপর কি হলো বিশেষ কিছু জানতে পারা যায় না বা জানানো হয় না। প্রতিদিন ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষের শরীরে যে বিষক্রিয়া হয়ে চলেছে

*ফলিত রসায়ন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তার খবর কেউ রাখে না। এমন কোন খাদ্য নেই যাতে ভেজাল দেওয়া হয় না। ক্রেতার চোখ ও আইনকে ফাঁকি দেয়ার জন্য ভেজালের উপকরণ নিত্য নতুন বদলাচ্ছে।

সরকারী আইনে ভেজালের ব্যাখ্যা কি? 1954 খৃস্টাব্দে এ দেশে খাদ্য ভেজাল নিরোধক আইন চালু হয়। তাতে ভেজালের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তা মোটামুটি এই: বিক্রীত খাদ্য ক্রেতার মতে যদি স্বাভাবিক এবং গুণসম্মত না হয়, খাদ্যে কোন স্বাস্থ্যহানিকর পদার্থ মিশে থাকে, খাদ্যের মধ্যে থেকে যদি কোন উপাদান বার করে নেওয়া হয়, খাদ্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তৈরি করা, প্যাক করা বা রাখা হয়, খাদ্য নোংরা, পচা বা পোকা-লাগা হয়, খাদ্য রোগাক্রান্ত পশুর মাংস হয়, খাদ্যে বিধিসম্মত নয় এমন রঙ বা অনুমোদিত রঙ বেশি পরিমাণে মেশানো থাকে, খাদ্যে বিষিক্ত সংরক্ষণ পদার্থ বা মাত্রাধিক অনুমোদিত পদার্থ মেশানো থাকে, খাদ্যের গুণাগুণ বা বিশুদ্ধতা নির্দিষ্ট মানের নিচে হয় বা তার উপাদানগুলি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে না থাকে যার ফলে খাদ্য স্বাস্থ্যহানিকর হয় অথবা নাও হতে পারে—এরকম খাদ্যকে আইনের সংজ্ঞায় ভেজাল বলা হয়। আর ভেজাল খাদ্য খেয়ে মানুষের অসুস্থতা বা মৃত্যু হলে অসাধু ব্যবসায়ীকে কি শাস্তি দেওয়া হয়? সেটা হলো তিন বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা।

এই আইন কার্যকরী বা ভেজাল দমনের জন্য কি ধরণের সরকারী কাঠামো আছে? এদেশে খাদ্যের মান ঠিক করে ভারতীয় মান সংস্থা (ISI) ও কৃষি উৎপাদন সংস্থা, আগমার্ক (AGMARK)। ভেজাল আইন বিষয়ে সরকারকে সবকিছু উপদেশ দেবার জন্য আছে খাদ্যের মান নির্ণায়ক কেন্দ্রীয় কমিটি (CCFS) এবং ফলজাত খাদ্য আদেশের (FPO) আওতায় আছে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি। এছাড়া আছে খাদ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তর। কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও পৌর স্বাস্থ্য বিভাগের আওতায় খাদ্যের মান যাচাই করার জন্য আছে বিভিন্ন প্রয়োগশালা ও দক্ষ বিজ্ঞানী। বাজার থেকে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহের জন্য আছে খাদ্য ইন্সপেকটর। এছাড়া আছে সদাসতর্ক পুলিশ বিভাগ যারা এই কাজকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করে। জনগণের কল্যাণের চিন্তায় ভেজালদাতাকে সুবিচারে শাস্তি দেবার জন্য আছে ন্যায়ালয়। সব শেষে আছে কারাগার যেখানে ভেজালদাতারা শাস্তি ভোগ করবে।

ভেজাল বন্ধ হচ্ছে না কেন? এটার মূল কারণ হলো মানুষের নৈতিক ও মানসিক অধঃপতন, প্রশাসনের ব্যর্থতা ও অসাধুতা, আইনের দুর্বলতা ও অপব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তা। আধুনিক মুনাফা লোটার উন্মাদনায় অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যে ভেজাল দিয়ে চলেছে ও তাকে সাহায্য করে চলেছে কিছু বিজ্ঞানী। বিভিন্ন সরকারী দপ্তর থাকা সত্ত্বেও ভেজাল বন্ধ হচ্ছে না। আইনের দুর্বলতা ও শাস্তি লঘু হওয়ায় আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অথবা প্রশাসনকে টাকার বিনিময়ে কিনে ভেজালদাতারা ঢালাও ভাবে ভেজাল দিয়ে চলেছে। ভেজাল-দাতাকে কঠোর হাতে দমন করার জন্য আইনের ফাঁক বন্ধ করতে হবে, আইন বদলাতে হবে। প্রশাসনকে সক্রিয় ও জনহিতকর হতে হবে। আর যে দেশে সরকারী কাঠামোতে ভেজাল বন্ধ হয় না সেখানে সাধারণ মানুষকে ভেজাল বিষয়ে সচেতন হতে হবে, এবং ভেজাল বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভেজাল খাদ্য বর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ভেজাল দেওয়া নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক অপরাধ। এটা জাতীয় কলঙ্ক।

জীববিজ্ঞানে অঙ্কশাস্ত্রের ভূমিকা

শশধর দে*

জীববিজ্ঞানের ঘটনাবলীর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে অংকশাস্ত্র কিভাবে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং জীব-অংকশাস্ত্র কিভাবে গবেষণার মাধ্যমে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান দিতে পারবে তা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

জীববিজ্ঞানের অনেক ঘটনার সঙ্গেই অঙ্কশাস্ত্রের বেশ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। যেখানে সাধারণভাবে কোন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা কষ্টকর হয়, সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে সহজেই অনেক সময় তার সহজ সমাধান সম্ভব।

এখানে মুখ্যতঃ অঙ্কশাস্ত্রের দুটি বৃহৎ শাখা, কঠিন ও ফ্লুইড, গতিবিদ্যাকে পাশাপাশি কাজে লাগানো হয়ে থাকে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণশাস্ত্রও এই বিষয়ের সাথে জড়িত। কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্কের সেটতত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র এইসব অনেক ঘটনাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেয়।

শ্রেণী বিভাগের তত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। এখানে লেখতত্ত্ব (graph theory) ও গণকযন্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দ্বিপদ শ্রেণী বিভাগ ও সম্ভাবনা তত্ত্ব (binomial distribution and probability theory) প্রয়োগ করে কোন প্রাণীর চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ভাল কি মন্দ, মিউটেশন, ইত্যাদি জানা যায়। অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগেই তাত্ত্বিক ও জৈবিক জেনেটিক্স্ (theoretical genetics ও biometrical genetics) গড়ে উঠেছে। প্রাণীদের গমনাগমন জানতে, হাত ও পায়ের ক্রিয়াকলাপ জানতে, বিভিন্ন জাতির ABO রক্ত গ্রুপে জিন কম্পাঙ্ক অনুসন্ধান করে একটি জাতি অন্য জাতিটির কত নিকটে বা জেনেটিক দূরত্ব কত তা জানতে অঙ্কের দরকার হয়। পরিবেশবিদ্যা এবং মহামারী সংক্রান্ত বিদ্যাতেও লেখতত্ত্বের বেশ প্রয়োগ দেখা যায়।

দেখা গেছে, পাখির পেশীর ও মস্তিষ্কের ওজন শরীরের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতিক। মাছের দৈর্ঘ্য ও মস্তিষ্কের ওজন শরীরের ওজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উষ্ণরক্তের প্রাণীরা প্রতিদিন গড়ে যে তাপ দেয় তা শরীরের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতিক। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও গাছের ছাল মোটামুটিভাবে গাছের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতিক। পাখিদের হৃৎপিণ্ডের কম্পাঙ্ক, স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কম্পাঙ্ক শরীরের ওজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একটা ছুটন্ত খরগোশ, হাতি বা ঘোড়া অপেক্ষা মিনিটে অনেক দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে। পদক্ষেপের হার শরীরের ওজনের সঙ্গে সমানুপাতিক।

কাজ করার জন্য পেশী ছোট হয়। এটি পেশীর তন্তুর দৈর্ঘ্য ও তার ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে। পেশীকে টান করা স্প্রিং-এর ন্যায় মডেল ধরে এবং হুকের সূত্র প্রয়োগ করে পেশী সংকোচনের গতিবিদ্যা আলোচনা করা যায়।

মাছের যে বিশিষ্ট আকৃতি, তার গমনাগমনের জন্য প্রয়োজনীয়তা কত অনেকেরই তা জানা। অধিকাংশ প্রাণীর (যারা সাঁতার কাটে বা উড়ে) পাখা বা ডানা বাদ দিলে তাদেরকে আদর্শ আকৃতির দেখায়। বেশ কিছু জীব সাঁতারের জন্য এবং শরীরের চতুর্দিকে তরলকে সঞ্চালন করার জন্য রোঁয়ার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সিলিয়া বা ফ্ল্যাজিলা জাতীয় জিনিষ ব্যবহার করে। এই সব জীবদের গমনাগমন জানতেও গতিবিদ্যার প্রয়োগ দেখা যায়।

যখন কোন জীবপদ্ধতিতে এলোমেলো পরিবর্তন দেখা যায় তখন সম্ভাবনা তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, গণ বা জাতিদের

*প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

মধ্যে প্রতিযোগিতা, সংক্রামক রোগের বিস্তার, মহামারীর তত্ত্ব স্টোচাস্টিক (stochastic) পদ্ধতির মধ্যে পড়ে। অবকলন সমীকরণের সাহায্য নিয়ে এরূপ প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়।

কোষ বিভাজনকে অঙ্কের সাহায্যে সহজভাবে বোঝানো যায়। উদ্ভিদকোষের সাইটোপ্লাজম ফ্লুইডে যে অনেকগুলি শূন্য গহ্বর দেখা যায়, পরিণত বয়সে কি করে তারা একত্রিত হয়ে একটি বড় গহ্বরে পরিণত হয় তার ব্যাখ্যা অঙ্কের সাহায্যে করা সম্ভব। কোষের শূন্য গহ্বরে ব্রাউনীয় বিচরণ (Brownian movement) আলোচনা করা যায়। কোষের বাইরের তরল, ভিতরের তরল ও কেন্দ্রীনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া কিভাবে হয় এবং কেন্দ্রীনের ভর বৃদ্ধির সঙ্গে কিভাবে কম্পনশীল কোষের বিভাজন ঘটে, স্থিতিস্থাপক কোষ বিস্তৃত হলে কি বল কাজ করে—এসব জীব-অঙ্কশাস্ত্রের একটি বিষয়বস্তু।

তাপ ও ভরের সঞ্চার ডাক্তারী ও জীববিদ্যার একটি বিশেষ অঙ্গ। রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্রে ভর সঞ্চালনের ব্যাপারে অঙ্কের প্রয়োগ দেখা যায়; আবার নিমাটোড (Nematode) কি ভাবে সাইন (sine) তরঙ্গাকারে গমন করে এবং উষ্ণতাপের দিকে ধাবিত হয় তা জীব-অঙ্কশাস্ত্রের একটি বিষয়বস্তু। ব্যাপনের গণিত থেকে এদের ও কেঁচোদের ব্যাপন পথের দৈর্ঘ্য ও ভরের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ওজন বা দৈর্ঘ্য কি হারে বৃদ্ধি পায় তা দেখে আপেক্ষিক বৃদ্ধির হার বের করা যায়। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা হিসাব করা হয়ে থাকে।

নার্ভ তন্তুর কোষকে বৈদ্যুতিক পদ্ধতির সঙ্গে বোঝানো যায়। পরীক্ষা দ্বারা অনেক প্রোটোজোয়া ও ব্যাক্টিরিয়া বৃদ্ধির ফলাফল লক্ষ্য করে জীব-অঙ্কশাস্ত্র সীমাবদ্ধ বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করে।

কোন সীমাবদ্ধ জায়গায় কয়েক রকমের প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে কিছু পারস্পরিক ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, কোন গণ অন্য গণদের খাবারের উৎস হতে পারে, আবার কোন ধরনের উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের উপর আলো ইত্যাদি কমিয়ে দিতে পারে। একটি উদ্ভিদ গণ-এর পরাগ সংযোগ অন্য প্রাণী গণ দ্বারা হতে পারে। কোন এক গণ-এর দ্বারা মাটি বিষাক্ত হতে পারে এবং উদ্ভিদ গণ-এর বৃদ্ধি দমন করতে পারে।

হরিণ, ভেড়া, ছাগল, ইত্যাদির পাকস্থলী বেশ জটিল। সদ্য গৃহীত কিন্তু চর্বনহীন খাবার বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এদের অবকলন সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

কোন ড্রাগ, D, রক্তের প্লাজ্‌মাতে গলে যায়। প্লাজ্‌মা ও টিস্যুর মধ্যে ব্যাপন পদ্ধতি দ্বারা D অণুর বিনিময় ঘটে। D অণু আবার কিড্‌নী দিয়ে বহির্গত হয়ে প্রস্রাবে মিশে যায়। প্লাজ্‌মা ও টিস্যু দুটি কক্ষ। জৈবিক প্রণালীর সমস্যা অবকলন সমীকরণ ও লাপ্লাস ট্রানস্‌ফর্মম (Laplace Transform)-এর সাহায্যে সমাধান করা হয়। ইকো-সিস্টেমে উৎপাদক ও ভক্ষকের হ্রাস-বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করতে অরৈখিক অবকলন সমীকরণের সাহায্য লাগে।

গণিতশাস্ত্র প্রয়োগ করে পত্রবিন্যাস, যৌগিক পুষ্পের ফ্লোরেট ইত্যাদি ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। গাছে তরলের উত্তোলন, উড্ডয়ন, বীজের বায়ুগতি, চাপ-চলাচল বিদ্যা অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত। সমীকরণের সাহায্যে বায়োস্ফিয়ারের সঙ্গে উদ্ভিদের শক্তি বিনিময়ের পরিমাণ, চাপ, ইত্যাদি জানা যায়।

বড় গাছের ক্ষেত্রে অনেক উপরে জল উঠবার পদ্ধতিতে বায়োস্ফিয়ারের সঙ্গে যে শক্তি বিনিময় হয় তা বিভিন্নধাপে বিভক্ত। যেমন, মাটি থেকে জলকে মুক্ত করবার শক্তি, অভিকর্ষের বিরুদ্ধে জল উত্তোলনের শক্তি, বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ সরবরাহের শক্তি ইত্যাদি। পয়সলি-র (Poiseuilli) সূত্র' সান্দ্রতাবিষয়ক নিয়ম ও অন্যান্য

গাণিতিক বিষয়কে কাজে লাগিয়ে এই সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে জানা যাচ্ছে।

মাটিতে জলের গতি মৃত্তিকা বলবিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু। অঙ্কের সাহায্যে স্থিরাবস্থা ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থা বোঝানো যায়। শিকড়মণ্ডলের ভিতর জলের ঊর্ধ্বগতি বোঝাতে স্থিরাবস্থা ও ক্ষণস্থায়ী অবস্থা আসে। গাছ মাটি থেকে জল নেওয়ার সময়ে মাটিতে জলের পরিমাণ, জলবিভব, কৌশিক পরিবাহিতা প্রভৃতি পদ্ধতি মাটি ও জলের ব্যাপন ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত পদ্ধতি অধিকাংশই গাণিতিক উপায়ে বিশ্লেষিত হচ্ছে। রক্ত চাপের সঙ্গে রক্ত প্রবাহের সম্পর্ক অঙ্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। হৃৎপিণ্ডের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহের হার জানা সম্ভব হয়েছে। হৃৎপিণ্ড ও তার কাছাকাছি রক্তপ্রণালীগুলির আভ্যন্তরীণ চাপের পরিবর্তন অতি সহজেই অন্তর্জুগুলার শিরায় প্রতিফলিত হয় বলে সাধারণতঃ ঐ শিরায় ধমনীর মতই স্পন্দন দেখা যায়। আবার যখন কোন দেহাংশে ধমনীগুলির প্রসারণ হয় তখন জালকের মধ্য দিয়ে নাড়ীর স্পন্দন জালকের অপর প্রান্তে অবস্থিত শিরাতেও সঞ্চালিত হয়। একই সঙ্গে ধমনী, শিরা ও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পলিগ্রাফ্ নামক যন্ত্রের সাহায্যে অঙ্কিত হয়ে থাকে। তা থেকে বিশারদগণ নানা রোগের চিকিৎসার ইঙ্গিত পান। রক্ত প্রবাহের সমস্যা জীব-অঙ্কশাস্ত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

শরীরের কাঠামোর সঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পদ্ধতির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। সাইনোভিয়াল (synovial) সন্ধিস্থলে যে পিচ্ছিল পদার্থ থাকে তা হচ্ছে খুব উচ্চস্তরের অ-নিউটনীয় ফ্লুইড। তরুণাস্থির এবং সাইনোভিয়াল তরলের প্রকৃতি খুবই জটিল। তরুণাস্থির আপেক্ষিক আন্দোলনে সন্ধিস্থলে চাপের সৃষ্টি হয়। অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞানীদের এর আরও অনেক নূতন তথ্য সরবরাহ করতে সমর্থ হলো।

হাড়ের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক বের করে অঙ্কশাস্ত্র অনেক জিনিষের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছে।

ফুসফুসের ভিতরে ও বাইরে বাতাসের পরিবহন, ফুসফুসের ভিতরে রক্তপ্রবাহ, জৈব বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শরীরে প্রবেশকারী ক্ষতিকারক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কৌশল—এগুলি পরিবহন কৌশলের মধ্যে পড়ে। গ্যাসের গতি সম্বলিত বায়োমেক্যানিক্সের এই অধ্যায় ফ্লুইড ডাইন্যামিক্সের অন্তর্ভুক্ত।

মানব দেহে রক্ত প্রায় 96,000 কি.মি. দৈর্ঘ্য যাতায়াত করে; প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1.2 মিলিয়ন রক্তকোষ মরে, মানুষের হৃৎপিণ্ড সারা জীবনে প্রায় 500,000 টন রক্ত পাম্প করে। এসব থেকে মানুষ অঙ্কশাস্ত্রের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। দেখা গেছে, পালমোনারি (pulmonary) কৌশিকের পুরো দৈর্ঘ্য প্রায় 2800 কি.মি. এবং পুরো আয়তন প্রায় 140 মি.লিটার। 1 সি.সি. রক্তে প্রায় 5×10^9 সংখ্যক লোহিত কণিকা, প্রায় 10^7 সংখ্যক শ্বেত কণিকা থাকে। অতএব, 5 লিটার রক্তে 25×10^{12} সংখ্যক লোহিত কণিকা আছে। একটি লোহিত কোষের গড়-জীবন প্রায় 120 দিন। কাজেই প্রতি সেকেণ্ডে যে সমস্ত লোহিত কণিকা মরে তাদের সংখ্যা দেখা যায় 2.4×10^4; সারা জীবনে (60-70 বছর) যে সমস্ত লোহিত কোষ মানুষকে রক্ষা করে তাদের সংখ্যা প্রায় 5×10^{15} এবং তাদের পুরো আয়তন প্রায় $2.25 \times 200 = 450$ লিটার। কাজেই জীবনকালে মানুষের শরীর প্রায় আধ টন লোহিত রক্তকণা তৈরি করে। এগুলি শরীরের প্রায় 60 লক্ষ কোটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে।

গবেষকরা হৃৎপিণ্ডের তত্ত্ব আলোচনা করেছেন। বাস্তবের উপর ভিত্তি করে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন তত্ত্ব (pulsating theory) জীববিজ্ঞানে এক যুগান্তর আনবে এবং কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরিতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে হয়তো প্রত্যেক হাসপাতালে

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ জমা থাকবে এবং বিকল হলেই তা জুড়ে দেওয়া যাবে। অন্যদিকে আবার, মানুষের স্মৃতিশক্তির অনুকরণে গণক যন্ত্রে স্মৃতি-শক্তি আরোপিত হয়েছে।

জীববিজ্ঞানের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে, প্রাণ ও অপ্রাণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে অঙ্ক, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যা দ্রুত গতিতে প্রসার লাভ করে চলেছে।

অদূর ভবিষ্যতে অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে জীববি[illegible]ানের আরও গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হবে এবং বিষয়বস্তুও সহজ হয়ে উঠবে; চিকিৎসাবিদ্যাতেও যুগান্তর আনবে।

বিজ্ঞান সংবাদ

সালোক সংশ্লেষের মাধ্যমে তড়িৎ উৎপাদন

সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতিতে যে আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে সেখানে ক্লোরোফিল ডোনার বা দাতা গণ থেকে গ্রহীতা-অণুতে ইলেকট্রন বিনিময় হয়ে থাকে। সম্প্রতি টি. হো, এ. আর. ম্যাকিনটোশ এবং জে. আর. বোলটন (T. Ho, A. R. Mcintosh and J. R. Bolton) কুইনোনের সঙ্গে হাইড্রোকার্বন শৃংখল দ্বারা সংযুক্ত পরফিরিন-এর (porphyrin) উপর দৃশ্য আলোকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করে নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁদের মতে, এই অণুর পরফিরিন অংশটি আসলে ক্লোরোফিল সদৃশ এবং কুইনোন অংশটি সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতির ইলেকট্রন গ্রহীতার ভূমিকা পালন করে।

নানারকম পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন যে, দৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত করলেই পরফিরিনের সঙ্গে কুইনোনে ঐ ইলেকট্রন বিনিময় ঘটে। তাঁদের মতে, এ জাতীয় অণুর বৈশিষ্ট্য থেকে সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতির অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব। এছাড়া, হয়তো ভবিষ্যতে এই অণু ব্যবহার করে উচ্চমানের সৌর কোষ তৈরি করে তড়িৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

এইভাবে উৎপাদিত তড়িৎ প্রচলিত সৌরকোষের কার্যকারিতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে বলে তাঁদের ধারণা।

বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিক সম্বন্ধে নতুন তথ্য

বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিক সাধারণত জারিত অবস্থায় এবং উদ্বায়ী পদার্থদের যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। নানা পদ্ধতির মাধ্যমে বহুদিন আগে থেকেই ভূগোলকে এর পরিমাণ এবং পরিণাম নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। লণ্ডনে বিজ্ঞানী ওয়ালস্ (Walsh), ডিউস (Duce) এবং ফ্যাস্‌চিং (Fasching) এ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে সম্প্রতি জানান যে, বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিকের আধিক্যের পিছনে যে যে উৎস আছে তা হলো—প্রাকৃতিক উৎস, কৃত্রিম উৎস এবং সামুদ্রিক উৎস।

বিভিন্ন শিলা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, জৈবিক ক্রিয়া, বনেজঙ্গলে আগুন লাগবার কালে বাতাসের দ্বারা বাহিত ধুলো ও বালি—এদের মাধ্যমে প্রতিনিয়তই কিছু কিছু করে আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলে এসে জমছে।

বহু ধাতুর আকরিকের সঙ্গে আর্সেনিক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হিসাবে থাকে। আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় ঐ আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলে এসে জমে। তামা নিষ্কাশনে এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া, কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন, বিভিন্ন চাষাবাদ ও এই সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ এবং নানারকম জ্বালানী পোড়াবার সময়ে আর্সেনিক পাওয়া যায় এবং তা বায়ুমণ্ডলে এসে জমে।

বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিকের উপস্থিতির পিছনে সমুদ্রের ভূমিকাও যথেষ্ট। সমুদ্রের জলে খুবই অল্প পরিমাণ মিথাইল আর্সেনিক যৌগ থাকে। এই যৌগটি উদ্বায়ী এবং সব সময়েই সমুদ্র থেকে বায়ুমণ্ডলে এসে জমছে।

বিজ্ঞানী ওয়ালস্ প্রমুখদের সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ভূগোলকের সব জায়গাতে এই আর্সেনিকের পরিমাণ এক নয়; কেননা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম উৎসের মাধ্যমে আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলে এসে জমছে। তাঁরা আরও জানান, শহরের পরিপার্শ্বস্থ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের বায়ুমণ্ডলে আর্সেনিকের উপস্থিতির মাত্রা বেশ কম।

তাঁরা দেখেছেন, নির্গত এই আর্সেনিকের এক বিরাট অংশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে যায়। প্রকৃতিতে আর্সেনিক নিঃসরণ ও শোষণ প্রায় চক্রাকারে চলছে। তবে, শোষণের মাত্রা নিঃসরণের তুলনায় কম হওয়ায় বাড়তি আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলকে কিভাবে বিষিয়ে তুলতে পারে তা নিরূপণ করতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা লণ্ডন শহরের বায়ুমণ্ডলের প্রতি ঘনমিটারে গড়ে 8 ন্যানোগ্রাম পরিমাণ আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। ভূগোলকে আর্সেনিকের মোট পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্য তাঁরা এখন অন্যান্য অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যৌথভাবে নানান কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

একটি উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণের শতবর্ষ

অসীম মুখোপাধ্যায়*

আলোচ্য নিবন্ধে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আবিষ্কৃত ইউক্লিড I,25 উপপাদ্যের বিকল্প প্রমাণের কথা এবং সেই সঙ্গে তাঁর গণিত প্রতিভার কিছু কথা উল্লেখিত হয়েছে।

ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশতিতম উপপাদ্যে বলা হয়েছে—

যদি দুটি ত্রিভুজের একটির দুটি বাহু যথাক্রমে অপর ত্রিভুজের দুটি বাহুর সমান হয় কিন্তু একটির ভূমি অপর ত্রিভুজের ভূমি অপেক্ষা বৃহত্তর হয়, তাহলে যে ত্রিভুজের ভূমি বৃহত্তর তার অপর বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভূত কোণ দ্বিতীয় ত্রিভুজটির অনুরূপ বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভূত কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হবে— অর্থাৎ, ABC এবং DEF দুটি ত্রিভুজের মধ্যে যদি $AB=DE$, $AC=DF$ এবং $BC>EF$ হয়, তাহলে $\angle BAC > \angle EDF$ হবে।

বলাবাহুল্য, উপরিউক্ত উপপাদ্যটি প্রমাণিত হয়েছে, এরই ঠিক আগের উপপাদ্যের (ইউক্লিড, I, 24) সাহায্যে। আগের উপপাদ্যের বিষয়বস্তু হলো: ABC এবং DEF দুটি ত্রিভুজের মধ্যে যদি $AB=DE$, $AC=DF$ এবং $\angle BAC > \angle EDF$ হয়, তাহলে $BC>EF$ হবে। কিন্তু আলোচ্য বিকল্প প্রমাণটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে একটি নতুন স্বতন্ত্র প্রমাণ যেখানে উপপাদ্য 24-এর কোন সাহায্য নেওয়া হয় নি। এই নতুন বিকল্প প্রমাণটি প্রকাশিত হয় লণ্ডনের একটি খ্যাতনামা গণিত বিষয়ক পত্রিকা Messenger of Mathematics-এর দশম খণ্ডের (1880-81), 122-123 পৃষ্ঠায়। প্রমাণটির রচয়িতা হচ্ছেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আশুতোষ (জন্ম 29 জুন, 1864) তখন নিতান্তই কিশোর, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এই নিবন্ধটি তিনি Messenger of Mathematics পত্রিকার কাছে 1880 সালের 6ই অক্টোবর পাঠিয়েছিলেন। নিবন্ধের প্রথমেই তিনি লিখছেন, "প্রায় পাঁচ বছর আগে আমি ইউক্লিড I, 25-এর নিম্নলিখিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার করি।" —অর্থাৎ, তখন তাঁর বয়স এগারো বছর— ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলের ছাত্র। সে সময় থেকেই যে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে সব কিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করার মনোভাব তাঁর ছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়।

বালক আশুতোষ উপপাদ্যটি নিম্নলিখিত ভাবে প্রমাণ করেছেন:

DEF ত্রিভুজকে এমন ভাবে স্থাপন করা হলো যে, E বিন্দু B বিন্দুর উপর এবং EF, BC-র

*গণিত বিভাগ, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা-700 029

ওপর পতিত হয় ; BD এবং AB সমপ্রান্তস্থ হয়। AD যোগ করা হলো। মনে করা যাক DF এবং AC পরস্পর G বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। (চিত্র 1, 2)।
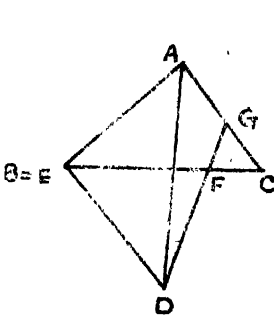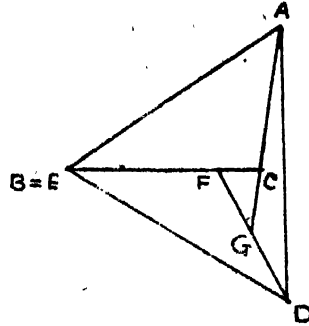
চিত্র 1 চিত্র 2

এখন $BA = ED = BD$ (স্বীকার)

অতএব $\angle BAD = \angle BDA$ (ইউক্লিড I, 5)

পুনরায়, $DG > DF = AC > AG$—অর্থাৎ $DG > AG$ (চিত্র 1)। সুতরাং $\angle DAG > \angle ADG$। অতএব, $\angle DAG + \angle BAD > \angle ADG + \angle BDA$, অর্থাৎ $\angle BAC > \angle BDF$ বা $\angle BAC > \angle EDF$

অনুরূপভাবে চিত্র 2 থেকে দেখা যায়, $DG < DF = AC < AG$; অর্থাৎ $DG < AG$

সুতরাং $\angle ADG > \angle DAG$; কিন্তু $\angle BAD = \angle BDA$,

সুতরাং $\angle BDA - \angle ADG < \angle BAD - \angle DAG$

অতএব $\angle BDF < \angle BAC$

বা, $\angle BAC > \angle EDF$.

নিবন্ধের উপসংহারে তিনি লিখেছেন, উপরিপাত পদ্ধতি যে কত কার্যকর এই প্রমাণই তার একটি দৃষ্টান্ত। এটা আগেই দেখা গেছে যে, কেমন ভাবে ইউক্লিড I, 7-এর জটিল প্রতিজ্ঞাটি পরিহার করেও ইউক্লিড I, 8 উপপাদ্যটি প্রমাণ করা যায়। ইউক্লিড I, 2 6-এর প্রমাণটিও যে আরও সহজে করা যায় তার নিদর্শন আছে টড্ হান্টারের ইউক্লিড-এর 382 পৃষ্ঠায় ঃ 448 উদাহরণটিতে।

পরবর্তীকালে এই কিশোর প্রতিভা বিকশিত হয়ে মৌলিক চিন্তাপ্রসূত অনূ্যন কুড়িটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করে যশস্বী হন। ডঃ গণেশ প্রসাদ, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের একদা হার্ডিঞ্জ-অধ্যাপক ছিলেন, যথার্থই বলেছেন—ভারতের ইতিহাসে ভাস্করাচার্যের (একাদশ শতাব্দী) পর স্যার আশুতোষই প্রথম পুরুষ যিনি গণিতের গবেষণায় রেখে গেছেন সত্যিকারের মৌলিকত্বের নিদর্শন। বিস্ময় লাগে ভাবতে যে, স্যার আশুতোষ 1892-এর পর গণিতের

আর কোন গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন নি। এর পর তাঁর জীবনের কর্মধারা অন্য পথে বাঁক নেয়—যে পথ সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু তিনি যে আজীবন গণিত-অনুরাগী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি তাঁরই নিজের হাতে গড়া। স্যার আশুতোষের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ডঃ রবীন্দ্রনাথ সেনের (হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক, বিশুদ্ধ গণিত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) উক্তিটি (বুলেটিন, ক্যাল. ম্যাথ. সোসাইটি, স্যার আশুতোষ স্মারক খণ্ড, 1964) এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছিলেন, স্যার আশুতোষ যদি পরিপূর্ণভাবে গণিত সাধনায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতেন তা হলে বিশ্বগণিত সভার প্রথম সারির গণিতবিদদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল গৌরবময় স্থান অধিকার করা তাঁর ক্ষেত্রে আদৌ অস্বাভাবিক হতো না।

পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়*

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে এক্স-রে-র আবিষ্কার তাদের মধ্যে অন্যতম।

এই এক্স-রে-র আবিষ্কর্তা হলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ভেলহেলম কোনরাদ রনজেন। তিনি 1895 খ্রীষ্টাব্দের 6ই নভেম্বর এই আবিষ্কার প্রচার করেন। তুচ্ছ ব্যাপার থেকে অনেক সময় যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়ে থাকে। এক্স-রশ্মির আবিষ্কারের মূলে ছিল ঐরূপ একটি ব্যাপার।

অধ্যাপক রনজেন একদিন অল্প চাপের গ্যাসের মধ্য দিয়ে তড়িৎ মোক্ষণ ঘটিয়ে কাচ ও অন্যান্য কতকগুলি পদার্থের প্রতিপ্রভা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। 6ই নভেম্বর তিনি তাঁর মোক্ষণ নলের নিকট বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইডের প্রলেপযুক্ত একটি প্লেট রাখেন। এরপর তিনি হঠাৎ দেখেন যে, যতবারই নলের তড়িৎ মোক্ষণ হচ্ছে ততবারই ঐ প্লেটটি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তিনি এবার মোক্ষণ নলটিকে কালো মোটা কাগজ দিয়ে সম্পূর্ণ মুড়ে দিলেন যাতে আর কোন আলো বা অতিবেগুনী রশ্মি বাইরে আসতে না পারে।

এরপর বিজ্ঞানী রনজেন তড়িৎ প্রবাহ পাঠানোর পরও দেখলেন, মোটা কালো কাগজ থাকা সত্ত্বেও বেরিয়াম থেকে প্লাটিনোসায়ানাইডের প্লেট থেকে উজ্জ্বল আলোর বিকিরণ হচ্ছে। তখন তিনি বুঝলেন—নলের মধ্যে এমন এক রশ্মি উৎপন্ন হচ্ছে যা ঐ মোটা কাগজ ভেদ করে প্লেটের উপর প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করছে। অধ্যাপক রনজেন তাঁর এই আবিষ্কার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করলেন না। আবিষ্কারের অদম্য কৌতূহল দমন করে একনিষ্ঠভাবে তিনি গবেষণা করতে লাগলেন।

*212, শরৎ চ্যাটার্জী রোড, শিবপুর, হাওড়া-2

তিনি দেখলেন আলো যে সমস্ত পদার্থ (কাঠ, ইট, চামড়া, মাংস প্রভৃতি) ভেদ করতে পারে না—এই রশ্মি কিন্তু সহজেই তাদের ভেদ করে। রনজেন লক্ষ্য করলেন, এই রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়া করে। আলোনিরুদ্ধ বাক্সের মধ্যে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখে তিনি তাঁর হাতের হাড়ের ছবি তুলতে সক্ষম হন।

কিন্তু রনজেন এই রশ্মির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারেন নি। বীজগণিতে যেমন কোন অজানা সংখ্যাকে X ধরা হয়, তেমনি রনজেন এই অজানা রশ্মির নাম দিলেন এক্স-রে (X-Ray)। তাঁর নাম অনুসারে এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় রনজেন রশ্মি।

এরপরই গবেষণা শুরু হয়ে গেল এক্স-রশ্মির উপর। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নব যুগ উন্মোচিত হলো। এই এক্স-রশ্মির আবিষ্কারের কয়েক সপ্তাহ পরে ভিয়েনার হাসপাতালের এক জটিল অপারেশনে চিকিৎসকগণ এক্স-রে ব্যবহার করে সাফল্য লাভ করেন।

এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের আবিষ্কর্তা হিসাবে 1901 খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রনজেন পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

শ্যামাপোকা

আমিনুল ইসলাম*

বর্ষার প্রারম্ভে বাদলা পোকা, কালী পূজার সময় শ্যামা পোকা, এ সব যেন বাঙ্গালীর সংস্কৃতির দূত। এদের নিয়ে কত কথা, কত উপকথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কজনই বা এদের আসল কথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবেন বা জানেন।

শ্যামাপোকা, যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো—নেফোটেটিক্স অ্যাপিক্যালিস (Nephotettix apicalis) আসলে একটি ধানের ক্ষতিকারক পতঙ্গ। ভারতবর্ষের সব ধান উৎপাদনশীল জায়গাতেই এদের দেখা যায়। এমন কি অধুনা এদের দৌরাত্ম জাপান, ফিলিপাইন্স, ফরমোসা এবং শ্রীলংকাতেও চোখে পড়ছে।

একটি প্রাপ্তবয়স্ক শ্যামাপোকা দেখতে সবুজ, দেহের পেছন দিকটা সরু এবং প্রথম জোড়া ডানার প্রত্যেকটিতে পেছনের দিকে একটা করে কালো দাগ থাকে। দেহের আকৃতির তুলনায় এদের চোখ দুটি (পুঞ্জাক্ষি) বড়। পেছনের পা দুটি আকারে বড় হওয়ায় এদের লাফ দিতে সুবিধা হয়। এরা সাধারণত পাতায় পাতায় লাফ দিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলে এদের 'পত্র লম্ফমান শোষক পোকা' বলা হয়। এদের চলনের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এরা পাশাপাশি চলতে পারে যা সাধারণত অন্য কোন পতঙ্গের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না।

প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত সমস্ত দশায় শ্যামাপোকারাই ধানের পক্ষে সমান ক্ষতিকারক, এরা এদের শোষণ-

*প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

ক্ষমতাবিশিষ্ট মুখ উপাঙ্গ দিয়ে ধানের পাতার রস শোষণ করে প্রথমে হলুদ এবং পরে বাদামী রঙের করে ফেলে এবং এইভাবে পাতাগুলি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

একটি পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী শ্যামাপোকা ডিম পাড়ার পূর্বে, দেহের পশ্চাদ অংশে অবস্থিত সরু উপাঙ্গ (ovipositor) দিয়ে পাতাসংলগ্ন কাণ্ডের গোড়ায় একটু ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং ঐস্থানে 3-18টি গুচ্ছে লম্বা সারি বেঁধে ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে অনেকটা লম্বাটে ধরনের। সাধারণত 3 থেকে 5 দিন পর ঐ ডিমগুলি থেকে নিম্ফ (nymph) বা অপরিণত পোকা বের হয় এবং 6 বার খোলস ত্যাগ করে (12 থেকে 21 দিন সময় লাগে) এরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ শ্যামাপোকা 7 থেকে 22 দিন পর্যন্ত বাঁচে। এদের জীবনচক্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে, জুলাই-অগাস্ট মাসে, এদের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা যায়, কারণ ঐ সময় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় এরা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। শীতকালে সাধারণত এরা সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

যদিও ধানের ক্ষতিকারক পতঙ্গদের মধ্যে এরা সবচেয়ে মারাত্মক নয়, তবুও এদের দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ খুব একটা কম নয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত 1914 খৃস্টাব্দে, কেবল মধ্যভারতে প্রায় 30 লক্ষ একর জমির ধান এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাছাড়া কতকগুলি প্রজাতি যেমন নেফোটেটিক্স ইমপিকটিসেপস (Nephotettix impicticeps), কতকগুলি ভাইরাসঘটিত রোগের (যেমন টুংগ্রো) বাহক হিসাবে কাজ করে।

ধান বা কিছু ডালজাতীয় শস্যের এইরূপ ক্ষতির জন্য বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগে এদের প্রকোপ রোধ করা হয়ে থাকে; যেমন 10% বি, এইচ, সি, ছিটিয়ে বা 0·1% কারবারিল বা 00·5% ম্যালাথিয়ন বা 0·04% এনডোসালফান সিঞ্চন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

দিনের বেলায় এরা ধানের জমিতে পাতায় পাতায় লাফিয়ে বেড়ায় আর রাতে আলোর দিকে আকৃষ্ট হয়ে এসে সমস্ত রকম কাজকর্মের ইতি ঘটিয়ে সকাল বেলায় মরে পড়ে থাকে। ফলে জীবনের শেষক্ষণটি পর্যন্ত এরা মানুষের ক্ষতি করেই যায়।

শব ব্যাপারী

বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করে খুবই ধনী হন। কোন এক পত্রিকায় ঐ সময়ে আলফ্রেড নোবেলের ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদের পরিবর্তে ভুলবশতঃ তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রকাশিত হয় এবং তাতে ডিনামাইট মারণাস্ত্রটি আবিষ্কার করে তিনি কত কি পেয়েছেন—তার হিসেব দিয়ে তাঁকে 'শব ব্যাপারী' বলে উল্লেখ করা হয়। যথাসময়ে তা নোবেলের নজরে পড়ে। মৃত্যুর পর লোকে তাঁকে এভাবে স্মরণ করবে ভেবে তিনি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন। জনসমক্ষে নিজেকে চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য তখন থেকেই তিনি সচেষ্ট হন। এরই ফল হলো নোবেল পুরস্কার।

শব্দের উপকারিতা এবং অপকারিতা

হীরক দাশ*

সব রকমের শব্দ যে শুনতে পাওয়া যায় তা নয়। এই জগতে এমন শব্দ আছে যা শুনতে পাওয়া যায় না কিন্তু কিছু প্রাণী তা ভালভাবে শুনতে পায়। এখানে শব্দকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এদের উপকারিতা ও অপকারিতা আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দ বা ধ্বনি কর্ণপটাহে আঘাত করে এবং তাতেই শুনতে পাওয়া যায়। এ হলো শ্রবণ তন্ত্রের গোড়ার কথা। শব্দকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—যে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় এবং যে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ রকম শব্দ কিছু প্রাণী দিব্যি শুনতে পায়। শব্দ অর্থাৎ ধ্বনির স্পন্দন সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি থেকে কুড়িহাজার বারের মধ্যে থাকলে সেই শব্দ শোনার ক্ষমতা মানুষের আছে কিন্তু ঐ স্পন্দন সেকেণ্ডে কুড়িবারের কম বা কুড়িহাজারের বেশি হলে সেই শব্দ আর শুনতে পাওয়া যায় না। কুকুর, বাদুড়, তিমিমাছ ইত্যাদির মত কিছু প্রাণী কিন্তু এই সব শব্দ খুব ভালভাবে শুনতে পায়।

যে শব্দ শোনা যায় না অর্থাৎ 'অশ্রুত শব্দ' তা অনেক উপকারে আসে। সেই তুলনায় সাধারণ শব্দ বিশেষ কোন উপকারে আসে না; বরঞ্চ বর্তমানে এর অপকারিতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল বিজ্ঞানীরা শব্দকে পরিবেশ দূষণের সহায়ক বলে গণ্য করেন।

পৃথিবীর ছোট বড় শহরগুলিতে শব্দ ছাড়া একটি মুহূর্ত কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই শব্দ শহরবাসীর মন এবং শরীরের যেভাবে ক্ষতিসাধন করছে তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন বেশ চিন্তিত। শব্দের প্রাবল্য মাপার জন্য ডেসিবেল নামক একক ব্যবহার করা হয়। শব্দের প্রাবল্য যত বাড়ে ডেসিবেলের মাত্রা তত বাড়ে। যেমন, শ্রবণসাধ্যতার প্রারম্ভ 0 ডেসিবেল, পাতার মর্মরধ্বনি প্রায় 10 ডেসিবেল, ভদ্রভাবে কথাবার্তার প্রাবল্য 20-30 ডেসিবেল, জোরে হাসি প্রায় 50 ডেসিবেল, জোরে রেডিও চালালে 60-70 ডেসিবেল, মোটর সাইকেল 80-100 ডেসিবেল; মাইক, ইলেকট্রিক হর্ন প্রায় 110 ডেসিবেল, জেট বিমান 120-140 ডেসিবেল। বিভিন্ন দেশের সমীক্ষা থেকে জানা গেছে 70 থেকে 90 ডেসিবেল শব্দ মানুষের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। 100 থেকে 110 ডেসিবেল শব্দের মধ্যে স্মৃতিভ্রংশতা, মানসিক রুক্ষতা ও দুশ্চিন্তা, কাজে ভুল, মাথা ধরা, ঘুমে ব্যাঘাত ইত্যাদি ঘটে। 120 থেকে 140 ডেসিবেল শব্দের প্রভাবে বধিরতা ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি, পরিপাক ক্রিয়া, রক্তচলাচল ইত্যাদির গন্ডগোল দেখা দিতে পারে।

সাধারণত কলকারখানার শিল্পগত শব্দের মাত্রা 80 থেকে 120 ডেসিবেল। বড় বড় শহরের জনাকীর্ণ ও যানবাহনে ভরা রাস্তাঘাটে শব্দের প্রাবল্য 100 ডেসিবেলকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রতি বছর এই মাত্রা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এখন আবার খেত-খামারে গিয়ে জুটেছে এই আপদ। খেতের ট্রাকটর, হারভেস্টার ইত্যাদির

*30/10, সেলিমপুর রোড, কলিকাতা 700 031

যান্ত্রিক শব্দ 70 থেকে 110 ডেসিবেল হলেও তা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এবার অশ্রুত শব্দের কথায় আসা যাক।

এই অশ্রুত শব্দের সাহায্যেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বাদুড় নিরাপদ পথে চলতে পারে। এরকম অনেক প্রাণীকে এই অশ্রুত শব্দ অনেক ভাবে সাহায্য করে কিন্তু এই শব্দ মানুষের কতখানি উপকারে আসে তা এবার দেখা যাক।

প্রসঙ্গত বলা যাক, যে শব্দ বা ধ্বনির স্পন্দন সেকেণ্ডে কুড়িবারের কম আর কুড়িহাজার বারের বেশি তাকে যথাক্রমে বলা হয় সাবসনিক (subsonic) এবং আল্ট্রাসনিক (ultrasonic) শব্দ-তরঙ্গ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোনার (sonar) নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার হয় যার সাহায্যে এই অশ্রুত ধ্বনি সমুদ্রের নিচে যে কোন দিকে পাঠিয়ে শত্রুপক্ষের ডুবো জাহাজ কোন্ দিকে এবং কত দূরে আছে তা ধরে ফেলা যায়। বিজ্ঞানীরা এই ধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে মাটির নিচে তেল বা জলের পাইপের সামান্য চিড় ধরে ফেলা যায়।

খুব ছোট যন্ত্রাংশ যা হাত দিয়ে ধরে পরিষ্কার করা যায় না, তা দিব্যি ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায় এই অশ্রুত ধ্বনির দৌলতে। এমন কি, খুব কম সময়ের মধ্যে যে কোন ধাতু ঝালাই করা যায়। উদাহরণস্বরূপ দুটি লোহার দণ্ড নেওয়া যাক। প্রথমে দুটি দণ্ডের মুখ একটি অপরটির সাথে লাগিয়ে একটি দণ্ডকে 'আল্ট্রাসনিক' উৎপাদক যন্ত্রের সাহায্যে কিছুক্ষণের জন্য কম্পিত করানো হলো। কম্পনের সময় সেই আলতোভাবে লাগানো মুখ দুটির মধ্যে ঘর্ষণের ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা ঐ দুটি দণ্ডের মুখ গলিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কম্পন বন্ধ করার কয়েক মুহূর্ত পর দুটি দণ্ড জুড়ে গিয়ে একটিতে পরিণত হয়।

গোয়েন্দা পুলিশরা একপ্রকার বাঁশী ব্যবহার করেন যার প্রেরিত শব্দের কম্পন সেকেণ্ডে চল্লিশ হাজার বার। সুতরাং এই রকম বাঁশীর আওয়াজ কোন মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়; কিন্তু পুলিশের শিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর এই আওয়াজ ঠিক শুনতে পাবে এবং সেই দিকে দৌড়ে যাবে। কুকুরটিকে দৌড়তে দেখে অন্য পুলিশের দল বুঝতে পারবে যে তাদের ওদিকে যাবার ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এভাবে পুলিশরা নিঃশব্দে কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

মাছের পট্‌কা (bladder) এই অশ্রুত ধ্বনি প্রতিফলিত করে। ইদানিং সেই জন্য মাছ ধরবার সময় এই ধ্বনি ব্যবহার করে জলের নিচে মাছ কোথায় আছে এবং কোন্ দিকে সাঁতার কাটছে— তা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এই অশ্রুত ধ্বনি দারুণভাবে সাড়া জাগিয়েছে। এখানে দু-রকম ভাবে এই ধ্বনিকে কাজে লাগানো হয়। রোগ মুক্তির জন্য এবং সঠিকভাবে রোগ নির্ধারণের জন্য।

বাত, বিষফোড়া, শরীরের ভেতরে বা বাইরে নানান ধরণের ক্ষত অশ্রুত ধ্বনির সাহায্যে তাড়াতাড়ি নিরাময় করা সম্ভব। কিছু কিছু শিরার ব্যথা দূর করতে এদের তুলনা নেই। শরীরের খুব সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্রী ছিঁড়ে গেলে এই শব্দচিকিৎসার সাহায্যে তা আবার জুড়ে দেওয়া যায়।

দুর্ঘটনায় মানুষের দেহের মধ্যে অনেক কিছু ঢুকে যায়। অস্ত্র প্রয়োগের সময় শল্য-

চিকিৎসকের জানা দরকার সঠিক কোন্ জায়গায় কোন্ বস্তুটি ঢুকে রয়েছে। দেহের ভিতরে লোহা বা লোহাঘটিত কোন ধাতুর অবস্থান নির্ধারণ করা কঠিন নয়। কিন্তু কাচ বা প্লাসটিক জাতীয় পদার্থ শরীরের ভিতর থাকলে তার অবস্থান শুধুমাত্র এই ধ্বনির সাহায্যে নির্ণয় করা সম্ভব। চোখের ভেতরের সূক্ষ্ম টিউমার, রেটিনা সংক্রান্ত কোন জটিল অসুখ যা কেবল মাত্র নির্ধারণের জন্য চিকিৎসা করা যেতো না—তা এই অশ্রুত ধ্বনির সাহায্যে এখন নির্ধারণ করা যায় অতি সহজে।

অশ্রুত শব্দ নিয়ে বিজ্ঞানীরা পুরোদমে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায় ভবিষ্যতে এই শব্দ আরও অনেক উপকারে আসবে।

বিষাক্ত একটি ভিনদেশী উদ্ভিদ

ফজলুর রহমান*

বহু রকমের গাছ দেখা যায়। কোন গাছ বিষাক্ত, কোন গাছ বিষাক্ত নয়। অনেকেই নিশ্চয় বিছুটি গাছ দেখেছ বা এর কথা শুনেছ। এই গাছ গ্রামাঞ্চলে দিকে জন্মায়। বিছুটি বহু শ্রেণীর হয়ে থাকে। অনেকটা জবা ফুলের মত পাতাওয়ালা এক ধরনের বিছুটি দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ ইটের বা মাটির দেয়ালে অথবা যেখানে মাটি আর্দ্র সেখানে বেশি জন্মায়। আর এক ধরনের বিছুটি আছে, এদের বৈজ্ঞানিক নাম ফিলিউরিয়া ইণ্টারাণ্টা। বর্ষার পরেই এদের দেখা যায়, শীতে এরা জন্মায় না। এদের পাতাগুলি কতকটা লিচু পাতার মত। এরা অনেকটা লতিয়ে চলে বা কোন আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের উপর ভর করে চলে। এরা যে কোন স্থানে জন্মাতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন ধরনের ফলের ও ফুলের বাগানে এই জাতের বিছুটির দেখা পাওয়া যায়। এদের বৈজ্ঞানিক নাম ট্রাজিয়া ইনভলিউক্রেটা। এরা জবা পাতার মত পাতাযুক্ত বিছুটি অপেক্ষা বেশি বিষাক্ত। ট্রাজিয়ার অন্য আর এক প্রজাতি অত্যন্ত বিষাক্ত। এদের পাতাগুলি সরু এবং অনেকটা বাঁশ পাতার মত। এদের ফুল হয়। ফুলগুলি সাদা এবং দেখতে সুন্দর। বিছুটির দেহে অসংখ্য সূচের ন্যায় 'রোম' দেখা যায়। এই রোমগুলিই আসলে বিষাক্ত। এই রোমের মধ্যে নানারকম বর্জ্য ও রেচন পদার্থ থাকে। এই রোম প্রাণীদেহে বিদ্ধ হলে প্রাণীদেহ বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং সেই সকল স্থান অত্যন্ত চুলকোতে থাকে। সেই স্থানে বিভিন্ন রকমের চর্মরোগও দেখা দেয়। বিছুটির দেহে এই বিষাক্ত রোম থাকার ফলে তৃণভোজী প্রাণীরা এদের কাছে যায় না। এটা বিছুটির তৃণভোজী প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায়।

আর এক ধরনের উদ্ভিদ ভারতবর্ষে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যা খুবই বিষাক্ত। দেখতে সুন্দর হলেই সব ফুলে বা গাছে হাত দেওয়া নিরাপদ নয়। এ দেশে এক জাতের ফুলের খোঁজ মিলেছে। যা ছুঁলে সংক্রামক অসুখ হয়। যে গাছে সাদা রঙের সুন্দর ঐ

* গ্রাম-খোদারবাজার, বারুইপুর, 24-পরগণা

ফুল ফোটে তার নাম পার্থেনিয়াম, হিস্টেরোফোরাস। এগুলি এক ধরনের আগাছা, এদেশে আগে ঐ গাছ বা আগাছা ছিল না। সম্প্রতি এদেশে, এমন কি হাওড়া, হুগলী, 24-পরগণাতেও এই আগাছা খুব বেড়ে চলেছে। এজন্য বিজ্ঞানীরা খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ঐ আগাছার ফুলে হাত দিলে দেহের চামড়া ধীরে ধীরে কুমীরের চামড়ার মত শক্ত হয় এবং তা ফেটে সারা দেহ ঘা হয়ে যায়। এমন কি হাত, মুখ, গলাও ফুলে ওঠে। এছাড়া 'পার্থেনিয়াম' গাছের বা আগাছার ফুলের গন্ধে হাঁপানি রোগও হতে পারে। শুধু তাই নয়—'পার্থেনিয়াম' নামক আগাছাগুলি বিষাক্ত সাপের প্রিয় বাসস্থান এবং এর ভেতর প্রচুর মশা জন্মায় এবং নানা বিষাক্ত পোকা-মাকড় বাস করে।

খবর নিয়ে দেখা গেছে ভারতের প্রায় কুড়ি লক্ষ হেক্টর জমি এখন এই বিষাক্ত আগাছায় ভরে গেছে। এই আগাছার ছোট সুন্দর থোকা থোকা সাদা ফুল ফোটে। বিভিন্ন রাজ্যে এই ফুলের বিভিন্ন নাম। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, জম্মু এবং কাশ্মীরের নানা অঞ্চলে এই ফুলের নাম বিভিন্ন—যেমন, চটক চন্দনী, গাজরগবত, গাজর ঘাস অথবা পাহাড়ী ফুল। এই ফুল এবং গাছের প্রথম দেখা মেলে পুনা শহরে। শেষ পর্যন্ত এই বিষময় 'পার্থেনিয়াম' আগাছা সর্বভুকের ন্যায় নানা শহরকে গ্রাস করতে ছুটে চলেছে।

বিষাক্ত এই আগাছার আদি জন্মস্থান কোথায়? দক্ষিণ আমেরিকা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। গাছগুলি এক থেকে দেড় মিটারের মত লম্বা হয়। পাতাগুলি আকারে অত্যন্ত সরু। এই আগাছা-গুলির এক একটি থেকে কম পক্ষে পাঁচ হাজার চারা জন্মায়। এক কথায় বলা চলে, এরা রক্ত-বীজের জাত।

এই আগাছার প্রকোপ এতই বেশি যে, ধান, চীনা বাদাম, তুলা, পাট, আলু, ট্যাড়স, আঙুর, লিচু, পেয়ারা, এবং নানা শাকসব্জির চাষের পক্ষের তা খুব ক্ষতিকারক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন গরুর পেটে ঘাসের সঙ্গে এই আগাছা গেলে তার দুধও বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই আগাছা থেকে প্রাণীগোষ্ঠীর আর কত ক্ষতি হতে পারে তা আজও হয়তো সব জানা যায় নি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 1981 খৃস্টাব্দের জন্ম সভ্য/সভ্যা পদ গ্রহণ ও নবীকরণ করতে ইচ্ছুক প্রার্থিগণকে বিধি ও নিয়মাবলী অনুযায়ী আগামী 20শে ফেব্রুয়ারী, 1981 তারিখের মধ্যে সভ্য/সভ্যা চাঁদা বার্ষিক 19·00 (উনিশ টাকা) পরিষদ কার্যালয়ে জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উক্ত তারিখের মধ্যে চাঁদা জমা না দিলে, 1981 খৃস্টাব্দের বার্ষিক সাধারণ সভায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

রবার

কমলকুমার আচার্য*

রবার এক ধরণের গাছের রস। রবার পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই পরিবহনের ক্ষেত্রে তার আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। পরিবহন ছাড়াও বৈদ্যুতিক তারের আবরণ, চিকিৎসায় সাজসরঞ্জাম, নল, ব্যাগ, গদি প্রভৃতি নানা রকমের জিনিষ রবার থেকে তৈরি হয়। রবার প্রধানত দু-প্রকারের : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক রবার এক ধরণের গাছের নির্যাস বা রস থেকে পাওয়া যায়। আর কৃত্রিম রবার প্রয়োগশালা ও শিল্পে তৈরি বা উৎপাদন করা হয়।

রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের গাছ। বেশির ভাগ রবার গাছ আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় এবং দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর অববাহিকায় জন্মায়। ঐসব অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ প্রাকৃতিক বন্য রবার (wild rubber) সংগ্রহ করা হয় তা পৃথিবীর মোট চাহিদার একটা ক্ষুদ্র অংশ। এই অভাব পূরণের জন্য কৃত্রিম রবার তৈরির গবেষণা শুরু হয়।

1876 খৃস্টাব্দে উইকহাম (Wickham) নামে এক ইংরেজ ব্যবসায়ী গোপনে ব্রেজিল থেকে প্রায় 70 হাজার রবার গাছের বীজ এনে মালয়েশিয়ায় রোপণ করেন। সেই দিন থেকেই আবাদী রবার (plantation rubber) চাষের সূত্রপাত হয়।

বন্য ও আবাদী উভয় প্রকার রবার এক প্রকার গাছের রস থেকে পাওয়া যায়। যে গাছের রস থেকে বন্য ও আবাদী রবার পাওয়া যায় সেই রবার গাছের নাম হেভিয়া ব্রাসিলিয়েনসিস্ (Hevea Brasiliensis), রবার এক ধরণের পলিমার। প্রাকৃতিক রবারের রাসায়নিক নাম হলো পলি (সিস্) আইসোপ্রীন, অর্থাৎ বহু (পলি) আইসোপ্রীন অণুর সংযুতিতে হয় এই ধরণের রবার। কৃত্রিম রবার বহু ধরণের হয়। যাদের কয়েকটির নাম—স্টাইরিন-বিউটাডাইন রবার (স্টাইরিন ও বিউটাডাইন অণুর পর্যায়ক্রমিক সংযুতি), নিয়োপ্রীন রবার (ক্লোরোপ্রীন অণুর পর্যায়ক্রমিক সংযুতি), ইত্যাদি।

বর্তমান যুগের পথ পরিবহন (মটর, বাস, বিমান) সম্পূর্ণ রবারের উপর নির্ভরশীল। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই রবারের তৈরী কোন বস্তু সামান্য উত্তাপ বা সামান্য ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারত না। 1839 খৃস্টাব্দে বিজ্ঞানী চালর্স গুডইয়ার পরীক্ষা করে দেখলেন যে রবার উত্তাপ ও ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তখন থেকেই রবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

রবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ফসল এবং চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের প্রয়োজন। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন 200 সেন্টিমিটার ও তাপমাত্রার প্রয়োজন 20° – 30° সেন্টিগ্রেড। রবার চাষের জমি ঢালু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদি রবার গাছের গোড়ায় জল জমে তবে তা বাঁচতে পারে না।

যে ভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়ে থাকে ঠিক সেই ভাবে রবার গাছ কেটে রবার রস সংগ্রহ করা হয়। এই রবার গাছ কাটতে দক্ষ শ্রমিক একান্ত প্রয়োজন। কারণ কাটার

---

*পোঃ ও গ্রাম কাজেয়াগ্রাম, রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, বর্ধমান

পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে রবার গাছ বাঁচে না। আবার যদি কম কাটা হয় তাহলে রবার গাছ থেকে রবার পাওয়া যায় না। রবার গাছের চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার রাখা একান্ত প্রয়োজন। না হলে রস সংগ্রহে অসুবিধা হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর মোট প্রাকৃতিক রবার উৎপাদনের 90 ভাগই আবাদী রবার। এর শতকরা 90 ভাগ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভারতে চাষ হয়। বাকি 10 ভাগ বন্য রবার, যা আমাজন ও কঙ্গো অববাহিকায় উৎপন্ন হয়।

জানবার কথা

প্রদীপকুমার দত্ত*

1. অবিশ্বাস্য মনে হলেও, কোন কোন জীবাণু বিশিষ্ট কুশলী বিজ্ঞানীদের চেয়ে অনেক বেশি চটপটে। অত্যন্ত উন্নত ধরণের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, দামী দামী রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেও একটি সাধারণ প্রোটিন অণু রসায়নাগারে তৈরি করতে যেখানে কয়েক জন অভিজ্ঞ কুশলী বিজ্ঞানীর কয়েক মাস লেগে যায়, সেখানে কোন কোন জীবাণু (যেমন—ই, কোলি) মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই কয়েক-শ' বিভিন্ন ধরণের প্রোটিন তৈরি করতে পারে। তা হলে জীবাণুরা কি বেশি চটপটে নয়?

2. ধুলো কে-ই বা পছন্দ করে? কিন্তু এই ধুলো আমাদের পরম উপকারী বন্ধু। ধুলো না থাকলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব হতো না। কারণ তা হলে সারা পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হতো। কিন্তু কেন? সে কথা বলতে হলে জানা দরকার ধুলো কি? ধুলো হলো কঠিন পদার্থের অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা যার অনেকেই বাতাসে ভাসমান থাকে। আর এগুলিই মেঘ থেকে বৃষ্টি হবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। মেঘ, যা বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দু ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ধুলিকণাগুলিকেই আশ্রয় করে অপেক্ষাকৃত বড় জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে পৃথিবীতে নেমে আসে, আর তাকেই বলা হয় বৃষ্টি। তাই ধুলো না থাকলে ঘনীভবন কেন্দ্রের অভাবে বৃষ্টি হতো না। দেখা যেত আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কিন্তু বৃষ্টির দেখা নেই। আর বৃষ্টির অভাবে পৃথিবী হতো মরুভূমি।

3. টিকে থাকা ও নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতকে নানা রকম উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায়। মরুভূমি অঞ্চলে যে সব গাছ জন্মায় তারা নিজেদের জলের অভাব যাতে না হয় সেজন্য কিছু বিষাক্ত পদার্থ তৈরি করে নিজের চারপাশের জমিতে এমন ভাবে ছড়িয়ে দেয় যাতে সেখানে আর কোন গাছ জন্মাতে না পারে। নিজের চারপাশের অনেকটা জায়গা এই ভাবে গাছ জন্মানোর অযোগ্য করে তুলে সামান্য পরিমাণ যে জল সেখানে পাওয়া যায় তাতে কাউকে ভাগ বসাতে দেয় না।

---

*ইনস্টিটিউট অব্ রেডিও ফিজিকস্ অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা-700 009

4. আমাদের দেহের প্রায় সব কোষই নষ্ট হয়ে গেলে আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়। কিন্তু মস্তিষ্কের কোষ একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর সৃষ্টি হয় না। মস্তিষ্কের কোন কোষ নষ্ট হয়ে গেলে তা চিরজীবনের জন্যই নষ্ট হয়ে যায়। আর মানুষের বয়স 35 বছর হয়ে গেলে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ (10^5) করে মস্তিষ্কের কোষ মারা যেতে থাকে। তবে এতে আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ সৌভাগ্যক্রমে মানুষ জন্মগ্রহণ করে $100000000000 = 10^{11}$ এরও বেশি মস্তিষ্কের কোষ নিয়ে। তাই 200 বছর বাঁচলেও তখনও মস্তিষ্কের অনেকগুলি কোষই সজীব থাকবে।

5. সমুদ্রের জলে যে নানা রকম লবণ থাকে তা সকলেরই জানা। কিন্তু এই লবণের পরিমাণ আমাদের ধারণার বাইরে। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে পৃথিবীর সব কটি সমুদ্রের জলে মোট লবণের পরিমাণ প্রায় 5×10^{16} টন। যদি কোন ভাবে এই লবণকে জল থেকে পৃথক করা যায় তবে পৃথিবীর সব কটি শহর প্রায় 152·4 মিটার লবণের নিচে ঢাকা পড়বে।

6. সাধারণত যে সব গাছপালা দেখা যায় সেগুলির বীজ পুড়ে গেলে কিংবা অ্যাসিডে ভেজালে তার থেকে আর গাছ জন্মায় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক উল্টেটো ঘটে। আগুনে না পোড়ালে বা অ্যাসিডের সংস্পর্শে না এলে সেই বীজ থেকে কোন গাছ জন্মাতে পারে না। সিয়ানোথাস (Ceanothus) গাছের বীজের এমন একটি কঠিন আবরণ থাকে যাকে না পোড়ালে তা অটুট থাকে। ফলে বীজ থেকে গাছ জন্মাতে পারে না। পোড়ালে এই আবরণ ফেটে যায় এবং বীজ থেকে গাছ জন্মাতে পারে। আবার লাল সিডার (Cedar) গাছ এবং কঠিন ম্যাপল (hard maple) গাছের বীজ থেকে গাছ জন্মাতে হলে বীজগুলিকে অ্যাসিডের সংস্পর্শে আনতেই হয়।

ভেবে কর

1. একদা এক রাজার 14টি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তিনি কাজকর্মে এই 14 সংখ্যাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। যেমন, তাঁর ছিল 14টি হাতি, 14টি মন্ত্রী, 14টি বাগান প্রভৃতি। এক সময় রাজা বৃদ্ধ হলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাজার 2523136 বর্গমিটার একটি বৃত্তাকার জায়গা ছিল। জায়গাটির কেন্দ্র বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। তাঁর ইচ্ছা হল—মৃত্যুর পর ঐ স্থানে তাঁর একটা স্মৃতিসৌধ হোক। সেজন্য তিনি রাজমিস্ত্রীকে ডেকে বিশেষ এক নির্দেশ দেন। তা হলো —বৃত্তাকার স্থানটির ব্যাসকে কর্ণ ধরে যে বর্গক্ষেত্র তৈরি হয়, সেই বর্গক্ষেত্রটিকে প্রথম বর্গক্ষেত্র ধরে তারপর বর্গক্ষেত্রের চারি বাহুকে স্পর্শ করে এবং বৃত্তের ব্যাসকে কর্ণ ধরে দ্বিতীয় বর্গক্ষেত্রটি পেতে হবে। এই রকম চৌদ্দতম বর্গক্ষেত্র পরিমাণ স্থান বিশিষ্ট একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে হবে। রাজা মৃত্যুর পর ঐ জায়গায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করবার ব্যবস্থা করে যেতে চান। রাজমিস্ত্রী তো মহা ফাঁপড়ে পড়ল—ঐ জায়গাটি বের করবে কি ভাবে? যাই হোক সে এর সমাধানের জন্য অনেক পণ্ডিতের কাছে গেল। কিন্তু সবাই রাজার হুকুম শুনে হাসাহাসি করলেন। অবশেষে মিস্ত্রী নিজেই এর সমাধান করবার চেষ্টা করলো। সমাধান করতে গিয়ে দেখলো যে, উদ্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রের বাহুটিও

14 মিটার হয়েছে। তখন মিস্ত্রী তো আনন্দে কাজ শুরু করে দিল। কি ভাবে মিস্ত্রী ঐ সমস্যার সমাধান করেছিল ?

শিশিরকুমার পাঁজা

(উত্তর 569 পৃষ্ঠায়)

2. একটি চক্রাকার রেল লাইনের উপর A ও B দুটি কামরা। C একটি ইঞ্জিন। চক্রাকার লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত লাইনের উপর এটি দাঁড়িয়ে আছে।

A ও B এর মধ্যবর্তী জায়গাটিতে D একটি কমজোরী সাঁকো আছে। সাঁকোটির উপর দিয়ে কেবলমাত্র ঐ ইঞ্জিনটিই যেতে পারে। এখন A কামরাটি B কামরার জায়গায় এবং B কামরাটি A কামরার জায়গায় আনবার নির্দেশ এলো ইঞ্জিন চালকের কাছে। বলো তো—কিভাবে চালক তা পেরেছিল ?
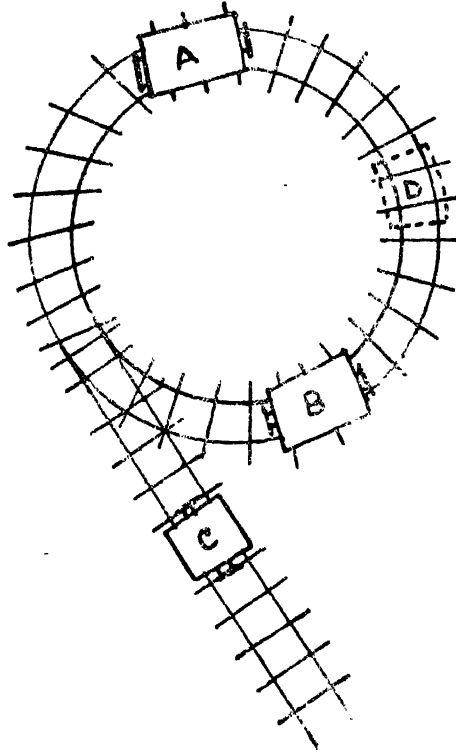
দীপ্তি শীল

3. দশটি বাক্সের প্রত্যেকটিতে দশটি করে লোহার বল আছে। এর মধ্যে নয়টি বাক্সের প্রত্যেকটি বলের ওজন 100 গ্রাম, শুধুমাত্র একটি বাক্সের প্রত্যেকটি বলের ওজন 90 গ্রাম। কেবলমাত্র একবার ওজন করে কি করে বলা সম্ভব—কোন্ বাক্সটিতে 90 গ্রাম ওজনের বলগুলি আছে ?

অমিতকুমার দাস

(উত্তর পরবর্তী সংখ্যায়)

একটু ভাব

(প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় মাত্র 60 সেকেণ্ড)

1. দুটি সমান আয়তনবিশিষ্ট কাপের একটিতে জল ও অন্যটিতে খাঁটি দুধ রয়েছে। দুধের কাপ থেকে এক চামচ দুধ জলে মেশানো হলো। তারপর ঐ দুধ মেশানো জল এক চামচ নিয়ে দুধে মেশানো হলো। বলতো—জলে দুধের পরিমাণ বেশি না দুধে জলের পরিমাণ বেশি?

2. দু-মুখ বন্ধ করা যে কোন আকৃতিবিশিষ্ট একটি স্বচ্ছ পাত্রের মধ্যে কিছু তরল পদার্থ আছে। তরলের পরিমাণ পাত্রটির আয়তনের অর্ধেক অথবা কম কিংবা বেশি। একটি সুতো দেওয়া আছে। বলতে পারো—কিভাবে জানা যাবে, ঐ পাত্রের তরলের পরিমাণ কত?

আশিসকুমার পাল*

(উত্তর: পরবর্তী সংখ্যায়)

*95A, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700 009

মডেল তৈরি

ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার

একটি ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার তৈরি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। নিচে ঐ বর্তনীটি দেখানো হয়েছে (চিত্র)।
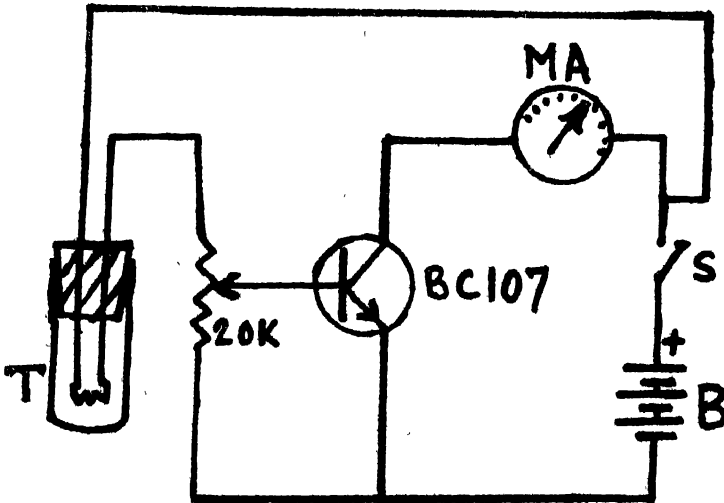
একটি অ্যামিটার (0—100 mA), একটি ট্রানজিস্টর BC 107, একটি পোটেনশিয়োমিটার 15 KΩ বা 20 KΩ, একটি থার্মিস্টার DLZ 100, একটি ব্যাটারী 6V ও বাকি কিছু তার, একটি একমুখী সুইচ S ইত্যাদির সাহায্যে বর্তনীটি সংযুক্ত করতে হবে।

টেস্টটিউবে রাখা থার্মিস্টারটির রোধ তাপমাত্রা হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। থার্মিস্টার, ব্যাটারী ও পোটেনশিয়োমিটার শ্রেণী সমবায়ে পরস্পর যুক্ত। তড়িৎপ্রবাহের সময় পোটেনশিয়োমিটারে যে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়, তা BC 107 ট্রানজিস্টরের 'বেস-বায়াস' হিসেবে কাজ করে। থার্মিস্টারে তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে ঐ 'বায়াস বিভব' নির্দিষ্ট থাকে না। 'বেস'-এর তড়িৎপ্রবাহ ট্রানজিস্টরে বিবর্ধিত হয়ে মিলিঅ্যামিটারটির সূচকের বিক্ষেপ ঘটায়। এবার মিটারটির স্কেলকে তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেলে বদল করে নিতে হবে। এজন্য টেস্টটিউব সমেত থার্মিস্টারটিকে সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা পরিমাপের প্রয়োজন তার মধ্যে রেখে পোটেনশিয়োমিটারের সাহায্যে মিটার স্কেলের সূচকটির পূর্ণ বিক্ষেপ ঘটানো হলো। কোন ত্রুটিহীন থার্মোমিটারের সাহায্যে ঐ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নির্ণয় করে নিতে হবে। থার্মিস্টারটিকে ক্রমশ বিভিন্ন নিম্ন স্থির তাপমাত্রায় রেখে মিটারের সূচকটির বিক্ষেপগুলি দেখে নিতে হবে। এভাবে মিটারের তড়িৎপ্রবাহ পরিমাপের বদলে তাপমাত্রা পরিমাপ করবার একটি স্কেল তৈরি হলো।

থার্মিস্টারটিকে অজানা তাপমাত্রায় রাখলে মিটারের সূচকটির বিক্ষেপ ঘটবে এবং তা থেকে ঐ তাপমাত্রা মোটামুটিভাবে বলে দেওয়া সম্ভব। তবে যে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে হবে, তা নির্ণীত স্কেলের মধ্যে হওয়া চাই। এই থার্মোমিটারের সাহায্যে O°C থেকে 100°C-এর মধ্যবর্তী যে কোন তাপমাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

—বিজ্ঞান অন্বেষ্টা

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন : পাটের আঁশ এত শক্ত হয় কেন?

কাজলকুমার মাইতি
কাঁথি, মেদিনীপুর।

উত্তর : পাটের আঁশের আকৃতি নলের মত। বোনা জালের মত এগুলি কাণ্ডের চারদিকে জড়ানো থাকে। জালের মধ্যে থাকে আঁশ। এই আঁশের গড় ব্যাস প্রায় 50 মাইক্রন। প্রতিটা পাটের আঁশ আবার কয়েকটা ছোট ছোট নলের সমন্বয়ে তৈরী। এগুলিকে আঁশের কোষ বলা হয়। এদের গড় ব্যাস প্রায় 15 মাইক্রন। কোষগুলি সরু সুতোর মত এবং উভয় প্রান্তই সূচালো। এরা পরস্পর শক্তভাবে সংযুক্ত থাকে। অনেকে মনে করেন—কোষগুলির মধ্যবর্তী অংশে ক্যালসিয়াম পেক্টেট নামক পদার্থ হয়তো কোষগুলিকে শক্তভাবে আটকে রাখে।

পাটের উপাদান হলো—হেমিসেলুলোজ, সেলুলোজ ও লিগ্নিন। সেলুলোজ দ্বারা গঠিত আঁশ খুবই মজবুত হয়। দেখা যায়, একই রকম গঠনের বন্ধনদ্বারা সেলুলোজ অণু তৈরী এবং লম্বা অণুগুলি আঁশের অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। তাছাড়া, সমান্তরাল বিভিন্ন অণুদের মধ্যে আঠার মত শক্ত বন্ধন থাকে। এ সমস্ত কারণেই পাটের আঁশ এত শক্ত বা মজবুত এবং খুব বেশি জোর সহ্য করতে সক্ষম হয়।

শ্যামসুন্দর দে

ভেবে উত্তর দাও

নিচের প্রশ্নগুলির একাধিক উত্তর দেওয়া আছে. সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত কর ঃ

1. একটি কৃত্রিম উপগ্রহে উপবিষ্ট কোন ব্যক্তি নিজেকে
   (ক) অনেক ভারী অনুভব করে
   (খ) অনেক হাল্কা মনে করে
   (গ) ভারশূন্য মনে করে।

2. কোন ঘরের মধ্যে একটি রেফ্রিজারেটর চলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এখন রেফ্রিজারেটরের দরজাটা খুলে দিলে
   (ক) ঘরের উষ্ণতা কমে যাবে
   (খ) ঘরের উষ্ণতা বেড়ে যাবে
   (গ) ঘরের উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হবে না।

3. নিচের সংখ্যাগুলি একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী রয়েছে। শূন্যস্থানের সংখ্যাটি বের কর ঃ
   0,7,26,63,—.
   (ক) 96 (খ) 124 (গ) 126

4. স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে যে পরিমাণ বায়ু গৃহীত হয় তার আয়তন হলো ঃ
   (ক) 4000—5000 (খ) 3200—4000 (গ) 1000—1050 মিলিলিটার।

5. ভারী হাইড্রোজেন এবং স্বাভাবিক হাইড্রোজেনের পরমাণুর মধ্যে
   (ক) ইলেকট্রনের সংখ্যা পরস্পর সমান
   (খ) নিউট্রনের সংখ্যা পরস্পর সমান
   (গ) প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা পরস্পর সমান।

6. একটি কাচের প্লেটের উপর একটি নক্সা খোদাই করতে হলে যে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করতে হবে সেটি হলো ঃ

(ক) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

(খ) হাইড্রোজেন ক্লোরাইড

(গ) হাইড্রোজেন ব্রোমাইড।

7. একটি মাল বোঝাই নৌকো সমুদ্র থেকে নদীতে প্রবেশ করলে নৌকোটি

(ক) বেশি ডুবে যাবে

(খ) অপেক্ষাকৃত ভেসে উঠবে

(গ) কোন পরিবর্তন হবে না।

8. স্থির অবস্থায় কোন বস্তুর যে ভর থাকে চলন্ত অবস্থায় তা

(ক) হ্রাস পায়

(খ) বৃদ্ধি পায়

(গ) একই থাকে।

9. কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থার পর কোন পদার্থের যে অবস্থা থাকে তার নাম হলো —

(ক) প্লাজমা অবস্থা

(খ) পারমাণবিক অবস্থা

(গ) আর কোন অবস্থা নেই।

তুষারকান্তি দাস*

(উত্তর 571 পৃষ্ঠায়)

* ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স্ অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স্ ; কলিকাতা-700 009

564 পৃষ্ঠার ভেবে কর-এর সমাধান

মিস্ত্রী প্রথমে রাজার আদেশ মত বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, আবার বৃত্ত হিসেব করে আঁকলেন। নিচে পর পর চারটি চিত্র দেওয়া হলো—
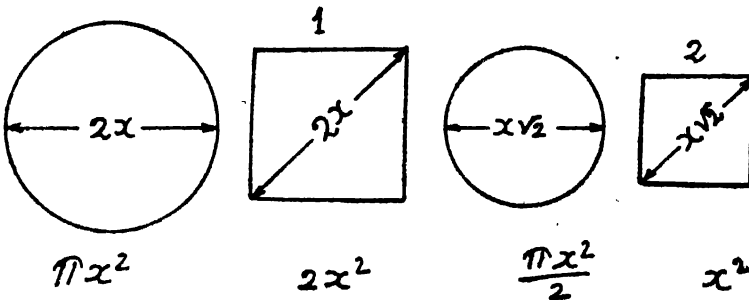
প্রথম বৃত্তটির ব্যাসার্ধ x ধরে ক্ষেত্রফল বের করে নিল। বৃত্তটির ব্যাস $2x$; কাজেই কর্ণ $2x$ ধরে ক্ষেত্রফল বের করলো। ক্ষেত্রফলগুলি পর পর বের করে দেখলো—প্রথম বৃত্তের $\frac{7}{11}$ গুণ হলো প্রথম বর্গক্ষেত্রটি এবং পরের বর্গক্ষেত্রগুলি ক্রমান্বয়ে অর্ধেক। চিত্রের নিচে ক্ষেত্রফলগুলি দেওয়া আছে। সুতরাং মিস্ত্রী 2523136 কে $\frac{7}{11}$ দিয়ে গুণ করে 2^{13} দিয়ে ভাগ করে পেল 196 বর্গমিটার পরিমাণ ক্ষেত্র এবং সহজেই বাহুটি নির্ণয় করলো। তা হলো $\sqrt{196} = 14$ মিটার।

তিরিশ বছর আগের পাতা থেকে

[জনমানসে বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে যাঁরা অগ্রণী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চেতনার দ্রুত উন্মেষ থেকেই তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নীতি বিশ্লেষক মডেল তৈরি করবার উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 1950 খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত এ সম্বন্ধীয় তাঁর একটি লেখা এখানে পুনর্মুদ্রিত হলো—সম্পাদক]

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

মোটা মুখওয়ালা দুটা বোতল, চৌকা একটা টিনের কৌটা যোগাড় কর। টিনের কৌটাটার তলায় ছিদ্র করে আধ ইঞ্চি মোটা একটা কর্ক্ পড়াতে হবে। কর্ক্‌টার মধ্যস্থলে সরু ছিদ্র করে তাতে ছোট্ট একটা কাচের নল গলিয়ে দাও। বোতল দুটার জন্যও দুটা কর্ক দরকার। বোতলের কর্কদুটার মধ্যেও দুটা করে ছিদ্র করে কাচের ছোট্ট নল পড়াতে হবে। এবার ছবির মত করে বোতল
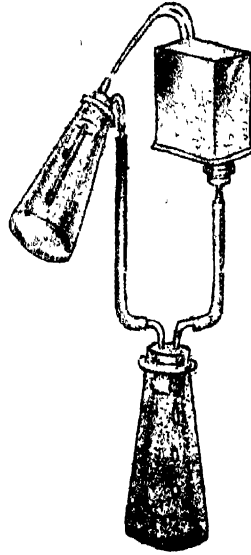
দুটা ও টিনের কৌটার সঙ্গে দু-টুকরা রাবারের নল জুড়ে সুবিধামত স্থানে বসাও। উপরের বোতলটার প্রায় গলা অবধি জল ভর্তি থাকবে এবং তার একটা কাচের নল তলা থেকে খানিকটা বাইরে বেরিয়ে থাকবে। নীচের বোতলটা থাকবে খালি। উপরের টিনের কৌটাটাতে জল ঢেলে দিলেই জলটা নীচের বোতলে নেমে আসতে চাইবে। তার ফলে বোতলের বাতাসে চাপ পড়বে। বাতাসের সেই চাপ গিয়ে পড়বে আবার উপরের বোতলটার জলের উপর। এই চাপের দরুণ বোতলের জলটা নল ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসতে থাকবে।

সংখ্যাকূট

পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংখ্যা বহু; তাই বিজ্ঞানীর সংখ্যাও অনেক। এঁদের অনেকেরই নাম ও আবিষ্কার জানা। এই সম্বন্ধীয় নিচের ছকটি পূর্ণ করতে গেলে স্মৃতিশক্তি একটু যাচাই হয়ে যায়।

ছকটিতে নির্দিষ্ট সংকেত এবং বিজ্ঞানীর আবিষ্কার অনুযায়ী বিজ্ঞানীর নাম ঠিক করতে হবে। ছকটি হলো—

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	
	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	
	27	28	29	30		

সংকেত—

ঘরের নম্বর : 1-2-3, 4-5-6-7, 10-16, 15-16, 6-11-17-23, 12-18-24, 9-14-20-26, 1-8-13-19-25-30, 27-28-29-30, 21-22-23, 23-24-25-26।

আবিষ্কার : স্টীম ইঞ্জিন, মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব, রিভলবার, ট্রাক্টর, ব্যারোমিটার, লাউডস্পীকার, ইস্পাত, ঝর্ণাকলম, ইলেকট্রিক বালব্, অক্সিজেন, রঙিন ফটোগ্রাফি।

অমিত চট্টোপাধ্যায়*

(উত্তর 573 পৃষ্ঠায়)

*7 বি, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 004

568 পৃষ্ঠার ভেবে উত্তর দাও-এর উত্তর

1. (গ), 2. (খ), 3. (খ), 4. (গ), 5. (ক), 6. (খ), 7. (ক), 8. (খ), 9. (ক)।

করে দেখ ঃ মজা পাবে

একটা কিংবা দুটো হাতের সাহায্যে নানারকমের জীবজন্তুর মুখ এমনকি সর্বাঙ্গের ছবি তৈরি করে মজা পেতে পার। এতে শুধুমাত্র দরকার একটা উজ্জ্বল বাতি একটা সাদা পর্দা। পর্দার সামান্য দূরে বাতিটা জ্বলবে। 1 ও 2 নং ছবির মত করে বাতি ও পর্দার মাঝে একটামাত্র
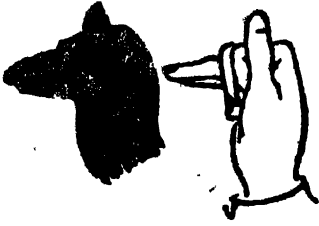
চিত্র 1
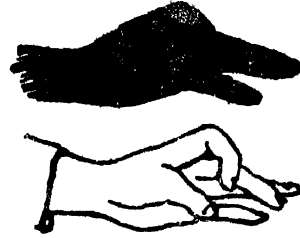
চিত্র 2

হাত রাখলে (বাতিটা দেখানো নেই) পর্দায় ফুটে উঠবে একটা লামা এবং একটা রাজহাঁসের গলা। ছবির কালো অংশে তা দেখা যাচ্ছে 3, 4 ও 5 নং ছবির মত করে দুটো হাত বিভিন্ন কায়দায় রাখলে
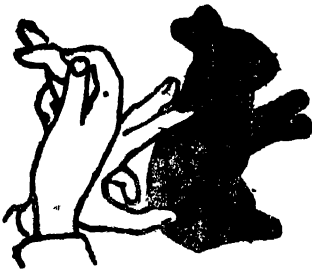
চিত্র 3
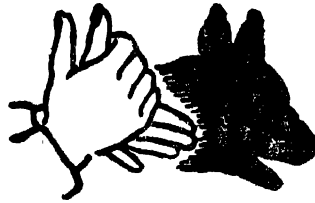
চিত্র 4

চিত্র 5

পর্দায় দেখা যাবে যথাক্রমে খরগোস, কুকুরের মুখ ও প্রজাপতি। ঐ অবস্থায়, হাতের বিভিন্ন আঙুল ও অন্যান্য অংশ নাড়িয়ে ছবিগুলিকে অনেকটা প্রাণবন্ত করে তোলা যায়। এভাবে, একটু চেষ্টা করলেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ করবার সময়কার অবস্থাটা, প্রজাপতির পাখা নাড়ানো, লামার থুথু ছেটানো, খরগোশের কান নাড়ানো, রাজহাঁসের গলা ফোলানো ইত্যাদি দেখানো যায়। এগুলি করে তোমরা দেখতে পার। তবে যত উজ্জ্বল বাতি নিয়ে এই পরীক্ষাগুলি করবে, ততই ছবিগুলি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। খেয়াল রাখবে—উজ্জ্বল আলো হলেও এজাতীয় ছবি স্পষ্ট ভাবে দেখতে হলে হাত রাখতে হবে বাতির কাছাকাছি। পর্দার কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষাগুলি করলে ছবি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

এসব ঘটনার পিছনে যে বিজ্ঞান আছে তা হলো—আলোর সরলরৈখিক গতি। হাত অস্বচ্ছ, তাই পর্দা ও বাতির মাঝখানে হাত রাখলে হাতের ভিতর দিয়ে আলো যেতে পারে না; আর এজন্যই পর্দায় ফুটে ওঠে হাতের ছায়া।

—বিজ্ঞান অন্বেষক

অন্যান্য বিজ্ঞান সংস্থার খবর

অন্বেষা সায়েন্স ক্লাব

16, 17, 18 অক্টোবর (1980) মসলন্দপুরের অন্বেষা বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালনায় এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার। প্রদর্শনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ফ্লাড অ্যালার্ম, ইনকুবেটর, সেফ্টি ফিউজ, নাচুনে পাখী, স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, আধুনিক ফল বিপণী, পরিবেশ ও দূষণ, ভারতে জনসংখ্যার সমাধান প্রভৃতি। প্রদর্শনীতে প্রচুর দর্শক উপস্থিত হন।

অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থা

13 এবং 14 সেপ্টেম্বর (1980) অশোকনগর বিজ্ঞান সংস্থার পরিচালনায় বাণীপীঠ স্কুলে দ্বিতীয় বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলার আকর্ষণ ছিল—বিজ্ঞান প্রদর্শনী, জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা, মডেল, বক্তৃতা, বিতর্ক এবং "সুশীল সেন স্মৃতি প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা"। এই সব প্রতিযোগিতায় প্রায় 200 ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। বক্তৃতা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে "জ্বালানী সঙ্কট" এবং "সভার মতে জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞানসম্মত নয়"। 'সুশীল সেন স্মৃতি বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজে' 23টি গ্রুপ অংশগ্রহণ করে। 14 সেপ্টেম্বর শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী স্লাইড সহযোগে "মানুষ এল কোথা থেকে" বক্তৃতাটি প্রদান করেন।

তাহেরপুর বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক মেঘনাদ সাহার 87তম জন্মদিবস পালন

8ই অক্টোবর (1980) তাহেরপুর নেতাজী উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার 87তম জন্মদিবস পালিত হয়। পরিষদের সম্পাদক শ্রীনারায়ণ পাল সভায় পরিষদের উদ্দেশ্য এবং বর্তমান কার্যাবলী ও সমস্যাদি বিবৃত করেন। পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন—এই অবক্ষয়ের যুগে কিছু তরুণ-তরুণী যে এক সৎ প্রচেষ্টার মধ্যে এগিয়ে এসেছে এবং আজ এমন এক মানুষকে স্মরণ করছে যিনি শুধু মাত্র বিজ্ঞান নয়, রাজনীতি ও সমাজ সেবাতেও জড়িত ছিলেন, তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে চলা আমাদের কিছু মাত্র ভুল হবে না।

চন্দননগর ক্রিয়েটিভ কালচার সেণ্টার

16 অক্টোবর থেকে 18 অক্টোবর (1980) পর্যন্ত চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ে ক্রিয়েটিভ কালচার সেণ্টার-এর উদ্যোগে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি এবং বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ও রেক্টর। চন্দননগরের মহকুমা শাসক এবং চন্দননগর মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রদর্শনীতে পদার্থ, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, গণিত

সংখ্যাকূট-এর সমাধান

ওয়াট, নিউটন, কোল্ট, হোল্ট, টরিসেলি, কেলগ, বেসম্যান, ওয়াটারম্যান, এডিসন, প্রিস্টলি, লিগম্যান।

শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিভাগে মোট 91টি মডেল প্রদর্শিত হয়।

ইয়ং সায়েন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

ইয়ং সায়েন্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে 5 সেপ্টেম্বর থেকে 7 সেপ্টেম্বর (1980) দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীসারদাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ডঃ আর. এন. ব্যানার্জী, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ অলক চক্রবর্তী।

মেলায় অনুষ্ঠিত "গরীব দেশে মহাকাশ বিজ্ঞানে ব্যয় নিতান্তই অপচয়" শীর্ষক বিতর্ক সভা এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য "বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জীবন ও কার্য" শীর্ষক ভাষণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক ধাঁধা (কুইজ) প্রতিযোগিতা খুবই আকর্ষণীয় হয়।

ভ্রম সংশোধন—অক্টোবর 1980 সংখ্যা জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার 521 পৃষ্ঠায় নয় এবং এগারো নম্বর খোপে '0' ও '5'-এর স্থলে যথাক্রমে '1' এবং '6' হবে।
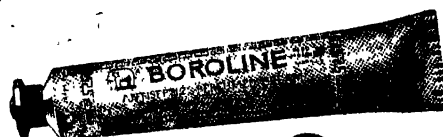
সম্পাদনা সচিব—বিভূতিভূষণ মজুমদার
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে শ্রীমিহিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-6 হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মাবলী

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা 18·00 টাকা ; ষাণ্মাসিক গ্রাহক-চাঁদা 9·00 টাকা। সাধারণত ভিঃ পিঃ যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না।
2. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্যগণকে প্রতি মাসে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা প্রেরণ করা হয়। বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য চাঁদা বার্ষিক 19·00 টাকা। আজীবন সদস্য চাঁদা 200 টাকা। যদি কেউ পরপর পাঁচ বৎসর সাধারণ সদস্য থাকেন তবে তিনি 150 টাকা দিলে আজীবন সদস্য হতে পারবেন।
3. প্রতি মাসের পত্রিকা সাধারণত মাসের প্রথমভাগে গ্রাহক এবং পরিষদের সদস্যগণকে যথারীতি "আণ্ডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিং"-এ ডাকযোগে পাঠানো হয় ; মাসের মধ্যে পত্রিকা না পেলে স্থানীয় পোস্ট অফিসের মন্তব্যসহ পরিষদ কার্যালয়ে পত্রদ্বারা জানাতে হবে। এর পর জানালে প্রতিকার সম্ভব নয় ; উদ্বৃত্ত থাকলে পরে উপযুক্ত মূল্যে ডুপ্লিকেট কপি পাওয়া যেতে পারে।
4. টাকা, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি ও ব্লক প্রভৃতি কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি 23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006 (ফোন-55-0660) ঠিকানায় প্রেরিতব্য। টাকা, চেক ইত্যাদি কোন ব্যক্তি-বিশেষের নামে পাঠাবেন না। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে 1 টা থেকে 5 টার মধ্যে উক্ত ঠিকানায় অফিস তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।
5. চিঠিপত্রে সর্বদাই গ্রাহক ও সভ্যসংখ্যা উল্লেখ করবেন।
6. কলিকাতার বাইরের কোন চেক প্রেরণ করলে গ্রহণ করা হবে না।

কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার লেখকদের প্রতি নিবেদন

1. বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রবন্ধাদি প্রকাশের জন্যে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যাতে জনসাধারণ সহজে আকৃষ্ট হয়। বক্তব্যবিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং মোটামুটি 1000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (abstract) পৃথক কাগজে চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখে দেওয়া প্রয়োজন। কিশোর বিজ্ঞানীর আসরের প্রবন্ধের লেখক ছাত্র হলে তা জানানো বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধাদি পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক জ্ঞান ও বিজ্ঞান, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-700 006, ফোন : 55-0660.
2. প্রবন্ধ চলিত ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।
3. প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালি দিয়ে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন ; প্রবন্ধের সঙ্গে চিত্র থাকলে চাইনিজ কালিতে পৃথক কাগজে এঁকে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধে উল্লেখিত একক মেট্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
4. প্রবন্ধে সাধারণত চলন্তিকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট বানান ও পরিভাষা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্রাকেটে ইংরেজী শব্দটিও দিতে হবে। প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
5. প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরো নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণত ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে সম্পাদক মণ্ডলীর অধিকার থাকবে।
6. 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনার জন্য দু-কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

সম্পাদক
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

JNAN-O-BIJNAN
Regd. No. C 3684
(G.P.O. Calcutta)
December, 1980